বর্ষ-১৫৭
সংখ্যা-১-৫, ৭-৮, ১০-১২
১৩৫৭

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

বৈশাখ—চৈত্র ১৩৫৭

অসহযোগে বিপ্লবী বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৪১
অমর জীবন—শ্রীরসিক লাল দাস ৫৮
অগ্নিবেশ ও আয়ুর্বেদ—ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ ২৪৪
অবিনাশ চক্রবর্ত্তী—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৪৪৪
অবলম্বন—লক্ষ্মীদেবী ৬৩৪
আলিপুর জেলে—শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
আষাঢ়ে—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১১৬
আকাঙ্ক্ষা—শ্রীজয়ন্তী দেবী ২৪৩
আমাদের সাহিত্য—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩, ৩৩৩
আদর্শ—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩২০
আবির্ভাব—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত ৪১৮
আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি—কমলা দাশগুপ্ত ৪২০
আশ্বিন, ১৩৫৬—বেনু দত্তরায় ৪৭২
আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতি—বীরেন সেনগুপ্ত ৪৭৩
আবির্ভাব—শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার ৫২৪
আবাহন—শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য ৫৩১
আচার্য বিনয় কুমার সরকার—শ্রীবাসুদেব দত্তরায় ৬৩১
আবেদন—শ্রীজয়ন্তী ঘোষ ৬৭৮
ইষ্টার—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৯৬
ইন্দোনেশীয়া—শ্রীঅশোকচন্দ্র গুহ ১৫৩
ইতিহাস—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ৪৬২
ইতিহাস—সন্তোষ কুমার অধিকারী ৪৬২
উত্তরাপথ ভ্রমণ—ভবঘুরে ২৬৭, ৪৭৯, ৬৩৩, ৭৪৪
উপায়—শ্রীপ্রভাত রায় ৭০২
একা—শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার ৩০
এপার ওপার—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী ৫৮
একটি সাদাপাতা—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯০
এপিট ওপিট—শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী ৫৩৬
একটা স্বপ্ন—শ্রীঅতীন কুমার ৬৪৩
একখানি পত্র—শ্রীপথিক ৬৭৪
কল্পনা—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ১০
কান্না—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
কালোমেঘ—ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ৫৪
কালের যাত্রা—৬৯, ১৩৮, ২০৭, ২৮৩, ৩৪৩, ৪৪০, ৪৯৫, ৫৪৬, ৫৯৭, ৬৪৭, ৭১৬, ৭৮০
করাচিতে নৌসেনা বিদ্রোহ—শ্রীঅনিলকুমার রায়
কলম্বসের নতুন অভিযান—শ্রীপতী চৌধুরী
কার্লমার্কস, প্লেটো ও কম্যুনিজম—বাসুদেব দত্তরায়
কুন্তল চক্রবর্ত্তী—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
কংগ্রেস ও মন্ত্রিসভা—শঙ্কর
কবি কুমুদরঞ্জন—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কে তুমি—মন্টু দাশগুপ্ত
খেলাধূলা—শ্রীখেলোয়াড় ১৯৭, ২৭৩, ৩৮০, ৪১৩, ৫৩৯, ৫৯১, ৬৪৮, ৭১৪, ৭৭৩
খোকার স্বপন—শ্রীরায় ২৫২
খেদ—শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৬
গীতা উদ্বোধনে—শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
গীতা জয়ন্তী—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক ২৯
গৌরবোজ্জ্বল বাংলা—ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী
গান্ধী ক্যাম্পের বর্ত্তমান কর্মধারা—রঞ্জন কুমার দত্ত
গ্রামের কংগ্রেস—শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী
ঘুম—পারুল ঘোষ
চিন্তার ধোঁয়া—কমলা দাশগুপ্ত
চিঠি—শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় ৪৬১
চীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৪৮৯
চারণের গান—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ৫২৩
চীন ও তিব্বতের রাজনৈতিক বিবর্ত্তন—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র বৈশাখ—চৈত্র ১৩৫৬

উপনিবেশ—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী ৪০৯
আগন্তুক—সুধীর রায়চৌধুরী ৬৬, ১৩৫, ২০৬, ২৭৯, ৪৩৬, ৪৪২, ৫৮৮, ৬৪২, ৭৭৭
জিজ্ঞাসা—শ্রীপুলিন সরকার ১৮৫
জ্যোতিষ্ময়—শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় ২২৭
জীবন—শ্রীবাণীন দাশগুপ্ত ৪২৩
আকৃতি—শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্তী ৫৪১
জীবন রঙ্গমঞ্চে—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ৬৪৪
ঝড়ের পরে—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯১
ঝরার ধর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৫৫০
এলাহ ট্রেলিং বিনিময় হার—শ্রীবীণাপাণি চক্রবর্তী
ওগো দুপুর— মেঘমালা দেবী
ওরেঞ্জ—শ্রীনগেন বসু ৩৮৩
ওয়ারাঙ্গলের রঞ্জন ও রাইকমল—শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস ৫৭৮
কন্যা—পুষ্পরাণী ঘোষ ১৯০, ২৪৬
কবীরের ভূমিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৩৭৬
কবিতা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৩৮১
কিরণ সাহিত্য বিষয়ে দু-একটি কথা—
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
কান—শ্রীমতী মায়া ঘোষ
কারী—শ্রীসংযুক্তা কর
কোরাখালি ত্রিপুরাতে গান্ধীক্যাম্পের বর্তমান
কর্মধারা—রঞ্জন কুমার দত্ত
নীলকণ্ঠ—শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায় ১৩৫
নতুন পৃথিবী—সন্তোষ কুমার অধিকারী ১৮৯
নায়ার সাথী—উৎপল
প্রণাম তোমায় বাপু—সাধন চৌধুরী
প্রথম হাজার ষ্টাইক—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপন—
শ্রীমুকুন্দ দাশগুপ্ত ১৮৬
পুস্তক পরিচয়— ১২৬, ২৭৭, ৪৪৪
পত্রম—শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায় ২৪৫
প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস—
শ্রীমতী লীলা রায় ৩১৫
প্রাবৃট—শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় ৩১৬
প্রচ্ছন্ন—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩৬৯
পূর্বাচল—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ৪১৫
প্রফুল্ল চক্রবর্তী—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ৫০৩
পাথর—শ্রীমতী বিজনলতা দেবী ৫০৬
পিয়াসী—শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায় ৫১৮
পাশাপাশি—বেলা দাশগুপ্ত ৭১২
পাহাড়তলীর কাব্য—শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৭৬০
ফকির সাহেব—সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ৪১
ফিরে আয়—শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার ৩৭৫
ফটোগ্রাফার ব্যবহার—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪০৬
ফুলটুসি—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৬৩৭
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ১১, ১২৭, ১৪১, ২২১, ৩০৩, ৪০১, ৪৫৫, ৬০৭, ৬৭৩, ৭২৭
বিদেশের উপর প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ
চিকিৎসার প্রভাব—ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ ২৭
বৈশাখ—শ্রীকমল সেন ৪৭
বহ্নি—মলিনা দেবী ১২৬
বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ ২২৪
বন্দিতা—কুমারী মীরা চক্রবর্তী ২৬৭
বাংলা অক্ষর—ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ২৮৯
বিপ্লবী সুশীল সেন—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ২৯১
বাংলার সমস্যা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৩৬১
বঞ্চনা—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৯
বৃন্দাবন দাস—শ্রীকালিদাস রায় ৪১৮
বহে চলে যেথা মন চায়—শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭২
বিপদের মুখে ভারতীয় আদর্শবাদ—
রঞ্জন কুমার দত্ত ৫১২, ৫৭৯
বরণীয় তারা স্মরণীয়—শ্রীরসিক লাল দাস ৫৭১
বন্যা স্মরণে—শ্রীজয়ন্তী ঘোষ ৬৩০
বসন্ত—মতিয়র রহমান চৌধুরী ৬৭২
বর্তমানে কাজ কি—শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী ৬৮৫

ভারতে বিদেশী মূলধন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৬১
ভালো লেখা—সন্তোষ কুমার অধিকারী ১৭৭
ভাগ্য—অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ ২৯৫
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম সরকার—শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৫৭০
ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্ম—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৬৭৯
ভারতবর্ষ—চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৬৯৫
ভারতের জাতীয় পতাকা ও অশোকের ধর্মচক্র—
শ্রীবীণাপাণি চক্রবর্ত্তী ৭০৭
মরুর কাকনা—শ্রীপতি চৌধুরী ২১৮
মহাকবি মাইকেল—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮০
মৃত্যুদূত—শ্রীসুলতা কর ৪১৯
মুক্তি—শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় ৪৯১
মোদের বিবেকানন্দ—লক্ষ্মী দেবী ৫২২
মহাত্মা শিশির কুমার—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ৫৮৬
মহাকবি দ্বিজেন্দ্র লাল—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬৪১
মুক্ত হইল মহাজীবনের দ্বার—মলিনা দেবী ৬৪২
মানুষ—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ৭৩৭
মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ ৭৩৯
যাত্রা—সুব্রতা চৌধুরী ৫২৬
যেথায় তুমি—শ্রীপান্থ ৭১৯
রবীন্দ্রকাব্যের সুর—অশোক সেনগুপ্ত
রোমাঞ্চ—সন্তোষ কুমার অধিকারী ২৬৪
রূপ ও বাণী—শিল্পরসিক ৫৯৪, ৭৭৫
রক্ত কমল—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৬০৩
রঙ্গবার্ত্তা—শিল্পরসিক ৬৫৫
রাজসাহী জেলে তিনবৎসর—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ৬৩৩
লঙ্কায় বিভীষণ ও নোয়াখালীতে গান্ধী ক্যাম্প—
রঞ্জনকুমার দত্ত
শরৎ সাহিত্যের মণি দীপিকা—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫, ১৫৯, ২৩৬
শূন্য প্রান্তরের গান—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী ১৬২
শিশুদের স্বাধীনতা—শ্রীমতী হেমপ্রভা ঘোষ ১৭৫
শিল্পী—শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়
শশীভূষণ রায়চৌধুরী—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
শহীদ—শ্রীমন্মথ রায়
শহীদ বন্দনা—শ্রীপ্রভাকর মাঝি
শিক্ষার অর্থ—শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়
শিল্পী—রেণুকা বিশ্বাস
স্বপ্ন ছায়া—পিনাকী রঞ্জন কর্মকার
স্বরাজ্য আন্দোলনে বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
সাহিত্যের মূলতত্ত্ব—শ্রীসুনির্ম্মল
সংবাদ—পুষ্পরাণী ঘোষ
সন্ধ্যা প্রদীপ—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
স্মৃতির বন্ধন—লক্ষ্মী দেবী
সঙ্গীত বিভাগ—শ্রীধাতু ২০০, ২৭৬, ৪৩৪, ৬৪০
স্বপ্ন ও সাধনা—শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার ২৩৪
সবকো সন্মতি দে ভগবান—রঞ্জনকুমার দত্ত ২৯৮
সাহিত্যে সামাজিকতা—শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার ৩১১
স্বীকৃতি—শ্রীমতী বাণী রায় ৩৯০
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরসিক লাল দাস ৪৬৩
সাংখ্য দর্শন ও সৃষ্টিরহস্য—শ্রীসংযুক্তা কর ৪৬৭
সহীদ সুশীল সেন—শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন
সংগ্রাম ও শান্তি—শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী
সৈনিক—জগদীন্দ্র মণ্ডল
হেথাও ওঠে চাঁদ—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
হে মাহমিকা—শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু
হাজার ট্রাইকের ঢেউ—শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
হো-চি-মিন—শ্রীঅশোক চন্দ্র গুহ
হারানো তারা—মন্মথ রায়
হে মোর রুদ্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
হাট বসি থেমে যায়—সন্তোষ কুমার অধিকারী
হো-চি-মিন ও ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা যুদ্ধ—
শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত
ক্ষতি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আগামী মাস থেকে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ীর

—"সিন্ধুর ডাক"—

(উপন্যাস)

মন্দিরাতে

ধারাবাহিক ভাবে

প্রকাশিত হবে।

ভারতবর্ষ

ত্রয়োদশ বর্ষ বৈশাখ - ১৩৫৭ প্রথম সংখ্যা

756.3
.012/B

নব বর্ষ

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

হে নব বর্ষ ভারতকে বড় করো
সকল দুঃখ, সকল দৈন্য হর।
কর নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার শেষ,
উন্নততর জীবনের উন্মেষ,
দাও ফিরে দাও শান্তি অখণ্ড,
ধৈর্য্য ক্ষমা ও শক্তি প্রচণ্ড,
কর সুবৃহত্তর ও মহত্তর
হে নব বর্ষ ভারতকে বড় করো।

২

খসাও জীর্ণ দুষ্ট দষ্ট প্রাণ—
হোক চারিদিকে সবুজের অভিযান।
শত প্রতিভার শক্তি উদ্ভাবনী
মহা প্রাণ তায় করুক তাহারে ধনী।
কর সুন্দর শুচি নির্ম্মল চিৎ
অমৃতান্বেষী জীব কল্যাণ কৃৎ।
জগন্মোহন রূপ সম্মুখে ধরো
হে নব বর্ষ ভারতকে বড় করো।

বাংলার ব্যাঙ্ক

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

গত কয় বছর যাবৎ বাংলার ব্যাঙ্ক সমূহ একটার পর পর একটা দরজা বন্ধ করছিল। এমনি ক'রে প্রায় ১৪০ টা ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হয়েছে। পূর্ব বঙ্গ হ'তে আগত বহু লোক তাদের যৎ সামান্য পুঁজী ঐ সব ব্যাঙ্কে রেখেছিল; তাদের আশা ছিল ঐ সামান্য মূলধন দিয়ে ব্যাঙ্কের সাহায্যে তারা পশ্চিম বাংলায় নূতন ক'রে জীবন সুরু করবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সাহায্য ত দূরের কথা,—তাদের সামান্য পুঁজীও ঐসব ব্যাঙ্কের অতল গহ্বরে লোপ পেয়েছে। এই বিষয়ে বাংলা সরকারের বিশেষ ক'রে বাংলার অর্থ-সচীবের ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীনতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমরা জানি ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকাভুক্ত;—কিন্তু বাংলার অর্থ-সচীব যদি প্রদেশের স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতেন তবে হয়ত অনেক ব্যাঙ্ক রক্ষা পেত। যখন বাংলার ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা কমে যাচ্ছিল—তখন বাংলার সরকারের উচিত ছিল সেই আস্থা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা। প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকেই তা করা যেত।

বাংলার ব্যাঙ্কসমূহের সংক্রামক অপমৃত্যুর কারণ কি? বাংলার ব্যাঙ্কের সৃষ্টির মধ্যেই এর একটা কারণ নিহিত আছে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের মতো বাংলার ব্যাঙ্ক বড় মূল ধন নিয়ে কাজে নামে নি। ২।৪ হাজার টাকা মূল ধন নিয়ে সাধারণ লোন কম্পানী রূপে এদের সৃষ্টি। অনেক ব্যাঙ্কের মূল পত্তন হয় পূর্ব বাংলার মফস্বল শহরে বা গ্রামে। সে অবস্থা থেকে যে এরা এমনি ব্যাঙ্কের রূপ গ্রহণ করে এত বড় হ'তে পেরেছে, এটা উদ্যোক্তাদের বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু যত বড়ই হক গোড়ার গলদ থেকে এরা একেবারে মুক্ত হ'তে পারে নি। এদের লগ্নি ও লেনদেন অনেক সময়ই স্থাবর ধরণের অর্থাৎ হঠাৎ প্রয়োজনে নগদ টাকা বের ক'রে দেবার ক্ষমতা এদের অনেকেরই ছিল না। কিন্তু ঘোরে দুস্থে সরকারী সাহায্যে ও অনুকূলো সব দায়িত্ব মেটাবার মতো সম্পত্তি (assets) এদের অনেকেরই ছিল। সরকারী সাহায্য ও আনুকূল্য এরা পেল না। বরং ভারত সরকারের ব্যাঙ্কার—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank) এদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্করুণ আচরণই করেছে। এই প্রসঙ্গে পরে আরও বলব।

এর মধ্যে এসে পড়ল যুদ্ধ। যুদ্ধের বাজারে লোকের অর্থ-শুভবিলের যেমন স্ফীতি হ'ল—মস্তিষ্কেরও তেমনি স্ফীতি হল; সঙ্কুচিত হ'ল কেবল মানুষের ধর্মবুদ্ধির। জাতীয় চরিত্রের যে সর্ব-ব্যাপী অবনতি ঘটল, ব্যাঙ্কের উপরও তার প্রভাব পড়ল। আমানত-কারী, লগ্নিদার, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা—অনেকেই ব্যাপক অসততার পাকে পড়ল। কিন্তু যুদ্ধ চিরকাল চলতে পারে না; যুদ্ধ থামল,—যুদ্ধের কাচা পয়সায়ও পোকা ধরতে লাগল। ব্যবসায় বাণিজ্য হঠাৎ সঙ্কুচিত হ'ল। এর জন্য অনভিজ্ঞ হঠাৎ ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত ছিল না। বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সমূহের উপর প্রথম ধাক্কা এল এই ভাবে। দ্রব্যমূল্য ক'মে গেল, শেয়ারের দাম ক'মে গেল, মুদ্রা মূল্যের স্ফীতি হ'ল;—চোরা বাজারে একটা হঠাৎ ধাক্কা লাগল। সরকার থেকে উঁচু স্তরের নোট অচল ব'লে ঘোষণা করল। এখানে বলা দরকার চোরা কারবারীরা ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় তাদের কাজ কারবার চালাত। এই সব মিলে ব্যাঙ্কের উপর একটা হঠাৎ ধাক্কা পড়ল।

এর পর এল মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ কার্যক্রম" Direct Action। কলিকাতার ব্যবসায় বাণিজ্য পুরো এক বছর প্রায় স্তম্ভিত হ'য়ে রইল। শেয়ারের (share) বা বিভিন্ন কম্পানীর অংশের মূল্য অসম্ভব নেমে গেল। বহু লোক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ঐ সব শেয়ারের কেনা বেচা করত। তারা শেয়ার কেনবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিত, বেচবার পর ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ করত। কিন্তু শেয়ার বাজার মন্দা হওয়াতে ঐ সব লেন-

দেনীদের পক্ষে ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হল না। ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাও এই কাজ কিছু করত,—তাতেও তাদের বহু লোকসান হ'ল। এমনি করে বাংলার ব্যাঙ্কের উপর আর একটা বিরাট ধাক্কা পড়ল।

তারপর এল বাংলা বিভাগ। সমগ্র বাংলার ব্যবসার কেন্দ্র হ'ল কলিকাতা;—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবসার ক্ষেত্র হ'ল পূর্ব বাংলা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অখণ্ড বাংলা একটা গোটা উনত (unit) এবং অর্থ-নৈতিক দিক থেকে অখণ্ড বাংলা ছিল এক-কেন্দ্রিক (concentric); সে কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। বাংলা বিভাগের ফলে তাই কলিকাতার ব্যবসার খুব একটা ঘা খেল। বাংলার ব্যাঙ্ক সমূহ-ও এই আঘাত থেকে অব্যাহতি পেল না।

বাংলার প্রায় সব ব্যাঙ্কেরই প্রধান ব্যবসার ক্ষেত্র ছিল পূর্ব বাংলায়। বহু শাখা, বহু আমানত, বহু সম্পত্তি ও লগ্নী কারবার ঐ সব ব্যাঙ্কের পূর্ব বাংলায় ছিল। হঠাৎ পূর্ব বাংলার ব্যবসায় ও সম্পত্তির মূল্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তার প্রথম ধাক্কা পড়ল বাংলার ব্যাঙ্ক সমূহের উপর। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন যদি অবস্থার গুরুত্ব বুঝে অন্ততঃ কয়েকটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে এগুতো তাহলে বাংলার ব্যাঙ্কে এমন মড়ক দেখা দিত না। ব্যাঙ্ক অব কমার্স নামে একটি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদাসিন্য ও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করার অক্ষমতার ফলে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হল। এই ব্যাঙ্কের পূর্ব বাংলায় যে সম্পত্তি ছিল, যথেষ্ট আদায় করলে তার অনেকটাই আদায় যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারত। কিন্তু পূর্ব বাংলার সম্পত্তিকে প্রায় নাকচ ক'রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হঠাৎ এই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কটিকে (সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) তালিকা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করল। এর অনিবার্য্য ফল স্বরূপ এই ব্যাঙ্কটি তখনকার মতো লেনদেন বন্ধ করতে বাধ্য হলো।

বাংলার তরফ থেকে এই অভিযোগ যথেষ্ট যুক্তি-যুক্ততার সহিত করা চলে যে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ কার্য্যক্রম ও বঙ্গ বিভাগ ভারতের আধুনিক রাজনীতির ইতিহাসে দুইটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। এর কোনটার জন্যই বাংলার ব্যাঙ্ক বা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বাংলার ব্যবসায়ীরা দায়ী নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই দুই ঘটনার সৃষ্টি। অথচ তার জন্য দণ্ডভোগ করল বাংলার ব্যাঙ্ক, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাংলার ব্যবসায়ীগণ। ব্যাঙ্ক অব কমার্সের পরে আরও বহু ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করছে; তার জন্য-ও বঙ্গ বিভাগ-উৎপন্ন আর্থিক অবস্থা বহু পরিমাণে দায়ী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারত সরকারের তখন যে দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা তারা গ্রহণ করে নি।

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বরাবর ছিল চাকরী জীবি। সরকারী অফিসের কেরানী বা হাকিম, উকিল, ডাক্তার মোক্তার বা মাষ্টার—এই ছিল সাধারণ বাংগালী ভদ্র লোকের পেশা। জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের উপর ইংরেজ প্রভুরা রুষ্ট হলো; ঐ সব ভদ্রলোকী পেশা করবার মতো শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাংলা ও বাংলার বাহিরে প্রয়োজনের অতীত পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল; প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিচার ও হিসাব এসে বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকের ঐ সব বংশানুগ জীবিকার সুযোগ সংকুচিত করল; এমনি নানা কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায় বানিজ্যের দিকে যেতে বাধ্য হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদিকে গতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখনকার মুক্ত রাজ-নৈতিক বন্দীগণের নিকট সাধারণ ব্যবসায় বানিজ্য ভিন্ন জীবিকার অন্য কোন উপায় উন্মুক্ত ছিল না। প্রায় বিনামূলধনে সততা ও পরিশ্রম ও মানসিক শক্তির বলে এরা অনেকে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙ্গালীর এই আর্থিক প্রচেষ্টায় বাংলার ছোট খাট ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ঐ সব ব্যাঙ্কের সাহায্য না পেলে পুঁজিহীন মধ্য-বিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

যারা এতদিন বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তারা বাঙ্গালীর এই নূতন প্রচেষ্টা বিশেষ খুসীর সঙ্গে দেখেনি। অ-বাঙ্গালী যে সব ব্যাঙ্কের বাংলা দেশে শাখা ছিল তাদের কাছ থেকে এই নূতন বাঙ্গালী

ব্যবসায়ীরা প্রায় কোন আর্থিক সাহায্যই পায়নি। সেই হিসাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন অ-বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহ ও ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রতি কখনও তুষ্ট ছিল না।

গুজব যত কিছু রাষ্ট্র হয়, হয়ত তার সবটাই সত্য নয় কিন্তু সবটাই মিথ্যা এমন মনে করার কারণ-ও নাই এক বছর পূর্বে যখন বার বার কতকগুলি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করছিল, তখন অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে বাজারে অনেক কথা রাষ্ট্র ছিল ;—বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির প্রতি যাতে লোকের আস্থা শিথিল হয় তেমন সব গুজব প্রচারে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ বিশেষভাবে জড়িত বলে সাধারণের মধ্যে একটা কথা খুবই রাষ্ট্র ছিল।

বস্ত্র-খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রথার ফলে অনেক ধনেশ অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর আয়ের পথ সঙ্কুচিত হয় বেশ বছর কি দুবছর পূর্বে যখন সমবায় সমিতির (Co-operative Societies) প্রতিষ্ঠা ক'রে তাদের মারফৎ বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তখন বাংলার ব্যাঙ্কসমূহ ঐ সব সমবায় সমিতিকে অনেকটা সাহায্য করেছিল। অ-বাঙ্গালী ধনপতি ব্যবসায়ীদের নিকট বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সমূহের ইহা একটা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তারপর অতি দ্রুত কতগুলি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক হঠাৎ বন্ধ করে কার্য্য কারণ পরম্পরায় এই সম্বন্ধে একটা সন্দেহ সাধারণের মনে আসতে পারে। আজ নানা দিক থেকেই বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে একটা খুব সংকটময় অবস্থা উপস্থিত হয়েছে। বাংলা অতি ঘন-বস্তী দেশ ; তারউপর পূর্ব বাংলা থেকে আরও কয়েক লক্ষ হিন্দু এখানে আসিবেই। ব্যবসায় বাণিজ্য এবং বিশেষ করে কলকারখানা প্রভৃতি উদ্যোগে (industry) বাঙ্গালী যদি সুযোগ না পায় তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হবে। ব্যাঙ্কের সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালীর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। অবাঙ্গালী ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীকে এতদিন সাহায্য করে নি ; ভবিষ্যতে যে করবে তেমন আশা করা-ও কঠিন। তাই বাংলার ব্যাঙ্কগুলির পুর্ণগঠন বিশেষ প্রয়োজন। যে সব যৌথ কারবার আমাদের দেশে হয়, তার মূলধনের একটা মোটা অংশ মধ্যশ্রেণী জাতীয় ছোট ছোট আমানতকারীদের (investor) নিকট হতে আসত। পাঞ্জাবের এই শ্রেণীর আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হয়েছে পাঞ্জাব বিভাগ ও তারপরের দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে। বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীও প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এবং কতকটা ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়ের ফলে নিঃস্ব হয়েছে। কাজেই যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা আজ খুবই কঠিন। সেই অবস্থায় ব্যাঙ্কের সাহায্য ভিন্ন তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা কলকারখানা প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে, এমন সম্ভাবনাই নেই।

বাংলা দেশে প্রায় ১৪০টি ব্যাঙ্ক গত কয়েক বছরের মধ্যে ফেল পড়েছে। কম হলেও ২৫।৩০ কোটি টাকা এই সব ব্যাঙ্কে জমা ছিল। তার সবই নষ্ট হয়ে গেছে এমন কথা বলা চলে না। এই সব ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কিছুর অনেকের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে ; উপযুক্ত অনুসন্ধান করে তাদের দণ্ড দেওয়াই উচিত। সরকার সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি—এটা তাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি। কিন্তু সব ব্যাঙ্কের পরিচালকগণই অসৎ ছিল একথা হয়ত কেহ বলবে না। পূর্বে আমরা দেখিয়েছি নানা অবস্থার সমাবেশে বাংলার ব্যাঙ্ক বার বার ঘা খেয়েছে। বাংলার ব্যাঙ্ক জগতে এই বিপর্যয়ের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী—সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ;—তাই এর দায়িত্ব বহু পরিমাণে সর্ব-ভারতীয়।

সে যাহ'ক, ব্যাঙ্ক পরিচালকদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা সর্বস্বান্ত হবে, এটা কোন রকমেই যুক্তিযুক্ত নয়। যে সব ব্যাঙ্ক লেন দেন বন্ধ করেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সরকার একটু সচেষ্ট হলে এদের ছোট আমানত টাকার অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সহজেই আদায় হতে পারত। ব্যাঙ্কগুলিকে liquidationএ না দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত সরকারী সহায়তায় ব্যাঙ্কগুলিকে একত্র করে পুনরায় চালু করা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একসময় ব্যাঙ্কের মড়ক বাংলাদেশের চেয়ে আরও ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছিল। তখন সেখানে আমানত বীমাভাণ্ডার (Deposit Insurance Corporation) ও পুনর্গঠন

অর্থ সংসদ (Reconstruction Finance Corporation) স্থাপন করে সেখানকার ব্যাঙ্ক মহলে সুস্থ আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা হয়। অবিলম্বে বাংলা দেশের পক্ষে এধনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

যদিও আমরা জানি ব্যাঙ্ক-ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকাভুক্ত—তবুও আমরা মনে করি এই বিষয়ে বাংলা সরকারের করণীয় কর্তব্য অনেকখানি। বাংলা সরকার যদি প্রথম হতে বাঙ্গালী ব্যাংকের প্রতি বাঙ্গালী আমানতকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার এবং বাংলা ব্যাংক সমূহের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত, বাংলার বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে এই ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যদি ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের দাবী বলতে পারত, তাহলে বাংলার বহু ব্যাঙ্ক রক্ষা পেত। আজও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারত সরকারকে দিয়ে এ সম্বন্ধে কিছু করাতে হলে পশ্চিম বাংলা সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এগুতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারত সরকার আছে দূরে; তারা হয়ত কেবল ব্যাঙ্কিং আইনের বিধান প্রয়োগ করে তুষ্ট থাকতে পারে; কিন্তু বাংলার ও বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব পশ্চিম বাংলা সরকারের। বর্তমান ব্যাঙ্ক বিধান সে পক্ষে পর্যাপ্ত বা অনুকূল কিনা, তাহা দেখতে হবে এবং তা দেখাতে হবে পশ্চিম বাংলা সরকারকেই; তাই তাদের দায়িত্বও সর্বপ্রথম এবং প্রত্যক্ষ।

রাজসাহী জেলে তিন বৎসর

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

(২)

রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপার দেখাশুনো করতো সে যুগে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। তখন ছিল হীকেনসন—ফুনো সিভিলিয়ান। রসিকের আত্মহত্যার পর আমাদের এক টেলিগ্রাম গেল তাকে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। এক দিন বিকেলে তো এসে উপস্থিত। তাকে সেল দেখাতে ভিতরে ঢুকিয়ে কথার কথায় আটকে ফেলা হ'ল—যতক্ষণ আটাই ছিল—সঙ্গে গিরীন দা কথা বলতে বলতে ভিতরে ঢুকেছেন, আমরা বাদবাকীরা দরজা জুড়ে যেন কথাই বলছি। বেশী বেগ পেতে হ'ল না—জৈলের অপরাহ্ণ, তায় রাজসাহীর সেল, অন্য দিকে আছেন বিলাতী সাহেব, একটু ঢুলকায়, কলকাতার পাখার তলায় ব'সে কাজ করে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুহুতে মুছতে হাঁফাতে শুরু করলো। বলে, দেখুন, এসব সেল তো আপনাদের জন্যে তৈরী হয়নি, হয়েছিল পাকা অপরাধী-দের জন্যে।

এই কথাটি স্বীকার করার পর সেল থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। সেদিন আর বেশী কথা হ'ল না, ব'লে গেল, পরদিন সকালে আসবে। অফিসে ব'সে রসিকের মৃত্যু সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলারের যা' যা' বলবার ছিল শুনলো।

ওদের পণ ছিল, সেল ছাড়া আমাদের রাখবে না। আমরাও যে-কোনো উপায়ে হোক্, সেলে বন্ধ রাখার প্রথা রহিত করাব। আমাদের কথা, রসিকের আত্মহত্যা সম্ভব হ'ত না যদি আমরা রাত্রে এক সঙ্গে একটা ওয়ার্ডে বন্ধ থাকতাম।

পরদিন ভোর বেলা প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে অনেক তর্কবিতর্ক হ'ল। গিরীন দা বললেন, কেউ পালাবার চেষ্টাও করবে না—আমাদের উপর নির্ভর ক'রে যা'ন আমাদের পল্লার ধারে নিয়ে ছেড়ে যাও, আমরা আবার ফিরে আসব

হীকেনসন প্রবোধের দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস

করে, What has Probodh got to say to that ? প্রবোধ একবার দালান্দা হাউজ থেকে পালিয়ে পরে আবার ধরা প'ড়ে এসেছেন।

প্রবোধ মুখের মতো জবাব দিলেন, Did you then depend on my honour ?

হাচেনসন সব শুনে সব দেখে চ'লে গেল। দিন তিনেক বাদে টেলিগ্রাম এল। ব্যবস্থা হ'ল, দিনের বেলা আমাদের সেলেই কাটাতে হবে, রাত্রির বেলায় হাসপাতালের দোতলার ঘরে বন্ধ হব। ঘরখানা বেশ বড়, আর খোলা—পদ্মা অবধি দেখা যায়। আমরা তখন নয়জন ওখানে—সবাই x class, অর্থাৎ "অত্যন্ত বিপজ্জনক", একসঙ্গে পাঁচজনের বেশী থাকতে পাব না। ঘরখানার মাঝামাঝি দিয়ে চাটাইয়ের একটা মস্ত বড় বেড়া ক'রে দেওয়া হ'ল, তার একদিকে পাঁচজনের, অপর দিকে চারজনের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। রাত্রে খাবার ইত্যাদি দেবার জন্যে প্রত্যেক দিকে একজন ক'রে কয়েদি থাকার ব্যবস্থা হ'ল; অবশ্য, খাবারটা একদিকেই থাকতো, আমরা বেড়াটাকে ঠেলে একসঙ্গে ব'সেই খেয়ে নিতাম !

বলতে গেলে রসিকের মৃত্যুর ফলেই আমাদের সেল বাস ঘুচলো। এই কথাটা আমাদের পীড়া দিত। কথাটা যেদিন খোলাখুলি আমি বললাম, গিরীনদার চোখ দুটো ছলছল্ ক'রে উঠ্লো, তিনি স'রে গেলেন। অন্য সব জেলে কিন্তু ষ্টেট্‌প্রিজনাররা শেষ পর্য্যন্ত (১৯২০) সেলেই কাটিয়ে গেছেন।

সেলে যতদিন ছিলাম, মনে হ'ত, কি দুঃখেরই জীবন ! ওয়ার্ডে গিয়ে সবাই এক সঙ্গে থাকতে পারাটাই সব চেয়ে কাম্য। পরের জীবনে বুঝেছি, জেলখানায় এর চেয়ে মারাত্মক যন্ত্রণা আর কিছু নেই। একটা অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ সীমানার মধ্যে থেকে সারা দিন রাত একই মুখ দেখা, একই কথা শোনা, অন্য বৈচিত্র্য কিছু নেই, দায়িত্ব কিছু নেই, চিন্তাও না করলে চ'লে যায়—এ থেকে দাঁড়ায়, মানুষের মন কেবল পরস্পরের খুঁৎ ধরতেই লেগে যায়, পরস্পরের পার্থক্যের বোধটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সে-হিসাবে রাজসাহীতে এই যে ব্যবস্থা হ'ল, দিনের বেলায় যার যার নিজের সেলে কাটাব, রাত্রির বেলায় একসঙ্গে থাকব, জেলখানার পক্ষে এ প্রায় আদর্শ ব্যবস্থা।

ভেদবুদ্ধি তবু আমাদের জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুললো ! এ ভেদবুদ্ধির মূল ছিল কিন্তু আমাদের বাইরের জীবনে, এখানে কেবল তার ডালপালা ফুলে ফলে মেলা দিল। এখানে বাংলার বিপ্লবী দলের গোড়া পত্তনের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটু আভাস অবান্তর হবে না। বলতে গেলে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী দল গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা প্রায় কোনো সময়েই থামে নাই। এ চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারা যা ক'রেছেন, সে কথা বাদ দিলেও বঙ্কিম চন্দ্র, রমেশ চন্দ্র, নবীন চন্দ্র, যোগেন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও হাত লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথরা কয়েক ভাই বোনে মিলে তাঁদের বাড়ীতেই যে-গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারই প্রভাবে সুরেন ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনও এই প্রভাবে এসে পড়েন। তবে যাঁরা বেপরোয়া ও সক্রিয় ভাবে গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিপ্লবীদল গড়বার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন ব্যানার্জি (স্বামী নিরলম্ব), যতীন মুখার্জি ও ব্যারিষ্টার পি মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পর মিত্তির সাহেব তার প্রসারের চেষ্টা করতে করতে স্বদেশী আন্দোলন এসে পড়ে। সে জোয়ারে কারও আর চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না—বাংলার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে আপনা আপনি সব সমিতি গড়ে ওঠে। তার অনেকগুলি অনুশীলন সমিতির শাখা হয়ে যায়, অনেক গুলি স্বতন্ত্র সমিতি হিসাবে চলতে থাকে। এর ভিতর বরিশালের "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" ও ময়মনসিংএর "সুহৃদ" ও "ব্রতী" সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় মিত্তির সাহেব ঢাকায় অনুশীলন সমিতির এক শাখা গঠন করেন ও খ্যাতনামা পুলিন বিহারী দাসকে তার পরিচালক নিযুক্ত করেন। পুলিন বাবু এই কাজের ভার নিয়ে

সমিতির এক গঠনতন্ত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করেন এবং জেলায় জেলায় ঢাকা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গঠনতন্ত্রে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে অপর সমিতিদের সম্পর্কে নির্দেশ ছিল যে, ছলে বলে কৌশলে তাদের বিনাশের চেষ্টা করতে হবে। এই নির্দেশে যে মনোভাবের সৃষ্টি করতো তার ফলে, অপর সমিতিগুলি যেমন পরবর্তী যুগে অনেক সময় পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করেছে বা পরস্পরে মিলে গেছে, এই সমিতির সভ্যদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় নাই। বরং এই সমিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে অপর কোন কোন দলের লোকদের মধ্যেও অনেক সময় এক অশোভন ও অকারণ সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে।

এই দ্বন্দ্ব অল্প দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গে যেমন জেলায় জেলায় তীব্র হয়ে ওঠে অন্যত্র তা হয়নি। কলকাতায় বরং ঢাকা অনুশীলন সমিতির লোকরা এসে যখন একটা পৃথক সত্তা বজায় রেখে চলতেন, যতীন মুখার্জি, বাঘু গোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ এবং আরও কেউ কেউ তখনও চেষ্টা করেছেন একযোগে চলতে। এঁরা আশা করতেন, সাময়িক পার্থক্য মিটে যাবে—কারণ এঁদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। যতীন বাবুরা ধরা প'ড়ে যাবার পরে তাঁদের অবশিষ্ট লোকের সঙ্গে এবং আত্মোন্নতির সঙ্গে এঁদের একটা মোটামুটি সহযোগিতা বরাবরই বজায় ছিল এবং ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেরও অপরাপর দলের সঙ্গেও অবাধ সহযোগিতা ছিল। এর পর পার্থক্যের একটা রাজনৈতিক কারণ ঘটলো: যখন ভারতীয় বিপ্লবে জার্মাণীর সাহায্য পাবার সম্ভাবনা জানা গেল। সব দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হ'ল! সব দল একত্র হয়ে যতীন মুখার্জির নেতৃত্ব মেনে নিল। কিন্তু ঢাকা অনুশীলন দল এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে অস্বীকার করলো।

এর ফল দাঁড়ালো, ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত ধরা প'ড়ে যাঁরা জেলে গেলেন, তাঁদের ভিতর ঢাকা অনুশীলনের লোক যাঁরা নন তাঁরাই পরস্পরকে যুগান্তরের লোক ব'লে জানতেন। এবং জেলখানাতে এঁদের প্রীতির বন্ধন আরও বাড়লো। কলকাতা অঞ্চলের যাঁরা পূর্ববঙ্গের দলের দ্বন্দ্বের খবরও রাখতেন না, তাঁরা কিন্তু জেলখানাতেও মনে করতেন, বিপ্লবী যখন সবাই, তখন দলাদলিটা সাময়িক, ও-ভুলটা এক সময়ে মুছে যাবে, আমরা সবাই একই! আমাদের গিরীনদা ছিলেন এই দলের। তিনি ছিলেন "আত্মোন্নতি"র লোক। কিন্তু এইসব ছোট খাটো দলের ভেদবুদ্ধি তাঁর মনে স্থান পেত না। আর বাইরে, জার্মাণীর সাহায্যে বিপ্লব চেষ্টায় আমরা একনেতৃত্ব একযোগেই কাজ করেছি—এই জ্ঞানে আমরা পাঁচজন, গিরীনদা, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশ দাস ও আমি—যেন কতকটা এক পরিবারের লোকের মতোই চলতাম।

অন্যদের সঙ্গেও গোড়াতে আমাদের মোটামুটি হৃদ্যতাই ছিল। এঁরা চারজন ছিলেন ঢাকা অনুশীলনের বা সংক্ষেপে অনুশীলনের লোক—প্রফুল্ল গাঙ্গুলি, সতীশ পাকড়াশি, যোগেশ চাটার্জি এবং প্রবোধ দাসগুপ্ত। এঁদের ভিতর প্রফুল্ল বাবু রাজসাহীতে আসেন সকলের পরে।

সেলধাসটা উঠে যাওয়া পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিবাদের ভাব ছিল। সেটা ক্রমে কেটে গিয়ে মনের চাপটা যেন অনেকটা লঘু হয়ে গেল। পড়াশুনো যে করতে চায়, তার আছে, নইলে নেই—খেয়েদেয়ে, তাস পাশা খেলে, ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দিলেও কেউ কিছু বলবে না। এ অবস্থায় ঘুম বদ্‌লানো হিসাবে তাস পাশার পরিবর্তে পড়াশুনোও কেউ কেউ করে। তা'তে মনের উপর কোনো দায়িত্বের চাপ থাকে না অথচ মন একটা কিছু নিয়ে ছাড়া থাকতে পারে না। আমরা তখন বেছে নিলাম দুই দলে পরস্পরের কুস্তি কাটা।

অনুশীলনের সতীশ বাবু এবং প্রবোধ সবশেষে ধরা প'ড়ে জেলে এসেছেন। কাজেই ওঁরা চারজন যখন এক সেলে জমতেন, আমরা প্রথমটা মনে করতাম, ওঁরা বাইরের খবর বার্তা নিচ্ছেন। গুপ্তসমিতির সাধারণ নিয়মানুবর্তিতার কাজেই আমরা সেখানে যেতাম না। কিন্তু মাসের পর মাস এই খবর নেওয়ার ব্যাপার চলতে পারে না। কিছু

দিনের ভিতর দেখলাম, যোগেশ ওভাবে একঘরে আলাদা জায়গা থাকাটা বিশেষ পছন্দ করছেন না। জেল জীবনের প্রথম অবস্থা থেকেই উনি একটা নতুন জীবন গ'ড়ে তুলতে ব্যস্ত। 'হুমদো' গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতেন, বন্ধুদের সাহচর্যও অনেক সময় এড়িয়ে চলতেন। আমি অনেক সময় সেই কারণে এঁর সঙ্গে মিশতাম। সেই সূত্র ধ'রে উনি এখন প্রস্তাব করলেন, আমার সাথে পড়াশুনো করবেন। সময় ঠিক ক'রে নিয়ে ইংরেজি, ভূগোল আর ফরাসি পড়তে শুরু করলেন। অপর তিন জনের সবার থেকে আলাদা হ'য়ে একত্র আলাপসালাপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে একটা চাপা উষ্মা প্রকাশ করতেন। একটু ছাঁস ক'রে একদিন বললেন, তিনি যে পড়ার জন্যে আমার কাছে কাটাতে আরম্ভ করেছেন, তা-ও তাঁর বন্ধুরা পছন্দ করছেন না। এই ঘেয়াড়া সংকীর্ণতায় দেশেরও অনিষ্ট হবে, নিজেদেরও—এই ওঁর মত। আমি বলি, কিন্তু বন্ধুদের অমতে আমার সঙ্গে মেশাতে তো তোরও অনিষ্ট হবে। উনি বলেন, বয়ে গেছে, আমি মানুষের সাথে মিশব। আপনার অমত নেই তো?

আমি বলি, আমার কেন অমত থাকবে?

প্রবোধ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির—উদার, সরল, গোঁয়ার। ভিতরে বিষ পোষণ করবেন, বাইরে সেটা চেপে, ছেপে খেলে চলবেন, সে ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাছাড়া, জেলের আবেষ্টনে মনের সংকীর্ণতাও বাড়ে। সেদিকে সর্বদা খেয়াল না রাখতে পারলে ভাল কাজেরও কদর্থ হয়। এই কদর্থ কিন্তু কোনো সময়েই প্রবোধের নিজস্ব ছিল না। কথায় কথায় ভিতরের হলাহল প্রকাশ পেয়ে গেল। এমন কি, গিরীনদা—যিনি সবার জন্যে সমানভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে সর্বদা প্রস্তুত—তাঁর উপরেও মাঝে মাঝে মেজাজ দেখিয়ে বসতেন। এই মেজাজ বস্তুটি দুইজনেরই ছিল উগ্র।

ক্রমে ওদিককার প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যেও বিষ ছড়ালো। ফলে, ওঁরা যখন এক ঘরে ব'সে আমাদের কুষ্ঠি কাটতেন আমরাও তখন আর এক ঘরে ব'সে ঐ কাজই করতাম। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতাও বাড়তে লাগলো। বুঝলাম, শিক্ষায়, সংস্কারে চারিত্রিক ভিত্তির ব্যবধানও দাঁড়িয়েছে অনেকখানি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও বিপ্লবী কর্মীর চরিত্রের পরিচয়ের একটা দায়িত্ব আমাদের আছে—এই বোধ থেকে অনেক সময় অনেক রকম ব্যক্তিগত ক্ষতি সহ্য ক'রে আমরা আমাদের যৌথ মান বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করতাম—যেমন কর্তৃপক্ষের কাছে, তেমনি জেলের সিপাহি কয়েদিদের কাছেও।

আগে বলেছি, আমাদের নীতি ছিল, সরকারের কাছ থেকে আদায় করব যতো পারি, সঞ্চয় করব না কিছুই। এই নীতি মেনে এবং অনেক সময় বন্ধুদের নিষেধ না মেনে যোগেশ মাঝে মাঝে আমার খোলা বাক্সে গোপনে নতুন জামা কাপড় জমা দিয়ে চ'লে যেতেন—আমি বাক্স খুলেই টের পেতাম, এটি কার কাজ। এসব সংগ্রহের উল্লেখ পূর্বে করেছি। প্রবোধও গোপনে দু'একবার আমার কাছে জিনিষ পত্র রেখে গেছেন। কিন্তু ঐ দু'একবারই মাত্র। তাঁর উপর সতীশ বাবুর শাসন ছিল কড়া। টিটকারিটা চাপা রেখে জেলার পর্যন্ত একবার আমাদের গোপনে শুনিয়ে গেল, একজন তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় অনেক জিনিষ পত্র দিয়ে দিয়েছেন, এমন কি সাধারণের ব্যবহারের জিনিষ পর্যন্ত। এখবর আমরা আগেই শুনেছিলাম—যে কয়েদি সে জিনিষ অফিসে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছে।

কর্তৃপক্ষের কাছে যতোই আমরা চাপা দিতে চাই, ভিতরের অবস্থা তারা জেনে ফেলে। উপেন মুখার্জি মাঝে মাঝে কিছু বই কিনতো; প্রবাসী, Modern Review, Bengalee ইত্যাদি কাগজ নিত। কাগজগুলো আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, এবং বই পেতে হ'লে পুলিশের অনুমতি নিতে মাসের পর মাস কেটে যেত। উপেন মুখার্জি কিন্তু আমাদের খুসি রাখবার জন্যে গোপনে এগুলো দিত। ফরিদপুর জেল থেকে পূর্ণদার সঙ্গে তার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে 'তুমি' ব'লে কথা বলে, পূজোয় কাপড়ও দেয়। পূর্ণদাই প্রথম কাগজগুলো নিয়ে আসতেন, পরে আমি আনতাম। একদিন গুরুমাই পেছি। তখন

আমাদের দলাদলির চরম অবস্থা। শরৎ বাবুর "শ্রীকান্ত" বইখানা পূর্ণদার হাতে দিয়ে উপেন মুখার্জি বলে, পূর্ণ, তোমরাই বইটা পোড়ো, প্রফুল বাবুরা পান, আমি চাইনে। ওঁরা পড়েন না, বই নষ্ট করেন।

পূর্ণদা নীরবে বইখানি ফেরত দিয়ে চ'লে আসছিলেন, উপেন মুখার্জি জিজ্ঞেস করে, কি হ'ল? পূর্ণদা ধীরে ধীরে বললেন, আমরা সবাই রাজবন্দী, আমরা পড়ব, ওঁরা পড়বেন না, সে হয় না।

পর দিন উপেন মুখার্জি নিজেই বইখানা নিয়ে এসে পূর্ণদাকে বলে গেল, তোমরা সবাই পোড়ো।

সে পর্ব মিটে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অল্প দিনেই এই একটা অন্ধকার নোংরা এঁদো গলির প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়ালাম।

গিরীনদা পড়াশুনো করেছেন প্রচুর—ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস সন তারিখ সমেত প্রায় কণ্ঠস্থ। এখনও রাজনীতি, সমাজনীতি (Sociology) ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনো করছেন, তাই নিয়েই থাকেন। দলাদলি যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, সব ভুলে পড়াশুনোয় ডুবে থাকতে চান, পেরে ওঠেন না, মন বসে না, জোর জোর পায়ে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পনের পা'চারি ক'রে ফেরেন। সিগারেট ধরালেন। সিগারেট টানতে টানতে ঘোরেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ অকারণ ঝগড়া ক'রে বসেন, হয়তো মনিদা বা পূর্ণদা—যাঁদের বেশী ভাল বাসেন,—তাঁদেরই সঙ্গে। ক্রমে মেজাজ অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, আমরা তখন হাসি ঠাট্টায়, অন্য কথায় ভুলাতে চেষ্টা করি।

আমরাও পড়তে শুরু করলাম যে যতো সময় পারি। রাজসাহীতে সরকারী কলেজ, তার লাইব্রেরীও ভালো। সরকারের ব্যবস্থায় আমরা সেখান থেকে বই পাই। স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কুমুদিনী ব্যানার্জি তখন রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাতের উপায় নেই। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকেও তিনি আমাদের পড়াশুনোয় যে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যে তখনকার সেকালের আমরা সবাই তাঁর কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। এক একটা বিষয়ের আমরা নাম লিখে পাঠাতাম। সেই সব বিষয়ের ভাল ভাল বই বেছে এক একবারে কুড়ি পঁচিশখানা পাঠাতেন। প'ড়ে ফেরত দিলে আবার পাঠাতেন। বিশেষ বিশেষ বই এক এক খানা—যা ধীরে ধীরে পড়বার জিনিষ—তা সবার পড়বার জন্যে পাঁচবার সাতবার ক'রেও আসতো।

এই সময়ে আমাদের কেউ কেউ দিনে চৌদ্দ পনের ঘণ্টা পর্যন্ত পড়তে শুরু করলেন—বিশেষতঃ সুরেশ দাস। যে সব বই আসতো, তিনি কোনো বাছবিচার করতেন না, সবই পড়বেন। Six Systems of Hindu Philosophy বইটা তিনি আগাগোড়া টুকে ফেললেন। Washington Irving এর Life of George Washington টেনে অনুবাদ ক'রে গেলেন।

মনিদা খুব বেছে পড়তেন। কিন্তু যা' পড়তেন, তা খুব মনোযোগ দিয়ে, এবং নোট রেখে। পূর্ণদা অত্যন্ত ধীরে পড়তেন, সারা বছরে চ'ারখানার বেশী নয়। অন্যবিধ কাজও তিনি করতেন—গোপনে সংবাদ পত্রাদি সংগ্রহ করা, সারা জেলের কয়েদিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো বইতে কি আছে, তার সারমর্ম অপরের কাছেও জেনে নিতেন।

যোগেশ মোটামুটি সব বই-ই পড়তেন। অভিমানের বালাই ছিল না। কোন্ কোন্ বই পড়া উচিত, গিরীনদাকে বা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন। যা পড়তেন একাগ্র মনে পড়তেন। সতীশ বাবুও খুব পড়তে শুরু করলেন প্রথমটা ইংরেজি বুঝতে কষ্ট হ'ত কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ে Illustrated Weekly বা অন্য কোনো সাময়িক পত্রের প্রতিটি প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ ধ'রে পড়তে পড়তে এই বাধা অল্প দিনেই অতিক্রম করলেন। প্রবোধ আর সতীশ বাবু প্রায় এক সঙ্গেই পড়াশুনো করতেন। প্রফুল বাবু-ও পড়তেন, কিন্তু পড়ার চেয়ে দলের চিন্তাতেই আনন্দ বেশী পেতেন।

আমার জীবনে এই সময়ে একটা প্রচণ্ড ওলোটপালট চলছিল। তার প্রধান হেতু ছিল জীবনটাকে বুঝবার

চেষ্টার ভিতর। হাজার ট্রাইকের পর যেন একটা নব জীবন লাভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল যেন একটা revaluation of values. বাইরে কিন্তু এর বিশেষ প্রকাশ ছিল না।

গিরীনদা সাহিত্য প্রায় পড়তে চাইতেন না। আমি সাহিত্যই পড়তে চাইতাম বেশী। আলিপুর জেলে, বিশেষ ক'রে মেজদা (চন্দন নগরের বসন্ত ব্যানার্জি) ও শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ির সঙ্গে থেকে বুঝে এসেছি, কলেজে প'ড়ে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখিনি। জেলে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব (Sociology), দর্শন, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হবে, তখন সংকল্প করেছি। কলেজে পড়বার বেলায় ও পরে যেমন যার সঙ্গে আলিপুরে যখন ছিলাম, তখন থেকে ডারুইন-তত্ত্ব ভালো ক'রে বুঝবার একটা আগ্রহ ছিল। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান কোনো বিষয়ে চাইনি, দুনিয়াটাকে মোটামুটি চিন্‌তেই চেয়েছি এবং তার সাথে সম্পর্কে নিজেকেই জানতে চেয়েছি। জেল খানায় পড়তে গিয়ে দেখলাম, একটা বিষয়ের কিছু জানতে আর একটা বিষয়ের অন্ততঃ সমান্য জ্ঞান থাকা দরকার—Sociology পড়তে Anthropology কিছু না জান্‌লে চলে না, Anthropology পড়তে Biology এবং Biology পড়তে Physiology'র ছ আ ৎ ২ জানা দরকার। এমনি ক'রে দু'দিনের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের একটা পল্লবগ্রাহিতা জুটলো।

রাজনীতি পড়তে গিয়ে যেসব বই পড়লাম—বর্ণা, ব্লুন্‌ট্‌শ্‌লি, লেকক্, সিজুইক, ডাইসি, উড্রো উইলসন—এখনকার দিনে সে সব কেউ পড়েনা। ইতিহাস, অর্থনীতির বেলাতেও তাই। দর্শন ছিল নিজের বিষয়। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে কলেজে যেসব বইয়ের নাম শুনেছিলাম, তারই দু'একখানা পড়লাম। একদিকে ধর্মজীবনের দিকে ঝোঁক ছিল, আর একদিকে সোসিয়ালিজমের নাম যখে শুনছিলাম। তাই একদিকে পড়লাম Varieties of Religious Experience পর্যন্ত, আর একদিকে বহু চেষ্টা ক'রেও Socialism সম্পর্কে Sombardএর বই ছাড়া আর কোন বই পাওয়া গেল না। নিজের প্রাণের টানে পড়তাম লেনী, ব্রাউনিং, বায়রন প্রভৃতি। এসব ছাড়া, যোগেশ তো আমার সাথে পড়তেনই। পরে প্রবোধও ইংরেজী শিখতে চাইলেন এবং জিতেন চৌধুরি ব'লে আর একজন নতুন এলেন, তিনিও। বয়সও প্রায় একই, বিদ্যাও প্রায় সমান সমান। এঁদের অ্যাডিসন, মেকলে, হাজ্‌লিট্ ইত্যাদি পড়াতে গিয়ে নিজের বিদ্যের কুলোত না, কখনও গিরীনদার কাছে ধার করতাম, কখনও এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি নিয়ে বেশ খাটতে হ'ত; ওঁদের কার কতোটা লাভ হ'ল জানিনে, আমার নিজের কাজ হচ্ছিল।

একটা প্রভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল—সেটা এই সময়ে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। ১৯১৫ সালে যখন যতীনদার (যতীন্দ্র নাথ শেঠ A. B. Harv.) বাড়ীতে ছিলাম, তখন তাঁর এবং তাঁর বন্ধু (বর্তমানে যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজের) হীরালাল রায়ের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলাম, মনের কপাটটা এঁটে বন্ধ ক'রে রেখে পড়া শুনো করা বৃথা। বিদিমাজাতীয়দের কাছ থেকে যেসব সংস্কার চেপে বসে, সেগুলো একটু পরিষ্কার না ক'রে নিলে পড়া শুনো ক'রে পণ্ডিত হওয়া যায় হয়তো, কিন্তু মনের সংস্কৃতি এগোয় না। পণ্ডিত হবার উচ্চাশা ছিল না, আর বুক্‌নি ঝেড়ে বা বড়ো বড়ো বইয়ের নাম ব'লে প্রশংসা পাবার আগ্রহটাকে হাস্যকর মনে হ'ত। লাওয়েল আর ডড্ প'ড়ে আমাদের একজন যখন এক সরকারী কর্মচারীকে শুনিয়ে দিলেন আমরা বাইশটা দেশের শাসনতন্ত্রের খবর রাখি, হাসি চাপ্‌তে আমার সেখান থেকে পালাতে হ'ল। জীবনের উপর নানাদিক থেকে নানা প্রভাব যা এসেছে, তা'তে যা'-কিছু করি, যা'-কিছু পড়ি সবেরই ভিতর একান্ত মনের যে-আগ্রহটা ছিল, সেটা 'হওয়া'—'করা'-ও নয়, 'পাওয়া'ও নয়। পাওয়ার ভিতর যে-বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল, সেটা মানুষের ভালবাসা।

১৯১১ সাল থেকে মনের ভিতর একটা উচ্চাকাঙ্খা জমেছিল—রবীন্দ্রনাথ যা' কিছু লিখেছেন, তার সবই পড়ব। বিপ্লবী দলে আসার পর থেকে গীতা, উপনিষদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ—এবং আর যা' যা'

পড়েছি, তা'তে এই 'হওয়া'র দিকটাতেই মনটা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু দেখলাম, এদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখার যতো সাহায্য পেয়েছি, ততো আর কিছুতে নয়।

ধরা পড়বার আগে বিনয় সরকার, রাধাকমল ও অজিত চক্রবর্তীর লেখা পড়তে বহু বিদেশী সাহিত্যিকের নাম কণ্ঠস্থ হয়ে যায়—যেমন, টলষ্টয়, তুর্গেনিভ্, ডষ্টয়েভ্স্কি, হুইট্‌ম্যান্, ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক্, আনাটোল ফ্রান্স, বার্ণার্ড শ। এঁদের যতো বই পাই জেলে পড়ব—এ সংকল্পের সাধনায় রাজসাহীতে প্রচুর সুযোগ পেলাম। গীতা, উপনিষদ্, বিবেকানন্দ থেকে যে কথাটা জীবনের চরম ক'রে জেনেছিলাম, 'নিজেকে জান', টলষ্টয় আর ইবসেন যেন সেইটেকে একটা নতুন রূপ দিল। তুর্গেনিভের Fathers and Sons যেন চোখের সামনে মেলিয়ে দিল আমরা কত বড় ভাঙ্গাগড়ার সামনে। এই ভাঙ্গাগড়ার সাম্‌নে নতুন মানুষ হয়ে গ'ড়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। ইব্‌সেন আর বার্ণার্ড শ' চোখের ঠুলি ভেঙ্গে খান খান ক'রে দিল। গোর্কির নাম কুমুদিনী বাবুর অঙ্কেই প্রথম শুনলাম। "Three of Them" প'ড়ে মনে হ'ল, সমাজের সাম্‌নে কাঁচা মাল হিসাবে এসে পড়ে শিশু—আর সমাজের ছাঁচে প'ড়ে শিব বানর হয়ে গ'ড়ে ওঠে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজসাহী জেলের ছোট্ট মাঠখানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পায়চারী করতাম, অথবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে উঠে পল্লার দিকে চেয়ে ব'সে থাকতাম, আর ভাবতাম—কি চাই, কি করব, কি হব। এতদিন যা' কিছু ভেবেছি, যা' কিছু পড়েছি, হয়েছি, মানুষের দুনিয়ার সঙ্গে তার যেন সম্পর্ক ছিল কম—আমার অতীত আর কোনো দুনিয়ার, ভবিষ্যৎ আর কোনো দুনিয়ার,—আমি এখানে যেন বিদেশে প্রবাসে। আজ যেন সে ভুল ভাঙ্গতে রইলো। শ্রীঅরবিন্দের 'আর্য' পড়ছি তখন—এতকাল যে অর্থে তা দেখা দেয় নি, আজ যেন সেই অর্থে ধরা দিল। এতদিনে যেন বুঝলাম—

আমি চালিব করুণা ধারা।
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

এ মন্ত্রের অর্থ কি। সমস্ত দুনিয়াটা যেন একটা নতুন অর্থে পেলাম, নতুন ক'রে সজীব হয়ে উঠ্‌লো।

হাতে-লেখা একখানা কাগজ চালাতে শুরু করা হয়েছিল—নাম ছিল "ভাঙা কুলা"—তার ভিতর বাংলা, ইংরেজি দুই রকম লেখাই বের হ'ত। মণিদা সেটার সম্পাদক। প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম তা'তে 'মানি না'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলাম "Not Peace but a Sword." কার্লাইল পড়ছিলাম। কার্লাইলের ভাষার তোড় এসে পড়লো তা'তে। 'মানি না'—বলতে একথা বলিনি তখন যে, ভগবানের অস্তিত্ব মানিনে, এই কথাই বললাম, তুমি যদি বিশ্বসৃষ্টির বাইরে কিছু হও, মানুষের সুখ দুঃখের জগতের অতীত কিছু হও, তা হ'লে তোমায় মানিনে; মানুষের সুখ দুঃখ, স্নেহ ভালবাসা, দ্বন্দ্ব কলহ সব জড়িয়ে যদি তুমি হও, তা হ'লে তুমি আমার, আমি তোমার।

আমাদের পড়াশুনোর আর একটা দিক ছিল সেদিন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। আজ যা একান্ত সহজ, সাধারণ, সে দিন তা ছিল না। জাতিভেদ মানি না, স্ত্রী স্বাধীনতা চাই—এসব কথা আজ আর বাংলার শিক্ষিত সমাজে এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু সে দিন—এমন কি যাঁরা বিপ্লবী হিসেবে জেলে গেছেন, তাঁরাও এসব কথায় আঁৎকে উঠ্‌তেন। এক দিকে এই। আর এক দিকে ইব্‌সেনের Doll's House, তুর্গেনিভের Fathers and Sons, মেটারলিঙ্কের Mona Vanna, ঘরে বাইরের নিখিলেশের চরিত্র। আমাদের জীবনে এবং পরস্পরের মধ্যে শুরু হ'ল তুমুল দ্বন্দ্ব।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় অভিযান আমার জীবনে শুরু হয়েছিল চার বছর আগে দৌলতপুর কলেজে। আমার উৎসাহদাতা ছিলেন প্রথমটা ডাঃ যুগল আঢ্য, পরে ডাঃ অমূল্য উকিল। শশীদার অধ্যাপক মণি শেঠের ও অধ্যাপক শরৎ ঘোষেরও সমর্থন পেতাম গোঁড়ামির সেই সুরক্ষিত দুর্গে। সহপাঠী কবি মুখার্জির পাওয়া নষ্ট করতাম রোজই স্নানের পর রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে

কোঁচার খুঁট গায়ে দেবার অছিলায়। তাঁর গুরুভাই প্রিন্সিপালের বকুনি খেলাম, কিন্তু ফলিকেও মেস ছাড়তে হ'ল। ঘোটের উপর, আমরা জেলে যাবার আগেই হৌলংপুর কলেজে গোড়ামির ভিৎ ন'ড়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

জেলে গিয়ে দেখলাম, গিরীনদার জাতিভেদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ পাচক ছাড়া অন্য কেউ রাঁধতে পারতো না। জেলের আইন কানুনও গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত জাতিভেদের মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। বন্ধুদের সমাজেও গিরীনদা স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন। আমাদের ভাল বাসতেন না, তা তো সত্য নয়, কিন্তু ছোঁয়া ছুঁয়ি না করার গভীর তাৎপর্য আছে, তিনি বিশ্বাস করতেন। গিরীনদা সহজেই ক্ষেপে যেতেন, এবং আমরাও এ নিয়ে তাঁকে একটু আধটু উপহাস করতাম। আমি রাজসাহী জেলে যাবার অল্প দিন পরে কিন্তু হঠাৎ একদিন গিরীনদা ব'লে বসলেন, ভূপেনকে সাথে নিয়ে খেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই! ও-তো ব্রাহ্মণ! এই ব'লে সত্যি সত্যি তিনি আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে সাথে খেতে বসালেন। খেতে খেতে কিন্তু বললেন, এই প্রথম তিনি জীবনে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতের স্পর্শে খাচ্ছেন!

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থামলো না। পূর্ণদা মাংসের ভক্ত—বিশেষতঃ মুরগীর। আমাদের সেলগুলোর পেছনে ছিল একটা পাওরুটির কারখানা। আমাদের রান্নাঘরে তো মুরগী ঢুকবার তখন উপায় নেই। পূর্ণদা মুরগী আনালেন এবং ঐ পাওরুটির কারখানার মুসলমান পাচক তা রান্না করলো। আমরা খেলাম। গিরীনদা ছ্যাঁ ছ্যাঁ করলেন। মণিদার ও সুরেশ বাবুর মুরগী খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু অহিন্দু পাচকের রান্নায় আপত্তি। মণিদার ভাব কতকটা গোরার মতো—আমার দেশের জনসাধারণের ভক্তিকে আমি ভক্তি করি।

কিন্তু খাওয়া দাওয়া ছাড়া চিন্তার জগৎটা উন্মুক্ত—বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। আমার মোটামুটি মত: গভীর বাঁধন বেঁধে বিকৃতি আমরা কিছু করতে পারিনি, হয়তো বাড়িয়েছি। অবাধ মিলনে বরং সে-বিকৃতির হাত থেকে আমরা সহজে রেহাই পাব। সব রকম স্বাধীনতারই যেমন গোড়াতে একটু বাড়াবাড়ি দেখা দেয়—এদিকেও তা হ'তে পারে। কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল স্বাধীনতার মধ্যে। গিরীনদা প্রভৃতি কয়েকজন এই মতের ঘোর বিরুদ্ধে। তাঁরা সনাতন পন্থী।

ধরা পড়বার আগে ও পরে আমেরিকা প্রত্যাগত বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে হরদয়াল ও বাসুদেব ভট্টাচার্য অ্যানার্কিষ্ট হয়ে যান এবং "Free Love" এর সমর্থক। এই গল্প এক দিন বলাতে গিরীনদা আমাকেও "Free Love" এর সমর্থক ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলেন।

এক একখানা বই বা পড়ি, তা নিয়ে প্রতীব্র আলোচনা হয়। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতির বই নিয়েও আলোচনা হয়—বুঝবার জন্য। কাজেই সেখানে ভাষা ও কণ্ঠ একটা সীমা মেনে চলে। মতামতের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন আর ও সব সীমার বালাই থাকে না। এটা প্রায়ই উঠে সাহিত্যের পর্যায়ের বই নিয়ে। যে সব বই নিয়ে আমাদের সব চেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে, তার ভিতর এখন এই কয়খানার নাম বেশী ক'রে মনে পড়ছে: রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "ঘরে বাইরে", সরযুবালা দাশ-গুপ্তার "দেবোত্তর বিষনাট্য", গোর্কির "Three of Them", ইবসেনের "Doll's House" বার্ণার্ড শ'র "Mrs Warren's Profession", তুর্গেনিভের "Fathers and Sons", মেটারলিঙ্কের "Blue Bird"; "Mona Vanna", ও পদ্মিনীর আদর্শের বৈপরীত্য নিয়েও তর্ক হয়। আমার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে Ibsen-এর "Brand". বই খানার একটা গদ্য অনুবাদ পেয়েছিলাম। পদ্য অনুবাদ পরে পড়েছি, তত ভাল লাগেনি।

আলোচনার ভিতর আমার একটা মতলব থাকতো—নিজের মতামতটা নিজের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলা। একটা সুবিধা ছিল। সন্ধ্যাবেলা খেতে ব'সে গিরীনদাকে একটা খোঁচা দিতাম। আর শুরু হয়ে যেত আলোচনা।

এক একদিন সমস্ত রাত্রির ধ'রে আলোচনা চলতো। রাত দেড়টা দুটো আন্দাজ যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়তো, তখন কমিটি মিটিংএর মতো এখানে দুজন ওখানে তিন জন করে ব'সে যেতেন। পরদিন সকালেও তর্ক চলতো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় হ'লে সব আবার পৃথক হয়ে যেতেন: তারপর স্নানের সময় চীৎকার ক'রে ক'রে; খাওয়াদাওয়ার সময়-ও বাদ যেত না। তর্ক থামতো খাওয়া দাওয়ার পর যখন এক দল তাস বা পাশা নিয়ে বসতেন। কোনো কোনো দিন রাত্রির বেলায় নয়জনে মিলে তর্কের ঝোঁকে এমন কাণ্ডও ক'রে বসতাম যে, জেল খানার সমস্ত সিপাই জমাদার নীচে এসে জমে যেত—ভাবতো বুঝি বাবুরা কপড়া মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে।

এই তর্কের উগ্রতার ভিতর কিন্তু বাইরের রাজনীতির দলের বিবাদ একটু চাপা প'ড়ে রইলো। দলাদলির একটি দিক আছে। ওর সংকীর্ণতার একবার পেয়ে বসলে নিজেদের ভিতরও তার প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক সময় বাঁচা যায় না। অল্প দিনের ভিতরই দেখা গেল ওঁদের চারজনের ভিতর প্রফুল্লবাবু আর যোগেশ একদিকে, সতীশ বাবু আর প্রবোধ অপর দিকে। প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ।

এখন মতামতের গণ্ডীর বৃত্ত আর দলের গণ্ডীর বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ ক'রে গেল! মতামতের বিবাদের মধ্যে গিরীনদা আর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের নেতা। আমার কথা: প্রাচীনকাল থেকে মেনে এসেছি ব'লেই কোনো জিনিষকে মেনে যেতে হবে—এর কোনো মানে নেই। এতে মানুষ এবং সমাজ দুই-ই পঙ্গু হয়। প্রতিটি জিনিষকেই যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে মনকে অভ্যস্ত করতে হবে, এবং যুগের পক্ষে উপযোগী হ'লেই তাকে গ্রহণ করা চলবে, নইলে তাকে সবলে বর্জন করতে হবে। গিরীনদার কথা: যে-যুগ থেকে কোনো জিনিষ মেনে আসা হয়েছে, সে-যুগেও ভবিষ্যদর্শী বিচক্ষণ লোক ছিলেন। এবং তাঁদের বিচার-বুদ্ধির সারবত্তার ফলে শত আঘাতেও আমাদের সমাজ বেঁচে রয়েছে। কাজেই এখন সেসব হঠাৎ বর্জন করার ফলে সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, তা'তে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যাহত হবে। আমি বলি, পঙ্গু মানুষ দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলে না। গিরীনদা বলেন, আগে দেশকে স্বাধীন ক'রে তার পর সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দিলেই চলবে।

ব্যক্তিগতভাবে গিরীনদার আমার প্রতি স্নেহ গভীর। আমি সেটা বুঝি এবং তাঁকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা ক'রে চলি—যদিও তর্কের ভাষা আমাদের কারুরই উগ্রতায় কম যায় না। সুরেশ বাবু স্বল্পতর যুক্তিতে, উগ্রতর ভাষায় এবং উচ্চতম কণ্ঠে গিরীনদার সমর্থক। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ। মণিদার আমার প্রতি মমতা যতো গভীর, আমার মতামতে ততো বেশী আঘাত পান, আর ততো নীরবে গভীরভাবে চিন্তা করেন। পূর্ণদা বিচারক। তিনি দুই পক্ষের কথা শুনে শেষ রায় দেন। মণিদার অন্তর্দেশে তাঁকে পূর্ণদার কাছাকাছি এনে ফেলে—যদিও রায়ের বেলায় পূর্ণদার রায় আসে প্রায়ই কতকটা আমার দিকে, আর মণিদার যায় গিরীনদার দিকে। আমি বুঝি, অন্তরের গভীরে মণিদা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। খালাসের কয়েক বৎসর পরে—বোধ হয় ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর—রাত্রে মণিদা আমায় তাঁর ওখানে নিয়ে গেলেন। বললেন, জেলখানায় তোমার কথাগুলো আমার shocking লাগতো, কিন্তু ওতে পরে আমায় চিন্তায় সাহায্য করেছে।

অপর দিকে, তর্কের ভিতর যোগেশ প্রত্যেকটি সমস্যা বুঝতে চাইতেন, তিনি ছিলেন আমার নীরব, কিন্তু গভীর সমর্থক। প্রফুল্ল বাবু ছিলেন সরব, কিন্তু কৌশলী সমর্থক। ষোলশেভিক বিপ্লব তখন চলছে, সতীশবাবু তার খুঁটিনাটি সংবাদ পড়তেন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। সে-হিসাবে তাঁর সমর্থন আমি আশা করতাম, কিন্তু সমর্থন করা বোধ হয় সব সময় সুবিধার মনে করতেন না। প্রবোধের নিজস্ব সমর্থন যে আমার দিকে, তা আমি বুঝতাম, কিন্তু মতামত গঠন এবং প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপর পার্টি ডিসিপ্লিন যেন প্রবল হয়ে চাপতো। বেচারীর অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হ'ত।

নিয়তিঃ কেন বাধাতে—শেষ পর্যন্ত বেচারিকে একেবারে একা প'ড়ে যেতে হয়। সেই অবস্থায় দলের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন না ক'রে আমি যতোটা পারি মিলতাম

ইতি মধ্যে ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাস এসে পড়লো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের Armistice হয়ে গেল। খালাসের উদ্যোগপর্বে বাজসাহী থেকে কেউ কেউ স্থানান্তরিত হ'তে লাগলেন—এঁদের ভিতর গিরীনদা, প্রফুল্ল বাবু, পূর্ণদা, মণিদা, সুরেশবাস একে একে চ'লে গেলেন। আবার নতুন আসতে লাগলেন বসন্ত বাবু (মেজদা), হেমেনদা, ভূপতি মজুমদার, জিতেন চৌধুরী (নোয়াখালী—লাম্বচর)। এঁদের কারও কারও সঙ্গে পুরোনোরা কেউ কেউ কয়েক মাস ক'রে রয়েও গেলেন। এঁদের মধ্যে মেজদা ছিলেন মধ্যপন্থী। আর, হেমেন দা যেমন ছিলেন যুক্তিপন্থীদের মধ্যে উগ্রতম, ভূপতি দা তেম্‌নি ছিলেন প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ডতম। কাঠে কাঠে ঘষার মাঝে মাঝে আগুন ধ'রে যেত।

কিন্তু হেমেনদা এসেছিলেন দার্জিলিং জেল থেকে হাঁপানিতে ভীষণ কষ্ট পেয়ে। সে-কষ্ট তাঁর এখানেও গেল না। এক এক রাত্রে দু'বার তিনবার ক'রে অড্রেনেলিন আর মর্ফিয়া ইনজেকশন নিতে হ'ত। তা স্বত্বেও ব'সে রাত কাটাতে হ'ত। ১৯১৭ সালে আলিপুরে জেলে সেই যে বিরাট পুরুষকে দেখেছি—এ যেন তাঁর ধ্বংসাবশেষ। ব্যাধি ছাড়া অন্য নির্যাতনও সয়েছেন। পুরোনো সেই আনন্দ এখনও এক একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে যায়। রাত্রে শ্বাস কষ্টে এক একবার এমন অবস্থা হয়, মনে হয়, এখনই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কাছে এসে দাঁড়াই। কিছু করবার নেই, শুধু দাঁড়িয়েই থাকি। উনি হাত দিয়ে ঠেলে দেন। আমি একটু ঘুরে আবার এসে দাঁড়াই। উনি ইঙ্গিতে বলেন, ঘুমোন গিয়ে। আমি ধীরে ধীরে বলি, ঘুমোতে যে পারিনে। উনি একটু ম্লান হাসি হাসেন।

বৈশাখী-সন্ধ্যা

শ্রীমীরা মুখোপাধ্যায়

মাতলো রে আজ বাউল বাতাস
এই বোশেখের সন্ধ্যা বেলা
গগন ঘিরে উঠ্‌লো রে চাঁদ
পাপ্‌ড়ী খ'সে পড়লো বেলা।
দিনের শেষে শান্ত হয়ে
সূর্যমুখী পড়লো ঢলি'
দোলন চাঁপার ঝুলন দোলায়
দুল্‌লো লাজুক রুক্ষ কলি।

আজ বোশেখের সন্ধ্যা বেলা
ঝুম্‌কো লতা করতে সুরু
ঝরার নেশায় মাত্‌লো বকুল
ঝরলো রে যুঁই ঝুরু ঝুরু।
ঝরার নেশায় দোলন দোলায়
উগর বেলা করছে খেলা
মাতালো রে আজ বাউল বাতাস
এই বোশেখের সন্ধ্যা বেলা !!

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও শিক্ষা

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। গৌড়বঙ্গে প্রাচীনকাল হইতেই ভাগবত সম্প্রদায় নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্ম্মমত প্রচলিত। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত অধিক দিনের নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকাল ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুন পূর্ণিমাতে। বাংলাদেশে সে সময়ে সুলতান জলাল্ উদ্দীন্ ফতেশাহ রাজত্ব করতেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। নবদ্বীপের গঙ্গাতীর তখন বহু নর নারীর দ্বারা 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল স্নাননিরত পুণ্যার্থী নরনারীগণের শঙ্খধ্বনি, সঙ্গীত ও হরিবোল হরিবোল রবে চারিদিকে যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, সে সময়ে চৈতন্যদেব ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব মাতা শচী দেবীর দশম গর্ভজাত সন্তান, তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে জগন্নাথ মিশ্রের আটটি সন্তান শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নবম গর্ভের সন্তান বিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। শচী দেবীর সন্তান বাঁচিত না বলিয়া পুরমহিলাগণ তাঁহাকে ডাকিতেন নিমাই, এবং তপ্ত কাঞ্চননিভ গৌরবর্ণের জন্য প্রতিবেশীরা বলিতেন গৌরাঙ্গ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী লইয়া বহু কবি, সাহিত্যিক ও ভক্তগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্বজন পরিচিত, এজন্য জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন :

"মকর পঞ্চমী তিথি এই মাঘ মাস
ইতি মধ্যে মহাপ্রভু করিলা সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বৎসর। ১৪৩১ শকাব্দে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে, বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং কাটোয়া নিবাসী কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কেশবভারতী দীক্ষার পর তাঁহার নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। চৈতন্যদেব শৈশবে দুরন্ত, যৌবনে অসাধারণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত অনুসারে জানিতে পারা যায়। তখন নবদ্বীপে সরস পণ্ডিত অধ্যাপকগণের বাসস্থান ছিল। নানা দেশ দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। নবদ্বীপের গঙ্গাতীরের ঘাটে ঘাটে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ নরনারী স্নান করিতেন। সাধারণ লোকে মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও মনসার পূজা করিতে ছিল পরম উৎসাহী। পুত্র-কন্যার বিবাহে তাহারা বহু অর্থ ব্যয় করিতেন এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি ছিলেন—শ্রদ্ধাহীন। সাধারণ লোকে মদ্য মাংস উপচার দিয়া যথা পূজা বা বাসলী পূজা করিত। পতির মৃত্যুতে নবদ্বীপ কামিনী মহিলারা সতী হইতেন—সহমরণ প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। দেশের সাধারণ সামাজিক অবস্থা ছিল অতিশয় শোচনীয়।

নবদ্বীপে যে সময়ে জগাই মাধাই নামক দুই ভাইয়ের অত্যাচারে নবদ্বীপ বাসিগণ নিত্য নিপীড়িত হইতেন। ইহাদের নিন্দনীয় আচরণ সম্বন্ধে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :

"অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই।
স্নান সন্ধ্যাবিবর্জিত জগাই মাধাই॥
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ কত শত।
বলে ছলে গুরু পত্নী হরে শত শত॥
গোমাংস শূকর মাংস করে সুরাপান।
ধর্ম্ম কথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নান॥
শিশু সব আছাড়িঞা মারে শিলাঘাটে
কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে॥
গলে যজ্ঞ সূত্র বান্ধা যেন সিংহনাদ।
উন্মত্ত অধির প্রায় মহা পরমাদ॥
উদরান্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে।
ঘূর্ণিত লোচন চারু পূর্ণ শক্রাননে॥

বন্ধুগণ সঙ্গে থাকি করে অন্ন ভোগ।
বুকে বাঁশ দিক্সা কারো সর্ব্বস্ব নেই॥"

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে নবদ্বীপ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্র এইরূপ ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই দুঃসময়ে শ্রীচৈতন্যদেব নির্ভীক বীরের মত নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা দেশ জাতি ও সমাজকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—অসাধারণ সাহসিকতা ও নির্ভীকতা সহকারে—দেখিলেন অত্যাচারিত, উৎপীড়িত সমাজকে বাঁচাইতে হইলে চাই তাহাদের মধ্যে নবধর্ম্ম প্রচারের মহবাণী প্রেম ও ভালবাসা ও ঐক্য মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নব নব ধর্মের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। কবীর, নানক, বল্লভাচার্য, রামানন্দ, প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণের প্রভাবে প্রত্যেক প্রদেশেই মানবতার মহৎ ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেমন সার্ব্বজনীন এক মহামিলন ও ভালবাসার ধর্ম্ম সমাজে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের ও বাংলার অত্যাচারিত ও নিপীড়িত নরনারীর সম্মুখে আনিলেন নব প্রেমের ধর্ম, অজ্ঞাত, উপেক্ষিত নরনারী ও উৎপীড়িত জনগণের কাছে আনিলেন সার্ব্বজনীন প্রেমের ধর্ম্ম। কর্ম্মজাত প্লাবিত বাংলাদেশে চৈতন্যদেব আনিলেন মধুময় প্রেমভক্তি তরঙ্গ। সব প্রদেশে আসিল এক ভক্তির জোয়ার। প্রেমের সে প্লাবনে শান্তিপুর ডুবিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া চলিল।

বাঙ্গালাদেশের যে দুঃসময়ের কথা বলিলাম, সে সময়ে চৈতন্যদেব আসিলেন মানবের প্রেমমন্ত্র লইয়া মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমকে দৃঢ়রূপে জাতি, কুল, ক্রিয়া ও বিদ্বেষ ভুলিয়া একই ভাবে দীক্ষিত করিবার জন্য। স্বর্গত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় নামক গ্রন্থে এম্, সিলভিয়ান লেভির (M. Sylvian) কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন: "Around the apostle who preached the cult of kritana—the new ideal of a religion of love free to all—sprang up a rich growth of hymns, recitations and poems." কীর্ত্তনের মধুর সুর-তরঙ্গ নবদ্বীপ নগরের পথে পথে ধ্বনিত হইত, দলে দলে ভক্তগণ নাম কীর্ত্তন করিত। এই মধুর কীর্ত্তনের প্রভাবেই জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠেরাও অবশেষে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনের তরঙ্গ তুলিয়া লোকের প্রাণে প্রাণে ভক্তির পবিত্র ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে অবশেষে আসিলেন গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রাম। নৃপতি হোসেন শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে:

"ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ক্রিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ক্রিহার মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
* * *
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভু পাঠাইল কহিয়া!
ধরণী খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
জোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥

তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর চিত্তে হেন লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তর।
দবীর পাস আইলা তবে আপনার ঘর॥

—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড; ১ম পরিচ্ছেদ:

তাহার পর কি হইল? মহাপ্রাণ হোসেন্ শাহ বৈষ্ণব ধর্মকে বলিয়াছিলেন:

"সর্ব্ব লোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন॥
কাজীরা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥

[বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২৩—৪২৪]

নৃপতি হোসেন শাহের এই উদার মত সেকালে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নবধর্ম প্রচারের সহায়ক হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব কি? ধর্মের শিক্ষা কি ছিল তাহা অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি, কত বড় অহিংস ধর্ম প্রচারক ছিলেন তিনি,—তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক সমস্যার পথ নূতন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সহিত গৌড় ও বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, হিন্দু রাজ শক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা বৌদ্ধদের অনুকূলে ছিল না। বৌদ্ধ সমাজের সেই শোচনীয় ধ্বংসকালে গৌড়ে ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিচালিত কঠোর সামাজিক নিপীড়নে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ হিন্দু সমাজের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই, কেন না তৎকালে অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের ও বৌদ্ধ সমাজের ধ্বংসাবশেষ যুগে শৈব ও শাক্ত দুইটি প্রবল ধর্মের উদ্ভব হয় এবং এই উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যেও বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর যে সমন্বয় হইয়াছিল তাহার ফলে শিব ও শক্তি পূজা হিন্দু সমাজে এক সঙ্গেই প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে নিরুপায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী, যোগিনী ও ডাকিনীরা শৈবধর্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে—তাহারা বাহিরে শৈবধর্মানুরক্ত হইলেও গোপনে বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিত এবং নানারূপ লাঞ্ছনা ভুগিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত নব প্রচলিত ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্ব্বে সমাজ ভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বাঙ্গলা দেশে নেড়া নেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণকে নবীন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

[বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৫-১৬ পৃষ্ঠা।]

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে এক নব যুগের উদ্ভব হইয়াছিল, যেমন ধর্ম সম্বন্ধে তেমনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সামাজিক মিলন ও বিবিধ সংস্কৃতির পথও নানাভাবে নানারূপে বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

চৈতন্যদেবের পরিষদ বর্গের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতির অবদান—অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত প্রকাশ, অদ্বৈত মঙ্গল, মুরারি গুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গল, কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্যচরিতামৃত, লোচন দাস রচিত চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ কি ইতিহাসের দিক দিয়া, কি সমাজ তত্ত্বের দিক্ দিয়া সর্ব্ববিষয়েই এই অমূল্য গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইলে এ সুন্দর গ্রন্থগুলিকে রত্ন ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপর দিকে ইহাও লক্ষ করিবার বিষয় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব হইতেই গৌড়দেশে চণ্ডীদাসের পদাবলী সমূহ প্রচারিত হয়। মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীত-গোবিন্দ' রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের

নবগীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সমুদ্র বিশেষ, সে সকল সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতেও বহু সময়ের প্রয়োজন এদিকে প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিরই অনুসন্ধান আবশ্যক এখানে আর একটি বিষয়ও প্রণিধান-

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে নিম্নস্তরের হিন্দু সমাজে ব্যক্তিগত সাধন ভজনের বিশেষ কোনও পথ ছিল, এমনও বোধ হয় না তান্ত্রিক দীক্ষা সমস্ত বর্ণের জন্য বিহিত হইলেও, অচল অতীব লোক ভিন্ন অন্য জাতিরাও যে ঐ দীক্ষা লাভ করিত এরূপ বিবেচনা হয়

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং নিম্নশ্রেণীর জন্য পবিত্র হরিনামের কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক লোকেরই ধর্ম সাধনের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ববঙ্গে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। নতুবা ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের ন্যায় মুসলমানের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে পূর্ব বঙ্গে হিন্দু জাতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে বাংলা দেশ নূতন শক্তিলাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রচারধর্মী। তিনি দেশবিদেশ পর্যটন করেন, তিনি দক্ষিণাপথ যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহার সেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বিবরণ সব দিক দিয়াই মূল্যবান এবং পরম চিত্তাকর্ষক, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি পুরীতে আসিয়া বাস করেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনে ও পুরুষোত্তমে

পুরুষোত্তম ধামেই তাঁহার

বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের মধ্যে যে সার্বজনীন প্রীতি দেখিতে পাই, যে অহিংসা ও নির্ভীক আদর্শ পাই, মৃত্যু যিনি বরণ করিয়াও মতলব হইতে বিচলিত হন নাই তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক বলেন :—He condemned ecclesiastical formalism and all distinctions of caste. He preached spiritual devotion and admitted all, including even Muslims, as his pupils." দু'টি কথায় তাঁহার ধর্মের মর্মকথা বলা যাইতে পারে

জাতিকুল ক্রিয়া ধর্মে কিছু নাহি করে
প্রেমধন অস্তি বিনা না মিলে কৃষ্ণেরে ॥

ভুবন মোহন গৌরা—একদিন যেমন ভারতবর্ষে নূতন প্রেমের ধর্ম বিলাইয়া জাতি, সমাজ ও ধর্মরক্ষা করিয়াছিলেন। আজ সেই প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে—সেই মহদ্ধর্ম প্রচার দ্বারা পতিত হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গের নিকট এই প্রার্থনা করি—আবার বাঙ্গালী হিন্দুর মনস্বিতা বিকাশের সেই শুভদিন আসুক। তাঁহার আশীর্বাদ বলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে বৈষ্ণবী শক্তি প্রচারিত হইয়া—মানুষের মত মানুষ হইবারযোগ্যতা দিক্—আমরা যেন মহান লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা

শ্রীঅরুণপ্রভা ভাদুড়ী

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে যে সকল খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলিকে নিয়ে একটী অখণ্ড সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে প্রকৃতি অন্যতম। তিনি বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানবকে, এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাকে, এক বিরাট ভাব-সম্পদ, রূপ, রস, সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির কবি। তাঁর প্রতিভাময়ী কাব্যলক্ষ্মীর একটী বিশেষ অঙ্গ সুন্দরী প্রকৃতিরাণীর স্বতোঃসারিত আশীষধারার অভিষিক্ত। বিশ্ব প্রকৃতিকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালো বাসতেন। সেইজন্য এই রকম আকুল আবেগে তিনি গাইতে পেরেছিলেন—

—"যে সুন্দরী বসুন্ধরে তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
একাও উল্লাস ভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা পরা তব কটিদেশ"—

সুন্দরী শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরাণীর অনবদ্য সৌন্দর্য সম্ভারে যদিও কবিচিত্ত ভরপুর, তথাপি তাঁর আশা এখনও মেটেনি। এখনও তার আনন কবির চোখে জাগায় সুন্দর স্বপ্ন। প্রকৃতির সকলই রহস্যপূর্ণ। এখনও তার কিছুই শেষ করা হয়নি। কবির অনিমেষ চোখ বিস্ময়ের শেষ তল খুঁজে পায়না। এখনও তিনি প্রকৃতির বুকে শিশুর মতন তার মুখ পানে চেয়ে আছেন। যেমন—

"এখনও মেটেনি আশা—
এখনও তোমার শুভ্র অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনও জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন।
এখনও কিছুই তব করি নাই শেষ
সকলই রহস্য পূর্ণ নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষ তল খুঁজে নাহি পায়
এখনও তোমার বুকে আছি শিশু প্রায়
মুখপানে চেয়ে"—

প্রকৃতিকে ভালোবাসবার ও তার সমস্ত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করার এই বিশ্বব্যাপি আকুলতা, আবেগপূর্ণ অধীর আগ্রহ তাঁর বিরাট কবি হৃদয়ের অপরিমেয় উদারতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি আরও বলেছেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দরী ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"—

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অপ্রতিহত গতি কিছুতেই তাঁকে স্থির থাকতে দিতনা। এই গতিবেগ তাঁর অন্তরের চিন্তা রাশি, ও ভাবধারাকে ক্রমশঃ স্থূল হতে সূক্ষ্মের পথে পরিচালিত করে। রহস্যোন্মুখ হৃদয়কে সর্বদা নূতন বস্তু আবিষ্কারের সন্ধানে ব্যাপৃত রাখে। তাঁর চিত্ত বিরাট; কল্পনা অসীম, ও চিন্তাশক্তি অপরিমেয়। কাজেই সাধারণে যে সামগ্রী হতে রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তাঁর অন্তর তাতে পূর্ণ হয় না। তাই তিনি সামান্যের মধ্যেও বিরাটের স্বপ্ন দেখেছেন, আবার বিরাটের মধ্যেও সামান্যের অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর রহস্যঘন কবিচিত্ত যে কি কামনা করে, তাহা তিনিও সঠিক উপলব্ধি সকল সময়ে করতে পারেন নি। তাই বলেছেন—

বৃথা যায় আধ প্রেম
আধখানা মন।
সমস্ত কে বুঝেছে কখন"—

আবার—"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই;
যাহা পাই তাহা চাইনা"—

তিনি প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য সম্ভারের মধ্যে অনন্তের রূপ, ও জড় জীবনের মধ্যে অনন্ত প্রাণের অনুসন্ধান করেছেন। সেই অসীম রূপ ও বিরাট প্রাণ যার আভাষ মাত্র, সেই আদি রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কবির যেন আর আগ্রহের সীমা শেষ নেই। কিন্তু তাঁর কবি হৃদয় যতদূরই অগ্রসর হোক না কেন, ঐ আভাষের বেশী কিছু আর সন্ধান করতে পারেনি প্রকৃতির এই অলৌকিক রহস্যঘন, স্বপ্নময়, প্রাণময়তার আবরণ উন্মোচন করা ত

আর সহজসাধ্য কাজ নয়। সুতরাং সকল কিছুর ভিতরেই এই আবছা অস্পষ্টতা থেকে যায়। যা দেখা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। অনুভব করা যায়, কিন্তু উপভোগ করা যায় না।

এই প্রকার চিন্তার ধারাটী কবির বলাকা কবিতার মধ্যে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি ধাবমান বলাকার গতিবেগ দেখে, এক বিরাট রহস্যঘন চিন্তায় অভিভূত হলেন। অবশেষে তিনি চলমান বলাকার গতিবেগের মধ্য হতে, সৃষ্টির চাঞ্চল্যময় অবিশ্রান্ত গতিবেগের সত্তা আপন অন্তরে অনুভব করে এই চিন্তার অবসান ঘটালেন। যেমন—

"দেওদার তরু সারে সারে
মনে হোল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চাহে
কথা কহিবারে।
বলিতে পারেনা স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি"—

গতির তত্ত্ব এখানে কবি Ehan Vitalএর Life

force এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যাকে আমরা প্রাণহীন বলি তার মধ্যেও একটা চলবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আছে। তাঁর কাছে এই বিশ্বে কোনও বস্তুই রূপহীন বা প্রাণহীন নয়। তিনি শুষ্ক অচলনের মাঝেও বিরাট প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছেন। অন্ধকারের মাঝেও আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি শুনেছেন—

"সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে, সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা সূক্ষ্মের প্রান্তরে;
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে সুদূরান্তরে"—

সৃষ্টির এই অস্পষ্ট চলার ছন্দ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আকাশপথে সঞ্চরণশীল হংস বলাকাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন,—

"হে হংস বলাকা—
কত মদ রসে মত্ত
তোমাদের পাখা।
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিশ্বের জাগরণ তরঙ্গিয়া
চলিল আকাশে"—

তোমাদের চলার আনন্দপূর্ণ অট্টহাসে সমস্ত প্রকৃতি বিস্ময়ে জেগে উঠল। ঐ পাখার ধ্বনি, নৃত্য-চপল শঙ্খময়ী অপ্সরা রমণীর মতন সমস্ত শুষ্কতার তপোভঙ্গ ক'রে চলে গেল। তাইতে শিহরি উঠল, তিমির মগন গিরিশ্রেণি ও দেওদার বন।

বলাকা কবিতাটীর প্রতি স্তরে স্তরে, সমগ্র সৃষ্টির তীব্র গতি শক্তিপূর্ণ চলবার গভীর উদ্দাম ভরা অদম্য আকাঙ্ক্ষাটী অতি সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে। গতির অভাবে জীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নিত্য প্রবাহিতের জন্য বিশ্বের মধ্যে প্রাণ স্পন্দন অনুভব করা যায়। এইখানে তাঁর নদী কবিতাটীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

—"তোমার চরণ স্পর্শে, বিশ্বধূলি মলিনতা
যায় ভুলি পলকে পলকে।
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে"—

এই উদ্দাম গতিবেগ, নিলায়িত গতিছন্দ, সমগ্র সৃষ্টিকে নির্মল পবিত্রতার শুচিস্নিগ্ধ আবেষ্টনে ঘিরে রেখেছে। নদীর ছন্দোময় গতিবেগের পানে চেয়ে কবি সৃষ্টির প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করেছেন। প্রকৃতির যাবতীয় গতিবেগের

মধ্যেই তিনি সৃষ্টির সচেতন আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। এখানে নদীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

—"ওগো নদী চঞ্চল অঞ্জসী অলক্ষ্য সুন্দরী ;
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি মৃত্যু স্নানে বিশ্বের জীবন"—

সৃষ্টির এই লীলাচঞ্চল গতিবেগের মধ্য দিয়ে মাটীর মানুষ ও বিশ্বের সাথে ভগবানও অগ্রসর হয়ে আসছেন মানুষের কাছে ; সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার অর্থই ত তাঁকে উপলব্ধি করা। তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে নিজ ধ্যান ধারণার সুস্পষ্ট প্রতীতি সঞ্চয় করা। শুধু চলা আর চলা। পিছন ফিরে চাওয়া মানেই পথে পড়া সৃষ্টির নীতি বিরুদ্ধ। ওই অদৃষ্ট পথের দেবতা সকলের অন্তরের মাঝে বসে ঘর ছাড়ানো উতরোল সুরে ডাক দিচ্ছেন, ওরে তোরা চল, এগিয়ে চল্। ভবিষ্যতের আশা আনন্দের মহা স্রোত তোদের টেনে নিয়ে যাক, পিছনের কোলাহল হতে দূরে বহুদূরে অতল আঁধারে, অকূল আলোতে। তাই কবি বলেছেন—

"তীরের সঞ্চয় তোর
পড়ে থাক তীরে।
তাকাসনে ফিরে
সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি—
মহাস্রোতে। পশ্চাতের কোলাহল হতে।
অতল আঁধারে অকূল আলোতে"—

ধাবমান হংস বলাকার পানে চেয়ে কবির মনে হোল, সমস্ত স্থাবর অস্থাবর জগৎ তার সঙ্গে কোন্ অজানায় ছুটে চলেছে—

"মনে হোল এ পাখার বাণী, দিল আনি—
শুধু পলকের তরে, পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেরোর আবেগ"—

গগনচারী বলাকার মুক্তি দেখে সকলে মুক্তির জন্য উদ্দাম হয়ে উঠল। পর্বত হতে চাইল বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ; তরুশ্রেণী মাটীর বন্ধন ফেলে ; পাখা মেলে, ওই শঙ্খ-রেখা লক্ষ্য করে দিশাহারা হয়ে আকাশের কিনারা খুঁজতে হোল ব্যস্ত। বিশ্বাসী পাখার পানে চেয়ে সুদূরের জন্য, ঘনায়মানা সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ ওঠে জেগে। এই বিরাট বিশ্বের যেখানে যা কিছু আছে সকলের মধ্যেই তিনি গতিবেগ লক্ষ্য করেছেন। এইখানে তিনি সৃষ্টির গতির রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন—

"তৃণদল—
মাটীর আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা
মাটীর আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা।
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"

হে হংস বলাকা, তোমার পাখার মত, তৃণদলও মাটীর আকাশে ডানা ঝাপটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে ; আবার অন্ধকার মৃত্তিকা গর্ভে, কত লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা অঙ্কুরের পাখা মেলে এগিয়ে আসছে কে তার ঠিকানা জানে। ওই উন্মুক্ত ডানার সঙ্গে গিরি রাজি বন সকলেই দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হতে অজানায় শুধু যেতে চাইছে। নক্ষত্রের পাখা ঝাপটিয়ে অন্ধকার ও আলোর পানে ছুটে যেতে চাইছে।—

"নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে,
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে"—

সাজাহান কবিতাটীর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই গতিবেগ পূর্ণ চিন্তাধারার খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়। মধ্যেই বলাকার সমস্ত দর্শন তত্ত্ব নিহিত আছে মানুষের জীবনও পরস্রোতা নদীর প্রবাহের মত নিত্য চঞ্চল। প্রতি পলকে নব নব অভিব্যক্তির স্তর অতিক্রম করে কোন্ এক অজ্ঞাত রহস্য জগতের পানে সে ধাবিত হচ্ছে। কালের দুর্নিবার স্রোতে জীবনের সকল কিছুই ভেসে যায়। সব সঞ্চয়ের অবসান ঘটে। এ তত্ত্ব সাজাহানের কাছে সহজ ছিল। তাই কবি বলেছেন—

"একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান—
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।"

কিন্তু তার জন্য সম্রাটের কোনও ক্ষোভ ছিল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন এই দুর্নিবার কালস্রোত হতে একটী মহার্ঘ রত্ন অক্ষয় রাখতে। প্রিয়া বিরহের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও হৃদয়ের অগ্নিজ্বালাকে অক্ষয় রাখার জন্য তিনি সর্বধ্বংসী

P30497

মহাকালের ছদয় সৌন্দর্যের মোহে ভুলিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহল সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে শুনাতে চেয়েছিলেন—

"ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া"—

প্রিয়ার স্মৃতিকে চির অম্লান রাখাই ছিল সম্রাটের একমাত্র কামনা। কিন্তু সর্বদর্শী কবি দেখেছেন, কাল-স্রোতে ভাসমান মানব জীবনের সঞ্চয়ের কোনও ক্ষেত্র নেই। বিলাপের অবকাশ নেই তাই কবি বলেছেন—

"মিথ্যা কথা কে বলে যে ভোলো নাই—
কে বলে রে খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার"—

সমাধি মর্মর চিরকাল সব জগতে পড়ে থাকে। স্মরণের আবরণে মরণকে ঢেকে রাখে। কিন্তু জীবনকে এখানে কে ধরে রাখতে পারে। আকাশের তারায় তারায় তার যে আমন্ত্রণ।—

"স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্ব পথে বন্ধন বিহীন"—

সম্রাট সাজাহান মমতাজের স্মৃতিকে তাঁর কীর্তি দিয়ে অমর ক'রে রাখলেন, কিন্তু তাঁর জীবন সেই কীর্তিকে পরাভূত করে নূতন প্রভাতের পানে এগিয়ে গেল।

—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ,
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারংবার।
তাই চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি নেথা নাই"—

ছবি কবিতাটীতেও রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন তত্ত্বপূর্ণ Mystic রূপের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এখানেও সেই চলে যাবার সুরটী লিলায়িত গতিচ্ছন্দে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। বহুরূপে বহুবার একটী চিন্তাধারা অনবদ্য রূপ-বিন্যাসে, অভিনব শব্দ সংযোজনায়, লিলাময় কৌশল-চাতুর্যে, আমাদের নয়ন সুমুখে বহুরূপের বৈচিত্র জাগিয়ে তোলে। সৃষ্টির সর্বপ্রকার চঞ্চলতার মধ্য দিয়েই জীবনের গতিবেগ ব্যক্ত হয়েছে। ইহাই তাঁর জীবন বাণীর মূলমন্ত্র। দান করেছে। তিনি বলেছেন—

—চলেছে ঘোরার ভাঁটা আলোকে আঁধারে—
আকাশে পাতালে পথের ঘূর্ণারে।
চলেছে ঘূর্ণের দল, নীরব চরণে, বরণে মরণে
সহস্র ধারায় ছোটে ভরপূর জীবন নির্ঝরিণী
মরণের বাজায় কিঙ্কিনী।
অজানার সুরে, চলিয়াছি দূর হতে দূরে ;
যেতেছি পথের প্রেমে"—

সর্বপ্রকার সুন্দর বস্তুর সুন্দরতর ছায়ার নামান্তর ছবি। সেই ছবির মধ্যেও কবি সঞ্চরমান প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছেন। সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির সন্তান হচ্ছে শিল্প। এখানে Longfellowর একটী কোটেশান তুলে দেওয়া গেল—

"Art is the child of Nature, yes,
Her darling child in whom we trace
The features of the mothers face
Her aspect and her attitude."

সুতরাং জগতের যা কিছু সুন্দর সকলই প্রতিফলিত হচ্ছে ছবি রূপে শিল্পের মধ্যে। সৃষ্টি যদি গতিবান হয়, তবে তার ছবি কেন নির্জীব হবে।

—"কি প্রলাপ কহে কবি, তুমি ছবি—
নহে নহে নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে ; নিস্তব্ধ ক্রন্দনে"—

তুমি যদি সত্যি অচঞ্চল ছবি হতে, তোমার মধ্যে যদি আনন্দাবেগ পূর্ণ গতিশক্তি না থাকতো তবে হয়তো কোনদিন জগতের সমস্ত শোভা সম্পদ নির্জীব ও মিথ্যে হয়ে যেতো। চলমান পৃথিবীর আত্মার সঙ্গে মিশে তুমি এক হয়ে আছ। এখানে কবি বলেছেন—

"মরি মরি সে আনন্দ পেয়ে যেতো যদি ; এই নদী
হারাতো তরঙ্গ বেগ ; এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন
তোমার চিকণ চিকুরের ছায়া খানি,
বিশ্ব হতে যদি মিলাইত,
তবে একদিন কবে চঞ্চল পবনে লিলায়িত
মর্মর মুখরঞ্জারা মাধবী বনের ; হোত স্বপনের...
আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নিলীমায় নীল"—

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অসংখ্য পাখীর পাখার সাথে দলে দলে কত মানবের বাণী অলক্ষিত পথে উড়ে চলে। অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে। এই গতিময় চাঞ্চল্য ও নিত্য বিচিত্রতার মধ্যেই এই বিরাট সৃষ্টির আনন্দ ও আবেগময় সত্তার আভাষ পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে কার যে কোথায় স্থান, কোথায় যে এই চলার শেষ তাহা কেউই জানে না। তাই কবি বলেছেন,—

"ধ্বনিয়া উঠিছে মুক্তে
নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয় অন্য কোথা
অন্য কোথা অন্য কোনখানে"—

বলাকা কবিতার মধ্যে দুইটী বা তিনটী Distinct ভাব আছে। এবং দুই তিনটী দৃশ্য আছে। এখানে আবেগের চেয়ে চিন্তা, রসের চেয়ে রূপ, এবং ভাবের চেয়ে তত্ত্ব বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য এই কবিতা ভাবধর্মী নয় তত্ত্বধর্মী। সমস্ত দর্শনতত্ত্ব এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে বলেই তত্ত্বের দিক দিয়ে বলাকা শ্রেষ্ঠ। বলাকাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা তীব্র আবেগ আছে। এর ছন্দ, গীতি কবিতার ছন্দ নয়। ভাষা-শক্তির প্রাচুর্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এতে গানের চেয়ে শক্তি বেশী প্রকাশ পেয়েছে বলে এই কবিতাকে আমরা তত্ত্বধর্মীর পাশে শক্তিধর্মী বলে উল্লেখ করতে পারি। আর একটী বস্তু লক্ষ্য করবার আছে, সেটী হচ্ছে বলাকার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা চলে যাবার সুর মানুষের মনকে চকিত স্পর্শ করে। "প্রাচীন সাহিত্যে" রবীন্দ্রনাথ বানভট্ট রচিত কাদম্বরীর সমালোচনা করা কালীন বলেছেন, "সমগ্র কাদম্বরী একটী চিত্রশালা"—বলাকাতে সেই কাদম্বরীর প্রভাব পড়েছে। অর্থাৎ বলাকার সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কতগুলি সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছেন। কোনও শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সাথে তাঁর কোন প্রভেদ নেই। শুধু চিত্র নয়, কাদম্বরীর অন্তর্নিহিতে যে শব্দবিন্যাস আছে, বলাকার অন্তরস্থ সেই শব্দের ঘনঘটাও আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের দর্শন তত্ত্বধর্মী কবিতাগুলির মধ্যে বলাকা যে শ্রেষ্ঠ চয়ন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

সুপ্রভাতে

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী

নীল আকাশের কোলে আজি হাস্‌ছে সোনার হাসি,
গাছের তলে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশী।
রাতের শেষে ঘুমটা ভাঙে কাহার পরশ লেগে,
প্রভাত কালের অরুণ আভায় উঠলো সবে জেগে।
কচি কচি ঘাসের শিশু, মুখে তাদের হাসি,
তারি মাঝে ভাব্‌নাটুকু যাচ্ছে কোথা ভাসি'।
ফুলের গন্ধে বাতাস আজি করছে ছুটো ছুটি—,
চাঁদের শুভ্র রূপোলিকা আঁধার দিচ্ছে টুটি'
আলোর মালায় ফুটিয়ে এলো নবীনতার গান
বর্ষ-প্রাতে বন্ধু দিয়ে গড়তে হবে প্রাণ !!

"লু"

কানন গোস্বামী

কল্প ছোট্ট রান্নাঘর খানায় খেতে বসেছে। রুক্ষ রজনীর পঞ্চমীর চাঁদ উদয়ের পথে। রান্নাঘর খানা মাঠের ধারেই। স্থানীয় গ্রাম্য ঘরের মত সেরূপ ঘেরা-ঘোরা বাড়ী নয়; কেমন এক অসামঞ্জস্য। খোলা মাঠের হাওয়া। চাঁদের আলো ঘরের দাওয়ায় খেলে বেড়াচ্ছে।

কল্প-মানসীর সংসার যেন খাপছাড়া। মানসী স্বামীর থালায় ভাত দিতে দিতে বল্লে একটা কুকুর থাকলে ভাল হোত।

কল্পএক মত হোল স্ত্রী মানসীর সাথে। তারপর কল্পের মনে পড়ে যায় অতীত দিনের কামনা-প্রবাহ। বেশী দিনের কথা নয় মাত্র পাঁচ বছর আগের কামনা। নির্জন গ্রামে বাড়ী—একটি এস্রাজ আর কুকুর।

পাওয়া সেরে আঁচানোর জন্য বেরিয়েছে, একটা জিম্ কালো রংয়ের রুগ্ন মাদী কুকুর কল্পের দিকে তাকিয়ে লেজ ওলট পালট করছে।

কল্পের অতীত কামনা নিরঙ্কুশ প্রমাণিত হ'য়ে গেল। স্ত্রীকে ডেকে বল্লে: এই তো চাওয়া প্রাণীটি হাজির। পেটের জ্বালায় এসেছে। এক গাদা পান্তা ভাত মাটিতে ঢেলে দিলে। কুকুরটা খেতে আরম্ভ করলে, খাওয়ার কেমন অদ্ভুত মৃদু শব্দ।

পেট পুরে খেয়ে সামনে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলো কুকুরটা।

রাতে শুয়ে শুয়ে চীৎকার.....ঘেউ...ঘেউ...; ঘুমে ব্যাঘাত।

কল্প ভোরে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছে কুকুর সাথী। কল্প কুকুরটার গায়ে হাত দিতে দ্বিধা বোধ করছে। গায়ে চর্ম রোগ। বিশ্রী দেখতে, চেহারা দেখে কল্পের প্রাণে দয়া এলো।

মানসীর কাজ বাড়লো। কুকুরের খাওয়ার পাত্র বসিয়ে দিলে। কুকুরটার নাম রাখলো "লু"। "লু" প্রভু চিনে নিলে। বাড়ী ছাড়ে না "লু"। পাড়ার লোক 'লু'কে দেখে অনেক সময় কল্পকে বলেছে একটা ভালো মন্দা বাচ্ছা পাল। মানসী বলে: ভালটি সবাই চাইলে খারাপ নেবে কে!

'লু'র দিবারাত্র আহার। এক মাসের ভিতর চেহারার পরিবর্তন হোল। সেদিন মানসী গ্রাম ঘুরতে বেরিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কল্পকে বলতে লাগলো: কুকুরটার জ্বালায় কোথাও বেরুনোর উপায় নেই। কি চেহারার ছিরি...পড়ে পড়ে মার খেল—পিছু ছাড়বে না। গোঁসাইদের বাড়ীর ভেতর পেছি ও ঢুকেছে ...কি বিশ্রী কাণ্ড। বলতে বলতে পোষাক পরিবর্তন করতে লাগলো।

লু বাড়ীর দারোয়ান। শেয়াল দেখলে উপায় নেই। দিন দিন লু মায়া বাড়াতে লাগলো। ক্ষিদে লাগলে লু এসে প্রভুর পা জড়িয়ে ঘুঁ ঘুঁ করে কান্না। চারটী মুড়ি খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে সরে যায়।

মানসী গ্রাম ঘুরতে বেরিয়েছে লুকে লুকিয়ে। যাওয়ার সময় বল্লে কল্পকে লুকে ডেকে রাখো। কল্প লুকে সদরে ডাকবা মাত্র-ই এসে হাজির। লেজ নাড়তে সুরু করলে, খালি লুর মুখের দিকে তাকায়। খিড়কীর দিকে খট্ করে আওয়াজ। কান ৩'টো খাড়া হয়ে গেল। কি জানি ভেবে একবার দৌড়ে ঘুরে এলো।

লু শুয়ে রয়েছে। কল্প পাশের বাড়ীতে গেল। বছর শেষের বৃষ্টি। চাষীর বেড়েছে কর্ম ব্যস্ততা। কল্পের চিন্তা তার জমিতে এবার তিল চাষ হবে কিনা! কল্পের বন্ধু শ্যাম। এদের বন্ধুত্ব গড়েছিল বিপদ বিপর্যয়কে কেন্দ্র ক'রে। শ্যামের যুক্তি ভিন্ন কল্প পা ফেলে না। চাষের উপদেশ নিতে তাই কল্পের পাশের বাড়ীতে যাওয়া।

লু চীৎকার করছে অপরিচিত আগন্তুক দেখে। আগন্তুকের গতিরোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লুকে অবজ্ঞা করে আগন্তুকরূপ কল্পের সদরে উঠে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। লু বাড়ীর চারধার তোলপাড় করতে লাগলো। কাউকে বাড়ীতে পায় না।

কল্পের বাড়ী পরিচ্ছন্ন। সদরে মহাত্মাজীর টাঙ্গানো

তৈলচিত্র—আর স্বাধীন ভারতের মানচিত্র। আগন্তুকদ্বয় দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে; লুর ভয় হচ্ছে প্রভুর হয়ত চুরি করতে এসেছে। খালি সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার।

আগন্তুকদ্বয় আসন গ্রহণ করা মাত্রই লু প্রভুদের অন্বেষণে বেরুলো। কল্পকে দেখতে পেয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়লো। কল্প বুঝতে পারে না লুর অন্তরের আহ্বান। জিজ্ঞাসা করে ফিরে লু কি ব্যাপার। কল্পের মুখের দিকে তাকিয়ে লু ছুটে চলে বাড়ীর দিকে। প্রভুকে দাঁড়াতে দেখে লু' ফিরে যায় প্রভুর পায়ের কাছে।

বাধ্য হয়ে লুকে কল্প অনুসরণ করলো। বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। কল্পকে আগন্তুকদ্বয় দেখে বলে: ধন্য আপনার কুকুরটী। প্রভুকে এনে তবে ছাড়লে।

কল্প উত্তর দিলে: এটী হঠাৎ আসে। কল্প লুর উপর গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

চৈত্রের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে কল্পর মনখানা ভারাক্রান্ত; সন্ধ্যার হাওয়া বইছে। বাড়ীর সামনে তুলো গাছের তলায় পাতা চৌকির উপর বসে আকাশের তারা গুলোর কিকিমিকি দেখ্‌ছে। কল্পর মনে ভেসে ওঠে পাঁচ বছরের কথা। জেলে বসে ভাবতে পারেনি এমনি দিনের এমনতর মুহূর্তের নিবিড় চিন্তাকে। এই সময় অতিবাহিত হয়েছে নির্জন কারা-কক্ষের ছোট্ট সেলটিকে ঘিরে। এমনতরো মুক্ত আকাশের তলে বসে তারাগুলোর সাথে মিতালি হ'তে পারে জীবনে এ ছিল কল্পনার বিষয়।

কল্পের মনে ভেসে উঠলো: সেলের দেয়ালে লেখা কথাটা। পাঁচ বছর পরে কোথায় থাকবো কে জানে। আরেকটী লেখা মনে পড়ে গেল: আমি প্রেমে পড়েছি কিন্তু সেদিনের প্রেমে-পড়া মানসিক চঞ্চলতা ভিন্ন তো কিছুই নয়। যিনি প্রেমের আসন দখল করেছিলেন তিনি মনের বাইরে। কারা প্রাচীরের অন্তরালে জীবন ছিল বাধেলা হীন। তাই প্রণয় করার অবসর ছিল। আজ কর্মময় জীবনে অবসর অল্প—প্রণয়ের চিন্তা মুছে গেছে। বাস্তব জগৎকে কেন্দ্র করে পথ হাটা ভিন্ন যখন গত্যন্তর নাই তখন ভাবের কল্পনা করা বৃথা। প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে গৌরাঙ্গ কি পেয়েছিলেন জানিনা; আমার অবসর সময় ক্ষেপন করা ভিন্ন কিছুই পাইনি। চাওয়া পাওয়ার বাইরের বস্তুর সাথে প্রেম! কল্প ডুবে গেছে চিন্তায়। লু কখন এসে পাশে বসে রয়েছে কল্প বুঝতে পারেনি। একেবারে গা ঘেঁষে। মানসী কাছে এসে বলে: কুকুর ছুঁয়েছো ঠাকুরের সন্ধ্যারতি করতে হবে না! লু লাফিয়ে উঠ্‌লো। মানসীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো লু।

মানসী রেগে আগুন। দেব সেবার যোগাড় এখন স্নান না করলে হবেনা! কুকুরের জ্বালায় জাত জন্ম সব গেল। এত বড় আস্পর্দ্ধা বলেই: সামনের কক্ষি দিয়ে পেটাতে সুরু করলো। লুর কি ওয়ে ওয়ে কান্না। তবু সরবে না।

সন্ধ্যা থেকে লুর কাজ আরম্ভ। দূরে বাঁধের ওপর লোক চললেও লু তেড়ে যায়। সেদিন আর লু'কে দেখা যাচ্ছে না। খাওয়ার পর লুকে "লু" "লু" করে ডাকা হোল লু এলো না। মানসীর মন খারাপ হয়ে গেল। কল্প গ্রামে বেরুলো লুকে খুঁজতে। হঠাৎ হারিকেনের আলো দেখে লু চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এসে দেখে প্রভু।

মানসী বেশী করে খেতে দিলে। কল্পের বন্ধু পৃথ্বীশ ভোরে এলো। ঘাটাল যেতে হবে। বার মাইল রাস্তা। লু পিছু নিলে। তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর কল্প লুকে ঢেলা মেরে বাড়ী পাঠানোর চেষ্টা করলে। খালি খালি পড়ে পড়ে মার খেল।

রাস্তায় লু' যাওয়া বিপদ হ'য়ে উঠছে। পাড়ার কুকুর নিজ নিজ এলাকায় লুকে পেয়ে বিবাদ বাধায়। লুকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে কল্পকে। এদিকে কোর্ট বেলা দশটায়। ঘাটাল পৌছতে তখনও আট মাইল বাকী। সাড়ে আটটা বেজেছে। কোর্টে কল্পের মামলা। দেওয়ানী মামলার আসামী। দেরী হ'য়ে গেলে এক তরফা হওয়ার সম্ভাবনা। দ্রুত চলেছে—রাস্তায় বিবাদ বাধে "লুর" সাথে। "লু" তবু প্রভুর সাথে দৌড়ায়।

কল্প থানায় প্রবেশ করলে। লু প্রভুকে খুঁজে পায় না। দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলে। থানা অফিসার কল্পকে বল্লে: সেই "লু" এসে হয়েছে। কল্পের পায়ের তলায় পড়ে লুর কি কান্না শুকিয়ে বসেছিল বলে।

কল্প ছুটে চলেছে। রসিক-গঞ্জে ছোট খাট ব্যবসার কেন্দ্র। যত রাজ্যের বাজারের কুকুরের আড্ডা সেখানে।

লু'কে সেই ঘাটীতে আট্‌কা পড়্‌তে হলো। কল্প দেখলে একপাল কুকুর লুর উপর পড়েছে। লুকে শুকুরে নিয়ে ফেলেছে। কাঁউ কাঁউ করছে। কল্পের সমস্যা।

কল্পকে নিজ স্বার্থ লুর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চল্লে। প্রভুভক্তির প্রতিদান লু পেল না প্রভুর কাছ থেকে। কল্প ভাবছে লুকে ছেড়ে এসে ভালো করিনি। লুকে হয়ত মেরে ফেলেছে। এত গুলোর সাথে যুদ্ধে বেঁচে উঠতে পারবে না। একটু ছাড়িয়ে এলে ভাল হোত। আর হয়তো লুকে পাবে না। কল্প দৃঢ় হ'য়ে নিলে—লুর মত আরো লু আসবে।

কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হোল। চায়ের দোকানে বসেছে কল্প। লুর জন্য প্রাণে প্রতিনিয়ত ব্যথা বাজছে কল্পর। বেশ সময় ছিল তবু ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেনি।

কল্পের বন্ধু পৃথ্বিশ এসে হাজির হলো। লু সাথে এক হাত জিব্‌ বের করে পিছনে পিছনে আসছে। এসেই কল্পের পায়ের কাছে পড়ে কান্না। কান্নার অর্থ কল্পের অন্তরই মাত্র বুঝলে। দির না থেকে খাবারওয়ালার কাছ থেকে ছ' আনার মুড়ি কিনে খেতে দিলে। তবু লু কাঁদে কিছুতেই খাবে না। কল্প গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে তবে লু খেলে।

কল্প হোটেলে খেতে গেছে লু সাথে। স্নান করতে কল্প নদীতে নাম্‌লে। কল্প ডুব দিলে লু ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। পাশের একটি লোক লুর কাণ্ড দেখে অবাক। হোটেলে খাওয়ার উচ্ছিষ্ট ভাত কল্প লুকে রাস্তায় খেতে দিলে লু খাবে না, দাঁড়াতে তবে খেলে।

সব সময় লু কল্পের পায়ে পায়ে। কোর্ট শেষ হলো বেলা চারটায়। পৃথ্বিশ বল্লে কল্পকে "বাসে গেলে লু যেতে পারবে না। কী কষ্ট যাবে! আর হাটতে পারবে না কল্প।" বাস ষ্টাণ্ডে কল্প হাজির হ'লো। লু বাসের সামনের চাকা ঘেঁষে শু'লে কল্প ভাবে লু যাবে কি করে!

লুকে তাড়িয়ে বাস ষ্টার্ট দিলে। লু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বাস দৌড়ালো। "লু" পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে। তার প্রভুকে নিয়ে পালাচ্ছে। এই রে চাপা পড়ে পড়ে। একটু একটু করে জিব্‌ হাত খানেক বেরিয়ে পড়েছে। তবু প্রাণপণে দৌড়। পিছনে পড়ে গেল! রাজ্যের ধুলো লুর চোখে মুখে লাগ্‌ছে। আহা কি কষ্ট।

কল্প পৃথ্বিশকে বল্লে: নেমে পড়ি। তিন মাইল লু গাড়ীর পিছনে দৌড়ে আর পারলো না। কল্প আর দু' মাইল এসে থানায় বিশ্রাম নিলে। লুর জন্য মন খারাপ। লুর প্রভু ভক্তির নিদর্শন দেখে কল্প অভিভূত হ'য়ে উঠেছে।

পৃথ্বিশ আনন্দিত হয়ে বল্লে: ঐ যে এসে গেছে লু। এসেই কান্না। লুকে থামাতে পারে না কল্প। গায়ে হাত বুলাতে থাকে। কল্পের মনে ধিক্কার আসে কর্তব্য-চ্যুতির জন্য। লুকে একরাশ মুড়ি কিনে খাওয়ালে।

রাত আটটায় কল্প বাড়ী ফিরতেই মানসী বল্লে: লুকে পাওয়া যাচ্ছে না তার বাচ্ছাকে শেয়ালে মেরে ফেলেছে।

কল্পের মনে ধাক্কা লাগলো। তবু বল্লে: ও আবার সাথে ঘাটাল—লু বাচ্চাকে খুঁজে পাচ্ছে না—চার ধার ঘেউ ঘেউ করে ছুটোছুটি করছে।

ভোরে উঠে দেখি লু তার মরা বাচ্চাকে বাঁশ বন থেকে তুলে এনে কোলের কাছে রেখে শুয়ে রয়েছে। পচা গন্ধ। এ কি কাণ্ড। যত মার খোর করে, তবু ওঠে না। কিছুতেই লু ছাড়বে না মরা বাচ্চা। জোর করে কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলার জন্য কল্প চল্‌ছে—লু পথ আটকায়। নদীতে ফেলা মাত্র লু জেগে বসে রইলে। কল্প দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

শরৎচন্দ্র

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস, বি. এস সি।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উপন্যাস কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু সমাজ গঠনের কাজে উপন্যাসের প্রভাব যে কত অমোঘ, দায়িত্ব যে কত গুরু, তা একটু আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে। যারা নিছক আনন্দ পাবার জন্যেই উপন্যাস পাঠ করে, তাদেরও দোষ দিতে পারিনে, কেননা আনন্দটাও অসত্য নয়; কিন্তু ঐ আনন্দের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য বোধও বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে যারা উপন্যাস পাঠ করে, আমি তাদেরি দলে। এর কাজ ঠিক অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতন। সমাজের সমস্ত অলিগলিতে দৃষ্টিপাত করে সাধারণ-অসাধারণ, সহজ অসহজ, উঁচু-নীচ সকলের প্রাণের কঠিন সমস্যা, অব্যক্ত আবেগ ও বেদনাকে যাঁরা কৌশলী ভাষা দিয়ে বাইরে মূর্তিমান করে টেনে আনেন, উপন্যাসিক হিসাবে তাঁরাই তত জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ঔপন্যাসিক জনপ্রিয়তার এ সংজ্ঞাটি যদি যুক্তিপূর্ণ ব'লে গ্রহণ করতে কোন বাধা না থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রই হচ্ছেন সেই সার্থক উপন্যাস-রঙ্গী যাঁর যাদুমন্ত্রে বাঙ্গালী পাঠক চিরমুগ্ধ। মানুষের গোপন হৃদয়াভ্যন্তরে শরৎচন্দ্র যে ভাবের প্রেরণা এনে দিয়েছেন, তাতেই তাঁকে এত করে ভালবাসি।

মাটীর দুনিয়াতে চলতে ফিরতে মানুষ দোষ-ত্রুটি করবেই; বিন্দুমাত্র দোষের অছিলায় পর্বত প্রমাণ গুণ-টুকুকে যদি অবহেলা করি, বাস্তব প্রয়োজনে সেটাকে সত্য বিচার নিশ্চয়ই বলা চলে না। তাতে সমাজের ক্ষতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। প্রকৃতির এটাই দুর্বোধ্য রহস্য যে, কোন চরিত্রের একাংশ যখন নিন্দনীয় ত্রুটি দ্বারা আচ্ছন্ন ঐ ত্রুটির পরিবর্তে অপরাংশে তখন অসাধারণ অনুভব প্রতিভার বিকাশ। প্রকৃতির এই প্রত্যক্ষ সত্য নিয়মকে অস্বীকার করলে ঠকতেই হয়। দোষ ত্রুটি ও সকল দুর্বলতার অতীত করে মানুষকে যারা কল্পনার খাঁটি দেবতার মূর্তিতে রচনা করেন, সে তখন পাথরের মূর্তির মতই নিষ্ঠুর ও শক্ত হয়ে গড়ে উঠে। সাধারণ মানুষ সেখানে ভয়ে ভয়ে মস্তক অবনত করলেও প্রাণের অনাবিল ভক্তি দিয়ে তাকে নিজেদের জীবনে কোনমতেই বরণ করে নিতে পারে না। এই সহজ সত্যের উপলব্ধি ও প্রকাশ শরৎচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই; তাঁর রচিত উপন্যাসের জীবন্তগুলি আমাদেরই মতন হাসি কান্নার মানুষ,—কখনও তারা স্বপ্নরাজ্যের অতিমানব কিংবা স্বর্গের দেবতা হয়ে ওঠেনি। কাজেই তারা আমাদের প্রাণের অতি নিকটে এসে সংগোপন মধুমে গলাগলি করে; তাদেরই মধ্যে যারা দৃঢ় ও বলীয়ান, তাদেরই নিয়ে আমরা প্রাণের পূজার অর্ঘ্য রচনা করি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মানবচরিত্রের যে অদ্ভুত বিশ্লেষণ দেখতে পাই এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর যে অপূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই, তাতে তাঁকে একজন বড় মনস্তাত্ত্বিক বলেও সম্মান করা উচিত। নারী চরিত্রের এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা আর কারও মধ্যে দেখতে পাইনা। শরৎচন্দ্র একাধারে একই সময়ে ঔপন্যাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর ভাষায় কোন কৃত্রিমতা কিংবা কষ্ট কল্পনার ছোঁয়াচ পাওয়া যায় না; স্বচ্ছন্দ গতিতে দৃপ্ত ভঙ্গীমায় নিজেই যেন নিজের পথ কেটে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চলেছে পাঠক সমাজকে তার সৌন্দর্যে স্তম্ভিত করে। সমাজের উঁচু তলায় যাঁরা বাস করেন, তিনি শুধু তাঁদের জন্যই লেখেন নি; তিনি জনসাধারণের জীবনের সমস্যাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও কবি হিসাবে নজরুলকে যেমন রবীন্দ্রপ্রভাব স্পর্শ করেনি, ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের বেলায় একথা ততোধিক খাটি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা জীবনের সম্পূর্ণ নূতন একটা দিকের আলোচনা দেখতে পাই। যেখানে কেউ হয়ত যায় না, যাদের লোকে-মন্দ বলে শুধু ঘৃণাই করে, সমাজের জঞ্জাল বলে যাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, এমনি সমস্ত জায়গায় শরৎচন্দ্র তাঁর নিপুণ লেখনী নিয়ে উপস্থিত; এবং তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সেই অসুন্দরও এমনি সুন্দর হয়ে উঠল, অবহেলার ধনও হয়ে উঠল শিক্ষার অঙ্গ যে তখন তাঁর

অলৌকিক প্রতিভার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা রাখবার যায়গা পাওয়া যায় না। যাকে সমস্যা বলে সমাজ অস্বীকার করতে পারেনি অথচ সমাধান সম্বন্ধে অসম্ভব ধারণার নিষ্ক্রিয়তার ছিল—সেখানেই দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এবং সার্থকতা। জীবনকে যারা তীক্ষ্ণভাবে এমন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেনি, তারা কি একাজ পারে? শরৎচন্দ্রের ছিল সেই দিব্যদৃষ্টি। তাই তিনি যা বলেছেন, তার মূল্য সার্থক উপন্যাসেরও উর্দ্ধে উঠে গেছে। তাঁর সমসাময়িক কালে সমাজের যে দৃষ্টি ভঙ্গীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং যা আর কারও মধ্যে ছিলনা, শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সেই পরম প্রয়োজনের সাফল্যমণ্ডিত বিকাশ দেখতে পাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয়, আমরা যেন কোন এক সত্য কাহিনীর সন্ধান পেয়েছি; উপন্যাসের জীবগুলির পদধ্বনি, কথাবার্ত্তা তাও যেন কান না পাতলেও শুনা যায়,—তাদের নিঃশ্বাস যেন আমাদের গায়ে এসে লাগে, ধ্যানে ও কর্ম্মে তারা এমনি সজীব ও সচল। তিনি যা বোঝেননি, কৃত্রিম পল্লব বলার মত জোর করে কাকেও তা বুঝাতে চেষ্টা করেননি, তিনি এমনই সত্যদ্রষ্টা ও জীবন দ্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে জিনিষটার অভাব, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তারই পূর্ণতা দেখতে পাই। পতিতা বলে এতদিন যাদের আমরা শুধু ঘৃণাই করেছি, শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের দিখালেন যে, না, তারা শুধু ঘৃণিতাই নয়, তাদেরও মধ্যে লক্ষ্মী থাকেন। শরৎচন্দ্রের এমনি অলৌকিক ব্যক্তিত্ব যে রবীন্দ্র প্রতিভা তাঁকে স্পর্শ-ই করেনি, প্রভাবে রাখা তো দূরের কথা! আশ্চর্য্য এইটাই যে রবীন্দ্রযুগে জন্মলাভ করেও বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা যুগ প্রবর্ত্তক হবার অধিকার নিয়েই ফুটে উঠছেন। শরৎচন্দ্রের পর থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার বিচিত্র উপন্যাসের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত দেখিনা কেন, শরৎচন্দ্রই এদের মূল কাণ্ড; তিনিই এসে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসকে সম্পূর্ণ একটা নূতন প্রগতির পথে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, যা না দিলে বাংলা উপন্যাস আজও এস্তরে এসে পৌঁছানর স্পর্দ্ধা রাখতনা।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রতিভাময়, কাজেই তিনি সকল সমালোচনার উর্দ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যেই উপন্যাসের পরিব্যাপ্তি; শরৎচন্দ্র উপন্যাসের আর একটা নূতন ও অত্যাবশ্যক ধারার প্রবর্ত্তক; এবং সেখান থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-শরতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে উপন্যাস-সাহিত্যের প্রগতি। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন, তা আর কেউ পারেননি, এটা সূর্য্যের মতন সত্য; কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যে এমন কিছু বেশী পাই যার সঙ্গে প্রাণের একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। জীবনকে খুব বিস্তৃতভাবে তিনি দেখেননি, কিন্তু যে টুকু দেখেছেন, তাতে অনুভূতির গভীরতা আছে। তিনি যা অনুভব করেছেন বিনা সঙ্কোচে তা প্রকাশ করেছেন; দুঃখের কোন মীমাংসা তিনি করতে না চাহিলেও তার বাস্তব রূপটি তিনি আমাদের ধ্যানের সম্মুখে এনে উপস্থাপিত করেছেন; ফলে সমাজের যে দিকটাকে আমরা অবজ্ঞা-অবহেলা করে এসেছি, সেটাও আমাদের চোখের সম্মুখে প্রগতির একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের আত্ম-চেতনা ফিরে এসেছে, সমস্যাকে সমস্যা বলে চিনতে পেরেছি। সমাধানের ইঙ্গিত না দিলেও কর্ত্তব্যের অনুভূতিটা যে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে দিলেন, এইখানেই শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব। তাঁর হৃদয়াবেগ এত বেশী যে কোন কিছুকেই ঠিক তার মতন করে দেখতে পারেন নি, আরও বড় করে দেখেছেন; মানুষের দুঃখ যতটুকু দেখেছেন, তার চেয়ে বেশী করে তিনি অনুভব করেছেন। শরৎচন্দ্রের যত কিছু নিন্দা-প্রশংসা, তাঁর নারী চরিত্রগুলোকে নিয়ে। যারা আমাদের আশে পাশেই আছে, যাদের কথা জানিও, তাদের কথাও যে বর্ণনা করে বললে এমন ভাল লাগে, শরৎচন্দ্রের কল্পনা ও ভাষার এ মোহিনী শক্তি ছিল। নারী চরিত্রেই বাংলার বড় বড় ঔপন্যাসিকদের একটা শক্তি পরীক্ষার স্থল। শরৎচন্দ্র আমাদের প্রচলিত সমাজ ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণে তিনি যেন প্রকাশ্য ভাবেই প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকে ব্যঙ্গ করেছেন। বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলোই যা

একটু বৈচিত্র্যময়, পুরুষ চরিত্রগুলো নাকি তেমন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে টমসন্ সাহেবও এই কথাই বলেছেন। আমাদের দেশে নারীর মধ্যেই একটু শক্তির পরিচয় আছে, তাই গল্পে উপন্যাসে নারী চরিত্রের একটু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলো একটু বাস্তব ঘেঁষা, রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলো একটা আদর্শ-কল্পনায় অনুরঞ্জিত; কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যে আদর্শ ও বাস্তবের একটা অপূর্ব সমন্বয় চেষ্টা আছে। আমাদের সমাজে নারীর যে শক্তির প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র ঠিক সেইটীর সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁর কল্পনাও বাস্তবের অনুকূল হয়েছে। জীবনে শরৎচন্দ্র বোধ করি মেয়েদের কাছ থেকে কোন আঘাত পাননি, এই জন্যেই তাঁর কাছে নারী চরিত্রের স্নেহ মমতা-মাতৃত্বের দিকটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজলক্ষ্মীর মত মহীয়সী মহিলার স্পর্শ থাকলে জীবনে শ্রীকান্তের মত ছন্নছাড়া হ'তেও হয়ত কোন আপত্তি থাকেনা। একবার আছাড় খেলে চিরদিন ধূলায় পড়ে থাকতে হবে, এর কোন যুক্তি নেই। সমাজের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞানুসারে যারা আমাদের নিকট ভ্রষ্ট-চরিত্র, শরৎচন্দ্রে তাদেরই চরিত্র মহিমার উজ্জ্বল প্রতিরূপ দেখতে পাই। এই চিত্রকে পূর্ণতা দেবার জন্যেই তার পাশে কতকগুলো মন্দ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনও শরৎচন্দ্রের হয়েছিল। নারী চরিত্রের সমস্ত গোপন অলিগলিও যেন শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত প্রসারিত। এই জন্যই শরৎচন্দ্রকে আমি আগে মনস্তাত্ত্বিক বলেছি। তিনি আমাদের মেয়েদের মধ্যে আর একটা মহিমা লক্ষ্য করেছেন, সেটা তাদের দুঃখ সহ্য করবার অসাধারণ শক্তি। কিন্তু একথা ত শুধু আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই খাটে না, নারী মাত্রেরই প্রকৃতিতে এই সুপ্ত শক্তি নিহিত আছে। নারী বিদ্বেষী Sohepenhaneরও বলেছেন,—'She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers.' নারী জীবনের এই নিয়তি শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে অভিভূত করেছে। তাই তিনি নারী চরিত্রের মহিমা এমন করে কীর্তন করেছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুভূতির দ্বারা তাঁর কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলেই তাঁর সৃষ্টি এমন গভীর; বাস্তব অনুভূতি ও স্বকীয় কল্পনার বিরোধ তাঁর কোন উপন্যাসে নেই। রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবকেই বাহিরের দিক থেকে নিকটতর করে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিই শরৎচন্দ্রকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি শক্তির অধিকারী করেছে। তাঁর কাল্পনিক চিন্তাগুলোকে কোথাও বস্তুনিরপেক্ষ abstract ideaর ভাবনা বলে মনে হয়না; তাঁর মধ্যে নিছক ভাব কল্পনা নেই—একটা অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতির আবেগ আছে। এই আবেগের জোরে তাঁর অনুভূতি-কল্পনাও যেন একটু জোর পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা বাঙ্গালীকে রসের উর্দ্ধলোকে বিচরণ করবার অধিকার দিয়েছে, তিনি সীমার সঙ্গে অসীমকে বেঁধে দিয়েছেন; কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। শরৎচন্দ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে সে দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি; নিজের সমাজে যে জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই গভীর বর্ণে চিত্রিত করেছেন। জীবনের মূল্যবান অংশ চিরদিন পর্দার আড়ালে অন্তঃপুরের মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকে, তাকে আবিষ্কার করার চোখ চাই; শরৎচন্দ্রের সে চোখ ছিল তাঁর উপন্যাসে জীবনের যে দিকটা যেমন করে ফুটে উঠেছে, তাতে আমাদের হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠে। আমাদের সমাজের সঙ্কটময় মুহূর্তে যে রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, শরৎচন্দ্র এলেন সেই খাঁটী দৃষ্টি নিয়েই। আমাদের সাহিত্যের ভাবধারার ক্রম বিকাশে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক অভ্যুদয় একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল তাই তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

জীবনের আর কোন্ দিকটা অনাবিষ্কৃত আছে তা'নি না; কিন্তু যতদিন না সম্পূর্ণ নূতন ও ভিন্নতর চিন্তার সন্ধান কেউ দিতে পারেছেন, ততদিন বাংলার উপন্যাসের ইতিহাসে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অধিনায়কত্বই বজায় থাকবে; বাঙ্গালী পাঠকের মানস মন্দিরে শরৎ-চন্দ্রই উপন্যাসের আরাধ্য দেবতা হয়ে প্রতিষ্ঠিত রইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কালের সমস্ত প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের নিকটই সাহিত্য

রসগ্রাহী মাত্রেই ঋণবদ্ধ ; কিন্তু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা অগ্রগতির ধাপ, এবং এই অগ্রগতির ধাপটা এমনি অত্যাশ্চর্য্য যে ঔপন্যাসিক হিসাবে ভালবাসি বলিলে সর্ব্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রের প্রতিই অন্তরের সমস্ত ভালবাসা একসঙ্গে নিবেদন করবার জন্যে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে উঠে।

বৈশাখী পূর্ণিমা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; এম-এ, পি এইচ ডি

বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম তিথি। বুদ্ধদেব ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত জগতে ভারতের ধর্মগত মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার অহিংসা ধর্ম সমস্ত মানব জাতির প্রতি মৈত্রী ও করুণার বিশুদ্ধ উৎসরূপ হইতে উৎসারিত। ইহা এক কালে প্রায় সমস্ত এশিয়ার রাষ্ট্র ধর্মরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আজ চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে—পৃথিবীর আকাশে বাতাসে হিংসার ছষ্ট বীজাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত বৌদ্ধ দেশ সমূহে যে হিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা নির্বাপিত করিবার মত শান্তি বারি আর প্রাচীন ধর্মের কমণ্ডলুতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা। বুদ্ধদেবকে কার্যতঃ অস্বীকার করিয়া অনুষ্ঠানিক ভাবে তাহার পূজা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। ভারতের শাশ্বত আদর্শ আজ মুহুর্মুহু হিংসা ও রক্ত লোলুপতার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ। আজ ভগবান তথাগতের বাণীকে নূতন করিয়া অনুভব করিবার দিন আসিয়াছে। মনের পরিবর্তন না হইলে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন কার্যকরী হইবে না। মনের গতি ফিরাইতে হইলে আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও জীবন নীতির অনুশীলন প্রয়োজন। জগতে অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার মূল উৎপাটন করিতে হইবে। এবং যাহাতে এই বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে না পারে তাহার জন্য চিত্তকে সর্বদা বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। সেই আশাতেই আমরা এই অনুষ্ঠানিক পূজার দ্বারা অব্যাহত রাখিতে চাই। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কবে তাহার মধ্যে প্রণবের প্রাণ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা কে জানে? কালী পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়াই আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে পাইয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিলে আমরা একদিন চৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাব প্রত্যাশা করিতে পারি। আশা করি বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালন একদিন এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে মৈত্র শান্তি মন্ত্রের উদাত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কীর্তন

ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস

কীর্তন শব্দের প্রতিশব্দ অনেক—কথন, প্রবন্ধ, সাধন প্রচার ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

পিবন্তি যে ভগবদাত্মনঃ সতাং
কথামৃতম্ শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তিতে বিষয়—বিদূষিতাশয়ম্
ব্রজন্তিতচ্ চরণসরোরুহান্তিকম্॥

পাঠ করে তখনি আনন্দে গাই :—

শ্রীহরি কথনামৃত শ্রবণ পুটে সঞ্চিত
পশিয়ে চিত্ত দূষিত, তখনি করে শোধিত ॥ ১ ॥
সেই সুধা পান তরে আকুল যে প্রাণ
[তেমনি আকুলতা চাই যা'তে করে আত্মহারা]
শ্রীহরি চরণ সরোরুহে পায় সে স্থান ॥ ২ ॥
[শ্রবণে কীর্তনে মনন হয়
প্রেমানন্দের হয় উদয়]

এই কীর্তনের প্রণালী কী ?

এই প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন—"স্বয়ং মহাপ্রভু" অভিমান শূন্য হয়ে হরিনাম কীর্তন

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

কবি কৃষ্ণদাস বলেন :—

"উর্দ্ধ বাহু করি কহো শুন, সর্বলোক,
নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক।
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ—
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।"

কপাট বন্ধ করিয়া কীর্তন এক বৎসর

"তবে প্রভু শ্রীনিবাস গৃহে নিরন্তর
রাত্রৌ সংকীর্তন কৈল এক বৎসর।
কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে
পাষণ্ডী হাসিতে আসে, না পায় প্রবেশে।"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "রামধুনী" কীর্তন নয়। কীর্তনে পায় লোক নব জীবন। রামধুনী কীর্তন লক্ষ লক্ষ বহির্মুখী লোক শুনে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। জীবন যাত্রার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক রাষ্ট্রনৈতিক প্রচারের সঙ্গে।

গৌরাঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক অভিযান—কীর্তনসহ।

"নাগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল
ঘরে ঘরে সংকীর্তন হইতে লাগিল।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।"

• • •

"প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন।" তিন সম্প্রদায় সহ নৃত্য করে চলেছেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ হরিদাস প্রভৃতি সহ। আজ যেন সমুদয় নবদ্বীপের লক্ষ লক্ষ লোক বহির্গত হয়েছে সদর রাস্তায়।

"কীর্তন ধ্বনি শুনি কাজী লুকাইল ঘরে
তর্জ-গর্জ শুনে তাতো না যায় বাহিরে।"

মহাপ্রভু কাজীর দ্বারদেশে এসে ডেকে পাঠান তাঁকে। তারপর কাজীর সঙ্গে বিচার, বিচারে পরাজয় এবং আত্মসমর্পণ। কাজী বললেন :—

"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি
এই কৃপা কর যেন তোমাতে রহে মতি।"

আজ জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ শাসন ভারের ভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেশে শান্তি এসেছে কি ? যিনি পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্বে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করেছিলেন, আজ তাঁকে আমাদের আহ্বান করতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। তাঁর পতাকা তলে দণ্ডায়মান হয়ে আমরা পৃথিবী কম্পিত করে বলব—

হরিবোল। হরিবোল !! হরিবোল !!!

চিরস্থায়ী শান্তি তখনই আসবে জগতে। তাই শাস্ত্রেও আমরা দেখে থাকি এই বাণী—"নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-মন্ত্র

শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার : কবি-শ্রী

"হে কবি! সত্যের স্রষ্টা ভাবস্রষ্টা ধ্যানলোকাচারী
অসীমের লীলা সাথী সঙ্গ-অভিলাষী!
"সকলি তোমার চিত্তে দেয় দোলা জাগায় পুলকে
ধূলির ধরণীকে আনো তুমি আনন্দের লোক।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান হয়ে বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণ বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। পলাশীর প্রান্তরে যে দিন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অস্তোন্মুখ রক্তিম রবির শেষ রশ্মি বাঙলার স্বাধীনতা হরণ করে ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারে আত্মগোপন করলো, সেদিন বাঙালী ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল। তারপর এক শতাব্দী পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জেগে উঠলো স্বাধীনতা সমরের প্রচণ্ড আলোড়ন। তখনও বাঙালীর রঙীন কল্পনার স্বপ্নঘোর টুটে যায় নি। স্বপ্নের মোহমায়া নিদ্রা ভেঙে গেলো, যখন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের উগ্র প্রতীক ও ধনতন্ত্রীতি কার্জনের কঠোর বঙ্গভাঙ্গে ভারত হলো দ্বিধাবিভক্ত। বিদেশী ইংরাজ শাসনে হাতমুখী বাঙলা মায়ের বুকে ফুটে উঠলো বিষাদের রেখা। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার। এমন সময় বাঙলার নিখ বিশ্রুত এক জাতীয় কবির তেজোময় রবি দিগন্তের কোলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। কবির গম্ভীর বজ্রকণ্ঠে বিষাদের সুরে একটি গানের রেশ আকাশে বাতাসে ভরে গেল।

"আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে (মরি হায় হায় হায় রে)
ওমা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥"

রবীন্দ্র-কাব্য বহুরূপী বা বহুমুখী। তবে বর্তমান আলোচ্য অংশে মুক্তি সাধনার পূর্ণ প্রতীক কাব্যের মধ্য দিয়ে গড়েছিলেন কবি সুললিত মুক্তি সঙ্গীত। তাঁর এই মুক্তি স্বর্গাপবর্গ নয়, এ নিছক জীবন্মুক্তি। তিনি বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত, সংস্কার থেকে মুক্ত, জড়ত্ব থেকে মুক্ত। লোকায়ত সভ্যতার মোহ ও সমারোহ হতে মুক্ত, নাগরিক জীবনের নাগপাশ হতে মুক্ত।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা পরিপূর্ণ আত্মাভিব্যক্তি দ্বারা তাঁর মন সর্বদা মুক্ত থাকতো। আত্মবিকাশের যে অফুরন্ত ও সম্যক্ সম্ভাবনা তাই তাঁর চিত্তের দেহ ধারণ। সেই সম্ভাবনাকে, ভাবে, ভাষায়, চিন্তায়, ছন্দে, সুরে, কর্মে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন মানব জীবনের কূলে কূলে। কঠোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে তাঁর জীবনের ব্রত। মুক্তি-কামী রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রতকে নানাভাবে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর একটি রচনায় বলেছেন।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।" নৈবেদ্য

চিত্তে রয়েছে বাসনা। বিশ্বে রয়েছে বিধাতার অবারিত দান। এখানে সম্ভোগের দ্বারাই বাসনার মুক্তি। এই বাসনাকে অতৃপ্ত রাখলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যদি তা' না হয়, তবে চিত্তকে বধ করাই হয়, তাকে মুক্ত করা হয় না। কামনার পরিতৃপ্তি ঘটলেই চিত্ত মুক্ত হয়। প্রবৃত্তির পরিপাকে নিবৃত্তি লাভই মুক্তি। গতানুগতিক ধারায় বিশ্বকবি চৈতালি'র একাধিক কবিতায় ভ্রান্তিই বলেছেন। পুণ্যের হিসেবে আর যেন এ্যাডেমের সাধু চিত্রগুপ্তের কাছে মুক্তি শুষ্কের হিসেব দেখতে চাইছেন। যৌবনে সাধু সংসারী ছিলেন, কাজেই তাঁর ঘরে কিছুই প্রত্যাশা করেন নি। যৌবনের খাতায় প্রচুর জমা দেখে সাধু চটে ওঠার চিত্রগুপ্ত বলছেন—

"বড় শক্ত বুকা
যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।"

তাঁর আর একটি কবিতায় গৃহী সংসার ত্যাগ করে চলেছে মুক্তির সন্ধানে। দেবতার দৃষ্টি কিন্তু তা' এড়ায় নি। তখন কবি বলছেন।

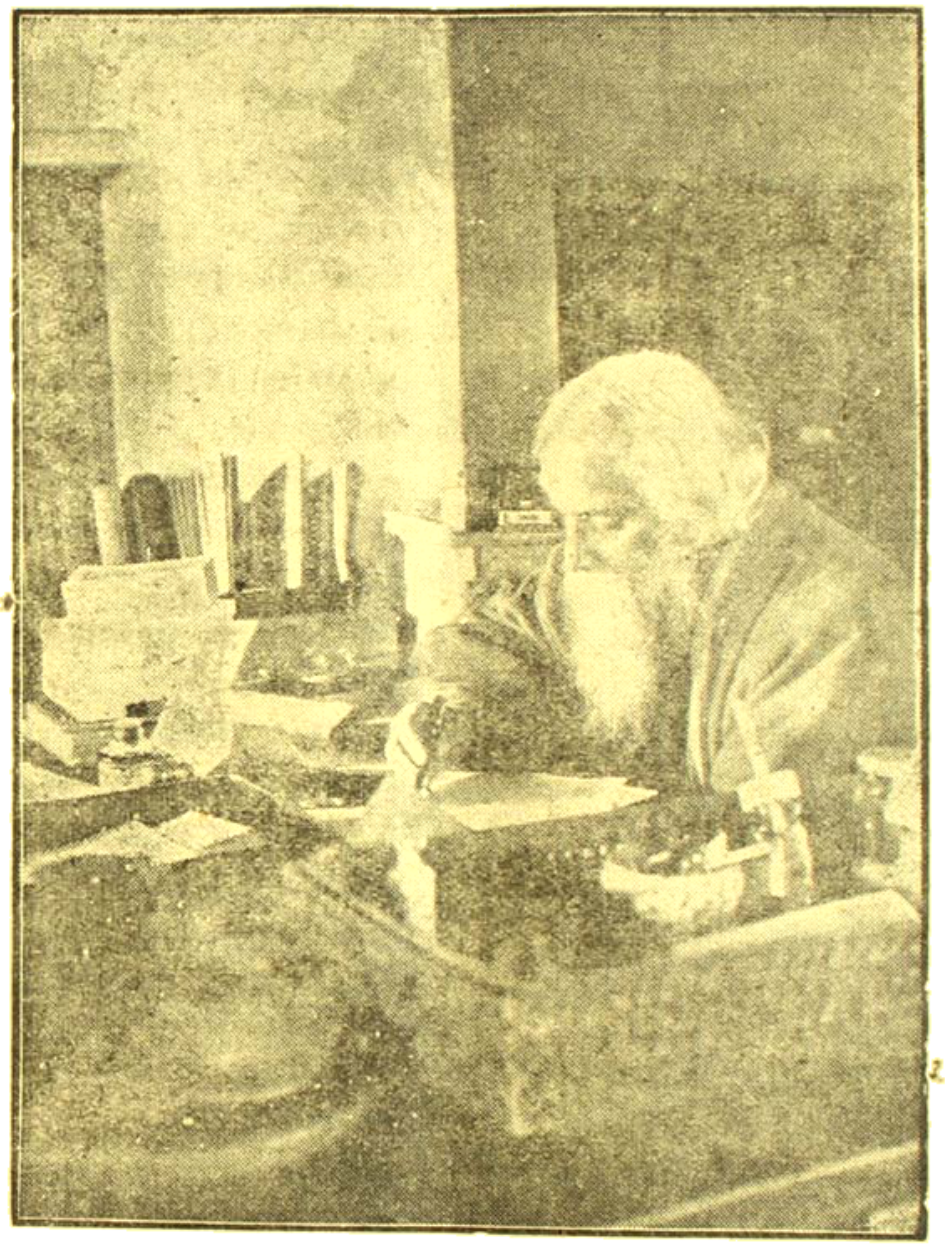

"দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"

যে প্রকৃত ভক্ত সে অনায়াসে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে চীবর পরে দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করে মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তি ভিক্ষুদের আহ্বান জানিয়ে লিখে ছিলেন।

"অকূলে রাতি ভিক্ষার কথা সঞ্চয় করে তারাতে
নিয়ে যে পারানি তবু পারিলনা তিমির-সিন্ধু-পারাতে।
পূর্ব গগন আপনার সোনা ছড়াল যখন ছ্যালোকে
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা প্রভাত পূরিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু হায় রে
আপন দ্বারের গোপন রাজারে
মন যেন তবে পায় রে।"

পরম কবিগুরু আরও তাঁর "মুক্তিতত্ত্ব" কবিতায় লিপিবিষ্ট করেছেন নিজের কয়েকটি পংক্তিঃ

"মুক্তিতত্ত্ব শুনতে গিরিশ তত্ত্ব গিরোমণির কাছে
হায় রে মিছে হায় রে মিছে।
শুনবি রে হায় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ্‌না চেয়ে
আলোক জাগায় নাচন গেয়ে
তারার নৃত্য শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যু রথে
নূতন প্রাণের যাত্রা পথে
জ্ঞানের মুক্তি সত্য সূত্রে নিত্য বোনা চিন্তাজালে।
আয় তবে আয় কবির সাথে মুক্তি খেলের গুঞ্জারাতে
জ্বলুলো আলো বাজুলো মৃদঙ্গ নটরাজের নাট্যতালে।"

কবি এখানে বলতে চেয়েছেন—কি জড়, কি জীব, কী তরু, কী মানব সকলেরই মুক্তি তার আত্মাভিব্যক্তিতে। তিনি তাঁর রচনার আর একটি জায়গাতেও উল্লেখ করেছেন।

"যায় রে শ্রবণ করি রব বর্ষ। কান্ত করি তার
কদম্বের রেণু পুঞ্জ পরে পদে কুঞ্জ বীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরিদিল। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্ত বৃষ্টি জ্যোতিঃ শুভ্রমেঘে মেঘে মুক্তির লিখন
আপন পূর্ণতা খানি নিখিলে করিল সমর্পন।"

আপন পূর্ণতাকে নিখিলের দ্বারে দ্বারে পরিপূর্ণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। শ্রাবণের পক্ষে যে কথা, কবির পক্ষেও সেই একই প্রযোজ্য। তিনি তাই আরও বলছেন।

"মুক্তি প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে,
যৌবন হয়েছে বন্দী বাল্যের দুর্গের অন্তরালে।
নটরাজ তুমি আজ করগো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে। পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণ ভঙ্গী ; রুদ্রেশ্বর সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে।"

এখানে কবি আচার বিচারের শত সংস্কার হ'তে শুদ্ধ, কুণ্ঠা, দ্বিধা, এবং তা' হ'তে যে মুক্তি, তাকেই আখ্যা দিয়েছেন মুক্তি। এ টুকু বলেও তাঁর মন পরিতৃপ্ত নয় তাই তিনি আরও একটি কথা উল্লেখ করেছেন

"নটরাজ আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি মন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডব তালে কর্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছান্দোবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সহজ যাবে খুলি।"

কবি সকাম কর্মের বন্ধন থেকে নিষ্কাম লীলার ভেতর যে মুক্তি উৎস নিহীত আছে, তাকেই বলেছেন প্রকৃত মুক্তি। "যাত্রার ডাক" রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সকলকে সম্বোধন ক'রে জানিয়েছেন।

"যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।
আজ ধরণী আপন হাতে,
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্র পুট।"

কবিগুরু নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা থেকে স্বভাব সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রাকৃত জীবনের মধ্যে চেয়েছেন দিব্য মুক্তি।

"বকুল বনের পাখিকে" আহ্বান করে নিলেন হৃদয় পিঞ্জরে। আপন ভেবে তাই তা'র সঙ্গে প্রাণের কথা ক'টি শুনিয়ে দিলেন।

"শুন শুন ওগো বকুল পাখি
মুক্তি টীকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে
খ্যাতির মুকুট খ'সে থাক্ নিঃশেষে।
কর্মের এই বন্ধ থাকনা কেঁসে
কীর্ত্তি থাকনা ঢাকি
ডেকে লও মোরে নাম হারাদের দলে
চিহ্ন বিহীন উদাও পথের তলে।"

এখানে তিনি কর্মের বন্ধন, খ্যাতি-যশের দায়িত্ব থেকেও চেয়েছেন মুক্তি। বোঝাই বন্ধন, সকল প্রকার বোঝা ফেলে দিয়ে জীবনকে হাল্কা করতে পারলেই মুক্তি-পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়। "কড়ি ও কোমলে"র শেষ রচনাটিতে তাই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন।

"মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে
আপন কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।"

তিনি বলেছেন কৃতার্থতাই জীবনের একমাত্র মুক্তি। কবির রচনা ভঙ্গী মনের আত্মাভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিপূর্ণ আত্মাভিব্যক্তির নামই শেষ কথা বলা—এতেই কবি মনের মুক্তি। কবির একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে একবার লিখেছিলেন—"আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এগুলি অর্থাৎ যৌবনের লেখাগুলি কেবল পরিত্যাজ্য হয়ে আসে। যদি যথেষ্ট কাল বেঁচে থাকি তা' হলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, যেখান থেকে আমাকে কেহ স্থান-চ্যুত করতে পারবেনা। দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠাতেই আসবে মনের মুক্তি।" তিনি "পরিশেষে"র মুক্তি নামক কবিতায় ভয়কেই বন্ধন এবং সাধনকেই মুক্তি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন আমাদের বাপুজী বলেছেন Fearlessness is virtue" নির্ভয় মনের মুক্তি যাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর ঘুর্ণী শ্রাবণ সন্ধ্যার পুষ্পবনে নিঃশেষ আনন্দের মধ্যে যে মুক্তি উপভোগ করে, মুক্তি পিয়াসী কবি সেই মুক্তিরই স্বপ্ন দেখে বলছেন।

"দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আজ বিস্মৃত শক্তি সহজে স্বপন।"

"সাবিত্রী" কবিতাটিতে কবি কৃতাঞ্জলী পুটে প্রার্থনা করছেন।

"তোমার দুতীরা আঁকে ভুবনে-অঙ্গনে আলিপনা
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যাক্ সরে'—
তেমনি সহজ হোক্ হাসি—কান্না-ভাবনা-বেদনা
না বাঁধুক মোরে।"

• • • প্রভাত-সন্ধ্যায় দিগন্তে ও নদী সমুদ্রে যে বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি হয় সেই বর্ণচ্ছটা যেমন মুহূর্তে জেগে উঠে আবার নিমেষের মধ্যে দিগ্-বলয়েতে বিলীন হয়ে যায়। আমাদের জীবনের কান্না, হাসি, ভাবনা ও বেদনা তেমনি ক্ষণিকের জন্য দেখা দেয়। যেন কোন তা'র স্মৃতি চিহ্ন না রেখে যায়, মনের পটে সেগুলির যেন কোন স্থায়ী রেখা ফুটে না থাকে। তাই সুখ দুঃখের নিবিড় বন্ধন ও মুক্তি চেয়েছেন। জীবনের যাত্রা পথে সহজ ও সরল প্রাণের স্রোতে অবিরাম ভাসাকেই তিনি স্থান দিয়েছেন গভীর ভাবে। নিজের প্রাণের কথায় তাই রচনা করলেন।

"সম্মুখে প্রাণের নদী তোমার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে যায় ছায়া আলো, মন্দ ভালো।"

• • •

তিনি আরও লিখেছেন।

"ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ-মিলন-গ্রন্থি-খুলিয়া খুলিয়া
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।
হে মহা পথিক!
অবারিত তব দশ দিক
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম
নাইকো চরম পরিণাম,
তীর্থ তব পদে পদে

চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।"

এই যে জীবনের বিরামহীন গতি প্রবাহের চলাফেরা সে তো কোন বিশিষ্ট মুক্তিতীর্থের উদ্দেশে নয়। নদী-ধারা যেমন তা'র প্রবাহের মধ্য দিয়ে মুক্তি পায়, কবি তেমনি তাঁর আত্মাভিব্যক্তির ক্রমোন্মেষ ধারার তরঙ্গে তরঙ্গে মুক্তি লাভ করতে চান। জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি, লয় উত্থান পতনের মধ্যে যে নিষ্কম্প শান্ত সমাহিত ভাব তিনি তা'কেও মুক্ত আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর মুক্তি-মন্ত্রের মহাকালের কাছে "শেষ সপ্তক" সৃষ্টিতে এই ভাবেই দীক্ষা চেয়েছিলেন।

"মহাকালের মত নির্ব্বিকার কে ?
মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি,
তোমার অতল স্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখরে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্র নৃত্য।
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্ররূপে
তুমি আছো অবিচল আনন্দে !
হে নির্দ্দয়, দাও আমারে ঐ
সন্ন্যাসের দীক্ষা
জীবন আর মৃত্যু পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি শিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে দাও আমাকে আশ্রয়।"

বিশ্ব কবি অন্ধ সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত দিবালোক চাইছেন। যৌবন-বল দৃপ্ত আগন্তুক মুক্তিদাতার পরিচয় দিয়ে তিনি বলে চলেছেন।

"বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার সৃষ্টি তাহার খেলা
দস্যুর মত ভেঙে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্য হীনের সোনা করিবার মত পরশ পাথর হাতে
আছে তার—
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।
বলো জয় জয় বলো নাই ভয় কালের প্রয়াণ-পথে।
আসে নির্দ্দয় নব যৌবন ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতার কাঁপন লাগুক লতায় লতায়
ঝর ঝর করি উঠুক ঝরণা প্রান্তরে পর্ব্বতে।"

স্নেহান্ধতা সন্তানকে যেন আগে বন্দী করে। এ জীবনে স্নেহান্ধতাই সবপ্রকার মোহের প্রতীক। ব্যক্তি-জীবনে যেমন সত্য, জাতীয়-জীবনেও তেমনি সত্য। কবি গুরু এই দুই জাতীয়-জীবন ও ব্যক্তি-জীবন সকলকেই চেয়েছেন মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে। রচনায় প্রকাশ করলেন মধুময় ছন্দ।

"যেমন করিয়া তারে আগ্রহ পরশে
জীর্ণ করি দিয়ে তারে লালনের রসে
মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
কেন এ ক্ষুধিত চিত্ত করিতে পোষণ,
দীর্ঘ গর্ভবাস হ'তে জন্ম দিলে যায়
স্নেহ গর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
নিজের সে বিশ্বের সে বিশ্ব দেবতা
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।"

এই ভাষার ও ভাবের ছন্দ দোলা দেয় অন্তরের মরলোকে। মনে জাগে এক অপূর্ব হিল্লোল। এ প্রতিবাক্যটি ঠিক যেন শচীদেবীর উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যের আবেদন। রাবেন্দ্রীক মতে এটিও আমরা স্নেহগ্রাসী-মুক্তি নামকরণ করতে পারি। তাঁর "বঙ্গ মাতা" কবিতাটি পাঠ করলেও আমরা উপরোক্ত ভাবের পরিচয় পাই। এই ভাবেই তিনি সমগ্র জাতিকে নব ভাবের পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই সেই জাতিকে দীক্ষিত করেছেন মুক্তি সাধনার অগ্নি মন্ত্রে। তিনি ধর্মকে সহস্র লোকাচার দেশাচার ও কুসংস্কারের নাগপাশ হ'তে, সমাজকে অন্ধ মোহজাল থেকে; জাত্যাভিমান, গতানুগতিকতা ও স্বার্থান্ধতা হ'তে, রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং স্বার্থের জটিলতা থেকে, ভাষাকে সংস্কৃতের ভ্রান্ত আভি-জাত্য থেকে, সাহিত্যকে চির প্রচলিত ধারা ও অনু-চিকীর্ষার বন্ধন হ'তে, গীতি কাব্যকে বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে সঙ্গীতকে কালোয়াতী শাসন হ'তে এবং কলা-বিদ্যাকে বৈচিত্র্যহীন চিরাচরিত আদর্শ হ'তে মুক্তি দেবার জন্য আজীবন ও আপ্রাণ সাধনা করেছেন।

কবিকবি যা'কে মুক্তপুরুষ বলে মনে করেন তাঁর আদর্শ দেখেছেন তাঁর শিশু কাব্যে এবং সরলতা জীবনের গতি প্রবাহে। কিন্তু মনে কখনও কুটিল-জটিল বন্ধনের বাধা পড়ে না। কারণ সে তো মুক্ত, আপন ভোলা, তাই সে আপন সৃষ্টিকে ধ্বংস থেকে ধ্বংস মাঝে অনর্গল মুক্তি দিতে পারে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে খেলনার শৃঙ্খল উন্মোচন করে স্বীয় খেলাকে বজায় রাখে। তাই কবি শিশুর মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করে লিখলেন।

"লজ্জাহীন সজ্জাহীন বৃত্তহীন আপনা বিস্মৃত
অন্তরে ঐশ্বর্য যার, অন্তরে অমৃত
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি পরে করে না অশুচি
নৃত্যের বিক্ষোভে যার সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।"

বিশ্বজয়ী কবি আপন সৃষ্টির বন্ধনকেও খুব বড় ও নিবিড় ও গভীর বন্ধন বলে মনে করেন। আমরা মর-জগতের জীব। তাই নানা প্রকার কামনা ও বাসনার উদ্রেক হয় মনে। আস্তে আস্তে জড় বুদ্ধি হয়ে পড়ি'। চিন্তা ও বিবেক শক্তিকে হারিয়ে ফেলি। তাই কবি অন্তরে আমাদের বুদ্ধির আরতি দীপালী জ্বেলে দিয়ে বলেছেন।

"বুদ্ধি দীপের আলো জ্বালি, হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি
বিসেব ক'রে পা-টিপে পথ হাঁটি
মন্ত্রণা দেয় কত জনা সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা
পদে পদে হাজার খুঁটিনাটি।"

এ বালাই শিশুর মধ্যে তখনও পূর্ণ মাত্রায় জেগে ওঠেনা। তাই তিনি আরও প্রার্থনা করছেন।

"বাল্য দিয়ে যে জীবনের আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক্ না তাহা সারা।
স্থলে জলে সঙ্গ আবার পাক্‌না বাঁধন হীন
ধূলায় ফিরে আসুক্ না পথ হারা।"

কবি কবি বাউল ছেলেদের মধ্যেও পেয়েছেন মুক্ত জীবনের সন্ধান। তাই তাদের ডাক দিয়ে বলেছেন;

"বাড়ী ফেরার তরে তোমায় কেউনা তাড়া করে
তোমার—নাই কোন পাঠশালা।
সমস্ত দিন কাটে তোমার পথে ঘাটে মাঠে
তোমার, ঘরেতে নেই তালা।"

বাউলের জীবন মুক্ত-সরলতাময়। কবি প্রতিভায় একটি বাউল-চরিত্রও ফুটে উঠেছে অপূর্ব স্নেহ সান্নিধ্যে। বাউলের মুখের মিষ্টি গান "তাইরে নারে না"—কবি হৃদয়ে দিয়েছিল অনাবিল তৃপ্তি ও গভীর আনন্দ। কবি উপলব্ধি করেছিলেন বাউলই জীবনের সকল বৃত্তি নিচয়কে মুক্তি দিতে পারে। রবীন্দ্র পরিচর্যায় যে কথা ক'টি আলোচিত হয়েছে, সব স্মৃতি চিহ্নগুলিই এই বাউলটির মধ্যে আমরা পূর্ণ বিদ্যমান দেখি। বাউল-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব রহস্য জানবার জন্য সেই রসাস্বাদ গ্রহণ করলেন কবিগুরু; জীবনের মধুময় ফাগুনে কবি জানতে পারলেন সে রসের গভীর তত্ত্ব। তাই ব্যক্ত করেছেন নিম্নের অংশটি।

"তা'রে নাহি বলি জল,
যা'তে নাহিক কমল,
চারু কমল সে নয়,
যা'তে মধুপ না রয়;
তা'রে মধুপ কে বলে
যেথা গুঞ্জন না গুঞ্জরে;
তা'রে গুঞ্জিত কে কয়,
যাহা মনোহর নয়।"

অর্থাৎ এটি একটি তথ্য পূর্ণ নীতি-গাথা। সে জলই জল নয়, যা'তে পদ্ম বিকসিত হয় না। সে পদ্মই নয়, যা'তে মধুকর মধু পানে মত্ত হয় না। সে মধুকরই নয় যে মধু গুঞ্জন করে না। সে গুঞ্জনই গুঞ্জন নয় যা' লোকের চিত্ত জয় করে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় জীবনের দুরূহ সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করেই কর্তব্য শেষ করেননি, পরন্তু তিনি সমাধানেরও ইংগিত দিয়ে-ছিলেন। কবি এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতিকে ধর্ম নির্বিশেষে এক মহাজাতিতে পরিণত করে বৃহত্তর মংগল সাধনা করতে হলে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত পাপ যা' জাতির প্রাণবায়ুকে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে, তা'কে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিতে

চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আমাদিগকে স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ, আজ রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী কাযে পরিণত হলো। ভারত বিচ্ছিন্ন চারিদিকে হয়ে নরতাণ্ডবের সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের দাবাগ্নি ধূ ধূ করে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। দিকে দিকে নররক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো বিশ্বমাতৃর অঞ্চল। যে নারী ধরণীর গৃহলক্ষ্মী—আজ তাঁদের দুঃখ-দৈন্যে, লাঞ্ছনা-ধর্ষণের করুণ আর্তনাদের অশ্রুজলে বসুমাতা স্নাত হয়ে উঠলেন। ওঃ, কি কঠোর তাঁর প্রাণ! নারীর এক বিন্দু অশ্রুজলে সারা সংসারের অমঙ্গল ঘটে যায়, কিন্তু আজ একবারে নিঃস্ব, রিক্ত সর্বহারা লাঞ্ছিতা আবালবৃদ্ধবনিতার দিকে যদি দেবতা দৃষ্টিপাত করেন, তবে সত্যিই তাঁদের কঠোর প্রাণ কারুণ্যে বিগলিত হয়ে উঠবে। পাষাণ দেবতা এখনও কি নীরবে চুপ করে রইবেন কলঙ্কিত বেদী মূলে?

এ সমস্যার সমাধান একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন। বিশেষ যুগে, বিশেষ কালে, এই সকল মনীষী বা ইষ্টের জন্ম ঘটে থাকে। তাই আমাদের প্রয়োজন এখন এক নূতন কর্মী ইষ্টের। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন দেশের দুর্দমনীয় যুব-শক্তি। তাই দেশের জন্যে তরুণদিগকে আহ্বান করে কবিগুরু বলেছিলেন।

"ওরে সবুজ ওরে অবুঝ • • •
শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামী তুই আয়রে চুরার ভেদী।
ঝড়ের মাতাল বিজয় কেতন ওড়ে
অট্টহাস্যে আকাশ পানা ঘেরে
ভোলানাথের ঝোলা ঝুলি কেড়ে
ভুলগুলি সব আনরে বাছা বাছা
আয় অশান্ত আয়রে আমার কাঁচা।"

জীবনে সংগ্রাম পথে যুবকদিগের সম্মুখের সুবিস্তৃত কর্তব্য ও সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে। সেই অজানা পথকে খুঁজে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হতে হবে। অশান্তির মাঝে নিয়ে আসতে হবে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। এজন্য চাই ত্যাগ, চাই সংযম, দুঃখবরণ। পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন কবিগুরু। এখন তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত ব্যাকুল আবেদনকে সার্থক করে তোলবার ভার আমাদের ওপর।

পঁচিশে বোশেখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ। আমাদের আড়ম্বর করে তাঁর জন্মতিথি পূজা করা তখনই সার্থক হবে—যখন তাঁর জ্ঞানলিপ্সা, কর্মশীলতা, মহাপ্রাণতা ও উদার জীবন-দৃষ্টি আমাদের জীবনের মধ্যে বস্তুগত রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের কাছে এক অনবদ্য সাহিত্যের চিরনব বিপুল ও বিচিত্র ঐশ্বর্য সম্ভার রেখে যান নি, তার চেয়েও মহত্তর সম্পদ আমাদের কাছে তিনি রেখে গেছেন, সে সম্পদ তাঁর সুমহান বিচিত্র জীবন—যে বরেণ্য জীবনের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মানবতা, মহত্ত্ব ও মুক্তি সাধনার একটি জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সেই দৃষ্টান্তকে আমাদের প্রতিপদে স্মরণ করতে হবে। তবেই আমরা তাঁর স্বদেশবাসী ও স্বজাতি বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করতে পারবো। আজ পঁচিশে বোশেখ তাঁর জন্মবার্ষিকীর দিনে সমস্ত অন্তরে আমাদের এই মহাব্রতকে গ্রহণ করতে হবে। সেই ব্রত যা'তে সর্বতোভাবে সফল ও সার্থক হয় সেই জন্য কবিগুরুর জন্মদিনে চির জ্যোতির্ময় রবির দিব্যসত্তার উদ্দেশে ভক্তিপ্রণতঃ শিরে আজ আমরা তাঁরই তাঁথাতে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নীয় তেজে বলীয়ান হয়ে উঠবো।

"রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
দৈন্যের মাঝে আছে যেই ধন,
যৌনের মাঝে করিছ গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিও,
ভিক্ষা বসন ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়॥"

কাব্য সাধনায় কবি কুমুদরঞ্জন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ; কবিকঙ্কন

আমাদের কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের যাঁরা বিশিষ্ট প্রতিভূ, আমার জীবনের ছায়াতরা গোধূলি-বেলায় তাঁদের অনেকেই চিরদিনের মত আমাদের ত্যাগ করে চলে গেছেন, যাঁরা আছেন আজিকার শূন্য অন্ধকারে তাঁদেরই প্রদীপ আমরা তুলে ধরবো, তাঁদের আলোর নির্দ্দেশে হবে আমাদের পথ চলা। কবি কুমুদরঞ্জনকে তাই আমাদের প্রয়োজন আছে, হয়তো তাঁদের নেই যাঁরা রসের ক্ষেত্রে বিদেশী কমলালেবুর চারা নিয়ে এসে ভিন্ন মৃত্তিকায় পুঁতে গোড়া লেবু ফলিয়ে তাকেই কমলালেবু পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। মাটির সঙ্গে যে কবির নিবিড় যোগ আছে, মাটির মায়া তারই ওপর চিরদিন থাকে। কবির ওপর দেশমাতৃকার মৃত্তিকার তাই এত মায়া ! কবি উষ্ট্র বাঘাম্বর যেব্রহীন, পিরামিড মোনালিসা, মসলা দ্বীপ, পাইথন নিয়ে যদি ভাবের ঐন্দ্রজালিক খেলা ছন্দের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে আমাদের মত মূর্খ লোককে দেখাতেন তা হোলে আজ এত জনপ্রিয় ও সর্ব্বজন বন্দিত হতে পারতেন কিনা তা বিতর্কের বিষয় হোয়ে থাকতো—কবির জয়ন্তী দিনে জয়মাল্য ও শুভেচ্ছার শুভ চন্দন দিয়ে এঁকে বরণ করবার সময় এই সব কথা মনে পড়ছে।

জীবনের লাবণ্য প্রভাতে যে সময়ে প্রথম কথা গেঁথে গেঁথে গানের সুরে ছন্দের মালা রচনা শুরু করি সে সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে ভাব জগতের রাজরাজেশ্বর—সারস্বত লোকের মহানায়ক। সেদিন বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় অবগাহন করবার সামর্থ্য ও শক্তি ছিল না। তাঁর কাব্যের রূপ ও স্বরূপ বুঝবার মত পরিবেশ তখনও আমার পক্ষে রচিত হয় নি, অবশ্য এখনও যে তাঁকে সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছি এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমি আজও চেয়ে আছি বিস্ময়ে কবিগুরুর বিরাট প্রতিভার মহাসিন্ধু পানে মুগ্ধ ভক্তের মত।

জীবনের যে সুন্দর প্রভাতের দিনগুলি হারাতে হারাতে আজ গোধূলিবেলার অশ্রুবর্ষণ মুখর দিনে এসে পৌঁছেছি সেই দিনগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার স্বপ্নমেদুর কল্পনার যাত্রা-মঙ্গল আর বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমার অন্তঃপ্রকৃতির যোগাযোগ—সেদিনের পথচারী আমি অভিভূত হয়েছি যাঁদের কাব্য পাঠ করে, রসসিক্ত হয়েছি যাঁদের রসোত্তীর্ণ রচনা আস্বাদন করে কবি কুমুদ-রঞ্জন তাঁদেরই একজন।

আমার স্বপ্নের তরঙ্গে এঁর কত কবিতাই না পূজার কুসুমের মত ভেসে গিয়েছে চিত্তের ঘাট থেকে হৃদয়ের ঘাটে—আজও মনে পড়ে গ্রামের তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তে বসে কত না মৌন সন্ধ্যায়, কত না বিজন রাত্রে গেয়েছি কবির গান খানি—

'এখনও সেই চিতার প'রে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি যার
দেয়রগো ব্যথা সকল কাজে
মাঝি ! তরী হেথা বেঁধো নাকো
আজকের এই সাঁঝে—'

সে সময়ে আমার আগ্রহ পাল মেলে অপেক্ষা করে-ছিল অনুকূল হাওয়ার জন্যে যদি কোনদিন কবি-সান্নিধ্য ভাগ্যে ঘটে। সারা জীবন ধরে যাঁর কাব্য সাধনা দুর্গম এক পল্লীতে, মাধ্যমিক ছাত্রাবাসেই কেটে গেল যাঁর জীবনের অধিকাংশ দিনগুলি তাঁকে পাওয়া তো সহজ-সাধ্য নয়, তাই এঁর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ আমার পক্ষে এসেছে আমার জীবনের মধ্য পথে। অজয় ও কুনুর নদের সঙ্গমস্থানে মাটীর ঘরে মাটির মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যে কবি পল্লীর মায়ের স্নিগ্ধ অঙ্কে বসে রাত্রিদিন ভাবের বেণু বাজাচ্ছেন সে কবির দান সামান্য নয়। কাব্যের ক্ষেত্র হৃদয়—মস্তিষ্ক নয়। মস্তিষ্কেন্দ্রিক কাব্য রচনার পদ্ধতি সাম্প্রতিক দিনের কবিদের ভেতর সংক্রামক ব্যাধির মতই দাঁড়িয়েছে ; ফলে এঁদের অত্যাধুনিক অভি-নবত্বের দৌবারিকতা গণ-অন্তরের রসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শ্রী ও শ্রীর আবরণে বাঙ্ময় বিশুদ্ধতা দিয়ে বাংলার

কাব্যলক্ষ্মীকে সাজাতে পারেনি—নানা চর্চাকেন্দ্রে নানা রকমের কবিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করবার বিষয় মনন-শীলতার আধিক্যে ভারাক্রান্ত হলে কবিতা মর্মস্পর্শী হয় না। কবির নির্জন মনোমণ্ডলে যে ঘটনাই ঢেউ তুলুক না কেন, তা যেন কবি চিত্তের ভেতর দিয়ে পাঠক চিত্তের ভেতর গভীর রেখাপাত করে। কবি কুমুদরঞ্জনের 'উজানি' 'তুরুক' 'শতদল' 'বনমল্লিকা' 'বীথি' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে তাঁরা জানেন দেশের সাংস্কৃতিক বনিষ্ঠ ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই ইনি বাঙালীর মনের মত করে কবিতা রচনা করেছেন। কোথাও খণ্ড খণ্ড পল্লী শ্রী, কোথাও মানুষের সুখ দুঃখের কথা, কোথাও ভক্তি ও ভাগবতের তত্ত্বগত অভিব্যক্তি, কোথাও বাংলার গৌরবময় বিগত দিনের চিত্রাবলী, কোথাও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় নৈকট্য, কোথাও আমাদের 'ছন্নছাড়া সভ্যতার বক্রগতির ওপর কটাক্ষপাত আমাদের অন্তরকে কিছুক্ষণের জন্যে আবিষ্ট করে রাখে। ছাত্র জীবনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সুইনবার্ণ প্রভৃতির কিছু কিছু কবিতা পড়ে নেবার চেষ্টা করেছি, সে সময়ে মনে হয়েছে আমাদের কবি কুমুদরঞ্জন এঁদেরই স্বগোত্রীয়। 'লি হান্টের' আর বেন এ্যাডাম বা কোলরিজের রাইম অব দি এনসেন্ট মেরিনার এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে কবির শ্রীধরের প্রতিপাদ্য বিষয় যেন তুলনা মূলক সমালোচনার বস্তু হ'য়ে আছে। শ্রীভগবান যে নিকৃষ্ট মৌন মূক প্রাণিগণের মধ্যে রয়েছেন, সবার সঙ্গে আছেন আমাদের দেহের ভিতরে অন্তরের মত অবিচ্ছিন্ন তাই ফুটে উঠেছে এরই মধ্যে। শ্রীভগবানের মহিমা ভক্তকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় কবি তা ব্যক্ত করেছেন শ্রীধর কবিতার উপসংহারে—

দাঁড়ে দুইজনে বসে যোগাসনে ঘুরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আদি-ভব মুকুতার মালা—'

কবিতার এই শেষ দুই ছত্র গভীর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ, এখানে কবি ভাব-সমাধিস্থ হয়েছেন। কবি পরম বৈষ্ণব হয়েও 'কাপালিক' কবিতার ভেতর দিয়ে শাক্তপদীদের সাধনার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন,—ষোড়শবর্ষীয় কাপালিকের শ্মশান সাধনার ভিতর দিয়ে মহামায়ার লীলারহস্য ও মায়ের অন্তর্গূঢ় বাণী ব্যক্ত করেছেন। তাই দেখ্‌তে পাই কাপালিকের আরাধ্যা জননী তার হাত দুটি ধরে বল্‌ছেন—

'ব্যর্থ নহে তোর পূজা দেব গ্রাহ্য সার্থক সুন্দর
প্রীতা আমি উঠ বৎস, লও নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
স্নেহ-প্রেম প্রীতি হীন কর্কশ কঠিন কারাগার
হয়না হয়না কভু দেবতার বিলাস আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস যে পারে ভুলিতে
বিশ্ব জননীর স্নেহ সে কখন পারেনা লভিতে।'

এম্নিভাবেই কবি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন জীবন-পুরোহিত হিসাবে।

কবির সদ্য প্রকাশিত 'স্বর্ণ সন্ধ্যা' কাব্য গ্রন্থখানি পড়ে অভিভূত হয়েছি, এর ভেতর দিয়ে মুদ্রিত হয়েছে বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার সমগ্র রূপ, এর ভেতরই রয়েছে ভগবৎ প্রেমের ভাবতন্ময়, এর ভেতরই লক্ষ্য করেছি মানুষ এবং প্রকৃতি প্রেমের পরম স্বাক্ষর। গ্রন্থের সূচনায় কবি নিজের কথা বলেছেন—

'মেলা দেখা শেষে, পুরবীর সুরে
সন্ধ্যা আসিছে ভাসি
মহুয়ার কাঁধে চেপে ফিরে যাই
বাজাতে বাজাতে বাঁশী।'

জীবনের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের ভেতর রহস্যময় অতিপ্রিয় ভাবলোকের সত্তার অনুভূতি ব্যঞ্জনার সাহায্যে রসঘন হ'য়ে উঠেছে, অথচ লেখা হয়েছে প্রাঞ্জল ভাবে, মনে এই কয়েকটি কথা কতখানি গভীর রেখাপাত করে তা যাঁরা রসিক তাঁরাই বুঝ্‌তে পারেন।

'একটি গ্রাম' কবিতার ভেতর কবি-সত্তাটীকে দেখ্‌তে পাই বেদনার গানে—

'ভালবাসিতাম উদার আকাশ
উদার মাঠের দাওয়া
বন বিহগের সাথে তাল রেখে
রাখালের গান গাওয়া।
ভালবাসিতাম চেয়া তরু তল,
ডাক দিত যেন ছায়া সুশীতল

নিতি অকারণ আনন্দে সেই
অজানার পথ চাওয়া।'

কবির 'ভৃত্য' কবিতায় চিরন্তন ভৃত্য ফুটে উঠেছে অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন—

কৃত্তিবাসের 'পাদুকা' বয়েছি, ধোয়ায়েছি পদ' আমি
মোর হাত হ'তে হরিতকী লন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের খেড়ার বাখারি আমিই এনেছি বহি
মহামায়া এলো কল্পা সাজিয়া দেখিয়াছি দূরে রহি।
ধনী মহাজন রাজা মহারাজা হিংসা করিলে কারু
গর্ব আমার বিদ্যাপতির বয়েছি গায়ছা গাত্র—'

বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতিভাকে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম সম্ভব নয়। সীমার মধ্য দিয়ে ইনি অসীমের সাধনা করেছেন, মানুষের মধ্যেও দেখেছেন শ্রীভগবানকে, তাঁর কাব্য প্রতিভার বিরাট মহীরুহের মূল ভাগবৎ প্রেমের রস পান করে সাম্বত হয়ে আছে। কবি সাম্প্রতিক কবিদের মত কোথাও বলেন নি—

'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসংগতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়ার ফুল—
নামুক মহুয়ার গন্ধ—'

এরূপ বিশিষ্ট বাক্ ভঙ্গিমা ও শব্দ বিন্যাসের সঙ্গে বাংলার মাটীর কোন যোগাযোগ নেই, বাঙ্গালীর কাণেও বাজে বেতালা সুর—এ শ্রেণীর কবিরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যের প্রভাব মুক্ত বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, এঁদের প্রচার-পত্রীরা এঁদের পথের বাধাকে অপসারিত করবার জন্যে এক একটি সহীদও হোতে পারেন কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে যখন বিচার হবে তখন এসব মেকী রচনা এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা উধাও হয়ে যাবে, থাকবে শুধু বেঁচে কুমুদরঞ্জনের মত কবি যাদের পশ্চাতে রয়েছে জাতির, সমাজের, দেশের বিশিষ্ট ঐতিহ্যের পটভূমিকা। কবি দুঃখ করে বলেছেন—

এত জীবনের স্নেহ প্রীতি ধারা
দেখি বুকে ব্যথা বাজে
যতনে লালিত এ তুচ্ছ কুসুম
লাগিল না কোনো কাজে?
সুরভিত করি দেব মন্দির
সাজলোনা পূজা থালা,
রহিল কেবল কৌটায় তোলা
ক্ষীণ কর্পূর মালা।
হোলোনাক পাঠ হোলোনাক গীত,
বারেক হোলো না খোলা
স্নেহের ডোরেতে জড়ালো এ পুঁথি
'তাকে'ই রহিল তোলা।

কবির আক্ষেপোক্তির কোন কারণ নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি যতদিন বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙালী জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন তাঁর পুঁথি তাকে তোলা থাকবে না, শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা পাঠ হবে। কবি শ্রীভগবানের লীলা সাধক হ'য়ে সহজাত কাব্য প্রতিভা নিয়েই এই দেশে জন্মেছেন, এদের তরু কিশলয়ের সঙ্গে চির সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, এদেশের ধূলি পবিত্র মনে করে নিত্য অঙ্গে মেখেছেন। এদেশের পুরুষানুক্রমিক ভাবধারাকে বাংলার কাব্য ক্ষেত্রে বহমান করে সোনার ফসল ফলিয়েছেন, এদেশের প্রকৃতিকে এদেশের মানুষকে ভাল বেসেছেন, এদেশের আচার ব্যবহার ধর্ম সব কিছুই কবির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে রয়েছে। কবি মহাসিদ্ধ পরম ভাগবত।

আজ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির অতি দুর্দিন। নিঃসঙ্গতার দুর্গ-চূড়ায় বসে বিশ্বতার আবেষ্টনে বিশেষ ভাবে তা লক্ষ্য করছি। জানিনা ভাবী দিন আমাদের জন্যে কী দুঃসংবাদ বহন করে আনছে! বৈষ্ণব কবিদের সাধনা প্রসূত বাঙ্গলা ভাষার সম্মুখ থেকে যদি কালো ছায়া মুছে যায় বৈষ্ণব কবিকুলতিলক কুমুদরঞ্জনের মত কবিরাও চিরদিন বিশ্ব বরেণ্য হয়ে থাকবেন।

বুদ্ধের জন্ম

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ
বিশ্বে আলোর করণা খুলে দিয়েছে—
গগন থেকে গহণ বনেও
তা ছড়িয়ে পড়ছে ॥
শাক্য-রাণী মায়া
প্রকৃতির এই উৎসবের রাতে
পিতৃগৃহে চলছেন।
চাঁদের আলোর সাথে সাথে
দেব, কিন্নর অপ্সরাদের
অভিনন্দন তাঁর শিরে ঝরছে ॥
মানুষ তখনও জানে না
আজ কিসের উৎসব,—
মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
কিন্তু জেনেছে,
বনের পশুপক্ষী,
বনের লতাতি ;
আর জেনেছে,
আকাশের তারা,
চাঁদের জোছনা ॥
অযোধ্য মানব—
রাণীর সঙ্গে চলেছে
তাঁর পিতৃ গৃহে—
কেউ বা আগে,
কেউ বা পিছনে
কেউ বা যান-বাহক হয়ে ॥
লুম্বনী উদ্যানে, সবাই ক্লান্ত।
বিশ্রাম ক'র, আবার যাত্রা সুরু হবে ॥
কিন্তু আর এগিয়ে যাওয়া হ'ল না,—
শাক্য-রাণী মায়াদেবী
কুক্ষিদেশে বেদনা বোধ করছেন ॥
রাণী বেদনায় কাতর ;—
তার মধ্যে ও
এক সুখ স্বপ্নের কথা মনে জাগল।
দশ মাস পূর্ব্বে
স্বপ্ন দেখেছিলেন—
তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে,
শ্বেত হস্তী রূপী বুদ্ধদেব
তাঁর পুত্ররূপে প্রবেশ করছেন।
তখন অন্তরীক্ষে দেবগণ
উৎসব করছিলেন ॥
আজও সে উৎসবের ধ্বনি
আমার কানে বাজছে।
চোখের সামনে
আমার উৎসবের মেলা বসেছে।
প্রসব-বেদনা-কাতর রাণী
সব শুনছেন
সব দেখছেন—
দেব বালাদের আনন্দ,
বজ্রপাণির উল্লাস,
ব্রহ্মার সিদ্ধ আশিষ ॥
শালতরু শাখা ধরে
রাণী দাঁড়ালেন ;
তাঁর মহাপ্রজাপতি ও পরিচারিকাগণ
সবাই পরিচর্যায় ব্যস্ত ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজছে
আর বাজছে বীণা, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
অন্তরীক্ষে এক দিকে দেবরাজ
অপর দিকে দেব-পিতামহ ব্রহ্মা।
মহাপ্রজাপতি ও পরিচারিকাগণ
দুপাশে উৎকণ্ঠিত দাঁড়িয়ে আছে।
আর স্বয়ং দেবরাজ
শুভ্র বস্ত্র খণ্ড ধ'রে আছেন
নব-জাতকে ধারণ করার জন্য।
মাতৃ কুক্ষি ভেদ করে
দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা নিয়ে

প্রভু বুদ্ধ অবতীর্ণ হলেন।
পাতুর পদস্পর্শে
পৃথিবীর সমস্ত কঠোরতা
বিদূরিত হ'ল—
তার গায় গায়
প্রতি পদ চিহ্নে
ফুটে উঠল কমল দল।

ঠিক সেই মুহূর্তে
ঋষি অসিত জেনেছিলেন
এক বুদ্ধ অবতীর্ণ হলেন।

আর,—ঠিক সেই মুহূর্তে
গৌতম ভৃত্য ছন্দক
ও অশ্বরাজ কণ্টক
পৃথিবীর কোলে এল—
বুদ্ধজীবনের
চির সহচর রূপে।*

* কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরে ভগবান বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি আছে; তার ১২ নং মূর্তি বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে। সেই মূর্তি অবলম্বনে এই গল্প কণা লিখিত হ'ল।

দ্বিজেন্দ্র স্মরণে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ওগো দ্বিজরাজ, স্মরি তোমা আজ।
তোমার জ্যোছনা হাসি—
একদা দেশের অশ্রু মুছালো,
ঘুচালো আঁধার রাশি।
বিস্ফুরিলে মায় বীরের বক্ষ—
শোনিত—লোহিত রাগে,
তব সঙ্গীত শ্রুতিমূলে তাঁর
কুণ্ডল হয়ে জাগে।
গড়ি' মঞ্জীর কনক জীবনে
পরালে বঙ্গ মাতার চরণে
তোমার কণ্ঠ কম্বুর নাদে
জাগিল বঙ্গবাসী।
আগায়ে হাত মৃত কল্পের
পাণ্ডুর ম্লান মুখে
গহন কাননে ফুটালে কুসুম
কাঁটার বোঁটার বুকে।
ফুটায়ে কমল গরল সায়রে
বসালে বাণীরে তুমি তার 'পরে।
ওগো নটবর সৃষ্টির কূলায়
বাজালে মোহন বাঁশী।

ক্ষমা করো

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়

ক্ষমা করো তবে যদি কোনদিন চেয়ে থাকি আনমনে
তব বিনম্র ললিত নয়ন পরে,
যদি কোনদিন তব মুখখানি একলা কমল সম
ফুটে থাকে মোর এই হৃদিখানি ভরে।
ক্ষমা করো, যদি অবসর ক্ষণে তোমার মূরতি আঁকি
তব রূপ হেরি মোর চারি পাশে ভুলে,
যদি কোনদিন কবরীভ্রষ্ট একটি কুসুম আমি
তব অগোচরে নিয়ে থাকি কভু তুলে।
ক্ষমা করো মোরে, কোন দিন যদি সুমধুর তব ছোঁয়া
মোর বুকে কভু সুর ঝঙ্কারে বাজে,
যদি কোন দিন খুশী হয়ে থাকি হেরিয়া তোমারে
সহসা গোপনে লজ্জিত হ'তে লাজে
ক্ষমা করো আজি। প্রবাসী পথিক সংসার ভোলা আমি
তোমার সে ক্ষমা অন্তর যদি দহে,
করিব গ্রহণ তব প্রসন্ন সুন্দর মুখ খানি;
সকল দেওয়া যে সকল দহন সহে।

কোন অপ্রত্যাশিত কাহিনী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঘুরে ঘুরে আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে চলেছে সাইকেল রিক্সাটা, ষ্টেশন থেকে অনেক খানি পথ, চেনা চেনা তবু ঠিক মনে পড়ছে না সাহুর। বিস্মৃতির প্রলেপ পড়ে গেছে মনের উপর। তবু মনে মনে অনেকখানি উৎসুক হয়ে উঠছে সাহু।

খোকাকে কোলের উপর বসিয়ে রেখেছে কিন্তু শান্ত হয়ে থাকতে চাইছে না খোকা। এমন বিচিত্র দৃশ্যাবলি কখনো চোখে পড়েনি ওর। সাইকেল রিক্সায় ও চড়েনি কোন দিন। চার বছর বয়স ওর। চার বছরের ছয়ন্ত শিশু

সাহুর মনটা ক্রমশঃ অস্বস্তিতে ভরে উঠে। কোথায় যাচ্ছে সে, কেন, কেন যাচ্ছে? কি দরকার? সরোজদার পরিত্যক্ত বাড়ীতে তাকে কে চিনবে এখন; সেই বা কি পরিচয় দেবে সেখানে?

তিন মাস আগে মারা গেছেন সরোজদা। নূতন একটা ঘটনার মতোই কথাটা হঠাৎ মনে পড়লো সাহুর। কিন্তু আর কিছু ভাবতে পারলোনা, কোন অনুভূতিকে লালন করতে পারলো না। শুধু তার মনে হলো তিন মাস আগে আসা উচিৎ ছিল।

মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে উঠে সাহু। সরোজদা খবর দিয়েছিলেন অসুখের কিন্তু তাকে আসতে কোন অনুরোধ করেননি, অভিমান করে সেও সেদিন এলো না। কিন্তু কি ভুল করেছে সাহু, কি ব্যাপক আর বিরাট অনুতাপকে বহন করতে হচ্ছে মনে মনে।

সাইকেল রিক্সাটা ক্যাঁচ করে একটা শব্দ করে থেমে গেল। হ্যাঁ, বাড়িটা ঠিক তেমনি আছে। এই ত দক্ষিণ মুখী প্রবেশ পথটা। আর এই ত সেই পুরান তেঁতুল গাছ। ঠিক তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে। সাহু চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল।

ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে খোকনকে কোলে করে আস্তে আস্তে গেটের ভিতর ঢুকল সাহু। পা দুটো অসাড় হয়ে আসছে। কেমন একটা অবসাদে সারা শরীরটা যেন ভেংগে পড়ছে ওর, কি পরিচয় দেবে ওর, আসার কি কৈফিয়ৎ দেবে?

আরও একটু এগিয়ে প্রায় চোখের উপর পড়লো একটা সাইনবোর্ড। দাঁড়িয়ে পড়ল সাহু। সরোজদার নতুন স্কুলটা তাহলে ওর বাড়ীর মধ্যেই করে ছিল। কিন্তু এখন কি চলছে ওটা, কারা পড়ায় সেখানে।

দাঁড়িয়ে পড়লো সে। মনটা আবার ভারি হয়ে আসছে। চোখ ঘুরিয়ে একদিকে তাকিয়ে রইল। পুরান ঘরগুলি চোখে পড়ছে ওর, ঠিক যেন আগের মতই আছে। তেমনি নির্জন তেমনি ছায়াঘেরা।

খোকন নামবার জন্য চেষ্টা করছে। সাহু আবার হাঁটতে লাগলো বড় বাড়িটার পাশেই স্কুল ঘরটা। সাহু চিনে এ'বাড়ি। সরোজদার বাবার বৈঠকখানা ছিল এটা। সাহু আবার দাঁড়ালো।

"কাকে চান আপনি?" সাহু চোখ ফিরিয়ে দেখলো, চাকর গোছের একটা লোক, স্কুলের দপ্তরি হবে বোধ হয়। ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা। বিব্রত বোধ করলো সাহু, ঠিক ভেবে পেলো না কাকে ওর চাই।

"হেড মিষ্ট্রেসকে চাই আমি"—যেপরোয়া ভাবে বললো সে। "আসুন আমার সঙ্গে" বিনীত ভাবে বললো লোকটা। "খোকাকে আমার কাছে দিন।"

"না, না, আমার কষ্ট হচ্ছে না।" লোকটার আন্তরিকতা আরও বিব্রত করে দিল ওকে। ওর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

স্কুলের দোতালায় উঠে এলো সে। লোকটা দেখিয়ে দিল হেডমিষ্ট্রেস এর ঘরটা। বললে "যান, উনি ভিতরে আছেন।"

সাহুর পা ধরে আসছে কিন্তু লোকটার দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। সে হেড্‌মিষ্ট্রেসের ঘরেই ঢুকে পড়ল!

আশ্চর্য হয়ে গেল সাহু। বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে, তারই বয়সী, হয়ত বা ছোটই হবে।

"কাকে চান আপনি?" মেয়েটি নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো। অপূর্ব দুটি চোখের দৃষ্টি, এত মিষ্টি, এত মধুর, এত অন্তরংগ হাসি হাসি মুখ। যেন ওকে বুঝতে পেরেছে মেয়েটি। "আপনার সংগে একটু দরকার আছে।" সাহু কোন রকমে বললো। সামনের চেয়ার-টাতে বসলো সাহু। খোকা নেমে গেছে কোল থেকে, কিন্তু দুষ্টুমি করতে সাহস পাচ্ছে না। কেমন বোকা হয়ে গেছে খোকা। সাহু চুপ করে ভাবছে। "আপনিই সাহু দিদি না?" মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল। "কেমন করে চিনলেন আমাকে?" বিস্ময়ে সাহুর চোখ দু'টী বড় হয়ে উঠল। চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। সাহুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসলো। "আমি চিনি আপনাকে।" সাহুর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো। "এসো, খোকা, আমার কাছে," খোকাকে কোলে নিয়ে ফেললো মেয়েটি। বললে, "শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন? কত ভেবেছি আপনি আসুন। একবার যেন দেখতে পাই আপনাকে কিন্তু ডাকতে সাহস হয় নি কোনদিন।" "কি করে জানলেন আমার কথা?" সাহু আবার আগের প্রশ্নই করে বসলো।

ওঁর কাছে শুনেছি আপনার কথা।" দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখান মেয়েটি। সরোজদার ছবি। সাহু দৃষ্টি ফেরাতে পারলো না। কেমন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো সে, প্রাণপণে কান্না দমন করতে লাগলো। "চলুন বাসায় যাই। আপনার বিশ্রাম দরকার।" খোকাকে কোলে নিয়ে চলবার উদ্যোগ করলো মেয়েটি। "বাসা মানে?" প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় ছিল না সাহুর। "মানে, আমার বাসা।" কাছে এসে দাঁড়ল মেয়েটি। বললে "এত প্রশ্ন করছেন কেন? না হয় আমাকে আপনার ছোট বোনটি মনে করলেন।" না হেসে থাকতে পারল না সাহু, ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে সাহু। বললে—"তোমার নাম ত জানিনে ভাই।" "তাপ্তী।" হাসে মেয়েটি। "আমি কিন্তু তোমাকে আর ছাড়ছিনে। এত দিনে আমার সন্ধান হলো তোমার।"

"অনেক আগেই আসা উচিৎ ছিল বোন।" সাহুর মনটা দুঃখে ভরে উঠে। "তাহলে আজ কান্না চাপতে এত কষ্ট হত না। "কাঁদতে নেই দিদি।" কেমন বিচিত্র হাসি হাসে তাপ্তী। "কাঁদব কেন আমরা।" খোকার মুখে চুমু খায় সে। বলে "এখন চলো ত; খোকার খিদে পেয়েছে।"

তাপ্তীর ঘরে এলো সাহু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, সাধাসিধে ভাবে সাজান সাহুর মন স্মৃতিতে ভারী হতে থাকে। সরোজদার মার ঘর এটা। ছেলে বেলায় কতবার এসেছে সে। "তুমি এ ঘরে থাকবে দিদি।" তাপ্তী বলে। "কোন অসুবিধা হবে না তোমার। কিন্তু....."

"কিন্তু কিসে—" সাহু হাসে।

"খোকাকে কিন্তু আমার কাছে রাখবো কোল থেকে ছাড়েনি খোকাকে।

"তোমার কাছে দেবো না। তুমি কিচ্ছু ভাল মা নও। কি বলো খোকা?" খোকা মার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনও কিছু বলবার সাহস হচ্ছে না ওর।

"এত তাড়াতাড়ি কি করে জানলে?" "তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি।" তাপ্তী হাসে, খোকাকে আবার চুমু খায়। বলে, "মার কাছে আর যেও না খোকা, কেমন?"

"ঝগড়া পরে করো।" সাহু হাসতে হাসতে বলে। "এখন অথিতির দিকে নজর দাওতো একটু।" "ওমা তাইত। তুমি ত আমার অতিথি। যদিও খোকা আমার অতিথি নয়। বসো আসছি আমি।"

খোকাকে নিয়ে চলে গেলো তাপ্তী, বসে বসে ভাবে সাহু। তাপ্তী কি করে এলো এখানে?

বেশ কয়টা দিন কেটে গেল আনন্দে আর আরামে এত সুন্দর দিন আর বোধ হয় আসেনি সাহুর জীবনে, অন্ততঃ ওর মা মারা যাবার পর এমন করে কেউ ওকে ভালবাসেনি। তাপ্তীকে ভারী ভাল লাগে সাহুর।

সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সাহু। সব কিছু বার বার করে দেখে, ঠিক যেন আগের মতই আছে, কোথাও কিছু পরিবর্তন হয়নি। যেন দুদিনের জন্য বেড়াতে

গেছেন সরোজদা,—আজই যেন ফিরে আসবেন।

সরোজদার কোন চিহ্ন নেই বাড়িতে কোন স্মৃতিই রাখেনি তান্তী। মনে মনে খুশী হয়না সাহু। রাঙ্কুসি-টার মায়া দয়া নেই যার বাড়ি সেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে সাহু। এই বাড়ি এই ঘর সবই আছে শুধু সরোজদা নেই, একেবারে নেই।

আজকে কান্না আসে সাহুর। সারা মনটা ভেংগে কান্না আসে।

"একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো দিদি?" খোকাকে নিয়ে ফিরে আসে তান্তী কাছে এসে ধমকে দাঁড়ায়। "ওমা, কাঁদছো তুমি?" পিঠে হাত রাখে তান্তী। "কাঁদছো কেন?" "তুইকি পাষাণ নাকি?" সাহু ধমক দেয়।

"পাষাণ নই মানুষ। কিন্তু কাঁদব কেন আমি। যা চাই খালি তাই ঘটবে নাকি পৃথিবীতে?"

"কিন্তু যা চাইনা, কোনদিনই চাইনা, কেবল তাই ঘটবে নাকি?"

"কেন তর্ক করো দিদি, কেন মনের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে মনকে ভেংগে দিচ্ছো? তার চেয়ে এসো দুজনে মিলে বাগানে যাই।"

ওকে জোর করে নিয়ে গেল তান্তী। যেতে যেতে বললো: "তোমাকে একা আর থাকতে দেবো না।"

ওরা দুজনে বেড়ায় বাগানের মধ্যে। তান্তী খোকনের সংগে খেলে, বলে, "এমন সুন্দর খোকা যার তার কান্না কিসের শুনি? অবান্তর আর অপ্রাকৃত দুঃখকে মনের মধ্যে জায়গা দেওয়া উচিৎ নয়।"

সাহু হেসে উঠে। বলে, "তোর কাছে উপদেশ চাইছি না, বুঝলি? একটু চুপ করে থাকনা। কেবল ছেলে মানুষের মতন বকবক করছিস।"

"একেবারে ঠাকুরমার মতন কথা বললে।" ফুরফুর করে হেসে উঠে তান্তী।

ওরা দুজনে সান বাঁধান পুকুর ঘাটে এসে বসে। সাহু বলে "তোর গল্প বলতো আমাকে।"

"আমার গল্প?" তান্তী বিস্মিত হয়। "হ্যাঁ, তোর গল্প।" সাহু বলে "তুই কেমন করে এখানে এলি তার গল্প।" চুপ করে থাকে তান্তী। একটি দুইটি করে মিনিট কাটে। অস্বস্তিকর হয়ে উঠে সমস্ত পরিবেশ। খোকনের চুলের মধ্যে হাত চুকিয়ে দেয় তান্তী।

"তিন বছর আগের কথা," তান্তী হঠাৎ বলে উঠে। "আমার বাবা মাষ্টারি করেন গ্রামের স্কুলে, বাংলা পড়ান। আমাদের গ্রামের নাম সোনাপুর। সরোজবাবু সেখানে গিয়েছিলেন গঠনমূলক কাজ করতে। সুতা কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ ইত্যাদি গ্রামের লোকদের শেখাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমরা সকলে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তাঁর আদর্শ, আর অদ্ভুত কার্য ক্ষমতার জন্য তিনি সবার শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটে বসলো।" "কি রকম দুর্ঘটনা?" চমকে উঠল সাহু।

"একদিন রাত্রে হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি এলো। বাড়িতে এসে যখন পৌঁছলেন তখন সারা গা বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। সেই রাত্রেই জ্বর এলো। সেই জ্বরে আড়াই মাস ভুগলেন। প্রাণপনে সেবা করলাম আমি। একটু থেমে বললে তান্তী। ভুলে গেলাম অন্য সব কিছু। পরিবারের কথা, নিজের কথা। তাঁকে সুস্থ করে তোলাই একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠল আমার। আড়াই মাস দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল।"

সুস্থ হয়ে তিনি বললেন,—'তোমার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আমি। তোমার কথা কোনদিন ভুলব না আমি।'

সন্তানহীন দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কিন্তু কিছু বলতে পারিনি, প্রকাশ করতে পারিনি নিজেকে।"

"তাঁকে বিদায় দিবার জন্য এগিয়ে এলাম। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ দিয়ে দুজনে হেঁটে চলেছি। চুপচাপ নীরবে পথ চলা। হঠাৎ তিনি থামলেন। বললেন 'এবার তুমি ফিরে যাও তান্তী, ষ্টেশনের পথটা একাই যেতে পারবো আমি।'

"আমি দাঁড়ালাম। তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। তারপর তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। কিন্তু প্রণাম করে আর উঠতে পারলাম না আমি। কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম। উনি বিস্মিত হয়ে গেলেন বল্লেন—'এমন করে কাঁদছ কেন? ছি ছি, উঠো।' 'আমি আপনার সংগে যাবো' সমস্ত সংকোচ ত্যাগ করে বললাম আমি। 'আপনার কাজের উপযুক্ত করে নিন আমাকে।'

"কিন্তু পারবে কি তুমি?" ওঁর কণ্ঠ মৃদু, গম্ভীর ওঁর চোখের দৃষ্টি। "কেন পারব না?" জোর দিয়ে বল্লাম আমি। "পারবো আপনি দেখে নেবেন।"

"তাঁর সংগে চলে এলাম এখানে। আর কোনদিন যাইনি সোনাপুরে। বাবা এসে দেখে যান মাঝে মাঝে। "এই আমার গল্প, তাণ্ডী ম্লান হেসে বলে। একটা সাধারণ মেয়ের গল্প যেমন হয় তেমনি।"

সাহু কোন জবাব দিল না। আবার কান্নায় ভরে উঠছে ওর মন। স্মৃতির কুয়াশায় ওর দৃষ্টি ঢেকে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে পৃথিবী।

"চলো উঠি," তাণ্ডী ওকে ঠেলে দিয়ে বললো। "খোকনের ঘিম লাগছে।"

"তুই যা আমি আরও একটু বসি, বেশ লাগছে আমার।" "উঁহুঁ, একা তোমাকে থাকতে দেবো না আমি। তুমি বসে বসে কাঁদবে।" ওকে হাত ধরে টেনে তুলে তাণ্ডী। সাহু আপত্তি করে না। মনকে প্রশ্রয় দিতে নেই। হারানো দিনের জন্য অশ্রুপাতে সত্যই কি সান্ত্বনা আসে; আসে কোন সুস্থতা?

ফিরে যাবার দিন কিন্তু ঘনিয়ে আসে সাহুর। ওর ছুটি ফুরিয়ে আসে কিন্তু তাণ্ডীকে ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না ওর। কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে সে তাণ্ডীর দিকে। কিন্তু—

"আর দু'দিনের পরে যেতে হবে," খেতে বসে সাহু বলে।

"এত তাড়াতাড়ি কিসের?" একটু ব্যথিত হয় তাণ্ডী। "ছুটি ফুরিয়ে গেছে," সাহু ম্লান হেসে বলে। "আবার ছুটির দরখাস্ত করে দাও! মঞ্জুর হবে তুমি দেখো।" "কিন্তু আর কতদিন তোকে বিরক্ত করবো বল্ ত।"

"সারা জীবন ধরে।" হাসে তাণ্ডী। তারপর হঠাৎ বলে "আমাকে একা একা ফেলে তুমি চলে যাবে দিদি? দেখচো না কেমন নিঃসঙ্গ আমি।"

ওর কণ্ঠে কেমন একটা বেদনা ধ্বনিত হয়ে উঠে। আশ্চর্য হয় না সাহু। নিঃসঙ্গতার দুঃখ তাণ্ডীর চেয়ে অনেক বেশী করে ও পেয়েছে। খোকন না এলে কি যে হতো ওর।

"খোকনকে আমি রেখে যাবো।" তাণ্ডী বলে, গম্ভীর হবার ভান করে ও। "দেখি তুমি কেমন করে যাও।" "তাকে ত প্রায় নিজের করে নিয়েছিস রাক্ষুসি।" সাহু হাসে। "তোর সংগে শেষ পর্যন্ত কি যে করতে হবে তাই ভাবছি। "কিছুই করতে পারবে না তুমি।" তাণ্ডী উঠে ঘরের দিকে চলে যায়।

বিকেলে ওরা বেড়াতে যায় হ্রদে। সাহু বলে, "চল, পুরাণো স্কুলটা দেখে আসি।" "চলো", সংক্ষেপে বললো তাণ্ডী। সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখে সাহু, অতৃপ্ত নয়নে দেখে। মনের সমস্ত উচ্ছ্বাসকে বাধা দেয় ও, সমস্ত অনুভূতিকে চেপে রাখে। তাণ্ডীর দিকে ভয়ে তাকায় না ও। পাছে তাণ্ডীও দুর্বলতা জেনে ফেলবে।

দেয়ালগুলোর উপরের আস্তরন ঝরে গেছে অনেক জায়গায়, টালির ছাদে ছুটা হয়ে গেছে। বন জঙ্গল হয়েছে স্কুলের মাঠে, এখানে সেখানে আগাছা। পুরান চিহ্ন কিছুই নেই, ভাববার মতো, ধরে রাখবার মতো।

একেবারে একপ্রান্তে চলে আসে সাহু। ছোট ছোট ছুটি কামরা। একমনে তাকিয়ে দেখে সে। না, কোন চিহ্ন নেই, নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেছে সব কিছু শুধু—

শুধু দেয়ালে এখনো আলপনার দাগ। ফিকে হয়ে প্রায় মিশে গেছে দেয়ালের সঙ্গে। সাহু একেবারে কাছে গিয়ে দেখতে থাকে। ফিকে দাগ গুলোকেই অবলম্বন করতে চায় সে।

"কি দেখচো অমন করে"?—তাণ্ডী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে।

"আমার মার হাতের চিহ্ন।" সাহু বলে, ওর চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে।

"তোমার মার?"

"হাঁ। মার। মা পাকতেন এঘরে। অনেক দিন থেকেছেন উনি, ছয় সাত বছরের কম নয়।"

"তাই নাকি। কৈ আমাকে ত বলোনি সে কথা।" "নিজের দুঃখের কথা বলে কি হবে। অকারণে মনকে শুধু ভারি করা। তাছাড়া নিজের কথা বলাও কঠিন।" "তবু বলো না আমাকে" মিনতি করে তারা, "তোমার সব কথা বুঝতে পারবো আমি। আমিও ত দুঃখী জীবনে

বিকেলের ক্ষীণ আলোকে ঘরের মেঝের বসলো দুজনে। সাহুর হঠাৎ ভাল লাগে এমনি করে বসাটা কতদিন এই ঘরের মেঝে বসতে পারেনি সে।

"আমার মা মাষ্টারি করতেন এখানে। আমি তখন ছোট এই সাত আট বছর বয়স হবে। বাবার কথা আমার মনে পড়ে না ঠিক। তবে শুনেছি উনি নাকি দেশকর্মী ছিলেন। ১৯৩০ সালে জেলে উনি মারা যান। তারপর থেকে মা বরাবর স্কুলে মাষ্টারি করে জীবিকা অর্জন করেন।

সরোজদার বাবা এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি মাকেও স্নেহ করতেন খুব। আর আমি প্রায় তাদের বাড়ীরই মেয়ে হয়ে গিয়েছিলাম। সারাদিন সেখানে থাকতাম, হৈ চৈ, খেলাধূলা করে দিন কাটাতাম।

কিন্তু অত্যন্ত ভীরু মানুষ ছিলেন সরোজদার বাবা। তখনকার দিনেও এমন ইংরেজভক্ত দুচারজন চোখে পড়ত না। রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন তার জন্য।

বাবার বিপ্লবী বন্ধুরা প্রায়ই মার কাছে আসতেন। মাও তাদের সাহায্য করতে ত্রুটি করতেন না। দু'তিন জনকে ত বেশ কয়দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন এখানে। এমনি করে ছয় বছর কাটিয়েছি আমরা এখানে।

সরোজদার বাবার কানে কেমন করে সেই খবর পৌঁছল। পরদিন মাকে জবাব দিলেন তিনি। বললেন, সরকারের রোষ পড়ে শেষ বয়সে জেল খাটতে তিনি রাজি নন।

মা তিনিষ পত্র গুছিয়ে নিলেন। আপাততঃ কলকাতা যাবো আমরা। মা সেখানে কাজ যোগাড়ের চেষ্টা করবেন।

আমার কিন্তু যাবার একটুও ইচ্ছা করছিল না। মনে মনে সরোজদাকে ভালবেসেছিলাম আমি। না, না, আশ্চর্য হয়ো না তুমি। এই একমাত্র স্বাভাবিক ছিল আমার বয়সের পক্ষে। অনেকদিন একসংগে কাটিয়েছি আমরা। এক সংগে খেলেছি, ভেবেছি, পৃথিবীকে দেখে বড় হয়েছি।

সেদিন সরোজদাকে ছেড়ে যেতে কি কান্না আমার। সরোজদা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। "তোমরা যাও সাহু, গিয়েই আমার কাছে লিখো, আমি সেখানে চলে যাবো।" "আমি তোমাকে ছেড়ে একদিনও বাঁচবো না।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললাম আমি। "কি করবো আমি?" হতাশা সরোজদার চোখে। "বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিছুই করতে পারবো না আমি।"

ষ্টেশন পর্যন্ত আমাদের দিয়ে গেলেন তিনি। গাড়ি ছাড়বার আগে মাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, "আমাকে ভুলে যাবেন না মাসীমা।" "তোমাকে কি ভুলতে পারবো বাবা।" মার চোখেও কেমন অশ্রুর দাগ। "তুমি মনে রেখো আমাদের।"

মাথা নীচু করে বসে রইলাম আমি। একবার ও তাকাইনি ওঁর দিকে। গাড়ি ছাড়ার সময় হলে উনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "যাচ্ছি সাহু।"

আমি চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। মনে হলো মার কাছে ধরা পড়ে যাবো আমি। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখি সরোজদা তেমনি করে তাকিয়ে আছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল বলতে পারি না, আমার চোখ ফেটে জল এলো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়লাম আমি।

কলকাতার অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে আমাদের কাটতে লাগলো। মা কারো সাহায্য চাইলেন না, কারো কাছে ধরার প্রার্থী হয়ে ভিক্ষা চাইলেন না। শিয়ালদার কাছে গিয়ে একটা মেসে আমরা থাকতাম। কোন রকমে দিন কাটতো।

৬মাস পরে মা চাকরি পেলেন একটা। বন্ডেলার একটি গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারি। আমরা সেখানে চলে গেলাম।

সরোজদা একদিন সেখানে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলাম আসতে। কদিন ছিলেন। তখন তাঁর বাবা মারা গেছেন। দেশের কাজে সবেমাত্র নেমেছেন তিনি।

সে কটাদিনের স্মৃতি ভুলবার নয় জীবনে, মনের কানায় কানায় ধরে রেখেছি সেই কটা দিনকে। এত মধুর কখনো মনে হয় নি জীবনকে, পৃথিবীকে।

আবার অশ্রু জলে বিদায় দিতে হলো তাঁকে যাবার সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম আবার শীঘ্রই যেন তিনি আসেন।

নানারকম মানসিক দুশ্চিন্তায় মার শরীর খারাপ হয়ে আসছিল। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিলাম সেই বছর মার অসুখ করলো। অল্প জ্বর হলো প্রথমে, আর তারপরে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না।

মার হয়ে স্কুলে পড়াতে লাগলাম আমি, কোনরকমে তাঁর চিকিৎসা করাতে লাগলাম।

গ্রামের ছোকরা ডাক্তার একজন। দুবছর আগে এল, এম, এফ পাশ করে এসেছেন। রোজই মাকে দেখে যেতেন ডাক্তার। টাকা পয়সা যা দিতে পারতাম কখনও আপত্তি করতেন না।

সরোজদাকে পত্র লিখেছিলাম কিন্তু কি জানি তিনি কোন খবর দিলেন না। মার অবস্থা খারাপ হয়ে এলো। একদিন রাতের কথা বলছি। সারাদিন ডাক্তার আসেনি। ভারী ধড় ফড় করছে মা। ভুল বকছে, প্রলাপ বকছে, আমাকে পর্যন্ত চিনতে পারছে না।

ভয়ে হিম হয়ে গেলাম আমি। কি করবো পেলাম না। তাড়াতাড়ি অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

ডিসপেনসারিতে বসে কি যেন করছিলেন তিনি। আমি উন্মাদের মতন গিয়ে পৌঁছলাম, বললাম, "একুনি একবার চলুন ডাক্তার বাবু, মা যেন আজ রাত ও বাঁচবেন না।"

একটু হাসলেন ডাক্তার, বললেন চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। নেই ডাক্তার বাবু, ঘরে আর কেউ নেই

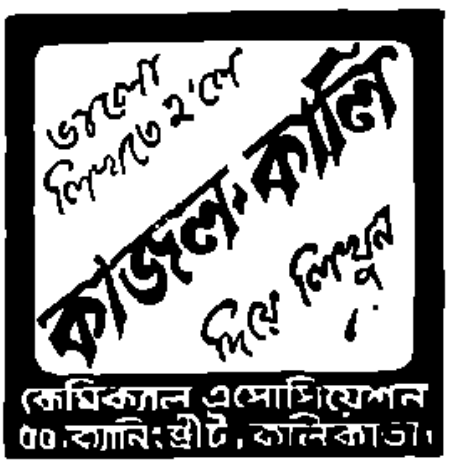

আমি এই মাত্র আসছি।" বলেই ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলেন। একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন আমার বললেন—"একটা সর্তে আপনার জন্য শেষ চেষ্টা করতে পারি আমি।"

"কি সর্তে?" সংকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। তুমি ভাবতে পার কি সর্ত? এক মুহূর্ত থামলে সাহু; অন্ধকারের মধ্যে ও চোখ দুটি জলতে লাগলো তার। "কি সর্ত?" ভয় ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো তান্তী। "সরাসরি তিনি আমার দেহ দাবী করে বসলেন। বললেন, তাহলেই তিনি চেষ্টা করতে পারেন। নইলে স্বচ্ছন্দে আমি ফিরে যেতে পারি।

আমার ভাববার আর সময় ছিল না। আমি বললাম "তাই হবে। আপনি চলুন।" কিন্তু এত করেও মাকে বাঁচাতে পারলাম না। দুদিন পরে তিনি মারা গেলেন। শোকে দুঃখ অবসাদে আর হতাশায় আমি পাগল হয়ে গেলাম।

আর দু'দিন পরে গোপনে কলকাতায় চলে এলাম আমি। এসেই পত্র দিলাম সরোজদাকে। আমার দেহমনে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি, আমি যেন নেমে গেছি সাধারণ মানুষের স্তর থেকে।

সরোজদা এবার এলেন। ওকে কাছে পেয়ে আমার সে কি কান্না। বললাম "আমাকে স্পর্শ করো না সরোজ দা।" "কেন?" প্রশ্ন করলেন তিনি। ভাবলেন বুঝি পরিহাস করছি। তাকে পরিষ্কার খুলে বললাম সব কথা। বললাম "আমি আর আগের সাহু নই সরোজদা।"

বড় দুঃখ পেলেন তিনি, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তবু বললেন "তাতে কি হয়েছে সাহু। এটাই ত আমাদের পৃথিবী। চলো আমার সংগে। রাজি হলাম না। অসহ্য কান্নার ভেংগে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল আমার মন। ভগ্ন জীবনের দুঃস্বপ্ন নিয়ে অন্য কাহাকে সুখী করতে পারবো না আমি।

সরোজদা পরদিন চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন, "আমার দরজা তোমার জন্য খোলা রইল সাহু। কোন অসুবিধা হলে চলে যেও।" অশ্রু সজল চোখে বললাম, "আচ্ছা।"

তারপর আর কি বলবো? ভাংগা মন আর নিঃস্ব অন্তকরণ নিয়ে আমি থেকে গেলাম কোলকাতায়। সকালে প্রাইভেট টুইশানি করি, দুপুরে স্কুলের মাষ্টারি আর বিকেলে গান শিখি। সারাটা দিন একটানা কাজের ফাঁকেই চলে যায়।

এক বছর পরে হাসপাতালে খোকা হলো। লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম আমি। মনে হচ্ছিলো এর চাইতে আর লজ্জাকর অবস্থা বোধ হয় হতে পারে না।

মৃত্যু কামনা করছিলাম আমি। খোকার মুখ দেখে ভুলে গেলাম। মনে হলো এর জন্যই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

হ্যাঁ, সরোজদার অসুখের খবর পেয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু লজ্জায় আসতে পারিনি আমি। আমার খোকাই আমার একমাত্র লজ্জার কারণ; এমনকি সরোজদার কাছেও অথচ এই খোকাই একমাত্র আশ্রয় আমার, ভবিষ্যত জীবনের একমাত্র উপজীব্য।

চুপ করলো সাহু। শান্ত নিঃসংগতায় ভরে গেছে চারিদিক। ঘরের কোলে জমাট অন্ধকার। "—চলো উঠি।"—তান্তী তার আঁচল ধরে টান দিলো।

ওরা উঠল দু'জনে। তান্তীর কোলে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যাবার দিন সত্যই আসে। সাহু নিজের বিছানা পত্র বাঁধছিল। তান্তী কোন কথা বলেনি, খালি মুখ টিপে টিপে হাসে। "হাসছিস্ কেন রাক্ষুসি? ভাবছিস বুঝি যাবো না?" "ওমা, তা ভাববো কেন। তুমি যে যাবে সেত দেখতেই পাচ্ছি।"

সন্ধ্যার পরে গাড়ী, এখন মাত্র পাঁচটা বাজে। সাহু বারান্দায় বসেছিল খোকা উঠানে নেমে খেলছে। তান্তী এলো। হাতে এক গাদা কাগজ, বললে, "এগুলি একটু পড়ে দেখো।"

(শেষাংশ ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

হকি :—এ বৎসর কলিকাতায় প্রথম ডিভিসন হকি লীগ প্রতিযোগিতায় কাষ্টমস দল দীর্ঘ ১০ বৎসর পর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কাষ্টমস দল যোগ্য দল হিসাবেই এ সম্মানের অধিকারী হইয়াছে। তাহাদের রক্ষণ ও আক্রমণ ভাগের শক্তি অন্য যে কোনো দল হইতে শক্তিশালী। কাষ্টমস দল অপরাজিত থাকিয়া যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা তাহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মোহনবাগান দলও অপরাজিত অবস্থায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগ অপেক্ষা আক্রমণ ভাগের শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল থাকায় তাহারা অধিক সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ই আই রেলওয়ে দল সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করায় আগামীবারে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাইতে হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগ লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারী কালীঘাট দল আগামীবারে প্রথম বিভাগে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। বালীগঞ্জ ইনঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তৃতীয় বিভাগ গ্রুপ 'এ' বিভাগে সিটি এ সি ও মিলন সমিতি ১৩ পয়েন্ট অর্জ্জন করিয়া প্রথম স্থান ও গ্রুপ 'বি'তে আর্ম্মড পুলিশ দল ১৮ পয়েন্ট লাভ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

লীগ খেলায় বিভিন্ন দলের স্থান

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
কাষ্টমস	১৯	১৬	৩	০	৪৯	২	৩৫
মোহনবাগান	১৯	১৪	৫	০	৩৮	৭	৩৩
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৯	১৪	৪	১	৩৪	১০	৩২
ভবানীপুর	১৯						৫
পোর্ট কমিসনার্স	১৯						৬
মেসার্সার্স	১৯						৩
প্রীয়ার	১৯						৪
পুলিশ	১৯						৪
রেঞ্জার্স	১৯						৬
ডালহৌসী	১৯						৬
আর্ম্মেনিয়ান্স	১৯						৫
সেণ্ট জোসেফ	১৯						৪
কলেজিয়ান্স	১৯						১
ইষ্টবেঙ্গল	১৯						৪
পার্শী	১৯						৩
রাজস্থান	১৯						৬
ক্যালকাটা	১৯						৪
মহঃ স্পোর্টিং	১৯						৩
বি জি প্রেস	১৯						৫
ই আই রেলওয়ে	১৯						২

বাইটন কাপ :—বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রতিযোগিতার অন্যতম বাইটন কাপের ফাইন্যাল খেলা গত ৭।৫।৩০ তারিখে কালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত টাটা স্পোর্টস দল পর পর দুইবার জয়লাভ করিয়া এবং বর্ত্তমান বৎসরে আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়া এ বৎসরে ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি দল বলিয়া আখ্যা পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

তাহারা বর্ত্তমান বৎসরে বোম্বাইয়ের লীগ লুসিটেনিয়ান্স দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া জয়লাভে সক্ষম হইয়াছে। বাইটন কাপে এ বৎসরে বহিরাগত দলগুলির মধ্যে শিখ রেজিমেণ্ট (আম্বালা),

বাঙ্গালোর স্পোর্টিং, উত্তর প্রদেশ একাদশ দলই শক্তিশালী ছিল। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব স্পোর্টস দলই সেমিফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল। স্থানীয় শক্তিশালী দলের মধ্যে ব্রেথ কাইটস দল ভালো খেলিয়াও উত্তর প্রদেশ একাদশের নিকট ২—০ গোলে পরাজিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। পাঞ্জাব পুলিশ দল বাইটনে খেলিবার কথা থাকিলেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাহারা আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার মধ্যে বঙ্গীয় হকি এসোসিয়েশন গত বৎসরের মত এবারেও অলিম্পিক দলের অবশিষ্ট দলের খেলার ব্যবস্থা করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। অলিম্পিক দলের অধিনায়ক রূপে হকি যাদুকর ধ্যান চাঁদকে খেলিতে দেখা যায়। বয়সের জন্য তাহার গতি মন্থর হইলেও এখনও ঠিক মুখে বল পড়লে তাঁহার প্রতিভা প্রতিভাত হইয়া উঠে।

অলিম্পিক দল :—এল. পিন্টো (টাটা স্পোর্টস); ডব্লিউ. ডি. সুজা (মুসিটেনিয়ান্স); ও আর. এস. জেন্টল (টাটা স্পোর্টস); কেশব দত্ত (মোহনবাগান); আমির কুমার (মুসিটেনিয়ান্স) ও যশোবন্ত (ভবানীপুর); ম্যাকেন (পোর্ট কমিসনার্স), সাকুর (ভূপাল), ধ্যানচাঁদ (আর্মি), জ্যানসেন্ (ডালহৌসী) ও ফার্ণানডেজ (টাটা)।

অবশিষ্ট দল :—কুলবন্ত সিং (পাঞ্জাব স্পোর্টস); ওয়াহেদ উল্লা (উত্তর প্রদেশ) ও ডি. পাল (মোহন-বাগান); পেরুমল (টাটা স্পোর্টস), জলুর (ভূপাল), ডালুজ (অধিনায়ক মেসার্স) কমরুদ্দিন (ভূপাল), খন্নি সিং (বাঙ্গালোর), ইন্দ্রিস (উত্তর প্রদেশ) ও রাজ গোপাল (বেঙ্গালোর)।

ফুটবল :—গত ৮।৪।৫০ তারিখ হইতে কলিকাতা ময়দানে ফুটবল লীগ খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। ময়দানের আকাশ বাতাস সহস্র সহস্র উৎসাহী দর্শকের কলকোলা-হলে মুখরিত হইতে থাকিবে। আবালবৃদ্ধবনিতার এই প্রিয় খেলা সম্পর্কে আগামীবারে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

কোন অপ্রত্যাশিত কাহিনী

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

সাহু পড়তে লাগলো। একটু পড়েই গম্ভীর হয়ে গেল সে। তাপ্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

দৃষ্টি নত হয়ে আসে তাপ্তীর। চোখের কোলে কেমন কেমন বেদনা ফুটে উঠে ওর, আস্তে আস্তে বলে, "উনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন। আমার আপত্তি সত্ত্বেও সব আমার নামে করে দিয়ে দিয়েছেন।"

সাহু দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এতদিনে তাপ্তীর বৈধব্যের অর্থ বুঝতে পারে সাহু। একা একা এ বাড়ীতে পড়ে থাকার অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আশ্চর্য, এই কথাটা এতদিন ওর মনে পড়েনি। নিজের ভালবাসা নিয়ে এমনি ব্যস্ত ছিল যে অন্যের ভালবাসা তার চোখেও পড়েনি। "এতদিন বলিস্‌নি কেন হতচ্ছাড়ি? সাহু লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরে তাপ্তীকে। "কেন লুকিয়েছিলি আমার কাছে? ভাবছিলি বুঝি শুনে খুব দুঃখ পাব।" "না।" চোখে অশ্রু নেমেছে তাপ্তীর। "তোমাকে বিশ্বিত করে দেবো এই ভেবেছিলাম।"

দুজনে হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ বসে থাকে। সত্যই এক হয়ে মিলে গেছে ওরা। মিলে গেছে পরস্পর।

"তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে উনি বলে ছিলেন।" তাপ্তী আস্তে বললো। "অবশ্য তুমি যদি চাও।" "আমিত কিছুই চাইনা বোন!" সাহু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

তাপ্তী উঠে গেল। উঠান থেকে খোকনকে ধরে নিয়ে এলো। ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল দলিলের কাগজ পত্র। বললে, "আমার খোকনকে দিলাম সব। ওর জন্য সব কিছু রক্ষা করবো আমি।"

চুমোয় চুমোয় খোকনের মুখটা ভরে দিলো তাপ্তী। বললে, "তুই চলে যা দিদি, কিন্তু আমার খোকনকে দেবো না আমি। আমার খোকন....."

পালিয়ে গেল তাপ্তী। দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সাহুর আর যাওয়া হয় নি।

পুস্তক পরিচয়

মাধুকরী—শ্রীসুধীন গুপ্ত প্রকাশক—এম্. সি. সরকার র‍্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'মাধুকরী' কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। ষাট পৃষ্ঠার মাঝে ত্রিশটী কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি সহজ ভাষায়, সাবলীল ছন্দে লেখা।

অধিকাংশ কবিতা কবির কাল্পনিক বিরহ-মিলনের আনন্দ-বেদনার কাহিনী। 'স্বর্ণ-শিল্পী', 'মহাকালের প্রতি' প্রভৃতি দু' একটী কবিতায় গভীর অনুভূতির স্পর্শ আছে। সমস্তাসঙ্কুল পৃথিবীর পীড়ন-জর্জর যুক নরনারীর রুদ্ধ বেদনা কবির কণ্ঠে কোথাও ভাষা পায়নি। যে বাস্তব জগতে তাঁর বাস, তিনি যেন তার কেউ নন। 'গ্রন্থ-সূচনায়' অবশ্য 'বৈশ্য যুগের বস্তু-স্ফীতি'কে দোষারোপ করে কবি যুগ-দায়িত্ব অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তবুও প্রশ্ন রয়ে যায়—যুগের না হয়ে কি যুগাতীত হওয়া যায়? ফুল থাকবে মাটীতে, ফুল ফুটবে আকাশে। মাটীর সঙ্গে আকাশের এই সেতু-বন্ধন-প্রয়াসই সত্যিকার আধুনিকতা। যাঁর ভাববার ক্ষমতা আছে, লিখবার শক্তি আছে, তাঁর মাঝে এই ধরণের বাস্তব-বিরাগ দেখলে দুঃখ না হয়ে পারে না।

গ্রন্থখানির আকৃতি অ-কাব্যোচিত এবং তদনুপাতে দামও একটু বেশী বৈকি।

শিক্ষার ভূমিকা—শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম. এ., বি. এল., বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। বাণী ভবন, ১৪৩ বি. বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

প্রত্যেক বিষয়েরই একটা শাস্ত্র আছে। যে অনুশাসন বা বিধি বিধান মেনে কোন বিষয়ের আলোচনা বা ব্যবহার হয়, তাকেই সে বিষয়ের শাস্ত্র বলা চলে, যেমন ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র। সেই হিসাবে শিক্ষা শাস্ত্রও আছে আর সেটা থাকাও উচিত। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনা চলে। ফলে সেখানে বিরাট শিক্ষাশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষাশাস্ত্র তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তার কারণ আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনাই বিশেষ হয়নি। আমরা পুরাতন অভ্রান্ত পথে চলে খুসী হই। শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যে কোন সমস্যা আছে বা এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার আছে এটা সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না। দুষ্টিদের কয়েকজন তথা কথিত 'ট্রেণিং' ওয়ালা এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু এদেশের জন সাধারণ, এমনকি, তাঁদের সম্বন্ধে যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাঁদের মধ্যে একদল শুধু উদাসীন নন, অবিশ্বাসী। তাঁদের ধারণা শিক্ষার ব্যাপারে সব কথাই জানা হয়ে গেছে, দরকার শুধু সেটা প্রয়োগ করার, আর প্রয়োগ করার রীতিতো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, এনিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

শিক্ষা সম্বন্ধেও যে অনেক কথা নতুন করে ভাববার আছে, তার প্রমাণ শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্যের এই ছোট বইটি। সেটা পড়লে অবিশ্বাসীও বুঝতে পারবেন শিক্ষা শাস্ত্রের আলোচনা আজ আমাদের দেশে কতখানি দরকার হয়ে উঠছে। শ্রীমহিমারঞ্জনের দৃষ্টি স্বচ্ছ, তাঁর অনুভব

ছাপাখানার যন্ত্রপাতী

রোটারি প্রিন্টিং মেসিন
অফসেট প্রিন্টিং মেসিন
ফ্লাট বেড ট্রেডল মেসিন

ব্লকবিভাগের যন্ত্রপাতী

ক্যামেরা
ক্রীন
আর্কল্যাম্প
কেমিক্যালস্

দপ্তরিখানার যন্ত্রপাতী

কাটিং মেসিন
ষ্টিচিং মেসিন
নম্বরিং মেসিন
কলিং মেসিন
পার্ফোরেটিং মেসিন

সব কিছুর জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে আনন্দিত হইব।

ইণ্ডোসুইস্ ট্রেডিং

=কোম্পানী লিঃ=

কেণ্ট হাউস

৩৩ নিমন রো একস্টেনসন-কলিকাতা
ফোন : ওয়েষ্ট ৭১৬

দরদী। তিনি শিশু শিক্ষার মৌলিক সমস্যাগুলি দেখেছেন, আলোচনা করেছেন। দরদী পিতামাতা ও শিক্ষক তাঁর বইয়ে অনেক নতুন কথা শুনতে পাবেন ও চিন্তার অনেক খোরাক পাবেন। তাঁর বইটি বাঙ্‌লা ভাষার শিক্ষা শাস্ত্রে বিশিষ্ট স্থান পাবে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

অভিযান—[প্রথমবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] ধানবাদ তরুণ সংঘের দ্বারা পরিচালিত একমাত্র সংস্কৃতিশীল বাংলা মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মূল সম্পাদক এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক। সহকারী হিসাবে সম্পাদনা করছেন, শ্রীবিনয় সন্ন্যাল, শ্রীসাবনা গুপ্তা এবং শ্রীতারক রায় চৌধুরী। দি নিউ ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ঝরিয়া থেকে মুদ্রিত এবং সংঘের পক্ষ থেকে শ্রীজগবন্ধু মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছ' আনা।

অভিযান পত্রিকার নামটি বেশ মিষ্টি। প্রতিটি রচনা বেশ আগ্রহ নিয়ে পড়েছি, এবং তার গুটী কয়েক রচনার ওপর আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ-আলোচনা করছি। (১) মৃত্যুঞ্জয় (গল্প) লিখেছেন শ্রীরাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক একটি জায়গায় লিখেছেন যে, "কলেজে পড়া মেয়ে সুনীতি তা' কিছুতেই বুঝবে না।" —হ্যাঁ মেয়েরা সত্যিই একটু বোকেন কম। চিন্তার-অপেক্ষা আস্ফালনই করেন বেশী। বিশেষ করে যাঁরা কলেজে পড়েন। প্রবেশিকার দ্বার পেরোলেই একটা স্বভাবতঃই "ভ্যানিটি" এসে যায়। তাই তাঁরা, "মুখেন মারিতং জগৎ।" অবশ্য সব মহিলাকেই বলছিনা, তবু কথিক সুনীতিবালার মতোই মেয়েদের। লেখকের মত সমর্থন করি। (২) জয় হবে (একাংকিকা)—নাট্যকার, শ্রীশশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য। লেখাটি দেখে মনে হচ্ছে কোন ইংরাজ লেখকের সাহায্য নিয়ে লেখক লিখেছেন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে ভদ্রলোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা খুবই উচিত ছিল। তা' না হলে অনেক ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। লেখাটি যে খুব ভাল হয়েছে, এক কথায় তা' বলা শক্ত। (৩) শ্রীশংকর লিখেছেন—

"ইঙ্গীত",—(ইঙ্গিত ?) ভদ্রলোকের গল্পের শিরোনামা দেখে, কী অর্থ সঠিক বুঝতে পারলাম না। রচনার বিষয় বস্তুতো কোন ইঙ্গিতের ছাপ মনে ফোটালোনা। (৪) আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ—লেখক শ্রীবৈতানিক শর্মা। লেখাটির বিষয় বস্তু তদনুরূপ। লেখকের কাছে এটি নিশ্চই টক্-মিষ্টি-ঝাল লাগতে পারে। কিন্তু পাঠক মহলে এর স্থান যে খুবই নিম্নে। লেখক শিব গড়তে বানরে পরিণত করলেন ! (৫) বান্ধবীর-কর কমলে (কবিতা)—রচয়িত্রী, শ্রীসান্ত্বনা গুপ্তা। কবি শিল্পী, তাঁর বান্ধবী "বিজয়া"কে নিয়ে ছোট্ট একটি চিঠিতে পুত্রবাৎসল্য ও পতিভক্তির ভাবটি বেশ ফুটিয়েছেন। আমাদের তা' খুব ভালোই লেগেছে। বর্তমানে মেয়েদের লেখিকার মনোভাব হওয়াই উচিত।

শিল্পী, কবিতার প্রথম দু'টি ছত্রের মিল কি ঠিক দিয়াছেন ? "বলে"এর সংগে মিল "কোলে।" আর একটি জায়গায় "কেঁদে কেঁদেই সাড়া।" "সাড়া" কথাটির অর্থ, কা'রো ডাকে "সাড়া" দেওয়া। কিন্তু "কেঁদে কেঁদে সারা" হলে কি আমাদের শুনতে ভালো হয় না ? ছন্দের মিল হিসাবে "অফিস যাবার তাড়া।" মিলটা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের মিল যেন বড্ড কেমন কেমন লাগে।

ইহা ব্যতীত, আর গুলির প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে না পারলেও ভবিষ্যতে উন্নতির অপেক্ষা রাখে। এতদ্ভিন্ন পত্রিকাটি দুর্গম পথেও তা'র নিষ্ঠা কালকে বজায় রাখলেই কৃতার্থ হবে অভিযানের যাত্রী দল।

নতুন পত্রিকা হিসাবে সামান্য ত্রুটী-বিচ্যুতি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একমাত্র পত্রিকার বাজারে সংখ্যা বৃদ্ধিকরার উদ্দেশ্যই যদি সম্পাদকের হয়, তা'হলে আমাদের আপত্তি নেই।

আমরা সম্পাদকের নিকট এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করি আগামী সংখ্যায়। দোষ ত্রুটীশূণ্য কখনিং থাকা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকা খানির প্রসার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আমরা—(দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম, সংখ্যা)

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা। সম্পাদনা করছেন, কিশোর ভাই শ্রীমান্ শ্যামাপদ কর্মকার। পত্রিকাখানি প্রকাশিত হচ্ছে. গ্রাম—গজা, ডাক—বন্দিপুর, ও জেলা হুগলী থেকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা।

কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ছবি ছড়াতে পঁচেমিশালি পত্রিকা খানি মন্দ হয় নি ; কবিতা গুলি ছোটদের মতো অনেক গুলিই নয়। ছবি ছড়াটী আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। "রবীন্দ্র নাথের বলাকা" এটী সাধারণতঃ বিজ্ঞ মহলেই স্থান পায়। সহজ ও সরল ভাষাতেই শিশুর মন আকৃষ্ট করা যায়।

"আমেরিকার ট্রাক" প্রবন্ধটীতে শ্রীপ্রমথ নাথ শীল, মহাশয় আমাদের দেশ কিছু মাল মশলা দিয়েছেন। ছোটদের মহলে এ ধরণের প্রবন্ধের প্রয়োজনও যেমন আছে, আকর্ষণ আছে তেমনি।

শ্রীমান্ শ্যামাপদ'র, "পাঠক" গল্পটী পড়লাম, কিন্তু প্রাণ খুলে প্রশংসা না করতে পারলেও ভবিষ্যতে আশার অপেক্ষা রাখে। কিশোর সম্পাদক পল্লী থেকে প্রচুর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যে পত্রিকাখানি প্রকাশ করছেন, তার জন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক উৎসাহ দিচ্ছি। এবং বহুল প্রচারেরও কামনা করছি। পরবর্তী সংখ্যায় রচনা নির্বাচনের ওপর একটু দৃষ্টি দিলে পত্রিকাটী আরো উন্নত হ'তে পারে ॥

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

প্রতিবারে একই বিষয়বস্তু নিয়া আলোচনা করা একঘেয়ে হইয়া ওঠে। কিন্তু জীবনের অনেক কিছুই একঘেয়ে খুঁটনাটের আমেজ আনা ও রসসৃষ্টি করা রসস্রষ্টার দায়িত্ব। শিল্পী সেই সামাজিক দায়িত্ব বহন করে। রাজনীতি বাস্তবধর্মী; কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে শুধু এই বাস্তবধর্ম আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে একটি বিশেষ ঝোঁক নিয়া। ঘটনার গতি দ্রুতবেগে যে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা তৃতীয় মহাযুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তববাদের উপরে কতকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এমন কিছুই আজ নজরে পড়ে না। যে আদর্শবাদ এক বিশ্ব কল্পনা করিতে পারে—যেখানে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, কলহ, সংগ্রাম অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে—এরূপ কোন সম্ভাবনা আজ আর দেখা যাইতেছে না।

ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী-চক্র আতলান্তিক চুক্তির মারফৎ সোভিয়েট বিরোধী ব্লককে অজেয় করিয়া তুলিবার কাজে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই কাজে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য লণ্ডন সহরে ত্রিশক্তির বৈদেশিক মন্ত্রিগণ আজ কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। প্রধানত ইউরোপ ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তোলার জন্য নূতন করিয়া নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিসমূহ এতদিন মার্শাল সাহায্য ভাণ্ডারের মারফৎ পুণর্গঠন কার্যে ব্রতী রহিয়াছেন। ওইইসি (ইউরোপীয়-অর্থনৈতিক-সহযোগীতা-প্রতিষ্ঠান) এর মারফৎ ইউরোপীয় জাতিগুলি অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতা যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনীতিক্ষেত্রে বিরোধের অবসান করা সম্ভব হয় নাই। এই বিরোধ জাতিয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। বর্তমান ক্ষেত্রে কমুনিজমকে বাধা দিবার সর্বাত্মক চেষ্টার পরিপন্থী। তাই মিঃ ডিন একিসন লণ্ডন কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিবার প্রাক্কালে এক নূতন নীতির পক্ষে ওকালতি করিয়া এক বিবৃতি দেন। এই নীতির মূলকথা হইল সর্বাত্মক চেষ্টা সফল করিয়া তুলিবার জন্য জাতির স্বার্থও যতটা সম্ভব ত্যাগ করিতে হইতে পারে। আতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহকে এই আত্মত্যাগ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিতে হইবে। অন্যথা আত্মরক্ষামূলক যে কোন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত বানচাল হইয়া যাইবে।

ইন্দোচীন—

লণ্ডনে যাইবার মুখে প্যারীসে মিঃ একিসন মঃ সুম্যানের সহিত সাক্ষাত এবং আলোচনা করেন। ফরাসী দেশ ইন্দোচীন সমস্যা লইয়া বহুদিন হইতে বিব্রত হইয়া আছেন। এই দেশে জাতিয়তাবাদী দলগুলিকে একত্রিত করিয়া নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে একদা পলাতক সিংহাসনচ্যুত বাও-দাইকে কেন্দ্র করিয়া 'স্বাধীন' ভিয়েৎনাম রাজ্য কায়েম করা হইয়াছে। ফরাসী বিরোধী ভিয়েৎমিন নেতা হো-চি-মিন সোভিয়েট, নব্যচীন ও সোভিয়েট সমর্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিয়াছে। মার্কিণ ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় হো-চি-মিন প্রচুর রসদসম্ভার কমুনিষ্টদের নিকট হইতে পাইতেছেন এবং দুই লক্ষাধিক কমুনিষ্ট সৈন্য ভিয়েৎনাম সীমান্তের অদূরে চরম আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া আছে। সিয়াং কাইশেকের শেষ আশ্রয়স্থল ফরমোসা দ্বীপও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই আক্রমণের প্রস্তুতি নাকি শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফরাসী সরকার বহুদিন ধরিয়া ভিয়েৎনামে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তাহারা তাহাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া আমেরিকা ও বৃটেনের সাহায্য কামনা করিতেছেন। তাহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যদি ইন্দোচীন রক্ষার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হইতে হাত গুটাইয়া লইতে হইবে এবং এই মহাদেশকে পুরাপুরিভাবে কমুনিজম্ এর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। মনে হইতেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার সময় ইন্দোচীন সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। ইতিমধ্যেই ফরাসী সরকারকে ইন্দোচীনের জন্য ছয় মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সম্ভার সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য নগণ্য। পুরাপুরি রক্ষাব্যবস্থা সফল করিতে হইলে বাৎসরিক সাহায্য পাঁচশত মিলিয়ন ডলার সরবরাহ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় মার্কিণ ধনকুবের এই ব্যয়ের ভারকে বহন করিবে।

মালয় :—

মালয়ের অবস্থাও দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না। শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠন করিয়া বৃটেনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া জানাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদল অবশ্য এই সাহায্য দানকে পররাষ্ট্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন এবং এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব চলিয়া যাওয়ার ফলে তাহাদের প্রস্তাব কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্মদেশ —

ব্রহ্মদেশের অবস্থাও গুরুতর হিসাবে গণ্য হইতেছে সেখানকার সরকার তাহাদের দলাদলের ন্যূনতাহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া কমনওয়েল্থ দেশসমূহ তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছে। বৃটেন খোলা-খুলি ভাবে এই সাহায্যকে কম্যুনিষ্ট প্রতিরোধের উপায় হিসাবে প্রচার করিয়াছেন। ভারতও এই সাহায্য তহবিলে অর্থদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বৈদেশিক নীতি পূর্ব বা পশ্চিম কোন গোষ্টিরই পরিপোষক নহে; অথচ গ্রেটবৃটেনের সাহায্যদান কম্যুনিষ্ট বিরোধী আর একই তহবিলে ভারতের সাহায্যদান নিরপেক্ষ। এই অস্পষ্টতা অবিলম্বে দূর হওয়া প্রয়োজন।

জার্মাণী :—

দক্ষিণ পূর্ব এ'শিয়ার এই সঙ্গীন অবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য করণীয় কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ লণ্ডন সম্মেলনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন অবসর নাই। পররাষ্ট্র সচিবত্রয় গত ১৪ই মে রাত্রে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাঁহারা সাহায্য করিবেন এবং সেখানে কম্যুনিষ্টদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রত্যেকটি সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্মাণী সম্বন্ধে ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র সচিবগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। গোটা পশ্চিম ইউরোপ "পশ্চিম ইউনিয়ন" ও "ইউরোপীয় সম্মেলনের" মারফৎ সঙ্ঘবদ্ধ। শুধু পশ্চিম জার্মাণীকেই এই সঙ্ঘ হইতে বাহিরে রাখা হইয়াছে; কারণ তাহার সার্বভৌমত্ব আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "বন শাসনতন্ত্র" অনুযায়ী পশ্চিম জার্মাণীকে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তরাজ্যের সার্বভৌমত্ব দখলী কমিশনের দ্বারা ব্যাহত। ত্রিশক্তি তাঁহাদের এই ঘোষণার সর্তাধীনে পশ্চিম জার্মাণীকে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠির ভিতর বরণ করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

গত ১০ই মের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পূর্ব নির্দ্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী ইউরোপের স্বাধীন জাতিসমূহের সমপর্যায়ে জার্মাণীর ক্রমশঃ পুনরধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্টির অধিবাসিগণ জার্মাণীকে তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার জন্য পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে তদনুযায়ী জার্মাণীর পূর্ণ মর্যাদাসহ পুনরায় ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। জার্মাণীকে যত দ্রুত সম্ভব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্টির মধ্যে ফিরাইয়া আনার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। ফ্রান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবত্রয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাশিয়া

তাহার অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দকে গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ জার্মাণীতে তাহাদের অন্যান্য স্বদেশবাসীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার অনুমতি না দিবে ততদিন পর্যন্ত জার্মাণীর সহিত শান্তিচুক্তির কোন আশা নাই।

পররাষ্ট্র সচিবত্রয় যুক্তপূর্ণ ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, দখলী আইন কানুন পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তাঁহারা একদল অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকায় দেশে বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল বড় বড় অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য উক্ত অফিসারগণের উপর সুপারিশ করার ভার অর্পণ করা হইবে।

পশ্চিম জার্মাণী দ্রুত সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করুক, ইহাই তাঁহারা দেখিতে চাহেন। জার্মাণী বিভাগ ও আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য দমনকারী শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। পশ্চিম জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার ভাব দেখা গেলে স্বাধীনতার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

এই ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ জার্মাণীতে উভয় জার্মাণীর অধিবাসীদের মিলনের পথে রাশিয়া যতদিন বাধা জন্মাইবে, ততদিন শান্তিচুক্তি অসম্ভব।

বিবৃতির শেষাংশে স্বাধীন নির্বাচন দ্বারা জার্মাণী বিভাগের অবসান ঘটাইবার জন্য রাশিয়ার নিকট পুনরায় প্রস্তাব করা হয়।

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, এই দলিলের মূলকথা হইল এই যে, পশ্চিম জার্মাণী আক্রান্ত হইলে আতলান্তিক চুক্তির কার্যকরী ব্যবস্থা: তাজিয়া পড়িবে। আগামী শরৎকালে লণ্ডনে জার্মাণীঘটন প্রশ্নের পুনর্বিবেচনা আরম্ভ হইবে। কারণ ইতিমধ্যে ফরাসী ও মার্কিণ রাষ্ট্রদূতগণ জার্মাণীর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এই বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন।

মধ্যপ্রাচ্য :—

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব রাজনীতির কূটচক্রের একটি প্রধান কেন্দ্র। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ও আরব লীগের মধ্যে কলহ এই রাজনৈতিক ঘোরপেঁচের প্রধান ক্রীড়নক। বৃটেন এতদিন এই নূতন রাষ্ট্রটিকে সার্বভৌম মর্যাদা দিতে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি জর্ডান ও আরব লীগের কলহ চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আরব লীগ আতলান্তিক চুক্তির কাঠামোর অনুকরণে একটি নিরাপত্তা চুক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে। এই চুক্তি প্রধানত জর্ডানের প্রতি বিরূপতাদ্বারাই অনুপ্রাণিত। জর্ডান কিন্তু এই চুক্তির ধার না ধারিয়া ইসরাইলের অনধিকৃত অথচ প্যালেস্তাইনের অন্তর্ভুক্ত আরব অঞ্চল দখল করিয়াছে এবং সাধারণ নির্বাচনের মারফত তথাকার প্রতিনিধি আরব আইন সভায় গ্রহণ করিয়াছে। এই কাজের ফলে আরব অঞ্চলে স্থায়ীত্বের একটা ভাব লক্ষিত হওয়ায় বৃটিশ সরকার এই অধিকার করিয়া লওয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইল রাষ্ট্রকেও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আইনানুগভাবে স্বীকার করিয়াছে।

জেরুজালেম সহরকে আন্তর্জাতিক শাসনাধীন রাখিবার যে সিদ্ধান্ত ইউ, এন গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সোভিয়েট রাশিয়া আর অনুমোদন করিতেছে না। পূর্বের অনুমোদন প্রত্যাহার করার ফলে ইসরাইল রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছেন, কারণ এই আন্তর্জাতিক শাসন তাহাদের মনপূতঃ ছিল না। অন্যান্য প্রধান শক্তিগুলিও এই বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ ছিলেনই। সোভিয়েটের অনুমোদন প্রত্যাহারের ফলে এই ক্ষেত্রে নূতন করিয়া অনিশ্চয়তার ভাব প্রকট হইল।

নববর্ষ—

মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে কোন সংযোগ না রেখে কাল তার যাত্রা পথে সমান গতিতেই চলে। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী নর নারী যখন এদিক থেকে ওদিকে গৃহহারা হয়ে ছিটকে পড়ছে, তখনও দিনের পর দিন অতীত হয়ে একটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। ১৩৫৬ সাল বাঙ্গালী ও বাংলার পক্ষে একটি চরম দুর্বৎসর বলেই ইতিহাসে স্থান পাবে। মানুষের কায়িক ও বৈষয়িক দুঃখ কষ্টের চেয়েও বেশী পরিতাপের হয় যখন মানুষ তার মনুষ্যত্বের ধর্ম ভুলে যায়। ১৩৫৬ সাল বাঙ্গালীর পক্ষে তেমনি একটি মনুষ্যত্ব হতে স্খলনের বছর। বাঙ্গালী হিন্দু কি মুসলমান, এ বিচার করে দোষের ভাগ বাটোয়ারা করার আমরা বিরোধী। আমরা দেখেছি বাঙ্গালী চরিত্রের যা গৌরবের সে কোমল হৃদয় বৃত্তি বর্জন করে বাঙ্গালী এই বছরে পাশব ধর্মের সাধনা করেছে; এমন কি প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর যে সাধারণ সৌজন্য, সমাজ জীবনের অত্যন্ত নিম্নস্তরের দাবী—তা পর্য্যন্ত অবহেলা ক'রে, বাঙ্গালী উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেছে। তাই ১৩৫৬ সালের বিদায়ে আমরা কোন প্রকার মর্মপীড়া অনুভব করি না; বরং একটা দুঃস্বপ্নের অবসান হওয়াতে একটা স্বস্তি অনুভব করি।

১৩৫৭ সাল শুরু হয়েছে; একটা নূতন জীবনাদর্শের পত্তন এই বছরে হবে এটা আমরা আশা করিতে পারি। অন্ততঃ এই আশায় আমরা নূতন বছরকে বরণ করে নিচ্ছি। আশা করি এই বছর বাঙ্গালীর ও বাংলার জীবনে সার্থক ও সুখের হবে।

মূল উৎপাটিত বাঙ্গালী—

পূর্ব বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা শুরু হয়—তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে পশ্চিম বাংলায়-ও কতকটা উন্মত্ততার ভাব দেখা দেয়। ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ঘর ছাড়া ভিটা ছাড়া যাযাবরের মতো—এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। এদের বৈষয়িক ও কায়িক দুঃখ কষ্টের কোন তুলনা নেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হ'ল—এরা আজ সমাজ চ্যুত।—যে সমাজে এরা এতকাল বাস করেছে, সে সমাজ ভেঙ্গে চুড়মার হ'য়ে গিয়েছে; কোন নূতন সমাজ এদের গড়ে ওঠে নি। মানুষ সংঘবদ্ধ হলে ও সংঘবদ্ধ হয়ে—একটা নৈতিক জীবন যাপন করে—প্রধানতঃ সমাজের প্রভাবে ও ভয়ে। এদের পুনর্বসতির হয় দেরী হবে—ততই এবং সমাজের প্রভাবের বাইরে থাকবে ততই এদের চরিত্রের নৈতিক দিকটা ভেঙ্গে পড়বে। সরকারী দৃষ্টি এ দিকে পড়বে ব'লে বিশ্বাস হয় না; তারও সরকার এমনি একটি চিজ, যার নিজের কোন মন নেই;—কাজেই অপরের মানসিক প্রয়োজনের খোঁজ খবর নেবার মতো কোন তাগিদ তাদের হ'বে না। কাজেই যে সব কর্মীরা শরণার্থী শিবির, শরণার্থী উপনিবেশ বা শরণার্থী পল্লীতে কাজ করছেন—তাঁদের ও শরণার্থীদেরই দৃষ্টি আমরা এদিকে বিশেষ করে আকর্ষণ করছি। যে অবস্থায় ও যত অস্থায়ী ব্যবস্থাতেই শরণার্থীরা থাক না কেন, তাদের মধ্যে যাতে অতি সত্বর একটা সামাজিক জীবন গ'ড়ে ওঠে—সে চেষ্টা বিশেষ দরকার।

শরণার্থীদের পুনর্বসতি—

আজ প্রায় তিন বছর ধরে পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা যাঁরা শরণার্থী বাঙ্গালী হিন্দু পশ্চিম বাংলায় আসছে মাঝে এই প্রবাহ কিছুটা কমেছিল; তারপর আবার গত পৌষ মাস থেকে এই জন স্রোত আবার ক্ষিপ্র হয়েছে গত ৩।৪ মাসে প্রায় ১৬।১৭ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে এখানে এসেছে। এর পূর্বেও ১৬।১৭ লক্ষ হিন্দু এসেছিল

এ পর্যন্ত ৬: ৮'লে কেবল পশ্চিম বাংলায়ই ৩২।৩৩ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে। এছাড়া আসামেও কয়েক লক্ষ গিয়েছে; বিহারেও কিছু গিয়েছে; ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু গিয়েছে। সব নিয়ে মোটের উপর বলা যায় প্রায় ৪০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এই ৪০ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী কোন অপরাধে আজ ঘর ছাড়া আশ্রয়হীন? এরা দেশের বিভাগ মেনে নিয়েছিল—নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও দুর্গতিময় জেনেও—যাতে ভারতের অন্যান্য অংশ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। দেশের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার হিন্দুরা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে; কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ৮'ল বঙ্গ বিভাগ মেনে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সামিল হ'তে দেওয়া। আজ তাদের এই দুর্গতি বহু পরিমাণে ভারতের স্বাধীনতার মূল্য ব'লে মনে করা যায়। তাই এদের প্রতি সমগ্র ভারতের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া কেবল পশ্চিম বাংলার ও ভারতের মঙ্গলের দিক থেকেও এদের সত্বর পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা দরকার। এদের উপযুক্ত পুনর্বসতি না হ'লে, এই লক্ষ লক্ষ লোক দেশের উপর একটা ভার হ'য়ে থাকবে; এরা উৎপাদন করবে না কিছু—কিন্তু যে ভাবে হ'ক এদের প্রয়োজনের মতো অন্ন বস্ত্র এরা সংগ্রহ ক'রে নিবেই। ভিক্ষা বা সমাজ দ্রোহী কোন কাজের দ্বারা যদি এরা জীবিকার ব্যবস্থা করে, তাতেও দেশেরই সম্পদ ক্ষয় হবে।

আজকার আর্থিক অনটনের মধ্যে, এই ৪০ লক্ষ লোক যদি তাদের শ্রম দিয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি না ক'রে, জীবন ধারণের জন্য কেবল দেশের সম্পদ ক্ষয় করতে থাকে, তবে সেটা দেশের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। সে জন্যই বলেছি যে কেবল দেশের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও পূর্ব বাংলার এই লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা দরকার।

ভারত-পাকিস্তান চুক্তি—

দেশের একটা খুব সঙ্কটময় মুহূর্তে পণ্ডিত জওহরলাল পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁকে আহ্বান ক'রে এক চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করেন। আমরা মোটামুটি এই চুক্তি সমর্থন করেছি ও করছি। কিন্তু সমর্থন করার অর্থ এই নয় যে আমরা খুব বড় কিছু এই চুক্তি থেকে আশা করছি। এই চুক্তি যদি শুভরূপে প্রতিপালিত হয়, তবে অনেক কিছু ভাল এই চুক্তি থেকে হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা ছিল—এই চুক্তি সেই ভাবে পাকিস্তানে প্রতিপালিত হ'বে কিনা। আজ একমাস পরীক্ষার পর বলা যায় যে এই চুক্তি আশানুরূপ ফল এখনও দেয় নি। এখনও যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, তার একটা প্রধান কারণ হ'ল—যে অরাজকতার মনোভাব দু' মাস পূর্বে দেশে দেখা দিয়েছিল হঠাৎ তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলায় এখন ও লুট-পাট, ডাকাতি, নারীর প্রতি অসম্মান—এমনি সব ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং ওখানকার সরকার তা বন্ধ করতে বা দুষ্কৃতকারীদের সাজা দিতে পারছে না। ওখানকার রাজকর্মচারীদের মধ্যে এমন কতকলোক আছে, যারা হিন্দু-বিদ্বেষকে পাকিস্তানের ভিত্তি বলে মনে করে—কারণ ওর উৎপত্তিও হিন্দু বিদ্বেষেই। রাজকর্মচারীদের এ মনোভাব ক্রমে দেশ বাসীর এক অংশে সংক্রামক হয়েছে।

এর উপর পূর্ব বাংলার আর্থিক অবস্থা এমন স্তরে গিয়েছিল—যাতে সেখানকার সাধারণ লোকদের খুবই অর্থ কষ্ট হচ্ছিল। এই অর্থ কষ্টের ফলে—চুরি, ডাকাতি, লুট-পাট পূর্ব বাংলায় প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার হ'য়ে উঠেছিল। পূর্বোক্ত রাজনৈতিক মতের ফলে, হিন্দু উৎপীড়ন কতকটা অনুমোদিত কাজ বলে পরিগণিত হ'ত, তার উপর এই অর্থ কষ্ট এসে জুটল। তাই লুট-পাট, ডাকাতি, চুরি এবং নারী হরণ প্রভৃতি তাদের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক হ'ল—বিশেষ ক'রে যখন ঐ সব দুষ্কর্মের শিকার হ'ত হিন্দুরা।

তাই, আজ হঠাৎ একটা চুক্তি হ'ল আর অমনি সবাই যেন যাদুমন্ত্র বলে পূর্বের মনোভাব ও কার্যপদ্ধতি সব বর্জন করবে, এমন ত আশা করা যায় না। তবু-ও একথা স্বীকার্য যে ঐ সব অপরাধ দমনের জন্য এবং হিন্দুদের রক্ষার জন্য, পাকিস্তান সরকারের যতটা আগ্রহশীল ও তৎপর হওয়া উচিৎ ছিল, তা হয় নি—অন্তত ওখানকার

হিন্দুদের মনে সে বিশ্বাস আসে নি। হয়ত একমাস খুব বেশী সময় নয় ;—যদি এখন-ও পাকিস্থান সরকার তাদের মত ও পথ পরিবর্তন ক'রে এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী চলে, তবে এই চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রের কিছুটা মঙ্গল হ'তে পারে

এই চুক্তি থেকে আমরা কি আশা করি! আমরা মনে করি ভৌগলিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাতে উভয় রাষ্ট্রের একযোগে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় চলা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। যদি তা চলতে না পারে, তবে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষাত্মক,—উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বদা একটা বিরোধ ও হিংসার ভাব চলেতে থাকবে। তাতে উভয় দেশেরই ক্ষতি হ'বে এবং উভয় দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বার বার মার খাবে ও সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবে। বিশেষ করে উত্তর বাংলা ও বাঙ্গালী এই সংঘর্ষে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই চুক্তির ফলে আমরা আশা করেছিলাম—উভয় বাংলার বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বাভাবিক সখ্যভাব ফিরে আসবে এবং উভয় বাংলার বাঙ্গালী আবার নূতন পথের সন্ধান সমগ্র ভারতকে দিবে। উভয় বাংলার মিলনের আশা আমরা এখন-ও ত্যাগ করি নি। অবশ্য মিলন বলতে—আমরা রাষ্ট্রীয় মিলনকে বড় ক'রে দেখছি না—তার চেয়ে প্রয়োজনীয় ও জরুরি হ'ল উভয় বাংলার মনোভাব ও দৃষ্টি-কোণের ঐক্য, উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য। আজ-ও অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য বহু বিষয়ে উভয় বাংলার মিলনের ক্ষেত্র বহু পরিমাণে আছে।

এই চুক্তিকে আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার উপর আমাদের এই আশার সাফল্য নির্ভর করবে। আজ যা চলছে—তা যেন কতকটা একতরফা ব্যাপার। ভারতের পক্ষ থেকে নৈষ্ঠিক ভাবে এর সব সর্ত পালনের চেষ্টা হচ্ছে; কিন্তু পাকিস্থানে এই চুক্তি এখন-ও তেমনিভাবে পালিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাতে উভয় দিক থেকে পূর্ব বাংলায় হিন্দুরা মার খাচ্ছে। তথায় তাদের পক্ষে নিরাপদ সম্মানজনক স্থান নেই; এখানে স্থানের অভাব। যে সব মুসলমান এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে আসছে বলে একটা কথা উঠেছে—তাদের যে শূন্য স্থান হিন্দু শরণার্থীরা অধিকার করেছিল, তা আবার তাদের ছেড়ে দেবার জন্য উদ্বাস্তু হিন্দুদের আবার দ্বিতীয় দফায় উদ্বাস্তু হ'তে হচ্ছে। অথচ মুসলমানরা যে সবাই ফিরে আসছে তা-ও নয়। কিন্তু এই হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবস্থা কি হবে—সে বিষয়ে সরকারের দেখা উচিত। ভারত-পাক চুক্তিতে এমন কোন সর্ত নেই যে বার বলে পুলিশ সরাসরি ভাবে এদের আশ্রয়চ্যুত করতে পারে।

মোটের উপর কথা হচ্ছে—পূর্ব বাংলায় যদি এই চুক্তি পালিত না হয়, আর তার কড়াকড়ি প্রয়োগ যদি পশ্চিম বাংলায় করার চেষ্টা হয়, তবে জনতার বিক্ষোভের নিকট এই চুক্তি কয়দিন টিকে থাকতে পারবে—বলা কঠিন।

ডাঃ সুন্দরী মোহনের পরলোকগমন—

ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস ৯৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। যে বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে—তাতে শোক করার বিশেষ কারণ নেই। যে কর্ম-খ্যাতি ও চরিত্র-খ্যাতি নিয়ে তিনি জীবন শেষ ক'রেছেন, তাতে তাঁর সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশের চেয়ে গৌরব করার কথাই মনে জাগে। এ সবই হল তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত দিক। কিন্তু সুন্দরী মোহন ছিলেন একটা যুগের প্রতীক—অথবা কয়েকটা যুগের সাক্ষী।

শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর জন্ম; সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৩ অব্দে তিনি কলিকাতা আসেন—অর্থাৎ প্রায় ৮০ বছর তিনি কলিকাতার জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলা দেশে তখন তিনটা নৈতিক প্রভাব ক্রিয়মান ছিল। একদিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ও শিব নাথ শাস্ত্রীর প্রভাব; অপর দিকে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ এর উপর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিম চন্দ্র—যাঁরা চেষ্টা করছিলেন যাতে বাংলার যুবকদের মনে একটা বিচারবাদ ও একটা মনুষ্যত্ব-বাদ (rationalism and humanism) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি শক্তির আওতায় যে সমাজ গড়ে

উঠেছিল—তাদের মধ্যে বাঙ্গনাবাসের বসু, রামতনু লাহিড়ী অশ্বিনী কুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতির সঙ্গে সুন্দরী মোহনও একজন ছিলেন।

প্রাক-বঙ্গ-ভঙ্গ যুগ, বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ—এই সবটার মধ্যেই সুন্দরী মোহন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এর পর অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরেই সুন্দরী বাবুর যোগ ছিল। একাধারে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ চিকিৎসক, সমাজনেতা, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক ও লেখক। ডাক্তারী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এবং ধাত্রীদের শিক্ষা ও সংস্কার জন্য সুন্দরী বাবু যা করেছেন, তা বহু কাল পর্যন্ত লোকে স্মরণ রাখবে।

স্বদেশী যুগে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, ব্রহ্মবান্ধব, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির সহযোগিতায় তিনি দেশ-সেবার অনুষ্ঠান ও আয়োজনে ঘনিষ্ঠ অংশ নিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভক্ত হিসাবে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন।

বাংলার একটা বিশেষ যুগের স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী হিসাবে সুন্দরী মোহন একটা বিশেষ ঐতিহ্যের প্রতীক ছিলেন। তাঁর তিরোধানে আমরা তাই দুঃখিত। তাঁর স্বজনদের সঙ্গে দেশের বহু নরনারী তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করবে।

৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। সাধারণতঃ তিনি আমাদের মাঝে উপেন দা ব'লেই পরিচিত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যিক, সুরসিক; স্বাভাবিক সময়ে তাঁর জন্ম হ'লে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হ'ত সাহিত্যের সেবায়; সহিত্য-ও সমৃদ্ধ এবং ধন্য হ'ত তাঁর সেবা পেয়ে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন একটা বিপ্লবের যুগে; যুবক উপেন্দ্রনাথ বিপ্লবের আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তার ফলে ধীরেনের সঙ্গে তিনি 'যুগান্তর' দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিপ্লবের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। অরবিন্দ ছিলেন এই কর্মীদলের নেতা ও পরিচালক। আলিপুর বোমার মামলায় উপেন্দ্রনাথ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ পেয়ে আন্দামান যান।

তখনকার আন্দামান পরবর্তী যুগের আন্দামানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের ছিল। ঐ জেলের তখনকার বিধি ব্যবস্থা মানুষের দেহ ও মনকে ভেঙ্গে দেবার জন্যই করা হয়েছিল। উল্লাসকর, হেম, বারীন, উপেন প্রভৃতি বিপ্লবী যুবকগণ ঐ জেলের নিষ্পেষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন এঁরা মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেন, তখন তাঁদের পূর্বের প্রতিভা ও কর্মশক্তি অনেকখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে।

এর পর এল অসহযোগ আন্দোলন; উপেন্দ্র নাথ এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারলেন না। কিন্তু এই আন্দোলনের ধাক্কা থেকে একেবারে অব্যাহতি-ও পেলেন না। বিশেষ করে যখন দেশবন্ধুর স্বরাজ্য আন্দোলন সুরু হ'ল—তখন উপেন্দ্রনাথ রাজনীতিতে আবার উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে (Reg III of 1818) তিনি ধৃত হয়ে জেলে বন্দী হ'লেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর আবার খালাস হ'লেন। কিন্তু মনের স্থিতি-স্থাপকতা তখন হারিয়ে ফেলেছেন। এর পর কিছু দিন কর্পোরেশনে কাজ করেন; সেখান থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে কিছুদিন পর দৈনিক বসুমতী কাগজের সম্পাদকের কাজ নেন।

আন্দামান থেকে ফিরে আসা ও ২৩ সালে জেলে যাওয়ার মধ্যে যে তিন বছরের মতো বাইরে ছিলেন, কেবল ঐ কয় বছরই হ'ল তার জীবনের কার্যত সাহিত্য সেবার সময়। বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্মী হিসাবে তিনি 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ঐ সময় কার লেখা ছিল অগ্নি-বর্ষী। বাংলার যুবকদের মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত করার পক্ষে তাঁর তখনকার লেখার কোন তুলনা হয় না। কিন্তু ঐ সময়কার লেখা সাহিত্যে স্থান পায় নি,—কতকটা সময়ের পরিবর্তনের ফলে এবং কতকটা তখনকার সরকারী নিষ্পেষণের ফলে ঐ সব লেখা

প্রকাশ্যে থাকতে না পেরে লোপ পাওয়ায়। ১৯২০ হ'তে ২৩ সাল পর্যন্ত লেখার মধ্যে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হ'ল "উনপঞ্চাশী";—এই রেখাত্মক বইখানা উপেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দান। "নির্বাসিতের আত্মকথা"—বিপ্লবী যুবকের আত্মকথা হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ঐ সময় "আত্মশক্তি" নামক এক সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হিসেবে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন—ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিক দিয়ে তখন তার যথেষ্ট আদর হ'য়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ সুরসিক ছিলেন; জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বহু কষ্ট তিনি পেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর রসজ্ঞান লোপ পায় নি। একদিন এক যুবক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন —"উপেনদা, যুগান্তর যুগের লেখার চেয়ে আপনার এখন-কার লেখা যেন একটু নেমে গিয়েছে।" তাঁর স্বাভাবিক হাস্য কৌতুকের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"তা ত একটু হ'বেই,—তখন লিখতাম এখান থেকে"—বলে বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন এবং বললেন—"এখন লিখছি এখান থেকে"—আঙ্গুলটা নামিয়ে পেটের দিকে নির্দেশ করলেন। বুকের জ্বালায় লেখা ও পেটের জ্বালায় লেখা—এর মধ্যে পার্থক্য ত হ'বেই—এই ছিল উপেন্দ্রনাথের কথার ইঙ্গিত।

সাহিত্যিক ও রসজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ বিপ্লবের দাহনে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অনেকের পক্ষে বিপ্লব আসে কেবল ত্যাগ ও লাঞ্ছনার দাবী নিয়ে; সার্থকতা ও সাফল্য দেখা সকলের ভাগ্যে জোটে না। উপেন্দ্রনাথের জীবন হ'ল বিপ্লবের সাধনায় ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণের কাহিনীতে ভরা। এই বিপ্লবী সাধকের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে সব চেয়ে পুরাতন এবং সব চেয়ে বড়। এর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আকারে বা বয়সে নয়,—এর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল গুণগত-ও। দেশ বিদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি রাষ্ট্র ছিল—প্রাচ্য খণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট বিদ্যা-চর্চার কেন্দ্র হিসাবে। এর পর একটা সময় এল, যখন এর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ে বাংলা দেশে নানা প্রকার গুজব রাষ্ট্র হইতে লাগল। স্বজন ও আশ্রিত পোষণ, পরীক্ষার ফল নিয়ে ছিনি মিনি খেলা, ধন ভাণ্ডারের হিসাব প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে অনেক কানাঘুষা বহু বছর যাবৎ চলছিল। তারপর "লোক সেবক" কাগজের সৎ-সাহসের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যাপার সাধারণে প্রকাশিত হ'ল। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলারকে ঐ পদ থেকে সরতে হ'ল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত হ'ল।

এই কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে বাজারে বহু গুজব রাষ্ট্র আছে এবং সে সঙ্গে এমন আশঙ্কাও লোকের মনে আছে —ঐ কমিটির রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত সাধারণে প্রকাশ করা হ'বে না। সমগোষ্ঠী আভিজাত্যের সম্মান রক্ষার জন্য ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে না—এমনি একটা সন্দেহ লোকের মনে আছে।

তার উপর, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটি কক্ষে আগুন লাগল,—সমস্ত হিসাব পত্র তাতে পুড়ে গেল। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার সম্বন্ধে আর বিশেষ অনুসন্ধান সম্ভব হবে না—অন্তত হিসাব পত্র সম্বন্ধে ত নয়ই। এই অগ্নিকাণ্ড যে স্বাভাবিক নয় এবং পিছনে যে স্বার্থ-দুষ্ট লোকের হাত আছে—এমন সন্দেহ প্রায় সকলের মনেই আছে। ঐ অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী কে? এর জন্য কোন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে কি? পশ্চিম বাংলার গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্সেলার। সেখানে সব ব্যাপারে তাঁকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ মতো কাজ করার প্রয়োজন নেই; এই বিষয়ে তিনি নিজের বিচার বুদ্ধি মতো চলতে পারেন;—এটা তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব। তাই আমরা আশা করি ডাঃ কাটজু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নিজের বিচার বুদ্ধি মতো চলবেন এবং কারোর মুখ চেয়ে বা পরামর্শে চলার দরকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তের রিপোর্ট ও অগ্নিকাণ্ডের সম্পূর্ণ কাহিনী সাধারণ জানতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও সুখ্যাতি এর উপর নির্ভর

করছে। আশা করি ডাঃ কাটজু এই বিষয়ে অবহিত হ'বেন।

শোলাপুর মিল—

বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর শহরে একটা কাপড়ের কল আছে; ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলের মধ্যে বৃহত্তম কয়েকটি কলের এটি অন্যতম। এই কলে সুতা কাটবার টাকু এবং কাপড় বুনাবার জন্য ২১ হাজার তাঁত আছে;—১৩০০০ শ্রমিক এখানে কাজ করত এটি বহু পুরাতন কল। এই কলটির পরিচালনার ভার ছিল মেনেজিং এজেন্টসের হাতে; এই এজেন্টসগণই অধিকাংশ অংশের (shares) মালিক। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ মেনেজিং এজেন্টসগণ এই কলটিকে অর্থ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করছিল। সরকারী তদন্তে প্রকাশ ৬ কোটির চেয়ে বেশী টাকা মেনেজিং এজেন্টস ও ডিরেক্টরগণ (Directors) নষ্ট বা আত্মসাৎ করেছে। লক্ষিত অংশীদারগণ বোম্বাই সরকারের নিকট আবেদন করায়, এই সব তথ্য বের হয়। গত আগষ্ট মাস হ'তে মেনেজিং এজেন্টসগণ কারখানা বন্ধ ক'রে দেয়।

যখন দেশে বস্ত্রের অভাব, যখন বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করার দরকার, তখন কলের পরিচালকদের এই কাজ নিতান্তই দেশদ্রোহিতা। হয়ত ধমকি হিসাবে—সরকারকে ভয় দেখাবার জন্য তারা এই কাজ করেছিল।

বোম্বাই ও ভারত সরকার তাদের এই ধমকিতে ভয় না পেয়ে সিদ্ধান্ত করে যে সরকারী তত্ত্বাবধানে এই মিল চালু করা হ'বে। এক অর্ডিনান্স (Ordinance) জারি ক'রে সরকার এই মিল চালাবার দায়িত্ব নেয় এবং এক নূতন ডিরেক্টর সংসদ (Board of Directors) স্থাপন করে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে এর জন্য এক স্থায়ী আইন পাশ করা হয়। এই আইনের আলোচনা উপলক্ষে উদ্যোগ বিভাগের (Industries) মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ধনপতিদের উপলক্ষ ক'রে বলেন—"এই আইনের বলে খিড়কি দরজা দিয়ে জাতীয়করণের (nationalisation) প্রচেষ্টা সরকার করছে না;—কিন্তু এই আইন ধনপতিদের পক্ষে এক হুসিয়ারী বাণী (warning)। তারা যদি সাধারণের টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে থাকে বা যদি এই সব উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের ঠিক পরিচালনা না ক'রে—তবে সরকার নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হিসাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

এই আইনটির পরিক্রম খুবই ছোট; কিন্তু এর মর্ম কথা খুবই ব্যাপক। যে হুসিয়ারী বাণীর কথা শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেছেন—তা-ই হ'ল এই আইনের মর্ম কথা। ভারত সরকার যে ধনপতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছেন—তাতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে এদের সদিচ্ছার উপর সরকারের বিশ্বাস ক্রমেই কমে আসছে। আমরা এতে সুখী। তা ছাড়া আর এক কারণেও আমরা এই আইনকে অভিনন্দন করি। ধনপতিদের হাত থেকে উদ্যোগী (Industrial) প্রতিষ্ঠান ও কারখানা সাধারণের বা সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার এক পরীক্ষা এখানে হবে। এই ক্ষেত্রে যদি এই পরীক্ষা সফল হয়—এবং আমরা আশা করি, সফল হবে—তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকারী পরিচালনা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। আর-ও ৩৫টি কারখানা বর্তমানে এই ভাবে বন্ধ আছে। আশা করি ঐ ৩৫টি কলের জন্য-ও সরকার অবিলম্বে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

লায়েক আলির পলায়ন—

হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন মন্ত্রী লায়েক আলির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগে তাঁর ভূতপূর্ব মনিব নিজামের আদেশে তাঁকে গ্রেফতার ক'রে নিজ গৃহে বন্দী রাখা হয়। তার পর একদিন খবর পাওয়া গেল—গৃহবন্দী অবস্থা থেকে লায়েক আলি পলায়ন করেছেন। প্রথম যে দিন খবর পাওয়া গেল—সে দিন (৬ই মার্চ) বলা হ'ল ঐ দিন ৭টা পর্যন্ত লায়েক আলি নিজগৃহে ছিলেন।—৭টার পর তিনি পলায়ন করেছেন। পরে বলা হ'ল—তার পূর্বে-ই তিনি পলায়ন করেছেন। এখন জানা যাচ্ছে অন্তত ২।৩ দিন পূর্বে তিনি সপরিবারে পলায়ন করেছেন।

স্ত্রী-পুত্র, কন্যা—এমন কি ভৃত্যদের পর্যন্ত নিয়ে লায়েক আলির মতো লোক বেরিয়ে গেলেন, নিজাম রাজ্য ছেড়ে বোম্বাই গেলেন,—সেখানে পূর্বাহ্নেই তাঁর জন্য এরোপ্লেনে করাচী যাবার জন্য টিকেট তৈরি ছিল ; সেই টিকেটের বলে বোম্বাই থেকে করাচী চলে গেলেন। একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র ভিন্ন এই এ সব সম্ভব নয়, এবং এই ষড়যন্ত্র উচ্চ পদস্থ লোকদের দ্বারা হয়েছে—এতে-ও কোন সংশয় নেই।

ভারতীয় পার্লামেন্টে এই ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার-সূচক মুলতবী প্রস্তাব আনা হয়। ২।৩ দিন আলোচনার পর আইনের কূটতর্ক বলে সাব্যস্ত হয়েছে—এই ব্যাপারে ভারত সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। সাধারণ লোক আইনের কূটতর্ক বা ঘোরপেঁচ বুঝবে না ;—তারা সহজ ভাবে মনে করবে—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় সরকারের এই ব্যাপারে চূড়ান্ত গাফিলতি, অসতর্কতা ও কর্তব্য-চ্যুতি হ'য়েছে। এই ব্যাপারে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতা ছিল একথা প্রায় সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এই বিভাগের মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল কিছু দিন পূর্বে সরকারী কর্মচারীদের সততা, দেশ প্রেম ও কর্ম-দক্ষতার ভূয়সী সুখ্যাতি করেছিলেন। আশা করি এই ঘটনার পর সরকারী কর্মচারীদের উপর তাঁর এই অসহায় নির্ভর ও আস্থার কিছুটা লাঘব হবে।

ডাঃ মাথাইর উক্তি—

এই প্রসঙ্গে ডাঃ মাথাইর ২।১টি উক্তি আমরা স্মরণ করছি। এবার বাজেটের আলোচনায় ডঃ মাথাই ২।৩ বার এমন কথা বলেছেন—যা থেকে মনে করা যায় যে মন্ত্রী-মণ্ডলী যেন শেষ পর্যন্ত ইংরাজের পরিত্যক্ত আমলা তন্ত্রের উপর আস্থা হারাচ্ছে। ২৪শে মার্চ তিনি বলেছেন —"যখন ১৯৪৭ সালে আমরা মন্ত্রী-মণ্ডলীতে যোগ দেই, তখন আমাদের আশা ছিল যত সত্বর সম্ভব তদকালীন প্রচলিত শাসন-গঠন বা আমরা অতীত থেকে উত্তরাধিকার ভাবে পেয়েছি—তা থেকে মুক্ত হব ; কিন্তু আমাদের শাসন-কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী গ্রহণ করার পর নিজেদের অজ্ঞাতে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁচেছি যা আমাদের কাম্য শাসন পদ্ধতির পক্ষে খুব অনুকূল নয়।" আশা করি এই উক্তি সরকারের একটা নূতন অনুভূতির ফল এবং একটা নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর সূচনা করছে।

এ ছাড়া-ও ডাঃ মাথাই বাজেট আলোচনা উপলক্ষে আর-ও ২।১ টি কথা বলেছেন যা থেকে আমাদের এই আশার আর-ও সমর্থন পাই। কল কারখানার জাতীয়-করণের (nationalisation) পক্ষে যে সব মন্তব্য সদস্যগণ করেন, কার্যত তা সমর্থন করে ডঃ মাথাই বলেন—যে আমাদের হাতে উপযুক্ত যন্ত্র বা শাসন-পদ্ধতি (administration) বা প্রতিষ্ঠান নেই যা দিয়ে জাতীয়করণের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করতে পারা যায়। ডাঃ মাথাই পক্ষে এই উক্তি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ।

আমরা আশা করি যে যন্ত্র বা যে শাসন-পদ্ধতির উপর এঁরা এত দিন খুব ভরসা করেছিলেন—যে যন্ত্রের ভরসায় কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পর্যন্ত উপেক্ষা করছিলেন, আজ হয়ত এঁরা বুঝেছেন যে বিদেশী রাজ শক্তির পরিত্যক্ত এই শাসন-যন্ত্র দিয়ে গণ-রাষ্ট্র শাসন করা চলে না।

ব্যবসায়িক সততা—

ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে অধ্যাপক কে টি সাহা এক বে-সরকারী আইনের সূচনা করেন। এই আইনে বলা হয়েছে—চোরা কারবারী, ট্যাক্স ফাঁকিদার প্রভৃতি অসাধু ও অসৎ ব্যবসায়ীদের গুরুতর দণ্ড দেওয়া হ'ক। তিনি তাঁর আইনে প্রস্তাব করেছেন—মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত। পার্লিয়া-মেন্ট এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। চোরাকারবারী বা অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে কেউ কোন কথা বলে নি ; যদি বা কোন স্বার্থ-দুষ্ট লোক চোরাকারবারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে—সে-ও তার সেই সহানুভূতি প্রকাশ করবে না। আজ মনে পড়ে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল একাধিকবার বলেছিলেন—"চোরাকারবারীদের ধরে ধরে ফাঁসী দিতে হয়।"

বর্তমানে যে আইন আছে, তাতে-ও এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের দণ্ড দেবার পর্যাপ্ত বিধান আছে। কিন্তু আইনের এই বিধান কার্যত প্রয়োগ করা যায় না। কিছু দিন পূর্বে কলিকাতায় এমনি এক মামলা হ'য়েছে ;—তাতে অপরাধীকে মাত্র ২৫০৲ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সরিষার তৈলের সঙ্গে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর শিয়ালকাটা বীজ মিশ্রিত করার অপরাধে ঐ ধনী ব্যবসায়ী অভিযুক্ত হয়। বাঙ্গালী বিচারক—মাত্র ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড করে ঐ ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা মনে করি সরকার পক্ষ থেকে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা দরকার।

ব্যবসায়িক অসততা জাতীয় চরিত্রের পক্ষে একটা কলঙ্ক। চরিত্রহীন জাতির পক্ষে কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করা সম্ভব নয়। যারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য খাদ্যের সঙ্গে অখাদ্য ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশিয়ে জাতির স্বাস্থ্যহানি করতে পারে—তাদের অপরাধ একটা সাধারণ খুনী আসামীর চেয়ে গুরুতর। খুনী হয়ত একটা কি দুটা লোককে খুন করে ; ঐ শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী শত শত লোককে মন্থর মৃত্যুর (slow death) গহ্বরে ঠেলে দেয়। এদের গুরুতর দণ্ড হওয়া দরকার। তাছাড়া এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা জাতির অর্থ হানি-ও করে। বিদেশে ভারত থেকে রপ্তানী মাল সম্বন্ধে বেশ একটা প্রতিকূল মত গ'ড়ে উঠছে। মাল চালানের পূর্বে যে নমুনা দেখানো হয় বা যে বিবরণ দেওয়া হয়—রপ্তানী মাল সেই অনুরূপ হয় না ;—ইচ্ছাকৃত বিকৃতি থাকার দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য-ও ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের গুরুতর দণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই আমাদের মত এই সব মামলায় সরকার থেকে আপিল ক'রে দণ্ড বৃদ্ধির প্রার্থনা করা উচিত। বিচারকদের বলে দেওয়া উচিত যেন এই সব মামলায় তাঁরা চরম দণ্ডই দেন ; লঘুভাবে এদের না দেখেন।

বিজ্ঞানের জন্য দান—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন বিজ্ঞান গবেষণা ভাণ্ডারে অনেক ব্যবসায়ী এবং উদ্যোগ-পতি (industrialists) অর্থ দান করেছেন। ঐ সব দাতাদের নাম-ও কিছুটা তিনি প্রকাশ করেছেন। দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট ৮ লক্ষ, রতন টাটা দাতব্য ভাণ্ডার (charities) ১১ লক্ষ ৭০ হাজার, ভারতীয় ষ্টীল এবং ওয়ের কোম্পানী (Indian Steel and Wire Products) ১ লক্ষ, পরলোকগত ডি. পি. খৈতান ২৫ হাজার, ভারতীয় খনিজ সংসদ (Indian Metallurgical Association) ১০ হাজার এবং শ্রীআলগাপ্পা চেট্টিয়ার—১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন। দাতাদের এই লিষ্টের মধ্যে বাঙ্গালী দাতার নাম একটিও নেই।

বাংলার পক্ষে এটা লজ্জার কথা। ঐ গবেষণা সংসদ যে সব গবেষণার ব্যবস্থা করে—তা প্রধানত কার্যকরী—কেবল নীতিগত নয়—practical—not theoretical ;—ঐ সব গবেষণা হতে ভারতীয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান (industrial firms) ব্যবসায় প্রভৃতি উপকৃত হবে। এই শ্রেণীর সামবায়িক প্রচেষ্টায় যদি বাঙ্গালী ধনীগণ বদান্যতার সহিত দান না করে—তবে একদিকে যেমন তাদের ক্ষুদ্র মনের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অপর দিকে তাদের অদূরদর্শিতার-ও পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ব্যবসায় ক'রে বহু ধন উপার্জন ও সঞ্চয় করেছে—এমন বহু বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী কলিকাতায় আছে। তাদের এই কার্পণ্যে তাদের ধিক্কার বোধ করা উচিত।

শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাস নিয়োগ—

ভারত পাকিস্তান চুক্তি অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সংখ্যা লঘিষ্ঠদের জন্য উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন করে মন্ত্রী থাকার ব্যবস্থা আছে। ভারত সরকার তাদের তরফ থেকে শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাসকে নিয়োগ করেছেন। চারু বাবু বহুদিন হাইকোর্টের জজ ছিলেন ; এরপর ছিলেনকলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার। কাজেই সাধারণ হিসাবে কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁর আছে, একথা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু যে কাজে তাঁকে নেওয়া হল—এই কাজের পক্ষে তাঁর যোগ্যতা

কতটা হবে—সে বিষয় আমাদের সন্দেহ আছে। তা ছাড়া তিনি চিরকাল ছিলেন ইংরাজ সরকারের অনুগৃহীত। তাদের মনোরঞ্জনের বলে, তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থান পেয়েছেন; কখন-ও নির্বাচনের বা জনসাধারণের বিশ্বাসের ফলে তিনি কোথা-ও কিছু পান নি। চিরকাল জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেসের বিরোধিতা করেই তিনি ইংরাজের মনোরঞ্জন পেয়েছেন। তাই আজ যখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের মনোরঞ্জন পেয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভায় একজন মন্ত্রী হয় হলেন—তখন মনে যেন হয় ইতিহাস আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করছে। জানি না কংগ্রেসের আদর্শ কতটা তাঁর জানা আছে এবং কতটা তাঁর দ্বারা পালিত হতে পারবে। তাছাড়া যার জন-সাধারণের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠা নেই—ব্যবস্থাপক সভায় যার সমর্থক কেউ নেই—তাঁর পক্ষে মন্ত্রী হয়ে স্বাধীন মত নিয়ে কার্য চালানো খুবই কঠিন। কিসের জোরে তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠার দাবী করবেন? এই অবস্থায়—যে কঠিন কাজের ভার তিনি গ্রহণ করলেন—"দেশ সেবার" সুযোগ হিসাবে—সে কাজের গুরুদায়িত্ব কতটা পূরণ করা তাঁর সম্ভব হবে, বলা যায় না।

তাঁর নিয়োগ যখন হয়েছে, আমরা আশা করব—তিনি সুষ্ঠুরূপে একাজের দায়িত্ব পূরণ করতে পারবেন বা অন্তত চেষ্টা করবেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছোটদের বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষা, কল্পনা ও লৌকিকতা-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প চিত্রণে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুশ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকার উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৮ম সংস্করণ

সরস্বতী লাইব্রেরী ৫ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

রূপছন্দা

ত্রয়োদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার রূপনারাণ বাবু বলতেন অনেক সৎ উপদেশের কথা। তিনি কয়েকদিন আসা যাওয়ার পর আমাকে একদিন নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে আমায় বুঝিয়ে বলেন, রকম সকম দেখে তাঁর মনে হয় যে আমার লেখাপড়া "শ্রীমাধব"; আমার নিজের নেই পড়ার চাপ, বাপের দিক থেকেও ছিল না কোন তাগাদা। তার জন্য দুঃখ নাই। এদেশের বিদ্যা জাতভ্রষ্ট হয়ে জ্ঞানকরা থেকে নেমে গেছে অর্থ-করীতে। কেরানী হওয়ার চেয়ে মূর্খ হয়ে থাকা অহিতকর নয়। ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারের জাত। ওরা তৈরী করছে ওদের খাতাপত্র লেখার লোক। তার মনে সর্বশাস্ত্র পড়ে হতমূর্খ হয়ে থাক। অর্থাৎ এই মনে গোলাম হয়ে থাক এই জাতটা। যদি কোনদিন ভগবান এই দেশটার প্রতি মুখ তুলে চান, তাহলে দেখা যাবে যারা ইংরাজদের লেখাপড়া নেয়নি তাদেরই সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় আসবে। শিক্ষিতরা তাদের মাথার কাঁঠাল ভাঙ্গবে। মরবে, সর্বস্বান্ত হবে এরা। দুটুপি করতে নামবে কেরানী বাবুদের জাত।

রূপনারাণবাবু ডাক্তারীর প্রথম জীবনে চাকরীতে ঢুকেছিলেন। কোন উপরিতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বেচাল হয়ে গৃহস্থঘরের মেয়েদের প্রতি কুনজর করে। রূপনারাণবাবু একথা জানতে পেরে সাহেবকে উত্তম মধ্যম দিয়ে চাকরীতে ইস্তাফা সাহেব পুঙ্গব সেই থেকে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। রূপনারাণবাবুর প্রাণখুলে কথা বলতে আর বাধত না।

রূপনারাণবাবু আমাকে স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপদেশ দিতেন।

আমাদের বাসা থেকে রূপনারাণবাবুর বাড়ী যেতে পথে পড়ে আইসক্রীম ও কাবাবের দোকান। পথে যেতে ঐ দোকান গুলি দেখে রূপনারাণবাবু একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন "দেখ, তোর বুকটা তেমন মজবুত নয়। হাঁপানী হবার ভয় আছে। ফুসফুস গুলোকে শক্তিশালী করা দরকার। রোজ একটা করে কাঁচা ডিম খাবি ডিমে হাসের ডিম বা মুরগীর ডিম বলে কিছু নাই সব ডিমই ডিম। খেতে আরম্ভ করলে বাপ বিচার করিস না কাগের ডিম, বকের ডিম, ঘোড়ার ডিম যা পাবি খাবি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—সে কেন?

রূপনারাণবাবু বুঝিয়ে বললেন—বাঁচার মত বাঁচতে

চাস? কি আধমরার মত?—

দ্বিরুক্তি না করে বললাম বাঁচার মত।

রূপনারাণবাবু বললেন—তাহলে জীবনকে করতে হবে গতিশীল। আমি বললাম—বুঝতে পারলাম না।

রূপনারাণবাবু বোঝাতে আরম্ভ করলেন। যখন এদেশটা স্বাধীন ও জীবন্ত ছিল, এদেশের লোকে কালাপাণি এক আধবার নয় অনেকবার পার হত। এখন মরা জাত। বলে কালাপাণি পার হলে জাত যায়। মুখে আগুন এ অপদার্থের! তখনকার লোক কোথা যায় নি? পূব পশ্চিম ছিল তাদের হেঁসেলের দুয়ার। জ্যান্ত জাতের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অসম সাহসিকতায় গা ভাসিয়ে দিতে। প্রাণের ভাণ্ডারে তাদের এত জমা, যে তারা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে পারে না। মরা জাতেরা গলাপচা দেহটাকে আঁকড়ে অনন্তকাল পার করে দেবার ভ্রান্ত আশা পোষণ করে।

আমার এই কথাগুলি বেশ ভাল লাগছিল। ক্ষুধাতুর যেন অকস্মাৎ রূপণের ভাণ্ডার লোটার আদেশ ও অবকাশ পেয়েছে। আমি তবটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে চাহিলাম। এই প্রসঙ্গ চলল কয়েকদিন। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা প্রচারের ইতিহাস বেশ মনোরম করেই রূপনারাণ বাবু বলতে লাগলেন। ভারতের সভ্যতা পারস্য, মিসর, গ্রীসে গেছে একদিক দিয়ে; বর্মা, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা, চীন ও আমেরিকায় গেছে আর একদিক দিয়ে। সমস্ত ঘর পড়ে গেছে। হাতাকে কুড়েতে বাধবার উপহাস্যকর চেষ্টা চলছে কয়েকশ' বছর ধরে।

ওস্তাদজী ও রূপনারাণবাবু আমার শ্রদ্ধা এতখানি আকর্ষণ করেছিলেন যে তা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন দিন চাকর বাসায় উপস্থিত না থাকলে আমি নিজ হাতে তাঁদের তামাক সেজে দিতাম। একদিন খাঁ সাহেব তামাক খেয়ে চলে গেছেন, তারপর এলেন রূপনারাণবাবু। তামাক খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর হুঁকোটা পাওয়া যাচ্ছিল না, চাকরও বাসায় ছিল না। তামাক সেজে মুস্কিলে পড়া গেল। তাঁকে বিষয়টা জানান হল। তিনি সামনে একটা হুঁকো দেখে বললেন—ঐ যে রয়েছে।

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম—ওটাতো ওস্তাদজীর হুঁকো, একটু আগে তামাক খেয়ে গেছেন।

বিনা কাল-বিলম্বে তিনি আদেশ দিলেন—ঐটেই দে না। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। আমার সঙ্কোচের কারণ অনুমান করে বললেন—হুঁকোর কি জাত যায় রে? মানুষেরই জাত যায়,—বে জল ফেলে জল বদলে। আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় চাকর বাজার থেকে এসে পড়ল। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি অন্য একটা ঘরে, যেখানে হুঁকো থাকত না, ঢুকে ডাক্তার বাবুর হুঁকোটা এনে দিল। আর কেউ না ওটাতে খায়, এইজন্য সে হুঁকোটা ঐখানে লুকিয়ে রেখেছিল।

তামাক টানতে টানতে, হাসতে হাসতে তিনি বললেন—দেখ্ যারা বাড়ী থেকে কোথাও বেরোয় না, কুনো হয়ে যায়, তাদেরই মত বাদ বিচার। যারা পাঁচ দেশে বা পাঁচ রায়গায় যায় তাদের সে কড়াকড়ি থাকে না। আমি সুন্দরবন অঞ্চলে যখন প্রথম যাই, সে দেশের ভালমন্দ কিছু জানতাম না। নৌকোতে যাচ্ছিলাম, তেষ্টা পেয়েছে। নদীর জল মুখে দিয়ে কুলকুচো করে ফেলে দিতে হল। নুন, নুন! মাঝীদের বললাম তাদের কলসী থেকে একটু জল দিতে। তারাও দেবে না, তারা কেওট, তাদের জল ত আমাদের চলে না। আমার না জানা থাকায় নিজের জন্য আলাদা এক কলসী ভাল জল নিয়ে যাওয়া হয়নি। জোর করে তাদের জল আদায় করে খেলাম। কি করব? প্রাণ দেব? এই দেখ্ কি করে অবথা গোঁড়ামি ভাঙ্গে।"

আমি দেখলাম লাখ কথার চেয়ে একটি দৃষ্টান্ত কত বেশী মর্মস্পর্শী। ক্রমে রূপনারাণবাবু আরও অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন সে যদি চাকরী-জীবী হতে চায়, হতে পারে। কিন্তু তা হলে তিনি তাকে নিজ সম্পত্তির একটি কপর্দকও দেবেন না। বরং টিনের লম্প গড়ে সে খাবে তবু চাকরী করবে না।

ছেলেটি তখন কলেজে পড়ছিল। আমাকে আর একদিন ডেকে বললেন—তোর লেখাপড়াতো আর হবার আশা নাই। গান শেখ;—আমি কিছু সংস্কৃত শিখিয়ে দেব। বামুনের ছেলে আছিস্, ভাগবৎ পাঠ ও কথকতা করে খাবি। খবরদার চাকরীর দোরগোড়া কখনও মাড়াবিনি।

১৯০১ সালে কলাইকুণ্ডার রাজা একবার ডাকলেন। তিনি বড্ড ভাল বাসতেন আমাদের। তাঁর মেদিনীপুর সহরে বল্লভপুরের বাড়ীতে যেতে বলেছিলেন। আমাদের নিজেদের বাসা ছিল কোতালীবাজার।

কলকাতা থেকে গেলাম। স্কুলের ছাত্র; লটবহর বেশী কিছু ছিল না।

ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী নিলাম। তাঁর বাড়ীতে এসে নাবলাম। আমার থাকার জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। আমি আমার বিছানা এবং কাপড় আমার বাসটি ঘরে রেখে সহরে ঘুরতে বেরুচ্ছিলাম। ছোটবাবু—রাজার ছোটভাই—নাম উপেন্দ্র নাথ পাল—আমায় বললেন, "বেরিয়ে ত' যাচ্ছিস, ঘরে তালা দিয়েছিস?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ঘরে জিনিষপত্র রেখে বেড়াতে যাচ্ছি; তালা দেবার কথা কেন বলছেন? ছোটবাবুর উত্তর হ'ল—"বড্ড চোরের উপদ্রব রে আজকাল।" আরও বিস্ময় হ'ল। বললাম—"চাকররা ত' আছে, তারাইত দেখাশোনা করবে।" মিষ্টি হাসি হেসে ছোটবাবু জবাব দিলেন—"ওরাই ত' চোর।" কি আশ্চর্য! বাড়ীর চাকর, চোর। চোরদের জায়গা ত' জেলখানায়। আবারও বললাম—"চোর যদি, বাড়ীতে রেখেছেন কেন?" অনাঘ্রাত ফুলের মত বেবাগী আমার তরুণ হৃদয় এ প্রহেলিকা বুঝতে পারছিল না। তাই ঐ প্রশ্ন। আগের মত মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে ছোটবাবু বললেন—"তাহলে ওরা যাবে কোথায়?" এ কি রে বাবা! চোরের প্রতি সহানুভূতি! বিহ্বল নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম তাঁর পানে। তালা দিতে গেলেই বা তালা পাব কোথা? আমি ত সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। ছোটবাবু সব ব্যবস্থা করলেন।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। সেই সময় সহরের যেখান সেখান থেকে একটা গান নিজের জনপ্রিয়তা জাহির করত। "আগুন লাগিয়ে বসে আছি।" গানটি থিয়েটারের কোন পালায় ছিল। ছোটবাবু থিয়েটারের দল করেছিলেন। শিল্পী হিসাবে তাতে বারবণিতার স্থান ছিল। ছোটবাবুকে আমার সেজন্য ভাল লাগত না। আমার দুই বন্ধু ছিল জ্যোতি ও শান্তি। তাদের জিজ্ঞেস করলাম ঐ গানটি যাতে আছে সে পালার নাম। জ্যোতি বলল —"হনুমানের বস্ত্র হরণ", আমি বললাম—ধ্যেৎ। শান্তির দিকে ফিরে চাইতে সে বললে, পালার নাম, "কচুবনে লঙ্কাকাণ্ড।" বইটার নাম জানা গেল না।

তখন সহরে কলেরা হচ্ছিল। ছোটবাবু তাঁর থিয়েটারের দল নিয়ে পরের মড়া পোড়াতে যেতেন। কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করতেন। গরীবের চিকিৎসা ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর ভিতরে দুইটি বিরুদ্ধ ব্যাপার আমায় মুস্কিলে ফেলেছিল। ভাল তা'হলে কাকে বলে? এর মানদণ্ড কি তবে ভুল? একজন তিলক ছাপ পড়া লোক ছিলেন। স্বভাব চরিত্র খুব ভাল। খুব সম্মান তাঁকে করতাম। পরে জানা গেল তিনি ছিলেন পরম্ব অপহারী। কে ভাল? যে সমাজকে ঠকায় সে, অথবা যে সমাজের সেবা করে সে?

আর একটা ঘটনা বড় মজার হয়েছিল। মাথায় জটাওলা সাধু অনেক দেখা যায়। কিন্তু দাড়ীতেও জট বড়ই কম চোখে পড়ে। তেমনি একটা সাধু এসে উপস্থিত রূপনারায়ণবাবুর বাড়ীতে। এ'কথা সে'কথার পর সাধুসন্ত বাণী শোনাতে শোনাতে বললেন—মিছার সংসার, একমাত্র হরিপাদপদ্মই সার। কামিনী কাঞ্চনে সব বন্ধে গেল। এ মোহ আর ভাঙ্গে না। কত কত অবতার, মহাপুরুষ সংশিক্ষা দিয়ে পথ বাতলে গেলেন। কিন্তু সংসার অসারই রয়ে গেল। বেচারীরা আফশোষ নিয়ে ফিরে গেছেন। রমণীর কমনীয় তনু ক' দিনের? তাতেই মোহ? রূপনারায়ণবাবু বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। শেষের মন্তব্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন

"দেখ সাধু, তোমরা আসবে আমাদের গালাগাল দিতে। আর দেখে তার পুরস্কার। এ বাঁদরামি আমি করব না। গালাগাল খাবার জন্য পয়সা খরচ করতে রাজী নই, তুমি অন্যত্র দেখ।" বলে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে বসে গেলেন। সাধু দমবার পাত্র নন। আরম্ভ করলেন শঙ্করের মোহ মুদ্গর—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।

রূপনারাণবাবু খবরের কাগজটা রেখে ওচিয়ে বসলেন প্রত্যুত্তরে বললেন—ওর মানে জান? ওর মানে হচ্ছে—ওরে মূর্খ বেটা, তোর কান্তে কৈ, খন্তা কৈ? এটা সংসারীদের উদ্দেশ্য করে বলা নয়। পঞ্চাশ লাখ কুঁড়ের বাদশাদের উপলক্ষ্য করে লেখা। সমাজ তোমাদের খোরাক যোগাচ্ছে। তার বদলে কি সেবা তাকে দিচ্ছ? যারা ধন উৎপাদন করে, তারা খাঁটি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তোমরা অলস। শুধু তাদের ঘাড়ে ভাগ বসাও।

সাধু বললেন—সাধুরা সংসারবিরাগী; তাদের কাছে কি কাজ আশা করেন? রূপনারাণবাবু জবাব দিলেন—ঘুরে ঘুরে ত' বেড়াচ্ছ। যদি লোকদের সত্যিকার শিক্ষার ভারটা নিতে, কত ভাল হত। আজ শতকরা পাঁচজন লেখাপড়া জানে, তোমরা খাটলে নিরক্ষরতা কত কমে যায়? আর কিছু না করে যদি শুধু এই কথা বলে বেড়াতে —"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?—তাহ'লে যে দেশে সোনা ফলে যেত। এইটাই হত জনশিক্ষা। সকল শিক্ষার সার।" সাধু বললেন—"আমরা ত প্রকৃত শিক্ষা দিই,—বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য। রূপনারাণবাবু বললেন—"সে অতি উত্তম। খুব ভাল সময় কাটাতে চাও ত একটা কাজ বলে দিতে পারি।" সাধু বললেন—কি?

রূপনারাণবাবু বললেন—"মুরগীজাতটাকে একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম শেখাতে পার? Monogamy? তাহলে বরং একটা কাজের মত কাজ হয়। আর তোমার সময়ও কাটে ভাল।" সাধু বললেন—ওত পরিহাস। কামিনী-কাঞ্চন সত্যই মানুষকে নীচের দিকে টেনে রেখেছে। রূপনারাণবাবু উত্তর দিলেন—"কামিনী কাঞ্চন না হলে সংসার চলে? সংসারটা ভগবানের সৃজন। কামিনী-কাঞ্চন কি শয়তানের সৃষ্টি? কামিনী না হলে অবতারা আসতেন কি করে? কোন অবতারই বা বিয়ে করেন নি? রাম? কৃষ্ণ? মুনি ঋষিরা কে গৃহী ছিলেন না? অর্থের প্রয়োজন চিরদিনই আছে। প্রয়োজনকে অস্বীকার করে কিছুই সংসারে নাই। যে মায়ের কাছে এত কিছু পেয়েছ, আজ তারই দুর্নাম করে সাধুগিরির পরিচয় দিতে লজ্জা করে না? মাতৃদ্রোহী কোথাকার?" সাধু এরপর আর কথা কইতে পারলেন না। রূপনারাণবাবু বললেন—'মেয়েরা খারাপ হবার জন্য মুখিয়ে নাই। তারা তোমাদের কুপথে নিয়ে যায় না। তোমরা এত কুপথগামী যে মেয়েরা তোমাদের সামলাতে পারে না। এই হচ্ছে তত্ত্ব!"

আমার মনে হল আর একদিনের কথা। হীরেনবাবুকে একজন সাধু বিবেক, বৈরাগ্য বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাধু। সাধু লক্ষণ কি ক'রে চেনা যায়। সেই প্রসঙ্গে বলছিলেন—যথার্থ প্রেমিক সে, যাকে দেখলে আপনি মনে আসে গোবিন্দের নাম। হীরেনবাবু বলছিলেন উত্তরে—আর তাকে কি বলা যাবে, যে বলে—"তারে দেখলে আমি আপন হারা হই!"

(ক্রমশঃ)

রাজসাহী জেলে তিন বৎসর

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

(৩

জেলখানার সর্বব্যাপী একঘেয়েমির একটি গুণ এই যে ওর অধিবাসীর অন্তরের গভীরে অনুক্ষণ ওর সঙ্গীতের মতো বাজে গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা : "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং... ন চৈব..." অর্থাৎ আমি ছিলাম না এমন কোনো কাল নেই। সেই আবহাওয়ার যুগযুগের রাজবন্দীদের অন্তরের সীমাহীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ইতিহাস বহন করে সেলের অজরামরবৎ দেয়ালগুলি। প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে। সেখানকার ৩ নং সেলের ভিতরের দেয়ালে নীচের দিকে এক জায়গায় লেখা দেখলাম :

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন

আমার তা থেকে কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে পড়লাম সেই হাতেই লেখা—

যা, আর যে পারি না!

নিজের অভিজ্ঞতার দিকেও চেয়ে দেখলাম—হাজার ট্রাইকের আড়াই মাস, তার পর আরও আড়াই মাস একলা কাটিয়েছি বিলাসপুরে। এমন তীব্র ক'রে অধিকিছু অনুভব করিনি যাতে De Profundisএর কবির আসে অথবা যাতে ক'রে দেওয়ালে লিখতে হয়, আর যে পারি না! তারপর নরেনদা, জ্যোতিষ বাবু, রসিক সরকার—এঁদের জেল জীবনের কথা সব শুনলাম, সমস্ত চিত্র দেখলাম। মনে হ'ল, এঁদের অভিজ্ঞতা ক্রূরতর ও দীর্ঘতর।

আমার দ্বন্দ্বসংঘর্ষ কিন্তু একটা ভিন্ন পথ নিল। তার রূপটি আমার চোখে স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠলো রাজসাহী জেলের আমার ১৬ নং সেলের দেয়ালের একটি লেখাতে। কোনো ফরাসী জানা রাজবন্দী সেখানে লিখেছেন Ah mon Dieu, qui est une meilleure vie? হে মোর ভগবান, উন্নততর জীবন কি? অতীত রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা দীক্ষার দিকে চেয়ে এক কথায় জবাব পেলাম—নিষেধিত জীবন।

এক প্রবন্ধের সহকর্মী বলেছিলেন, কাজটি আমি করেছি, জিনিষটি আমার—এই উত্তম পুরুষগুলোকে জীবনে বার দিয়ে চলবে। নিজেকে না ছাড়তে পারলে কিছুই ছাড়া হ'ল না। এর সঙ্গে "Brand" এর কথাটা এসে যুক্ত হল : All or nothing—হয় সবই দেব, নয় তো কিছুই দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু এই তো সব নয়—প্রতি মুহূর্তের জীবনের দিকে চেয়ে চলি—কত কি যে ধূলি উড়ে এসে পড়ে, উড়ে যায়—তার তো অন্ত নেই! "দু'জনায় মিলে পথ দেখায়।"

মাঠে ঘুরি—নিজেকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করতে করতে গতি-বেগ জোর হয়ে ওঠে। রাতের নিভৃত অন্ধকারে চোখ মেলে ব'সে নিজেকেই বারি। এক একটি দিনের শেষে তৃপ্তিতে মন ভ'রে আসে : নিজের পড়াশুনো ছাড়া আদর্শের চিন্তা, পথের চিন্তাতেই দিনটি কেটেছে, অসংগতি ততটুকুই মাত্র এসেছে সমাজের সঙ্গে সংগতি রাখতে যতটুকুর প্রয়োজন।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,

—ভাবি, এ কি একটা অপরাধ? কেন? দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছি; দেশকে, স্বাধীনতাকে যদি তোমার আসনে বসাই যতনে, সে কি একটা অপরাধ? এরা কি তোমার ছাড়া? আজকের এই জেলখানার জীবনে নিজেকে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে তৈরী করবার জন্যে পড়াশুনো করছি—সে কি একটা অপরাধ? নিষেধিত-জীবন যে সব বন্ধুর সঙ্গ পেয়েছি, তাদের সঙ্গের সুখ সেই সুখের স্মৃতি,—এ উপভোগ কি একটা অপরাধ? চোখ বুজে কোনো সাকার বা নিরাকার দেবতার ধ্যান—এই কি একমাত্র নিরপরাধ কাজ?

যোগসূত্রে পতঞ্জলিও বলেছেন 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা'—চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ যদি যোগের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে যা ভালো লাগে তার ধ্যানেও সে উদ্দেশ্য সাধন চলতে পারে। যৌবনের ধর্মে শুধু ভাবি, আমার ধ্যানের আসনে থাকেই বসাই, "শূন্যমনের বৃথা উপহার" যেন কাউকেই না দিই,

কোনো মুহূর্তেই না দিই। মনের উপর এমনি নজর রাখতে চেষ্টা করি।

এ আমার অন্তরতম প্রদেশের দ্বন্দ্ব। এছাড়া, বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবহারেরও দ্বন্দ্ব আছে। সে দিকে বাইবেলের দুটি কথার ইলাষ্টের ব্যাখ্যা মনের উপর গভীর দাগ কাটে: (১) কাউকে বিচার কোরো না এবং (২) যেমন ব্যবহার অপরের কাছ থেকে আশা কর, অপরের প্রতিও তেমনি ব্যবহারই কোরো। শুধু তাই নয়, দুটো কথাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়—অপরের যে আচরণের দরুণ, যে মনোভাবের দরুণ নিজে বাধা পাই, নিজের ভিতর ক্ষোভ আসে, বিরক্তি আসে, অপরের কঠোর সমালোচনা করি, নিন্দা করি, নিজের দিকে অমনি নজর পড়ে, তেমনি আচরণের, মনোভাবের অংকুর, আভাস নিজের ভিতরও আছে কিনা। প্রতি কথায় কাজে যেন নিজেকে সংকুচিত মনে হয়। অথচ নিজেকে নির্ভুল মনে ক'রে চলা আর সঙ্গে সঙ্গে সব ভুল ভ্রান্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো—মনে হয় যেন একটা অস্বস্তিকর মনের দ্বন্দ্ব।

এছাড়া আছে, ভবিষ্যতের রাজনীতির চিন্তার দ্বন্দ্ব। ধরা পড়বার পর থেকে কতবার কত রাজকর্মচারী ব'লে দিয়েছে, ৩ নং রেগুলেশনে যাদের ধরেছে তাদের আর কখনকালে ছাড়া হবে না। এসব শুনবার পরও আমাদের গিরীনরা বলতেন, ছাড়বে না বই কি? অমনি ছাড়বে? মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটা করব, খালাস আদায় করব, তার পর বাইরে যাব।

এসব কথা স্বত্বেও প্রথমটা মনে হত না, শীঘ্র ছাড়বে। একটা সুদূর দিনে কি রাজনীতি করব, তার একটা অসাড় চিন্তার মনের উপর তেমন কোনো ছবি ভেসে উঠতো না, শুধু গতানুগতিকেরই চর্বিতচর্বণ ক'রে যে রাজনৈতিক কাজের চিন্তা করতাম, সে ঐ গোপন পন্থায় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের আয়োজন। এই চিন্তার ধারায় পরিবর্তন এনে দিল ক্রমে ১৯১৮ সালে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নীতি ঘোষণা, মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নিয়ে আন্দোলন, রাওলাট বিল নিয়ে আন্দোলন, গান্ধীজির ভারতীয় রাজনীতিতে অবতরণ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি। কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি। ইতিমধ্যে জেল জীবনের দু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে নিই।

পূজো এসে পড়লো। বেখেয়ালী গিরীনদার জেল জীবনের একঘেয়েমী ভাঙবার নানারকম খেয়াল ছিল। দরখাস্ত করা হ'ল গভর্ণমেণ্টের কাছে, আমরা যখন বিনা-বিচারে বন্দী, আমাদের বাইরের জীবনের উৎসব আনন্দে, বিশেষতঃ ধর্মোৎসবে বাধা দেবার অধিকার সরকারের নেই। বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎসব দুর্গা পূজো। তা করতে দিতে হবে।

আগে বলেছি, উপেন মুখার্জি কি প্রকৃতির জেলার ছিল। সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে লেখাল, জেলের অফিসাররাও পূজো করবে, সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যদি রাজবন্দীদের বাবদ একশ' দেড়শ' টাকার বরাদ্দ ক'রে দেয়, পূজোর তাঁদের জন্যও সংকল্প করতে বাধা নেই। গভর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ ষ্টীফেনসন কিছু টাকার বরাদ্দ ক'রে, লিখে দিল, উপযুক্তমতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা ক'রে জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে একত্রে রাজবন্দীদের পূজো করার ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্টের আপত্তি নেই।

পূজোয় বিশ্বাস আমাদের আছে কারও কারও, আমার তখন আর নেই, কিন্তু উৎসব করব না কেন, আর সে উৎসব যখন বন্দীজীবনের চিরন্তন বিধিনিষেধকে উল্লঙ্ঘন করতে চলেছে?

জেলের গেটের ঠিক বাইরে পূজোর মণ্ডপ হ'ল। আমরা যে সেখানে জেলার এবং জমাদার সিপাই পাহারায় শুধু অঞ্জলি দিতেই যাই, তাই নয়। প্রায় যখন তখন বললেই গেটের সিপাই দরজা খুলে দেয়। গেটের বাইরে অবিশ্যি একজন জমাদার আর এদিকে ওদিকে দুচারজন সিপাই নজর রাখে। পূজোর দিন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকালবেলা অল্প সময়ের জন্য জেলে আসে। তারপর জেলারের সঙ্গে ব্যবস্থায় আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

সহরের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসেন, আমরাই তাঁদের অভ্যর্থনা করি। এ যে জেলের পক্ষে কতো বড় কাণ্ড, তা জেলে যাঁরা না গেছেন, বিশেষতঃ ষ্টেট প্রিজনার হয়ে না গেছেন তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন না।

জেলার শাক্ত। পট্টাম্বর প'রে, শুধু পায়ে আমাদের জন্ত "মায়ের প্রসাদ" নিজে ঘরে নিয়ে আসে। চক্ষুদুটি তখন তার রক্ত বর্ণ, ভাষা অসংলগ্ন। সে সময় আমাদের জন্ত না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেই অবস্থাগ্রস্ত জেলারের সঙ্গে গিরীনদা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন, আর অষ্টমীর দিন জেলের বারণ' করেদিকে আমরা লুচিমেঠাই খাওয়ালাম। করেদিদের খাওয়ানটা আমাদের রাজসাহীতে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকই ছিল, সে কথা আগে বলেছি। একসঙ্গে সবাইকে খাওয়াবার সুযোগ এই প্রথম।

কিন্তু চূড়ান্ত হ'ল নবমীর রাত্রে। সেদিন বায়োস্কোপের ব্যবস্থা হয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার সিভিল সার্জনও। সেদিন মফঃস্বলে গেছে। বিশেষতঃ ষ্টেট প্রিজনারদের সম্পর্কে দায়িত্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুপস্থিতিতে জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের। এদিকে জেলার ঠিক করেছে রাতের বেলা আমাদের ঘর খুলে বের ক'রে নিয়ে অফিসের একটা ঘরে বসিয়ে বায়োস্কোপ দেখাবে। সে জেলাম্যাজিষ্ট্রেটকে পুজোর আরতি দেখতে নেমন্তন্ন করেছে। ওদিকে তো নিজে টং হয়ে রয়েছে।

উপর-ওয়ালাদের খুসি করবার সেই সনাতন পন্থা। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাসেল পূজা মণ্ডপের বাইরে থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে পুজোর আয়োজনের সব কিছু দেখছে—উপেন মুখার্জি বলে, you can go in, sir. ওদিকে কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া, কায়স্থ, বৈদ্য যে সব কর্মচারী ছিল তাদের এবং তাদের পাড়ার মেয়েদের পর্যন্ত মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পুজোর আয়োজন করতে দেয় নি। পীড়াপীড়িতে ক্যাসেল ঢুকতে গিয়ে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, উপেন মুখুজ্যে তখন বলছে, you are my father sir, you can go in with your shoes on sir,

ক্যাসেল তো অবস্থাটা বুঝলো। সে জুতো খুলে রেখেই ভিতরে ঢুকলো।

এর পর যখন উপেন মুখার্জি আমাদের খুলে এনে বায়োস্কোপ দেখাবার অনুমতি চাইলো, ক্যাসেল দায়িত্ব নিতে সাফ্ অস্বীকার ক'রে বসলো।

বায়োস্কোপ রাত ৮ টায় হবার কথা। ১০ টা অবধি স্থগিত রইলো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফিরে এসে যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললো, জেলারকে এমন অপ্রকৃতিস্থ দেখলাম যে আমি ভরসা পাইনি। তুমি যখন এসেছ, তুমি ব্যবস্থা করলে আমার আপত্তি নেই।

আরও কৌতুককর একটা উৎসবের কাহিনী বলি। সে ভূপতিদার একমাত্র পুত্র মিনুর সঙ্গে যোগেশের একমাত্র কন্যা ধলির বিবাহ উৎসব। সদব্রাহ্মণ মেজদা এতখানি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী যে তিনি এই অসবর্ণ বিবাহে পৌরহিত্য করতে রাজী হলেন: পাত্র হুগলি গুপ্তিপাড়ার বৈদ্য, আর পাত্রী বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ বংশীয়া। জেলের ধলিখানার তৈরী বিচিত্র সাজে সজ্জিত বর আর কনে ফুলসাজে সাজানো দুই ডুলিতে চার করেদীর কাঁধে চেপেছে। আর চার করেদীর গলায় ঝুলানো চার কানিস্তারা। শালপ্রাংশু হেমেনদা বিবাহের শোভাযাত্রার অগ্রগামী, আমরা সব পেছনে। কানিস্তারার আওয়াজে যে যেখানে পেয়েছে করেদী সিপাইরাও জমে নাতি দীর্ঘ শোভাযাত্রা বিপুল গম্ভীর মধুর (!) মন্থরে জেলের বুক কাঁপিয়ে আর আফিসে চমক লাগিয়ে চলেছে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল বর আর কনেকে নিয়ে। যেমন পোষাকেপত্রে, তেমনি বাস্তসমাবেশে তাদের অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে এক একজনে আর তাদের স্বস্থানে চেপে রাখা চলছে না, ম্যাও ম্যাও ডেকে আঁচড়ে কামড়ে যেমন ক'রে পারে লাফিয়ে পড়বার জন্তে প্রাণপণ করছে। যাই হোক বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল এবং পাড়ার করেদীদের প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধ হবার আগে ইতর জনের মতো ব্যবস্থার করা হ'ল।

আর একটি ঘটনা অন্য ধরণের। রাজসাহী জেলের

বিভিন্ন ইয়ার্ডে সাত আটজন রাজনৈতিক কয়েদি ছিলেন। আমরা গোপনে এঁদের খোঁজখবর রাখতাম, এবং প্রয়োজনমতো খাদ্য এবং অন্য জিনিষ পত্র দিতাম। কাণাঘুষো একটা খবর শুনলাম, ভিতের একজন পালাবার চেষ্টার বাইরে কাউকে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে। হঠাৎ দেখা গেল এঁদের অনেককে যার যার ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে ফেলা হ'ল, এবং এঁরা যেসব "বিশেষ সুযোগ" পেতেন, বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। বিশেষ সুযোগের মধ্যে তো বোধ হয় পেতেন একটু পরিষ্কার ধরণের ভাত আর তরকারী। জাঙ্গিয়ার বদলে একটু লম্বা পায়জামা। আর খাটনি এঁরা করতেন নামমাত্র। তাছাড়া, এঁদের ভিতর তিন চারজন এক সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের নিয়ে "জালডিগ্রি"তে আলাদা আলাদা বন্ধ করতে শুরু করলো। "জালডিগ্রি" মানে একটা মানুষ যতোটা লম্বা, তার চেয়ে ফুটখানেক লম্বা, এবং মোট গজখানেক চওড়া এক একটা জায়গাকে লোহার শিক এবং তার দিয়ে ঘিরে এক একটা খাঁচার মতো ক'রে তৈরী আস্তানা—তার ভিতর পাশাপাশি চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে রাত্তির বেলায় বন্ধ করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ ধাগী কয়েদি। তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বন্ধ হওয়াটা রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক।

এঁরা আমাদের খবর পাঠিয়ে অনশন করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পেলাম, লম্বা পায়জামা, ছাড়াতে গিয়ে জমাদার এঁদের কারও কারও প্রতি অপমান সূচক ভাষাও ব্যবহার করেছে। শুনে আমরা জেলারকে ডেকে পাঠালাম। জেলার বুঝলো, আমরা সব জেনেছি। সে এল না।

আমরা তখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লিখে পাঠালাম, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আমরাও অনশন শুরু করছি।

জেলার বুঝলো, ব্যাপারটা সুবিধের দাঁড়াচ্ছে না। যে রাজনৈতিক বন্দীটির পলায়ন চেষ্টা নিয়ে এই সব ঘটছে, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগে, তাঁকে গোপনে অন্য জেলে সরিয়ে দিল। পরদিন অন্যান্য বন্দীদের যার যার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং কাপড় ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনই সব দিয়ে দিল। কিন্তু হয়তো আমাদের জব্দ করার মতলবে, আমাদের কোনো খবর জানালো না।

আমরা খবর পেয়েছি। কিন্তু হাঙ্গারষ্ট্রাইকের নোটিশ দিয়ে হাঙ্গারষ্ট্রাইক করেছি, খবর যতক্ষণ ওদের কাছ থেকে না আসছে, আমরা তো ততক্ষণ খেতে পারিনে। এই ভাবেই দিনটি কাটলো।

পরদিন সকালবেলা উপেন মুখার্জি এসে গিরীনদার ঘরে ঢুকলো। গিরীনদা ধমকে উঠতেই ওতো গিরীনদার হাত জড়িয়ে ধরলো। গিরীনদা অমনি নরম হয়ে গেলেন। আমি চীৎকার ক'রে গান গাইতে গাইতে গিরীনদার ঘরে ঢুকেই ঐ অবস্থাটা দেখে থেমে গেলাম। এর পর যোগেশ দরজায় পৌঁছে গাল দিতে শুরু করেছেন। গিরীনদা বললেন, যোগেশ, উনি ক্ষমা চেয়েছেন। যোগেশ থেমে গেলেন। কিন্তু ভূপতিদা ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেলেন। গিরীনদা আর কয়জনকে থামান? ভূপতিদা বলতে শুরু করেছেন, গিরীনদা, আপনি ঐ ছোট লোকটার সাথে কথা বলছেন? He should be first kicked at, then talked to.

গিরীনদা বলছেন, থাম, ভূপতি।

উপেন মুখুজ্যে মৃদু হেসে বলে, ছেলে মানুষ, একটু বকতে দিন গিরীন বাবু।

ভূপতিদা বাইরে থেকে ফেটে পড়লেন: "No, I am not a child, I'm 28, and I have seen much of the world, much more than you have.

এর পর প্রবোধ, সতীশ বাবু সবাই পৌঁছে পাইকারী গালাগালি চালালেন। গিরীনদা তখন বেরিয়ে এসে সবাইকে শান্ত ক'রে উপেন মুখার্জিকে বিদায় করলেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯২০ সালের গোড়ার দিক। গিরীনদারা তখন চ'লে গেছেন। ঝগড়া ঝাটির আর ঘরধাও লেখার পালা তখন আমার। ইতিমধ্যে

নতুন নতুন রেটিনিউজনার্স সব অন্যান্য জেল থেকে এসেছেন। তার ভিতর অন্তরীণ আইন ভেঙে জলপাইগুড়ি জেলে যেয়ার পরে নতুন রেটিনিউজনার হয়ে এলেন সেন সেন (চট্টগ্রাম) আলিপুর থেকে এলেন চারু ধনীপুর থেকে শরৎ গুহ (ময়মনসিংহ) ঢাকা থেকে কুন্তল ও নরেন ব্যানার্জি (ফরিদপুর) এবং চাঁদপুর থেকে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রবি সেন এলেন। মোট আমাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বারো। কিন্তু সে কথা পরে।

ক্যাসেল চ'লে গেছে, নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে দার্জিলিং জলপাইগুড়ির চা বাগান অঞ্চলের কোনো মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। নাম টার্ক, চেহারাও তাই। ক্যাসেল নাস্তিক পরিদর্শনে আসতো—কখনও আমাদের আগে গুডমর্নিং বলতাম, কখনও সে-ই বলতো। আমি তখন ১৬ নং ছেড়ে ৭ নং সেলে এসেছি, অর্থাৎ আমার সেলটাই ইয়ার্ডের মধ্যে প্রথম। আমি সেল থেকে বেরিয়ে বললাম Good morning. দেখলাম, কারও সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে সোজা ইয়ার্ডের মাঝামাঝি একটা সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ততক্ষণে সবাই এসে জমেছে। ও একটা ফাইল বের ক'রে বলে, চিঠি সেন্সর করা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আমি কয়খানা দরখাস্ত পেয়েছি। তার ভিতর এই একখানায় ভাষা রয়েছে "indiscriminate interdiction of letters" আর "unconscionable delay"—এটা কার দরখাস্ত? যোগেশ বলেন, আমার। কে এর সুবিধা ক'রে দিয়েছে? যোগেশ বলেন, দিয়ে তোমার কাজ কি? আমার সই রয়েছে, আমার দরখাস্ত।

টার্ক বলে, পুলিশের বিরুদ্ধে এই রকম ভাষা যদি ব্যবহার কর, তোমাদের দরখাস্ত বিবেচনা তো করাই হবে না, পড়াও হবে না।

আমি গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করি, এমন কোনো আইন আছে?

আইনের কথা শুনেই পেছন ফিরে রওনা হ'ল। তখন যতো রকমের বচন আমাদের যার মুখে এল ঢিল ছোড়ার মতো ক'রে পেছন থেকে ছুঁড়ে ও আর ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল না।

বচন শুধু মৌখিক হ'ল না—পরদিনই লেখে ভারত সরকারের বরাবর পাঠান হ'ল। বিকেলে জেলার এসে অনুরোধ জানায়, দরখাস্তখানা ফেরত নিন।

আমি বলি, ম্যাজিস্ট্রেট কথা চেয়ে চিঠি লিখুক।

এর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দর্শন নেই। অথচ আইনে বলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতি মাসে একবার ক'রে রেটিনিউজনারদের দেখতে আসবে।

টার্ক বদলি হয়ে গেল। তার জায়গায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এল পরবর্তীযুগের স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান রীড্ সাহেব। আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিদর্শন শুরু হ'ল।

অপর একটি ঘটনা সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিয়ে। আ সাহেব তখন বদলি হয়ে গেছে। তার জায়গায় এল মেজর গয়েল। পাঞ্জাবী। পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বউ হয়ে যে যত মার খায়, শাশুড়ী হয়ে সে ততো মারে। এই লোকটি তার একটি দৃষ্টান্তস্থল। উচ্চতরপদের কর্মচারীদের কাছে ধমক খেলে যতোখানি কেঁচো হয়ে থাকতো, নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি ততো অন্যায় জুলুম করতো। রাজসাহীতে এসেই কয়েদিদের প্রতি শাসন কড়া ক'রে তুললো। জেলে জেলার বংশের সঙ্গে ডাক্তারদের ঝগড়া চিরন্তন। গয়েল নিজে ডাক্তার হয়েও জেলারের কথায় ডাক্তারদের সঙ্গে অকারণ কলহ করতো।

রাজসাহীতে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আনবার কি পরিমাণ পেরাম আগে বলেছি। গয়েল এসে কিছু দিন বাদে জেলারকে দিয়ে ব'লে পাঠাল, নতুন কাপড় জামা পেতে হ'লে পুরানো কাপড়জামা ফেরত দিতে হবে।

আমি বলি, দেব না।

জেলার পুনরায় এসে বলে, একটা পাত্র রেখে দেওয়া হবে, ছেঁড়া জামা ছুঁড়ে তার ভিতর ফেলবেন।

আমি বলি, সেখানে থুঁসি ফেলব।

আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

আমরা ওখানে যারা দু'বছর আড়াই বছর যাবত আছি, তাদের এক একজনের ছুটো তিনটে ক'রে কাঠাল কাঠের বাক্স হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর জন্যে জেলে তৈরী চৌকিদারী কাপড়ের একটা একটা ক'রে খেরাটোপ হয়েছে। এখন নতুন যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কেউ এক সঙ্গে তিনটি খেরাটোপের অর্ডার দিয়েছেন।

একটা খাতায় প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের ফর্দ লেখা, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সই ক'রে দিলে জিনিষ গুলো আমাদের কিনে বা তৈরী ক'রে দেওয়া হ'ত। গরেল তো তিনটি খেরাটোপের অর্ডার এক সঙ্গে লেখে কেটে দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঁচ পাতা দরখাস্ত—তা'তে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের রাজসাহী জেলে যতোরকম অন্যায় জুলুমের কাহিনী।

আবার জেলারের ডাক। অনেক ধরাধরির পর খাতায় লিখে দিলাম, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোনো জিনিষ না দিতে পারে, কিন্তু খাতায় কিছু কাটতে পারবে না। কোনো দাবী অন্যায় ব'লে মনে হ'লে আমাদের ডেকে আলোচনা করবে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখে দিল, "Agreed". দরখাস্ত ফেরত নেওয়া হ'ল। এর পর যে কয়মাস রাজসাহীতে ছিলাম, গরেল সাহেবের সাথে আমাদের ভালই কাটে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'brass'—বাংলায় কি বলব 'ঠ্যাটানি?' অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, বিনাবিচারে বন্দী হয়ে জেলে থাকতে গেলে ওর খানিকটা না হ'লে কর্তারা কাবার তলায় ঠেসে রাখতে চান—ন্যায় যুক্তির উপরে মাথা তুলে না রাখলে, ন্যায়যুক্তির তলায়ও ওর স্থান হয় না, কারণ, বিনাবিচারে বন্দী ক'রে রাখার ব্যাপারটাই ন্যায়যুক্তির সীমার বাইরের ব্যাপার। সেটাকে মনে মনে যে মেনে নিয়েছে, কর্তারা তাকে ঘিরে অনেক কিছুই মানিয়ে নেন। সে কথা স্পষ্ট হবে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আমাদের বন্দীজীবনের কাহিনী যখন বলব।

আর সব ছোট খাটো ঘটনার উল্লেখে কাজ নেই। এখন এসে পড়লো আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার জগতে যন্ত্রের দিন।

একটা ধারণা আমাদের অনেকে পোষণ করতেন, দেশ যখন একেবারে শান্ত হবে, আমরা যদি খালাস হই, তখন হ'তে পারে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঠিক উল্টো। ধরপাকড় যখন চলেছিল, দেশ তখন ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছিল। এরই যেন সীমারেখা টেনে দিল অ্যানি বেশান্তের ধরা পড়ার। আবার ধরা দেবে সাড়া জাগলো। পার্থোমিটারে পারা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে রইলো। বাংলার রাজবন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নেতা সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'সার' উপাধি ছাড়তে হ'ল। মণ্টেগু মনে করেছিলেন, দো-আঁসলা ধরণের কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে দেশকে ঠাণ্ডা ক'রে ফেলবেন। ফল উল্টো ফললো। নরম-পন্থী কংগ্রেস গরম হয়ে উঠলো, শাসন সংস্কার গ্রহণে আপত্তি জানালো।

কিন্তু আগুন জ্বললো রাওলাট আইনের প্রস্তাবে। যুগান্তর বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র আর কোনো রকমে ফলপ্রসূ না হোক, গান্ধীজিকে ভারতের রাজনীতিতে নামালো। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যাগ্রহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত দেশের চেহারা ফিরে গেল।

এই উতলপাতলের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তি দ্রুত হ'তে লাগল। আজ না হয় দুদিন বাদে খালাস হবেই। কি করব তখন বাইরে গিয়ে?

চারু এলেন আলিপুর জেল থেকে। ব্যক্তিগত জীবনের সুতীব্র দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের বন্যা বয়ে গেছে দু'বছরের

জেলের জীবনে। অন্তরের তলা অবধি কপোতাক্ষের জলের তলদেশের মতো স্পষ্ট। প্রীতিস্নেহ কোথাও যেন কোনো সীমারেখা মানতে চায় না। এরই সঙ্গে নিজেকে গ'ড়ে তুলবার আগ্রহ বেধনা এক মুহূর্তও অসাড় হ'তে জানে না। আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন করে কোন্ মুহূর্তে স্তিমিত হয়েছে, তারই জন্য ক্ষমাহীন আঘাতের পর আঘাতে দেখি, অমন সদা উদ্দাম, চঞ্চল, সহাস্য মূর্তিটীকে মুষড়ে তুলেছেন।

বলি, কিচ্ছু হয় নি।

যুগপৎ কান্নাহাসিতে সমতা ছুটে ওঠে। প্রশ্ন করেন, কি করব বাইরে গিয়ে?

কুন্তল এলেন ঢাকা জেল থেকে। এখানকার অবস্থা ছিল রাজসাহী জেলের গোড়ার দিকের চেয়ে বরং খারাপ ছাড়া ভাল নয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর গভীর অনুভূতির অপরূপ সামঞ্জস্যে গড়া এ মানুষটিও জেল জীবনে অন্তরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পান নাই। অব্যাহতি পান নাই, শুধু তাই নয়, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। বরং রামানন্দ স্বামীর কথার অনুকরণে বলা চলে, যে মানুষ যতো গভীর, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ জেলের জীবনে তার ততো বেশী। কিন্তু আপনাকে ভুলে থাকার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এমন এঁর মেদমজ্জায় জড়িত যে, নিজেকে খুলে ধরলেন আস্তে ধীরে। তার আগেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন, কি করব বাইরে গিয়ে?

পড়াশুনো করার সুযোগ চারু অনেকখানি পেয়েছেন আগে হাজারিবাগ জেলে। ঢাকা জেলের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। কুন্তলের পড়াশুনো করার ক্ষমতা ছিল আমাদের অনেকের চাইতে বেশী। আগ্রহ দুজনারই সমান। রাজসাহী কলেজ থেকে বই আনিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সারাদিন পড়াশুনো করেন। রাত্রে ঘরের এক কোণে পাটি বিছিয়ে তিনটি বাধা এক জায়গায় ক'রে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি—রাত দুটো বাজে, তিনটে বাজে।

শুদ্ধমাত্র গুপ্ত সমিতির আয়োজনে একটা দেশে বিপ্লব হয় না। জনসাধারণের ভিতর কাজ করা চাই। কি কাজ? কি ভাবে করব? কংগ্রেসে যোগ দেব? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা সংস্কার ছিল। তার কারণ, আগেকার দিনে যে-কংগ্রেসকে আমরা চিনতাম, সে তো শুধু প্রস্তাব পাশ করার একটা সংঘ।

কিন্তু কংগ্রেস নতুন রূপ নিচ্ছে গান্ধীজির নেতৃত্বে। এখন শুধু প্রস্তাব পাশ করা নয়, কাজ করা, সে কাজ বিদেশী সরকারকে আঘাত হানার কাজ এবং দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে।

ইঙ্গিতটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হ'ল আমাদের দলের সত্যেন মিত্র প্রভৃতি যুক্তি পেয়ে যখন কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

কিন্তু আমরা তিন জনতো দলের সব নই, অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। অন্যত্র আর সবাই কি ভাবছেন কে জানে?

সব সমস্যার সমাধান হ'ল ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনদা যখন এসে পড়লেন হাজারিবাগ জেল থেকে। সেখানে সুরেন ঘোষ, অরুণ গুহ, সাতকড়ি ব্যানার্জি প্রভৃতি দলের প্রধান প্রধান কর্মী আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটি মোটা-মুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। দেখা গেল, চিন্তার ধারা তাঁদের আমাদের এক। সিদ্ধান্তও একই। তবে সেখানে তাঁরা একটা চলবার পথের ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন, এখানেও আমাদের কাছে মনোরঞ্জনদা সেটা স্পষ্ট ক'রে তুললেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে স্তরে আমাদের জীবন পথ খুঁজেছে। এই তার শুরু। আনন্দ পেলাম এই ভেবে যে, আমাদের যাঁরা যাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছিলেন, তাঁরা পথের সব দ্বন্দ্বের পরে মোটামুটি একই সমাধানে পৌঁচেছেন।

সমস্যা তখনও রইলো দুটি: প্রথম—গান্ধীজির অহিংসা। কিন্তু এ বাধা দুরতিক্রম্য ব'লে কারও মনে হয় নাই। কারণ, জেলে চিন্তার বিকাশের যে সুযোগ ছুটেছিল তাতে বুঝলাম, বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান শক্তি জাগ্রত জনগণের স্বাধীন হবার মরিয়া আগ্রহ, অস্ত্র নয়। যে-জাতের (সেদিন পর্যন্ত) সেই আগ্রহই জাগে নাই, সে

অস্ত্র পেয়েই বা কি করবে? তাছাড়া, জাতকে জাগাবার কালে, একথা প্রচার ক'রে বেড়ান চলে না যে, জাগ্রত জাতি অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অহিংসাকে তাই আমরা নীতি বা policy হিসাবে গ্রহণ করি, গান্ধীজির মতো ধর্ম হিসাবে নয়।

দ্বিতীয় বাধা, জেলে আমরা যারা ছিলাম, তারাই দলের সব নয়। যতীন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর যাঁরা দলের নেতৃস্থানীয় হয়ে দাঁড়ালেন, যথা, যাদু গোপাল মুখার্জি, অমরেন্দ্র চাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর —এঁরা তখনও পলাতক। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে দলের নীতি চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হ'তে পারে না। কিন্তু এ বাধাও সাময়িক। খালাস হয়ে গেলে এঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে সিদ্ধান্ত পাকা করা শক্ত হবে না।

অনুশীলনের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এইবারে পাকা হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা হয়তো গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে লড়বার উদ্যোগ তখনও ভাবছেন। কাজেই তাঁদের কাছে অর্থের সমস্যাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরলেন।

অপ্রীতিকর তুচ্ছ ঘটনা রাজসাহীর জেল জীবনে অনেক ঘটেছে। কিন্তু পড়াশুনো আর আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে সেগুলোকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি। ইতি-মধ্যে প্রফুল্ল বাবু খালাসের আগে অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। পরে মনোরঞ্জনদার সঙ্গে এলেন রবি সেন। দু'জনে একটা ছন্নছাড়া চরেছিল হাজারিবাগ জেলে। সেখানে ৬৪ দিনের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের কালে একই সেল ব্লকে ছিলেন আমাদের মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা এবং অনুশীলনের রবি বাবু ও নরেন ভট্টাচার্য (রাজসাহী)। ওখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলসন এঁদের চারজনকে ঠাউরেছিল হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের নেতা। তাই জোর ক'রে নল চালিয়ে খাওয়াতে এসে এঁদের ঘুষিঘাষি মারতো, এবং প্রতিদানে জোড়াপায়ের লাথিও খেয়ে যেত।

এই সবের ফলে রবি বাবু সব ব্যাপারে মনোরঞ্জনদার পরামর্শ নিতেন এবং মনোরঞ্জনদাও রবিবাবুকে না জানিয়ে কিছু করতেন না। রবিবাবুর সংস্পর্শে সতীশবাবুর ভিতর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল, প্রবোধ তো দলাদলিতে কোনো সময়েই রস পেতেন না। অনুশীলনের আর একজন নতুন এসেছিলেন ঢাকা জেল থেকে, নরেন ব্যানার্জি। জেল জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর ভিতর এসে পড়েছিল এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্য। জেলের এই অর্ধসন্ন্যাসী খালাসের পর পাবনার "সৎসঙ্গে" যোগ দিয়ে পাকা সন্ন্যাসীই হয়ে যান।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা শান্তি পেলাম এবং সে শান্তি খালাসের দিন পর্যন্তই বজায় ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য বরং গভীর হবার আশংকা দিন দিন বেড়ে চললো।

গোপনে তখন আমরা অমৃত বাজার, বেঙ্গলী প্রভৃতি সব রকম কাগজই পাই। তা'তে দেখি, ওদিকে আন্দামান থেকে বারীন বাবু, পুলিন বাবু প্রভৃতি খালাস হয়ে এলেন, এদিকে জেল ও অন্তরীণ থেকে শত শত বন্ধুরাও মুক্তি পাচ্ছেন। এর ভিতর লক্ষ্য করছি, অনেকের থাকবার আশ্রয় নেই, জীবিকার উপায় নেই। তা নিয়ে আলোচনা আন্দোলনও চলছে। দেশের নেতারাও কারও কারও উপায়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও দেখা গেল, Y.M.C.A.র O. R. Rahar নেতৃত্বে এবং বি. সি. চাটার্জি, এস. আর. দাস প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সহযোগিতায় মুক্ত রাজবন্দীদের জন্য একটা স্ত্রী কিচেন জাতীয় মেস প্রতিষ্ঠিত হ'ল বেনেপুকুরে। এই মেসের বিশিষ্ট উদ্যোগী শ্রীনলিনী কিশোর গুহ।

ক্রমে দেখা গেল, আমাদের বন্ধু যাঁরা খালাস হচ্ছেন তাঁদের ভিতর প্রায় কেউই এ মেসের কাছ ঘেঁষলেন না, বরং কংগ্রেস ঘেঁষা হয়ে দাঁড়ালেন। এই মেসে আশ্রয় পেলেন প্রায় সবই অনুশীলনের লোক, আর এই মেসের ভিত্তিতেই কয়েক মাসের ভিতর পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে যোগাযোগে গ'ড়ে উঠ্‌লো "ভারত সেবক সংঘ", এর দু'খানি প্রচারপত্র পরে বের হ'ল "হক কথা" ও "শংখ"।

নলিনী বাবু এ দু'খানার সম্পাদক। এর প্রচার কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

এগুলি অবশ্য হয় আমাদের খালাসের পরে। কিন্তু বেনেপুকুরের মেসটাকেই এমন কি অনুশীলনের যোগেশ ও আশু কাহিনী পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মসম্মানের দিক থেকে সুনজরে দেখতে পারেন নাই। পালংএর আশু বাবু রাজসাহী জেল থেকে প্রায় সবাই খালাস হয়ে যাবার পর রাজসাহীতে আসেন। খবরের কাগজের খবর পড়তে পড়তে গভীর দুঃখে তিনি একদিন বলেন, এরা এখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে কেন? এর চেয়ে খবরের কাগজ ভিন্নি ক'রে খেতে পারেনি?

এদিকে খালাসের গতি দ্রুততর হ'তে হ'তে অবশিষ্ট প্রায় সব ক'জন এসে জুটেছেন রাজসাহীতে: একদিন দুপুরবেলা জেলার এসে বলে, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী নেলসন, আর আই. বির ডি. আই. জি. ডিকসন সাহেব এসেছেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আফিসে চলুন।

আমরা কয়েকজন বেরিয়ে প'ড়ে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি, বাকীরা তৈরী হয়ে আসছেন। কুন্তল তখন বলেন, দেখ, এ লোক] দুটোর কিন্তু একটা বাতিক আছে।

কুন্তল যে কাহিনী বললেন, তা এই: ঢাকা জেল থেকে কুন্তল বদলি হবার কয়েক দিন আগে এরা দুজন সেখানে যায়। সর্বশেষ কুন্তলকে আফিসে ডাকে। সেখানে পৌঁছে দেখেন, এরা দুজন দুখানা চেয়ারে ব'সে আছে, আর কোনো চেয়ার নেই।

কুন্তল বলেন, চেয়ার কোথায়? নেলসন বলে, আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে বলতে হবে। কুন্তল টেবিলের উপর চেপে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে শুনি?

নেলসন বলে, আমি বাংলা গবর্ণমেণ্টের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী। কুন্তল জিজ্ঞেস করেন, তোমার সঙ্গে কথা না বললে কি হয়?

ও বলে, না বললে। তখন কুন্তল উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, তোমার মতো অভদ্রের সঙ্গে আমি কথা বলিনে। ব'লে বেরিয়ে চলে আসেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে আফিসের দিকে একটা ঘটগাছের তলায় আমরা পৌঁছেছি। জেলারকে বললাম, যান, ভিতরে গিয়ে আগে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। জেলার বলে, সে হয়ে যাবে।

আমি বলি, হয়ে যাবে-তে কাজ নেই, আগে যান।

একটু বাদে জেলার মুখ কালো ক'রে ফিরে এসে বলে, সাহেব বললেন, দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।

আমরা সেলে ফিরে এলাম, দু'একজন গেটের সামনা সামনি গিয়ে একটু বেরালের ডাকও শুনিয়ে এলেন। আবার, এই চেয়ারের প্রশ্নটাকে এত বড় ক'রে তোলাতে দু'একজন একটু অসন্তুষ্টও হ'লেন।

দিন তিনেক পরে খানিকটা সম্পাদকীয় মন্তব্যের সাথে খবরটা অমৃত বাজার পত্রিকায় বেরিয়ে গেল।

ষ্টিফেনসন তখন বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী। কয়েকদিন বাদে খবর পেলাম, সে ঢাকা থেকে লাফে ক'রে রাজসাহী আসছে। সে কিন্তু এই প্রশ্নটি তুলবারও সুযোগ দিল না। সোজা আমার ঘরের ভিতর ঢুকে আলাপ জমিয়ে তুললো। রাজসাহীর বর্তমান কলা ও রাঘবসাধী সন্দেশও কিছু খেল। এবং আমাদের ভিতর যাঁর খুশি, আমার খাটে ব'সে, যাঁর খুশি, দাঁড়িয়ে আলাপ ক'রে নিলেন। সবার সাথেই দু'চার মিনিট ক'রে আলাপ করলো। সবই প্রায় weather talk. ওরই ভিতর খালাসের জন্য আমাদের মন পরীক্ষা হয়ে গেল।

আমার বললো, আপনাদের তিনজন ছাড়া আর সবাইকে তো খালাস দেওয়াই আমরা স্থির ক'রে ফেলেছি।

আমি বলি, একজন তো বুঝ্‌ছি, এই গরীব বেচারি। আর দুজন কে?

ষ্টীফেনসনের কথা ভাল বোঝা যেত না। একটা কার নাম বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, কে?

"Paresh," Amrita Sarker, you don't know Paresh of Anusilan?

আমি বললাম, Yes, আর একজন কে ?

প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে ও অন্য কথা পেড়ে বললো।

ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনদা ও রবিবাবু ঢাকা জেলে বদলি হ'য়ে গেছেন। তাঁদের মায়ের অসুখ—তাঁরা যথাক্রমে বরিশাল ও ময়মনসিংহ গেলেন। দু'জনারই মায়ের মৃত্যু হ'ল; সঙ্গে সঙ্গে দু'জনারই বন্দী অবস্থাও ঘুচলো।

চারু সেই বছরেই বি. এ. পরীক্ষা দেবেন এবং পরে শুধু বি. এল। এই উপলক্ষে দু'জনাই ছাড়া পেলেন।

এর পর একদিন ডিকুসন আবার এসে হাজির। ইতিমধ্যে ধড়ে বুদ্ধি এসে গেছে। ইয়ার্ডের মধ্যে একা একা ঢুকে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা শুরু করলো। বলে, আমরা তো সব ছেড়ে দেওয়াই ঠিক ক'রে ফেলেছি। তবে বাইরে কাজকর্মের যোগাড় হচ্ছে না, এই যা অসুবিধা। বিজয় (বি. সি. চাটার্জি) আমাদের খুব সাহায্য করছে, তবু খেতে উঠছি না।

আমি বলি, তা হ'লে কুন্তলকে আর প্রবোধকে ছাড়ছ না কেন? কুন্তলকে বিজয় নাগ (পরে পণ্ডিচেরি আশ্রমের) তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিতে ডাকছেন, আর প্রবোধের জন্য তাঁর ভাই কাজ যোগাড় ক'রে রেখেছেন।

তাই নাকি? আমরা তো জানতাম না! দেখা যাক্ কি করতে পারি।

এর পর সপ্তাহখানেকের ভিতর ওঁদের খালাসের হুকুম এল।

ওঁদের দুজনকে অফিস থেকে বিদায় দিয়ে আমি আর সতীশবাবু হারাধনের দুটি ছেলের মতো ফিরছি, জেলার বলে, আজকের রাতটিই মাত্র নির্জনতা ভোগ করতে হবে। কালই আবার তিন জন আসছেন।

নেই তো প্রায় কোথাও কেউ, আবার কে আসছেন?

পরদিন এলেন অধ্যাপক প্রভাস দে, আর পালংএর আশু কাহিলি ও রাইচরণ সেন।

সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে গেছি গেটে। প্রভাস বাবু সেলের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জেলারকে বলেন, ওখানে যাব না। জেলার বলে, চলুন, স্নান করুন, খান, তারপর হবে'খন।

প্রভাস বাবু বলেন, স্নান করতে কেন, মলত্যাগ করতেও ওখানে নয়।

আমি যত বলি, আমরা উপরেই থাকি, উনি যেন শুনেও শোনেন না।

প্রভাস বাবুর এই তৃতীয়বার রাজসাহী জেলে। প্রথম বারে ছয় মাসে তিন চারিটি সেলের পর বাল্য বন্ধু হরিশ শিকদারের সন্ধান পান নাই। দ্বিতীয় বারে জেলার রায় সাহেব গুরুচরণ দত্তের উপর ক্ষেপে গিয়ে এক লাথিতে অ্যাটিসেলের কাঠের দরজা কাটিয়েছেন। আর এই তৃতীয় বার।

এর পর, সপ্তাহ তিনেক এক সঙ্গে আমরা পাঁচজন রইলাম। এমন সময় পাইকারী ভাবে খালাসের পরোয়ানা এল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খালাসের নীতি ঘোষিত হয়েছে। আর এখন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর।

আমিই প্রথম রাজসাহী জেল ছাড়লাম। আগের দিন রাত্রে প্রভাস লাহিড়ি খবর পেয়ে বল বল নিয়ে এসে রাস্তা থেকে ডাকাডাকি ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। বছর চারেক আগে একদিন গৌহাটির পথে তাঁকে নলিনী ঘোষের সঙ্গে চন্দননগর থেকে ব্যাণ্ডেলে ট্রেণে চড়িয়ে দিয়েছিলাম।

পরদিন জেল থেকে বেরিয়ে প্রভাস বাবুর বাড়ীতে উঠলাম। সহরটা দেখা হ'ল। সন্ধ্যায় অনেকে মিলে নৌকায় পদ্মা বেড়ানো গেল। মুক্ত জীবনে প্রথম একটি শান্ত সন্ধ্যা, অন্তর যখন চঞ্চলতায় ভরপুর।

পরদিন কলকাতা রওনা হলাম।

কংগ্রেসে সঙ্কট

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন ক'রে কংগ্রেস এখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছে। হঠাৎ কংগ্রেসের কার্যক্রমে একটা মৌলিক পরিবর্তন এসে গেল। গত ২৫।৩০ বছর কংগ্রেস বলেছে ধ্বংসমূলক কথা,—আইনভঙ্গ আন্দোলন চালিয়েছে, সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস প্রচার করেছে, প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা ক'রে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা ও আশ্বাস দিয়েছে। তারপর হঠাৎ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে—তাকে বলতে হচ্ছে স্থিতিমূলক কথা,—আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বলছে, সরকারকে মেনে চলতে বলছে—আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে সম্মান করতে বলছে। কংগ্রেসের কার্যক্রমের এই হঠাৎ পরিবর্তন স্বভাবতই লোকের নিকট একটু বিসদৃশ ঠেক্‌ল, বিশেষ করে এই জন্য যে স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন লোকে দেখতে পায় নি। সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে পরিবর্তন কতকটা সময়সাপেক্ষ; ধীরে ধীরে তা হতে পারে—একথা জনতার একটা অংশ নিশ্চয় বুঝতে পারে। তাই এই পরিবর্তনের অভাবে তারা ততটা খুঁত ধরতেন; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও ব্যবস্থায় যে কোনই পরিবর্তন হয় নি, এটা দেশের জনসাধারণ সহজ ভাবে নিতে পারে নি। অথচ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের পুরানো কার্যক্রমের ও কথার প্রায় মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেল,—এটা জনসাধারণ মোটেই ক্ষমার চক্ষে দেখেনি।

প্রায় তিন বছর অতীত হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রায় কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পূর্ব্বের মতোই আমলা তান্ত্রিক রয়ে গেছে; অথবা পূর্ব্বের চেয়েও আরও বেশী আমলা তান্ত্রিক হয়েছে। কর্মচারীর সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেড়েছে; শাসন যন্ত্রের গতি পূর্ব্বের চেয়ে শিথিল ও মন্থর হয়েছে; অসততার প্রভাব পূর্ব্বের চেয়ে মোটেও কমেনি; কর্মচারীদের উদ্ধতভাব পূর্ব্বের মতোই রয়েছে, জনতার সংগে রাষ্ট্রযন্ত্রের যোগ পূর্ব্বের মতোই প্রায় অস্তিত্ব-বিহীন। এই অবস্থায় কংগ্রেসের প্রতি লোকের আস্থা স্বভাবতই শিথিল হবে এবং হয়েছেও।

তদুপরি প্রায় সর্বত্রই কংগ্রেস সংগঠন ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কার্য্যের কোন সহযোগিতা নেই; হয় কংগ্রেস সংগঠন মন্ত্রীমণ্ডলীর তাঁবেদারী করছে নয়ত উভয়ের সম্পর্ক কতকটা পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠেছে। কতক কংগ্রেস কর্মী আজ মন্ত্রীমণ্ডলীর সভ্য; তাঁদেরই সহযোগী কতক-কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে আছে। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীভুক্ত কংগ্রেসকর্মীগণ সংগঠন পরিচালক কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি একটা বিরূপতার ও অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে চলছে; সময়ে সময়ে তাদের মনে একটা মুরুব্বীয়ানা ও মাতব্বরী ভাব দেখা দেয় যার ফলে অন্য কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠে।

বাংলাদেশের মন্ত্রীসভাকে মোটামুটি অ-কংগ্রেসীয় মন্ত্রীসভা বলা চলে; বাংলার বাইরে-ও কংগ্রেসী মহলে এই মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কথাবার্ত্তা বা আচরণে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুরক্তির বা অনুরাগের পরিচয় বিশেষ দেন না; সহকর্মী ও সহযোগী নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের বাইরেই তাঁর দৃষ্টি প্রধানতঃ পড়ে। কাজেই এই মন্ত্রীসভার শাসনাধীনে বাংলাদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে—এমন আশা করা বৃথা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মন্ত্রীসভার প্রকৃত স্বরূপ যাই হ'ক নিয়মানুগ ভাবে (formally) এ মন্ত্রীসভা-ও কংগ্রেসের নামেই চলছে। কাজেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষত এই মন্ত্রীসভার কোন বিরুদ্ধাচারণ বা প্রতিকূল সমালোচনা করতে পারে না। মন্ত্রীসভার দোষ ত্রুটির জন্য, বাংলা কংগ্রেস লোকের নিকট গাল খায়—হেয় হয়; কিন্তু মন্ত্রীসভার প্রভাব প্রতিপত্তির কোন সুবিধা কংগ্রেস পায় না। মন্ত্রীসভা অনেক সময় বরং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার ও তার ভিতরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টাই করে। বাংলার কথা

বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রদেশের বা কেন্দ্রের মন্ত্রীসভার সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক-ও বিশেষ মধুর নয়; সহযোগিতার অভাব প্রায় সর্বত্রই আছে; প্রত্যক্ষ বিরোধের ভাব হয়ত সবত্র নেই। কেন্দ্রের মন্ত্রীসভায় পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই আছেন কিন্তু জনতার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনকারী কয়েকটি বিভাগই এতকাল ছিল অকংগ্রেসী লোকের হাতে। মন্ত্রীসভার মৌলিক নীতি ও কার্যব্যবস্থা এতদিন যে খুব কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করে চলেছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। কংগ্রেসের কার্যকরী সভা বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেসের সভাপতির প্রতি যে মৌলিক আনুগত্য ও সৌজন্য দেখিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল, তা মোটেই হয় নি। বরং এ অভিযোগ সকলের নিকটই শোনা যাবে যে পণ্ডিতজী ও সর্দারজী মোটামুটি কংগ্রেসকে উপেক্ষা করেই চলেছেন; সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত তাঁদের; কংগ্রেস কেবল অনুমোদনের শীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে। শাসনকার্যে-ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে তাঁরা বরাবর নির্ভর করেছেন ইংরাজের পরিত্যক্ত আমলাতন্ত্রের উপর; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মীদের অবিশ্বাসের সঙ্গে দূরে রাখতেই যেন তাঁরা ব্যস্ত। এর ফলে শাসন কার্য পূর্বের মতোই আমলাতান্ত্রিক, নৈর্ব্যক্তিক ও যান্ত্রিক হিসাবেই চলেছে; এর কোথাও নূতন আদর্শ, নূতন সৃষ্টি ভঙ্গী ও নূতন কর্মপ্রেরণা দেখা যায় নি।

এই অবস্থায় কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট অতিমাত্রায় অপ্রিয় হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও রাজ কার্য পরিচালনে যে অসততার সৃষ্টি ইংরাজরা ব্যাপক ভাবে করে রেখে গিয়েছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ তার কোন হ্রাস করতে পারে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রিগণ নিতান্ত নিঃসহায় ভাবে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে চলেছে; তাদের ত্রুটী বিচ্যুতিকে দেখেও দেখতে চায় না; বরং জনসাধারণের তরফ হতে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এলেই, পণ্ডিত জওহরলাল পর্য্যন্ত উষ্মার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেন এবং কর্মচারীদের পক্ষ সমর্থন করেন। এর ফলে অসততা, কর্তব্যচ্যুতি ও দায়িত্ববোধহীনতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। ক্রমে কংগ্রেস কর্মীদের মনেও আদর্শনিষ্ঠা ও সততার প্রতি আগ্রহ শিথিল হচ্ছে। সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলীর যে বিরোধীভাব গড়ে উঠেছে, প্রধানত তার জন্য এবং কতকটা একদল কংগ্রেস কর্মীকে মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের তাঁবেদার হিসাবে পাওয়ার আগ্রহে—শাসন-নিষ্ঠা ও আদর্শে সন্দিহান করে কংগ্রেসীকে মন্ত্রীমণ্ডলী হাতে রাখার চেষ্টা করে। পারমীট, লাইসেন্স প্রভৃতি সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আজ প্রযুক্ত; গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য করাও বহুক্ষেত্রেই আজ দুঃসাধ্য—হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য। প্রধানত মন্ত্রীমণ্ডলীর মতিগতি ও কর্ম-পদ্ধতির ফলে এই রন্ধ্র দিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে অসততার প্রসার হয়ে আসছে।

বহু প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বহু কেলেঙ্কারীজনক অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে পণ্ডিতজীর নিকট এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রায় বিনা অনুসন্ধানে অথবা নাম মাত্র অনুসন্ধানের পর পণ্ডিতজী ফতোয়া দিলেন পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীসভা নির্দোষ। বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজস্থান প্রভৃতি বহু প্রদেশের মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে; কোন ব্যাপারেই জনসাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক এমন কোন অনুসন্ধান হয় নি; সর্বত্রই যেন ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এমনি করে কয়েকজন বিশেষ মন্ত্রীর বা কয়েকটী বিশেষ মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়, কিন্তু শাসন কার্যের বা কংগ্রেসের সুনাম ও খ্যাতি এতে বাড়ে ত না-ই বরং ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। তাই আজ কংগ্রেস লোকের নিকট একটা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠছে।

চঠাৎ শাসন কার্য্য হাতে পেয়ে জওহরলাল বা বল্লভভাই বা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রিগণ মনে করতে পারেন গভর্ণমেণ্টে সাফল্য লাভই আজ বড় কথা;—রাষ্ট্রের

স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা ব্যগ্র হতে-ই পারেন। তার ফলে কংগ্রেসকে কতকটা অবজ্ঞা করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। এটুকুও পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আজ যা চলছে তা যে কতকটা ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পনামূলক কংগ্রেসকে অবজ্ঞা করা ও রাষ্ট্রের নিকট কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করা। একথা তাঁরা ভুলে যান—যে বিপ্লবের উদ্‌যোগ নিয়ে কংগ্রেস সংগ্রাম সুরু করেছিল, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয় নি। একথা ভুললে চলবে না যে আজ আমরা একটা স্তিমিত-গতি বিপ্লবের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা;—হয়ত শেষ পর্যন্ত গঙ্গার গতিরোধে অভিলাষী শ্বেত ঐরাবতের মতো আমরা বিপ্লবের স্রোতে ভেসে যাব, যদি নূতন ভগীরথ এই কংগ্রেসের ভিতর থেকে না এসে কংগ্রেসের বাইরে থেকে আসে। মনে পড়ে কয়েক মাস পূর্বে সর্দারজী ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে বিপ্লবের কথা যেন কেউ না বলে কারণ বিপ্লব শেষ হয়ে গিয়েছে। এ মত অত্যন্ত মারাত্মক। বিপ্লবের অগ্রপথে দাঁড়িয়ে তুষ্টির অহিফেন সেবন ক'রে যদি বিপ্লবী নিজের গতিকে স্তম্ভিত করে রাখে, তবে বিপ্লব তাকে ক্ষমা করবেনা।

আজ এমনি একটা সঙ্কট সময় কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত হয়েছে। কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেসের নির্বাচন আসন্ন। আজ আমাদের নির্দ্ধারণ করতে হবে কংগ্রেসের কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকিবে কিনা অথবা রাষ্ট্রের তাঁবেদার হিসেবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে। এখানে মনে রাখা দরকার নূতন শাসন বিধান অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্র হল গণতান্ত্রিক; একাধিক দলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি এখানে আছে। আজ যদি কার্যত কংগ্রেস ব্যতীত আর কোন দল কোন ব্যবস্থাপক সভায় না থাকে, তবে তাকে-ই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিবর্ত্তনীয় রূপ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কোন বিরোধী দলের অভাব নিতান্তই আকস্মিক,—মৌলিক নয়। আগামী ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে হয়ত তেমন কোন বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না; হয়ত প্রধানতঃ সেইজন্যই আগামী নির্বাচনেও কংগ্রেসের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল ভারতীয় শাসন বিধানে একাত্মক নয়—যেমন কম্যুনিষ্ট রুশিয়া, ফ্যাসিষ্ট ইটালী ও নাজী জার্মাণীতে আছে ও ছিল। কাজেই রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রের তাঁবেদার করে দাঁড় করানো সেই দলের পক্ষে অন্যায়ী; একথা স্মরণ রেখে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিহিত হওয়া উচিত।

নূতন শাসন বিধান অনুসারে যে রাষ্ট্র আমাদের গঠিত হবে, তাতে রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রের উর্দ্ধে রাখা প্রয়োজন—যাতে রাজনৈতিক দল নিজের দাবীতে নির্বাচন-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারে। রাজনৈতিক দল তার নিজের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রকে চালিত করবে;—রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সুবিধা ও খেয়াল অনুসারে রাজনৈতিকদল চালিত হবে না। এতদিন কংগ্রেস যে আর্থিক ও সামাজিক আদর্শের কথা বলে এসেছে, তাকে কার্য্যে পরিণত করার ঐকান্তিক চেষ্টা আজ কংগ্রেসকে করতেই হবে। তার জন্য বিশেষ প্রয়োজন কংগ্রেসের সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলা। আজ যা চলছে তা কতকটা শাসনযন্ত্রের নিকট কংগ্রেসকে পর করার প্রচেষ্টা। এর পরিবর্তে শাসন যন্ত্রের প্রকৃত চালক হিসাবে কংগ্রেসকে দাঁড়ো করতে হবে। রুশ বিপ্লবের পর লেনিন বুঝেছিলেন যে বিপ্লবকে পূর্ণ ও সার্থক করতে হলে, কম্যুনিষ্ট পার্টিকে স্বতন্ত্রভাবে ও সগৌরবে বজায় রাখা দরকার। তাই তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়ে, কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক থাকাই পছন্দ করে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গত যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ষ্টালিনও কেবল কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকই ছিলেন;—রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন ভাবে জড়িত ছিলেন না। মহাত্মা গান্ধী জীবিত থাকলে রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে থেকে কংগ্রেসকে পরিচালন করতে পারতেন। সে অবস্থায় কংগ্রেস নিজ মর্য্যাদা ও আদর্শ নিয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যুর পর অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করেছে। কংগ্রেসের

যারা সত্যিকার নেতা তারা আজ সবাই রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় ব্যস্ত। দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় সমস্যাই তাঁদের নিকট সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম দাবী নিয়ে উপস্থিত থাকে। সাধারণত তার বাইরে মন দেওয়ার মতো অবসর ও অবস্থা এঁদের হয় না বরং অনেক সময় কংগ্রেসী আদর্শের দাবী তাঁদের নিকট বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়। তাই কংগ্রেসের অস্বস্তিকর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ রাষ্ট্রপরিচালক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে দেখা দেয়। রাজকর্মচারীদের উপর এঁরা অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে বাধ্য হন। যারা কংগ্রেসের আদর্শের কথা বলতে চায় তাদের প্রতি ক্রমশ বিরক্তির ভাব বাড়তে থাকে। নিত্য-কার দাবী মিটাতে এঁরা সাহায্য পান রাজ কর্মচারীদের নিকট। এ ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীরা অনেক সময় আসে সমালোচক রূপে—সহায়কারীর রূপে নয়। ভবিষ্যতের কথা ব'লে আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মিগণ যখন তাঁদের দৃষ্টিকে আগত ও আসন্ন কাল থেকে একটু ঘুরে টানতে চেষ্টা করে, তখন সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের উপরই এদের বিরাগ বৃদ্ধি পায়।

তাই আজ দেখতে পাই প্রায় সর্বত্রই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মিদের ঘুরে রেখে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। বর্তমানের খুঁটানাটী দাবীর নিকট ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের তরফ থেকে জোর করে কথা বলে, রাষ্ট্র যন্ত্রকে কংগ্রেসের নিকট নত করিয়ে নেওয়ার মতো কোন লোক আজ কংগ্রেসে নেই। আজ যদি লেনিনের মতো জওহরলাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আলেয়াতে বিমুগ্ধ না হয়ে কংগ্রেসের পরিচালনা ভার গ্রহণ করতেন, তাহলে রাষ্ট্রীয় শাসন যন্ত্রের সাহস হত না কংগ্রেসকে উপেক্ষা ক'রে এক পা-ও এগুতে পারে। কংগ্রেসকে বাঁচাতে হলে আজ শীর্ষস্থানীয় কোন নেতাকে শাসন যন্ত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হবে। জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বল্লভভাই—আজ এ তিনজনই কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা। তার মধ্যে বল্লভভাইয়ের শারীরিক অবস্থা এমন নয় যে কংগ্রেস পরিচালনার গুরু দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন। রাজেন বাবুর স্বাস্থ্য-ও খুব ভাল নয়। যে পরিশ্রম এই কাজে প্রয়োজন, যে মানসিক স্থিতিস্থাপকতা এর জন্য দরকার, তা কেবল জওহরলালের-ই হয়ত আছে। পূর্বে জওহরলালের যে খ্যাতি ছিল, ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়ে সে খ্যাতির অনেকটা লাঘব হয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে যে মানসিক গঠন ও যে কার্যকরী বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন, তা পণ্ডিতজীর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শাসন যন্ত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ও একটি বিপ্লবাদর্শ নিয়ে জাতিকে চালিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা গান্ধীজীর পর জওহর-লালের মতো আর কারো মধ্যেই আমরা দেখতে পাই না। রাষ্ট্রকার্য্য পরিচালনার মতো কার্য্যকরী বুদ্ধি হয়ত সর্দারজীর মধ্যে বেশী আছে। যদি কংগ্রেস থেকে কর্মপন্থা ও আদর্শ নির্দেশ করে দেয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র তাকে রূপ দিতে বাধ্য হয়, তাহলে সে কাজ সর্দারজীর দ্বারা হয়ত সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে। তাই আমরা মনে করি আজকার এই সঙ্কট সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বর্জন করে কংগ্রেসকে বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ। আজ যদি পণ্ডিতজী কংগ্রেসের সভাপতি থাকতেন তবে কোন প্রধান মন্ত্রীর পক্ষেই তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চলা সম্ভব হত না।

রাষ্ট্রের একটা স্বাভাবিক প্রকৃতি হল স্থাণুত্বের দিকে; অর্থাৎ যা চলেছে তা বজায় রাখাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আর্থিক ও সামাজিক অধিকার ও সত্বের মর্যাদা বজায় রাখা,—এই হয়ে উঠে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। বাইরের একটা বিশেষ প্রেরণা না থাকলে রাষ্ট্র সহজে গতিমুখীন হয় না। আমাদের স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ক্রমে স্বভাবত-ই স্থাণুরূপ পরিগ্রহ করছে। অথচ আমাদের রাষ্ট্র হল বিপ্লবী রাষ্ট্র—বিপ্লবের আদর্শকে সমাজে রূপ দেওয়া যার প্রধান কাজ। এ রাষ্ট্র হ'ল নূতন সমাজ ও নূতন ব্যবস্থা গড়বার যন্ত্র, নূতন আশা ও আকাঙ্খাকে বাস্তবে পরিণত করার উপায়। এই রাষ্ট্র যদি

প্রাধান্যের দিকে যায়, তবে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তাই রাষ্ট্রকে গতিমুখী করার জন্য বাহির থেকে রাজনৈতিক দলের প্রেরণার প্রয়োজন আছে। সেই প্রেরণা যোগাবার ক্ষমতা আজকার কংগ্রেসের নেই; জওহরলালের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন লোক কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে, কংগ্রেসের সেই মর্য্যাদা আসিবে না। গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা হতে কংগ্রেস নেতাদের এই শিক্ষা লাভ করা উচিৎ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কংগ্রেস হবে রাষ্ট্রের পরিচালক; কংগ্রেস থেকে রাষ্ট্রের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত করে দেবে এবং রাষ্ট্র তা নির্দিষ্ট সময়ে কার্য্যে পরিণত করবে—এই চ'ল রাষ্ট্রের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক। রুশ বিপ্লবের পর সেখানকার রাষ্ট্রযন্ত্র ঠিক এমনি ভাবে কম্যুনিষ্টপার্টির নির্দ্দেশ ও কার্য্যক্রম মেনে চলেছে। পূর্ব নির্দিষ্ট কার্য্যক্রম যদি সময় মতো পরিপূর্ণ করা সম্ভব না হ'য়ে থাকে, অথবা যদি আকাঙ্খিত সাফল্য তাতে সম্ভব না হয়ে থাকে, তা হলে পূর্বোক্ত কার্য্যক্রমের পুনর্বিবেচনা কম্যুনিষ্ট পার্টি বহুবার করেছে এবং প্রয়োজন মতো পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করে নূতন নির্দেশ রাষ্ট্রকে দিয়েছে। আমাদের এখানে গত তিন বছরের ভিতর আজ পর্য্যন্ত তেমনি কোন প্রয়াস হয় নি। আজ প্রায় দুবছর হল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটা অর্থ নৈতিক কার্য্যক্রম মূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গত দুবছরের ভিতর সেই economic programme বা আর্থিক কার্য্যক্রমকে কার্য্যে পরিণত করার প্রায় কোন চেষ্টাই হয় নি। গত জয়পুর কংগ্রেসে শ্রেণীহীন সমাজ ও অন্যান্য বড় বড় বুলি সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে; কবে বা কতদিনে তার কতটুকু অংশ কার্য্যে প্রতিফলিত করতে হবে, তার কোন নির্দেশই সে প্রস্তাবে নেই। তাই সেই প্রস্তাব কাগজের প্রস্তাবই (paper resolution) থেকে গিয়েছে। আমরা মনে করি কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্বন্ধে এমন ঔদাসীন্য দেখানো এমন লঘুচিত্ততার সহিত কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করাতে, কংগ্রেসকে হেয় ও অবজ্ঞেয় করা হইয়াছে।

এখন থেকে উচিত এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক এক একটা কার্য্যপদ্ধতি নির্দেশ করা। কংগ্রেসের আর্থিক ও সামাজিক আদর্শকে সময়ানুপাতিক ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রতি এক বছর বা দু'বছরের জন্য এক একটা পরিকল্পনা ঠিক ক'রে কংগ্রেস থেকে রাষ্ট্রকে নির্দ্দেশ দিতে হবে তা কার্য্যে পরিণত করার জন্য। জমিদারী বিলোপ সাধনের মতো অতি সাধারণ আর্থিক প্রস্তাব-ও বাংলা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত আলোচনার মধ্যেও আসে নি; এ সম্বন্ধে কোন খসড়া আইন এখন পর্য্যন্ত বহু প্রাদেশিক সরকার প্রস্তুত করে নি। অথচ কংগ্রেস সেই সব প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর এই ত্রুটিকে উপেক্ষা করেই চলছে। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দায়িত্ব কতখানি, কংগ্রেসের সম্মান ও মর্য্যাদা কতটা এর উপর নির্ভর করে, তা আজ বিবেচনা করা দরকার।

নূতন গঠন বিধান অনুসারে কংগ্রেসের নির্বাচন ও সংগঠন আসন্ন। কংগ্রেসের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যে মন্তব্য করলাম আশা করি কংগ্রেসকর্মিগণ সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন। মন্ত্রী মণ্ডলী বা শাসন যন্ত্রের চেয়ে কংগ্রেস বড়—একথা স্মরণ রেখে কংগ্রেসের সংগঠন করতে হবে; নতুবা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হবার কারণ আছে বলে মনে করিনা।

ছন্দ যাদু সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার : কবি-শ্রী

নিদাঘ নিথর এই ধরণীর
ক্লান্ত আঁধার রাতে
স্বরূপ তোমার প্রকাশ হলো
মধুর জ্যোছনাতে।

জীবন উষায় ডঙ্কা বাজালে
নবীন ছন্দে কবি
ধন্য হয়েছে মোদের বাঙলা
তোমার পরম লভি,

"ফুলের ফসলে"—পূজার দেউলে
অর্ঘ দিয়েছো তুমি
"ধূপের ধোঁয়ায়" মুখরিত তাই
ধরণীর বন ভূমি।

তোমারি কণ্ঠে শুনেছি আমরা
বাঙলা দেশের গান
জাগ্রত হলো বাণীর প্রতিমা
জাগ্রত হলো প্রাণ।

দিকে দিকে তাই "বীণা আর বেণু"
সু-মধুর তান ধ'রে
মনের সেতারে সেই মধু ভাষা
সদাই আলাপ করে।

তুমি এনে দিলে প্রাণ-সঞ্জীবনী
সুখে দুখে নিরাশায়
তোমারি কথাটি স্মরি ক্ষণে ক্ষণে
আঁখি তাই ঝরে যায়।

হে কবি তোমার জনম দিন
এসেছে আবার ফিরে
আজি প্রভাতের আলোকে-আঁধারে
বিশ্বখানিরে ঘিরে।

এরি মাঝে শুনি রচনা তোমার
"বিদায় আরতি" পালা
শেষ করিলে কি পূজা তাড়াতাড়ি
ফুরালো অর্ঘ ডালা?

শুধের হিয়ার জ্বালো আজি কবি
তোমার অগ্নি দীপ
নিখিত এই বাঙালীর ভালে
পরাও বিজয় টীপ।

মাতৃভক্ত সত্য দ্রষ্টা
ছন্দের যাদু কবি
তোমার বিহনে ম্লান হয়ে আসে
জীবনের ভাষা সবি।

এসো হে আবার মোদের সভায়
বরাভয় হাতে ধরি'
অন্তর ভরি' ভক্তি-অর্ঘে
তোমারে প্রণাম করি।

অলৌকিক

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট্ ক্লাসে পড়ি। আমার মত অজ পাড়াগাঁয়ের এক গোবেচারার পক্ষে এও যে কখনও সম্ভব হতে পারে, সত্যি এ ভাবলে আজও আশ্চর্য্য হতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব মুখ-চোরা। ঘরের মধ্যে নিজের দুরন্তপনায় সকলকে অস্থির করে তুলি, কিন্তু বাইরে আমার একান্ত লাজুক বোকাটে স্বভাবটা লোকের মনে নিজেকে নিরীহ বলেই পরিচিত করে। অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য্যে নিজের অসাধারণ ও অসম্ভব কল্পনায় সঙ্গোপনে নিজের ভবিষ্যতকে কল্পনার তুলি বুলিয়ে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করে তোলাই ছিল আমার খুব আনন্দের খেয়াল। প্রেরণার অভাব হতোনা; কেমন করে যেন বারে বারেই নিজের মনে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করে নিতাম, আমি একজন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ হব।

এমন সময় গ্রামে যখন সংবাদ পৌছাল, গ্রামেরই লোক এবং আমাদেরই স্কুলের বিপিন কর সায়েন্সের ডাক্তার হয়েছেন, তখন আমার ভবিষ্যত কল্পনা যেন একটা স্থির আদর্শ খুঁজে পেল। বিপিন কর আমাদের চেয়ে অনেক ছোট ঘরের ছেলে, কাজেই আমার পক্ষে তাঁরই মত সায়েন্সের ডাক্তার হওয়া বোধ করি নিশ্চয় কঠিন হবে না। তাছাড়া আমার নামধারী এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও আছেন আমাদের দেশে; কাজেই আমারও মনে কোন সন্দেহ থাকতনা যে আমার নিজের নামটা নিরর্থক হবে। আজও মনে আছে আমার ছোড়দির সঙ্গে একদিন আমার কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে আমার প্রতিভা ঐ সায়েন্সের ডাক্তারকেও অক্লেশে ডিঙিয়ে যাবে।

আদর্শের উত্তেজনায় গ্রামের স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করা আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হয় নাই। যখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি তখন ইংরেজী বইএ মাউন্ট্ এভারেষ্ট সম্বন্ধে একটা গল্প পড়াতে গিয়ে এসিষ্ট্যান্ট্ হেড মাষ্টার আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, মাউন্ট এভারেষ্ট নাকি আমারই অপেক্ষায় এখনো অপরাজিত হয়ে পড়ে আছে, আমি বড় হয়ে ওকে জয় করব। এই বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে মাউন্ট এভারেষ্টকে এখনও কেউ জয় করতে পারেনি শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ। এসিষ্ট্যান্ট্ হেড. মাষ্টারের এই উক্তির পর থেকে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রইলনা যে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি আই এস্‌সি পড়ব।

আমাদের হেড্ মাষ্টার আমার এ দুঃস্বপ্নকে মোটেই সমর্থন করেননি। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল বলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বেকার সাজার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই তখন একমত ছিলেন। তাছাড়া গ্রামের ছেলে আমার মধ্যে কোন অসাধারণ মেধাও বোধ করি তিনি লক্ষ্য করেন নি। বাবা আমাকে ডাক্তারী পড়বার জন্য কিঞ্চিৎ পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তাঁর এই অপরিণামদর্শী ছেলের একগুঁয়েমীর বিরুদ্ধে তিনি কখনও বিদ্রোহ করেন নি। আমার দুই দাদা তখন কলেজে পড়েন। ডিগ্রীর মোহটা আমার বড় দাদার সব চেয়ে বেশী ছিল: কলেজে পড়ে আমরা সকলে গ্রাজুয়েট্ হব, এই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা। অবশ্য দাদার সে পূর্ব সংস্কার রূঢ় বাস্তবের আঘাতে এখন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছে। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আই, এস্‌সি পড়তে লাগলাম। আমাদের স্কুলের আদর্শবাদী শিক্ষক দীনবন্ধু বাবু ডাক্তার মেঘনাদ সাহা প্রমুখ মনীষী বৃন্দের নামোল্লেখ করে আমাকে প্রেরণা দিলেন। এই প্রথম আমি ডাক্তার মেঘনাদ সাহার নাম শুনি। কোন অভাবনীয় দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে না পড়লে ম্যাট্রিকে ষ্টার পেয়ে পাশ করতাম, শিক্ষক মহাশয়েরা সখেদে এ মন্তব্যও করলেন।

বাস্তবের প্রত্যক্ষ স্পর্শে কল্পনার মোহ যখন ভাঙতে লাগল, তখন ক্রমে বুঝতে আরম্ভ করলাম যে আমার বৃত্তি নির্ব্বাচনে ভুল করেছি। আমার মত কল্পনা বিলাসী ছেলের পক্ষে সাহিত্যের ছাত্র হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আবার মনে দ্বন্দ্ব বাধল; নিজের সঙ্গে নিজে তর্ক করে

এবং অঙ্কশাস্ত্রের মতামতের উপর নির্ভর করে কোন রকমে দিন চলে। তবু আই. এস্‌সির মায়াজাল ছিন্ন করতে পারলাম না। দিদিমা ও নিজের অসুখের জন্য প্রথমবারে পরীক্ষা দেওয়া হলো না। দ্বিতীয়বারে টেষ্ট পরীক্ষার ছই তিন দিন আগে হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে পরীক্ষা দেওয়া গেল। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলাম। সাহিত্যের বিষয়গুলিতে যে নম্বর পেয়েছিলাম, তাতেই বোধ করি বিভাগ উঠে থাকবে, বিজ্ঞান ও অঙ্কের বিষয় গুলিতে শুধু কোন রকমে পাশ করে গিয়ে থাকব।

ইতিপূর্বে মনে মনে একটা অন্ধসুপ্ত সঙ্কল্প গড়ে উঠেছিল যে আই, এস্‌সি পাশ করে এ লাইন পরিত্যাগ করতে হবে এবং সাহিত্য নিয়ে বি,এ পড়েই গ্রাজুয়েট হওয়া যাবে কিন্তু বিজ্ঞানের চুম্বক আকর্ষণ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারলাম না। ভাগ্যদেবতা আমাকে বি, এস্‌সি পড়তেই টেনে নিলেন।

কষ্টে সৃষ্টে বি, এস্‌সি পাশ করেছি। বি, এস্‌সিতে অঙ্কশাস্ত্রে যে অল্প নম্বর পেয়েছি তা শুনলে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের হেড্ মিঃ পাণ্ডনি হয়ত বলবেন,—অঙ্ক নিয়ে এম্, এস্‌সি পড়া আমার সাজেনা। সায়েন্সের ডাক্তার হবার দুঃস্বপ্ন আমার কেটে গেছে, কিন্তু স্বনামধন্য হবার পাগলামী এখনও আমাকে ছাড়েনি। ভুলক্রমে এখন আমি অঙ্ক শাস্ত্রে এম্, এসসি হবার পথে পা বাড়িয়েছি। আছাড় খেয়ে পা আমার অনেকবার ভাঙ্গল, কিন্তু খুঁড়িয়ে চলা এখনও কিছুতেই যায়ে না। ক্লাসে প্রফেসর যখন অঙ্কের প্রব্লেম নিয়ে মাথা ঘামান, আমার মন তখনও ভেসে যায় ঘরের পিছনে রেন্‌টী গাছের ডালে বসে কোকিল ডাকছে সেই দিকে। অঙ্কের সঙ্গে আমার কোর্সড্ ভাইভ্রেশন হয়, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে হয় রোমান্স। ফাঁকে ফাঁকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে পাঠাই কলকাতার নানা মাসিকে, যদিও প্রত্যেকবারেই সম্পাদকের কাছ থেকে ধন্যবাদ নিয়ে তা ফেরত আসে। বাস্তবকে চিনতে এখন আর আমার এতটুকু বাকী নেই; জেনে শুনেও মিথ্যা কল্পনা করবার দুঃসাহস এখনও কেন যে আমাকে ত্যাগ করে না, সে কথাই ভাবি। সে দিন তাই আমার ডাইরীতে লিখেছি—নিজেকে আজও আমি চিনতে পারি নাই। আমার মধ্যে আর একটা দুর্বোধ্য রহস্যময় এজেন্ট্ আছে; তার কাছে বারে বারে আমি হার মেনেছি; সেই আমার আমিত্বকে পরিচালিত করে। নিজের দুর্বলতায় তার কাছে আমি লজ্জা পাই। আমার 'ঘরকুণো' কবিতায় বোধ করি তার পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস মিলে;—জানি না, সে কে?—

সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের দুর্বোধ্য দুর্বলতার একটা ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করি।

ঢাকা থেকে এক প্রফেসর এসেছেন। মিঃ পাণ্ডনি বলেন,—তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করোনা? আমি ভেবে পাই না, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আমার কি প্রয়োজন। আমি ঢাকার লোক, তিনিও ঢাকা থেকে এসেছেন; এই বিদেশে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কোন অবশ্যম্ভাবী উপকারিতার কথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আগে থেকে তার ভিত্তি তৈরী করে রাখাকে তোষামুদি ছাড়া আর কি বলা যায়, আমি জানি না। (অবশ্য পূর্ব বঙ্গের হিন্দুর এখন দেশ বলতে কোন্‌টা বুঝায় তাও জানি না।) তেলা মাথায় তেল দেওয়া রোগে সারা পৃথিবী আজ জর্জরিত; এ রোগটা আজ একটা স্বাভাবিক চালাকিতে দাঁড়িয়ে গেছে (কর্তব্যও বলতে পারি!)

সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলাম, কটন কলেজ দলের সঙ্গে আমাদের দলের ক্রিকেট্ খেলা আছে, তাই আজ ক্লাস ছুটি হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাসের অন্য কোন ছেলে আসে নি। চারি পাশের সমস্ত কোলাহলের মধ্যে নিজেকে একা একা অত্যন্ত খাপছাড়া অপরিচিত মনে হচ্ছিল। নাম রেজেষ্ট্রী করবার জন্যে আজ একজন এক্সট্রামাণ্ট এসিষ্টাণ্ট আসবার কথা ছিল। সেক্রেটারীর অফিস বন্ধ দেখে কি করব তাই ভাবছিলাম। সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছি, দেখলাম এক ভদ্রলোক ডাঃ বাজীর

সঙ্গে গেটে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করছে। অবাক হয়ে ভাবলাম, এ কে? কি স্পর্দ্ধা এর? ওকে দেখেছিলাম গেলবার সিলং এ; নোঙরতে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে। আমারই মত সেও একজন প্রার্থী ছিল; একই সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে আমারই মত সেও ব্যর্থ মনোরথ হয়েছিল। আর আজ একে দেখছি ডাঃ বাজীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে। নিজেকে আরও মূল্যহীন নগণ্য মনে হলো। ও পাশে চালতে গাছের ছায়ায় ট্যাক্সির খোলা দরজার কাছে দাঁড়ালো সিল্কের ঈষন্যপালিনা বীণা ডেকা, অসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে কোন প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপে মত্ত। সবারই জীবনের স্ব-স্ব কেন্দ্র ও পরিধি আছে; কিন্তু আমার নিজের কাছে নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কোচিত মনে হল,—আমার জীবনটা একটা শূণ্য ব্যাসার্দ্ধের বৃত্ত অর্থাৎ বিন্দুর মতন নগণ্য।

সামনে চেয়ে দেখলাম, ঢাকার প্রফেসর ডাঃ শর্মা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মনে পড়ল মিঃ খাণ্ডনির কথা,... তাঁর সঙ্গে দেখা করোনা কেন?...বিনা প্রয়োজনে ঐ গায়ে পড়ে পরিচয় করবার তোষামুদি চালাকিটা আয়ত্ত করবার জন্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও আরও কয়েকবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু পর্য্যাপ্ত সুযোগ ঘটেনি কখনও। ভারী পা দুটাকে আস্তে আস্তে চালিয়ে দিলাম আর একবার আজ ঐ সুযোগের অন্বেষণে। রাস্তায় একজন...সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। তাঁকে এড়াতে পারলাম না সহজে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—'কোথায় যাবেন?'

—'একটু কাজে, ঐ বাঙ্গালী স্কুলে।'

সঙ্কোচিত হয়ে মিথ্যা কথা বললাম; কেন, ঠিক জানিনা। ততক্ষণে ডাঃ শর্মা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। একটু জোরে পা চালিয়ে অগ্রসর হলাম। তাঁকে ধরবার আগেই তিনি মোড়ে গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলেন। ভাবতেছিলাম, পিছন দিক থেকে গিয়ে প্রথম কেমন করে তাঁকে আহ্বান করব, কি দিয়ে আলাপ সুরু করব। 'আর'। তারপর কি বলতে হবে, জানিনা। বিনা প্রয়োজনে গায়ে পড়ে পরিচয় করবার কি মানে হয় বুঝিনা। তিনি মোড় ঘুরতেই আমারও মনের মোড় ঘুরল। ফিরে আসলাম।

আসবার পথে দেখলাম, ডাঃ বাজী তেমনি গেটে দাঁড়িয়ে পাইপ্ টানছেন; এক হাত তাঁর সুন্দর ভঙ্গীতে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকানো। সত্যি ডাঃ বাজীকে ভারী সুন্দর দেখায়। নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে হতে লাগল। নিজের লাজুকতায় ও খাপছাড়া আচরণে নিজের কাছেই মুখ দেখাতে ভারী লজ্জা অনুভব করলাম। আমি একটা অপদার্থ। আমি 'ঘরকুণো'। নিজের কুঠুরীতে বসে নিজেকে ডাঃ বাজী, প্রফেসর মেধী, বন্ধুরা বা খুসী বলে কল্পনা করি ও আনন্দ পাই। কল্পনায় নিজেকে আরও অনেক বড় বলে মনে করতেও কোন বাঁধা দেখিনা। কিন্তু আমার এই আনাড়ী সঙ্কীর্ণতা ভেদ করে প্রতিভার বিকাশ করা কতখানি যে অসাধ্য তা বুঝতে পারলেও তাহা দিয়ে বুঝানো যায় না। মনের মতন এমন জটিল তথ্য বোধ করি আর কিছু হতে পারে না। মানুষ নিজেও নিজের মনকে চিনতে পারেনা, তবু তার কি দম্ভ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানুষ ত তবু এই দুর্বোধ্য মন দিয়েই তার প্রত্যক্ষ সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলো লাভ করে...যে মন একবার শান্ত হয়' তাই আবার কখনো বিচলিত হয়ে পড়ে,—কিন্তু এই মন জিনিষটি যে কত গহীন, এটাই শুধু সকলের অজানা থেকে যায়। আমারও মনের সমুদ্রের কড় উঠে আছে। সংসারের এই দুর্বোধ্য জটিলতার মাঝখানে দিকভ্রান্ত নাবিকের মতন আমি দিশেহারা হয়েছি। আমার জীবনের গতি কোন্ দিকে জানিনা। কিসের অন্বেষণে কোথায় ভেসে চলেছি, কেমন করে বলব। কে আমাকে পরিচালিত করে জীবনের এই আঁকাবাকা রাস্তায়, কে জানে? জীবনের হাটে আমি মূলধন বিহীন ব্যবসায়ী, দেউলে। জীবনে যতটুকু উঠবার উঠে গেছি। একটা পার্টস্ না থাকলে মুখস্থ করা বিদ্যায় কি কোন কাজ হয়? ভুল করে আমি গণিতজ্ঞ হতে পারি (পি, সি, রায়ের মত), কিন্তু জীবন-সংগ্রামে পরাজয় আর বঞ্চনা ছাড়া কিছুই পাবনা। বর্ত্তমানের দুনিয়াতে চলতে হলে

লোকের সঙ্গে পরিচয় করাতে তোষামুদি বললে ঠকতেই হয়। তেলা মাথায় তেল দেওয়া নিয়ে সমালোচনা করা যত কঠিন তাবেই, তারো আপত্তি নেই কিন্তু নিজের জীবনে তাকে বাদ দিতে গেছ কি মরেছ। বড় হবার সাধ আছে, অথচ বাস্তব মূল্য দিতে চাই না। অতের দিনে কি উজান বাওয়া চলে? সাবা দুনিয়াতে যখন সুবিধাবাদের রব উঠেছে, আমি কেন অভিমান করে দূরে সরে থাকি? সাধারণের মত হাল্কা স্যোতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই না কেন? চলার পথের নূতন নীতির আবিষ্কারক হতে গিয়ে বারে বারে পরাস্ত হয়েই ফিরে এসেছি; তবু কিছুতেই আমার একগুঁয়েমী ত্যাগ করতে পারলামনা। নইলে ডাঃ শর্মার সাথে কেমন করে আলাপ করতে হয়, সে কথা জানলাম না কেন?

কেন, কে বলবে?

রামপ্রসাদ

শ্রী মতিলাল রায় (চন্দননগর)

তন্ত্র ও সহজিয়ার সিদ্ধ-পীঠ বাঙ্গলা। বাঙ্গলার তীর্থ তাই কাশী, কাঞ্চী, ত্রিপিলা নয়, বাঙ্গলার তীর্থ ক্ষেত্র নান্নুর কেন্দুবিল্ব, হালিসহর, নবদ্বীপ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি। বাঙলায় যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু নিজেদেরই সাধন সিদ্ধ করেন নাই—সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতির অন্তর-চেতনা যাহাতে ঈশ্বরময় হয়—তাহারই সিদ্ধ সাধন-সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন—সেই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদ অন্যতম। তিনি প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গলার এক গ্রাম প্রান্তে শক্তিসাধনার অপূর্ব মহিমা প্রচার করিয়া ছিলেন। সেই পুণ্য জীবন-গীতা আজ সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ রামপ্রসাদ সাহিত্য সম্মেলনে সামান্য একটু আলোচনা করিব।

১৭১৩—১৭১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাঙ্গলার ইহা ছিল সন্ধিযুগ। তখনও বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর কমনীয় হৃদয় বৃত্তির পূর্ণ-বিকাশের উপায়গুলি অন্নাভাবের পীড়নে লোপ পায় নাই। তখন হালি সহর কুমারহট্টের অন্তর্গত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল।

কুমারহট্ট সংস্কৃত চর্চ্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, গ্রামের কুমার, ধোপা, ইহারাও পণ্ডিতগণের মুখে নিরন্তর দার্শনিক চর্চ্চা শ্রবণ করিয়া তর্ক শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন ও মীমাংসার সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তীও আছে। হালিসহরের শিবের গলি, সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীগণের বাসস্থান, উপবন, সরোবর, দেবালয়, গৃহশ্রেণী প্রভৃতি গ্রামের শ্রী সম্পাদন করিত। গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিত; ধর্মভাবের স্রোতনায় হালিসহর তখন মত্ত, মুখরিত। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম সেন। তখনকার দিনে লোকে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া নিত্য প্রাতকৃত্য সমাপন পূর্বক, উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিয়া ধর্মজীবনের অঙ্গ প্রাত-সন্ধ্যাদি নিয়মিতভাবে পালন করিয়া চলিত।

রামপ্রসাদও অতি শিশু বয়স হইতেই পিতার সহিত প্রতি প্রভাতে পুষ্পচয়ন করিয়া ফিরিতেন। তারপর চণ্ডী মণ্ডপে ধূপ ধুনার গন্ধে চন্দন চর্চ্চিত সুবাসিত পুষ্প পত্র পিতা যখন মায়ের চরণে অঞ্জলী দিতেন—রামপ্রসাদ তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। রামপ্রসাদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল শিবের বুকে জননীর রক্তাম্বুজ চরণ-যুগল। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না এমন আলতা, এমন রাঙা, এমন কোমল চরণ দুটি কি মাটির!

সংসারে আমরা শিখি ভালবাসিতে। এই ভালবাসাই আমাদের মূলধন—যাহা দিয়া ঈশ্বর বস্তু খরিদ করি। সে বস্তুকে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ প্রভু,

কেহ বন্ধু আবার কেহ বা প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর বলিয়া অনুভব করি।

দাস, সখা, বাৎসল্য শৃঙ্গার চারিরস,
চারি ভাবের ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ্।

রামপ্রসাদ ভগবানকে মাতৃভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন। ছেলে যেমন মায়ের কাছে আব্দার ধরে; অভিমান করে, আদরে সোহাগে গলিয়া যায়। অনাদরে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদে, কটু বচনে গঞ্জনা দেয়, রামপ্রসাদের জীবনে মায়ে ব্যাটায় এই অনির্বচনীয় লীলা-মাধুরীই ফুটিয়া উঠিয়াছে—ভাব, ভক্তি, স্নেহ প্রেমের মধ্য দিয়া। বিশ্বজননীর সহিত মানব শিশুর এই মধুর সম্বন্ধের বিচিত্র অভিব্যক্তি সাধন-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্বে দেবতার সহিত মানবের এমন জীবন-যোগের সাক্ষাৎ পরিচয় এক প্রকার দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যের পর দিব্য সম্বন্ধ তত্ত্বের অনাবিল নিদর্শন রামপ্রসাদের জীবনেই স্পষ্ট হইয়াছে। রামপ্রসাদ জাতির গুরুমূর্তি। কেমন করিয়া দীক্ষা দিলে জাতির প্রাণ ঈশ্বরময় হইবে, সে সিদ্ধ কৌশল রামপ্রসাদের ছিল—'মা'ই তাহাকে এই সিদ্ধ বিদ্যা হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। তাই দুরূহ সাধন-বিজ্ঞানের জটিল ব্যাখ্যাগুলি তিনি মায়ের নামে সহজ সরল ভাষায় গানের ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গিরিশ ঘোষকে বকলমা দেওয়ার মত—মাতৃসাধক রামপ্রসাদ একটা জাতির দৈনন্দিন জীবনকে সহজভাবে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করার কি চমৎকার সঙ্কেত দিয়াছেন এই একটি মাত্র গানের মধ্য দিয়া—তাহা ভাবিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়:—

ওরে ও মন, বলি, ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
সদা শুদ্ধ সত্ত্ব সাধন মর্ম্ম দিবা নিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফের, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মার মন্ত্র বটে,
ওরে মা যে পঞ্চাশ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে॥

কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মারে॥

সাধকের জীবনে যে গাম্ভীর্য্য, যে অসাধারণত্ব রামপ্রসাদের তাহা ছিল না বরং অতি সাধারণ ভাবেই তাঁহার দিনযাপিত হইত। পুত্র কন্যার পিতা হইয়া গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া, হাট বাজার করিয়া যেমন লোক সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, তিনিও তাহাই করিতেন। রামপ্রসাদের উঁচাই বিশেষত্ব। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে তাঁর এইটুক দান, যে কি অমূল্য, তাহা আজ নির্ণয় করা যাইবে না। ধর্ম্মজীবন যে দিন সহজ হইয়া সকল অবস্থার দিব্যানুভূতির পরশ লোকে অনুভব করিবে, সেইদিন দেশ বুঝিবে, রামপ্রসাদ জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের কি অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ মুক্তি মোক্ষের তোয়াক্কা রাখিতেন না। তীর্থ বাসের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল না। 'মা'ই ছিল তাঁর জীবনের সবখানি। তিনি গাইতেন—

"আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানসী॥
ছুৎ কমলে ধ্যান কালে আনন্দ সাগরে ভাসি।

'মা' কেই তিনি একমাত্র ইষ্ট ভাবিতেন—তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল—

"কালিতে মরিলে শিব দেন তত্ত্ব মসি
ওরে তত্ত্ব মসির উপরে সেই মহেশ মহিষী।"

রামপ্রসাদের ভক্তিডোরে মা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। প্রসাদের হস্তে আহার্য্য গ্রহণে মায়ের রসনা বিস্তৃত হইত, রক্তজবা চয়ন করিয়া গ্রহণ করিতেন। মায়ের সহিত প্রসাদের জাগ্রত পরিচয় পরবর্ত্তী মাতৃসাধনায় নূতন বিশ্বাস ও বল সঞ্চার করিয়াছে। প্রসাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় বহিয়াই কমলাকান্ত সিদ্ধ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাতৃপ্রেমে উন্মাদ, তারাপীঠের বামাক্ষেপা কৌল শ্রেষ্ঠ। প্রসাদকে মাতাল বলিয়া লোকে পরিহাস করিত, তার সে উত্তর তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কি মদে মত্ত থাকিতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

সুরা পান করিনারে সুধা খাই কুতূহলে।
আমার মন মাতাল মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে।

মায়ের উপর অভিমান করিয়া তিনি গাহিতে

ডাকি যারে যারে মা—মা বলিয়ে
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে?
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

মায়ের সহিত প্রসাদের ভাই মান—অভিমান কখোপ-কথন সকল লোকে প্রত্যয় করিত না। কিন্তু সকলে স্তম্ভিত হইল সেদিন, যে দিন তিনি মাতৃ প্রতিমা মাথায় করিয়া গঙ্গা বক্ষে—অবতরণ করিয়া গাহিলেন—

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে
কেবল ঘোষণা রবে গো।

সকলেই তামাসা দেখিতে গঙ্গাতীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রসাদ আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পাষাণভেদী করুণ কণ্ঠে গাহিলেন—

এসেছিলাম ভবের হাটে হাট করে ব'সেছি ঘাটে
ওমা শ্রীদুর্গা বলিল পাটে নাহে লবে গো।

চক্ষে তাঁর অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, দর্শকবৃন্দের কণ্ঠেও হাহাকার উঠিল। সন্ধ্যার আঁধার জল তখন কালো মিশ, গগনের নক্ষত্র প্রতিবিম্বিত, রামপ্রসাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—

দশের ভরা ভরে নায় দুঃখীজনে ফেলে যায়
ওমা তার ঠেকে যে কড়ি চায় সে কোথা পাবে গো।

কি মর্মভেদী অভিমান! জনমণ্ডলী নির্বাক, মন্ত্রমুগ্ধ, প্রসাদের কণ্ঠে ভৈরব গর্জ্জিল, বায়ু যেন স্তব্ধ, স্রোত রুদ্ধ—

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে আসন দে মা
ফিরে চেয়ে
আমি তামাসা দিলাম ওপ গেয়ে
ভবার্ণবে গো

একি মৃত্যু? ভাষা মুখ!—প্রসাদের জীবনের কথা এই খানেই মহিমা মণ্ডিত হইয়া কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত জাতিকে মাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবে।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

—"ভবঘুরে"

(চার)

রাত থেকেই বন্ধুরা ডাকাডাকি সুরু করেছেন—"যাত্রীরা সব চলে গেল—তোমরা যাবে কখন?"

—"যারা যাবেই, তাদের ধরে রাখবে কে?"—বলে পাশ ফিরে কম্বলটা গুছিয়ে শোবার চেষ্টা করলাম। রাতে বেশ শীত পড়েছিল।—"এত রাত থাকতে ভদ্রলোক উঠে কখনও—বিশেষ ক'রে এই শীতে।"

কিন্তু বেশীক্ষণ ভদ্রতা রক্ষা করা গেল না। সঙ্গীরা সব তৈরী। অগত্যা উঠে বসলাম। একটু পরে তৈরী হ'য়ে নিয়ে আবার পথে নেমে পড়লাম। আজ প্রথম থেকেই চড়াই সুরু হ'ল। উঠছি—তো উঠেই চলেছি। এর যেন আর শেষ নাই। প্রতিবারেই মনে হয়—ঐ পাহাড়ের ঐ বাঁকটার ওপাশেই বোধ হয় চড়াই শেষ হ'য়েছে—কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হ'তে হয়। খাড়া চড়াই উপরে উঠতে উঠতে পাহাড়ের আর একটা বাঁকে অদৃশ্য হ'য়েছে। ক্ষীণ একটা আশা তখনও জাগে—হয়ত ওখানে পৌঁছতে পারলে চড়াই শেষ হবে। নূতন উৎসাহে চলতে আরম্ভ করি—কিন্তু সেখানে গিয়েও সমস্ত আশা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়।

ক্লান্ত পা দু'টোকে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। দুপাশে অসংবদ্ধ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে 'চীড়' গাছের বন। মাঝে মাঝে দু'একটা মৃত ঝরণা দেখা যায়। কঙ্কালের মতো পড়ে আছে—মসৃণ উপলখণ্ডগুলো—যেন পরিচয় দিতে চায়—যে এককালে এখানেও জীবন ছিল।

ক্রমশঃ চীড় গাছ ছাড়া দু'একটা অন্য গাছও দেখা যাচ্ছে। গোলাপ ঝাড়ে ফুল ফুটতে আরম্ভ ক'রেছে। বড় বড় গাছের গায়ে কিছু কিছু শ্যাওলাও জন্মাতে দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় দেখলাম—দু'টী বয়স্কা মেয়ে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পথের উপরেই ব'সে পড়েছে। একজন গীতাটা খুলে পড়তে আরম্ভ করেছে—আর একজন একাগ্র মনে শুনে যাচ্ছে।

নানা জাতের, নানা দেশের, নানা রকমের লোক দেখা যায় এই পথে চলতে চলতে। কিন্তু সব দেশের লোকদেরই মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যাদের ধর্ম পিপাসাটা কিছুটা প্রবল। তারা ঐ বিশ্বাসের জোরেই এই কঠিন, দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে যায়—গায়ে শক্তি না থাকলেও। এদের দেখেই বোধ হয় ভক্ত কবির মনে জেগেছিল—

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা—তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।"

আর দু'চার জন দেখা যায়—যাদের সবটা কিছুটা উৎকট। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। নূতন নূতন দেশ দেখা, বিভিন্ন দেশের মানুষদের সঙ্গে আলাপ করা—এইটাই এদের লক্ষ্য। ধর্মাচরণটা অনেকটা গৌণ। কেউ কেউ তো ধর্মের নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন।

বাকী একদল আছেন—এঁরা হচ্ছেন—সাধারণতঃ বড় বড় শেঠ জাতীয় লোক। সারা জীবন ধ'রে খদ্দেরের পকেটের ভার লাঘব ক'রতে ক'রতে নিজেদের পকেট কাঁপিয়ে তুলতে থাকেন; ভগবানের কথা তখন ভুলেও মনে আসেনা। তারপর হঠাৎ হয়ত একদিন পরলোকের ভাবনা এসে হাজির হয়। স্বর্গে যাওয়ার পারমিট সংগ্রহের জন্য তখন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইহলোকের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নেন—স্বর্গের দ্বারী পুরোহিতের ট্যাঁকে কিছু রৌপ্যচক্র গুঁজে দিয়ে পাথরের ঠাকুরকে কিছু কলা খেতে পারলেই (ভোগ দেওয়া?) স্বর্গে যাওয়ার পারমিটটা ছাড়ায় কে? অবশ্য পুরোহিতের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবার কষ্টটুকুকে অস্বীকার করবার মতো যথেষ্ট পয়সা এরা ইহলোকের পারমিটের জোরেই কামিয়ে নিয়েছেন। এঁরা ডাণ্ডি চেপে চলেন, সখ করে হাটেন, ঘুরঘীন ক'রে দেখেন—পচ্চরের পিঠে মাল নেন—ধর্মশালায় সব চেয়ে ভাল ঘরটা তো এদেরই, আর মন্দিরের ভিতরটা তো এদের জন্যই রিজার্ভ। অন্যান্য যাত্রীরাও বোধ হয় এইটাকেই বিধি ব'লে মেনে নিয়েছে। রৌপ্য-খণ্ডের মহিমায় সবই সম্ভব ক'রে নিয়েছেন এঁরা।

অবশ্য তালিকার মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীদের কথা ধরা হয় নি। আজকালকার বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে ধর্ম পিপাসাকে তো মানুষের মনের বিকার মাত্র ব'লে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। তা হ'লে ভগবান তো বিকারের অস্পষ্ট অনুভূতি বা অবচেতন মনের গোলোকধাঁধার পর্য্যায়ে পড়ে যান। এই ধাঁধার সমাধান করবার নেশায় আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীরা বাহ্য প্রকৃতিকে অস্বীকার করে চলেন। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে এদের বিকৃতিটা এতদূরে এসে পড়েছে যে—এঁরা সব কিছু ক'রতে পারেন। কখনও বা এঁরা কণ্টক শয্যায় শুয়ে থাকেন, কখনও বা প্রচণ্ড শীতে উলঙ্গ অবস্থায় কাটান; বছরের পর বছর হাত উঁচিয়ে বসে থাকেন; আবার শোনা যায় নাকি—উর্দ্ধপাদ হ'য়েও তপস্যা করেন। এই সব বিকৃতিকেই—আমরা সাধারণ লোকেরা 'বিভূতি' আখ্যা দিয়ে থাকি বোধ হয়।

এঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু পৃথক। তাই বোধ হয় এঁরা যুগ যুগ ধ'রে আপামর জনসাধারণের সশ্রদ্ধ বিস্ময় আকর্ষণ ক'রে এসেছেন। হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশেও এদের সংখ্যা খুব অল্প নয়—বরং কিছু বেশীই।

যাই হোক, যখন একটানা পাঁচ মাইল চড়াই পেরিয়েও শেষ ক'রতে না পেরে 'ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি'—গোছের অবস্থায় এসে পৌঁছেছি,—তখন হঠাৎ দেখি—পাহাড়ের একটা ঘোড়ে চড়াইটা সত্যিই শেষ হ'য়ে গেল। তারপর উৎরাই আরম্ভ। তখন কি স্ফূর্তি। আনন্দের চোটে এক বন্ধু তো রবি ঠাকুরকে পর্য্যন্ত বাদ দিলেন না। গান জুড়ে দিলেন—"পতন, অভ্যুদয়, বন্ধুর পন্থা—যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী"। রবি ঠাকুর যখন কবিতা লেখেন—তখন

ওঁর মনের মধ্যে চিরন্তনের চড়াই উৎরাই বাসা বেঁধেছিল কিনা—সেটা গবেষণা সাপেক্ষ।

যেমনই চড়াই, তেমনই উৎরাই। নামছি তো নেমেই চলেছি। দু'পাশে বনের মধ্য দিয়ে পথ—গাছের পাতায় ঢাকা—গ্রাম বা লোকজনের চিহ্নমাত্র নাই। আমাদের সামনে কোন যাত্রীও নাই—তাদের অনেক পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু একটা অসুবিধা দেখতে পেলাম—উৎরাই এর দীর্ঘ পথের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জল নাই। পেটে তখন ধাঁ ধাঁ লেগেছে। গত রাত্রির আহারের পর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, যাও ছিটে ফোঁটা সকাল পর্য্যন্ত পেটে অবশিষ্ট ছিল—সে টুকুতো দীর্ঘ চড়াই উঠতেই বহু আগে শেষ হ'য়ে গেছে। সঙ্গে রুটী আছে—কিন্তু খেতে পারছি না—জলের অভাবে।

নামতে নামতে ক্রমশঃ চাঁড় গাছের রাজ্যে এসে পৌছালাম। সমস্ত পথ জুড়ে চাঁড় গাছের পাতায় ঢাকা। কিন্তু তখন এ সব দেখবার অবকাশ নাই। চারদিকে ঝরণা খুঁজে বেড়াচ্ছি। অনেক কিছুই চোখে পড়ছে—কেবল ঝরণাই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শেষে প্রায় তিন মাইল নেমে এসে একটা ঝরণা দেখতে পেলাম। সে খানেই জলযোগ সেরে নিলাম। কিন্তু দু'জন সঙ্গী এবং কুলিটী তখনও অনেকটা পেছনে। তাদের খাবার কিন্তু আমাদের কাছে থেকে গেছে। কাজেই তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রতে হ'ল।

দীর্ঘ সময় কেটে গেল। কারুরই দেখা নাই। চাঁড় গাছের ছায়ায় বসে বসে দেখছি গ্রামের মেয়েরা জল নিতে এসেছে। এই অঞ্চলের মধ্যে এই একমাত্র ঝরণা। বহুদূর থেকে মেয়েরা জল নিয়ে যায়। এত অল্প জলে এরা চালায় কি ক'রে—ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। সুজলা বাংলা দেশে জন্মেছি—বহু রকমের economy দেখতে হ'য়েছে—রায় কন্ট্রোলের যুগে অন্ন বস্ত্রের চূড়ান্ত economy পর্য্যন্ত। কিন্তু জলের economy—এ আমরা ভাবতেও পারি না।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আসছি—পাহাড়ীরা অত্যন্ত অপরিষ্কার। এদেশের মেয়েরা দেখতে খুব সুন্দরী—কিন্তু কি ভীষণ অপরিষ্কার। গায়ে বোধ হয় ইঞ্চি খানেক ক'রে ময়লা জমে আছে রুক্ষ চুলে জটা বেঁধে গেছে, (তপোভূমির দুহিতাদের লক্ষণ হয়তো!)—আর বেশবাস তদতোধিক—কোন আধুনিকা বঙ্গললনা দেখলে বোধ হয় নাকে রুমাল চাপা দেবেন। এরা জীবনে ক'বার স্নান করে—তা বোধ হয় হিসাব ক'রে গুণে বলে দিতে পারে; আর কাপড় চোপড় তাঁতের 'চড়ন' ছেড়ে বেরিয়ে এসে বোধ হয় আর জলের মুখ দেখেনি।

এদেশের এই জলের অভাবই বোধ হয়—এদের অপরিচ্ছন্নতার একটা কারণ। আর একটা কারণ বোধ হয়—এদের ভয়াবহ দারিদ্র্য। কি রকম দারিদ্র্যের মধ্যে এরা জীবন যাপন করে—জীবনটা 'যাপন' বললে বোধ হয় ভুল হবে—জন্ম থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীর মাটীতে কোন রকমে কাটিয়ে দেয়—তা কল্পনা করা যায় না।

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদেই নাকি মানুষ অর্থের উপাসনা করে থাকে। অবশ্য 'প্রয়োজনের' প্রকারভেদ আছে। দরিদ্র কুটীরবাসী এবং মোটর বিহারী প্রাসাদবাসীর প্রয়োজন এক নয়। একালে এদের প্রয়োজনও হয়ত খুব বেশী ছিল না। কঠিন প্রস্তরময় শস্যক্ষেত্রের নিজেদের পরিশ্রম লব্ধ ফসল আর গৃহপালিত ভেড়া, ছাগলের অপরিষ্কৃত লোমের তৈরী মোটা কম্বল নিয়েই হয়ত জীবনটা একদিন সুখেই কেটে যেত। কিন্তু আজ দিন বদলে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। রৌপ্যচক্রের মোহময় আকর্ষণে পাহাড়ী সন্তানরা আজ সমতলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। সমতল থেকে যারা আসে—তাদের সুবিন্যস্ত বেশভূষা হয়ত পাহাড়ী যুবকের মনে আশা জাগিয়েছে; সমতল বাসিনীদের চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ হয়ত পার্বত্য-ললনার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করেছে—তাই আজ পাহাড়ী যুবকরা ছুটে চলেছে সমতলের দিকে—রৌপ্যচক্রের এবং বিলাস সামগ্রীর সন্ধানে।

নিরুপায় প্রতীক্ষার অলস মুহূর্তগুলির মধ্যে নানা রকম কথা মনে আসে। বসে বসে অনেকটা সময় কেটে গেল। অবশেষে সঙ্গী দু'জন এলেন। তাঁরা জলযোগ পর্ব সারলেন; কিন্তু কুলি মহারাজের পাত্তা নাই। এদিকে ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে দশটা বেজে গেছে। অগত্যা তাকে ছেড়ে দিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম।

কিন্তু বেরিয়েই দেখি সামনেই টিহরি ষ্টেটের একটা ডাকবাংলা, পাশে একটা দোকানও আছে। বৃদ্ধ দোকানদার উপদেশ দিল—বাংলোয় থেকে এবেলা খেয়ে দেয়ে বিকেলে গেলে ভাল হবে। অবশ্য তার অযাচিত উপদেশের পিছনে যে কোন স্বার্থ ছিল না—তা নয়। এখানে থাকলে তার দোকানে কিছু বিক্রীও হবে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থই দেখলাম—দোকানদারের যুক্তি মন্দ নয়। তখনও ৩ মাইল ঘুরে ধর্মশালা। এতদূরে যেতেই অনেকটা বেলা হ'য়ে যাবে। কাজেই ওখানের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করব ঠিক করলাম।

জায়গাটার নাম ডাংডোল গাঁও। তথাকথিত সরকারী ডাক বাংলোটীতে গিয়ে দেখলাম—সেটা সরকারীই বটে। গরু, ভেড়া, মহিষ—যে যখন পেরেছে—সেই সেখানে কপিক আস্তানা পেতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী স্বার্থে কিনা বলা যায় না—কিছু কিছু 'ত্যাগ'ও করে গেছে। বাংলোর দু'টো ঘরই গোয়ালের চেয়ে বেহদ্দ। ঘরের চেয়ে বরং বারান্দাটা কিছু পরিষ্কার—অন্ততঃ পরিষ্কার করা সহজ। চীড় গাছের পাতা ভেঙে এনে ঝাড়ু বানিয়ে বারান্দাটা খানিকটা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানেই আস্তানা গাড়লাম।

পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে উনুন তৈরী হ'ল জঙ্গল থেকে জ্বালানীও সংগ্রহ করা গেল, দোকানদারের কাছ থেকে চাল, ডাল কেনার উপরি পাওনা স্বরূপে বাসন কোসনও জোগাড় হ'ল। রান্নাও এক রকম হ'য়ে গেল। নেহাৎ ভেতো বাঙালী আমরা—রুটীটা বিশেষ ধাতস্থ হয় না, হ'লে অবশ্য কিছু কম খরচে হ'ত—কিন্তু রুটী পেলেই পেটটা বিদ্রোহ করে বসে। অগত্যা প্রায় দু' বেলাই ভাত চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

ইতিমধ্যে আমাদের লছমীরাম (কুলি) বন্ধুবান্ধব সহ হাজির হ'য়েছে। আমাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি যাত্রীও এসে সরকারী অতিথিশালার আতিথ্য গ্রহণ করল। পূর্ব পরিচিত বাঙালী বৃদ্ধ মাখনবাবুও এসে হাজির হ'লেন। তাঁর কুলিটী রান্নার জোগাড় করতে লেগে পড়ল। জায়গাটায় এমনই খুব ভীড় ছিল—তার উপর আরও ভিড় হ'বে মনে হ'ল। দোকানদারের কাছে একটা বালতি চেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করতে গেলাম।

কিন্তু সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। পাহাড়ের বুক চুইয়ে একটী ক্ষীণ জলধারা গ্রামবাসীদের দেওয়া একটি কাঠের গোমুখের ভিতর দিয়ে ঝির ঝির করে পড়ছে। সারা গ্রামের সেই একটি মাত্র অবলম্বন। মেয়ে পুরুষের দল কলসী হাতে নিয়ে রীতিমত 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কোন রকমে আধ বালতিটাক জল সংগ্রহ করে নিয়ে তাতেই স্নান সেরে নেওয়া গেল। খাওয়াটাও হ'ল—একরকম মন্দ নয়! খাওয়ার পর খানিকটা দিবানিদ্রা উপভোগ করা গেল।

প্রায় ঘুটো নাগাদ বন্ধুদের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। আবার পথে বেরোতে হবে—'বন্ধনের কাল' শেষ হ'য়ে এসেছে—যাত্রার আয়োজন করতে হবে। লটবহর বেঁধে কুলিদের ছাড়বার আয়োজন করছি—এমন সময় একটা পাহাড়ী এসে চেঁচামেচি সুরু করে দিল। হাত পা ছুঁড়ে কি যে বলছে লোকটা—তার বিন্দু বিসর্গও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। শেষ পর্যন্ত কুলিদের ধ'রে টানাটানি ক'রতে লাগল। তখন ব্যাপারটাকে আর উপেক্ষা করা গেল না। বারদুয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সমস্যা সমাধানের আশা ছেড়ে দিয়ে কুলিদের ব্যাপারটা জিগ্যেস করলাম।

তাদের কাছে জানা গেল যে—জঙ্গলে আগুন লেগেছে—সেই আগুন নেবাবার জন্যই এত টানাটানি—হাঁকাহাঁকি চলছে এদেশের নিয়মই হচ্ছে—জঙ্গলে আগুন লাগলে সব কাজ ফেলে আগে আগুন নেবাতে যেতে হবে যে লোকটী টানাটানি করছে—সেটী হচ্ছে—টিহরি ষ্টেটের একজন অধস্তন কর্মচারী—উপাধি ফায়ার গার্ড (Fire guard)। লোকটার কাঁধে ঝোলান আমাদের দেশের চৌকীদারদের ছোট ধরণের একটা জিনিষও দেখলাম বটে। তার পিতলের চাকতির উপর লেখাও আছে দেখ্‌ছি—"Fire guard—Tihri" কুলিদের শুকনো মুখ দেখেই বুঝলাম—নামে ঐটুকু হ'লেও তার প্রতাপ কম নয়।

তার আবেশে আমাদের যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল সবে সে ভরসা ছিল—একটু পরে 'রেঞ্জার সা'ব' (Forest Ranger) আসছেন—তিনি এলে ছাড়া পাব। অগত্যা বসে পড়লাম। সামনে ঝড়ের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে—বলরেই আরও কিছুকাল কাটাতে হবে—মনে হয়।

ইতিমধ্যে কিছু কিছু গ্রামের লোকও এসে হাজির হয়েছে। তাদের এবং কুলিদের নিয়ে ফায়ার গার্ড আগুন নেবাতে চলে গেল। আমরা বসে বসে তাদের এবং নিজেদের 'পোড়া অদৃষ্টের' মুণ্ডপাত করতে লাগলাম

কিন্তু ব'সে বসে কাল্পনিক অদৃষ্টের মুণ্ডপাত আর কতক্ষণ চলে? ভাবলাম—দেখে আসি—ব্যাপারটা কি? দেখলাম—জঙ্গলের চারিদিক জুড়ে আগুন লেগেছে। চীড় গাছের সরু সরু ডাঁটার মতো পাতাগুলোয় আগুন লাগা খুবই সহজ—আগুনের সামান্যমাত্র স্পর্শে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে শুকনো চীড়পাতা সারা পাহাড়টা ঢেকে রেখেছে; কোথায় কি ভাবে সামান্য একটু আগুনের ছোঁয়া লেগেছে—সারা বনটাই এখন আগুনের কবলে। চীড় গাছও খুব দাহ—দেখলাম চীড় গাছের শুকনো ছালগুলো পর্য্যন্ত জ্বলছে। প্রায় সমস্ত গাছেরই শুকনো পাতাগুলো পর্য্যন্ত জ্বলছে।

এই সর্বগ্রাসী আগুন ফায়ার গার্ডরা কিভাবে নিভাচ্ছে—দেখবার কৌতূহল হ'ল। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—ফায়ার গার্ড গ্রামের লোক এবং কুলিদের নিয়ে জমজমাট ক'রে বসেছে। সেখানে তাঁদের তাম্রকূট চর্চ্চা চলছে—আবার যে সে তামাক নয়—বড় তামাক। আগুনের ধোঁয়া আর তামাকের ধোঁয়ার রীতিমত প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে। 'ফায়ার গার্ড' নামটার অর্থ এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হ'ল। ফায়ার—মানে আগুন যাতে অকালে নিবে না যায়—তাই গার্ড দেওয়াই বোধ হয় এদের কাজ।

জঙ্গলের আগুন সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বাংলোয় ফিরে এলাম। সেখানেই বা আর কি করি? ব'সে ব'সে রেঞ্জার সাহেবের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলাম। কি ফ্যাসাদেই না পড়া গেল রে, বাবা! একটা বেলা অনর্থক কেটে গেল! বসে বসে আর এক দফা লক্ষ্মীরামের মুণ্ডপাত ক'রতে লাগলাম। ওর জন্যই তো এখানে আটকে যেতে হ'ল। ও বদ্দি একটু শিগ্‌গির আসত তাহ'লে কি আর—; কিন্তু 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। এখন চুপচাপ বসে বসে দু' মাইল নীচের বাংলো থেকে 'রেঞ্জার' পদবীধারী অফিসার পুঙ্গবের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ক্রমে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যা নেমে এল। কিন্তু রেঞ্জার সাহেব তো দূরের কথা—কাকপক্ষীরও দেখা নাই। একটু পরে শোনা গেল যে রেঞ্জার সাহেব গান্ধীজীর পবিত্র চিতাভস্ম বহনকারী দলের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য সিমলী গেছেন।

হা হতোস্মি! তাহ'লে তো আমাদের উদ্ধারের আর কোন আশাই দেখা যাচ্ছে না। বসে বসে ভাবছি—পতিতোদ্ধারের জন্য ভগবান নাকি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। আমাদের মতো অধমদের প্রতি কি

তাঁর বিন্দুমাত্রও অনুকম্পা নাই? দয়া ক'রে একবার অফিসাররূপে অবতীর্ণ হয়ে এই 'দুষ্কৃত'দের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর না, বাবা! অবতার আর অফিসারে কতটুকুই বা তফাৎ।

তবে ভগবানের মন ভিজল কিনা বলতে পারি না;—একটু পরেই শুনলাম—রেঞ্জার সাহেব নাই বটে তবে আমাদের উদ্ধারের জন্য আর একজন অফিসার আসছেন।

বহুক্ষণ ধরে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকবার পর যিনি এলেন—শুনলাম—তিনি হচ্ছেন—'জমাদার সাহেব।' বয়স খুব বেশী নয়—ছোকরা বললেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু প্রতাপে ইনিও কম যান না, এসেই তো খুব এক চোট তুমি তাদি জুড়ে দিলেন—তুম লোগনে আগ লাগায়া—জঙ্গলমে—কিসিকো নেহি ছোড়েঙ্গে।"

দেখা যাক—কতদূর গড়ায় ব্যাপারটা। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল। জমাদার ছাড়ুক বা না ছাড়ুক—পেট তো আর ছেড়ে কথা বলবে না। অগত্যা রাত্রির জন্য পরোটা বানাবার কাজে গৃহিণীকে লাগিয়ে দিলাম।

রাত্রি হ'য়ে গেল। অন্যান্য যাত্রীরা ইতিমধ্যেই দু'টো ঘর অধিকার ক'রে বসেছিল—তাই একটা ঘর থেকে জমাদার সবাইকে বের ক'রে দিল। শুনলাম—ওখানে নাকি আমাদের জবানবন্দী নেওয়া হবে। নীরবে ঘটনার গতি দেখে যেতে লাগলাম। কিন্তু জমাদার বা তার সঙ্গীটীর হাবভাব খুব ভাল ব'লে মনে হ'ল না।

যাই হোক এক টুকরো কাঠ জেলে নিয়ে ওরা দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমরাই এই অভিশপ্ত পুরীর প্রথম যাত্রীদল—কাজেই প্রথম ডাক পড়ল আমাদের মধ্যে একজনের। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবাই প্রায় হিন্দিতে ওস্তাদ। তার মধ্যে আমার ওস্তাদীটা নাকি কিছু বেশী। অধমের অপরাধ যে একবার সুযোগ পেয়ে রাষ্ট্রভাষার 'তিসরী কিতাব' পর্য্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম—এবং ব্যাকরণের কোন বালাই না রেখে যা আসে তাই বলে যেতে কোথাও আটকায় না। অতএব বন্ধুরা সাব্যস্ত ক'রলেন—যে দলের তরফ থেকে মাতব্বরী ক'রতে যেতে হবে—আমাকেই। 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' যাকে বলে আর কি!

অগত্যা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম কিন্তু আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যে দরজা বন্ধ করে দেবে—এটা সঙ্গীরা কল্পনাও করেন নি। ঘরে ঢুকার পরেই আরম্ভ হ'ল সনাতন পুলিশী ব্যবস্থা, ঘরের মধ্যে একখণ্ড জলন্ত কাঠ এবং একটা বেত হাতে নিয়ে বসে আছে ফায়ার গার্ড, তার পাশে বসেছে কাগজ পেন্সিল নিয়ে জমাদার আর এই অধম ছাড়া অন্য চতুর্থ ব্যক্তি নাই। প্রথমেই তো জমাদার আক্রমণ করে বসল—"তুমনে আগ লাগায়া জঙ্গল মে।" (তুমিই জঙ্গলে আগুন লাগিয়েছ)

আমি ভীষণভাবে অস্বীকার করলাম। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বলল—"কিসনে আগ্ লাগায়া তুম জানতে হো (কে আগুন লাগিয়েছে তুমি জান)?

আগুন লাগান সম্বন্ধে সত্যিই আমি কিছু জানতাম না। কাজেই অস্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ জমাদার চুপ ক'রে গেল। তার চেলা তখন বেত আস্ফালন ক'রতে লাগিয়েছে। সে ভয় দেখাতে লাগল—"কাটকে নিমক ডালেঙ্গে (গা কেটে কেটে নুন ছিটাব)

[ক্রমশঃ]

পূর্ববঙ্গের সমস্যা

শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস

অদৃষ্টের তাড়নায়ই হউক আর রাজনৈতিক অনিবার্য কারণেই হউক পূর্ববঙ্গের সওয়া কোটি বাঙালী আজ মানুষের সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাদিগের সহায়-সম্পদ, প্রাণ ও মান সমস্ত ছিনাইয়া লইয়া সর্বহারা করিয়াছে এবং করিতেছে। নিরাশ্রিত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইবার জন্য আসিয়া অনাহারে ও রোগে কাতারে কাতারে মরিতেছে। তদুপরি পুলিশের অত্যাচারে লাঞ্ছিত হইতেছে। আজ যাহারা সর্বহারা একদিন উহারাই সর্বজন কল্যাণের নিমিত্ত ভারতের স্বাধীনতা সমরে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী হইয়াছিল, প্রাণ দিয়াছিল। কি আশায় তাহারা বৃটিশ সরকারের গোলা-বারুদের মুখে দাঁড়াইয়াছিল? তাহার প্রতিদান কি আজ সমগ্র ভারত এমন করিয়াই দিবে? স্বাধীনতা সমরে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল কি স্বাধীনতা লাভের পর সকলের নিকট ভারে ভিক্ষাপী হইয়া দুর্বিষহ নিমিত্ত? ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ আজ উহাদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখে, অবাঞ্ছিত বোঝা বলিয়া মনে করে। অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালায়ই বাঙ্গালী পরদেশী। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন কত অপরাধ তাহারা করিয়াছে। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

পরাধীনতার ভার ও অপমান অসহনীয় মনে করিয়া এই পূর্ববঙ্গবাসী একদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়াছিল। তাহার ফলে সহস্র লোক কারাবাস, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে বরণ করিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের অনেকে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহ্নিতে ঝাঁপিয়া পুড়িয়া মরিল এবারেও যাহারা বাঁচিল তাহারা স্বাধীনতার আগমনী গানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! দেখিতে দেখিতে অপমান, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দানের দক্ষিণা দিয়াছিলেন স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া, পূর্ববঙ্গবাসী দানের দক্ষিণা দিল শত শত মা, ভাই, বোনের প্রাণ দিয়া। কিন্তু তাহাতেও দক্ষিণা শোধ হইল না। ধন-সম্পদ, আত্মীয় স্বজন সমস্ত হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। আজ তাহার ধীশক্তি, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা যেন লুপ্ত হইয়াছে। ক্রমাগত বিপর্যয়ের ফলে চিন্তাশক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের মেরুদণ্ডও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সমাধানের দায়িত্ব ও তাহার অংশ :—

ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালী জাতির একটা বড় অংশ আজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। উহারা যদি না বাঁচে তবে বাঙালীর অতীত গৌরব ও বীরত্বের কাহিনী অদূর ভবিষ্যতেই রূপকথার সামিল হইবে। বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর শৌর্যবীর্য কেবল মাত্র বাঙালারই সম্পদ নহে। সমগ্র ভারতের। রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র বাঙালারই মুখোজ্জ্বল করেন নাই; সমগ্র ভারতের তিনি গৌরব! নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেবল মাত্র বাঙালারই গৌরব বর্দ্ধন করেন নাই বিশ্ব দরবারে সমগ্র ভারতীয় শৌর্য-বীর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব এই বাঙালীজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব সমগ্র ভারতের।

ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। সাহায্যও করিতেছে। কিন্তু এই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে। তা ছাড়া খয়রাতি সাহায্য দ্বারা সমস্যার যথার্থ সমাধানও সম্ভব নহে। সরকার নানারূপ সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়াও কোনও সুনির্দিষ্ট মন্তব্যে আসিতে পারিতেছেন না। সরকার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না অথবা যথার্থ দরদ দিয়া করিতেছেন না এ সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের দোলা খেলে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ বাক্ বিতণ্ডাও হয়। আসলে সমালোচনা দ্বারা এই ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হইবে বেশী। আমরা কেবল অনুরোধ করিতে

পারি যে, পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদিগের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া অপেক্ষা খাটিয়া খাইতে পারে এমন কোন বৃত্তির ব্যবস্থা করিলে উহারা লাভবান এবং উপকৃত হইবে অধিক। সরকার ইচ্ছা করিলেই অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অথবা কারিগরী কারখানা করিয়া উহাদিগের দুঃখের কতকটা লাঘব করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবশ্য অনেক স্থলে করিয়াছেনও। কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলে প্রতিপালিত হইতেছে না। সরকার আদেশ করিয়া উহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সেদিকে যদি একটু কড়া দৃষ্টি রাখেন তবে বোধ করি কিছুটা কার্যকরী হইতে পারে। মোটের উপর ভারত সরকার যদি মনে করেন এই বাস্তুহারাদের ধ্বংস ভারত সরকারেরই ক্ষতি এবং উহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভারত সরকারেরই শক্তির বৃদ্ধি সাধন তবে অনেক কিছু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

নানা স্থানে, নানা মুখে সরকারী নীতির প্রতি দোষারোপ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ আমরা এই বিশাল সমস্যার সমাধানের ভার সরকারের উপর চাপাইয়া দিয়া বিচারকের দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। আমরা যাহারা পশ্চিমবঙ্গে আছি তাহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পূর্ববঙ্গবাসী দধিচীর ন্যায় আপন অস্থি দিয়া বাঙ্গালাকে পাকিস্থানীদিগের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। নিজেদের বিপদ অনিবার্য জানিয়াও সমগ্র বাঙ্গালা যাহাতে পাকীস্থানের কবলে চলিয়া না যায় তন্নিমিত্ত বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়াছে। অন্যথায় হয়তো সমগ্র বাঙ্গালাকেই পূর্ববঙ্গের অবস্থায় পড়িতে হইত। অতএব তাহাদের এই দুঃখ দুর্দশার সমস্ত সরকারের উপর সমস্ত ভার চাপাইয়া নির্বিকার দর্শক হইলে চলিবে না। ইহা দান প্রতিদানের কথা নহে। সাধারণ কর্তব্য বোধের কথা। আজ যদি এই সওয়া কোটি বাঙ্গালীর জীবন মরণ সমস্যাকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমস্যা বলিয়া গ্রহণ না করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতেই যে এই জাতির কি দুর্দিন আসিতেছে তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। ইহারা যদি বাঁচার মত বাঁচিয়া না থাকিতে পারে তবে বাঙ্গালী জাতির নামই একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে সে কথা মনে করাও অসঙ্গত হইবে না। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "রিফিউজিরা বিহার যাইবে না, উড়িষ্যা যাইবে না, আন্দামান যাইবে না। তবে কি উহাদের জন্য চৌরঙ্গীর উপর চারতলা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে?" এই কথা বলিবার অবশ্য কারণও আছে। এতদিন আমরা সুখে দুঃখে মোটামুটি একরূপ খাটিয়া পরিয়া ছিলাম। কিন্তু আজকাল এই বাস্তুহারা সমস্যার দরুণ খাওয়া খাওয়া, চলাফেরা চাকুরীতে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ফলে স্বতঃই মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে তিন কোটি বাঙ্গালীর সওয়া কোটিকে বাঙ্গালার বাহির করিয়া বিহার উড়িষ্যায় পাঠাইলে আপাততঃ অসুবিধার খানিকটা লাঘব হইবে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর কৃষ্টি, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সলিল-সমাধি প্রাপ্তি হইবে।

সত্য গোপনের চেষ্টা না করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা শিক্ষার দিক হইতে অনেক অগ্রগামী। উহাদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অনেককেই হার মানায়। কাজেই এই শক্তি যদি বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তবে বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্য, জ্ঞান-গরিমা অস্বাভাবিক ভাবে লাঘব হইবে। অপর পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র হিন্দু জাতির শক্তি এক কেন্দ্রীভূত হইলে এই শক্তি জগতের যে কোনও শক্তিমান জাতির সমকক্ষ হইতে পারে। অতএব বাঙ্গালী জাতির যদি অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, বাঙ্গলার ঐতিহ্য যদি বজায় রাখিতে হয় তবে আমাদের আপাতঃ কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে কোনও উপায়ে এই মরণোন্মুখ বাস্তুহারাদের বাঁচাইয়া বাঙ্গলারই মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করা উচিৎ।

অনেক বাস্তুহারার মুখে সরকারের ও স্থানীয় লোকের

বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা হয়তো মনে করে যেহেতু কংগ্রেস ভারত বিভাগ মানিয়া লইয়াছিল এবং সেই নিমিত্তই পূর্ববঙ্গের এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে অতএব বাস্তুহারাদের সমস্ত প্রকার সাহায্য করিয়া পূর্বে তাহারা যেরূপ ছিল সেরূপ অবস্থা ফিরাইয়া দেওয়া সেই কংগ্রেস সরকারের অবশ্য কর্তব্য। শুধু তাহাই নহে সে ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শাস্তি পাওয়া উচিৎ। কিন্তু তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করে না যে, উহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ভারত সরকার কেন? কোন সরকারই তাহা পারে না। সরকার এবং স্থানীয় লোকদিগকেই গালাগালি দিলেই যদি সমস্যার সমাধান হইত তবে না হয় লোক ডাকিয়া আমরা সে কার্য করিতাম। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা ফলবতী হয় না। কেবলমাত্র দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বাড়ায়। সমস্যা সমাধানের কাজ এক বিন্দুও অগ্রসর হয় না।

বাঁচিবার উপায় :—

বাস্তুহারাদের বাঁচিতে হইলে এবং মানুষের অধিকার অর্জন করিতে হইলে আজ নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী ও বেসরকারী খয়রাতি সাহায্যের নিমিত্ত ভিক্ষার ঝুলি যত শীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভিক্ষাবৃত্তি, দান গ্রহণ কার্যের এমনই মহিমা যে একবার জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইলে আর ত্যাগ করিতে চায় না। ইহার অভ্যাস বড় সাংঘাতিক! ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে নীচ করিয়া তোলে। আপন স্বত্বাকে বিস্মৃতির জলে তলাইয়া দেয়। আজ যদি বাস্তুহারাগণ মনে করে যে আন্দোলন করিয়া, সভাসমিতি করিয়া সরকারের নিকট হইতে পুনর্বসতির ব্যবস্থা আদায় করিবে এবং সেই ভাব লইয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে তবে ধ্বংস তাহাদের অনিবার্য। নিজেরা যদি কার্যতঃ বাঁচিবার চেষ্টা না করে তবে দুনিয়ার কেহই তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। "আমরা বাঁচিব। আবার আমরা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইব" বলিলেই বাঁচা যাইবে না। এই নিমিত্ত কয়েকটি সুচিন্তিত পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এই নিমিত্ত সর্বপ্রথম কার্য হইল স্থানীয় লোকের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করা। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে এমন জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে যদ্দ্বারা গোটা বাঙ্গালী সমাজ উপলব্ধি করিতে পারে, আজ যাহাদের দুঃস্থ ও অসহায় বলিয়া সকলেই আপদ মনে করিতেছে, তাদেরই যদি কাজে লাগানো যায় তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ চুপ করিয়া সরকারী বা বেসরকারী খয়রাতি সাহায্যের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া ছোট বড়, ভাল মন্দ যে কোন কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিৎ। আজ আর সম্মান ও পদবীর মোহে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার সময় নাই। পূর্ব যশ, খ্যাতি আজ আর ক্ষুধার অন্ন, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, জোগাইবে না। খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকার মধ্যে অপমান ছাড়া সম্মানের গন্ধ মাত্র নাই। পরের দয়ার উপর বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে যে কোনও প্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করা অনেক সম্মানজনক!

ভোটের উপর বাস্তুহারাদিগকে ইহাই স্থির করিয়া লইতে হইবে যে তাহাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হইবে। সরকার পিছনে আছে। তাঁহাদের কর্তব্য তাঁহারা করিবেন।

সহীদ সুশীল কুমার সেন

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সেন

(অনুবৃত্তি)

৬। 'তুড়িলাভ'

সুশীল কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের 'বন্দেমাতরম' * পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি লেখার জন্য কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ঐ সময়ে লালবাজারে অবস্থিত ছিল। মোকদ্দমার শুনানীর দিন সুশীলও অন্যান্য ছাত্রদের সহিত লালবাজারে গিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বন্দেমাতরম ধ্বনি করা মহা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনিলেই 'সাহেবলোগ' অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেন। স্বদেশী যুগের বহুকাল পর পর্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে 'ধুলে-মাতরম' ছাপযুক্ত কাপড় আসিত, ইহা হইতে মনে হয় 'সাহেবলোগ' বন্দেমাতরমের 'বেধে মার' এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন। লালবাজারে সমবেত জনতা এক সময়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে; সহরের শান্তিরক্ষকরা ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়েন এবং ইউরোপীয় পুলিশ সার্জেন্ট, অশ্বারোহী পুলিশ এবং লালপাগড়ি বাহিনী প্রতীক্ষমান জনতাকে যুগপৎ আক্রমণ করে। হুয়ে (Huey) নামক একজন সার্জেন্ট ঘুষি মারিয়া ছুটপাত পরিষ্কার করিতেছিল; সুশীলের পার্শ্বে অবস্থিত প্রভাস দেব নামক জাতীয় বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে মুখ্যাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকুমার উহাকে প্রত্যাঘাত করেন। ইহার পরে উভয়ের মধ্যে কিয়ৎকাল যুদ্ধ চলে, এবং সুশীলকুমারের ছুটি আঙ্গুল জখম হয়। অতঃপর দেশীয় পুলিস আসিয়া সুশীলকুমারকে কাবু করিয়া ফেলে। উহারা সুশীলকুমারকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইলে হুয়ে সাহেব উহাদের নিবারণ করেন। পুলিসের কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা প্রদানের অভিযোগে সুশীলকুমারকে অভিযুক্ত করা হয়, এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় উহাকে পাঁচশত টাকার জামিনে মুক্ত করিয়া লইয়া আসেন। কলিকাতার অন্যান্য স্বদেশী মামলার মত এই মামলারও বিচার কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে হয়। কলিকাতা পুলিস কোর্টের উকিল এবং সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ মোহন বসু মহাশয় আদালতে সুশীলকুমারের পক্ষ সমর্থন করেন। সুশীলকুমার ঘটনা স্বীকার করেন,

* ১৯০৬ ইংরেজীতে কংগ্রেসের নীতি, বিশেষভাবে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি হয়। যাহারা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁহারা তিলক, লাজপত রায়, ও বিপিন পালের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হন, এবং বাংলায় বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ইহাদের নেতৃত্বে স্বরাজ সমিতি গঠিত হয়। নূতন দলের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয় ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম'। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উহার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু পত্রিকার নীতি সম্পর্কে অন্যান্যদের সহিত মতভেদের ফলে তিনি প্রধান সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। সম্পাদকের নাম ঘোষণা করিবার আইন তখনও প্রণীত হয় নাই,—তৎকাল প্রচলিত আইনে শুধু মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ঘোষণা করিবার বিধান ছিল। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিবার পর হইতে সম্পাদকের কোন নাম ঘোষিত হয় নাই, সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ যে বন্দেমাতরম এর সম্পাদক ছিলেন, তাহা প্রতিবাদ করা সহজ হয় নাই। এই মামলায় শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়কে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এবং ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বরণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের বিচারক কিংসফোর্ড সাহেব I. C. S. পাঠকালে শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

কিন্তু অপরাধ অস্বীকার করেন; তিনি বলেন তিনি আত্মরক্ষার্থে হুয়ে সাহেবকে প্রহার করিয়াছেন। বিচারক সুশীলকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া উহার প্রতি বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা হিসাবে ১৫ ঘা বেত্র দণ্ডের আদেশ দেন। আদেশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাদেশ তামিল করিবার জন্য উহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে উহাকে একটি টেবিলের পাশে দাঁড় করাইয়া টেবিলের উপর উবু হইতে বলা হয়, এবং প্রেসিডেন্সী জেলের ইউরোপীয় জেলার স্বয়ং উহার উলুক পাছায় পনের ঘা বেত দেন। প্রচলিত প্রচারপত্র হত্যাদিতে সুশীলকুমারকে হাড়িকাঠে বাঁধিয়া বেত মারা হইয়াছে বলিয়া যে কথা, তাহা সত্য নহে। হাড়িকাঠে যেরূপ নৃশংস ভাবে বেত মারা হয়, সুশীলকুমারকে সেরূপভাবে বেত মারা হয় নাই কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সমগ্র পাছার কালশিরা পড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি কয়েকদিন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ছিলেন। সাধারণতঃ বেত্রাঘাত দণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রথম কয়েক ঘা বেতের সময় খুব চেঁচায়; তারপরে আর চেঁচাইতে পারে না, শুধু একটা অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। সুশীল কুমার বেত্রাঘাতের সময়ে বা পরে কোনরূপ কাতরতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রচলিত সাহিত্যে উহার অচৈতন্য হইয়া পড়িবার যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা নিতান্তই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, ফাঁসীর সময়ে মাতা, ভাগনী এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে খুদিরামের এবং ভ্রাতার উদ্দেশ্যে কানাইলালের বিলাপের কাহিনীর সমপোত্রীয়।

বেত্রাঘাতের পর সুশীলকুমারকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। যতদূর মনে পড়ে প্রদ্ধেয় ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখার্জি মহাশয়ের একজন আত্মীয় সেখানে ছিলেন, তিনি যথেষ্ট যত্ন সহকারে তাহাকে দেখেন। সুশীলের আত্মীয়-স্বজনেরা সেখান হইতে উহাকে সাতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় লইয়া আসেন। সুশীলকুমার অপরের সাহায্যে হাঁটিয়া ঘোড়লার উঠিয়াছিল। কয়েকদিন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী থাকিবার পরে তিনি পুনরায় চলা-ফেরার যোগ্যতা লাভ করেন।

এই ব্যাপারে সুশীল পরিচিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সুশীলের তুড়িলাভ, কিরিঙ্গীকে বলায় বাবা' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইল। বাংলার সকল পত্রেই এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সম্পাদকীয় লিখিত হইল এবং ভারতের সর্ব্বত্রই এই ঘটনা লইয়া একটা আলোড়ন হইয়া গেল। জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়) এই 'martyr boy' কে দেখিবার অভিপ্রায় করিলেন, এবং পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতিরিক্ত আস্ফালনে সুশীলকুমারের মনে অহঙ্কার জন্মিয়া উহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার খুল্লতাত ৺মহেন্দ্রনাথ দে মহাশয় এই রূপ অভিনন্দনে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এর পরে যখন ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উহাকে প্রকাশ্য অভিনন্দনের দাবী জানাইলেন তখন এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইল। ৺পাল মহাশয় মহেন্দ্রনাথের কোন আপত্তি শুনিলেন না, আবার সুরেন্দ্রনাথের সভায় সুশীল কুমারকে যাইতে না দেওয়ার পর শ্রীযুক্ত পালের সভায় উহাকে যাইবার অনুমতি দিতে মহেন্দ্রনাথের বিবেকে বাধিতেছিল। সুশীলকুমার এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন তিনি সাধারণ শ্রোতা হিসাবে সভায় যাইবেন, তারপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, সেই অনুসারে কাজ করিবেন। ইহাতে এই সমস্যার একটা সমাধান হইল বটে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথকে একটা প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়া তাঁহার অবস্থা পরিষ্কার করিতে হইল। উত্তর কলিকাতার বীডন উদ্যানে এই সভা আহূত হয়, এবং সুশীলকুমারকে দুইটি পদক দেওয়া হয়। পদক দুইটির একটীতে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে :

প্রথম পৃষ্ঠে:—	অপর পৃষ্ঠে :—
S. N. Mukherji	Awarded to
Jeller	Susil Kumar Sen
31, Cornwallis Street.	for
	Bravery and
	Patriotism.

স্বরাজ সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অপরটীতে সময়ের অল্পতার জন্য কিছু উৎকীর্ণ করা সম্ভব হয় নাই।

এই উপলক্ষে অন্যান্য যাহাদের সহিত সুশীলকুমারের হৃদ্যতা স্থাপিত হয় এবং পরিচয় জন্মে উহাদের মধ্যে একটি পরিবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে কলিকাতার নিকট বাস করিতেন। এঁদের বাড়ি ছিল খুব সম্ভবতঃ ফরিদপুর জেলায়। এই পরিবারের সুশীলকুমারের প্রায় সমবয়স্ক একটী যুবক সুশীলকুমারের নিকট যাতায়াত করিতেন। এঁর একটি চক্ষু নষ্ট ছিল, এবং এঁর নাম খুব সম্ভবতঃ ছিল শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেন। পরবর্তী জীবনে সুশীলকুমারের সহিত এঁর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, বলিতে পারি না। ৫৪ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে প্রভাস চন্দ্র দে নামে একটি যুবক থাকিতেন। ইনি আবেগপূর্ণ ভাষায় লিখিতে পারিতেন, এবং সভাসমিতিতে প্রায়ই ইহাকে গরম গরম বক্তৃতা দিতে দেখা যাইত। ইনিই সুশীলকুমারকে ৺দেবব্রত বসু মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, এবং সেই সূত্রেই সুশীলকুমার মানিকতলার বিপ্লবী দলের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন। আমাদের মেজদার সহিত প্রভাস বসুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সুতরাং এঁর সংস্পর্শে আসিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। সময়ে আমরা অপর এক জন মহানুভব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসি, যাঁহার স্মৃতি আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি পরলোকগত মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সাহেব। এরূপ উন্নতমনা অকৃত্রিম স্বদেশ সেবী নিতান্তই দুর্লভ। ইনি পাটনায় মোক্তারী করিতেন; বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মোক্তারী ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া 'anti partition procession party' নাম দিয়া অল্প-সংখ্যক যুবককে লইয়া একটী দল গঠন করেন। এঁরা পথে পথে স্বদেশী গান গাহিয়া বেড়াইতেন এবং রাখী প্রভৃতি সকল প্রকার অনুষ্ঠান পালন করিতেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পরে যখন বাঙ্গালী রাখী উৎসব ভুলিয়া গেল, তখনও ইনি বঙ্গভঙ্গের সময়ে ৩০শে আশ্বিন তারিখে বাঙ্গালী যে চর্ম্মের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার স্মৃতি অম্লান রাখিয়াছিলেন, এবং যদিও বিহার বাংলা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল তাহা হইলেও ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ৩০শে আশ্বিন সমাগত হইলেই বাঙ্গালীকে রাখী উৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, এবং উৎসবে যোগদান করিবার আহ্বান করিতেন। ইংরেজের ভেদ-নীতির জীবন্ত প্রতিবাদস্বরূপ এই মহানুভব স্বদেশসেবী শেষ জীবনে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ধাতব্য হাসপাতালে দেহরক্ষা করেন।

সুশীলের 'তুড়িলাভ' ঘটে পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে। এই সময়ে আমাদের পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা লইয়া আসেন। উহাদের সঙ্গে একটী ভৃত্য আসিয়াছিল; সে নৈহাটীতে জল খাইবার জন্য নামিয়া আর গাড়ি ধরিতে পারে নাই। উহার জন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই উহার কথা যথারীতি পুলিসে জানান হইল। লোকটি বিশেষ বুদ্ধি করিয়া একদল গোয়ালার সঙ্গে পরবর্ত্তী একটী লোকাল গাড়িতে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতায় পদার্পণ উহার সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহারও ঠিকানাও সে জানিত না। স্বগ্রামে 'বীরেনবাবু সুশীল বাবুর যতই প্রতিপত্তি থাকুক, কলিকাতার বিশাল জন-সমুদ্রে উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যে কতদূর অসম্ভব, সে বোধ তাহার ছিল না। কিন্তু এই অজ্ঞানতাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার সহায়ক হইল। 'বীরেন বাবু সুশীল বাবুর' খোঁজ করিতে করিতে ভৃত্যটি শেষ পর্য্যন্ত কালিঘাট পৌঁছিল। ঘটনাচক্রে সেখানে শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার মহাশয়ের সহিত উহার সাক্ষাৎ হয়। হালদার মহাশয় উহাকে ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐদিনই বিকাল বেলা সে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে।

সেকালে আজমিরিগঞ্জ হইতে জাহাজযোগে গোয়ালন্দ হইয়া রেলে কলিকাতা আসিতে হইত এবং আজমিরিগঞ্জ হইতে হেমন্তে নয় (৯) মাইল হাঁটিয়া ও বর্ষায় নৌকাযোগে

বালিয়াচক যাইতে হইত। আমাদের বাড়ি যাওয়ার দিন যখন স্থির হইল তখন গ্রামের নেতৃস্থানীয়, এবং স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দেব, ৺প্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এবং শিবেন্দু চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়গণের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্রগণ একটি বড় ভাওয়ালি নৌকায় করিয়া আমাদের আগাইয়া আনিতে গেলেন, এবং বিপুল বন্দেমাতরম ধ্বনি, এবং এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনৈক পল্লীকবি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে রচিত, 'এসহে সুশীলকুমার প্রাণের প্রিয় কুমার' ইত্যাদি সঙ্গীত, সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া আমাদিগকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। এই বন্ধের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া একবার আমরা জালমুখী জমিদার বাড়ি গিয়াছিলাম। সেখানেও সুশীলকুমার বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, এবং সুশীলকুমারসহ সকলের একটী গ্রুপ ফটো উঠান হয়। এই ফটোতে সুশীলকুমারের গলায় মালায় ফুলগুলি স্বাভাবিক বর্ণে রঞ্জিত ছিল। রঙীন ফটোগ্রাফীর তখন শৈশবাবস্থা, সুতরাং কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। খুব সম্ভব এই রং তুলিদ্বারা ছুটান হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে এই বিষয়ে খোঁজ লইবার কোন সুযোগ হয় নাই।

সুশীলকুমারের এই সকল অভ্যর্থনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম এই জন্য, যে, এই সকল অভ্যর্থনায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। আত্মীয়-স্বজন, সহকর্ম্মী, এবং মাননীয় জনের প্রতি ব্যবহারে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই, শুধু তাহাই নহে, কর্ত্তব্য-কার্য্যেও তিনি কখনও কোন শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই, অথবা তাঁহার আচরণে কখন কোন অহমিকার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহার কৃতিত্ব যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার পিতৃব্যের প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ক্রমশঃ

মানস রথের রথী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আমরা হ'লাম মানস রথের রথী,
কল্পলোকে স্বপ্নলোকে অবাধ মোদের গতি।
দেব বালারা যেথায় গাঁথে পারিজাতের মালা,
নাগ বালাদের [redacted] যেথায় হাজার মানিক জ্বালা,
কিন্নরেরা গান করে আর বিদ্যাধরে নাচে,
রত্ন রতন ফলে যেথায় রত্ন পুরীর গাছে,
যাব সেথায় স্বর্গে যেথায় রম্ভা অমরাবতী
হ'য়ে মোরা মানস রথের রথী।
আমরা সবাই মানস রথের রথী,
মরু মেরুর দুর্গমতায় অবাধ মোদের গতি!
বরফ ঘরে যেথায় মানুষ কাটায় গভীর শীত;
মরিচীকা নাচে যেথায়, গায় বেদুইন গীত।
নিবীড় বনে পিগ্‌মি যেথায় জিরাপ চড়ে ঘুরে,
দেখ্‌ব সারা ভুবন, বসে ধবল গিরির চূড়ে।
দেশ বিদেশে দেখ্‌বো জাতির সুমতি দুর্ম্মতি;
হ'য়ে সবাই মানস রথের রথী।
আমরা সবাই মানস রথের রথী;
এই ভারতের অতীত পথে অবাধ মোদের গতি।
যা'ব ভৃগুর আশ্রমে সেই সরস্বতীর তটে;
শীলভদ্রে দেখ্‌বো চোখে তাঁর নালন্দা মঠে।
উরুবিল্বে দেখ্‌বো গিয়ে মহাবোধির প্রভা
দেখ্‌বো চোখে উজ্জয়িনীর নব রতন সভা।
যাব যেথায় বুদ্ধে পুজে রাণী বিলাসবতী;
আমরা হ'লাম মানস রথের রথী॥
আমরা সবাই মানস রথের রথী,
অনাগত যুগেও হবে অবাধ মোদের গতি।
সেই ভারতে যাব যেথায় নাই দীনতার লেশ;
নাইক' ব্যাধি, ক্ষুধার পীড়ন, নাই অসূয়া দ্বেষ।
মৈত্রী প্রেমে শৌর্য্যে ভারত সবার পূজা পায়,
পণ্যে বোঝাই হাজার তরী দেশ বিদেশে যায়।
সেই ভারতে যাবো যেথায় ধর্ম্মে সবার মতি,
হ'য়ে সবাই মানস রথের রথী!!

যাদের আমরা ঘৃণা করি

শ্রীসুলতা কর

সমাজের নিম্নস্তরে যারা বাস করে, যাদের অস্পৃশ্য বলে, ছোটলোক বলে আমরা দীর্ঘকাল ধরে ঘৃণা করে আসছি, তারা কি সত্যই এতখানি ঘৃণার পাত্র। সাধারণের ধারণা যে নিম্নজাতিরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে উচ্চ জাতিদের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। উচ্চজাতিদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা তাদের নাই।

কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখতে পাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিম্ন জাতিদের দান কম নয়।

হাড়ী, ডোম এরা এখন সমাজে অস্পৃশ্য একঘরে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এরা ছিল বীরের জাত, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। অতীত ভারতের বেশীর ভাগ রাজাদের সৈন্যেরা ছিল হয় ডোম নয় হাড়ি।

হাড়ি সৈন্যদের বীরত্ব কাহিনীর একটি গল্প লিখছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে খাসিয়ারাজের কোন কারণে ঘোর মনোমালিন্য হয়। উভয় রাজাই যুদ্ধের আয়োজন করলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য প্রবল প্রতাপ হাড়ি সৈন্যের বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

"বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল সৈন্য।
হাড়িরা ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া॥
উত্তরের হাড়ি চলে আগে সৈন্য বাণা।
বঙ্গদেশী হাড়ি সব মধ্যে পাকে থানা॥
দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম আদি।
তার সেনা সাথে চলে মহাশব্দ বাদি।
ডেমস্ ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে।
মুকুর দেখান লাঠি পাকাইয়া মাথে॥"

(রাজমালা—ত্রিপুরা ইতিহাস)

কিন্তু হাড়ি সৈন্যদের এই প্রতাপ বৃথা হ'ল। কার সঙ্গে তারা যুদ্ধ করবে? শত্রু কোথায়? সমস্ত রণক্ষেত্র ফাঁকা, কোথাও জনপ্রাণী নাই। খাসিয়ারাজ বা তাঁর সৈন্য দলের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য্য হয়ে রাজা ধন্যমাণিক্য ভাবতে লাগলেন—এ কি ব্যাপার। এমন সময় গুপ্তচরদের মুখে খবর শুনলেন যে ত্রিপুরার দুর্দ্ধর্ষ হাড়ি বাহিনী যুদ্ধে নামছে; একথা শুনেই খাসিয়ারাজ নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে সভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে স্বদেশে পালিয়েছেন।

দেখতে দেখতে খাসিয়ারাজের দূত মহারাজ ধন্যমাণিক্যের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল—"খাসিয়ারাজ বিনাসর্ত্তে ত্রিপুরারাজের আনুগত্য মেনে নিয়েছেন অনুগ্রহ করে ত্রিপুরারাজ তাঁর হাড়ীসৈন্য ফিরিয়ে নিন।" ত্রিপুরারাজ সম্মত হয়ে হাড়ীসৈন্য ফিরিয়ে নিলেন এমনই ছিল হাড়ীসৈন্যের প্রতাপ। আজ যাদের আমরা নীচজাত বলে ঘৃণা করছি, সমস্ত ভারতবর্ষ একদিন বীরের গৌরব, যশের মুকুট তাদের মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। ভারতের বীরযোদ্ধা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী

সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভ না করলেও তাঁর লেখনী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অফুরন্তভাবে কাব্যধারা বর্ষণ করে বাঙ্গালী চিত্তে সাহিত্য-রস পরিবেশন করে গিয়েছেন। নিজস্ব ভাব-ধারায় মণ্ডিত কাব্যরচনা ছাড়াও অজস্র বিদেশীয় কবিতার অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বাড়িয়েছেন। বিশেষ করে বিদেশীয় জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদ লক্ষ্য করবার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেছেন :

বন্দনা করি মায়!
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা চন্দন-শীতলায়!
যাঁহার জ্যোৎস্না পুলকিত রাতি
যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুর ভাষিনী—সুখদাত্র-বরদায়।
বন্দনা করি মায়।
সপ্ত কোটির কণ্ঠ নিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায়?
বন্দনা করি মায়।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরমে'র অনুবাদ করে কবি দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত ঘেঁষা জাতীয় সঙ্গীতের নিছক বাঙ্গালা অনুবাদ চলে কি না, অন্য দেশীয় জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদের সঙ্গে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত এক এক ধারায় চলেছে। এই ভাবোদ্দীপক ও দেশবন্দনা সঙ্গীত জাতির মর্মস্থলে আঘাত হানে ও অনুপ্রেরণা জোগায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ও ভাষার যাদুকর। নানা ভাবে ও ছন্দে শব্দযোজনা করে ভাষার এমন মাধুর্য্য সৃষ্টি করেন যে, স্তম্ভিত চোখে পড়ে। "বেণু ও বীণা"য়—"বঙ্গ আমার জননী আমার", "কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল" শীর্ষক রচনাগুলি জাতির মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এমন স্বাধীন কবিস্বরস খুব অল্পই উপভোগ করা যায়।

"হোমশিখা"র কবিতাগুলি পাঠ করিলে ঋষিদের হোমশিখার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এর তেজস্বিতা হোমশিখার মতই, ব্যাপ্তি হোমশিখার মতই বিশ্ব বিস্তারী। কবির সামা-সাম্য কবিতাটীতে যে নির্ভিকতা ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয় কবি যেন অত্যাচার পীড়িতদের সাম্য-সাম্য গান শুনিয়ে দিতে চান।

"তীর্থ-সলিল" গ্রন্থে পাশ্চাত্য কবিতার পাশাপাশি প্রাচ্য কবিতাগুলি খুব উজ্জ্বল করে উঠেছে। জগতের সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার কাব্যানুবাদ এই গ্রন্থে একত্র করে রাখা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র। কবি তাঁর পিতামহের নিকট হতে অসাধারণ জ্ঞান পিপাসা এবং সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে অল্প বয়সেই কবি যশে প্যাতিমান হয়েছিলেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়োগ ব্যথা বাঙ্গালী সাহিত্য রসিকের চিত্তে বেদনাদায়ক সন্দেহ নেই।

কবির সম্বন্ধে অনেক সাহিত্যিক বলেছেন, সত্যেন্দ্র-নাথের সাহিত্য প্রেরণার আর একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা বুলিকে উদ্ধার করে তাকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

স্বদেশের প্রতি তাঁর অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যা কিছু অসত্য ও অলসতা, যা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যা কিছু ক্ষুদ্র ও মূঢ়তা ছিল তাকেই কঠিন ধিক্কারে ও বিদ্রূপে আঘাত হেনে তাঁর বাণী বেদনার জ্বালায়

বিষাক্ত হয়ে উঠত। আবার অতীত ও বর্তমানে যা কিছু মহান ও সুন্দর হবার সম্ভাবনা দেখতেন, তাই তাঁর মর্মস্পর্শ করত এবং তাঁর বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়তেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করেও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দশা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করবার সুযোগ পেলে ছাড়তেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁর একটি বিশেষ অনন্যসাধারণ নিপুণতা ছিল।

কবির বিখ্যাত কবিতা নারী বন্দনায় লিখিয়াছেন :

ললাট তোমার সিতপক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ,
আধ-ফুটন্ত যূথিকার কলি স্ফুরিত নাসার ছাঁদ ;

• • •

পদ্ম লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলে,
তোমারে ঘিরিয়া যেন বসন্ত নব-পল্লব খোলে।

• • •

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে শুভ্র ছায়,
আধ বিকশিত সোনার কমল উজলিছে মহিমায় ;

• • •

অমল বরণী নবনীত জিনি'—জিনি' বরফের গুঁড়া,
কোমল চিকণ চিকুর সোণালি জিনি' কাঞ্চন চূড়া !

• •

ঐ কালো রূপ অমৃতের কূপ সুষমার খনি কালো,
শ্যাম পল্লব জিনিয়া পেলব কালো আমি বাসিভালো ;

• •

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু ধনু কেগো ক'রেছ যোজনা নয়ন-পদ্ম-শরে !

• • •

কজ্জল-হীন কাজল-নয়নে রেশমী পক্ষ্ম ঘেরা,
কান্ত কোমল ক্লান্ত সে দিঘি সকল দিঘির সেরা।

এই কবিতাগুলি বিভিন্ন দেশের নারী বন্দনার অনুদিত অংশ বিশেষ। বিভিন্ন দেশ ও জাতি নিজেদের পছন্দ মত বন্দনার কবিতা রচনা করে যান। বর্ণনার মধ্যে তাই দেখা যায় বিভিন্নরুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি। কবি এই বিভিন্ন রূপ ও রসের আলেখ্য বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এই যে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক ভাবে পৃথিবীর সব দিকেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারই আশা বিস্তর ভাব সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন তাতে ভাষার গৌরবই বৃদ্ধি করেছেন। কবিতাগুলি পড়লে মনে হয় যেন এগুলি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

বাসি ফুলের মালা

ধ্রুবেন্দ্রকুমার সেন

গোধূলির ম্লান আলোয় বিখ্যাত চিত্রতারকা সুরুচি দেবীর বিরাট কাইজারখানা নিঃশব্দে সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ী ঢুকল। ষ্টুডিও থেকে আসছেন সুরুচি দেবী সারাদিনের স্যুটিংএর পর ;—ক্লান্তিতে আর অবসাদে তিনি অবসন্ন। গাড়ীর দরজা খুলে ড্রাইভার দাঁড়াল—সুরুচি দেবী নাবলেন ধীরে, তারপরে মন্থর গতিতে একতলার সিড়ি ভেঙে দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে পৌছলেন। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল—তাই মেক্ আপ্ তুলে তারপর বাড়ী ফেরার আর ধৈর্য্য ছিল না। সমগ্র মুখমণ্ডলে ঘনত্বে লাল রঙএর প্রাচুর্য্য—সুরুচি বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ক্ষীণ হাস্য করেন। হায়রে! শুধু জীবন ধারণের জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এই রকমারী সাজার ঘটা। পাখার সুইচটা টিপে দিলেন সুরুচি—তার অবসাদ ভরা দেহে ও মনে ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুটা শান্তির প্রলেপ এনে দিল।

বেয়ারা এসে এক গ্লাস ঠাণ্ডা লরবৎ এনে সামনের টিপাইতে রাখল। সুরুচি ধীরে ধীরে তা পান করলেন। পাখার ঠাণ্ডা বাতাস আর ফ্রিজিডেয়ারের সরবৎ কিছুটা তৃপ্তি দিল।

এখনও অনেক কাজ বাকী; সমস্ত মেক্ আপ্ ধুয়ে মুছে অবসাদভরা দেহকে বাহিরাগার স্নান করাতে হবে। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজে লাগে—অসোয়াস্তিতে ভরে আছে সুরুচির মন; কিন্তু তবুও, এখন কিছু করতে ভাল লাগছে না, শুধু মনে হয় এমনি চুপচাপ বসে থাকতে।

সামনের টেবিলে খোলা কাগজ আর ছায়াছবির মাসিক ও সাপ্তাহিক সংখ্যাগুলি চোখে পড়ে। সকালে পড়তে পড়তেই ষ্টুডিও থেকে ফোন্ এসেছিল, তাই তাড়াতাড়িতে আর পড়া হয়নি, তবু—যেটুকু পড়া হয়েছিল তাতে গর্ব্বে ফুলে উঠেছিল তার বুক। আজগের ছায়াছবির জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রতারকা যে তিনি তা সমালোচকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তার আগের ছবিটি দেখে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সংসারে এক পুত্রহারা জননীর ভূমিকাভিনয় তাঁর—, সমালোচকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন এমন মহিমময়ী নারীর চরিত্রাভিনয় মাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। ভাগ্যবিড়ম্বিত এক স্নেহবৎসল জননীর সন্তান পালনের অবিস্মরণীয় কাহিনী...হাসি, কান্নায়, সুখে, দুঃখে রসোত্তীর্ণ এক মাতৃমূর্ত্তি...।

গত রবিবারের কথা মনে পড়ল তার। সকালে ঐ ছবির ছিল প্রেস্ শো। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্রসমালোচকেরা এসেছিলেন এই আসরে। নিস্পন্দ চলের মাঝে ছবি শেষ হ'ল—বিজলীবাতি চম্‌কে উঠল। কুখ্যাত, অখ্যাত, বিখ্যাত সব কাগজের প্রতিনিধিরাই তাকে ঘিরে ধরলেন—চোখে তাদের বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রশংসাভাজন দৃষ্টি। কত নামজাদা লোক তাদের মধ্যে —সবাই ভূয়সী প্রশংসায় মুখর করলেন তার কর্ণযুগল...। অজস্র স্তুতিবাদের মাঝে মাঝে, সংবাদসেবীদের ক্যামেরা আলোর স্ফুলিঙ্গ ছড়াল তাদের সবার ওপর।

কিন্তু তবুও এসব তার ভাল লাগেনি। শিল্পীর জীবনে তার সৃষ্টি যখন প্রাণবন্ত হয়ে অপরের মনোরঞ্জনে সফলকাম হয় তখনই তার পরিশ্রম সফল বলে প্রতীয়মান কিন্তু এ সফলতাও সুরুচির নিজের কাছে কেমন ফাঁকা মনে হয়—কেমন যেন অহেতুক ফাঁকা। ব্যর্থতার গ্লানি সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে শ্রাবণের মেঘের মত জটলা করে সুরুচি সব পেয়েছেন, অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বই জনের যা কাম্য—সেই অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি কিন্তু তবুও মন ভরে কই? আকাশের নীলে আর ধরিত্রীর শ্যামলিমার মাঝে যে বিরাট ফাঁক। হাঁ! লোক ভাবে বটে তিনি সুখী, আর সম্মানের ডালি যেখানে উপুড় করা সেখানে অন্য কিছু ভাবা বোকামো কিন্তু তার মনে শান্তি কই? শান্তির বিন্দুমাত্র আভাষও সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। চারিদিকের এই সম্মানের ডালি, অসংখ্য স্তুতিবাদ, ভোগবিলাসের সহস্র উপকরণ, তার প্রাসাদোপম বাড়ী, দামী গাড়ী কোন কিছুই তার ফাঁকা মনকে ভরাট করতে পারে না।

এই কিছুক্ষণ আগের স্মৃতি তাকে দোলা দিল। ষ্টুডিও'র কাজে বিশেষ ব্যস্ত তখন, ক্যামেরা ম্যানের ফিল্ম্ ঘুরছে অবিরাম তার সামনে—গৃহস্থ বাড়ীর সদ্য বহিষ্কৃত বধূ তিনি, ধীর মন্থর গতিতে রাজধানীর রাজপথে এসে দাঁড়ালেন বাড়ীর দ্বার পেরিয়ে...। সেই আবেগে স্তব্ধ, দুঃখে স্থিরমান, করুণার প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমুহূর্ত্তের গতি সেলুলয়েডের গর্ভে গাঁথা হয়ে রইল। পরিচালক বাহবা দিয়ে বললেন এমন জীবন্ত ছবি তিনি এর আগে আর গ্রহণ করেন নি। আর, সত্যিই সুরুচি তার অন্তরস্থলের পরিপূর্ণ আবেগ দিয়ে ফোটালেন এই গৃহবিতাড়িত বধূর প্রতিমূর্ত্তি। আরও কিছু দিন বাদে সহরের প্রেক্ষাগৃহে যখন এ ছবি মুক্তি পাবে তখন দর্শক সাধারণ ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন—বাস্তবিক এ একমাত্র সুরুচি দেবীতেই সম্ভব কিন্তু গুণমুগ্ধ দর্শক সাধারণ তো জানেন না সুরুচি দেবীর অতীত ইতিহাস। অশ্রুর মালায় গাঁথা সুরুচি দেবীর সে কাহিনী যে সেই সদ্য গৃহবিতাড়িত বধূরই সমগোত্রীয়...।

সুরুচির মনের নৌকা, বছর দশ বারো আগের; জীবনের ঘাটে নোঙর ফেলল্। সুরুচির পৈত্রিক অবস্থা

তেমন স্বচ্ছল ছিল না। সংসারের কর্ণধার একমাত্র জীবিত দাদা মশাই আর তাঁর পিতৃমাতৃহীন অনাথা নাতনী পঞ্চদশী সুন্দরী সুরুচি। আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও পুরোহিত বংশের এই একমাত্র কন্যা সুরুচির সম্বন্ধ এল সহরের নামজাদা গন্ধবণিক এক ধনিয়াধী পরিবার হ'তে। সুরুচির রূপ আছে তাই দরিদ্রের পর্ণকুটির হ'তে রাজরাণী হওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছিল কিন্তু রাজরাণী হওয়া সত্ত্বেও পথের ভিখারিনীর চেয়েও তিনি অসুখী ছিলেন।

দাদা মশায়ের সচেষ্ট সহযোগীতার এক অশুভক্ষণে সুরুচির মালা বদল হয়ে গেল এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে। সুরুচির শ্বশুর ঘর আরম্ভ হল—আমলা, মোসাহেব, সহর, অন্দর, দশ বিশটা চাকর চাকরাণী আর পোষ্যবর্গ—; সে এক এলাহি কাণ্ড। ঐ ভিড়ের মাঝে অতটুকু সুরুচি হারিয়ে গেছিলেন রথের মেলায় ছেলে হারাণোর মত। সুরুচির শ্বশুরবাড়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বিরাট ইজারাদার। বংশের অধস্তন পুরুষেরা তাদের অর্থের ও খেতাবের আভিজাত্য বাড়িয়ে নিল পাট, তামাক আর জাহাজী ব্যবসার দারুণ। কিন্তু ও বাড়ীর ছোট বড় সবাই এক একটি কুচরিত্র।

সেখানে বর্ষায়— বসন্তের আমেজ নামে বিলাতী খোতল দারুণ।

সুরুচি—, মাত্র পনের বছরের রূপবতী সুরুচি ভীরু পাখীর মত তাঁর স্বামীর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন—সেখানে আদর হ'ল যতনা নিপীড়ন হ'ল তার দ্বিগুণ, তবুও কালের যাত্রার গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবন গড়িয়ে চলছিল এক রকম; কিন্তু শীগগিরই সুরুচি তার স্বামীর কাছে ফুরিয়ে গেলেন আর এরকমই ও বাড়ীর রেওয়াজ। সুরুচির কোলে তখন নবজাতকের ক্ষীণ কান্না বাজছে ফুরিয়ে যাওয়া বিয়ে বাড়ীর সানায়ের শেষ রাগিণীর মত।

ধীরে ধীরে অপদার্থ মাতালের কাপুরুষতা বাড়তে লাগল। হ্যাঁ—। কাপুরুষ, তা ছাড়া তাকে আর কিই সম্বোধন করা যায়—যে স্বামী দিনের পর দিন নবজাত শিশুসন্তানের মা'কে—নিজের সহধর্মিনীকে, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করেন সারা দিনমান। ক্রমশঃ অত্যাচার বেড়েই চলল শুধু চরিত্রবান স্বামীরই নয় তার সঙ্গে সমতা রেখে এগিয়ে চলল শাশুড়ীরও অত্যাচার। উঃ! সে সব বিগত দিনের স্মৃতি তার জীবনে যেন দুঃস্বপ্নের রাত হ'য়ে রয়েছে। এখনও তার অঙ্গবাসের অন্তরালে তপ্ত লৌহ শলাকার নির্মম প্রণয়চিহ্ন অঙ্কিত আছে—এখনও বেত্রদণ্ডের সুমধুর স্মরণী বোধ হয় তার দেহে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

তারপরের সেই উৎসব শেষের রাত। অন্নপ্রাসন উপলক্ষে সমস্ত দিন ও রাত্রি খাটুনির পর প্রায় রাত্রিশেষে ক্লান্তিতে অপরাপর মেয়েদের মতই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সুরুচি মেঝের ওপর—মধ্যরাত্রে তার স্বামী দেবতা ঢুকলেন ঘরে চূড়ান্ত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। সুরুচির দুর্ভাগ্য —সেদিন খাটের পাশে কি কারণে যেন আনা এক লৌহদণ্ড পড়েছিল। সেই লৌহদণ্ডের অকথ্য অত্যাচার চলল তার নরম দেহের ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে মাতালের কড়া আদেশ সুরুচি যেন এই মুহূর্তে তার বাড়ী ছেড়ে চলে যান। অপরাধ? অপরাধ—সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তিজড়িত এই মধ্যরাত্রের নিদ্রা। মদ্যপায়ীর আবার কারণ অকারণ।

সুরুচি আর সহ্য ক'রতে পারেন নি—গলাধাক্কার ফলে চৌকাট পার হ'য়ে একেবারে বাইরের বারান্দায় এসে পৌঁছেছিলেন, তারপরে এমনি অশ্রুসজল অব্যক্ত বেদনায় ধীরে ধীরে ঐ বিভীষিকাময় বাড়ীর দেউড়ি পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। অবলার ওপর অত্যাচার যেখানে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা, সেখান হ'তে—তাকে ফিরে আসার কোন অনুরোধ আসেনি। ও বাড়ীর পূর্ব্ববর্তী বধূদের কপালেও এমনি তরো ঘটনা ঘটেছে অতীতে—ও বাড়ীর রেওয়াজই ঐ ধারার সেদিন রাজধানীর জনবিরল পথে একাকী ভাগ্যবঞ্চিতা বিতাড়িতা এক বধূর দ্বিপ্রাগমন হ'ল আকাশের একরাশ অন্ধকারের

সঙ্গে। সুরুচির ভারী বুক হতে তাঁরই অজান্তে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

তারপরে কত ঝড়—কত নিশ্চিত মৃত্যুর সাথে অবিরাম সংগ্রাম। অবশেষে চলতি পথে সুরুচি নিজের পরিচয় খুঁজে পেলেন—জীবনধারণের সন্ধান জোগাড় করলেন একদা। গঙ্গার জলের অভাব ছিল না—কারক্লেশে দড়ি, কলসীও জুটত কিন্তু ভাবালুকতায় ধরা দিয়ে সুরুচি ছেলেমানুষী করেন নি: তাকে বেঁচে থাকতে হবে—এত সব জঞ্জালের মাঝে তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—তার নিজের দাবীকে ছিনিয়ে আনতে হবে। অর্থের জোরে কিনিয়ে আনবেন তার স্নেহ আদরের শিশুকে আপন কোলে—সুরুচি একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য এবার তার সাথে চূড়ান্ত রসিকতা করল—আদালতের কাঠগোড়ায় পর্য্যন্ত তার দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন হ'ল। সুরুচি ভাগ্যের কাছে বারবার হেরে গিয়ে নিজেকে ভেঙে ফেললেন হতাশায়। আজ তিনি শিল্পী—চিত্রশিল্পীর জীবনে যা কাম্য তা তিনি পেয়েছেন কিন্তু এতে তার মন ভরেনি। অপদার্থ দাতাল স্বামীর সোহাগ আর তিনি কামনা করেন না কিন্তু তার ঘর আলো করা শিশুসন্তান হতে তিনি কেন বঞ্চিত হবেন? সুরুচির মনের ভেতর অব্যক্ত সন্তান-কাঙালি মাতৃস্নেহ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সুরুচির মনের কথা বুঝতে আজ এরা অপারগ কিন্তু সন্তানস্নেহবুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে কত আর পর্দ্দায় তিনি হাসি-কান্নার চমক লাগিয়ে মাতৃমূর্ত্তির রূপ দেখেন। তার মনে হল সব মিথ্যা—চারিপাশের জগৎ তাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে নিজেদের পাওনা গণ্ডা আদায় করে নিচ্ছে—আর, যাওয়ানে তিনি জীবনের সিন্দুকের বাহবাপূর্ণ বিদ্রূপের চাবিকাঠিকে নিজের প্রাপ্য মনে করে সন্তর্পণে বেঁধে রেখেছেন আপনার অঞ্চলপ্রান্তে।

সুরুচি উঠে এলেন জানালায়, কখন জানিনা সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর এখন অন্ধকার—বাইরের আকাশে সপ্তমীর চাঁদ দেখা যায় ক্ষীণভাবে, কিন্তু সুরুচির ঘরের অন্ধকার তার মনের অন্ধকারের সঙ্গে সমতা রেখেছে। মনের আকাশে তার কালো চামচিকের মত অন্ধকার—সেখানে নেই তারার ক্ষীণ আলো কিংবা বিজলী বাতির চমক্...।

ব্যর্থ নিরানন্দময় সংসার তার কাছে শূন্য মনে হয়। তার জীবন যেন বাসি ফুলের মালা, তাতে গন্ধ নেই। প্রাণ নেই আছে শুধু বিশীর্ণ পাঁপড়ি—যার দ্বারা কোন কাজই হবে না এ সংসারে। আজগের এই ম্লান গোধূলির শেষে তার সন্তান বুভুক্ষু মন আপন মনে শুধু গুমরে গুমরে কেঁদে বেড়ায়। চোখের ধারায় কখন তার অবচেতন মন আত্মপ্রকাশ করেছে—সুরুচি আঁচলে চোখ মুছলেন।

হঠাৎ ঘরের বিজলী বাতি চমকে উঠল। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—চান করবেন না-মা? সুরুচি ফিরলেন—। কি কমলা'র মা; কোলে তার ফুটফুটে একটি শিশু—চাঁদের আলোর মত ধবধবে।

এক লহমায় সুরুচি এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন আগন্তুক শিশুকে কোলে: কার ছেলেরে? পাশের বাড়ীর জজ সাহেবের নাতী। সাহেবের মেয়ে এসেছেন একটু আগে বাপের বাড়ী—এ তারই ছেলে!

সুরুচি কমলা'র মাকে বিদায় করলেন। তারপরে চুমোয় চুমোয়—অনুরাগে আর আদরে ভরিয়ে দিলেন সেই ছোট্ট শিশুকে। আজকের ব্যর্থ ফাঁকা সন্ধ্যায় ভরে গেল অপত্য মাতৃস্নেহে—এই মুহূর্ত্তে সুরুচির যেন কোন অভিযোগ নেই কারুর ওপর। সন্তান বৎসল মাতৃস্নেহ উপচে পড়ল প্লাবনের মত সেই ছোট্ট ফুলের মত শিশুর ওপরে। বুকে চেপে ধরলেন জোরে, বললেন বল্ মা! বল মা...!

অবুঝ শিশু আদরের আতিশয্যে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

কলিকাতা লীগের প্রথম অধ্যায় প্রায় শেষ হইতে চলিল। বর্ত্তমান বৎসরে বিভিন্ন দলগুলির ক্রমপর্য্যায়ে ইষ্টবেঙ্গল দলই সর্ব্বোপরি আসনে এখনও পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত এবং দল হিসাবে তাহাদের শক্তিও শ্রেষ্ঠ। ইষ্টবেঙ্গল দলের শক্তি মূলতঃ তাহাদের আক্রমণ ভাগের উপরেই নির্ভরশীল। আক্রমণভাগে আমেদ, ভেঙ্কটেশ, সালে, আল্লারাও ও ধুনরাজের মিলিত আক্রমণ ধারা রক্ষা করা বর্ত্তমান বৎসরে লীগ তালিকার যে কোন দলের রক্ষণভাগের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে ইষ্টবেঙ্গল দলের বর্ত্তমান বৎসরের রক্ষণভাগ গতবৎসর অপেক্ষা দুর্ব্বল। তাজ-মহম্মদের মত ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যাকের অনুপস্থিতি দলের রক্ষণভাগকে বহুলাংশে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। তবে এবৎসরে অপরাজিত ইষ্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ যদি দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে তবে গত বৎসরের মত এবারেও তাহারা লীগ বিজয়ের সম্মান অধিকার করিতে পারিবে একথা জোর করিয়া বলা চলে।

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগান দলের টীম পূর্ব্বেকার মতই এবারেও গঠিত হইয়াছে। রসিদ, সেলিম মহঃ স্পোর্টিং দলে যোগদান করায় যে ক্ষতি হইয়াছে মহঃ স্পোর্টিং দল হইতে সাত্তারকে পাইয়া সে শক্তির সমতা রক্ষণ হইয়াছে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ও গোলমুখে ব্যর্থতার জন্য মোহনবাগান দলের লীগ বিজয়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। তবে রক্ষণভাগ তাহাদের শক্তিশালী; বিশেষ করিয়া এস মান্না গত বৎসরে আহত হইবার জন্য খেলিতে না পারিলেও বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় তিনি স্বাভাবিক খেলা খেলিতেছেন। সুতরাং লীগ বিজয়ের শেষ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে এবং অপরাজিত দল দুইটির মধ্যে যাহারা কয়ী হইবে ভাগ্যলক্ষী তাহাদের দিকেই হস্ত প্রসারিত করিবেন। অবশ্য সাধারণ খেলায় অঘটন যদি কোন পক্ষকে স্থানচ্যুত না করে।

মহঃ স্পোর্টিং দল বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের খেলার সূচনা ভাল করিলেও কয়েকটি সাধারণ খেলায় পয়েন্ট হারাইয়া ও রাজস্থানের নিকট পরাজিত হইয়া লীগ বিজয়ের সম্ভাব্য স্থান হইতে কিছুটা নামিয়া আসিয়াছে। মহঃ দলের রক্ষণভাগ গত বৎসর অপেক্ষা দুর্ব্বল। উত্তর প্রদেশ হইতে আগত রক্ষণভাগের কয়েকজন খেলোয়াড় অন্যান্য স্থানে যানাইয়া লইলেও সেন্টার হাফ, ব্যাকের সমস্যাই দলের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আক্রমণ ভাগে সত্তার চলিয়া গেলেও আমেদ, রসিদ ও সেলিম যোগদান করায় পুরোভাগের শক্তি বরঞ্চ কিছুটা অধিক হইয়াছে বলা চলে। যদি রিটার্ণ লীগ খেলায় মহঃ দল তাহাদের খেলার উন্নতি দর্শাইতে পারে তবে তাহারাও লীগ বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে।

এই বৎসরে রাজস্থান দল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বাছাই করা খেলোয়াড় আমদানি করিয়াছে। সঞ্জীব, এন্টনি, রমনের মত অলিম্পিক খেলোয়াড় এবং ডিক্রুজ, ভীমরাও অরোকীস্বামী, সাম্পাজী ও ব্রজভেলুর মত প্রথম শ্রেণীর খ্যাতনামা খেলোয়াড় দলে যোগদান করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক বুঝা পড়ার অভাবের জন্য উচ্চ শ্রেণীর খেলা দর্শাইতে পারিতেছেন না। যদি আরও অনুশীলনের ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয় তবে তাহারা যে কোন প্রথম শ্রেণীর দলের জয়লাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

অন্যান্য দলগুলির মধ্যে এবৎসর জর্জ্জটেলিগ্রাফ ও কালীঘাট দলই ভাল খেলিতেছে। তাহারা বিভিন্ন শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর দলগুলির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে ভাবে পয়েন্ট ছিনাইয়া লইয়াছে তাহাতে তাহাদের উচ্ছসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

ই, আর, আর, ভবানীপুর, এরিয়ান্স প্রভৃতি দল গত বৎসর যেরূপ খেলিতে সক্ষম হইয়াছিল এবৎসর সে তুলনায় তাহাদের খেলার মান অনেক নামিয়া গিয়াছে।

লীগে সর্ব্বনিম্ন স্থানে এখন ক্যালকাটা দল অবস্থান করিতেছে; তাহারা এ বৎসরে মাত্র একটি খেলাতেই জয়লাভে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ খেলিতে থাকিলে আগামী বৎসরে তাহারা প্রথম বিভাগে খেলিবার যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হইবে।

ক্যাল গ্যারিসন ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে সদ্য আগত বি, এন, আর দলও লীগ তালিকার নিম্নদিকে অবস্থান করিতেছে। গতবৎসরে লীগের শেষাশেষি ক্যাল গ্যারিসন দল যেরূপ শক্তিশালী দল গঠনে সমর্থ হইয়াছিল এবৎসরেও তাহারা সেরূপ করিতে পারিলে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভাল ফল দেখাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

একদিকে যুযুধান জাতিসমূহ নিজের নিজের কোটে দাঁড়াইয়া কোমর বাঁধিতেছেন এবং নিজেদের দোষ ঢাকিয়া অপরের দোষ ও আগামী যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব তাড়স্বরে ঘোষণা করিতেছে। এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে ইউ, এন, ওর সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাই পূর্ব ও পশ্চিম রাষ্ট্রগোষ্টির মধ্যে বিরোধের মিমাংসা করিয়া ইউ, এন, ওর শাখা প্রশাখার কার্যক্রমে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ওয়াশিংটন ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরিয়া তথাকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। সর্বশেষ তিনি মঃ ষ্টালিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং ওয়াশিংটনে ফিরিয়া তাহার আলোচনার ফলাফল মার্কিণ সভাপতি ট্রুম্যানের গোচরে আনেন। এদিকে যে বিষয় লইয়া সাম্প্রতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে ইউ, এন, ওতে মার্কিণ উপ-প্রতিনিধি মিঃ আর্ণষ্ট গ্রস পরোক্ষভাবে ট্রিগভি লাইয়ের এই চেষ্টার প্রতি বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া যে ভাবে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বৈঠক বর্জন করিয়াছে, উহা বন্ধ করা না হইলে মার্কিণ গভর্ণমেন্ট কিছুতেই তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবেন না। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনার জন্য সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাই যে চেষ্টা করিতেছেন, মিঃ গ্রস পরোক্ষভাবে সে কথাটিরই উল্লেখ করেন।

মিঃ গ্রস বলেন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপপ্রতিষ্ঠানে সোভিয়েট প্রতিনিধির অনুপস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে। চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তাহাদের তথাকথিত "ধর্ম্মঘটের"

কথা উল্লেখ করা হইতেছে।

আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইতেছে। কিন্তু মৌলিক আদর্শের প্রশ্নে যে কোনরূপ দরকষাকষি চলিতে পারে না বা কোনরূপেই যে উহার মূল্য হ্রাস করা চলে না, সে কথাটিও দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা একটি পণ্যদ্রব্য নহে যে, উহা ভিক্ষা করিয়া বা অপরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া অর্জন করিতে হয়। মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রশ্নেও আমরা দরকষাকষি করিতে ইচ্ছুক হইব না।

মিঃ গ্রস ফুলিয়া গিয়াছেন যে কারণে সোভিয়েট প্রতিনিধিরা ইউ, এন, ওর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি বয়কট করিয়াছে ও করিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে মার্কিণ সরকারের পরাজিত, ধিক্কৃত ও বিতাড়িত কে, এম টির প্রতি অহেতুক সমবেদনা ও সাহায্য দান। যেখানে একটা গোটা জাতি নিজেকে নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে দেশ হইতে নির্মূল করিয়াছে তাহার স্বাধিকার অস্বীকার করিয়া তাহার প্রতিনিধিগণকে ইউ, এন, ও হইতে বাহিরে রাখিবার গণতন্ত্রসম্মত বা ইউ, এন, ওর সনদ-সম্মত কোন অধিকার ধনগর্বিত, ক্ষমতাস্ফীত মার্কিণ শাসকগনেরও নাই। বিশ্বের সজাগ বুদ্ধি ও মন মার্কিণের এই অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করিতেছে ও করিবে। মার্কিণ প্রতিনিধির উপরোক্ত বক্রোক্তিকে তাহারা শুধু অহেতুক নির্লজ্জ দুর্বিনয় বলিয়াই গণ্য করিবে।

লাই পরিকল্পনা

মঃ ট্রিগভি লাই রাষ্ট্র সঙ্ঘের সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত একটি স্মারকলিপিতে "শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বিংশ বার্ষিকী পরিকল্পনা" গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

উক্ত স্মারকলিপিতে গত দুইবৎসর যাবৎ রাষ্ট্র সঙ্ঘে যে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া মিঃ লাই বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘই উক্ত সরকার সমূহের প্রত্যেকটির পররাষ্ট্রনীতির প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়, প্রধান সমস্যাগুলি লইয়া আন্তরিকতার সহিত পুনরায় আলাপ আলোচনা করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রধান সমস্যা চীনের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নটি তিনি এড়াইয়া যান।

মিঃ লাই জানান যে, সম্ভবতঃ তিনি পরিকল্পনাটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার পরবর্তী অধিবেশনের বিষয় সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবেন। সাধারণ সভার অধিবেশনের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনেও এই পরিকল্পনা পেশ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি বিবেচনা করিতেছেন।

লাই পরিকল্পনায় দশটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা সম্বলিত স্মারকলিপিটির শিরোনামা এইরূপ 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে বিংশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহের স্মারকলিপি।"

মুখবন্ধে মিঃ ট্রিগভি লাই বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করিতেই হইবে এবং যাহাতে চিরস্থায়ী শান্তির আশা দেখা যায়, তজ্জন্য জগতকে নূতন পথের সন্ধান দিতে হইবে।

মঃ লাইয়ের এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করা দূরের কথা, রাষ্ট্রসমূহের কার্যক্রম তাহার সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী।

উদ্যোগ পর্ব :—

বিদেশে সাহায্য প্রেরণের জন্য ৩১২ কোটী ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার বরাদ্দ বিলে গত ৫ই জুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই বিলের দ্বারা বিশ্বব্যাপী

পাঁচ হকা সাহায্য পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তৃতীয় বর্ষে ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য প্রেরণ এবং অনগ্রসর এলাকাসমূহের উন্নতির জন্য "চারি হকা" কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবার নিমিত্ত এই বিলে অর্থ মঞ্জুর হইয়াছে।

হোয়াইট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলে স্বাক্ষর করিবার পর মিঃ ট্রুম্যান বলেন, "বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার ইহা একটী বড় দান। নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বিশ্বগঠনে ইহা আমেরিকার যোগ্য উদ্যম ও উদার প্রচেষ্টা।

চারিহকা সাহায্যের কর্মসূচী অনুযায়ী বাস্তব বিষয়ে সাহায্যের জন্য যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার ভিত্তিতে সুদৃঢ় করা এবং "কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদকে" পরাস্ত করার পক্ষে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এই বিলে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় বৎসরে ইউরোপে সাহায্য প্রেরণের জন্য ২৮৪ কোটী ডলার ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সচিব মিঃ লুই জনসন অস্ত্রসাহায্য পরিকল্পনা অনুমোদের জন্য সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও সশস্ত্রবাহিনী কমিটির নিকট আবেদন করেন। শক্তি পরীক্ষায় রাশিয়ার সম্মুখীন হইবার জন্য শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অস্ত্র সাহায্য পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট পন্থী নহে, এরূপ দেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি তাহার বিবরণ প্রদান করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সব দেশের উপর কম্যুনিষ্ট আক্রমণের আশঙ্কা করা হইতেছে, সেই সকল দেশের জন্য অস্ত্র সাহায্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইন্দো-চীন গভর্ণমেন্টকে অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমান ও জঙ্গলে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া—ইন্দোনেশিয়ার নূতন গভর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হইবে। মিঃ জনসন বলেন, দূর প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এই অঞ্চলে কমিউনিজমের প্রতিরোধ করা বিশেষ প্রয়োজন।

ফিলিপাইন :—গেরিলাদের কর্মতৎপরতার জন্য ফিলিপাইনকে অস্ত্র সাহায্য করা প্রয়োজন।

পারস্য ও কোরিয়া—এই দুইটির উপর কমিউনিষ্টগণ যে চাপ দিতেছে তাহা রোধ করার মত শক্তি এই দেশ দুইটির নাই।

গ্রীস—গ্রীসে কমিউনিষ্ট গেরিলাগণ নূতনভাবে যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা রোধ করিতে হইলে গ্রীসকে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরা হকরা প্রয়োজন।

তুরস্ক—তুরস্কে সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক ধারায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পশ্চিম ইউরোপ—আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক ক্ষুদ্র ইউরোপীয় পদাতিক বাহিনী গঠন করিতে হইবে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই পদাতিক বাহিনীকে মার্কিন বিমান বাহিনী সাহায্য করিবে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ মনে করেন যে, এইরূপ একটি পদাতিক বাহিনী কমিউনিষ্ট আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে পারিবে।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সোভিয়েট রাশিয়া কেবল যুদ্ধ ও আক্রমণের কথাই বোঝেন। উত্তর অতলান্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে যদি দ্রুত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেই রাশিয়া কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা এড়ানো যাইতে পারে।

কমিটি দুইটির সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জনসন বলেন যে পশ্চিম ইউরোপে শক্তিবৃদ্ধির সাহায্যেই রাশিয়ার সহিত বোঝাপড়া সম্ভব হইতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটি সংশোধন

প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির নিকট অস্ত্র সাহায্য পরিকল্পনার সমর্থনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন একিসন বলেন, বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আছে বলিয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য কমিটিকে অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন যে, "এই পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা আপনারা যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং আমাদের ও আমাদের সন্তান সন্ততির জীবনে শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় একটি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন পরিদর্শন ও উত্তর আতলান্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলনের ফলে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের নিজেদের স্বার্থে ও অন্যান্য জাতির স্বার্থে আমাদের এই গ্রহণ করা উচিত।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ একিসন বলেন: "আমরা কমিউনিষ্টদের নিকট ইন্দোচীনকে বিসর্জন দিয়াছি," এই মত আমি সমর্থন করি না।

তিনি বলেন, "আমরা ইন্দোচীনকে হারাই নাই। আমি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন ও ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ সুমানের সহিত ইন্দোচীন সমস্যা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয় যে, ইন্দোচীনের উন্নয়নের জন্য ফরাসীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

এই উদ্যোগ আয়োজন কি অনিবার্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে দ্বিতীয়ে "শান্তির ললিত বাণী" শুনাইবে পরিহাস।"

BOOKS OF THE HOUR

MARX - **CAPITAL, Vol. I (Unabridged) Rs. 10/-**

PLEKHANOV - **FUNDAMENTAL PROBLEMS OF MARXISM Rs. 5/-**

LENIN - **TASKS OF THE PROLETARIAT IN OUR REVOLUTION As. -/12/-**

SARASWATY LIBRARY

C 18 - 19, College Street Market :: CALCUTTA

রাজবন্দীদের মামলা

বিভিন্ন প্রাদেশিক হাইকোর্টে ও ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টে রাজনৈতিক আটকবন্দীদের তরফ থেকে অনেক মামলা ইতিমধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা বর্তমানে হওয়ার সময়ের অনিশ্চিত সাময়িক অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য উৎপ্রীব বহু রাজনৈতিক দল সব দেশেই থাকে এবং ভারতবর্ষেও আছে আদালতে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী-প্রমাণ সব সময় এদের বিরুদ্ধে পাওয়া সম্ভব নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকটা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উপর নির্ভর করতে হয়। তার ফলে এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে কোন কোন নিরপরাধ ব্যক্তিও সরকারী চক্রান্তে অবরুদ্ধ হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশেরই কর্তব্য যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতভেদ বা পুলিশের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর জন্য কেহ নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত না হয়

ভারতীয় সংবিধানে এবপক্ষে যথোপযুক্ত নিদর্শাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে "মৌলিক অধিকার" সম্পর্কীয় ধারাসমূহে ভারতীয় সংবিধানে এই পক্ষে যে সব সর্ত দেওয়া হয়েছে, তাতে ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকরূপ পরিস্ফুট হয়েছে বহু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ বিনা বিচারে আটক রাখা সম্বন্ধে, যে আইন প্রণয়ন করেছে তা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার-মূলক বিধানসমূহের প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনমাসের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কাউকে আটক রাখতে হলে সে সম্বন্ধে আইন করার অধিকার একমাত্র ভারতীয় পার্লামেন্টেরই আছে; সংবিধানের এই মোটা কথাটা কোন বহু প্রাদেশিক সরকার, বিনা-বিচারে আবদ্ধ রাখার আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নিকট ধমক খেয়েছে, এটা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে বিশেষ বিচক্ষণতা বা কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

ভারতীয় পার্লামেন্ট হতে এই সম্পর্কে যে আইন পরে প্রণয়ন করা হয়েছে তা প্রয়োগ করতে গিয়েও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার আদালতে নাজেহাল হয়েছে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিষয় সংবিধানে বলা আছে আটক করার পরে যথাসম্ভব সত্বর প্রত্যেক বন্দীকে তার আটক হবার কারণ জানান হবে, বন্দীদের সম্বন্ধে ভেটন ব্যবস্থারও একটা আদর্শ এই সংবিধান থেকে পাওয়া যায় কিন্তু হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে বিচারের সময় দেখা গিয়েছে যে এই সব বিধান ও আদর্শ অনেকস্থলে মান্য করা হয়নি। সরকার পক্ষ হতে কৈফীয়ৎ স্বরূপ বলা হয়েছে যে এই প্রকার গাফিলতি বরাবরই করা হয়েছে এবং এতদিনকার প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারসমূহ চলেছে। দুই একটী মামলায় আদালত হতে ধমক দিয়ে তাদের বলা হয়েছে যে পুরানো ব্যবস্থা অনুকরণ ও অনুসরণ আজকার দিনে চলতে পারে না।

হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট প্রাদেশিক সরকার সমূহকে এইভাবে তিরস্কার করে কেবল যে বিচারকের কর্তব্য পালন করেছে তা নয় রাষ্ট্রের মর্যাদাও রক্ষা করেছে। প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্ম সবই পুরানো আমলাতন্ত্রের হাতে; তারা পুরানো চালেই অভ্যস্থ এবং পুরানো চালচলতিই বজায় রাখতে চায়। এরা সবাই

রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিযুক্ত ও শিক্ষিত হয়েছিল। সেই মনোভাব নিয়ে এরা এতকাল চলেছে এবং এখনও চলতে চায়; তাদের পেয়ালপুশীর বাইরে নাগরিকের কোন মৌলিক অধিকার থাকতে পারে এ ধারনা তাদের নেই। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের চেতনা আশা করা বৃথা; আইন শৃঙ্খলার ঘুমন্ত গহ্বরে এদের মন ঘুমিয়ে আছে। স্বাধীনতার আলোক উদ্ভাসিত রাষ্ট্রে সে মন সক্রিয় হতে পারে না। আটক বন্দীদের বিচারে এই কথাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে—

কেন্দ্রীয় আইনসভা—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছে: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন্ত্রী-সভা প্রবর্ত্তন হওয়ার ব্যবস্থা নূতন সংবিধানে আছে। তাহাই কয়মাস যাবতই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গুজব রাষ্ট্র ছিল। এরমধ্যে নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার ভাঙ্গন দেখা দেয়। সেই গোলমালে মন্ত্রীসভার প্রস্তাবিত অদলবদল কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকে। তারপর যে মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে গত এপ্রিল মাসে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও শ্রীকিতিশচন্দ্র নিয়োগী পদত্যাগ করেন। এতদিন তাঁদের পরিত্যক্ত পদ শূন্য রাখা হয়েছিল। যে মাসের প্রায় শেষ দিকে, সেই দুটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব উৎপাদন ও সরবরাহ বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং শ্রীনিয়োগীর পরিত্যক্ত ব্যবসায় বিভাগের (commerce) ভার গ্রহণ করেন আসামের গভর্ণর শ্রীপ্রকাশ। অবশ্য উভয়েই নিজ নিজ পূর্ব পদ ত্যাগ ক'রে আসেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম পদত্যাগ ক'রে শ্রীপ্রকাশের স্থলে আসামের প্রদেশপাল হয়ে যান; উদ্বাস্তু পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাকসেনা পদ-ত্যাগ করেন এবং অর্থ সচীব ডাঃ জন মাথাই প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীর সঙ্গে মৌলিক মতভেদ অনুভব করে মন্ত্রী সভায় থাকতে অস্বীকার হন।

এতদিন কেন্দ্রে যে মন্ত্রীসভা চলছিল, তাকে ঠিক কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বলা চলে না। কয়েকটি প্রধান প্রধান দপ্তর অকংগ্রেসী লোকের আয়ত্বে ছিল। কিছুদিন যাবৎ কথা চলছিল এবার পণ্ডিতজী পুরোপুরি কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা গঠন করবেন। ভারত-পাক চুক্তি নিয়ে যখন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও শ্রীনিয়োগী পদত্যাগ করেন, তখন একথা আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে, যে এঁরা দুজন খাঁটি কংগ্রেসী হ'লে, ঠিক ঐ সঙ্কট সময়ে পদত্যাগ করতে পারতেন না। কাজেই খাঁটি কংগ্রেস-পন্থী লোক নিয়ে মন্ত্রী-সভা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। মন্ত্রীসভার এই পরিবর্ত্তনের সময় একে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা করা হবে এমন গুজব খুবই শুনা গিয়েছিল।

অথচ এবার-ও যা হল তাতে একে সম্পূর্ণ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বলা চলে না। অর্থ-সচিবের পদে আনা হয়েছে তার চিন্তামন দেশমুখকে। তার চিন্তামন যোগ্য ব্যক্তি; কিন্তু কিসের পক্ষে তিনি যোগ্য সেটা বিচার করা দরকার। বিজ্ঞানের যোগ্য অধ্যাপককে ইংরাজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করলে তার যোগ্যতার মর্য্যাদা করা হয় কি বিদ্রূপ করা হয় তা ভেবে দেখা উচিৎ। কংগ্রেসের যে আর্থিক ও সামাজিক আদর্শ, তাকে কাজে পরিণত করার কাজে তার চিন্তামনের যোগ্যতা কতটা হ'বে—সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তা হিসাবে জমিদার প্রথা লোপ করার প্রস্তাবে তিনি খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে ঐ কাজে বাধা দিয়েছেন বলে খ্যাতি তাঁর শুনেছি। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক কোনদিনই ছিল না। হঠাৎ তাঁকে এনে কংগ্রেসের আদর্শকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এখন ভারতীয় রাষ্ট্রের যে আর্থিক সঙ্কট যাচ্ছে, তাতে কোন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা

বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা সন্দেহ। প্রথমে মিঃ নিয়াকৎ আলি, তারপর শ্রীসুব্রহ্মণ্যম চেট্টি, এবং এরপর ডাঃ মাথাই, পর পর নিজ নিজ অভিরুচি মতো ভারতীয় অর্থ-নীতি চালিয়েছেন। এখন আসছেন শ্রীদেশমুখ—তাঁর পরিকল্পনা ও অভিরুচি নিয়ে। আর্থিক ব্যাপারে এই ক' বছরে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা দরকার ছিল, বার বার তা ব্যাহত হওয়াতে স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি কোন বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে পারে নি। এটা পরিতাপের বিষয়। ডাঃ মাথাইকে পরিবর্তন করতে হ'লে কোন একজন কংগ্রেস-নিষ্ঠ ব্যক্তিকে ঐ পদে মনোনীত করা উচিৎ ছিল। কোন অবস্থাতেই ঐ পদে অ-কংগ্রেসী কাউকে মনোনীত করা অন্যায় বলে মনে করি। কারণ অর্থসচিবের হাতেই ভারতীয় রাষ্ট্রের আর্থিক ও সামাজিক নীতি নির্ভর করে। সমগ্র রাষ্ট্রের স্বরূপ কার্যত অর্থসচিবের উপর নির্ভর করে। কাজেই এই পদে কংগ্রেসী মন্ত্রী রাখাই উচিৎ। পণ্ডিতজীর হয়ত কংগ্রেসীদের উপর পূর্বের মতো আস্থা নেই; তাই তিনি ঐ পদের জন্য কংগ্রেসী মহলে যোগ্য লোক খুঁজে পান না।

অন্যান্য বিভাগে যে সব নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে তারা সকলেই কংগ্রেসনিষ্ঠ এবং তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতবকে উৎপাদন ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। নানা কারণে তাঁর এই মনোনয়নকে আমরা বিশেষ ভাবে সমর্থন করছি। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন; সেই সঙ্গে সততার খ্যাতি-ও বজায় রেখেছেন; এবং কংগ্রেস আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আগ্রহ বহুবিদিত। তদুপরি প্রাদেশিক দিক থেকেও আমরা এই মনোনয়ন বিশেষভাবে অনুমোদন করি। বম্বে, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় প্রদেশ থেকেই সাধারণত মন্ত্রীদের মনোনয়ন করা হয়। উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ছোট ছোট প্রদেশ সমূহের এই বিষয়ে একটা অভিযোগ বহুদিন যাবৎ আছে। সেই হিসাবে শ্রীমহাতবের মনোনয়ন বিশেষভাবে সঙ্গত হয়েছে বলে মনে করি।

শ্রীযুক্ত খুর্শী খাদ্য ও কৃষি বিভাগের এবং শ্রীপ্রকাশ ব্যবসায় বিভাগের এবং শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন উদ্বাস্তু পুনর্বসতি বিভাগের ভার গ্রহণ করেছেন। এঁরা সকলেই কংগ্রেস কর্মী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। খাদ্য বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদৌলতরাম আসামের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছেন, তিনিও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, কার্যকরী সমিতির সভ্যও বহুদিন ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহের কারণ নেই। তিনি প্রথমে ছিলেন বিহারের গভর্ণর; এরপরে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী এখন আবার হলেন আসামের গভর্ণর। শ্রীপ্রকাশ প্রথমে ছিলেন পাকিস্থানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তারপর আসামের গভর্ণর এবং বর্তমানে হলেন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী। একই ব্যক্তিকে পরপর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা আমরা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে মনে করি; এটা কতকটা স্বজন পোষণের (Nepotism) মত দেখায়, তাছাড়া এমনি মনোনয়ন হতে অনুমান করা যায় যে পণ্ডিতজীর পরিচিত জন কয়েক ব্যক্তিছাড়া কংগ্রেসী মহলে কোন যোগ্য ব্যক্তি আছে বলে পণ্ডিতজী মনে করেন না।

এক বৎসরের বেশী হ'ল কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নির্দেশ ছিল—ভারতের পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত আফিস আছে তাতে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের নিয়োগের বিশেষ সুবিধা যেন দেওয়া হয়। এপর্য্যন্ত এই নির্দ্দেশ যথাসম্ভব ব্যতিক্রমেই পালিত হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের অফিস ও কলিকাতা বন্দরের সমুদ্রগামী সওদাগরী জাহাজে নাবিক নিয়োগ অফিসের বিষয় যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে ঐ দুই অফিসে কর্মকর্তার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়ম হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অফিস যে অঞ্চলে অবস্থিত সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে যাতে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকেই সেখানকার কর্মচারী চয়ন করা

যায়। সেই হিসাবে আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে অধিকাংশ কর্মচারী নিযুক্ত হওয়া উচিৎ। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদ থেকে আমরা দেখতে পাই গত তিন বছরে তেরাশী (৮৩) জন কর্মচারীর মধ্যে বাষট্টি (৬২) জন অন্যান্য প্রদেশ হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে; মাত্র একুশ (২১) জন এই পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি পঁয়ত্রিশটি (৩৫) কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে ২১জন বোম্বাই হতে ও সাতজন ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় হতে নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম থেকে মাত্র সাতটি লোক নেওয়া হয়েছে; পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু একটি লোকও এখানে নিযুক্ত করা হয়নি।

কলিকাতা বন্দরে জাহাজের খালাসী, সারেঙ্গ প্রভৃতি নিয়োগেও আবার এমনি একটা দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা চলছে। এই কাজে বেশীর ভাগ লোক ছিল পাকিস্থানী মুসলমান। গত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে পাকিস্থানী মুসলমানরা অনেকে কাজ ছেড়ে চলে যায়। তখন বোম্বাই হতে ২২০টি হিন্দু নাবিক এনে কাজ চালানো হয়। কিন্তু পরে তাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে তাদের অনেকে কাজ ছেড়ে চলে যায়। এদের প্রতি একটু অস্বাভাবিক রকমের কঠোরতা দেখানো হয়। এরা কাজে নূতন ভর্ত্তি হয়েছে; তাই এদের প্রতি বরং কিছুটা কোমল ভাবই দেখানো উচিত ছিল; তার স্থলে অতিরিক্ত কঠোরতা দেখানোর অর্থ এই হয় যে যে কোন উপায়ে এদের সরিয়ে দিতে হবে।

সওদাগরী নৌবাহিনী প্রত্যেক জাতির পক্ষে একটি অতি আবশ্যকীয় বিভাগ। জাতির বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য প্রত্যক্ষ ভাবে এর উপর নির্ভর করে; দেশরক্ষার জন্যও সওদাগরী নৌবাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। সে জন্যই এই নৌবাহিনীর নাবিক এমন হওয়া দরকার, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বিষয়ে যাদের মনে কোন দ্বিধা নেই। যে কোন সঙ্কটে ও বিপদে জাতীয় স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখে ও রাষ্ট্রের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য নিয়ে যারা চলতে পারবে তাদের উপরই সওদাগরী নৌবাহিনীর পরিচালনার ভার দেওয়া চলে। আমরা জানি ভারত সরকারের নীতি-ও এই মত সমর্থন করে এবং সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর নাবিকের শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় নূতন নাবিক শিক্ষালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অথচ কলিকাতা বন্দরের নৌবিভাগীয় অফিসের এই খামখেয়ালী আচরণ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমরা শুনেছি এই অফিসে বহু উচ্চপদে ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গি কর্মচারী আছে। তাদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালী সরকারী নীতি ও জাতীয় স্বার্থকে প্রতিহত করে চলবে, এমন অধিকার তাদের আছে বলে আমাদের ধারণা নেই।

পূর্ব্ববাংলার উদ্বাস্তুদের মধ্যে নাবিকের কাজে উপযুক্তলোকের অভাব নেই। পূর্ব্ববাংলার ধীবর, নমশূদ্র, বাগদী প্রভৃতি বর্ণের লোকরা যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু এবং জলপথের অভিজ্ঞতাও এদের আছে। আজ যখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বৃত্তিহীন আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তাদের নিয়োগের এই সুযোগ অবহেলা করা অন্যায়;— কেবল যে মানবতার দিক থেকে এটা অন্যায় তা নয়, জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে-ও এটা অন্যায়।

পূর্ব বাংলার অবস্থা

ছমাস হ'য়ে গেল ভারত-পাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে একটা নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার বোধের সৃষ্টি করা—যাতে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠরা সহজ ভাবে নিজ নিজ রাষ্ট্রে ও গৃহে বাস করতে পারে। কিন্তু এরপরও পূর্ব বাংলা হ'তে এ পর্যন্ত অন্তত ৮।১০ লাখ লোক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে; এবং পশ্চিম বাংলা ও উত্তর প্রদেশ হ'তে লক্ষাধিক লোক পাকিস্থানে গিয়েছে। জনতার বাসস্থল পরিবর্ত্তনের এই আগ্রহ এখন-ও চলছে। এখন-ও প্রতিদিন গড়ে ৮।১০ হাজার লোক পূর্ব বাংলা হ'তে ভারতে আসছে। পশ্চিম বাংলা থেকে-ও প্রতিদিন সামান্যলোক পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছে।

ইদানীং পূর্ব বাংলার অবস্থা পরিদর্শন করে ফিরেছেন এমন কয়েকটি ব্যক্তির বিবৃতি হ'তে আমরা ওখানকার অবস্থা কতকটা জানতে পারি। সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও ডাঃ আলেক একযোগে পূর্ব-বাংলার বহু অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন; জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সহ ৭।৮টি জেলা ভ্রমণ করেছেন। চারু বাবুর বিবৃতিতে তিনি একটা কথা খুব বড় করে ধরেছেন,—এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় থেকে এখন ওখানকার অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশ্বাস মহাশয় ত প্রথমে এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন বলেই লোকে জানত। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করে ফিরে আসা উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য যে আবেদন কাগজে ছাপা হয়—তিনি তার একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন। তারপর হঠাৎ মন্ত্রী হ'য়ে ঐ চুক্তির সপক্ষে তাঁকে কাজ করতে ও কথা বলতে হচ্ছে। হয়ত পূর্ব বাংলা ঘুরে এসে ঐ চুক্তির পক্ষে সবচেয়ে ভাল যুক্তি পেলেন এই যে মার্চ্চ এপ্রিল মাস থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। একথা তিনি খেয়াল করলেন না যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার একটা চরম অবস্থার চেয়ে অবস্থার উন্নতি হওয়া ঐ চুক্তি ব্যতীত-ও হচ্ছিল ও হতই চারু বাবুর পক্ষে কাগজে এইভাবে বিবৃতি দেবার কোন প্রয়োজন ছিল কিনা বা কাগজে বিবৃতি দেওয়া তাঁর পক্ষে শোভন হয়েছে কিনা—সে সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ তিনি সাধারণ বিশ্বাসের মন্ত্রী নন,—কতকটা বিদেশী রাষ্ট্রের ভারতীয় দূতের মতো। তাই তাঁর পক্ষে পূর্ব বাংলা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে হয় সত্য গোপন করতে হ'বে, নয় ত অপ্রিয় সত্য বলতে হ'বে। তাঁর বিবৃতিতে এমন উক্তি কিছু আছে—যা পূর্ব বাংলার হিন্দুদের পক্ষে খুব সহায়ক হবে না। তিনি যেন এই চুক্তি সম্বন্ধে অত্যধিক দায়িত্বের (official obligation) বিষয় সদা সচেতন। সেই দৃষ্টি থেকে সব দেখেছেন, ফলে তাঁর চোখে বাস্তবের চেয়ে বাঞ্ছিত ছবিও বেশী ফুটে উঠেছে।

প্রায় একই সময় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে এক সাংবাদিক বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর বিবৃতি অনেকটা বাস্তব ধর্মী—কিন্তু তিনি-ও অপ্রিয় সত্য চেপে গিয়েছেন বলে মনে হয়। বাস্তবিকই হিন্দুরা পূর্ব বাংলায় বাস করতে পারবে কিনা,—বা তারা ওখানে নিরাপদ অনুভব করে কিনা—এ প্রশ্নের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জবাব এঁরা কেউ দেন নি। ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ-ও পূর্ববাংলা থেকে প্রায় একই সময় ফিরে আসেন এবং তিনি-ও এক বিবৃতি সংবাদপত্রে দেন। তাঁর বিবৃতি বরং অনেকটা স্পষ্টতর। পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তা-বোধ ফিরিয়ে আনতে হ'লে কি কি কাজ পূর্ব বাংলায় হওয়া দরকার তার যে ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন, তা থেকেই ওখানকার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দিক থেকে যে সংবাদ পাওয়া যায়—তাতে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে—ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা না থাকলে-ও আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি খুব নিষ্ঠা যে ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের আছে এমন কথা বলা যায় না। চুরি, ডাকাতি, নারীর প্রতি অপমান, অথবা লোকের নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ আজ পূর্ব বাংলার প্রায় নিত্যকার ব্যাপার হয়েছে। তার উপর আবার এই অপরাধের ফলে হিন্দু গৃহস্থই বেশী বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশের নিকট হতে তেমন প্রতিকার এই সব ব্যাপারে হিন্দুরা পায় না। তাই হিন্দুদের মনে সব সময়ই একটা আতঙ্কের ভাব থাকছে। তাদের ধন, মান ও জীবন কখন-ও নিরাপদ বলে তাঁরা অনুভব করে না।

ভারত-পাক চুক্তির সফলতা আজ নির্ভর করছে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মনে নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার বোধ সৃষ্টির উপর। যতদিন তা না হচ্ছে,

ততদিন ওখান থেকে হিন্দুদের বহির্গমন বন্ধ হবে না। এবং ততদিন পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মন হতেও আতঙ্কের ভাব দূর হ'বে না। ভারতের প্রত্যেক অংশে মুসলমানগণ পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে। ব্যবসায় ও জীবিকার দিক থেকেও তাদের পক্ষে কোন অন্তরায় নেই। সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করার-ও কোন অবস্থা এখানে নেই। পূর্ব বাংলার অবস্থার প্রতিকার হিসাবে গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে পশ্চিম বাংলায় ও উত্তর প্রদেশে মুসলমানদের উপর কিছু অত্যাচার ও জুলুম হয়েছিল; তা তেমন ব্যাপক ও তীব্র হয় নি। তবু-ও তাদের মনে আতঙ্কের ভাব জন্মেছে। যতদিন পূর্ব বাংলার অবস্থার সাম্য ও স্বাভাবিকতা না আসছে ততদিন এখানকার মুসলমানদের মনে কখন কি হয়, এই আতঙ্কের ভাব দূর হ'বে না।

উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ মনের এই অনিশ্চিত ভাব, উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলকর ও ক্ষতিকর। ভারত-পাক চুক্তি এই অবস্থা দূর করতে যে পরিমাণে সক্ষম হ'বে, ঠিক সে পরিমাণে এই চুক্তি সাফল্য লাভ করবে।

ময়মনসিংহের সমাবেশ

পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের যে সম্মেলন ময়মনসিংহে ইদানীং হয়ে গেল—তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাঁরা এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা, তাঁদের সাহস ও রাজনৈতিক বুদ্ধির সুখ্যাতি করতে হয়। পূর্ব বাংলার হিন্দুগণ রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন, শিক্ষিত, কর্মে প্রেরণাশীল, উদ্যোগী এবং বিক্রমশালী। এমনি একটা সম্প্রদায় রাজনৈতিক জীবন ব্যতীত কোথাও বাস করতে পারে না। কিন্তু ভারত বিভাগের পর ভারতীয় কংগ্রেস পূর্ব-বাংলাকে তার আয়ত্ত থেকে বাদ দিল; আমরা মনে করি ক্ষমতার লোভে ভারতীয় নেতৃবর্গ পাকিস্থান সম্বন্ধে যে সব ভুল করেছিলেন, এটা তার মধ্যে সর্ব প্রধান ও সর্ব প্রথম। মূল রাজনৈতিক সংস্থা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে, ওখানকার হিন্দুগণ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস কর্মিরা অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস নামে এক সংস্থা স্থাপন করে। গত আড়াই বছর এই কংগ্রেস ওখানকার রাজনৈতিক দাবী নিয়ে কাজ করেছে। বহু জেলায় তাদের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী আছে—যারা পাকিস্থানের নাগরিক হিসাবে বাস করতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

আজ যখন পূর্ব বাংলার হিন্দুদের সত্তা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ জাগছে, যখন চারিদিক থেকে কেবল নিরাশার কথাই উঠছে, ঠিক সেই সময় পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের উৎসাহে ও উদ্যোগে ময়মনসিংহে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের এক সম্মেলন হয়েছে। শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীসুরেশ চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি পুরাতন ও অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস গঠনে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছেন; অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মী শ্রীমনোরঞ্জন ধর, শ্রীগোবিন্দ লাল ব্যানার্জী, শ্রীবিনোদ চৌধুরী, শ্রীধীরেন রক্ষিত প্রভৃতি তাঁদের নির্দেশ মেনে পূর্ব বাংলার কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন। পূর্ব বাংলার যে কোন কর্মী প্রথমেই পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস হতে দূরে ছিলেন; ক্রমে তাঁদের মন হতে সংসয় ও সন্দেহ দূর হচ্ছে বলে মনে হয়। শ্রীশঙ্করনাথ বেও ও ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ তাঁদের পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে এই রাজনৈতিক সংস্থার কার্যকারিতা উপলব্ধি করেছেন।

ঠিক এই সঙ্কট সময়ে পাকিস্থান কংগ্রেস যে সংখ্যা-লঘিষ্টদের এই সম্মেলন আহ্বান করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। ঐ সম্মেলনে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উথাপন করেন; শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন ধর, শ্রীগোবিন্দ ব্যানার্জি, শ্রীধীরেন রক্ষিত প্রভৃতি নেতৃবর্গ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। এই প্রস্তাবে ১৬টি দাবীর কথা হয়েছে; এই সব দাবী

পূরণ না হলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে পূর্ব বাংলার বাস করা কঠিন অথবা অসম্ভব। হিন্দুদের পক্ষে সেখানে বাসকরা এখনও যে সহজ হয়নি তা তাদের ১৬ দফা দাবী হতে সুস্পষ্ট হয়; চুরি ডাকাতি এবং গত দুই মাসের দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সংক্ষিপ্তভাজন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি; নারী ধর্ষণকারীদের উচিৎ দণ্ড বিধানের অথবা অপহৃতা মেয়েদের উদ্ধারের জন্য পর্য্যন্ত চেষ্টা এখনও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট করেনি; অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার এখনও কার্য্যত স্বীকৃত হয়নি। সরকারী চাকুরী এবং জিবীকার্জনের অন্যান্যক্ষেত্রে এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায্য অংশ দেওয়া হয়নি; তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার দাবী পাকিস্তান সরকার আজও বাস্তবে স্বীকার করেনি—সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব হতে একথা সুস্পষ্ট হয়। দিল্লী চুক্তি সম্বন্ধে এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি ঠিকভাবে পালিত হলে কেবল যে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে তা নয়; উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকা উচিত তাও এই চুক্তি থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছমাস অতীত হল এচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পূর্ববাংলার এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা হয়েছে এমন কথা সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠগণ অনুভব করেনি। হয়ত এখনও সময় একেবারে অতীত হয়নি। ইদানীং চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষ হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলা সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষ হতে এখনও মন্ত্রী নিয়োগ করেনি। আমরা মনে করি ভারত সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকারের বহু পূর্ব্বেই এবিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব বাংলা সরকার যাকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রি নিযুক্ত করেছে, তাকে কোন ক্রমেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি বলা চলে না, এই নির্ব্বাচনের ভিতর পূর্ব বাংলা সরকারের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা চুক্তির পক্ষে অনুকূল নয়। দায়সোধ গোছের মনোভাব নিয়ে এই চুক্তিকে সফল করা যাবে না। আমরা আশা করি পাকিস্তান সরকার নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ-অনুভূতি থেকে এই বিষয়ে একটা উদার মনোভাব গ্রহণ করবে।

পাকিস্তান সরকারের মনোভাব যাই হউক পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মিগণ মৈমনসিংহ সম্মেলনে যে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে আশা করি তা নিতান্তই ব্যর্থ হবে না। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে তখনও এঁরা একেবারে নিরাশ হননি—আমরা এতেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্থিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রদূত

ত্রয়োদশ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৫৭ | তৃতীয় সংখ্যা

কুটির উৎপাদন কেন ?

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

মহাত্মা গান্ধী ক্রমাগত কুটির উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছেন এবং কংগ্রেস-ও তাঁর এই দৃষ্টিকোণ স্বীকার ক'রে নিয়েছে। একথা মেনে নিতে পারি যে গান্ধীজী কুটির উৎপাদনের কথাটা এমনভাবে না তুললে হয়ত এদিকে কারো অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেত না এবং হয়ত কংগ্রেসের কর্মপন্থার মধ্যে এই itemটি এমনভাবে মুখ্য হয়ে উঠত না। কিন্তু একথা বললে ঘোরতর অন্যায় করা হবে এবং মিথ্যা বলা-ও হবে যে কেবল গান্ধীজীর জেদের খাতিরেই যথেষ্ট কারণ না পেয়েও কংগ্রেস কুটির উৎপাদনকে (Cottage Industry) এমনভাবে গ্রহণ করেছে—কেবল গান্ধীজীকে তুষ্ট করার জন্য। বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদন (Machine Industry) আজ-কাল এমন সর্বব্যাপী ও প্রবল হয়ে উঠেছে, যে এর বিপক্ষে কথা বলতে যাওয়া মূঢ়তা ও ধৃষ্টতা ব'লে মনে হবে। গান্ধীজীর মতো যুগ প্রবর্ত্তক মহামানব-ই এই দুঃসাহস করতে পারেন। আজ কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ বলতে প্রধানত এই কুটির উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া বুঝায়।

নৈষ্টিক ন্যায় (formal logic) দিয়ে বহু উদ্ভট তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। গ্রীক দার্শনিক জিনো (Zeno) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে হাত-ও এগিয়ে থাকা মৃদুগতি কচ্ছপকে দ্রুতগামী ধাবমান ছাড়িয়ে যেতে পারবে না; হস্তধৃত তীর ধনুক থেকে নিক্ষেপ করা যায় না এটা হ'ল গ্রীক দর্শনের dialectic বা বাংলার কূটতর্ক। বাংলার অবনত অবস্থার নৈয়ায়িকগণ তৈলাধার পাত্র—কি পাত্রাধার তৈল, তা'ল টিপ ক'রে পড়ে—কি প'ড়ে টিপ করে প্রভৃতি কূটতর্ক ন্যায়ের সাহায্যে করতেন—এটা হল তাঁদের। কোন একটা জিনিষকে বুঝতে হ'লে মনের পটভূমিকা তার অনুকূল করা দরকার। কেবল শুষ্ক যুক্তি দিয়ে—যান্ত্রিক উৎপাদন বনাম কুটির উৎপাদন—এই বিতর্কের মীমাংসা হবে না।

লেনিন যখন বলেছেন, ইতিহাসের পরিবেশ দ্বারা সত্য নির্দিষ্ট হয় (truth is historically conditioned) বা সত্য হ'ল একদেশদর্শী (truth is partisan), তখন তিনি এই কূটতর্ক পরিত্যাগ ক'রে ইতিহাসের পরিবেশ দিয়ে সত্যকে নির্দেশ করতে ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যকে নির্ণয় করতে বলছেন। এর অর্থ হল—অবস্থা-সমষ্টি ও জনসমষ্টি মিলে যে কারণ-সমষ্টি সৃষ্টি করে, তা উপলব্ধি করা। নিরপেক্ষভাবে (absolute sense) যান্ত্রিক উৎপাদনের বিরুদ্ধে কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই যান্ত্রিক

উৎপাদন এসেছে, সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও মানুষ যন্ত্রকে তার সেবায় নিয়োজিত করবে। কিন্তু অবিমিশ্র মঙ্গল ব'লে কোন কিছুই নেই—বিশেষ যখন তার অত্যধিক বাড়াবাড়ি চলে। যান্ত্রিক উৎপাদনও অবিমিশ্র মঙ্গলের নয় এবং তার-ও আজ অত্যধিক প্রসার প্রতিপত্তি হচ্ছে।

তাই বিশ্বের ও ভারতের বর্তমান অবস্থায় কারখানা ও কুটির উৎপাদনের তুলনা করার প্রয়োজন এসেছে। যান্ত্রিক ও কারখানা উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় মার্কস (Marx) যে তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছেন, তেমন তীব্রভাষা বোধ হয় গান্ধীজী-ও প্রয়োগ করেন নি। এখানে ২।১টা তুলে দিচ্ছি—"We saw how machinery leads to an increase in the amount of human material for exploitation, by its annexation of the labour of women and children; how it extends its grip over the whole of the workers' lifetime by its immoderate extension of the working day; how its progress, which renders possible an enormous increase of production in ever shorter periods, serves as a means for the establishment of a system by which more & more work is done in a shorter time—as a means by which labour power is more & more intensively exploited."

অন্যত্র বলেছেন—"The special skill of each individual machine worker, who is thus sucked dry dwindles into an insignificant item as contrasted with the science, with the gigantic forces of nature & with the mass of social labour, which are incorporated into the machine system & out of which the power of the 'master' is made.

পুনশ্চ তিনি লিখেছেন—"In the form of machine, the instrument of labour immediately enters into competition with the worker. The self expansion of capital by means of machinery is directly proportional to the number of workers whose means of livelihood has been destroyed by this machinery."

তিনি আরও বলেছেন—"Owing to the extensive use of machinery and division of labour, the work of the proletariats has lost all individual character, and consequently all charm for the workman."

"He becomes an appendage to the mach-

Independent peasant or handicraftsman .....develops knowledge, insight & will."

এই ধরণের উক্তি আরও বহু চিন্তাশীল লেখকগণ-ও করেছেন। বিখ্যাত রুশ লেখক ক্রপটকিন লিখেছেন—

The artist who formerly found aesthetic enjoyment in work of his hands, is substituted by the human slave of an iron slave." (Fields, Factories and Workshops.)

মার্কসের আপত্তির প্রধান কথা-ই হ'ল—শ্রমশীল জনতার উপর এই কারখানা উৎপাদনের দুষ্ট ফল। দ্রুত উৎপাদনের সুবিধার সঙ্গে তুলনা ক'রে ঐ দোষের লঘুত্ব গুরুত্ব বিচার করা দরকার। যান্ত্রিক উৎপাদন হ'ল, একদিকে পুঁজী বাদী অর্থ-ব্যবস্থার জনক, অপরদিকে এর প্রতিফল। হেগেলীয় বা মার্কসীয় ডায়েলেকটীকে (dialectic) কার্য কারণ সম্পর্ক এমনি ক'রে জড়িয়ে থাকে, যে এক পর্য্যায় যা কারণ, অপর পর্য্যায় তা-ই হয় কার্য। যখন ব্যবসায়, বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের ফলে ইউরোপীয় ধনপতিদের হাতে বাড়তি অর্থ কিছু জমল, তখন থেকেই সুরু হ'ল কারখানা ও যান্ত্রিক উৎপাদন। আবার এই যান্ত্রিক উৎপাদনই ঐ বাড়তি অর্থের

পরিবার বাড়িয়ে পুঁজিবাদকে পুষ্ট ও প্রসারিত করল। এই একশ' বছর ধ'রে এই বিষ-চক্র দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে ও সমাজের সর্ব স্তরকে জড়িয়ে ধরেছে। মার্কস যে নূতন অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার কথা একশ' বছর পূর্বে বলেছিলেন, তা আজও যান্ত্রিক উৎপাদনের দুষ্ট ফলকে প্রসারিত করতে পারে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রুশিয়াতে মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়। মার্কসের বিধানের একটা মৌলিক কথা হ'ল যে—তাঁর ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী হ'তে হবে এবং বিশ্ব-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ঐ সমাজ ব্যবস্থাকে চালু ও কায়েমী করতে হবে। Engels & Marx arrived at the conclusion that the socialist revolution could not be victorious in one country taken singly, that it could be victorious only by a simultaneous stroke in all or the majority of civilised countries (History of the C. P. S. U., P. 377.)

বলশেভিক বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন বহুবার এই আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন—যে রুশিয়াতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সাথে সাথে পশ্চিম ইউরোপে-ও কম্যুনিষ্ট বিপ্লব হ'তে বাধ্য। এমন কথা-ও তিনি বলেছেন যে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ঐ বিপ্লব না হলে, রুশের বলশেভিক বিপ্লবের স্থায়িত্ব ও সাফল্য সম্বন্ধে কোন আশাই নেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে বহু-প্রত্যাশিত বিপ্লব হয় নি।

তারপর থেকে রুশের বলশেভিক নেতারা বিশেষ ভাবে ষ্টালিন—"একদেশে সাম্যবাদ"—socialism in one country—মত প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধের কয় বছর বাদ দিয়ে-ও কুড়ি বছরে অন্যান্য বিষয়ে বহু অগ্রগতি সত্ত্বেও, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সোভিয়েট রুশিয়া এখনও যেন ঘুরেই আছে। এর কারণ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে পুঁজিবাদী বিশ্ব পরিবেশের প্রভাব এড়িয়ে এক দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না। এই যুক্তির ফলে, আমরা আর একটি বিষচক্রের বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ি। এক যুদ্ধের পরও অবস্থার যে সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, তাতে-ও অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন আশাই নেই। এই যুদ্ধের পূর্বে রুশিয়ার অর্থ-ব্যবস্থায় যে ধন-বৈষম্য স্বীকৃত হয়েছিল, তা'তে কারখানার শ্রমিক ও ম্যানেজারের আর্থিক বরাদ্দের পার্থক্য ছিল প্রবল। নিম্নতম বেতন থেকে উচ্চতম বেতন আশী (৮০) গুণ পর্যন্ত হচ্ছিল। সাধারণ অভিজ্ঞ শ্রমিক, অনভিজ্ঞ শ্রমিকের চেয়ে ১২ গুণ পর্যন্ত আয় করত। কারখানার ব্যবস্থা পরিচালনায় যে সাধারণ শ্রমিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল বা আছে, তা-ও বলা চলে না।

এই বিষয়ে মরিস হিণ্ডাসের (Maurice Hindus) 'Mother Russia' নামক গ্রন্থে কারখানা বিষয়ক আখ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। এক স্থলে তিনি লিখেছেন—"The director is the manager (of the factory). He carries all the burdens that devolve on the shoulders of a manager of a factory in America & England. He is personally accountable for everything—raw materials, machines, division of labour, relation with labourer, output of goods—above all for the discipline & efficiency of other executives & workers. He must observe all Soviet laws & he must be ruthless in enforcing discipline & other requirements for efficient prodcution". (P161).

অন্যত্র—"A worker has no right to leave his place of employment without special permission. This is rarely granted by the factory, the state or the nation, and now in time of war, of the Army. The worker's own wishes or advantages do not count. Not only does

law disallow leaving a place of employment but it bans one from securing work elsewhere". (P. 163).

আবার —"The director the supreme command. He is responsible to nobody in the factory—neither the trade union nor to the party.....Not collective but personal responsibility, as in any capitalist country is the very core of Soviet factory management. (P.165)

এই অবস্থায় যে ধন-বৈষম্য ও শ্রম-বৈষম্য মার্কসকে বিচলিত করেছিল—তার গুণগত নিবৃত্তি হয় নি—কেবল পরিমাণগত রূপের পরিবর্তন হয়েছে। একথা সত্য যে সোভিয়েট রুশিয়াতে ধন উৎপাদক উপকরণ—জমি বা কল-কারখানা—সবই ব্যক্তিগত অধিকারের বাইরে—অর্থাৎ সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু একথা-ও ত অস্বীকার করা যায় না—যে সাধারণ শ্রমিক আজ-ও সেখানে মালিক নয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তার নেই। তার শ্রম-অর্জিত অর্থে তার সমান অধিকার নেই। সমাজের শীর্ষস্থানীয় শতকরা ১০।১১ জন লোক সমগ্র জাতীয় আয়ের অর্ধাংশের অধিকারী; আর বাকি জন পায় বাকি অর্ধাংশ; শ্রমিক হচ্ছে কারখানা গৃহের বিরাট যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র—প্রায় একটি নৈর্ব্যক্তিক অংশ—তার ইচ্ছা বা সুখ-সুবিধার কোন হিসাব সেখানে নেই—the workers' own wishes or advantages do not count. এই যে যন্ত্রের নিকট মানুষকে খর্ব করা—উৎপাদন প্রথায় মানবের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা—মার্কস এর প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর স্বভাব সিদ্ধ প্রাণময় ভাষায়। এর প্রতিকার তিনি চেয়েছিলেন —যন্ত্রকে সাধারণের সম্পত্তি ক'রে—by socialisation of the machine। তাঁর সে আশা এখনও পূরণ হয় নি;—সোভিয়েট রুশিয়াতে যদিও যন্ত্রকে সাধারণের সম্পত্তি করা হয়েছে কিন্তু এখনও ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। বরং এই একশ' বছরে যন্ত্র আরও বিষম জটিল ও সর্বব্যাপী হয়েছে। এই বিরাট যন্ত্র দানব-ক্রমে মানুষকে সরিয়ে সরিয়ে যন্ত্রের প্রভাব-ই বাড়িয়ে তুলছে। আজ এমন দিন কল্পনা করা যায় যখন কেবল একবার চালিয়ে দেবার জন্য ২।৪টি রক্তমাংসের মানুষের প্রয়োজন হবে—আর সবই করবে যন্ত্র এবং যন্ত্রের—মানুষ যাকে বলা হয় রবট (Robot)। মানুষের কর্মের পরিসর দিন দিন সংকীর্ণ হচ্ছে, মানুষ যন্ত্রের কাছে দিন দিন খর্ব হচ্ছে। মার্কস এই অবস্থার কেবল সুরু দেখেই বলেছিলেন—The individual worker dwindles into an insignificant item..... বিজ্ঞান, সংঘবদ্ধ শ্রম ও প্রকৃতির বিরাট শক্তি—এই ত্রয়ীর মিলন হয়েছে যন্ত্রের গঠনে; আর ঐ যন্ত্রের সামনে ব্যক্তিগত শ্রমিক একটা অনাবশ্যক সংজ্ঞা মাত্র।

এমন একদিন ছিল যখন অভাব পূরণের উপায়ের অপ্রাচুর্য্য মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল; মার্কসের সময়-ও সমাজের নিকট প্রধান সমস্যা ছিল অভাব পূরণের জন্য উৎপাদন। তাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন তীব্র ভাষা প্রয়োগ ক'রে-ও তিনি যান্ত্রিক উৎপাদনকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সমস্যা হ'ল—কাজের অভাব পূরণ। দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে; কিন্তু নেই কাজের প্রাচুর্য। তাই কতিপয়ের বিলাসী জীবনের পাশাপাশি চলছে বহুর বেকার দুর্গতিময় জীবন।

মার্কসের উক্তি থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, যান্ত্রিক উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি তিন শ্রেণীর—(১) শ্রমিকের শ্রম শোষণ ক'রে পুঁজিপতির ধনবৃদ্ধি—"as a means by which labour power is more & more intensely exploited." (২) বিরাট যন্ত্র দানবের সামনে মানুষ একটি প্রায় অনাবশ্যক সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়—the individual worker dwindles into an insignificant item, এবং (৩) যন্ত্রের বিস্তারের অনুপাতে শ্রমশীল জনতার জীবিকা নষ্ট ও অপহৃত হয়—is directly proportional to the number of

workers whose means of livelihood has been destroyed by the machinery। গান্ধীর আপত্তিকে-ও এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যন্ত্রের বিরুদ্ধে মোটামুটি সব সামাজিক আপত্তিকে এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আমরা এখানে গান্ধীর কথা প্রত্যক্ষত আনব না; সমাজের তরফ হ'তে মার্কসের মুখ দিয়ে যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে তিনটি আপত্তি উত্থিত হয়েছে, তার-ই বিচার এখন করব।

মার্কসের প্রথম আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যান্ত্রিক উৎপাদনকে সমাজীকরণ (socialise) করলে, এর উৎপন্ন সম্পদকে সামাজিক বা জাতীয় সম্পত্তি ব'লে গণ্য করলে, শ্রমিকের শোষণ বন্ধ করা যায়। অর্থনীতি হিসাবে এটা সম্ভব; কার্যগতিকে এর পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব কিনা, তা এখন-ও বিতর্কের বিষয়। গত ৩৫ বছরের চেষ্টায় রুশিয়ার এখন-ও এই আদর্শ পূরণ হয় নি। এখনও কারখানা গৃহে বেতনের তারতম্য ৮০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণ শ্রমিক ও উচ্চ কর্মচারীর জীবন যাত্রার পার্থক্য এখন-ও সেখানে বেশ পরিস্ফুট। তবুও পিওরীগত বা নীতিগতভাবে এর যৌক্তিকতাকে-ই আমরা মেনে নিতে রাজী আছি কিন্তু সেই আদর্শ ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে সমাজে দেখতে পাব, এমন ভরসা বোধ হয় কেউ করেন না এই মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে গতি দেখছি, তা'তে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে, একথা বলতে আপত্তি নেই; কিন্তু তা'তে বিভিন্ন দেশে যে ধনোৎপাদক উপকরণসমূহ (means of production) জাতীয়কৃত বা সমাজীকৃত হবে—এমন কোন নিদর্শন দেখা যায় না। সোভিয়েট রুশিয়ার আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সদ্য ক্যাপী কবলমুক্ত দেশসমূহে যে সব কম্যুনিষ্ট দল গঠিত হচ্ছে, তারা কেউ তাদের কার্য্য তালিকার মধ্যে এই বিষয়টি উল্লেখ করে নি। বার্লিনে ১৯৪৬ সালে জার্মাণ কম্যুনিষ্ট দলের গঠন হ'ল; তাদের কার্য তালিকাও প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু তার মধ্যে সাম্যবাদের এই মূল কথাটি নেই। ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশের কম্যুনিষ্ট দলের কার্য্যতালিকায়-ও উৎপাদন উপকরণ-সমূহকে লোকায়ত্ত বা জাতীয়কৃত করবার কোন কথা নেই। এ থেকে বুঝা যায়, বিশ্বের কম্যুনিষ্ট দলের ভরসাধারী রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট দল ঐ বিষয়টি বর্ত্তমানের জন্য মুলতুবী রেখেছে—পিওরী বা নীতি হিসাবে অবাঞ্ছনীয় বলেই হ'ক, বর্ত্তমান বাস্তবে তা অসাধ্য বলেই হ'ক—তা আমাদের বিচার করার দরকার নেই।

কাজেই অর্থনীতির দিক হ'তে—অর্থাৎ শ্রম শক্তির শোষণের উপলক্ষ হিসাবে যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আপত্তি বর্ত্তমান অবস্থায় আছে তার কতকটা উপশম আশা করা গেলে-ও তার পূর্ণ প্রশমন আশা করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

ভারতের শাসনতন্ত্র*

বিচার বিভাগ

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

ইংরেজের শাসনের দিনের কথা আমরা ভুলি নাই। তাছাড়া, এটা সহজবুদ্ধির কথা যে, যে শাসন করে, সে-ই যদি আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের মালিকও যদি সে-ই হয়, তা হ'লে স্বৈরাচার সেখানে সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে এবং জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সেইজন্য আধুনিক জগতে আইন প্রণয়নের কাজ প্রায় সর্বত্র শাসকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিচারবিভাগের কাজ আজও অনেক দেশেই তেমন ক'রে আলাদা ক'রে দেখা হয়নি।

প্রাচীন ভারতে কিন্তু ব্যবস্থা ভিন্ন রকম ছিল। আইনকে তখন বিজ্ঞানের অঙ্গহিসাবে দেখা হ'ত। সেইজন্য আইন ব্যবসায় ছিল ব্রাহ্মণের পেশার অন্যতম। বিচারক নিযুক্ত হ'তেন আইন ব্যবসায়ীদের ভিতর থেকে। কাজেই তিনি হতেন ব্রাহ্মণ। আর শাসক ছিলেন ক্ষত্রিয়। সুতরাং বিচারবিভাগ তখন শাসনবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন ছিল।

পরে কিন্তু এ-অবস্থা বদলে যায় যখন ব্রাহ্মণদের ভিতর অনেকে রাজনীতিতে যোগ দিতে শুরু করেন। এর পর থেকে ক্রমে রাজা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠেন। কিন্তু সর্বত্র বা সব সময় অবস্থা এক ছিল না। জাতকের দিনে রাজনৈতিক পুরোহিত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বা বিচারক হ'তে পারতেন না। রাজা শাস্তি দিতেন, কিন্তু বিচারকের অথবা মন্ত্রীর পরামর্শে।

আবার মৃচ্ছকটিকের বিচারালয়ের দৃশ্যে পাই, জুরি বা বিচারকদের প্রধান বলছেন, আর্য চারুদত্ত, নির্ণয়ে বয়ং প্রমাণম্। শেষে তু রাজা। প্রমাণে আসামী দোষী বা নির্দোষ আমরা শুধু তাই দেখব, বাদবাকীটা রাজার হাতে।

কিন্তু আধুনিক যুগে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক মঁৎকিয়ে স্পষ্টভাবে প্রথম বলেন যে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, শাসনকর্তৃত্ব ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন।

তা স্বত্বেও প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির কথা বাদ দিলে এখন পর্যন্ত বিলাতের সব বিচারক নিয়োগের ভার রাজার নামে শাসনকর্তাদের উপর। এবং শাসনকর্তারা Justice of Peace এবং Magistrate দের বরখাস্তও করতে পারেন।

আমেরিকাতে প্রেসিডেন্টই বিচারক নিযুক্ত করেন, কিন্তু সেনেটের সঙ্গে একমত হয়ে। সোভিয়েটের মূলনীতি ও শাসনপদ্ধতি পৃথক হ'লেও উর্ধ্বতন বিচারালয়গুলি কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রিপাবলিকের সোভিয়েটের নিয়োগেই সৃষ্টি হয়। People's Court বা অবন্তন বিচারালয়গুলি সাধারণ নাগরিকের দ্বারা নির্বাচিত হয়। উভয় দেশের এই দুই ব্যবস্থাতেই বিচারালয়ের উপর রাজনৈতিক প্রভাব সক্রিয় থাকার অবকাশ রয়ে গেছে।

এই সবের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রে বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার নানাবিধ প্রয়াস বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ভারতের শাসনতন্ত্রের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে বিচারবিভাগের দায়িত্ব অপরিসীম, সেইজন্য ক্ষমতাও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে অনেকে লঘুচিত্তে ব্যবহারজীবীদের স্বর্গ ব'লে বর্ণনা করেন। বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা গণতন্ত্রের প্রাণ, বিশেষ ক'রে একটি যুক্তরাষ্ট্রে। কারণ, শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার বলে এখানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের স্বৈরাচারের প্রতি ঝোঁককে ঠেকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই ধারাগুলি ব্যাখ্যার প্রায় অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিচারবিভাগকে।

ভারতের শাসনবিধানে শাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচারবিভাগকে পৃথক্ ক'রে ফেলবার বিধিমতো প্রয়াস

করা হয়েছে। ৫০ নং ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে আলাদা ক'রে ফেলতে হবে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আইনের বিচার বিশ্লেষণে বিচারবিভাগকে আইন প্রণয়নবিভাগের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিভাগ তিনটির ঐক্য বজায় রাখার ব্যবস্থা আছে শুধুমাত্র জরুরী অবস্থার জন্যে। কিন্তু জরুরী অবস্থা জরুরী অবস্থা ব'লেই সাধারণ আলোচনার গণ্ডীর বাইরে।

এই শাসনতন্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির মধ্যেও এর বিচারবিভাগের ঐক্য বজায় রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র ভারত মহারাষ্ট্রের বিচারবিভাগ একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থা—বিচারালয়গুলির ক্রম নিম্ন বা ক্রম-উর্ধ্ব ধারা অবশ্য আছে।

সব চেয়ে উর্ধ্বতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে Supreme Court. এই সুপ্রীম কোর্টের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন State অংশরাজ্যের হাইকোর্ট। এবং এই সব হাইকোর্টের অধীনে রয়েছে জেলাকোর্ট, এবং আরও সব নিম্ন আদালত।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ অবশ্য রাষ্ট্রপতিই করবেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বেলায় তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির বিচারপতিদের মত গ্রহণ করবেন। অন্যান্য বিচারপতি নির্বাচনে তাঁকে প্রধান বিচারপতির মত নিয়ে কাজ করতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হ'তে হ'লে ভারতীয় নাগরিক হ'তে হবে এবং অন্ততঃ ৫ বছর হাইকোর্টের বিচারক অথবা ১০ বছর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট থাকতে হবে। এছাড়া, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সুপ্রীম আইনজ্ঞহিসাবে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করতে পারবেন।

একবার নিয়োগের পর প্রত্যেক বিচারপতির কার্যকাল ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। খুশিমতো কোনো বিচারপতিকে সরানো চলবে না। সরাতে হ'লে পার্লিয়ামেন্টের উভয় সংস্থার উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত সুপারিশের বলেই মাত্র রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারপতিকে বরখাস্ত করতে পারবেন। সে সুপারিশও করতে হবে বিচারকের অকর্মণ্যতা বা অসততা প্রমাণ হয়েছে, এমন অভিযোগের ভিত্তিতে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতনও তাঁদের দায়িত্ব ও পদমর্যাদার উপযোগী করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও যুগধর্মের বিবেচনায়, তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেতন হবে মাসিক ৪০০০৲ টাকা, অন্য বিচারপতিদের ৪০০০৲ টাকা। সুপ্রীম কোর্টের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভারতের কোনো বিচারালয়ের ব্যবহারজীবী হিসাবে কাজ করতে পারবেন না।

বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন রীতি আছে, এখানেও সেইভাবে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগ করা চলবে।

এবারে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। বলতে গেলে, পৃথিবীর সব যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত থেকে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টকে ব্যাপকতর ও অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টও সাধারণ আপীলের জন্যে নয়। কেন্দ্র ও অংশরাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত বিরোধের বিচার সুপ্রীম কোর্টই মাত্র করতে পারবে। শাসনতন্ত্রের আইনঘটিত ব্যাখ্যা ছাড়া অংশরাজ্যের হাইকোর্ট থেকে আপীল সম্পর্কে বিচার করবার ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের।

দেওয়ানী বিচার সম্পর্কে, ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে Privy Councilএর যে ক্ষমতা ছিল, ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারী ব্যাপারেও অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা চলবে।

এছাড়া, নাগরিক অধিকারের ও ব্যক্তির স্বাধীনতার দিক থেকে একটা বড় কথা আছে। ভারতের সবরকম আদালতের উপর, এমন কি ট্রাইব্যুনালগুলির উপরও

সুপ্রীম কোর্টের একটা সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে। মৌলিক অধিকারগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কেও সুপ্রীম কোর্ট বিহিত করতে পারবে।

আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্যের উল্লেখ আগে করেছি। এখানে পাই, শাসন বিভাগের উপর এর প্রাধান্য। সম্প্রতি একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কিভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করেছে, তা সকলেই জানেন।

এছাড়া, ক্যানাডার মতো এখানে প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্রপতি কোনো আইন ঘটিত ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের মন্ত্রণা গ্রহণ করতে পারবেন।

হাইকোর্টের গঠনপ্রণালীও সুপ্রীম কোর্টের গঠন প্রণালীর মতোই হবে। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা উভয় কোর্টেরই একইভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। হাইকোর্টেরও বিচারপতি রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করবেন। তাঁদের কার্যকাল ৬৫ বৎসরের পরিবর্তে ৬০ বৎসর বয়সে শেষ হবে। বরখাস্তের নিয়মও উভয়ক্ষেত্রে অনুরূপ। হাই-কোর্টের বিচারপতিরাও অবসর গ্রহণের পর ব্যবহার-জীবীর কাজ করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ক্রমে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে কাজ করবার জন্য আহ্বান করতে পারেন।

হাইকোর্টের ক্ষমতা বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে যা ছিল, সেই রকমই রাখা হয়েছে, বরং খানিকটা বেড়েছে। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে আগে ক্ষমতা সংকুচিত ছিল, এখন আর তা নেই। এবং ট্রাইবুনাল-গুলির উপরও হাইকোর্টের সাধারণ কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়েছে।

হাইকোর্টের অধীনে যে সব বিচারালয় আছে, তাদের ক্ষমতা ও আওতা, বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আগে যা ছিল, সেই রকমই আছে।

অন্যান্য শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের কাঠামোটি খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিকল্পিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কোথায় নিহিত এ নিয়ে বহু বিস্তীর্ণ বিতর্ক আছে। সর্বময় ক্ষমতার ঐক্য ও বহুত্ব নিয়েও নানা জটিল ও দুরূহ আলোচনা বিদগ্ধ সমাজে চলে। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এই আলোচনা আরও জটিলতর।

রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে, অথবা জন সংসদে, অথবা শাসনতন্ত্রে, অথবা সর্বোচ্চ বিচারালয়ে —আগে বলেছি, এ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। একটা কথা কিন্তু সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, সর্বময় ক্ষমতা যেখানেই থাক্ না, বিচার বিভাগের ব্যাখ্যার উপরই তার স্বরূপ ও স্বকীয়তা নির্ভর করে। এই কারণে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে বিচার বিভাগের দায়িত্ব গুরুতর।

কোনো শাসনতন্ত্রই চূড়ান্ত নয়, এবং লিখিত আক্ষরিক উক্তির উর্ধ্বে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই একটা নৈতিক সত্তা আছে। বিচারবিভাগের ব্যাখ্যা থেকেই শাসন তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ এই সত্তাটির স্বরূপ স্পষ্ট হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের কোনো কোনো নীতি নতুন ক'রে প্রবর্তন করে—এমন কথা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এই কারণে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এতটা প্রয়োজনীয়।

শাসনতন্ত্র যা'তে দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতাপ্রিয় একাধি-নায়কের হাতের যন্ত্র না হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য কোনো চেষ্টাই বাহুল্য চেষ্টা নয়। এই কারণে ভারতের শাসনতন্ত্র যে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্যে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছে, বলতে গেলে, এইটিই এই শাসনতন্ত্রের সবচেয়ে মঙ্গলময় দিক। শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের এই পরিকল্পনা কতোখানি কার্যকরী হবে এবং ভারতীয় জনগণের মুক্তির তৃষ্ণা এই পরিকল্পনায় কতোটা মিটাতে পারবে সে বিচার করবে ভবিষ্যতের ইতিহাস।

---

*কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সৌজন্যে।

ভারতবর্ষ ও সিংহল

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

সিংহলদ্বীপ ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইলেও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতবর্ষের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কমনওয়েল্থ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্বশাসন অধিকার প্রাপ্ত দেশ।

স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। ভৌগোলিক পরিস্থিতিই সিংহলের ভাগ্যকে ভারতবর্ষের ভাগ্যের সহিত জড়াইয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টির পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধার্মিক এবং সভ্যতার যে কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তৎসমস্তের প্রভাবই সিংহলের উপরেও বর্তাইয়াছে।

এখানকার লোক বেশীর ভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং পালী বা সিংহলীই এখানকার প্রধান ভাষা। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব এদেশে সক্রিয়। এই সমস্তই সিংহলের ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য সম্ভব হইয়াছে। যে জলরাশির দ্বারা সিংহল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণ ভারতের লোকেরা এখানে প্রায়শই যাইত এবং উক্ত দ্বীপের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিত, কখনও বা বন্ধুভাবে, কখনও বা শত্রুভাবে, কখনও বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আবার কখনও বা সিংহলের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া ভারতীয়েরা সিংহলে গমন করিয়াছে। যুগাবতার রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণের কবল হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন; বাংলাদেশের অধিবাসী বিজয় জনৈক সিংহলী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে সিংহল যখন ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না তখন বিভিন্ন বন্যজন্তুর মত দঃ ভারত হইতে বেদ্দারা (vaddas) আসিয়া এই দ্বীপ দখল করে। মহাবংশ নামক পুস্তকে বিজয়ের গল্পের ভিতরে আদম পীক (সিংহলের একটি জায়গা) নিবাসী পুলিন্দদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ এই বেদ্দাদের সম্বন্ধেই লেখা।

দক্ষিণ ভারতীয় একটি শক্তিশালী জাতি দ্রাবিড়রা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সিংহলে যাইতে অভ্যস্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ১ম এবং ২য় শতকে সিংহলবাসীরা এদের দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি এবং সিংহলের সাথে এদের যুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই থাকিত; কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিংহলীদের কাছে এরা পরাজিত হইয়াছে। আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ৫০০ অব্দে ভারতবর্ষের পূর্ব এবং পশ্চিমদিক হইতে বাণিজ্যিক জাহাজে করিয়া আর্যরা সর্বপ্রথম সিংহলে যায়। আর্যদের আগমনই সিংহলের ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের সূচনা। তাহারা যে সিংহলী ভাষা ব্যবহার করিত তাহাই এখনও ওখানকার বেশীর ভাগ লোকের ব্যবহৃত ভাষা; এখানকার প্রায় ২।৩ অংশ লোক আজিও সিংহলী ভাষা ব্যবহার করে। ভারতীয় পালী ভাষার সহিত সিংহলী ভাষার নিবিড় সম্পর্ক আছে। যে লৌহের ব্যবহার সিংহলে আজ বহুল প্রচারিত তাহারও প্রবর্তক এই আর্যজাতি; যে কৃষি এদেশের বেশীর ভাগ লোকের প্রধান উপজিবীকা তাহাও আর্যদের দ্বারাই প্রবর্তিত।

৭০০ শত অনুচরসহ ভারতবর্ষ হইতে বিজয়ের সিংহলে আগমনের সময়কেই সিংহলের ইতিহাসের প্রারম্ভ হিসাবে ধরা যায়। বিজয়ই সিংহলের প্রথম বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা।

সিংহলের রাজপরিবার এবং দক্ষিণ ভারতীয় পাণ্ড্য রাজ্যের মধ্যে অনেক বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা সুবিখ্যাত। সিংহলের নগরী নির্মাণে এবং শিল্পের উন্নতিবিধানে পাণ্ড্যরাজ্যের লোকেরা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বিজয় এবং তাহার অনুচরদের চেষ্টাতেই অনুরাধপুর এবং তাম্রপর্ণী নগরীদ্বয় গড়িয়া উঠিয়াছে। সিংহলরাজ

পাণ্ডুভাষা গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলবর্তী একটি রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধগুলিই ভবিষ্যতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম স্থাপনের প্রস্তাবনা স্বরূপ।

সিংহলরাজ পাণ্ডুক ভারতীয় নগর নির্মাণ পদ্ধতি এবং শাসন পদ্ধতি অতি সুনিপুণভাবে অনুকরণ করিয়া অনুরাধপুরকে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। তাহার অনুকরণ এত সার্থক যে অনুরাধপুর নগরীকে রাজগড়, বৈশালী বা পাটনার প্রতিকৃতি বলিয়া ভুল হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নহে।

ভারতের ন্যায় সিংহলেও শ্রামামান ব্রাহ্মণ, জৈন এবং অন্যান্য সংসারত্যাগীরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের অগ্রদূত। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনী প্রথার প্রবর্তন করেন ইহাকেই সিংহলে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হিসাবে ধরা যায়। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারের অন্যতম কারণ অনুরাধপুরের রাজা দেবানম্প তিষ্য কর্তৃক সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রেরিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সর্বপ্রকারের সাহায্য দান। বুদ্ধঘোষ নামক একজন বিখ্যাত ভারতীয় বৌদ্ধ টীকাকার সিংহলী ভাষ্যকে পালীতে অনুবাদ করিবার জন্য সিংহলে যান।

অশোকের রাজত্বকালে যে ব্রাহ্মী হরফ ব্যবহার করা হইত সিংহলের পুরাতন গুহার ভিতরেও সেই হরফের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথেই সিংহলে লিখন পদ্ধতিরও প্রবর্তন হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সিংহলে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে পালী এবং সিংহলী ভাষায় বেশীর ভাগ সাহিত্যই বুদ্ধের জীবনী ও বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষ এবং সিংহল উভয়ই কৃষিপ্রধান দেশ। ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং কৃষির উপরেই তাহাদের উন্নতি নির্ভর করে। উভয় দেশই আজকাল স্বাধীন এবং মানব জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সুযোগ উভয় দেশেই রহিয়াছে। উভয় দেশের লোকই নিজের দেশকে ভালবাসে এবং দেশের উন্নতিবিধানের জন্য ব্যগ্র। আজকাল শিক্ষাও সিংহলে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ধান এবং নারিকেলই সিংহলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। রবার, কুইনাইন এবং চায়ের চাষও এখানে কিছু কিছু হয়।

সিংহলকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বিস্তৃতি হিসাবে ধরা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবে জুনমাসে এবং উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রভাবে ডিসেম্বর মাসে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৭,১৯৩,০০০। এখানকার লোক বসতির নিবিড়তা একমাত্র হাঙ্গেরী বা কোরিয়ার সহিত তুলনীয়। অনেক বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা এখানে আছে এবং তার মধ্যে একটী যৌথকারবারের বিধি অনুযায়ী সংযুক্ত। চা, রবার এবং নারিকেল রপ্তানীর উপরই সিংহলের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে। সমবায় সমিতির মারফৎ এখানকার ধান্য সংগৃহীত এবং বিলী ব্যবস্থা করা হয়। কৃষক ন্যূনকল্পে প্রতি বুশেলের মূল্য বাবদ ৮৲ টাকা পায়।

ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনাদ্বারা সিংহলের গ্রামসংগঠন, গ্রাম্য চাষের ভূমি, কৃষকের উন্নতি এবং উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যতীতও এখানে কয়েকটি জাতীয় বাগ (Park) আছে। জলসেচের অনেক উন্নতি হইয়াছে। মৎস্যচাষের জন্যও কয়েকটি বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

খনিজ বিজ্ঞান বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনায় সিংহলের শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখানে স্থানে স্থানে অতি দুর্লভ মাটি এবং মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়। কিছু কিছু অভ্র, লৌহ, চীনামাটী, বালী এবং পাথরচুণাও এখানে আছে।

শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হয়। জাতীয় ভাষার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সিংহলী বা তামিলী ভাষার মারফৎ যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরেজীকে একটি অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে ইংরাজী ভাষার

মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তামিলী বা সিংহলী এর যে কোন একটিকে অবশ্যপাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুবিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়গুলি শিল্পশিক্ষাকলেজের মারফৎ শিখান হয়। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত একটি কলেজের মধ্য হইতে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি।

এখানে সুপ্রীম কোর্ট, জেলা আদালত এবং গ্রাম্য বিচারালয় আছে। একজন প্রধান বিচারপতি এবং ৮ জন নিয়পদস্থ বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। গ্রাম্য বিচার বিষয়ে গ্রামনীর ক্ষমতা যথেষ্ট এবং গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারও তার উপরই ন্যস্ত।

জাতীয় তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই কলম্বো সহরে তড়িৎ সরবরাহ করে। কিন্তু গ্যাস সরবরাহ করে একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। জলশক্তি হইতে তড়িত সরবরাহকারী একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অন্যান্য ৫৮টি সহরেও একই ভাবে তড়িত সরবরাহ করা হয়।

দুইটি প্রধান ব্যবসাপথের সঙ্গমস্থলে কলম্বো সহর অবস্থিত। ইহা একটি বিরাট বন্দর ও পোতাশ্রয়। এই কলম্বো বন্দরের উপরেই সমগ্র সিংহলের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে।

এখানকার সমস্ত রেলপথগুলিই জাতীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। বিমান-পোত পরিচালনার ভার যান-বাহন সচিবের উপর ন্যস্ত। পৃথিবীর সমগ্র দেশের সহিতই বিমান ডাকের ব্যবস্থা আছে। প্রধান প্রধান নগর ও জিলাগুলি telephone দ্বারা সংযুক্ত।

এখানে অনেকগুলি পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ভূমি খনন এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক জরিপ কমিটির উপর ন্যস্ত। এখানে জাতীয় যাদুঘরও আছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু লোক অনুরুদ্ধপুর ও পুলোনারুয়াতে আসা-যাওয়া করে।

পারস্পরিক উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে একটী গভীর সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। বৌদ্ধ-ধর্মের দ্বারা এই দুইটি দেশ একাত্ম ও নিবিড় বন্ধনে আবিষ্ট, পণ্ডীতজীর মতে এই বন্ধন কিছুতেই শিথিল হইবার নহে। •

• B. C. Law কর্তৃক Foreign Review May '50 সংখ্যায় লিখিত India & Ceylon নামক প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে।

প্রগতি

শ্রীস্বদেশ রঞ্জন দাস

প্রগতি শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গতি। প্র—গম+ক্তি। এই বিশ্লেষণ দ্বারা 'প্রগতি' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় প্রকৃষ্ট পথে গমন করা। প্রকৃষ্ট পথ কাহাকে বলে? যে পথে গমন করলে ব্যক্তি বা সমাজ ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। যে পথে গমন করলে সমাজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি-সাহস, স্নেহ-মমতা, দয়া-ক্ষমা, প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধন ক'রে নিজেকে সুন্দর ও সবল ক'রে তুলতে পারে তাকেই বলে সত্যিকারের প্রকৃষ্ট পথ। যে সমাজ এরূপ প্রকৃষ্ট পথে চলে তাকেই বলে প্রগতিশীল সমাজ।

আজকাল সভা-সমিতি, দৈনিক-মাসিক, নানা প্রকার সামাজিক বই-পুস্তক, সিনেমা-থিয়েটার সর্ব্বত্রই এক কথা শুনা যায়—প্রগতি! প্রগতিশীল সমাজ নানা দিক থেকে এগিয়ে চলেছে। এই প্রগতি সমাজকে সুন্দর ক'রে তুলছে, সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে আর ক'রে তুলছে আনন্দময়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত প্রগতি বস্তুটা কি তা উপলব্ধি করা আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের সহজ-সাধ্য নয়। ছেলে বিলেত গিয়ে বড় এঞ্জিনিয়র বা ব্যারিষ্টার হ'য়ে মেম বিয়ে ক'রে নিয়ে এল, সমাজ বিনা আপত্তিতে সেই বিধর্ম্মী, চির অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সমাজের একটি স্ত্রীলোককে আপন ঘরে স্থান দিয়ে মনে করল অতীত সমাজের কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রগতিশীল হবার সুযোগ পেল। পিতার মৃত্যুর পর সন্তান হবিষ্যান্ন

আহার না করে বড় ইংরেজী হোটেলে কাউলকারী অতি তৃপ্তির সঙ্গে উদরস্থ ক'রে মনে করল অতিত সমাজ কতই না কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

প্রাসাদ প্রমান বাড়ীতে উহার মালিক আমোদ প্রমোদে মত্ত। ভিখারী উৎসবের বাড়ীতে ভিক্ষা পাবার লোভে 'ছুটো খেতে দাও বাবা' বলতেই কর্ত্তা হয়তো বা দারোয়ানকে উচ্চ গলায় হুকুম দিলেন 'উসকো নিকালো' অথবা নিজেই এসে ঘুষা মেরে দিয়ে 'বেরো ব্যাটা বলছি। যতসব Undeserving elementএর দল।' বলে বাইরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে দিলেন। বর্ত্তমান প্রগতিশীল সমাজের এও একটা দিক। সিনেমা থিয়েটারে অ্যাক্ট করে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে মদ খেয়ে মাতাল হয়, এরও নাম প্রগতি। প্রগতির রূপের এরূপ দোটানা রাম শ্যামের ন্যায় লোকের মনে এক জটিল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তারা স্থির করে উঠতে পারে না, কোনটা তাদের গন্তব্য পথ। তাদের মন থেকে এখনও ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের ছাপ বিলীন হ'য়ে যায় নাই। অথচ বর্ত্তমানকার তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে। আকুলি বিকুলি করে সে প্রগতির সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়তে। ঝাপ দেয়ও অনেকে। যে ঝাপ দেয় তারই পূর্ব্বস্মৃতির বিস্মৃতি ঘটে। পূর্ব্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। তথাকথিত প্রগতির ঘোরালো ও জোড়ালো পাকে পাকে উহার সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যায়। প্রগতি-পাকের পাকে প'ড়ে কেউ নিস্তার পায় না তেমন বলা যায় না। তবে সেরূপ উপমা ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। যারা পাকে পরেও নিজ সত্তাকে, নিজ বৈশিষ্টকে বজায় রেখেছেন এবং নিমজ্জিত সত্তা পুনরায় জাগিয়ে তুলেছেন, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাত্মা গান্ধী চরম বিলাসী-সংসর্গে থেকেও নিজের সহজ, সরল জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে গেছেন। এবং তৎসঙ্গে প্রমাণ করে গেছেন যে মনোবলের অমোঘ শক্তির সাহায্যে নিজ জাতিগত আদর্শের মধ্য দিয়েই জগত সমক্ষে সব অধিকার দাবী করা যায়। শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত থাকতে হয় না। অধিকার করাও সম্ভব হয়। দেশবন্ধুর জীবন কাহিনী প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করলেই নিজ আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে হ'বে তা'র স্বপক্ষে তেমন জোড়ালো কোনও যুক্তি নেই। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের জীবন কাহিনী পাঠ করলে সব চেয়ে বড় করে চোখে পড়ে যে, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে মৌলিকত্ব থাকলে পরের অধীনে কার্য করেও নিজ স্বত্বা বজায় রাখা মোটেই অসম্ভব নয়।

প্রগতির নাম করে ভারতের যে সমস্ত প্রদেশ অতি দ্রুত তালে অধোগতির দিকে এগিয়ে চলেছে বাঙ্গলা তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তার পরেই বোধ করি মাদ্রাজ। এই উভয় প্রদেশই কোট প্যান্টালুন পরিহিত কেরাণীর জন্মদাতা। দাসত্বই যেন উহাদের জন্মগত অধিকার। সমাজকে নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থা দিয়ে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে গুটিকয়েক ধীশক্তি-সম্পন্ন দূরদর্শী লোক। কিন্তু বাঙ্গালার আজ অতি দুর্দৈব যে চিত্তরঞ্জন বা আশু মুখার্জীর ন্যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ, মহান ব্যক্তি একটিও নাই। আজ শতকরা নিরানব্বুই জনই সমাজ সংস্কারক পথ প্রদর্শক। সবাই চায় সমাজকে একটা কিছু দান ক'রে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতে। ফলে সমাজে এমন সমস্ত রীতি নীতি, ভাবধারা প্রবর্ত্তিত এবং প্রচলিত হচ্ছে যার নিমিত্ত সমাজ তিন তিরিখে ন'এর তালে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

যে যা করছে সবই প্রগতির নাম দিয়ে। স্ত্রী বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বেহুস হ'য়ে রয়েছে এদিকে হয়তো স্বামী বা শিশু বেচারা রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছে; রক্ষা না করলেই নয়। আভিজাত্যে আঘাত লাগে। আবার অন্য দিকে তাকালে দেখা যায় স্বামী তার বন্ধুর অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে দার্জিলিং কালিম্পং বা নৈনিতাল Recreation এর জন্য গিয়েছেন। স্ত্রী বেচারী স্বামী সন্দর্শনের আশায় রোগ শয্যায় ছট্‌ছট করছে। এ সমস্তও বর্ত্তমান সমাজের প্রগতির এক

একটা অঙ্গ। বর্ত্তমান Aristocracy বজায় রাখতে হ'লে এর থেকেও অধিক লজ্জাকর ও অন্যায় কাজ করতে হয়। কোন কোনও অতি আধুনিক বাঙ্গালী মহলে সাহেবী ধরণের পরপুরুষ ও পরস্ত্রী নিয়ে নাচ হয়। এটাই বোধ করি বর্ত্তমান প্রগতির সর্বশেষ সংস্করণ। এর উপরেও যদি সমাজ উঠে থাকে তবে সে কথা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। যারা এসমস্ত অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে যাবে তাদেরকেই এ প্রগতিশীল শ্রেণীর লোকেরা বলবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, Conservative, Backward.

এমন কেন হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তরে আর কিছু না বলে শুধু এই মন্তব্য করা যায় যে ভারত, বিশেষ করে বাঙ্গালী ইংরেজী সভ্যতা (মূল সভ্যতা নয়; বাইরের চাকচিক্য) এবং শিক্ষাটাকে মূল ইংরেজী শিক্ষা নয়, ইংরেজদের দ্বারা কাজ হাসিল করবার প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত করা) এমন ভাবে গ্রহণ করেছে দুনিয়ার সমস্ত কিছুই সেই তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার রঙ্গিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখে। ফলে, আমাদের নিজেদের ও যে একটা আদর্শ আছে এবং তাহার বৈশিষ্ট ও ঐতিহ্য আছে তা দেখতে পায় না। শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা কেবল নানা দিক থেকে দাসত্ব করবার শিক্ষা। বিদ্যালয় ক'রে লেখা পড়া শিখিয়েছে তাদের শাসন কার্যের হিসেব নিকেষ রাখবার জন্যে, কিন্তু হাতে কলমে কি করে স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যায় তা' শেখায় নি। শিখিয়েছে, 'খাবার পর নিয়মিত মদ্য পান করলে শরীরের মালিন্য দূর হয়, কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গালার জলবায়ুতে এরূপ ব্যবস্থার খুব বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ক্ষতি আছে যথেষ্ট। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হ'বার ফলে আমরা কোনও উপকৃত হই নি সে কথা বলা অন্যায় হ'বে। ইংরেজী সভ্যতায় অনেক কিছু জানবার, দেখবার ও গ্রহণ করবার আছে, যা থেকে আমরা যথেষ্ট লাভবান হ'তে পারি। কিন্তু যা ভাল, যা মঙ্গলকর সেটা আমরা গ্রহণ করতে চাই না এক আনাও অথচ যেটা খারাপ সেটা সতের আনা নিতে পারলে যেন কৃতার্থ হ'য়ে যাই। এটা অতি প্রচলিত কথা যে 'যত্ন করলে রত্ন মেলে'। অর্থাৎ ভাল বস্তু পরিশ্রম ও আয়াস সাধ্য। আমাদের জাতি ও সমাজ এত আলস্য পরায়ন যে আয়াসসাধ্য কাজ করতে রাজী নয়। অনায়াসে যা' পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট। তাতে যদি সর্বনাশও হয় ক্ষতি মনে করে না। আসলে এটাতো অতি সত্য কথা যে, ইংরেজ কোনও দিন চায় নি যে, ভারতবর্ষ সত্যিই একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হউক। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতে শাসন ও শোষণের জন্যে এসেছিল, ভারতকে উন্নত, জাগ্রত করতে আসে নি। কাজেই ওদের কাজ চালাবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দেয়নি। একটা জাতি এরূপ অতি নগণ্য দানকে যদি কোন জাতি, কোনও সমাজ প্রগতির চরমতায় মনে করে, উৎকর্ষতার চরম সীমা মনে করে, সে জাতি, বা সে সমাজের আর কতটুকু আশা কতটুকু ভরসা?

নকল করা প্রগতি মেরুদণ্ডবিহীন মাংসপেশীবৎ অচল, জড়, তার পরিবর্ত্তন নেই, পরিবর্দ্ধন নেই। মৌলিকত্ব বিহীন কোনও বিষয়ের কোন মূল্য নেই। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান প্রগতি মৌলিকত্ব বিহীন, বৈশিষ্ট বিহীন। কেবলমাত্র বাহ্যিক। আহারে-বিহারে, বেশ-ভূষায় আমরা প্রগতিশীল হচ্ছি। মনের দিক থেকে আমাদের সমাজ এক চুলও এগুচ্ছেনা, ফলে প্রগতির ভিত্তি অত্যন্ত হালকা থেকে যাচ্ছে। যে কোনও সময় ভেঙ্গে পরতে পারে। মানুষ আজ পরস্পর মারামারি, হানাহানিতে উন্মত্ত। কে কার মুখের অন্ন কেড়ে খাবে সে চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত। পরের জন্য স্বার্থ বলি দিয়ে জীবন মন সমস্ত দেবার কথা যেন আজ ভাবতেই পারে না। তার পরিবর্ত্তে বরং নিজ সুবিধের জন্য পরের স্বার্থ এমন কি অপরের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। মোটের উপর প্রগতি

প্রগতি বলে আমরা যতই গলাবাজি করি না কেন, হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ সাধন না হ'লে সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'বে। যদি সত্যিকারের প্রগতিশীল সমাজ বলে পরিচিত হ'তে হয় তবে বাঙ্গালীকে ভারতীয় আদর্শের উপর, ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্টের উপর ভিত্তী ক'রে গড়ে তুলতে হ'বে সমাজকে। অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত সোনাকে পোড়া ও সোহাগা জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করে আগুণে পোড়ালে যেমন খাঁটি সোনাটি পাওয়া যায়, বাঙ্গালী সমাজের নিজস্ব রীতি নীতি, জীবন যাত্রার পদ্ধতি, অশন-বসন, গতি বিধির ধারাকে বীর্যশক্তি সম্পন্ন বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পুড়িয়ে নিলে কুসংস্কার প্রভৃতি সামাজিক ভেজালগুলো দূর হ'য়ে এক শক্তিশালী, সুন্দর সমাজের সৃষ্টি হবে। ভারত একদিন জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ, কোনও দিক থেকেই হীনবল ছিল না। বাঙ্গালার সিংহশিশু বিজয়সিংহ একদিন কেবল মাত্র সাতশত বাঙ্গালী সেনা নিয়ে সিংহল জয় করেছিল। বাঙ্গালার শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর একদিন দুরতিক্রম্য হিমালয় অতিক্রম ক'রে তিব্বত, চীন, প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় কৃষ্টির প্রচার করেছিল। বাঙ্গালার সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির প্রাধান্য প্রমাণ করেছিলেন। সে কি নিজ আদর্শকে পরের পায়ে বিসর্জন দিয়ে? বেশ ভূষা সম্বন্ধে কথা উঠলেই অনেকে অসুবিধা মূলক ওজর আপত্তি তোলে। অনেকে বলে কাপড়ের চাইতে প্যান্টালুন অনেক সুবিধাজনক। উহা পরিধানে একদিকে যেমন কাজ কর্ম করতে সুবিধে হয় অপর দিকে চলা ফেরায় অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এসমস্ত ধারণা মনের একটা রোগ মাত্র। মানুষ অভ্যেসের দাস। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে সাধারণ পোষাক হিসেবে প্যান্টালুন প্রবেশ করে। সরকারী আফিসের বড় কর্তাদের অনুকরে পরবার জন্য বড় বাবুরা কোট প্যান্টালুন পরতে সুরু ক'রে দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে নকলপ্রিয়তা ও তৎকালীন প্রভুগোষ্টিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সকল শ্রেণীর লোক উহা ব্যবহার করতে সুরু করে।

অনেকে আবার ইহার সপক্ষে অর্থনৈতিক কারণ দর্শান। বলেন কাপড়ের অপেক্ষা প্যান্টালুনে খরচ অনেক কম। একথা সত্যি কি মিথ্যে সে নিয়ে বিচার বিতর্ক করে লাভ নেই। এঁর মিমাংসা করতে গেলে অনেক কোন্দল করতে হবে। সে কোন্দল বাদ দিয়ে তাদের নিকট এটাই প্রশ্ন যে, সস্তা দরে পেলেই সমস্ত বস্তু কিনতে হবে? যাহারা বলেন চলাফেরায় প্যান্টালুন সুবিধে, কাপড় চাদর একটা জঞ্জাল বিশেষ তাদেরকে কেবল ছত্রপতি শিবাজী এবং তাঁর ঝটিকা বাহিনীর কার্য ক্ষিপ্রতা এবং তৎসঙ্গে তাদের মালকোচা করা কাপড়ের বেশটার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা যায়। যদি কেউ বলে 'কোট প্যান্টুলান আন্তর্জাতিক পোষাক। নানা প্রকার তথ্য জানবার জন্যে দেশ বিদেশে ঘুরতে হলে এ পোষাক ব্যতিত গত্যন্তর কি? তাদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু স্বামী বিবেকানন্দের গেরুয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর খদ্দরের পোষাক এবং তৎসঙ্গে তাঁদের কার্যকলাপের কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করা যায়; বেশ ভূষার কথা কেবল মাত্র উপমা স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে এরূপ আত্মঘাতী কার্যকলাপ বহু আছে, এবং এর ফলেই আমরা সর্বপ্রকারে আপন সত্তাকে আপন বৈশিষ্টকে অপরের পায়ে বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা হ'তে চলেছি। সমাজকে যদি দীর্ঘজীবি করে রাখতে হয় তবে বাহ্যিক চাল চলন আহার বিহার, অশন বসনের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন করতে হ'বে। নচেৎ কবি অতুল প্রসাদ সেনের,—"ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" বাণীর সার্থকতা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব

শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ,

আমাদের এই ক্ষুদ্র সহরে আপনাদিগকে স্বাগত জানাইতেছি।

আপনাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে পারি এমন সঙ্গতি আজ আর আমাদের নাই। আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়াছে। আপনারা আমাদের সকলপ্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

জটিল ও গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে আজ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের বুক ভাঙ্গা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আজ আকাশ বাতাস ভারাতুর। মানুষ আজ তাহার প্রিয় বাসভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। বন্ধুত্ব প্রেম প্রীতি মানুষের এই সহজাত হৃদয় বৃত্তিগুলি আজ স্তব্ধ। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে তাহার কোন ঠিকানা নাই। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তব সংঘাতে মানুষ আজ অতলে তলাইয়া গিয়াছে। আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এক মোটা অংশ ভিক্ষুকের অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে চলিয়াছে। এই দুঃখের অবসান কোথায় এবং প্রতিকার কি তাহাই বর্ত্তমানে একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীর জীবন হইতে এই অভিশাপ দূর করার জন্য যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত এবং চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে অন্ধ-নিরপেক্ষভাবে বাঙ্গালীকেই বাস্তবতার ভিত্তিতে সেই প্রায়শ্চিত্ত এবং চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে।

পরিতাপের বিষয় এই যে বাস্তব পরিস্থিতির অনন্যোপায়তা আজ প্রায় সকলকেই সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মূল্য-মানে পরিবেশের মূল্য নিরূপণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া আজ রাষ্ট্রীয় চেতনা মূর্চ্ছাহত। ইহার প্রতিকার স্বরূপে এ যাবৎ যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহার মূল মর্ম্ম ইহাই ধারণা হয় যে আমাদের এবং অপর রাষ্ট্রের সামাজিক মন হইতে প্রচলিত সংখ্যা নিরূপণ যন্ত্রটী মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হইতেছে। এক মতে সমাজদেহ হইতে এই সংখ্যাতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিল ব্যাধি এবং উহার সমুদয় উপসর্গ দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে লোক বিনিময়ই একমাত্র উপায়, তাহা যতই সময়সাধ্য এবং কষ্টসাধ্য হউক না কেন। অন্য মতে লোক বিনিময় ব্যাপারে যে সময় প্রয়োজন এবং এই সময় মধ্যে অর্থক্ষয়, লোকক্ষয় ইত্যাদি বহু প্রকার ক্ষয় ক্ষতি ঘটিয়া সমাজদেহে যে দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইবে তৎ-বিবেচনায় লোক বিনিময় গ্রহণযোগ্য নহে। এই মতা-বলম্বীরা মনে করেন যে বরং ঐ সময় মধ্যে কিছু পরিমাণ মূল্য দিয়া হইলেও যদি সংখ্যাগুরুর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটান সম্ভবপর হয় তবে তাহাই সমধিক কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের মতে একমাত্র হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারাই স্থায়ী প্রতিকার লাভ করা সম্ভব। এই দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের এবং অপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কবর্গ সংখ্যা-লঘু চুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সাম্প্রতিক এবং অতীত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রস্তাব আমরা পাকিস্তানবাসী সংখ্যালঘুগণ কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা এই সংখ্যালঘু চুক্তিদ্বারা আমাদের সম্মুখে যে বাস্তব নেতৃত্ব তুলিয়া ধরিয়াছেন এই দেশবাসী সকলেই এই চুক্তির আক্ষরিক এবং মর্ম্মগত বিধানসমূহ সর্ব্বান্তকরণে সফল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবেন।

সংখ্যালঘু চুক্তি সফল করার প্রধান দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর ন্যাস্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মান মর্য্যাদা ধনপ্রাণ কৃষ্টি ও জীবনোপায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে রক্ষা করার পবিত্র এবং নৈতিক দায়িত্ব যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন তবে অচিরেই তাঁহাদের কথায় এবং কার্য্যে তাঁহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন প্রতিফলিত হইয়া উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাস্তুহারাগণ স্ব স্ব বাসভূমিতে ফিরিয়া আসিতে উৎসাহ বোধ করিবেন। কিন্তু কেবল-মাত্র সংখ্যাগুরুগণের কর্ত্তব্য সম্পাদনদ্বারা সংখ্যালঘুগণের

কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। সংখ্যালঘু চুক্তিদ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের শিথিলতা দূর করিতে হইবে এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্ভাত ক্লৈব্য সর্ব্ব প্রযত্নে পরিহার করিতে হইবে। বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজকে স্ব মর্য্যাদায় এবং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দৃঢ়তার সহিত সকলেই স্ব স্ব অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা করিলেই সমীকরণের পথে প্রশস্ততর এবং কল্যাণজনক সার্ব্বজনীন অধিকার সৃষ্ট হইয়া রাষ্ট্রের এবং সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অন্তর্ভূত হইতেছে। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আশাভঙ্গের কারণগুলি দূরীভূত করিয়া আমাদিগকে পাকিস্তানের পূর্ণ নাগরিকস্বরূপে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে প্রতি জিলায়, প্রতি মহকুমায় এবং অন্যান্য স্থানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্থানীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান গঠন ও স্থাপন করা আবশ্যক মনে হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং সহায়করূপে কার্য্য করিয়া সংখ্যালঘুগণের মন হইতে ভীতি আতঙ্ক ও নৈরাশ্য দূর করিয়া তাহাদিগকে আত্মমর্য্যাদায় এবং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন এবং সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে সংখ্যালঘুগণ কতকগুলি অস্বচ্ছন্দতাজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। গুরুতর সাংসারিক ও আর্থিক প্রয়োজনেও সংখ্যালঘুগণ নানা বাধাহেতু তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ইচ্ছামত বিক্রয়াদি করিতে পারিতেছেন না। সংখ্যালঘুগণের ঘরবাড়ী নানা অজুহাতে হুকুম দখল হইতেছে। সংখ্যালঘুগণের বাড়ীর ফলপসারী গাছ বাঁশ এবং পুকুরের মাছ যে কেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দেখিয়াও আপত্তি করার মত বল পাইতেছেন না। আমাদের বিষয় সম্পত্তির উপস্বত্ব লাভ করিতে এবং ভোগ করিতে নানা অবস্থায় নানা কারণে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। সংখ্যালঘুগণের জীবনোপায়ের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিভিন্নমুখী কারণে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষ্টির পরিপন্থী নবনীতি প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ্য পুস্তকাদিতে তাহা প্রতিফলিত হইতেছে। আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারিগণ দেশব্যাপী বিপর্য্যয়ের সূচনা করিতেছে এবং এমন কি সংখ্যা গুরুগণও এই বিপর্য্যয়ের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে অনেক সময়ে গভর্ণমেণ্টের আদেশগুলিও মফঃস্বলের প্রয়োগক্ষেত্রে ব্যাহত এবং বিলম্বিত হইতেছে। সর্ব্বত্র সংখ্যাগুরু অভিমুখী এক ব্যাপক ভাবধারা প্রবহমান দেখা যাইতেছে। এই সমস্তই আপনারা সবিশেষ অবগত আছেন বিধায় এ ক্ষেত্রে মাত্র আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম। আপনাদের মূল্যবান সময় আর অধিক অপচয় করিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা নেতৃবর্গ আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের এই সম্মেলন দ্বারা বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের যোজনা হইবে। আশা করি এই সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এমন নির্দ্দেশ দিবেন যাহাতে তাহারা সুসংহত স্বাধিকার প্রবুদ্ধ হইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতিশীল নাগরিক হিসাবে বিশিষ্টতা ও কৃষ্টি সংরক্ষণপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে।

পরিশেষে আপনাদিগকে পুনরায় আমাদের সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাইতেছি।*

---

*ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অভিভাষণ।

আত্মবীক্ষা চাই

মন্মথগোপাল সেনগুপ্ত

ছোট বড় নির্ব্বিশেষে যে কোন লোকই যদি তাঁর জীবন কি ভাবে ধাপে ধাপে সূচনা থেকে পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন ত তা জিনিষ হিসাবে মূল্যবান না হয়েই পারে না। একটা জীবন, সে যতই ক্ষুদ্র হ'ক, যে সমস্ত আঘাত-সঙ্ঘাতের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে এসেছে, যে সমস্ত বিঘ্ন-বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে টিঁকিয়ে রেখেছে—যে সব আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্নের চিন্তা, উদ্দীপনা ও আবেগের প্রভাবে তার বহু বিচিত্র রূপান্তর হয়েছে...পরের পর সাজিয়ে তার ইতিহাস উপস্থিত করা হ'লে, সে ইতিহাস হৃদ্য ও সর্ব্বজন গ্রাহ্য হবেই, যেহেতু একজনের আয়নায় যে সেখানে প্রতিফলিত হয় বহু জনের জীবন—এমন কি, বলা যেতে পারে, সর্ব্বজনের জীবন।

একেবারে জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে জগৎ, জীবন ও সংসারের রূপটা কি ভাবে চোখের ওপর একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হয়েছে—এক দিকে এসেছে জাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ঘা, লোভ, লালসা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি, অন্যদিকে জাগতিকতাকে অতিক্রম করে যাবার যা অনুপ্রেরণা, রসবোধ, শিল্পবোধ, প্রেমবোধ, এবং দুইয়ের সমমাত্রিক টানা-পোড়েনের ভেতর দিয়ে জীবন প্রবাহিত হয়ে গেছে ঘাঠ ঘাট অতিক্রম করে যাওয়া উপলা প্রতিহত নদীর মতো...এ যদি ধাপে ধাপে এঁকে যাওয়া যায়, তাহলে যে কোন মহাজনের সঙ্গে যে কোন অজ্ঞাতজনের জীবনে কতকগুলো মূলগত ঐক্য দেখতে পাবেই। এই ঐক্যের মানুষকেই বলা যেতে পারে বিশ্বমানব—যার জন্যে নেই কোন ভৌগোলিক সীমানার প্রশ্ন!

কিন্তু বিপদ এই যে নিজের যে জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছি, ধাপে ধাপে, পায়ে পায়ে, পিছু হঠতে হঠতে, নিজেই ফিরে যেতে পারি না আর সেই পথযাত্রার আদি উৎপত্তিতে। মাঝখানে জমেছে অনেক দোঁয়া, অনেক ধুলো, যা আচ্ছন্ন করেছে স্বচ্ছ দৃষ্টিকে—যে নিয়ে উঠেছে রুচি-অরুচির, মতামতের উত্তাল তরঙ্গ, যা অবিচ্ছেদ্য ক'রে ফেলেছে সহজ বিচার বুদ্ধিকে...কাজেই আজকের মন নিয়ে আঁকলে যখন সেদিনের জীবনকে, তখন অনিবার্য্য ভাবেই তা হবে সেদিনের পটভূমিতে ফেলে, আজকের জীবনকেই চিত্রিত করা। সেদিন চলে গেছে, তার ভাবস্মৃতিও মুছে গেছে সেই সঙ্গেই.. এ অস্বীকার করে ত লাভ নেই!

এর ওপর আছে আর এক বিপত্তি—নিজ অন্তরের কাছেও যে নিজে চোর হই আমরা! যাকে বলে ভাবের ঘরে চুরি করা...তা যে করি পদে পদেই! তাই ত যেখানে যেখানে করেছি অন্যায়, অনাচার, হয়েছি সৎপথ ও সদাচারের আদর্শ থেকে স্খলিত, আমাদের স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর দিয়েছে হয় বিস্মৃতির প্রলেপ মাখিয়ে, নয়ত নব ব্যাখ্যায় তৃণ গুল্ম সাজিয়ে...যাতে নিজের মনের কাছেই খুঁজে পাই একটা সমর্থনীয় সাফাই! স্মৃতি বা বিস্মৃতির এই শিল্প-নিপুণতাও আত্ম নিরীক্ষার পথে মস্ত একটা বাধা...এ চেপে ধরে নিজের দিকে তাকাবার মতো মুক্ত দৃষ্টিকে। অর্থাৎ আত্মবীক্ষা মূল্যবান জিনিষ এবং তা করতে হলে, হওয়া চাই আত্মস্থ। নিজের মনের অন্ধকার অতলে ডুব দিয়ে চলে যান উজান ঠেলে একেবারে গোড়ার সোপানে—পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ, শুচি অশুচিকে দেখুন এক নির্মুক্ত নৈর্ব্যাজীব দৃষ্টিতে... যেন অন্যের জীবনকে দেখছেন তাহলেই ঠিক চিনতে পারবেন আপনার অতীতকে। এই পরিচিতি নিজের জন্যে, দুনিয়ার জন্যে নয়...এ বোধ জাগ্রত রেখে, এর পর লিখে যান এক এক করে। দেখবেন, কঠিন হলেও, অসম্ভব নয় নিজেকে নিজে দ্রষ্টা ও দর্শনীয় রূপে বিচার করা। এই দ্বৈত দর্শনকেই শাস্ত্র বলে ধ্যান, বিজ্ঞান বলে আত্মজিজ্ঞাসা—জীবন বিচারের এই হল সর্ব্বোত্তম প্রাপকাঠি।

সিন্ধুর ডাক

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মহা সিন্ধুর উত্তাল বক্ষে, সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্যটা। উত্তাল জলরাশির ঘননীল বক্ষে পড়েছে তার রক্ত প্রতিচ্ছবি। ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু সঞ্চালনে সিন্ধু সূর্যকে ডাকছে, "এস এস, আমার সঙ্গে পাড়ি দাও অনন্তের পথে।" উত্তাল সিন্ধু—নবোদ্ভিত সূর্যকে ডাকছে।

সূর্যশরণের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল বেশ বেলা হয়েছে। সকলে ঘুমের থেকে উঠে পড়ছে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ও উঠল না কে যেন জোর ক'রে ওকে বিছানায় বসিয়ে রাখল। কেননা ওর চোখ থেকে তখনও ঘুমের জড়তা কাটেনি। এবং তার সঙ্গে জড়ানো ছিল ওর ভোর রাত্রে দেখা অপূর্ব সিন্ধু-স্বপ্ন। ওর এই এগারো বৎসর বয়সে ও কোনদিন সমুদ্র দেখেনি। তবে সমুদ্র দেখার ওর ভারী সাধ। কাজেই স্বপ্নে সমুদ্র দেখে ও কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছে না।

কাকীমা বাইরে থেকে ডাকছেন, "ওরে সূর্য, আর কতক্ষণ ঘুমাবি, এবার ওঠ"—

ভৃত্য গৌর এসে ডাকল, "খোকাবাবু ওঠ, ছোটবাবু বাইরে ডাকছেন। পণ্ডিত মশাই এসেছেন"—

"দুত্তোর ছাই পণ্ডিত মশাই। পূজার সময়ও এ বাড়ীতে পড়তে হবে। ছুটি নেই।" কাকার আহ্বান এসেছে, আর শুয়ে থাকা চলে না। বিরক্ত হয়ে গজ গজ করতে করতে সূর্য বিছানা ছেড়ে উঠল। উঠানে কাকীমা কমলার সঙ্গে দেখা হোল। তিনি ওর বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "মুখ ধুয়ে আয়; আজ একটা ভাল জিনিষ খেতে দোব"—

কমলার দিকে না তাকিয়ে, সূর্য দাঁতে নিমকাটী লাগিয়ে সোজা ঘাটে চ'লে গেল। ঘাটে তাঁতীর সঙ্গে দেখা হোল না। মনটা আরও বিগড়ে গেল। এমন আশ্চর্য স্বপ্নটা কারুর কাছে না বললে যেন মনের অস্বস্তিটা কিছুতে কমবে বলে মনে হয় না। কাকীমার ত এখন শোনার সময় নেই; এক সন্ধ্যা ছাড়া। আর কাকাকে ও ত বাঘের মত ভয় করে। কাজেই বিরক্ত মনে ঘাটের থেকে ফিরে এসে ও রান্নাঘরের দাওয়ায় আসন পেতে বসল। কাকীমা তোলা উনুনে ঘি তৈরী করছিলেন। ওকে দেখে বললেন, "তোর খাবার ওই জলের তাকে রেখেছি—। নাবিয়ে নিয়ে খা সূর্যি; আমি আর এ কাপড়ে ছোঁবনা বাইরের জিনিষ—"

সূর্য তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাল। লাল পাড় গরদের শাড়ী পরে পিঠে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে কমলা উনানের ধারে বসে কড়ার মাখনের ডাল ছাড়ছেন—! মাঝে মাঝে কাঠের হাতা দিয়ে কড়ার ঘি নেড়ে দিচ্ছেন। কয় মিনিট তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সূর্য বললে, "হ্যাঁ, নিজেরা সব পূজোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, আর আমাদের একদিনও ছুটী নেই। কাল পূজো আজও পড়তে হবে"—

কমলা তার লক্ষণ দেখে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন তার মনোভাব। তিনি ভেবেছিলেন নতুন খাবার দিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখবেন ওর ছুটী না পাওয়ার দুঃখকে। কেন না, সূর্যর কাকা কৃষ্ণশরণের সংস্কৃত শিক্ষার উপর অত্যন্ত ঝোঁক। তাঁর ধারণা যত প্রকার ভাষা শিক্ষা করনা কেন, সংস্কৃত না শিখলে সে শিক্ষার কোনও সার্থকতা থাকে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আমাদের আদি ভাষা, দেব ভাষা, বেদের ভাষা সংস্কৃতকে অত্যন্ত কোনঠেসা ক'রে দিয়েছে। তাই তিনি সূর্যকে বাড়ীতে পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত শেখাচ্ছেন অতি যত্ন সহকারে। পূজার আর দুদিন বাকী। কিন্তু সূর্য এখনও ছুটী পায়নি তার পণ্ডিতমশাইর কাছে। কমলা সবই জানেন। কিন্তু স্বামীর কোন কাজ বা ব্যবস্থাকে তিনি অসঙ্গত বা অবান্তব বলে মনে করেন না। তাই তাঁকে এ বিষয় কিছু বলা সঙ্গত মনে করেন না।

তিনি উনানের কাছ থেকে উঠে এসে সূর্যর সামনে খাবারের থালাটা নামিয়ে দিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, "আজকের দিনটা পড়ে নাও বাবা, কাল পঞ্চমী, কাল থেকে তোমার ছুটী"।

সূর্য চার পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, একি করলে, আমায় ছুঁয়ে ফেললে যে? তোমার কি কিছু মনে থাকে না, পুজোর কাজ করছিলে যে?"

সূর্যর মাথাটা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, আবার তখনি ছেড়ে দিয়ে কমলা বললেন, "না আমার কিছুই মনে থাকেনা। তোমার জন্য কিছু মনে রাখার কি উপায় আছে?"

সূর্যর যেন কান্না পেয়ে গেল। সকাল থেকেই ওর দিনটা খারাপ যাচ্ছে। কমলার মুখের দিকে না চেয়ে ও বললে, 'তুমি ঘাটে যাও কাকীমা। কাপড় কেচে এস। আমি ততক্ষণ তোমার ঘিয়ের উনানের জাল দেখছি"। কমলার চোখ দুটী স্নেহরসে ভরে উঠল। তিনি বললেন, "না রে তোর ছোঁয়া লাগলে পূজার কাজ কিছুই নষ্ট হবে না। এখন তুই খেয়ে নে দেখি। আমি বসছি কাছে"—

সূর্যর মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল। যাক্ কাকীমাকে অন্ততঃ সে কোনও বিপদে ফেলেনি। থালাখানি টেনে নিয়ে খাবার মুখে তুলে কমলার দিকে ভালো ক'রে তাকাল। থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন। সূর্য মিষ্টি খেতে বড় ভালোবাসে। কাজেই ওর মন আরও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে বললে, "জান কাকীমা, আজ ভোর রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম?"

কম্পিত বিস্ময় চোখে ফুটিয়ে কমলা "সে কি রে?"

সূর্য বললে, "হ্যাঁ কাকীমা, সে ভয়ঙ্কর এক মহাসিন্ধু। কি প্রচণ্ড তার গর্জন। কি টক্‌টকে নীল তার জল। সেই জলের মধ্যে থেকে সূর্য উঠছে লাল টক্‌টকে, ঠিক তোমার বঁটীখানার মত গোল"।

কাকীমা বললেন, "সত্যিরে? তাহলে তোর পুণ্যি আছে বলতে হবে। সমুদ্র দর্শন ত সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। একবার যাব মুনি আমাতে তোতে, বুঝলি? পুরীর সমুদ্রধারে"—

হ্যাঁ কাকীমা যেতেই হবে। সূর্য চোখ বড় ক'রে বললে, "স্বপ্নের মধ্যে আমার মনে শুধু হচ্ছিল, সিন্ধু যেন আমায় ডাকছে। আমার বড্ড ভয় করছিল কাকীমা"—

"পাগলা ছেলে; ভয় করবে কেন?" কমলা হেসে বললেন, "বড় হলে তোকে ওই সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশে পাঠাবেন, তোর কাকা আমায় বলেছেন। বেশ্‌বি সে সব দেশ কতবড়, কত উন্নত, কত শিক্ষিত, কত ধনী। তাইত তোকে এত করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

লেখাপড়ার কথায় সূর্যর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। সে সিন্ধু দেখতে চায়, কিন্তু সে লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে নয়। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখলে বোধ কি? সে বললে, "দাঁড়াও না কাকীমা। আমি আগে বড় হয়ে নিই; তারপর দেখোনা, তোমায় নিয়ে যাবো ওই সিন্ধুতীরে। দেখো সে কি অদ্ভুত"—কমলা হেসে বললেন, "তুই যে আমার বাবা। বাবা কি মেয়েকে ফেলে কোথাও যায়?"

সূর্যর তখন খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে সলজ্জকণ্ঠে বললে, "ধোৎ তোমার ওই কথা শুনলে আমার বড় লজ্জা করে"—

কোঁচার খুঁটে হাত মুছতে মুছতে ও উঠানে নেমে বার বাড়ীর দিকে চলে গেল। কমলাও উঠে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে উনানের ধারে গিয়ে বসলেন। কড়াতে মাখমের রং ফুটে ফুটে তখন বাদামী হয়ে এসেছে। এবার নামাতে হবে। কমলা ঘিয়ের কড়া নামিয়ে, দুধের কড়া চড়িয়ে দিলেন। এখন চন্দ্রপুলি গড়তে হবে — পুজোর কটা দিন সব রকম জিনিষই ঘরে রাখতে হয়। কমলার মনে পড়ে গেল সূর্যর কথা। একটু আগে সে বলে গেছে, সকলেই পূজার জন্য ব্যস্ত শুধু সেই কিছু করতে পারছে না। কতখানি অভিমানের কথা। না না, আজই পণ্ডিতমশাইকে বলতে হবে, কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত সূর্যকে ছুটী দিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় পরিচারিকা লক্ষ্মীকে ডাক দিলেন। লক্ষ্মী এলে তাকে কথা কটী বলে বার মহলে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দুধ ততক্ষণে ফুটে উঠেছে, এবার ছানা কাটতে হবে। কমলা কাজে মনোনিবেশ করলেন।

বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর। তক্তাপোষের উপর ফরাস পাতা। মেঝেতে আজিম পাতা। সে ঘরের দেয়ালে

আধুনিক বা পৌরাণিক কোনও ছবি দেখা যায় না। তবে সেখানে অন্য প্রকার দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। যা দেখে অপরিচিত ব্যক্তি সহজেই অনুমান করতে পারে যে, চৌধুরী বংশ অতি প্রাচীন শাক্ত বংশ। এবং কৃষ্ণশরণের পূর্ব-পুরুষগণ বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। ঘরের সামনে দেয়ালে একটী বিরাট খড়্গ ঝোলান আছে। তার শীর্ষদেশে মস্তবড় সিঁদুরের ফোঁটা। কৃষ্ণশরণ রোজ স্নান করে এসে গায়ত্রী জপের পূর্বেই, সেই খড়্গকে প্রণাম করে তার সিঁদুরের রক্ত তিলকে নূতন ক'রে স্মরণের প্রলেপ দেন। কাল খড়্গের বুকে সিঁদুরের রক্ত বিন্দু ধ্রুব ধ্বক করে জ্বলে, ঠিক যেন কৃষ্ণশরণের পিতৃ পুরুষগণের রক্ত-আঁখির শাসন বহ্নির শাশ্বত সাক্ষর। তারপর ঘরের সমস্ত দেয়ালে, মোষের মাথা সমেত সুবৃহৎ শিং। হরিণের শিং সদৃশ চামড়া। হলদে গায়ে কালো ডোরা কাটা বাঘের চামড়া। চোখের মণি দুটো এখনও জ্বল জ্বল করেছে। তবে সে হিংস্রতার নয়, এ্যাসিডের প্রক্রিয়ার। বিরাটাকার শ্বেত শুভ্র হস্তী দন্ত। যে জিনিষ বিখ্যাত কোনও যাদুঘরেও নেই। তারপর সাপের খোলস সজারুর কাঁটা ইত্যাদিত' আছেই। বিখ্যাত শিকারী চৌধুরী বংশ কোনও দিন পাখী শিকার করেনি। তাই সেখানে কলাকুশলী বিহঙ্গের কোন নিদর্শন নেই। এ যেন চৌধুরী বংশের ছেলে সূর্যশরণ এই বালাখানায় প্রবেশ করতে ভয় পায়। এইটাই কৃষ্ণশরণের সাম্প্রতিক মনোবেদনা। ছেলেটা কি মানুষ হবে না? ওর রক্তে কি এই বংশের ঐতিহ্য এখনও জাগেনি? বারো বছর বয়স হোল, এখনও যদি, না জাগে তবে আর কবে জাগবে? তবে কৃষ্ণশরণ এটাও লক্ষ্য করেছেন, সূর্যর রক্তও শান্ত নয়। তবে তার রূপ স্বতন্ত্র। তার স্বভাবটা কেমন যেন আন্মনা। পুরাতনের প্রতি ওর লেশমাত্র আসক্তি নেই। উপরন্তু নূতনের দিকে দুর্বার আকর্ষণ। কৃষ্ণশরণের মনে আশঙ্কা হয়, তবে কি ওর দ্বারা এই বংশে বৈভব রক্ষা হবে না? কিন্তু না হয়ে উপায় নেই। চৌধুরী বংশের বংশধরকে রক্ষা করতেই হবে, তার সুপ্রাচীন বংশ মর্য্যাদাকে। তা না হলে মা ভবানীর শাপে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই তিনি অত কঠোর ভাবে সূর্যের তত্ত্বাবধান করেন। ওই ত বংশে বাতী দেবার প্রতীক। মা ভবানী ওদের বাস্তুর জাগ্রত বিগ্রহ। মায়ের আদেশ, তাঁর মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবে চৌধুরী বংশেরই কোনও পুরুষ। নারী নয়। কিন্তু কৃষ্ণশরণের অবর্ত্তমানে সূর্যশরণকেই এই ব্রত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, সূর্য আজও ভবানীর মন্দিরে প্রবেশ করতে ভয় পায়। তাঁর নিজেরও কোনও সন্তান নেই। কাজেই কৃষ্ণশরণ ভবিষ্যতের চিন্তায় সর্বদা চিন্তিত থাকেন। এবং সূর্যকে বংশের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণশরণের ফরাসের একাংশে বসে সূর্য মাথা নীচু করে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করছে। কৃষ্ণশরণ উন্মুক্ত জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর গৃহ সীমানার বিশাল বিস্তৃতির একাংশে দেখা যাচ্ছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সুউচ্চ একটী মন্দির চূড়া। রং তার এককালে হয়ত সাদা ছিল। কিন্তু রৌদ্রে পুড়ে, জলে ধুয়ে এখন তার কোনও রংই চোখে পড়ে না। মাথার উপর পিতলের ত্রিশূলের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ওই চৌধুরী বংশের বিখ্যাত মা ভবানীর মন্দির। ওই মন্দিরের দিকে তাকালেই তাঁর অগ্রজ জ্ঞানশরণের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। সমস্ত দিন তাঁর মন্দিরেই অতিবাহিত হোত। প্রথম জীবনে তিনি বিবাহও করেন নি। পিতা বিষ্ণুশরণ পুত্রের গতিক দেখে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলেন এ ছেলেবার নয়। তাঁর জ্ঞান মায়ের দৃষ্টিতে পড়েছে। মনে মনে তিনি তাতে খুশীই হয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণ-শরণের অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়ে সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই কৃষ্ণশরণ আজ চৌধুরী বংশের উপযুক্ত বংশধর। সাধক এবং সংসারী তিনি একযোগে দুই ধর্মাবলম্বী।

কৃষ্ণশরণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত দিনের একটী জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যার বিষণ্ণ দৃশ্যপট। ভবানীর

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে। পূজার বেদীতে তখনও ঘিয়ের প্রদীপ নিবে যায়নি। ধূপ জ্বলছে। পঞ্চমুণ্ডী জবা আর রক্তগোলাপের গন্ধে চন্দনের স্নিগ্ধতায় ছোট্ট ঘরখানি আমোদিত। কালো পাথরে খোদাই করা ভবানী মূর্তির অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রণামী ফুলের ভারে ঢেকে গেছে। শুধু উদ্যত হয়ে রয়েছে মায়ের হাতের সিন্দুর শোভিত খড়্গ খানি। কপালের ত্রিনেত্র প্রদীপের আলোয় ঝকঝক করছে। মায়ের ঠোঁটের প্রান্তে অপূর্ব হাসির রেখা। চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি; এলো চুলে অমাবস্যার অন্ধকার। তাঁরই পদপ্রান্তে পাথরের মেঝের উপর লুটিয়ে জ্ঞানশরণ প্রণাম করছেন। তাঁর দীর্ঘ দেহ থেকে থেকে মাটীর উপর জেগে উঠছে। এবং মাঝে মাঝে আত্মগতভাবে উচ্চারণ করছেন "মা, মাগো, ভবানী"—কৃষ্ণশরণের প্রণাম সারা হয়ে গিয়েছিল তিনি বাইরের বারাণ্ডায় বসেছিলেন। এমন সময় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল এক নারী মূর্তি। সর্বাঙ্গ তার সাদা চাদরে আবৃত। অস্ফুট কণ্ঠে বললে "আপনি কি বাবা জ্ঞানঠাকুর"?

কৃষ্ণশরণ বললেন, "না তিনি এখন প্রণাম করছেন মন্দিরের মধ্যে," কত দেরী হবে বাবা বলতে পার?" নারী শুধালে।

"সে তাঁর খেয়াল। সময়ের কিছু স্থিরতা নেই" কৃষ্ণশরণ বললেন।

এমন সময়ে "ভবানী ভবানী বলে" সুদীর্ঘ ডাক ছেড়ে জ্ঞানশরণ প্রণাম সেরে উঠে বাইরে এলেন। নারীমূর্তি বিস্মিত চোখে দেখল, এক গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ পুরুষ। তার সামনে দাঁড়িয়ে। কাপড়ে তাঁর রক্তচন্দনের ছোঁটা। চুল ছোট করে ছাঁটা। পরণে লাল তসর। বক্ষে বিলম্বিত শুভ্র উপবীত। কি প্রশান্ত মুখশ্রী। রমণী তাঁর পদ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বললে, "বাবা আমার বড় বিপদ। আমায় বাঁচান"—জ্ঞানশরণ নতনেত্রে তার পানে চেয়ে বললেন, "কি হয়েছে মা তোমার?" রমণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বাবা আমার মেয়েকে আর বোধ হয় রাখা গেল না। চিকিৎসকেরা জবাব দিয়ে গেছেন। এখন আপনি ভরসা"—জ্ঞানশরণ বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, "আমি কি করতে পারি, সব ওই ভবানীর ইচ্ছা"—

বাবা দয়া করুন—রমণী কাঁদতে লাগল। মেয়ে নিয়ে এসেছিলুম দেশে পূজা দেখতে। কিন্তু এখন সব বুঝি যায়।"

জ্ঞানশরণ উঠে মন্দিরের মধ্যে গেলেন। মায়ের পায়ের উপর থেকে সিঁদুর মাখা একটু বেল পাতা তুলে এনে তার হাতে দিলেন। বললেন, "এইটী ধুয়ে সেই জল তোমার মেয়েকে তিনবার করে খাইয়ে দাওগে মা। এ ছাড়া আমার আর কোনও ওষুধ জানা নেই"—রমণী তাঁকে প্রণাম করে চলে গেল। মন্দিরে অর্গল বন্ধ করে দুই ভাই বাড়ী ফেরার জন্য পথে নাবলেন। এমন সময় জ্ঞানশরণ বললেন, "তুই বাড়ী যা কৃষ্ণ, আমি একটু পরে আসছি। আমার মনে হচ্ছে মেয়েটা বাঁচবে না। দেখি একবার গিয়ে, যদি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র পড়ে তাকে উদ্ধার করতে পারি।"

কৃষ্ণশরণ ঘাড় কাত করে বললেন "আচ্ছা"—

জ্ঞানশরণ চাষী কৃষ্ণর হাতে দিয়ে অন্য পথ ধরলেন। ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে তার দীর্ঘ দেহ মিলিয়ে গেল। খড়মের শব্দ আর শোনা গেল না। কৃষ্ণশরণ তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সেই রমণী এসে জ্ঞানশরণকে নিয়ে যেতো। শোনা গেল তিনি স্বস্ত্যয়ন করছেন। একটী অপরিচিতা মেয়ের জীবনের জন্য এতখানি আত্মত্যাগ, এ বুঝি জ্ঞানশরণের মত সাধকের চরিত্রেই সম্ভবে।

একদিন দুপুর বেলা খেতে বসে জ্ঞানশরণ কনিষ্ঠকে বললেন, "ভবানীর ইচ্ছায় মেয়েটী এ যাত্রা থেকে বেঁচে গেল। তবে তার একটী চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

"চোখ? কৃষ্ণশরণ চমকে উঠলেন। বিবাহিত না, অবিবাহিতা মেয়ে দাদা?"

বিষণ্ণ মুখে জ্ঞানশরণ বললেন," খুব সম্ভব অবিবাহিতা"। একটু থেমে তিনি আবার বললেন "ওরা একেবারে

নাস্তিক। কিছুই মানে না। তবে মা'টী অত্যন্ত ভক্তিমতী"—

কৃষ্ণশরণ বুঝতে পারলেন—এদের সঙ্গে মিলে অগ্রজ মনে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি সান্ত্বনা ছলে বললেন, "আপনি আর ওখানে যাবেন না দাদা। এতে মনে ব্যথাই পাবেন। সহরের লোকেরা অমনিই হয়। বিশেষ ক'রে একটু পয়সা থাকলে ত আর কথাই নেই।"

না: আর যাবার কোনও প্রয়োজন নেই"। জান-শরণের গম্ভীর কণ্ঠ আরও গভীর শোনাল। তিনি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

তার কিছুদিন পরে একদিন কৃষ্ণশরণ দেখতে পেলেন, মন্দির প্রাঙ্গণে আর একটী নারী মূর্ত্তি। অপূর্ব্ব রূপসী তরুণী। মনে হয় যেন একটু গর্ব্বিতা।

(ক্রমশঃ)

রায় ঘাটোয়াল সুবা

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

যে লোকটি আমাদের গরুর তদারক করতো আর কুয়ো থেকে জল তুলে দিত সে লোকটি ছুটী নিয়ে বাড়ী যাওয়াতে আজ মাস খানেক ধরে বড় অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। একটাও ভাল লোক পাওয়া যাচ্ছে না; আনাড়ী এক এক জনকে ধরে আনা হচ্ছে —যে জল দিচ্ছে সে গরুর কাজ পারছে না আর যে গরুর কাজ জানে তার হয়ত সব জল দেবার মত ক্ষমতা নেই। দুদিন কাজ করেই তারা পালাচ্ছে। নিত্য নতুন লোককে কাজ বোঝাতে প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি এমন সময় একদিন চাপরাশী একজন লোককে নিয়ে এসে বললে: "এই নিন মা এ গরুর কাজও জানে ভাল, জল দিতেও পারবে—আর কোন তকলিফ হবে না আপনার।" চাপরাশীর পিছনে যে লোকটি ছিল সে এবারে সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। লোকটির বয়স প্রায় ৫০ এর কাছাকাছি—তাহলেও বেশ আঁটসাঁট গড়ন—এখনও যথেষ্ট বাঁধুনী আছে শরীরে; মাথায় একটি টিকি পাগড়ীর ভিতর দেখা যাচ্ছে, পরণে একখানি ৫ হাতী ধুতী মালকোচা করে পরা, হাতে মোটাবাঁশের একখানা লাঠী। লোক-টিকে দেখে আমার ভালই মনে হলো—কাজকর্ম্ম সব বুঝিয়ে দিয়ে মনে মনে বললাম "ভগবান এলোকটি যেন টিকে যায়।"

লোকটির নাম শুনলাম সুবা। তা সুবা কাজ বেশ ভালই করতে লাগলো। জলের জন্যও আর চেঁচামেচি করতে হয় না, দুধও যথা সময়ে যথা পরিমাণে পাওয়া যায়, গরুর সম্বন্ধেও নিত্য নানারকম প্রশ্নের চোটে অস্থির হতে হয় না। গৃহস্থালীতে আবার শান্তি ফিরে এল।

আমাদের গরুটির নাম কস্তুরী। সুবা আসবার দিনকয়েক বাদেই কস্তুরীর একটি বাছুর হলো, পূর্ণিমার দিন হয়েছে বলে সুবা মহা-উৎসাহে তার নাম রাখলো "পূর্ণিমা"। কস্তুরীর গত বছরেও একটি বাছুর হয়ে-ছিল—আমরা তার কোন নাম রাখিনি—সুবাই এখন তার নাম রাখলো লক্ষ্মী। পূর্ণিমা হবার পর থেকে কস্তুরী আর লক্ষ্মীকে মোটেই কাছে ঘেঁষতে দিত না —কাছে গেলেই শিং নেড়ে গুঁতোতে যেত; লক্ষ্মী সেই থেকে খালি সুবার পিছনে পিছনে ঘুরতো; সুবা যেখানে যেত সেও সেখানে যেত. সুবা যতবার জল আনতে কুয়োতলায় যেত লক্ষ্মীও ছুটতো তার সঙ্গে, আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসতো। পূর্ণিমা যখন একটু বড় হলো তখন সেও লক্ষ্মীর মতই ঘুরতো সুবার সঙ্গে। সে এক বেশ মজার দৃশ্য—জলের টানের

বাঁক ঘাড়ে করে বুড়ো সুবা চলেছে, পিছনে ছুটি বাছুর যাচ্ছে আর আসছে।

সুবাকে একদিন তার ঘর কোথায় কি জাত কে কে আছে এইসব জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেই তখনই উৎসাহ ভরে তার জীবন কাহিনী বলতে সুরু করলে। বৈদ্যনাথধামের খুব কাছেই সুবার দেশ, মাত্র ৫।৬ ক্রোশ দূরে। সুবার বাবা, মা, ভাই, বোন, বৌ, ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সবই আছে—মস্ত গৃহস্থ তারা; ৩৪ হালের জমি চাষ হয়। ধানের চাষ তো আছেই, তাছাড়া মুগ, বিরি, মটর, আহির, কুলথী প্রভৃতি নানা রকম কলাইও হয় প্রচুর। জীবিকার জন্য বাইরে বেরোনর কোন প্রয়োজন হয় না তার—তাদের ভিতর আর কেউ কখনও বাইরে বেরোয়নি, সুবাই খালি ঘরে মন টিকে না তাই বেরিয়ে পড়ে। মা বাপ, ভাইরা বৌছেলেরা সকলেই কত বলে ঘরে থাকবার জন্য; কিন্তু সে পারে না—দুমাসের ওপর তিন মাস থাকলেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে—একটু হেসে বললো "এই দেখুন না বাবা, এই এক বছরের মধ্যে এইখানেইতো ৪।৫ টা কুঠীতে কাজ করলাম—কি করবো এক জায়গায় আমি বেশীদিন কিছুতেই থাকতে পারি না"—সুবার এই শেষের কথা শুনেইতো আমার ভয় হয়ে গেলো, মনে পড়লো ওকে কাজে ভর্ত্তি করবার সময় চাপরাশীও আমাকে আড়ালে ডেকে ওর ঐ একটি দোষের কথাই বলেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার গরুগুলির প্রতি ওর অসাধারণ মমতার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ভাবলাম অন্ততঃ আমাদের পুরাণ লোকটি না আসা অবধি টিকে যাবে নিশ্চয়।

জাতি সম্বন্ধে সুবার মনে খুব গর্ব্ব আছে। আমাকে বললে, "জানেন আমরা হলাম রায়-ঘাটোয়াল—রাজপুতানার রাজারা যা আমরাও তাই—উয়ারা আমাদের জাতি বটে, তবে কিনা উয়াদের ধন আছে, আমাদের ধন নাই"—তারপর এদেশে বহুপ্রচলিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করে বললে—"ঘাটাল ঘাটোয়াল।

ঘাড়লে সিং

"অর্থাৎ কিনা ঘাটোয়ালরাই সম্পদে, সম্মানে—সব রকমে উঠে গেলে সিং হয়।

সুবা বুড়োমানুষ, স্বভাবতঃই একটু বেশি কথা বলতে ভালবাসে, আমার এইসব প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার দেশ কোথায়। উত্তরে কলকাতা শুনে উল্লসিত হয়ে বললে কলকাতা বড় তাজ্জব সহর, কলকাতায় সে একবার এক মনিবের সঙ্গে গেছে ৮ দিন ছিল। বাপরে! সেখানে কি গাড়ী ঘোড়ার ভীড়—কতরকমের গাড়ী, কত বড় বড় বাড়ী কত জিনিষ। তার বাবু তাকে চিড়িয়াখানাও দেখিয়ে দিয়েছিল; কত রকমের জানোয়ার, কত পাখী আবার সাপগুলি রেখে দিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসবার যাবার ইচ্ছা সুবার নেই; তার কারণ সেই ৮ দিনের মধ্যেই সে একবার হারিয়ে গিয়েছিল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার দুধারে সব নানারকম জিনিষপত্র দেখতে দেখতে ক্রমে কোথায় চলে এসেছে তা খেয়াল নেই, যখন হুঁস হলো তখন আর বাড়ী যাবার রাস্তা খুঁজে পায় না। দু'একজন লোককে জিজ্ঞাসা অবশ্য করেছিল কিন্তু বাড়ীর নম্বর না জানলে শুধু মনিবের নামে কলকাতা সহরে বাড়ী খুঁজে পাওয়া যাবে কেন? যাই হোক এমনি জিজ্ঞাসা করতে করতেই সে পুলিসের নজরে পড়ে, পুলিস তাকে থানায় নিয়ে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখান থেকেই তার উদ্ধার হয়। অনুমান করছি সুবার মনিব সুবার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতে সন্দিগ্ধ হয়ে থানায় ডায়রী করে এসেছিলেন। তারপর যে কদিন ছিল তাকে আর একা বাড়ীর বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি।

এই হলো আমাদের সুবা—ঘরে যার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি সত্ত্বেও মন টিকে না, এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে হলে যে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আদিম মানবের যাযাবর প্রবৃত্তি যার মধ্যে আজও বেশ খানিকটা রয়ে গেছে।

সেদিন বিকেলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি সুবা কুয়োতলায় ঘড়ি বালতী রেখে দুই

হাতে লক্ষ্মী আর পুর্ণিমার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে। সদা চঞ্চল বাছুর দুটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে তার আদরটা বেশ উপভোগ করছে। দেখে আমার মনে হল বন্ধনবিহীন, চঞ্চল পথিক সুধার না শেষে ভরত মুনির দশা হয়—বাছুর দুটোর মায়ায় না বাঁধা পড়ে যায়।

কিন্তু তখন জানতাম না যে আমার ধারণা কত ভুল এবং কত শীঘ্রই তা ভাঙবে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দুদিক থেকে ঠাকুর ও চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলো, দুধ দুইবে কে আর জলই বা দেবে কে? অবাক হয়ে বল্লাম, "কেন সুধার কি হল?" তারা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, "কে জানে—পালিয়েছে নিশ্চয়ই। সকাল থেকে তো দেখছি না, তার সে পাগড়ী, লোটা আর লাঠিও নেই।" আমি একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বল্লাম, "বলিস কিরে মাইনেও তো নেয়নি—"

কিন্তু যে সুধাকে এনে দিয়েছিলো সেই চাপরাশীকে ডেকে পাঠাতে সে বললো, মাইনে না নিয়ে যাওয়ার দরুণ তার পালান আটকাবে না কারণ সে হয়ত মাসখানেক বাদে একদিন এসে মাইনে নিয়ে যাবে, আর সে তো মাইজীকে পূর্ব্বেই জানিয়েছিলো সুধার এই স্বভাবের কথা।

হ্যাঁ—তা সে জানিয়েছিল নিশ্চয় সেকথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম—

তা ভাবলে কি আর হবে? মানুষের বিচিত্র মনোভাবের গভীর রহস্য কে বুঝবে?

হয়ত বা লক্ষ্মীপুর্ণিমার মায়ার বাঁধন কাটাবার জন্যই সুধার এই অতর্কিত পলায়ন। কে জানে কাল গোধূলি বেলায় অতর্কিতে দেখা সেই ধূম্র হয়ত বা লক্ষ্মীপুর্ণিমার কাছে সুধার শেষ বিদায় গ্রহণ।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

(দশম পরিচ্ছেদ)

শীতকালে কতকগুলি মুসলমান সওদাগর আসে মেদিনীপুরে। তারা গরম কাপড়ের বেসাতি নিয়ে আসত। গরম পড়লে দেনাপাওনা মিটিয়ে দেশে চলে যেত। বেহারের শাহাবাদ জেলার শাসারাম থেকে একদল সদাগর এবছর এল। আমাদের বাসার কাছেই তারা দোকান খুলল। বড়মিঞার নাম ছিল মহম্মদ জান। বড়মিঞার আর এক ভাই ছিল। এরা মালিক। রসিদ ব'লে একটা ছোকরাও সঙ্গে ছিল। মেদিনীপুরকে কেন্দ্র ক'রে এই দোকান থেকে মাল নিয়ে এদের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় বেচতে যেত। প্রয়োজনমত এই বড় দোকানে আসা যাওয়া রাখত।

ছেলের ছেলের মনে মনে ভাব করার আমন্ত্রণ আপনার থেকে আসে। ভাষার দুরূহতা এতে অন্তরায় হতে পারে না। হাড়মা ছিল সাঁওতাল ছেলে। আমি ছিলাম বাঙ্গালী। কিন্তু অবলীলাক্রমে ভাব হয়ে গিয়েছিল। রসিদ ছিল বেহারী মুসলমান। তার সঙ্গেও আমার হয়ে গেল ভাব। আমাদের বাসার বাইরের কুয়া থেকে ছেলেটি জল নিতে আসত। তাই থেকে হয় আলাপ। কয়েকদিন বাদে দেখা গেল কুয়ার পাশের একটুখানি জমিতে লেগে গেছে রসুন পিঁয়াজের গাছ। আমিও তাতে জল দিতাম, ছেলেটিও দিত। মাটি ফুঁড়ে বেরুল অঙ্কুর। ক্রমে হল সুন্দর কলি। তারপর হল চমৎকার ফুল। এমনিভাবে দুটি ছেলের মধ্যে ভালবাসা বেড়ে উঠল।

যা ক্বচিৎ কখনও দেখাশোনায় তৃপ্তি পেত, তা বেশী সময় দাবী করতে লাগল। কুয়ার ধারে অপেক্ষা ক'রে আমি যতটুকু রসিদের সঙ্গ পেতাম এখন আর তাতে তৃপ্তি হয় না। বেশী বেশী মেলামেশা করতে ইচ্ছা হয়। নানারকম খরিদ্দারদের সম্পর্কে এসে রসিদও কিছু কিছু বাংলা শিখে ফেলেছিল। যে কোন ভাষা শেখার সহজ উপায় হচ্ছে ঐ ভাষাভাষি ছোট ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেশা। ভাষা শিক্ষার গদ্য সহজে আয়ত্ত করা হয়। পদ্য বোঝা আর একটু শক্ত। গান বোঝা আরও শক্ত। বলা গানের চেয়ে গাওয়া গান বোঝা আরও শক্ত। সুরে অনর্থ ঘটায়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কথা বোঝা আরও কঠিন। টান-টোনে কেমন একটা তফাৎ থাকে। নিজের ভাষা শেখার পদ্ধতিতে এর উল্টোটা অনেকখানি জায়গায় দেখা যায়। পদ্য থেকে গদ্যের দিকে এ পথটি গেছে। প্রথম আসে সুর, কান্নার ভিতর দিয়ে তার বিকাশ; হাসির ভিতরে তার প্রকাশ। পিঠ চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়ানর গানের তালের মত ছন্দের আবির্ভাব। ঘুম পাড়ান বা ছেলে ভোলান গানে পদ্য ও সুরের বিন্যাস, "খোকা কেন কেঁদেছে, ভিজে কাঠে রেঁধেছে," "খোকা আমাদের ঘুমাল, পাড়াশুদ্ধ জুড়াল," "খোকা এল নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে"। মা, মাসি, পিসি, বোনেদের কথায় গোড়াকার অভ্যাস। বাবাকে দেখা যায় এদের ফাঁকে ফাঁকে। কতরকম ছড়া রূপকথার ভিতর উঁকি মারে। জীবনে পাওয়া যায় দুটো শিক্ষা, (১) মা স্নেহের রূপ-মূর্তি, (২) বাবা গভর্ণমেণ্ট—শাসনতন্ত্রের রূপমূর্তি। কেউ কেউ বলে—মা স্নেহময়ী, বাবা ডাণ্ডাধর। খেদুড়ীরা বালা জীবনে সংসাররূপ মরুভূমিতে ওয়েসিস —সজলভূমি।

রসিদ এখন শিমনের কাপড়, পিয়াসের পানি, চোখে নিন্দ, পেটে ভুখ বলতে শিখেছে,—"ফুল তুলব, হার গাঁথব, সিন্দুর দু-জনে" গাইতে পারে। আমি ও কম জানি না। বলি খামোকো কষ্ট কেন করতা হ্যায়, সগলমে মুড়গুড়ি লাগতা হ্যায়। তোমকো ব্যতিব্যস্ত কাহে দেখছি। পা ফুলকে এতখানি।

পরস্পর ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে একটা সত্য আবিষ্কার হয়ে গেল। এতে আপোষ-নামা, একটা বোঝা-পড়া দেখা যাচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে বোঝাপড়া বা আপোষ-নিষ্পত্তি অনেকখানি কাজ করে। সংসার সাধারণতঃ এই পথে চলে। এই বুদ্ধের মধ্যনিকয় বা মধ্যপথ, খুব ঠিক। চরম পথ বহু দেরী দেরীতে এক আধবার দরকার হয়। সাধারণত সর্বদা অর্ধ-চণ্ডা ভাব প্রায়শই অনিষ্টকর।

রসিদের সঙ্গে মেশা ও যথাবার্ত্তা বলার সুবিধার জন্য ক্রমশঃ বড়মিঞার দোকানে আসতে লাগলাম। এই উপলক্ষ্যে বড়মিঞা আমার পরিচয় পেয়ে গেল, খুব খাতির যত্ন ক'রে দোকানে বসত। নানারকম গল্প শোনাত। সাহাবাদ জেলায় জগদীশপুরে বাবু কুমার সিং জন্মগ্রহণ করেন। তার গল্প করত। বাবু কুমার সিং আশি বছর বয়সে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য সেপাইদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালে যোগ দেন। সাহাবাদ বা আরার ধারে গঙ্গা। অপর পারে কাশী, বেনারস, গাজীপুর, বালিয়া, গোরখপুর, ছাপরা। জিতে ফেরার সময় তিনি ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে আহত হন। তিনি আহত হাতটা কেটে জড়িয়ে দিয়ে পাগড়ীতে পটি বেঁধে ফেরেন। জগদীশ পুত্রের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন। তার ভাই অমর সিং কোন দিন ধরা পড়ে নাই। প্রায় তিনমাস পরে মারা পড়েন। ফুলসাই একজন মুসলমান ফকির। তিনি কুমার সিংহের ডানহাত ছিলেন। তিনি যুদ্ধে মারা যান। অমর সিং নেপালে চলে যান। এঁদের নামে ওদেশের লোকের আজও ভারী শ্রদ্ধা। শেরশাহর গল্পও বলত। শাশারামে তাঁর কবর আছে। বহুলোক দেখতে যায়।

দিন যত যেতে লাগল বড়মিঞা গল্পের মোড় তত ধর্মের দিকে ফেরাতে লাগলেন। সে বলত—জগতের

মধ্যে মুসলমান ধর্ম শ্রেষ্ঠ। একমাত্র এই ধর্ম সত্য। মানুষ যতবার ভুলে প'ড়ে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে পাপের পথে পা বাড়িয়াছে, তাদের ফেরাবার জন্য ভগবান ততবার পয়গম্বর বা তাঁর আদেশবাহী মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে শেষবারের মত হজরৎ মহম্মদকে পাঠিয়েছেন। এরপর আর কাউকে পাঠাবেন না বলেছেন। পুরান আইনের ঘোষক্রটি দেখে বদলে নূতন আইন জারী হ'লে পুরাণ আইনে আর কাজ হয় না। কারণ তা বলবৎ নয়। সেইজন্য সবচেয়ে নতুন ধর্ম, ইসলামই এখন জগতের পক্ষে খুব ভাল ধর্ম।

ক্রমশঃ কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতি কি তা সে আমাকে বুঝিয়েছিল। এই পাঁচটি গ্রহণ ও পালন না হলে ধার্মিক মুসলমান হওয়া যায় না। চারিটি দেওয়াল আর একটি ছাত না হলে যেমন বাড়ী হয় তেমনি এই পাঁচটি অবলম্বন না হলে ধর্ম হয় না। কলেমাতে বলা হয় আল্লাহ্ বা ভগবান এক। মহম্মদ তাঁর রসুল বা প্রেরিত। তৌরিৎ, জবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি যে সব শাস্ত্র তাতে বিশ্বাস এবং কোরাণে বিশ্বাস। এই সবের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের নাম ইমান। বিনা ইমানে মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমান এই ভাবেও অন্যেরা বুঝতে পারে —যে মুসলমানে ইমান যার আছে সেই মুসলমান। অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসীই মুসলমান। ধর্মহীন মুসলমান জীবন হয় না। ইসলাম সেই ধর্মের নাম। ইসলাম মানে শান্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করার উপদেশ আছে ইসলামে। হিন্দুরা যেমন চার বেদ মানে মুসলমানরা তেমনি চার কিতাব মানে। হজরৎ দাউদের কাছে আল্লাহ প্রকাশ করিতেছিলেন তৌরিত, হজরৎ মুশার কাছে জবুর, হজরৎ ইশা বা যীশুর কাছে ইঞ্জিল বা বাইবেল। হজরৎ মহম্মদ পেয়েছিলেন কোরাণ।

মহম্মদ জান আরও বলেছিল ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কোরাণ, হদিস, ফেকা শাস্ত্র দিয়ে। কোরাণ আল্লাহর কাছ থেকে মহম্মদের মনে নেমে আসে। মহম্মদ সাহেব যা উপদেশ দেন তা আছে হদিসে। মহম্মদের পরে জ্ঞানীরা একত্র হয়ে কোরাণ, হদিস ও মহম্মদের জীবন ও বাণী থেকে ফেকা শাস্ত্র নির্দ্ধারিত করেন। ছাতে যেতে যেমন সিঁড়ির দরকার তেমনি একটি মারফৎ বা উপলক্ষ্য ধরে আল্লাহর কাছে পৌছাতে হয়। সেই মারফৎ হচ্ছেন রসুল বা মহম্মদ।

মুসলমানদের সাধনায় জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ আছে। জ্ঞানীরা কাদেরী খানদান বা বড়পীরের (আবুল কাদের জীলানির) আধ্যাত্মিক বংশ। ইনি বাগদাদে ছিলেন। এঁর মতে সঙ্গীত হারাম বা নিষিদ্ধ। এঁর মাসতুতো ভাই খাজা মহম্মদ চিস্তি ভক্তিপন্থের গুরু বা পীর। ইনি ভারতে আসেন। আজমীরে এর কবর আছে। চিস্তিয়া খানদান হচ্ছে এর আধ্যাত্মিক বংশ। গান বাজনা এদের পক্ষে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। গানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগে। গওস্ বা সমাধি পর্যন্ত পৌছান যায়। এদের গানের একটা নমুনা :—

"আঁখে তুঝ্‌কো দেখ্ রহি হ্যায়,
দিল্‌তো গিরিফ্‌তার হ্যায়,
সবকি সুরত দিখা হ্যায়, তুঝ্‌কি সুরত না দিখা হ্যায়,
ইস্‌ক্ কি লহর সব উঠ্‌তা হ্যায়,
রুহ্ জিসিম্ সে খাক্ হোতা হ্যায়,
ইসি ইস্‌ক্‌কা কারা বুরা হ্যায়,
লাখো আদমি বিগাড় গেয়া হ্যায়।

মন চুরী করেছ কে গো মনহরণ! মন চুরি হয়ে যাবার পর চোখ দুটো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাইয়ের রূপ পরিদৃশ্যমান। কিন্তু তুমি থাক দৃষ্টির বাইরে। যখন প্রেমের জ্বালা জ্বলে ওঠে, দেহত সামান্য, অন্তরাত্মা পর্যন্ত ছাই হয়ে যেতে চায়। তবে এ প্রেম ক'রে লাভ কি? এতই যদি খুইয়ে ফেলা? লক্ষ লক্ষ লোক এই পথে নষ্ট হয়েছি। আমি একটা প্রাণী না হয় বা গেলাম।

মুরিদ বা সাধককে চার অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। পীর, মুরসেদ বা গুরু পথ বলে দেন। শরিয়ৎ বা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ, তরিকৎ বা নিত্যকর্মপদ্ধতি, হকিকত বা তত্ত্বার্থ, তারপর মারফত বা তাসাউফ বা ইল্‌মে লাদুন্নি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা অপরা জগতের বিদ্যা।

এই তাসাউফে পৌঁছালে আর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। সব আল্লাময় দেখে।

এত সব আমাকে বোঝাতে অনেকদিন লেগেছিল। শেষে আমাকে বলল—তুমি যা কিছু করবে বিসমিল্লা বলে আরম্ভ কোরো। খুব শুভ ফল পাবে। এক ব্রাহ্মণের মেয়ে সর্বকর্মারম্ভে বিসমিল্লা বলত। মনে মনে বলতে বিশ্বাস বেড়ে গিয়ে সে প্রকাশ্যে বলা আরম্ভ করল। মেয়ের গুণের কথা বাপের কর্ণগোচর হল। বাপ খুব রাগ করতে লাগলেন। কিছুতে মেয়েকে টলাতে পারলেন না। তাকে জব্দ করার এক ফিকির ঠাওরালেন।

একদিন মেয়েকে একটা আংটি দিয়ে বললেন "এটি বাক্সে তুলে রেখে এস." মেয়ে বিসমিল্লা বলে পিতৃ আজ্ঞা পালন করল। বাপ তা লক্ষ্য করলেন। চুপিচুপি এক সময় সেই আংটিটি বের করে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে এলেন। পরের দিন আংটিটি চাইলেন। মেয়ে বাক্স খুঁজে আংটি পেলনা। বাপ বললেন—আর তিন ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, খুঁজে বের কর নৈলে তোমায় কেটে ফেলব। মেয়ে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। খুব ভাবতে লাগল। এর মধ্যে মেছুনি মাছ দিয়ে গেল। বিসমিল্লা বলে মেয়ে মাছ কুটতে বসল। আল্লাহর কুদ্‌রৎ। মাছের পেটের ভিতর সেই আংটি বেরুল। বাপ আংটি পেয়ে অবাক এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করল।

আমি গল্প শুনলাম। মদন ও রবির গল্পে এরূপ আংটি পাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল। ধর্মান্তর গ্রহণের কথা আমার মনের কোণেও ঠাঁই পেল না। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ আশ্চর্য ঘটনার গল্প অশেষ।

আমার এ রকম ঘনিষ্ট নতুন আড্ডার কথা আমার পিতৃদেবের কাণে পৌঁছাল। তিনি কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর একদিন আমাকে বললেন—তুমি যদি মনে কর যে মুসলমান বা খৃষ্টান হ'লে তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব ভালরকম বিকাশ লাভ করবে, তুমি স্বচ্ছন্দে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পার। আমার দিক থেকে বাধা হবে না। আমি চাই তুমি মানুষ হও। তোমাদের ধনাঢ্য হওয়া আমি কামনা করি না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। পিতা বললেন—এখুনি আমি জবাব চাচ্ছি না। আমি মনে করি খোলসের মত ক'রে একটা ধর্ম রাখার কিছু মানে হয় না। ধর্ম জীবন হওয়া চাই। চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ হতে হওয়াই ধর্ম। মানুষে মানুষে ব্যবহারে যা আসবে সেখানে সৎ হতে হবে। আমার মনে বেশ একটা নাড়া লাগল। চিন্তা করতে লাগলাম। আমার বাবার ভাব হচ্ছে পরকে ভাল হতে বলার চেয়ে নিজে ভাল হওয়া বেশী দরকার।

(ক্রমশঃ)

উত্তরাপথ ভ্রমণ

ভবঘুরে

পূর্বানুবৃত্তি

প্রথমটা ভয়ানক রাগ হ'ল। এরা ভদ্রতা রেখে কথা বলতে জানে না। গলা চড়িয়ে কথা বলতে সুরু করলাম। কিন্তু হিন্দির দৌড় অতদূর পৌছাল না। অগত্যা ইংরেজী ব'লতে আরম্ভ করলাম।

ওঃ, বাবা, ইংরেজীর মহিমা! জমাদার যে বিশেষ কিছু বুঝল তা মনে হ'ল না কিন্তু ইংরেজী বুকনি শুনেই চুল ছেড়ে দিল—সুরও অনেকটা নরম হ'য়ে এল। তার চেলাটী তো একেবারে চুপ।

এর আগে একটু আধটু যে ভয় না হচ্ছিল—তা নয়। কারন পুলিশের জাতভাই তো—এরা ক'রতে পারে না—জগতে এমন কিছু নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস—সে সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা আছে। আর ও বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের পুলিশ বা অদেশীয় রাজ্যের পুলিশে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। তারপর বন্ধু বান্ধবহীন—নির্জন প্রান্তর—এখান থেকে আমাদের কোন খবরই হয়ত বাইরের জগতে পাবে না।

কিন্তু 'মুখেন মারিতং জগত'। তখনও চড়া সুরেই কথাবার্ত্তা চলছে। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর তারা আমাকে পিছনের দিকে বসিয়ে আমাদের মধ্যে আর একজনকে ডাকল। আর একটি বন্ধু আস্তে আস্তে এসে ঢুকলেন। তারপর তিনি অপূর্ব হিন্দিতে জমাদারকে বুঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন—"দেখিয়ে—হাম তো বাংলা দেশসে আয়া—হিন্দি আচ্ছা নেহি বুকতা..."

কিন্তু শোনে কে? জমাদার খুব ধমক দিতে লাগল। এদিকে বন্ধুটীও খাঁটী গান্ধীজীর চেলা—এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। তিনি আরও ভাল ক'রে বুঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

শেষ পর্য্যন্ত যখন অনেক জেরা ক'রেও আমাদের দু'জনের কথার কিছু অমিল খুঁজে পেল না—তখন জমাদার নরম হ'য়ে এল। শেষ পর্য্যন্ত বলল—যে "হয় পাঁচশ' টাকা জামিন রাখতে হবে—না হ'য় কোর্টের রায় বেরোন পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হবে। আমরা তার দ্বিতীয় সর্ত্ত—অর্থাৎ কোর্টের রায় না বেরোন পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে রাজী হ'লাম। লিখে দিলাম—"কোর্টের রায় না বেরোন পর্য্যন্ত থাকতে রাজী আছি—ইতিমধ্যে আমরা বা আমাদের দলের কোন লোক পালিয়ে গেলে ৫০০৲ পাঁচ শ' টাকা দিতে বাধ্য আছি।"

দলের পক্ষ থেকে আমরা দু'জনে সই ক'রে বেরিয়ে এলাম। অপমান তখনো গায়ে কাঁটার মতো বিধছে। কিন্তু ক'রবার কিছু নাই। গুম হ'য়ে ব'সে রইলাম। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধুদের উদ্বেগাকুল প্রশ্নের কোন জবাব পর্য্যন্ত মুখ দিয়ে বেরোল না।

ইতিমধ্যে আমাদের পরবর্তী যাত্রী বাঙালী মাথন-বাবুর ডাক পড়ল। পুলিশের চাকুরীতে চুল পাকিয়েছেন তিনি। 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি' চলল—কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর কাছ থেকেও ঐ রকম একটা রাজীনামা লিখে নিয়ে ছেড়ে দিল।

আমাদের বাঙালী ক'জনের জবানবন্দী নিয়ে জমাদার উঠে পড়ল। বাকী যাত্রীদের বলল—কাল তোমাদের হবে।

জমাদার বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ এক দাঁড়িওয়ালা সাধুবাবা বেরিয়ে এসে এক যাত্রীদলের প্রধানকে দেখিয়ে বলল—"লালানে আগ লাগায়া," তারপর জমাদারের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে বলল—"গুড মর্ণিং"। নিজের পরিচয় জাহির ক'রে সে শোনাল—গোয়ার মিলিটারী দলে সে নাকি অনেকদিন চাকুরী করেছে। উদ্দেশ্যটা বোধ হয় সগোত্রীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে জমাদারের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। হাত পা নেড়ে সে কি প্রচণ্ড স্ফূর্তি তাঁর!—যেন যাত্রাদলের অভিনয়ে স্বয়ং পবন নন্দন আসরে নেমে লাফালাফি সুরু ক'রে দিলেন।

একটু আগে লোকটা পাথরের মেজে পরিষ্কার ক'রে

সেখানেই আটা মাখছিল। তখন কিন্তু লালার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছিল—দেখেছি। 'লালা' (ব্যবসায়ী) লোকটীকে দেখে মনে হ'ল—নিরীহ প্রৌঢ়—কতকগুলি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে চলেছে। সে শুধু বলল—"যদি দোষ ক'রে থাকি—ভগবান শাস্তি দেবেন।"

জমাদার লালাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী কি কথাবার্তা বলল। তারপর লালাকে ছেড়ে দিয়ে সাধুকে নিয়ে পড়ল। তাকে বলল—"চলো, তুমকো মেরা সাথ্ আনা পড়ে গা।" সাধু ব্যাটার স্ফূর্তি তখন উবে গেছে। তার সঙ্গে দুটী মেয়ে ছিল। তাদের দোহাই দিয়ে সে যেতে চাইল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জমাদার ছাড়ল না—সাধুকে ধ'রে নিয়ে গেল। খানিকটা দূরে কিছু গ্রামের লোক জড় হ'য়েছিল। তাদের হেফাজতে সাধুকে ছেড়ে দিয়ে জমাদার আমাদের কাছে এসে খানিকটা ভরসা দিয়ে বলল—"আপ লোগ্ খা পিকে শো যাইয়ে।"

কি জানি, বাবা, পুলিশী ভরসা! ওদের ভরসাকেও বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক ইতিমধ্যে আমাদের লছমীরাম কিছু পরোটা বানিয়েছিল। কিন্তু তাও বিশেষ রুচল না, একটী বন্ধু তো একেবারেই খেলেন না।

রাত বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীত-ও জাঁকিয়ে উঠল। বারান্দাতেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। বন্ধুবান্ধবরা বলেন—আমার ঘুমের সঙ্গে নাকি ত্রেতা-যুগের কুম্ভকর্ণের ঘুমের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে রাতে আমারও ঘুম ভাল হ'ল না, সারারাত ধ'রে সেই গ্রামের লোকগুলি আমাদের পাহারা দিয়ে রইল। জমাদার ও তস্য চেলাও বোধ হয় ঐ দলের সঙ্গেই রাত্রি কাটাল।

পরের দিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল—যদিও ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি বেঁধে পথে বেরোবার তাড়া ছিল না। দূরে দেখা যাচ্ছে—গ্রামের লোকগুলি তখনও আগুনের ধারে বসে বসে তামাক টানছে। সব দেখে শুনে আমরা তো তখন সব আশাই ছেড়ে দিয়েছি। সকাল সকাল লোটা কম্বল বেঁধে তৈরী হওয়ার তাগিদ নেই—কাজেই প্রথমে মুখ হাত ধু'তে ঝরণার ধারে গেলাম।

মুখ ধু'তেই কেমন যেন আলস্য লাগছিল—আলস্য ঠিক নয়—কেমন যেন উদাসীনতা। কোথা থেকে কি একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লাম—এখন কতদিন এখানে আটকে থেতে হবে—কে জানে!

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসে দেখি—বন্ধুরা লোটা কম্বল বেঁধে একেবারে তৈরী। আশ্চর্য্য হ'য়ে জিগ্যেস করলাম—"কি ব্যাপার?" শুনলাম—আমাদের বাঙালী ক'জনকে চ'লে যেতে বলা হ'য়েছে। আর সবাই থাকবে। শুনে যেন বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছিল না। পর্বতের মূষিক প্রসব কি সহজে বিশ্বাস করা যায়!

এমন সময় কয়েকজন গ্রামের লোক এসে বলল—"আপনাদের কোন ভয় নাই, বাবু, এবেলা খেয়ে দেয়ে এখানে থাকুন—বিকালে যাবেন। পাহাড়ের পিছন দিকটাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—এমন সময় যাওয়া নিরাপদ নয়।"

নাই হোক নিরাপদ—কিন্তু এই অভিশপ্ত পুরীতে আর নয়। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাছতলায় ব'সতেও রাজী আছি। যখন বাবুও আমাদের মতে সায় দিলেন।

লটবহর কুলির মাথায় তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অন্যান্য সবাই থাকল! ওদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে? পরে শুনেছিলাম—ওদের সবাইকে বনবিভাগের হেড্ অফিসে টেনে নিয়ে যায়। সেখানে সাধুর ভাগ্যে বেশ দু'চার ঘা জুটেছিল। তারপর সাধুর আর সেই লালার প্রত্যেকের দশ টাকা ক'রে জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

যাই হোক—ফেলে আসা সহযাত্রীদের প্রতি ক্ষীণ একটা মমত্ববোধ ছাড়া আমাদের ক'রবারও কিছু ছিল না। পথে বেরিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। চীড় গাছের পাতার ছাওয়া উঁচুনীচু পথ বেয়ে খানিকটা

এগিয়ে এসে পাহাড়ের বাঁকে একটা মোড় ফিরলাম। পাহাড়ের এপাশটাতেও গতিকই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ে আগুন লাগলে আগুনের নীচের রাস্তা দিয়েও যাওয়া নিরাপদ নয়—বিভিন্ন সময়ে নানা আকারের পাথরের নুড়ি আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে নীচে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের গায়ে গাছ পালায় আটকে যায়। জঙ্গলে আগুন লাগলে তাদের সেটুকু আশ্রয়ও পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। তখন সেইসব উত্তপ্ত পাথরের টুকরো—পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তার এক টুকরা যদি কোন রকমে এসে গায়ের উপর পড়ে তো আর রক্ষা নাই। একটা বেশ বড় রকমের টুকরো আমাদের কয়েকহাত সামনে এসে পড়ল। আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি! ভয়ে ভয়ে ছাতার আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম।

অগ্নিময় সেই পাহাড়টা পিছনে ফেলে খানিকটা সমতল জায়গায় এসে পৌঁছান গেল। পাশ দিয়েই ব'য়ে গেছে—ক্ষীণকায়া যমুনা—মাঝে মাঝে ছোট বড় ঝরণা এসে মিলেছে। সেই রকম বড় ঝরণার ধারে বসে আমরা আগের রাতের অভুক্ত পরোটাগুলোর সদ্ব্যবহার ক'রতে লেগে পড়লাম।

আজ প্রথম যমুনাকে দেখলাম। এর আগে গঙ্গাকে দেখে এসেছি। গঙ্গা আর যমুনার মধ্যে যেন একটা পার্থক্য অনুভব করা যায়। গঙ্গার জল ঘোলাটে—যেন গৈরিক বসনা ভৈরবী। ফেনোজ্জ্বল উদ্ধত তার তরঙ্গ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তার রূপ—চাইলে চোখ ঝলসে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ধারার দান গ্রহণ ক'রে পরিতুষ্ট হওয়া যেতে পারে—কিন্তু কাছে বসে কথা ব'লতে ভয় হয়। আর যমুনার জল নীল—যেন শান্ত, গ্রাম্য বধূ। তার শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ চোখ ঝলসায় না, তরঙ্গ আছে—কিন্তু তা যেন গ্রাম্য বধূর সলজ্জ হাসির মধুর ঝলকাকলি—একে আপনার ক'রে নেওয়া যায়—দু'দণ্ড কথা বলে শান্তি পাওয়া যায়।

যমুনার পাড় ব'য়েই এবার আমাদের পথ। পথের মাঝে গঙ্গানী ব'লে একটা চটী ছাড়িয়ে এলাম। এখানের আর একটা ধারা এসে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গানী ছাড়িয়ে পাহাড়ের একটা বাঁক ফিরতেই সামনে দেখলাম—তুষার কিরীটি অভ্রভেদী পাহাড়। ঐ বোধ হয় যমুনোত্রী—যমুনার উৎস মুখ। ঐ খানেই বোধ হয় আমাদের যেতে হবে।

নূতন উৎসাহে এগিয়ে চললাম। কিছু দূর দিয়েই একটানা ব'য়ে চলেছে যমুনা। তার কল কল শব্দ আমাদের পথ পর্য্যন্ত ভেসে আসছে। একটা জায়গায় দেখলাম—একেবারে যমুনার গা ঘেঁসে পথটা চলে গেছে। নদীর উপরে বড় একটা পাথরে গিয়ে বসলাম। যমুনার ধারা তরঙ্গ ভঙ্গে এগিয়ে চলেছে। সামনের পাহাড়, পাথর কোন বাধাই সে মানছে না। ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলোকে তো ঠেলে নিয়ে একেবারে চৌকস ক'রে দিয়েছে, যাকে ঠেলতে পারছে না—তাকে ক্রমাগত আঘাতে মসৃণ ক'রে ফেলেছে। উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে নদীর রুদ্ধ গর্জন আরও বেড়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে—কিন্তু সব কিছু বাধা কাটিয়ে কলহাস্যে এগিয়ে চলেছে যমুনা—যেন বলতে চায়—"আরও বাধা সইব আমি, সইব আরো আরো"—কিন্তু আমার পথকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল, তৃষিত শীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে খানিকটা আরাম পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার চলতে সুরু করলাম। ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য পাহাড়ের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে হিমালয়; কিন্তু তারই মধ্যে এক একটা পাহাড় নজরে পড়ে—ছবির মতো সুন্দর। ঠিক যেখানে যে পাথরটী খাপ খায়—সেইখানে সেইটী দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতি দেবী। হঠাৎ দেখলে কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া দেব মন্দির ব'লে ভ্রম হয়। কোন প্রাচীন শিল্পী বোধ হয় পাহাড়ের এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়েই বোধ হয় দেবমন্দিরকে তার বর্ত্তমান রূপ

দিয়েছিলেন। পাহাড়ের উপরে দেবমন্দির স্থাপনের কল্পনার মধ্যেও বোধ হয় লুকিয়ে আছে—এই অতুলনীয় পার্বত্য সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। চীড় গাছ ছাড়া মাঝে মাঝে দু'একটা আখরোটের গাছ পড়ে। তবে ফল এখনও কাঁচা। খানিকটা দূর থেকে একটা গর্জ্জন ভেসে আসছিল। কাছে এসে দেখা গেল—খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে একটা ঝরণার ধারা একেবারে খাড়া নীচে এসে পড়েছে। দূর থেকে মনে হয়—যেন একটা লম্বা সাদা কাপড় থেকে নীচ পর্য্যন্ত টেনে দেওয়া হ'য়েছে।

পথে এবার চীড় গাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে; দু'একটা অন্যান্য গাছ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে প্রায় সবই কাঠের ঘর। মাটীর ঘর আর বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

চলতে চলতে এক বন্ধু বললেন—"এখানকার পাথরে অভ্রের কণা যেখান আছে বলে মনে হয়।" হওয়া অসম্ভব নয়। সূর্য্যের কিরণ পড়ে ঝক ঝক ক'রছে পাথর-গুলো। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না—চোখ ঝলসে যায়। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে এখনও কত অনাবিষ্কৃত খনিজের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—অন্ততঃ যাঁরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামান—তাঁদের মুখে তো তা'ই শোনা যায়।

একটানা এগার মাইল হেঁটে বেলা প্রায় এগারটার সময় ধর্মশালায় এসে পৌঁছালাম। ধর্মশালার নাম—'যমুনা চট্টী।" যাত্রী এবং ফেরৎ যাত্রীদের ভিড়ে চটী বেশ সরগরম। ঘর পাওয়া মুস্কিল হ'ল। যাই হোক খাতিরদারী পত্রের জোরে একটু পরেই একটা কামরা দখল করা'গেল। খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রামও নেওয়া গেল।

ধর্মশালায় যাত্রী ক্ষণিকের অতিথি। একে একে তারা বিদায় নিতে এল। পরিপূর্ণ ধর্মশালা ক্রমে খালি হ'য়ে এল। কিন্তু একটী সঙ্গীর হঠাৎ জ্বর হ'য়ে পড়ায় আমাদের আর সেদিন যাওয়া ঘটে উঠল না।

যাওয়ার আশা নেই দেখে ধর্মশালার চৌকীদারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। এদেশের সমাজে বিবাহ প্রথা বড় অদ্ভুত। আমাদের দেশে মেয়ের বাবা হওয়া একটা অভিশাপ ব'লে গণ্য হয়। একাধিক কন্যার নিরুপায় পিতা কন্যার বিবাহে বরপক্ষের দাবী মেটাতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিন্তু এদেশে ব্যাপারটা অন্য রকম। বিয়ের সময় বরপক্ষকেই মেয়ের বাপকে পণ দিতে হয়। সেটাও খুব কম নয়। এই গরীব দেশে এক হাজার থেকে দু'হাজার পোক টাকা ট্যাকে ক'রে নিয়ে তবেই যুবকরা প্রিয়ার গলায় মালা দেওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। অনেকক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে অভাবগ্রস্থ নীচু জাতিদের মধ্যে বড় ভাইই বিয়ে ক'রে। অন্যান্য জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকেই পত্নীত্বে বরণ করে থাকেন।

অদ্ভুত প্রথা বটে! ব্যাপার শুনে একটী বন্ধুবর গবেষণা ক'রলেন—"জানো পঞ্চ পাণ্ডব মহাপ্রস্থানে যাওয়ার পথে এই বিজ্ঞেটা এদের দিয়ে গেছেন।"

আর একটী বন্ধু মন্তব্য করলেন—হাঁা, শুধু অর্জ্জুনকে আর কষ্ট ক'রে লক্ষ্য ভেদটা ক'রতে হয় না"।

পূর্বোক্ত বন্ধুবর চোক কপালে তুলে বললেন—"বলো কি হে—লক্ষ্যভেদই যদি না থাকল—তবে তো সব রোমান্সটাই মাঠে মারা গেল। লক্ষ্য ভেদ ঠিকই আছে হে। তবে এদেশের দ্রুপদরা লক্ষ্য রাখেন—আমাতার ট্যাঁকের দিকে। সেখানে লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হ'লেই দ্রৌপদী লাভ অব্যর্থ।"

বন্ধুবরের মনোজ্ঞ গবেষণায় কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে হেসে নিলাম। কিন্তু চৌকীদারের মুখে শোনা গেল—কালধর্ম্মেই বোধ হয়—এখন সামাজিক হিসাবে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সম্পত্তি ব'লে গণ্য হ'ল না। যুধিষ্ঠির—মানে বড় ভাইএর স্ত্রীরূপেই তিনি সমাজে পরিচিতা, সন্তান সন্ততিরাও বড় ভাইএর ব'লে পরিগণিত হয়।

দার্শনিক বন্ধুটী এবারেও চুপ ক'রে থাকলেন না। বললেন—"তা তো হ'বেই। হিন্দুধর্ম তো? 'ক্ষেত্র যার

"—পুত্র তার'—এ বিধান তো মুনি ঋষিরাই দিয়ে গেছেন।"

তার্কিক বন্ধুটী বললেন—"ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিটা এদেরই ঘাড়ে চড়ে এখনও বেঁচে আছে দেখছি।

—"ভুলে যাচ্ছো কেন, ভায়া,—এটা 'তপোভূমি,' এখানে থাকবে না তো কি তোমাদের ম্লেচ্ছ দেশে থাকবে?"

এরপর আর চৌকীদারের সঙ্গে কথা বলা গেল না। কিন্তু এদেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার একটা আগ্রহ থেকে গেল।

রাতের খাবার জোগাড়ে সন্নিহিত দোকানে ঢুকলাম। তখনও বেশ বেলা আছে। দোকানে ব'সে ব'সে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। দোকানদারের বয়স খুব বেশী নয়—যৌবনের সীমারেখা পার হ'তে এখনও কিছু দেরী আছে। তার কাছে শুনলাম—সে দু'টো বিয়ে ক'রেছে—বাড়ীতে চাষ বাস দেখবার জন্য। পুর্বেই ব'লে রাখা ভাল—এ দেশের মেয়েরা কঠোর পরিশ্রমী। সংসারের কাজকর্ম ছাড়াও বেশীর ভাগ ক্ষেতের কাজটাই তারা করে। পুরুষরা তো শুধু লাঙ্গল ছুঁড়ে দিয়েই খালাস। চাষের বাকী সব কাজই মেয়েরা করে। পুরুষরা বাইরে আর উপায়ের চেষ্টা দেখে। আমাদের দোকানদার বন্ধুটী বিদেশে দোকান করেন—বাড়ীতে তার স্ত্রীরা ক্ষেত খামার ঘর সংসার সব কিছু সামলায়।

আমাদের দেশের মতো এদেশেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্পত্তি সাধারণতঃ এক সঙ্গেই থাকে। তবে ভাইদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হ'লে যে যার পৃথক হ'য়ে যায়, সম্পত্তিও ভাগাভাগি হ'য়ে যায়। যে পৃথক হয় সে তখন আলাদা বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বড়ভাই এর ক্ষেত্রজ পুত্ররা—অর্থাৎ তার স্ত্রীর ছেলেরা সম্পত্তি ভাগ করে পায়।

জমির দাম এ দেশে খুব বেশী নয়। আজকালের বাজারে ১০০৲ থেকে ১৫০৲ পর্য্যন্ত বিঘা বিক্রী হয়। আগে আরও কম ছিল।

কথায় কথায় মৃতের সৎকারের কথা উঠল। এরাও আমাদের দেশের মতোই মৃত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়ে ফেলে। প্রত্যেক গ্রামের আলাদা সাধারণ শ্মশান আছে। সংসারের খেলা শেষ ক'রে অধিবাসীরা তারই খানিকটা জায়গা দখল করেন।

পথে আসতে আসতে অনেক পোস্ত গাছ দেখে এসেছিলাম। শুনেছি—পোস্ত গাছের ফলের আঠাটাই অফিংহেনরূপে ভক্তদের কৃপা করে থাকে। পোস্তর চাষ আমাদের দেশে নিষিদ্ধ—আবগারী আইনের ঘাঁড়া ঘাড়ে পড়বার ভয় আছে। কিন্তু পোস্তার ফুল খুব সুন্দর। তাই কৃত্রিম উপায়ে সেটা অনেক পরিবর্ত্তিত হ'য়ে পপি (poppey) নামে সৌখীন লোকদের বাগানে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু এদেশের ক্ষেতের পর ক্ষেত আসল পোস্তর গাছ দেখে এসেছি। ভাং বা গাঞ্জা তো আগেই দেখে এসেছি। এখন আফিংটা হ'লে মন্দ হয় না। কৌতূহলবশে দোকানদারকে জিগ্যেস করলাম—ব্যাপারটা। সে বলল—পোস্তর চাষ ক'রতে বাধা নেই—কিন্তু অফিহেন নিষ্কাষণ নিষেধ তারপর উপমা দিয়ে বলল যেমন কস্তুরী মৃগ মারা নিষেধ।

অন্তরঙ্গ ভাবে জিগ্যেস করলাম—"তো আপলোগ নেহি করতে হৈ?"

দোকানদার বলল—"লোগ করতে হৈ লেকিন....."

হিন্দি জোগাল না। তাকে শেষ ক'রতে না দিয়ে খাস বাংলায় বলে ফেল্লাম"....."পিছনে।"

সকলে আর এক চোট হেসে নিলাম। এমন সময় আমাদের লছমীরাম এসে খবর দিল—সে কি পাহাড়ী শাক কিনে এনেছে। ডাল আর আলু ছাড়া অন্য কোন সবুজ তরকারীর মুখ দেখি নি—অনেকদিন। কাজেই আগ্রহের সঙ্গে দেখতে এলাম। শাকের নাম 'লিংড়া'। শাকের চেয়ে ডাঁটাটা অনেক বড়। যাই হোক, খাওয়ার সময় লাগল—মন্দ নয়। যমুনা চটীর ঠাণ্ডা পরিবেশে আর পরিতৃপ্ত আহারে সেদিন কাটল ভালই।

(ক্রমশঃ)

অসংলগ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ, বি, এস্ সি

আজ নববর্ষ : রিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, চারদিকের অস্পষ্টতা ভেদ করে পাশের কোন্ বাড়ী থেকে হারমোনিয়মের করুণ সুর কি একটা গানের বাণী লয়ে কেঁদে কেঁদে আছড়িয়ে পড়তেছে..... আমি বিষাদে বিরষ্ট বদন লয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছি, অর্দ্ধনিমীলিত চোখের কোলে দুই ফোঁটা অশ্রু এসে জমা হয়েছে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বোধ্য আবেগের সাড়া লয়ে.....কিন্তু নববর্ষের সহিত এ সমস্ত এবং আমার অবাধ্য মনের কী ও কতটুকু সম্পর্ক, সে ত জানিনা। এই যে মানুষ তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ত্তব্য নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে দিন গুজরান করে, সে কার প্রেরণা নিয়ে, সে কি তা বলতে পারবে? অন্ততঃ আমার কথা তো বলতে পারি না, কোন্ খামখেয়ালী ও অদৃশ্য জীবন-দেবতা আমার বৈচিত্র্যময় জীবন ও অবিশ্বস্ত মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পরিহাস করছেন। আমার কিসের অভাব? কি করলে আমি আমার মনের রাজা হতে পারব? আজ নববর্ষ; এই দিনটি যদি আদর্শ রূপে যাপন করতে না পারলাম ত কিসের কি? কোথায় আজ মন খুলে হাঁসি মুখে সকল আনন্দে যোগ দিয়ে পরাণটাকে বাঁশীর মতন বাজিয়ে তুলব, না আমি বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে শয্যা নিয়েছি। দাদা এসে ডেকে গেলেন বারেবার, আমি সাড়া দিলাম তবু উঠবার কোন প্রয়াস করলাম না। আজ নববর্ষে দাদার অবাধ্য হয়ে থাকার নাম যে কি মহাপাপ, সে কথা কি আমি জানি না? কিন্তু মন যদি বিরুদ্ধ হয়ে বৌদির একটু আহ্বান পাবার লালসায় পড়ে থাকে ত সে কি আমার দোষ? অথচ বৌদি যদি আমার মনের অস্ফুট ভাষাটুকুর অর্থ উপলব্ধি করেও আমাকে না ডেকে দূরে সরে রয় তবে বৃথা অভিমান করেই বা আমার লাভ কতটুকু? কিসের অভিমান? অবাধ্য মনটা এত অভিমান বিলাসী কেন? বৌদি পরের ঘরের মেয়ে, তবু অপাসিত মন কেবল তাঁর সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে। পরাজয় আমারই, এটা পরীক্ষিত সত্য. তবু তাঁর সাথে কারণে-অকারণে ফিরে ফিরে অভিমান বাঁধিয়ে-বোকা মন কি আনন্দটা যে পায়! চোখ দুটো কখনও মেলে কখনও বুজে কি এক রহস্যময় জটিল মনোভাব নিয়ে পড়ে থাকলাম—বৌদি কখন আসবে ও আমাকে একটুখানি ডাকবে, অমনি মনের সকল অভিমান ঝরে পড়বে ও হাল্কা হয়ে উঠে বসব। অবশেষে সে পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত্তটুকু এল :—বৌদি এসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন,—সন্ধ্যা বেলায় ঘুমুতে আছে? উঠে বস দিকিন্; ওঃ, মশায় কামড়াচ্ছে।—অমনি মনের সব অভিযোগ নেমে গেল আর স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসলাম। দাদা পাশেই বসে রইলেন। কেন অমন হয়? বৌদি আমাকে 'রামখোকা' বলে ঠাট্টা করে। আমি কি কখনো মনের রাজা হতে পারবো?

আমার ঘরে-বাইরে চৌদিকেই অশান্তি। ছোড়দাও সেদিন লিখেছেন, একটুখানি গৃহসুখ আমার জীবনের পরম কাম্য, যার পরিবর্ত্তে অনেক বড় স্বার্থও অবহেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারি, কাজেই নৌ-বাহিনীতে যোগদান করা হয়ত আমার পক্ষে ঠিক কাজ হবে না; ছোড়দাকে দেখিনা মাস কয়েক, তাতেই মন প্রীষ্মের ছুটির জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে, নৌ-বাহিনীতে গেলে সেখানে বছরের পর বছর সকলকে ছেড়ে একা থাকতে পারব কি? কিন্তু গৃহসুখ কোথায় আমার মিলে? ইস্কুল থেকে সাধ করে এসেছিলাম, বাসায় গিয়ে খিচুরী খাব.....কি মেঘলা মেঘলা দিনটা... যাবার সময় বৌদিকে বলে গেছি.....কেমন মজা হবে...। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, বৌদি ভাতের কেন গালছে...। একেই বলে গৃহসুখ! হায়রে home-sicking পাগলা মন! গৃহে থেকেও যদি গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত হই, ত আমার নৌ-বাহিনীতে যাওয়ার আপত্তি কোথায়? কে নিষেধ করে? কেন যে তিনি খিচুরী রাঁধলেন না, তিনিই জানেন। এ নিয়ে কৈফিয়ৎ দাবী করে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে তুলব? সে অধিকার আমি কোথায় পেয়েছি? কাছে থেকেও আমি সর্ব্বদা এত দূরে দূরে রই,

গৃহে থেকেও আমি এতদূর প্রবাস রচনা করেছি, হায় ছোড়দা, সেকথা তুমি কেমন করে জানবে।.....আমার সে প্রবাসে কোন আত্মীয় বান্ধব কেউ নেই, চারিদিকে ঊষর বালুকাময় কর্কশ ধূ-ধূ-করা মরুভূমি...স্নেহহীন..... রুক্ষ...নিঃসঙ্গ একাকীত্ব...জীবনের স্বাদ্য পাওনা থেকে চরম বঞ্চনা। হায়রে পিচুরী, হায় বৌদি!... তবু কি তোমাদের উপর আমি রাগ করে থাকতে পারি? আর একদিন—যে দিন হয়ত কোন গ্রীষ্মের কাটফাটা রৌদ্রের দিনে অকারণেই বৌদির শ্রীহস্তে তুমি শ্রীপিচুরী রাঙা হবে, সে দিন হৃদয়ের রুচির শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহ্যিক প্রফুল্লতা নিয়ে তোমাকে গলাধঃকরণ করতেই হবে। ছদ্ম-ছাড়া, আমি পথহারা জীবনের একটি করুণ হতাশ কান্না... হাহাকারই আমার স্বাধীনতাকামী মনের একমাত্র সম্বল। স্বেচ্ছাচার ও রুচি আমার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি অদৃষ্টের পদতলে। হায়রে আমি! যে ঘরের প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা, সেই ঘরই কেন আমাকে অমন করে আবার পিছু ডাকে। কৃত্রিম মনোভাব ও জোড় করা হাসিমুখ আমি অমন করে আর কতদিন টিকিয়ে রাখব? বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেই সংঘর্ষ এড়ানো যায়? একেই বলে শনিগ্রহের ফের।

ছোড়দাই বেশ আছে। আর কিছু না থাক, প্রবাসে থেকেও গৃহসুখের কল্পনাটুকুত তার আছে। আর আমি পুরোমাত্রায় গৃহী হয়েও ষোল আনার অতিরিক্ত রকমে গৃহহারা; আত্মীয় পরিজন পরিবৃত থেকেও সম্পূর্ণ অনাত্মীয়; জনতার মাঝখানে থেকেও তাহা একা; নদীর কূলে কূলে থেকেও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়; ছায়ার মতন কাছে থেকেও মৃতের মতন দূরে আছি; পূর্ণিমার চাঁদ বলে যাকে ভাবি, সে হয় আলেয়ার ফাঁকি; আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ইন্দ্রধনুর মতন ক্ষণিকের রংএর খেলা দেখিয়েই মিথ্যা হয়ে মিলায়; বাস্তবতা আচ্ছন্ন হয়েছে অভিশাপের জালে, কল্পনার সান্ত্বনাটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নেই।... অবোধ মন। বুঝেও তুমি বুঝ না, মাকড়সার মতন নিজের রচা জালেই তুমি আবদ্ধ হয়েছ; জোনাকীর মতন নিজের গড়া আলো আঁধারির খেলাই তুমি খেলছ; কস্তুরী মৃগের মতন আপন নাভিগন্ধেই তুমি মত্ত উতলা হয়েছ। হায়রে উদাস! তুমি কেন মরনা! অবহেলার দানকে অনুরাগের আকর্ষণ বলে কতকাল আর ভুল করবে?

এইবার বাইরের দৃষ্টান্ত। বৌদি ও ছোড়দি আমার সারা ত্রিকালটাই সেদিন নষ্ট করে দিয়েছে; মনের প্রফুল্লতায় কটূক্তির বিষ মাখায়ে দিয়েছে। প্রতিবেশিনী হিসাবে এই বুঝি তাদের কর্ত্তব্য? আমার কোমল মানসিকতায় আঘাত হানবার কি ন্যায় সঙ্গত অধিকার তাদের ছিল? ওকে আর ছোড়দি বলে ডাকব না। এই বুঝি ছোড়দির মতন ব্যবহার? বৌদি আমার নাম দিয়েছিল 'মামা শ্বশুর,' ওটাকে ছোড়দি বিকৃত করে বলে 'মেয়ে মানুষ মামা শ্বশুর'। আমি সর্ব্বদা ঘরে ঘরে থাকি বলে ওরা এসে মনোমত আড্ডার আসর জমিয়ে তুলতে পারে না, আমার বিরুদ্ধে এই তাদের ক্ষোভ। কিন্তু অলস হই, কুঁড়ে হই, আমিত আমার ঘরেই থাকি; সাধারণের মতন আমিত ভুলেও কখনো অন্যের অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করি না। বর্ত্তমান যুগের পুরুষ, তুমি পুরুষ না কাপুরুষ? মনুষ্যত্ব তুমি হারিয়ে ফেলেছ; তোমার সমস্ত শিক্ষা, অর্থ, তোমার তুমিত্ব সব কিছু আজ বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছ নেশাময়ী স্ত্রী-অপ্সরায়। মানবিক আদর্শে প্রত্যেকটা সংসার আজ এত নীচে গেছে যে কামের আবেগে পুরুষ স্বেচ্ছায় বরণ করেছে তুচ্ছ স্ত্রীর দাসত্ব। দুনিয়ার হাওয়া আজ উল্টো দিকে বইতে সুরু করেছে, মোহ এসে দখল করেছে কর্ত্তব্যের স্থানকে; মেয়েলোক আজ দুনিয়ার রাণী, পুরুষকে সে অত্যাচারের দম্ভ নিয়ে স্বেচ্ছাচারের শাসন করে, সেই আজ দুনিয়ার শাসক, পুরুষকে সে আজ শাসায়। মেয়েদের হাতের চাবুক খাওয়ার জন্য পুরুষেরা আজ সানন্দে সাগ্রহে পিঠের চামড়া উন্মুক্ত করে বসেছে; হাড়ি কিনবার পয়সা না থাকলেও সাড়ি তোমাকে কিনতেই হবে। দোকানে দোকানে তাই এত সাড়ির বাহার। নির্ব্বোধ পুরুষ, তুমি আজ পেত্নীর পাল্লায় পড়েছ, তোমার চোখের

সত্য দৃষ্টি কি কোন কালে মোহভেদী হবে না? এ ভয়ঙ্করী পেত্নীকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে তোমার অর্জিত বিদ্যা থেকে সরষে পরিমাণ সুবুদ্ধিও কি ছেঁকে তুলতে পারবে না কোন দিন? তুমি না বিংশশতাব্দীর এ্যটম্ ব্যোম্ উদ্ভাবনকারী বৈজ্ঞানিক, তুমি এতই নরকে নেমে গেছ?...

এমন একটি নারীকে আমার বেছে নেওয়া উচিত, যে হবে আমারই মতন শিক্ষিত। দুনিয়ার সকল রকম হালচালই আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভেবে ভেবে অবাক হই। মনে হয়, যাদের জীবনে ভাল লাগে, তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে জীবনের সকল আনন্দই অপূর্ণ থাকে। কিন্তু তা কি কখনো হয়? চাওয়া যতই ন্যায্য হয়, পাওয়া জিনিষটা যেন ততই দূরের জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বরং আমি অনেক সময় জীবনের অন্যান্য দাবীর পাওনাটুকু অনায়াসে মিটতে দেখি। কিংবা এটাই হয়তো জীবনের খাঁটি সত্য। দুনিয়ার অনেক সত্য জিনিষই মিথ্যার আবরণে ঢাকা থাকে কিনা (সুগার কোটেড্ কুইনিনের মত), তাই মানুষে সচরাচর মিথ্যা জিনিষটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে। যারা তা করে না তারাই অধিক বিভ্রান্ত হয় আর ঠকে ততোধিক। জীবনের সত্য আদর্শ যাই হোক্ না কেন, এটাই চলতি দুনিয়ার সাধারণ সহজ নীতি যা গ্রহণ না করে বেঁকে দাঁড়ালে লোকে বোকা বলে অবহেলা করে পায়ে ঠেলে দেয়। আদর্শের মূল্য শুধু আদর্শ হিসাবেই, তাকে বর্ত্তমানের সমাজ ধারার জীবনের চলার পথে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলেই অনেক দুঃখ পেতে হয়, কেন না সুবিধাবাদের ভিত্তির উপর গড়া মানুষের সমাজ আদর্শবাদী মোটেই নয়;—বর্ত্তমান দুনিয়ার আদর্শ মানে পাঠশালার ছেলেদের দ্বারা বই-মুখস্থ-করা অর্থ-না-বুঝা কতকগুলো ফাঁকা বুলি। উদাহরণ স্বরূপ, ছেলেরা মুখস্থ করে 'পিতামাতাকে ভক্তি করবে'; পিতামাতাকে ভক্তি করার কি ঔচিত্য ও কতটুকু এর সার্থকতা এবং ভক্তি করা কাকে বলে, শিক্ষক মহাশয় বর্ত্তমানের সমাজ জীবনে প্রয়োজনহীন বলেই সে সম্বন্ধে অর্থ পরিষ্কার করে কোন বক্তৃতা দেন না; ঐ বুলিটা মুখস্থ করা হলো কিনা এবং শব্দগুলোর বানান আয়ত্বে এলো কিনা, সেটাই এখানে শিক্ষক মহাশয়ের একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ জন্যে দোষ দেব কাকে? সামাজিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে গোড়া ধরে টান দিতে হয়, এবং সে দোষটা অপরিহার্য্য ভাবে রাষ্ট্রনায়কদের ঘাড়েই পড়ে।

আমি যা চাই তা পাই না; যা পাই তা সহজে নিতে চাই না। কেন এরকম হয়? আমার গণ্ডীর বাইরে যেটা সেটাই হয়তো আমার চাওয়া হয়ে থাকবে; এবং যেটা পাই, সেটা না চেয়ে পাই বলেই হয়তো সহজে নিতে চাইনা। যা চাওয়ার অপেক্ষা রাখে না, সেই অনায়াস-লভ্য জিনিষটিকে মনের সঙ্গে রফা করে নেওয়া তাই মোটেই সহজ হয়ে উঠে না, সেটা যত খাঁটিই হউক না কেন। অথচ চাওয়ার জিনিষটি দুর্লভ বলেই ত দুর্মূল্য;—মনের সত্য আর জীবনের সত্য ভিন্ন বলেই মনের চাওয়া-পাওয়ার নিক্তির ওজন নির্দ্দেশক কাঁটাটা ভারসাম্যের স্থির নির্দ্দেশে অচঞ্চল হয়ে আজও দাঁড়াতে পারছে না।

পুরোনো দিনের কথা ফিরে ফিরে মনে পড়ে। কার উপর আমার কতখানি অধিকার? দুনিয়ার সকল দিকেই আজ এই অধিকারের প্রশ্নটাই সকলের চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যাকেই আমি অধিক কাছে টানতে চাই, সেই আমাকে অবহেলা দিয়ে দূরে ঠেলে দিবে। আর যাকে মায়া এবং মোহ ভয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, সেই ফিরে ফিরে নিষ্ঠুর কৌশলে আমার দুর্ব্বল হৃদয়-দুয়ারে আঘাত হানবে। যার চতুর্দ্দিকে আমি বৃত্তের পরিধির মতন একটা আবেষ্টনীর গণ্ডী টেনে দিতে চাই, এবং তার কেন্দ্রস্থল থেকে আবদ্ধ সমস্ত জায়গাটুকুতে এক চেটিয়া অধিকার নিয়ে রাজত্ব করবার কথা, সেখানেই অধিকারের দাবী নিয়ে অন্যায় মতন

কেবল কাড়াকাড়ি লাগবে ; এবং আমার এই ক্ষুধার অন্ন কেড়ে খাওয়ার জন্যে যারা অমন ষড়যন্ত্র করে, তারা এতই একতন্ত্রী, তাদের রুচি এতই অমৃত এবং অশ্লীল যে তাদের তথাকথিত নীচ হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি লালসাটাকে মিটাতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায় যে তারা সেখানে অনধিকার চর্চ্চা করছে, এবং যার অধিকারের দাবী নিয়ে সমালোচনার তর্ক তুলছে, সেখানে এসব প্রশ্ন উঠতেই পারে না ; কেননা সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমার একান্তিনেহকত্ব বিরাজ করে, সামাজিক নিয়মে ত বটেই। এবং এই দুঃখটা আরও গভীর হয়ে উঠে তখনই যখন দেখতে পাই যার জন্যে আমার হৃদয়ের এমন আকুলতম আবেদন, সেটা কদাচিৎ তার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয় অর্থাৎ আমার অন্তরের দোলা তার অন্তরে মোটেই রেসনেন্স (Resonance) জাগাতে পারে না, কেবল ফোর্সড্ ভাইব্রেশন (Forced Vibration) লাগানোর মতই তার ঝোঁক, আর সেই ষড়যন্ত্রগুলোও দস্তুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রোমাধারী। কাজেই আমি যখন অন্যায় মতন মানসিক আঘাত পাই, কাছে থেকেও অন্যায় মতন সেটার প্রতিবাদ অভীপ্সিত জনের কাছ থেকে আমার পাওয়া একেবারে দুর্লভেরও অতিরিক্ত হয়ে উঠে।

কেন ওরকম হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এপ্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্নের উত্থাপন করতে হয়, সেটা হচ্ছে,—'মানুষ কি চায়?' মানুষ যেহেতু অস্থাপি কিয়দংশে পশু, এবং ডারউইনের ইভলিউশন্ থিওরী যখন বলে মানুষ বানরের রূপান্তর, কাজেই এতদিনের সংস্কৃতির সঙ্গে এই বিংশশতাব্দীর যতখানি বৈজ্ঞানিক প্রগতির সংযোগই ঘটুক না কেন, মানুষ তার আদিকালের বাঁদরামী স্বভাবটাকে আজও চাপা দিতে পারেনি। মানুষ তার নগ্ন বর্ব্বরতার উপর একটা বাহ্যিক ভদ্রতার কোট্ গায়ে দিয়েছে মাত্র ; এবং যখনই তার আদিম মানসিক মনোভাবের উত্তাপ থেকে থেকে বেড়ে উঠে, তখনই সে বাইরের এই ভদ্রতার কোটটাকে খুলে ফেলতে বাধ্য হয়, গায়ে অশ্লীলতার ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে তার বধরুচি মিটায়। এজন্যেই দিকে দিকে অধিকারের কাড়াকাড়ি।

এই কাড়াকাড়ি যাতে না লাগে, সেই উদ্দেশ্যেই ত জাতি সঙ্ঘের আড্ডা বসেছে, মানুষ তার সমাজ গঠন করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় করেছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের কামনা পোষণ করেছে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাইকোলজীর' ডিগ্রোমাধারী অপোগণ্ডরা যদি মানুষের সাধারণ প্রয়োজনে গড়া সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন চলা ফেরা আচার অনুষ্ঠানে অন্যের কোমল মনোবৃত্তিতে অন্যায় মতন আঘাত হানে, তখন এর চেয়ে অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আর আমি যাকে চাই, সে কেন আমাকে ধরা দেয় না, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি কেবল ফিরে ফিরে আমার অ-দৃষ্ট জীবন-দেবতাকে অভিশাপ দিই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুঁটিনাটি সব কিছুই নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি সূত্র এই নিয়ম-শৃঙ্খলের ক্রমানুযায়ী সাজানো এক একটি আংটা ; এবং বিজ্ঞানের প্রগতি মানেই ক্রমবর্দ্ধমান এই শৃঙ্খলে একটির পর আর একটি সুষ্ঠু সুঠাম নিয়মের আংটির সংযোগ সাধন...এই জাতীয় বিভিন্নমুখী নিয়মের শৃঙ্খল গুলোর মূল উৎপত্তি স্থল কিন্তু একটিই ; এবং সেটি হচ্ছে জীবন দর্শন...পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রগুলো মূল জ্ঞান-কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। বিশ্লেষণ করে দেখলে বলতে হয়,—এদের মধ্যে তফাৎ এই যে 'দর্শন' হচ্ছে,—The knowledge of the Universe as a whole ; আর বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে,—What is felt should be established as a fact by experimental proof.

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—Knowledge is power. কিন্তু এই power worshipping মনোবৃত্তি কেন হয়? সংস্কৃতে আছে,—বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। সকল প্রবাদেরই মূল উদ্দেশ্য একই অর্থে নিহিত। সেটা

হচ্ছে,—মানুষ স্বার্থপর, অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে প্রত্যেক মানুষ চায় এ পৃথিবীতে রাজত্ব করতে ...ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তখন মনের কাছে বড় একটা ঘেঁসে না, যদিও সকলেই জানে, মৃত্যুই হচ্ছে ঐহিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবু কেন মানুষে দ্বন্দ্ব বাধায়? এইজন্যে যে, যতদিনই সে বেঁচে থাকে, ততদিনই সে চায় অন্যের উপর টেক্কা মেরে প্রভুত্বের অধিকার নিয়ে টিকে থাকবার জন্যে। শক্তিমান দুর্ব্বলের উপর টেক্কা মারে, এই তো দুনিয়ার নিয়ম। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে এই একই নীতির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়; এই একই নেশা ছিল আলেকজাণ্ডারের, এই একই নেশা ছিল তৈমুরের। জ্ঞানের অনুশীলন মানে শক্তিরই আরাধনা। মানুষ আজ অতিথিশালা গড়ে অতিথি পোষবার জন্যে নয়, ওর দ্বারদেশে নিজের নাম ফলক গোঁথাই করে রাখবার জন্যেই। স্বার্থপরতাটা যদি মানুষের মজ্জাগত না হত, তা হলে বুঝি পরস্পরের মধ্যে কোন আকর্ষণ থাকত না! স্বার্থের খাতিরেই মানুষের প্রয়োজন হয় শক্তিপূজার;—হতে পারে সেটা ধনশক্তি, বাহুশক্তি কিংবা জ্ঞানশক্তি।

প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা সূত্রের যথার্থ চিরন্তন সামঞ্জস্য বর্ত্তমান; কিন্তু মানুষ সর্বকালে সর্বযুগে নিজের প্রয়োজন মত তার ধর্ম্মশাস্ত্রে, রাজনীতি, সমাজ এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের আইন রচনা করে; ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞাও চাহিদানুযায়ী থেকে থেকে রূপ বদলাতে বাধ্য হয়। তদনুযায়ী যে কালে যে দল অধিকতর শক্তির অধিকার অর্জ্জন করেছে বলে দাবী জানায়, সে কালে সেই দলের অনুকূলেই চলতি দুনিয়ার আবহাওয়াটা বইতে থাকে···সেটা তখন যত কৃত্রিমই হোক না কেন, তাকেই লোকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অনেকে সেটা সহজে স্বীকার করতে চায়না বলে এবং যতদিন এ প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, ততদিন এ নিয়ে মাথা ঘামাঘামি হয় বলেই পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়,—অতি আদিকালেও যুদ্ধ ছিল এবং বর্ত্তমানের বিংশশতাব্দির সভ্য(?) দুনিয়াতেও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় নি! দিকে দিকে তাই সুবিধাবাদের অগ্নিজ্বাল, অসন্তোষের বিষবাষ্প।

গতিশীল দুনিয়ার নিউটন গতির তৃতীয় নিয়মের সত্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন,—'To every action, there is an equal and opposite re action তাই হয়

আঘাত করলে তার প্রতিঘাত আসবেই। প্রত্যেক বিনিময়েরই প্রতিক্ষণন আছেই; ধ্বনি করলে তার প্রতিধ্বনি উঠবেই। একেই বলে কর্ম্মফল। দুনিয়ার প্রত্যেক পদার্থেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে, এই পদার্থের সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই; সৃষ্টির প্রথম থেকেই সে আছে। শক্তির বৃদ্ধি বলে আমরা যেটা দেখতে পাই, সেটা এই আদি নির্দ্দিষ্ট শক্তির রূপান্তর গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিয়ম জিনিষটা হচ্ছে যেন গেঞ্জির সুতোর মতন, মাথা খুলে একটার মুখ ধরে টান দিলে ক্রমানুযায়ী সব কটা বের হতে হতে মূল অবধি চলে আসে। বিজ্ঞান বল, সাহিত্য বল, রাজনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, মানুষের গড়া সমাজ এবং সকলের মূল জীবন-দর্শন—সব কিছুর ঘাটাঘাটি ব্যাপারেই মানুষ তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটি মুহূর্ত্তও উপেক্ষনীয় বলে অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না, অথবা উদ্দেশ্য পালনে বৃথা ব্যয় করে নষ্ট করে দিতে চায়না;—ভবিষ্যতের জীবন-তালিকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তার হিসাব করা।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যটা কিসের? সাম্যের না সুবিধাবাদের, ন্যায়ের না স্বার্থপরতার? এ নিয়ে প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন এর যথার্থ জবাবটাও ওই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।

বজ্র বিষাণ বাজো !

শ্রীমণি ভট্টাচার্য

গো-ধূলির তারা উঠিবে না আর
আমার জীবন-নভে,
ফাগুনের দোলা—'সে তো বহুদূর
চির-পরবাসী র'বে।
বিহগ-কাকলি নহে মোর তরে,—
জোছনায় বন-বীথি,
ছায়া নিয়ে খেলা মিছে দু'টি বেলা
—সবাকার হো'ক ইতি !
প্রেমিক-প্রেয়সী কুসুম-শয়নে
বেভোল, আত্মহারা !
জানে নাকো' তারা পৃথিবীর বুকে
বহিছে অগ্নি-ধারা !
তা'রা তো দেখেছে পুবে রাম ধনু
শত কল্পনা-ভরা !
—আমি যে দেখেছি তুফান-বর্গী
ফসল উজাড়-করা !
তা'রা তো দেখেছে আকাশের বুকে
চাঁদিনী-তারকা-মালা ,
—আমি যে দেখেছি প্রেতিনীর হাসি
বিজলি চটক-জ্বালা !
তা'রা তো শুনেছে দখিণ পবনে
মিলন-বিরহ-গীতি ;
—আমি যে শুনেছি শবের রোদন—
অভিশাপ নিতি নিতি !

* * *

ফাগুনের খেলা হয়ে গেছে শেষ ;—
আষাঢ়ের গরজন !
কম্পিত কোরো ভীরু হিয়া যত
বিলাস-কুজবন !
ভাংগো আজি ভুল ! উল্কা-চমকে
বজ্র-বিষাণ বাজো !—
ধ্বংসের রূপ দেখে নিক্ যা'রা
সুপ্তি-অন্ধ আজো !!

'জানামি ত্বাম্'—

শ্রীমতী বাণী রায়

তুমি শুধু আমার আশ্রয় !
আমি পলাতকা প্রখর দিবস তাপ হ'তে,
নিসঙ্গ এ একাকীর পথে
শীতল বিশ্রাম চাহি বাহুশাখা মাঝে।
আমার জীবনে ঘেরি নিঃশব্দ গোপনে
তোমারি আশ্বাসবাণী বাজে।
তুমি একা আশ্রয় আমার !—
সহস্রজনতা বক্ষে জীবন-স্পন্দন,
—আমারও স্পন্দন, বন্ধু—কান পেতে শুনি।
তবু জানি এ জনতা যৌবন-প্রলাপ,
শ্রাবণের অন্ধকারে অকাল ফালগুনি !
অন্তরের গুঢ় অন্তস্তলে,
যেথা চিরবৃদ্ধা বসে থাকে,
সে নৈরাশ্য-হুতাশার চোরাকক্ষতলে
চাহি-না তো গান ;
চাহিনা মুখের ভাষা ;
খুঁজে মরি প্রাণ।
সেই মম পলাতকা প্রতিটি নিমেষে
তুমি শুধু আশ্রয় আমার।
তোমার আমার ক্ষণ-সংসর্গের ঘরে
তোমারে কি করেছি রচন ?
সম্পূর্ণ মানবরূপে দেখিনি তো চেয়ে,
প্রেমিকের রূপে করি চির আবাহন।
তোমার প্রেমের চেয়ে জানি তুমি বড়,
তুমি মহীরুহ !
দেখি মোহভঙ্গে আজ মেলিয়া নয়ন,
তুমি একা নহ তো আমার।
অনন্ত আশ্রয় তুমি আরো সবাকার।
ভেঙ্গে ফেল মন্দির দুয়ার—
সঙ্কীর্ণ পরিধি হ'তে মূর্ত্তিখানি আনি
স্থাপনা করিব আজি বিশ্ববেদী তলে।
তুমি যে একেলা মম, এই গর্ব্বটুকু
মুছে দেব ম্লান আঁখিজলে।

"আধুনিক বাংলা গান"

শ্রীজয়দেব রায় এম এ, বি, কম, বি, এসসি,

আধুনিক বাংলা গান এক বিচিত্র সৃষ্টি! রবীন্দ্র উত্তর যুগের বাংলা সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের যে বিপরীত, Anti Romantic অবনতি আসিয়াছে, আধুনিক বাংলা গান বা Modern Songs তাহারই অন্যতম নিদর্শন! সুর লক্ষ্মীকে অপমান করিবার জন্য যতগুলি কৌশল তাঁহার ভক্তগণের জানা আছে, সবগুলিকেই আজ গানে নিয়োগ করা হইয়াছে! গানে সুরের অংশ যতদূর কম করিতে পারা যায়, সুরকে কতভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় তাহার সকল পথই আজ অবলম্বন করা হইয়াছে!

তাহা সত্ত্বেও গান তাহার নিজস্ব মোহিনী মায়ায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতেছে; কিন্তু গায়কেরা Preliminary সুরজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতেছেন, মুগ্ধ তরুণ-তরুণীরা কি শুনিতেছেন নিজেরাই জানেন না! গানের পক্ষে এই রসজ্ঞানের অভাব মহাসংকটের সঙ্কেত!

আধুনিক বাংলা গান বাণী প্রধান! বাণী প্রধান গানের বিচিত্র অবদান আছে, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে বাণীর প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুরের সঙ্গে যত কম হয়, ততই ভালো! আমাদের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী গানে বাণীর অভাব ছিল, কিন্তু গান বহুযুগ হইতে কেবল সুরের ধারাই রসিকের চিত্ত জয় করিয়া আসিতেছে!

বাংলা দেশের গান অবশ্য চিরদিনই ভাবময়, কীর্তন গানের মধ্যেই প্রথম ভাবের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সুরের মিলন হইয়াছে! মহাজনী কীর্তনের পদগুলি সুরের বিজ্ঞানেরও সুন্দর নিদর্শন! হিন্দুস্থানী তেলেনা গানের অর্থহীন বাক্যের মধ্যেও সুরস্পর্শে কি সৌন্দর্য্যের সঞ্চার হয়, তাহা আমাদের অজানা নয়! হিন্দী চতুরঙ্গের রূপ, যেমন—

চতুরঙ্গ গাওরে গুণী সারদা (তালা)
সা-রে-গা-মা তেরে কেটে পদ-পদার্থ দিয়ে
তাল তান সুরে রাগকো দেখিয়ে
লাগে-ডাঁট আর লয়কো সমালিয়ে॥
না ধেরে ধেরে ত্রিম্।
তানানা ত্রিম্ তানানা ত্রিম্ তানানা ত্রিম্।
ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধারা ধারা ত্রিম্।
তিক্ ধোর তিক ধোর ধেরে কেটে ধারা ধারা ত্রিম্
ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধী কৎধা
ক্র্যাং কিটি তাক্ তাক্ ধেটে ক্র্যাং
কিটি তাক্ তাক্ ধেটে ক্র্যাং—কট্ ট্র্যাং-কট্ টাং
ধেড়ে ধেড়ে ধা, টাং ধেড়ে ধেড়ে ধা, টাং ধেড়ে ধেড়ে
ধা॥ (তালা)

কিন্তু অপূর্ব্ব ইহার সুর মাধুর্য্য! ইহার দ্রুত ছন্দ, বিচিত্র গতি, সুর প্রকৃতির সংযোগে ঐ অর্থহীন শব্দগুলি সুন্দরের রূপই প্রকাশ করে!

রবীন্দ্রনাথের মন অল্পবয়স হইতে আমাদের গানের এই রসহীনতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার অসাধারণ কবি প্রতিভার অন্যতম প্রকাশ পথ তাঁহার গান, সুতরাং কবির গান যে বাণী প্রধান হইবেই তাহা আর বিচিত্র কি!

রবীন্দ্রনাথ যে কি ভাবে তাঁহার গানে সুরের ক্ষেত্রে বাণীর প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন রহিয়াছে তাঁহার 'হিন্দী ভাঙ্গা' গানগুলিতেই! হিন্দী গানের সুর ও ছন্দের সাহায্যে তাঁহার কবিতা গানে পরিণত হইয়াছে। গীতাঞ্জলির যুগ হইতে তাঁহার গান সম্পূর্ণ বাণী প্রধান হইয়া সঙ্গীতের মুক্তি সাধন করিল! তাঁহার গানের মিশ্রসুরে ভাবের অংশই প্রধান হইল।

রজনীকান্ত সেনের গান এই গীতাঞ্জলির ধারার গান! শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের পত্রের ভাষায় "রজনী সেনের গান আমার খুব প্রিয়। ভক্তিসঙ্গীতে এমন আন্তরিকতা ও সরলতা বাংলা ভাষায় দুর্লভ বস্তু। আমি এখনো তাঁর গান গেয়ে থাকি।"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য প্রতিভায় তাঁহার কবি প্রতিভার বিকাশ হয় নাই! অতুল প্রসাদ ছিলেন উচ্চাঙ্গ সুরের একনিষ্ঠ অনুকরক, সুতরাং তাঁহার গানে বাণীর প্রাধান্যের সুযোগই ছিল না! কিন্তু কবির প্রতিভার

যাহা সম্ভব হইয়াছিল, শুদ্ধ সুরকারের দ্বারা তাহা কি করিয়া সার্থক হইবে?

রবীন্দ্রনাথের পরে আসিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি আধুনিক বাংলা গানের প্রথম সৃষ্টি তাঁহারই হাতে!

নজরুলের গানে বৈচিত্র্য আছে, তিনি হিন্দু ঐতিহ্যের সাধক, ইসলামী 'মার্শিয়া' গান না করিয়া রামপ্রসাদী গান না করিয়া রামপ্রসাদী গানই তিনি রচনা করিয়াছেন। উদ্দীপনার গান বা Martial Songsএর সৃষ্টি করিয়াছেন, নানা রসের গান তাঁহার বিচিত্র সুর প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। আধুনিক গানের প্রধান যে ধারা অর্থাৎ প্রেমের গান, নজরুলই তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন! কিন্তু নজরুলের প্রতিভা ছিল, সুরের সঙ্গে বাণীর মিশ্রণে তাঁহার কৃতিত্বও আছে! কিন্তু পরবর্তী সুরকারদের অধিকাংশই কেবল অনুকরণই করিতেছেন, তাঁহাদের নিজস্ব সৃষ্টির অভাব প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়!

অনেকের বিশ্বাস রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুকরণেই আধুনিক গানের সৃষ্টি! আমার তাহা মনে হয় না! কাজী নজরুলের গানের ভিত্তিতেই আজিকার বাংলা গান! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুরের যে অসীম প্রভাব আধুনিক গানের প্রতি ছত্রে, তাহা আসিয়াছে Indirect পথে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ বন্ধনের মধ্যে আধুনিক গানে কোনই Direct প্রভাব নাই! তবে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের সুরের ছায়াপাত ঘটিতেছে, অবশ্য সেইজন্যে দোষ দেওয়া না! কারণ কবির গান আজ আমাদের দেশের cultureএর অন্যতম অঙ্গ, অবচেতন মনে তাঁহার নানা গানের সুর স্থায়ী আসন পাইয়াছে! সামাজিক Status রাখিবার জন্য বড় লোকের বাড়ীতে Drawing Room এর অর্গানে বাজাইবার জন্য নানা ভাবের নানারঙ্গের গানে আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহার সুরের ধারা বহিয়া আসিতেছে! তাঁহার নাটকের গানগুলি, সুররূপ প্রাপ্ত কবিতা গুলি আমরা নানা সময়ে ব্যবহার করিতেছি, তাঁহার প্রভাব এড়াইবার চেষ্টা বাতুলতা!

নজরুলের পরে কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা হইল, গানে Division of power হইয়া গেল! কোন প্রতিভাশালী কবি আর গানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন না; সুতরাং গান আসিয়া পড়িল নিকৃষ্ট রচয়িতার ভাগে! তাঁহারা রবীন্দ্র রচিত গানের কথাই অল্প বদলাইয়া লইলেন চাঁদের আলো, দখিন হাওয়া, শিউলি, বেলা চাঁপা প্রভৃতি কয়েকটি ফুলের নাম, ফাগুন দিনের মধুর খেলা প্রভৃতি রবীন্দ্র গীতি সঙ্গীগণকেই ব্যবহার করিয়াছেন! গানের প্রধান অংশ অর্থাৎ সুরটি যাঁহাদের অধিকারে সেই গায়কেরাও গানের কথার উপরও কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, গানের উপর তাঁহাদের কোন মায়া নাই, সুতরাং তাঁহাদের সুবিধা মতো দুইটি একটি কথার বদল করিয়া গানটিকে রবীন্দ্র সুরের standard ছাঁচে ফেলিতেছেন! ঠিক্ মাপ হইল কিনা, খাপ খাইল কিনা, সেই সব দেখিবার সময় তাঁহাদের নাই! শ্রোতারা যাহা পাইবে, তাহাতেই যখন খুশী, তখন আর কষ্টের প্রয়োজন কি? অতএব গানের কথা ও সুর উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ আর নাই। গায়কেরাও স্বাধীন, কোন 'ঘরোয়ানা'র নয়! কোন রাগিণী, কোন ছন্দের বাঁধন কিছুই এই গানে নাই, একই সঙ্গে ভৈরবী, পূরবী, বিভাস, ইমনের ইচ্ছামত মিশান হইতেছে, সুবিধামত রবীন্দ্র সুরের কলি জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তাহার উপর আছে আবার বাজনা! আমাদের দেশের গানে বাজনা করিত সঙ্গত, কিন্তু ইংরেজী গানের অনুকরণের গানের প্রধান অংশের ভার দেওয়া হইয়াছে অর্কেষ্ট্রাকে! ফিল্মের গানের চাহিদায় অর্কেষ্ট্রার অংশস্বরূপ গানকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরও বড় পরিবর্ত্তন আসিল, style বা গায়কীর প্রভাবে! গানের পথে গায়কী একটি বড় factor। রবীন্দ্র সঙ্গীত তাহার গীতিরীতির জন্যই সুন্দর! কিন্তু যে গানের সুর ভালেই দোষ তাহার আবার গায়কীর বৈশিষ্ট্য কোথায়? তবু আধুনিক গানে এই style হইয়াছে এক মস্ত অঙ্গ।

মল্লিক, মুখার্জী, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির গাহিবার ধরণেই আধুনিক গানের সুরও গঠন হইতেছে! এই সকল মল্লিক মুখার্জিরাই যখন গানের স্রষ্টা, তখন তাহাদের প্রভাবও এড়ান সম্ভব নয়! গানটি শেষে দাঁড়াবে গায়কের রুচিরই উপর!

Western Music গত কিছুদিন হইতে রেডিও এবং সিনেমার দৌলতে সাধারণে পরিচিত হইতেশুরু করিয়াছে! এই ইংরাজী গানের নানা বিচিত্র ভঙ্গী, তাহার Dramatic প্রকাশ, Modulation, Permutation, Abrupt Voice Change, প্রভৃতি যথেচ্ছাচারে অবলম্বন করা হইয়াছে! পাশ্চাত্য সঙ্গীতে classic এবং Modern ভাগ আছে তাহা কালানুক্রমিক মাত্র, আমাদের গানের মতো এত বিপ্লবাত্মক মোটেই নয়।

এইগুলি ছাড়াও গ্রাম্য গানের প্রভাবও আছে আধুনিক গানে! গ্রাম্য সঙ্গীতে রাগরাগিণীর বালাই নাই। সহজ সুরে সহজ কথাটাই প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া ভঙ্গী চলিয়া আসার ফলে, এই ভঙ্গীগুলি প্রতি গানেই স্থায়িত্ব পাইয়াছে: যেমন আখর ধুয়া প্রভৃতি। এই সবের মধ্যে যেটিকে ভালো লাগিয়াছে, আধুনিক গানে তাহারই প্রয়োগ করিবার পথও করিয়া রাখা হইয়াছে! যে সময়ে যে ভঙ্গীর Fashion তাহারই প্রচলন করা হয় এই সকল গানে!

দিলীপ বাবুও আধুনিক গানের স্রষ্টা, কিন্তু তাহার একটি গানের সঙ্গে অপর একটি গানের সুর গঠনে সাম্য আছে। এই সুর সৌষম্যই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক! কিন্তু অন্যান্য সুরকারের রচিত গানের মধ্যে কোনই মিল নাই, ইহাই প্রমাণ করে সুরকারদের অক্ষমতার! আমি বহু প্রসিদ্ধ গায়ককে জানি যাঁহারা কি গাহিতেছেন, নিজেরাই বলিতে পারেন না!

মহিলা Composer আমাদের দেশে নাই, তবু বলিব আমাদের আধুনিক গান প্রায় সমগ্র অংশই তাঁহাদেরই জন্য রচিত! পুরুষের গাহিবার উপযুক্ত গান আজ বাংলা দেশে সৃষ্টি হয় না।

রসের বিভিন্নতায় যে বাংলা গান ছিল, আজ তাহা বিলুপ্তির পথে। সব গানই বিরহের, হতাশের, প্রেমের ব্যর্থতার। জাতীয় সঙ্গীত অবশ্য দুই একটি নূতন রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেনের "বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি" গানটির উল্লেখ করিব!

শ্রীযুক্ত রাজেন্দু দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান যুগে আধুনিক গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রীযুক্ত জগৎ ঘটক, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মিত্র প্রভৃতি দুই একজন প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টা এখনও আছেন বলিয়া মনে করি! তবে আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার; যে 'নজরুলী গান' লইয়া এত হট্টগোল, সাদা চোখে দেখিতে গেলে সেই গানের মধ্যে এমন কিছুই নাই, অবশ্য রবীন্দ্র অনুকৃতি ব্যতীত, যাহা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে!

আষাঢ়ে

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

উঁকি মারে আষাঢ়ের পূর্ণিমা চাঁদ,
এইখানে এই ঘাটে তরী আজ বাঁধ।
আকাশেতে মেঘ নাই, নদী ভরা জল,
ভেসে আসে মালতী ও যূথী পরিমল।
তরু শাখে এখনো যে ফিঙা দেয় শিষ্,
বনভূমি বলে যেন 'জয় জগদীশ'।
দূর গ্রামে মিটি মিটি জ্বলিতেছে দীপ,
আকাশে মাথার পরে ডাকিছে টিটিভ।
উল্লাসে চাঁদ পানে চেয়ে রই চুপ
দেখি নাই বহুদিন হেন তার রূপ!
আষাঢ়ের চাঁদ আর আষাঢ়ের জল—
স্নাত, পূত, ধৌত করেছে ধরাতল।
দূষিত ও কলুষিত আছে যেথা লোক,
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ নির্ম্মল হোক।
চারিদিকে সুষমার আজ সীমা নাই
ভাবি ধরণীকে দেব-দেউল বানাই।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

ফুটবল লীগ :—কলিকাতার ফুটবল লীগের শেষ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং লীগ খেলার আকর্ষণ ও প্রতিযোগিতা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল বর্ত্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষে থাকিলেও মোহনবাগান এবং রাজস্থান দলের সহিত তাহাদের ব্যবধান অত্যন্ত সামান্য হওয়ায় লীগ বিজয়ের জয়টীকা কাহার ললাটে অঙ্কিত হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে আগামী ১৫ই জুলাই মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের এবং ২৬এ জুলাই মোহনবাগান ও রাজস্থান দলের খেলার ফলাফলের পরেই।

যদি ইষ্টবেঙ্গল দল তাহাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া প্রথম লীগের খেলার মত মোহনবাগান দলকে পরাজিত করিতে পারে তবে গত বৎসরের সম্মান হইতে এবৎসরেও তাহারা বঞ্চিত হইবেনা একথা বলা চলে।

জর্জ্জটেলিগ্রাফ লীগ খেলার প্রথমার্দ্ধে শক্তিশালী দলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দর্শক মনে যে উচ্চাশার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল ফিরতি খেলায় তাহাদের সে নৈপুণ্য প্রকাশ না পাওয়ায় বেশ কিছুটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। মহঃ স্পোর্টিং দল বর্ত্তমান বৎসরে অনেকগুলি খেলায় ড্র করিয়া ও কয়েকটি খেলায় পরাজিত হওয়ায় তাহারাও লীগ বিজয়ের সাম্ভব্য স্থান হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। মহঃস্পোর্টিং দলের এ বৎসরে এরূপ পরিণতি হওয়ার প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের সেণ্টার হাফের সমস্যা। উপযুক্ত সেণ্টার হাফ না পাওয়ায় দলের মেরুদণ্ডই দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় অন্যান্য স্থানে কুশলী খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও কোনরূপ ভাল ফল দর্শাইতে পারিতেছেনা। ক্যাল গ্যারিসন দল গত বৎসরের মত এবারেও লীগের শেষাশেষি যেরূপ শক্তিশালী দল গঠন করিয়াছে তাহাতে তাহারা প্রথম শ্রেণীর যে কোন দলকেই সহজে রেহাই দিবেনা একথা জোর করিয়া বলা চলে।

লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান

(৯ই জুলাই পর্য্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
ইষ্টবেঙ্গল	২০	১৪	৪		৪৩	৫	৩৫
মোহনবাগান	১৮	১৩	৪		৩৬	৭	৩০
রাজস্থান	১৮	১২	৫		২৩	৪	২৯
মহঃ স্পোর্টিং	২১	১৮		৩	২০	৯	২৬
জর্জ্জটেলিগ্রাফ	১৯	৮		৪	২২	১২	২৩
স্পোর্টিং ইউঃ		৮		৬	১৫	১৪	২২
ভবানীপুর	১৮	৪		৫	২৪	২১	১৮
ই,আই,আর	১৭			৬	২১	১৭	১৭
এরিয়ান্স	১৮			৯	১৭	২৬	১৬
কালীঘাট	১৮			৭	১৯	১৬	১৪
ডালহৌসী	১৯		৪	১২	৭	২৬	
বি,এন,আর	১৯		৪	১২	১৭	৪০	
ক্যালঃ গ্যারি	২১		৪	১৪	১৪	৫০	
ক্যালকাটা	১৮		৩	১৫	৬	৩৮	

খেলাধুলা সাংবাদিকদের ফুটবল খেলা :—এই মাসের খেলাধূলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইতেছে খেলাধূলা সাংবাদিকগণের ফুটবল খেলা। গত ১৭ই জুলাই ভবানীপুর মাঠে ইংরাজী সংবাদ পত্রের সাংবাদিকগণ বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ইংরাজী সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ ২-১ গোলে জয়লাভ করেন।

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের অধিকাংশ সাংবাদিকগণ এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। খেলোয়াড়দের বয়সাধিক্য, স্থূলদেহ ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য খেলাটি তিন চক্রে ১৫ মিনিট করিয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক চক্রেই উভয় পক্ষেই কিছু কিছু খেলোয়াড়কে অবসর লইতে দেখা যায়।

প্রথমচক্রে খেলাটি পরিচালনা করেন বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ও ভারতের ক্রীড়াজগতের জনপ্রিয় শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত। দ্বিতীয় চক্রের পরিচালনার ভার অর্পিত হয় ভবানীপুর ক্লাবের সম্পাদক শ্রী এন এন মিত্রে'পর, এবং তৃতীয় চক্র পরিচালনা করেন, কলিকাতা ফুটবল ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক জার্জ্জিয়াডি।

খেলাধূলার চুলচেরা হিসাব যাহারা নিয়মিত করিয়া থাকেন, প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়েরা যাহাদের সামান্য প্রসংসাটুকুর জন্য উদগ্রীব থাকেন তাহারা যে কিরূপ ধুরন্ধর খেলোয়াড় তাহা দেখিবার জন্য মাঠে অগণিত দর্শক সমাগম হয়।

খেলার শেষে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি ডাঃ এস কে গুপ্ত পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং ভবানীপুর ক্লাবের সম্পাদক শ্রী এন, এন মিত্র জলযোগে খেলোয়াড়দিগকে ও উপস্থিত নিমন্ত্রিত অতিথিদিগকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা :—গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফুটবল মাঠে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতেছে তাহাতে কলিকাতার ফুটবল খেলা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে যে আর বেশীদিন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবেনা তাহার পূর্ব্বাভাষ এ বৎসরেও দু'তিনটি খেলায় এবং গত ৮ই জুলাই তারিখের ইষ্টবেঙ্গল বনাম রাজস্থান দলের খেলাতেই বোঝা গিয়াছে। নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্য রেফারী বা খেলোয়াড়দের প্রতি হামলা করা যে কতবড় হীনতা বা নীচতার পরিচয় তাহা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে লজ্জিত হইতে হয়।

আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি অথচ স্বাধীন দেশের নাগরিকদের যে সামান্যতম বিবেক বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা তো আমাদের নাই-ই পরন্তু দেশের গৌরবের কোন বস্তুকে যদি আমরা অবনতির পথে ঠেলিয়া দিতে পারি তবে গৌরব বোধ করিয়া থাকি।

বাঙ্গালা দেশ ভারতের ফুটবলের জন্মস্থান এবং বাঙ্গলার ফুটবল খেলোয়াড়েরাই এই খেলা সম্বন্ধে দেশ বিদেশে সুনাম প্রতিষ্ঠিত করে। সেই বাঙ্গলার ফুটবল যে আজ কোন পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা দেখিয়াও আমরা বিন্দুমাত্র ভীত বা আতঙ্কিত হইনা।

আজ যদি এই উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত কঠোরতার সহিত বন্ধ না করা হয় তবে শুধু খেলাধূলা বিষয়ে নহে জাতির অন্যান্য বহু সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাষ ইহা হইতেই সূচিত হইবে।

পুস্তক পরিচয়

রেনেসাঁ আন্দোলন ও ভারতবর্ষ

সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ প্রণীত এবং শ্রীরামগতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৯১ বি, সিমলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য ছয় আনা মাত্র।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বুর্জোয়া নূতন ভাব-সমষ্টি ও নূতন বিশ্ব-দর্শন নিয়ে তৎকালীন ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলো যুক্তির শাস্ত্রাঘাত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ ব্যবস্থায় যখন নাগরিকের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না তখন প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার তাদের আছে আর ঐ বিশ্বাসের জোরেই প্রথমে ফ্রান্সে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে সারা ইউরোপে জ্বালিয়ে দিল এক বিপ্লবানল। সেই বিপ্লবকেই বলে, "রেনেসাঁ আন্দোলন"।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পুস্তিকাটীর বিষয় বস্তু হচ্ছে ঐ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, উপায় এবং ফলাফল। পুস্তিকাটীর কলেবর অপেক্ষা উহাতে আলোচ্য বিষয় বস্তুর গুরুত্ব হচ্ছে আরও অনেক বেশী। মধ্য-যুগের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ত্তমান ভারতে এবং ইউরোপে একটী সুদৃঢ় "রেনেসাঁ আন্দোলন"এর প্রয়োজন যে খুব বেশীই হয়ে উঠেছে তা'তে সন্দেহ নাই। এর পূর্ব্বে ঐরূপ যতগুলি আন্দোলন হ'য়ে গেছে, বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষ সেই সমস্ত আন্দোলনের অকৃত-কার্যতার কারণগুলি সম্বন্ধে অতি সহজেই সতর্ক হ'তে পারে। সেই সম্বন্ধে এই পুস্তিকাটীতে লেখক বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করেছেন।

উহার একটিস্থানে তিনি লিখেছেন, যে সেযুগে অব্রাহ্মণ ও নারী জাতির পক্ষে বেদচর্চা অমার্জনীয় বলে পরিগণিত হ'ত। ইউরোপে সে সময় ঠিক কি হ'ত বলতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের (পূর্ব্বকালে) পক্ষে একথা প্রজোয্য হ'তে পারে না। কারণ আমরা দেখতে পাই যে বেদচর্চা তো দূরের কথা বৈদিক যুগের আর্য নারীদের মধ্যে কেহ কেহ বেদমন্ত্রও রচনা ক'রে গেছেন। তারপর "গুপ্ত যুগের" পরবর্তী হিন্দু সভ্যতায়ও নারীর স্থান কম উচ্চে ছিল না।

লেখক বুদ্ধধর্ম ও সভ্যতাকেই ভারতের প্রথম রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যেই যদি "গুরু-বাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়" তবে বুদ্ধ সভ্যতা ভারতের রেনেসাঁ আন্দোলন হয় কিরূপে? কারণ বুদ্ধধর্মে তো অন্ধ-গুরুবাদের প্রাবল্য বড় কম ছিল না।

ছাপা মন্দ নয়। কিন্তু পুস্তিকাটীর প্রুফ ভালভাবে সংশোধিত হয় নি। তবে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীমায় সাব-লীলতা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই। আধুনিক সমাজে বিশেষতঃ যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থক তাঁদের কাছে এটী আদরণীয় হবে বলে আশা করছি।

ডিটেক্টিভ সুধীর রায়। লেখক—গুরুদাস ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিন্যু। কলিকাতা—২৯, মূল্য দুটাকা।

এটি সন্ধানী গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। এটিতে দুটী গল্প আছে। প্রথম গল্পটির সূত্র থেকে দ্বিতীয় গল্পটির আবির্ভাব। দুটি গল্পই একই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার দুটি পথ আছে—বাস্তবতথ্য ও অপরাধের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। প্রথম গল্পটি বাস্তবতথ্য প্রমাণের ও দ্বিতীয়টি সাইকোক্রিমিনোলজিক্যাল তদন্ত। প্রথমটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সাগর পারের গোয়েন্দা পিটার চেনী, লেমী বক্সটন, এলেরী কুইন বা হ্যারকিউ পাইরটকে। দ্বিতীয় গল্পটী সে হিসাবে অদ্বিতীয়। অপরাধের বিশ্লেষণ কোরে অপরাধীর মনের পরিচয় লাভ ও তা থেকে খুনীকে নির্ণয় করা—সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতনতম প্রচেষ্টা বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে এধরণের ডিটেক্টিভ বইয়ের একান্ত অভাব ছিল। ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনার অগ্রগতি কাহিনীর ঘুনুনি ও বলার ভংগী, ভাষা মাধুর্যে অতি সুন্দর। দ্বিতীয় গল্পটি প্রথমটিরই পূর্বসূত্র। এধরণের বর্ণনাকৌশল কোনান ডয়েলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু শেষদিকে লেখক দুজায়গায় সিনেমা-টেকনিকের আশ্রয় না নিলেই পারতেন। গ্রন্থেদপট আকর্ষণীয়, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর একান্ত উপযোগী। মুদ্রাকর প্রমাদ মারাত্মক নয়। বাঁধাই handy.

এ বই পাঠকপাঠিকাদের বুদ্ধি ও চিন্তার সুযোগ দেবে, আমরা বিশ্বাস করি।

সভ্যতার অভিশাপ—[স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত কিশোর নাটিকা]

শ্রীশান্তশীল দাশ প্রণীত। ঘুঘুডাংগা সাগরিকা স্মৃতি মন্দিরের তরফ থেকে শ্রীভাস্করানন্দ রায়, বি, এস-সি কর্তৃক প্রকাশিত। চল্লিশ পৃষ্ঠায় এসে পড়েছে নাটিকার যবনিকা। মূল্য আট আনা মাত্র।

লেখক নাটিকাটিতে মোট এগারোটি কিশোর চরিত্রের অবতারণা করেছেন। বিশিষ্ট চরিত্রের ভেতর অনুপমের চরিত্রটাই সভ্যতার কৃষ্টি ও আভিজাত্যকে সমভাবে বজায় রেখেছে। অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এই আভিজাত্য কথাটি এসেছে। ইংরাজিতে বলে "অ্যারিষ্টো ক্র্যাসি।" কথাটি খুবই উচ্চাংগের, কিন্তু বর্তমানে তথা কথিত নব্য সভ্যতার যুগে আমরা তার আসল রূপকে বিকৃত করে "আড়ষ্ট খাসি"তে পরিণত হয়েছি। গাড়ি, বাড়ি, আর Bank Balance বাড়ালেই জগতে মহৎ ও উদার হওয়া যায় না। চাই অন্তরের স্নেহমাখা মমতা ও প্রীতির আধার। লেখক শ্রীযুক্ত দাশ তাই ধারকরা আভিজাত্যকে উল্লেখ করে অনুপমের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, "মানুষ কি আর মানুষ আছে রে, সব অমানুষ হয়ে গেছে...মানুষের কান্না আর মানুষের মনে করুণা জাগায় না, মানুষের মনে ব্যথা লাগেনা। একজন মানুষ যখন না খেতে পেয়ে চীৎকার ক'রে মরে তখন আর একজন মানুষ তার টাকাগুলো নিয়ে ছিনি মিনি খেলে...মানুষের চোখের জল, মানুষের আর্তনাদ, বেদনার দীর্ঘশ্বাস, সব জমা হ'য়ে আছে এই পৃথিবীর বুকে, অশরীরী আত্মার মতো তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই পৃথিবীর চারিদিকে, একদিন তারা বিদ্রোহ করবে মানুষের বিরুদ্ধে...।" লেখকের স্বপ্ন ও চিন্তাধারা সত্যিই খুব প্রশংসনীয় এবং প্রাঞ্জল ভাষণগুলি আমাদের খুবই ভালো লাগলো। কিশোর বয়স থেকে প্রত্যেক ছেলেরাই যদি এই ধরণের মনোভাব নিজেদের অন্তরে পোষণ করে তা'হলে ভবিষ্যতে তারাই দেশের কর্ণধার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক তাই সরস্বতী পূজা বা অন্য কোনও উৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের অন্য হাল্কা রসিক অনুষ্ঠান না করে সত্যিকার সভ্যতার আসল রূপকে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। যদি কলঙ্কিত কিশোর ছাত্র এই পুস্তিকা খানির দিকে দৃকপাত করে তা'হলে আমাদের মনে হয় নিশ্চয়ই তা'রা বিপুল আনন্দ উপভোগ করতে পারবে এবং হীন মনকে সরলতা ও মধুময় করতে পারবে।

বইখানির বাঁধাই ও ছাপাগুলি সুন্দর হয়েছে।

রসিক জয়ন্তী—[সংকলন গ্রন্থ]

সম্পাদন করেছেন কবিরত্ন শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী এবং সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ থেকে শ্রীবুড়কিশোর ভাগবত ভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। একশ' উনচল্লিশ পৃষ্ঠাংশের পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান ২৭ নং আটা পাড়া লেন, পোঃ কাঁকুড়গাছি। কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়েই পাওয়া যাবে; মূল্য তিনটাকা মাত্র।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনকাহিনী অল্প বিস্তর আশা করি সকলেই জ্ঞাত আছেন। সন ১২৪৪ সালে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এগার মাস মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর, বীরভূম একচক্র গ্রামে এই মহাত্মা ভূষণ মহাশয় গর্ভবাস নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হ'ন। এই স্থানটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের তীর্থস্থান। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা সার্ব্বভৌম বৈষ্ণবাচার্য্য গৌরমোহন চট্টরাজ মহোদয় স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে ছিলেন যে, জাতককে উক্ত শ্রীধামের ব্রহ্মরন্ধ্রে আট দণ্ড ফেলে রাখতে হবে নচেৎ জীবনের আশা সংকটাপন্ন হবে। সুতরাং সেই আদেশই পালিত হয়েছিল—বিধিমতে। অতঃপর সপ্তাহকাল পরে নবজাত পুত্র ও প্রসূতি সহ চট্টরাজ মহাশয় মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে, গঙ্গাতটে তৎকালীন নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুষ্পোদ্যান সমন্বিত বিতল গৃহে ফিরে আসেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতার নাম হয় সুন্দরী দেবী। তিনিও নিত্যানন্দ বংশীয়া কন্যা। এবং পিতার নাম সার্ব্বভৌম শ্যাম সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর প্রাপ্ত বয়সে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ তিন ঠাকুরের অন্যতম। তিনি শ্রীশ্রীগৌরাংগ মহাপ্রভুর "প্রেম শক্তি স্বরূপ" শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সপ্তম পুরুষ। তাঁর প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজ ছিলেন পরমহংস প্রতিম সাংখ্য দর্শন বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সংসারে বাস করেও নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর নব জীবন যাপন করাও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে কালাতিপাত করা বিদ্যাভূষণ মহাশয় উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছেন। সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, শাস্ত্র বেত্তা ও বৈজ্ঞানিকের সংগে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করে দেখতে গেলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিদ্যার ক্ষেত্রে গুরু বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে এইসব মহাত্মা জয়ন্তীর প্রয়োজনও আছে যথেষ্ট আর আকর্ষণও আছে তদনুরূপ। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী। কেউই তাঁদের কথা ভেবে দেখিনা। এই পুস্তকখানি পাঠ করলে জয়ন্তীর কি বিশেষত্ব ও প্রয়োজন তা' সহজেই বুঝা যায়। পুস্তকখানির প্রতিটী প্রবন্ধ ও কবিতা বেশ সহজ ও ভাবসম্ভারে সু-পরিপুষ্ট। একাধারে শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ কবিগণের লেখাই এতে স্থান পেয়েছে। রচনা গুলির মধ্যে শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ, শ্রীকরুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীজ্যোতিঃ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীবিজেন্দ্র লাল ভাদুরী, শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখক ও কবি কুলচূড়ামনিদের রচনাগুলি আমাদের বিশেষ আনন্দ প্রদান করেছে। ভিতরকার ফটোগ্রাফি করেছেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভাদুরী। ছবিগুলি সুন্দর হয়েছে কিন্তু Blockগুলি আরও সুন্দর হ'লে ছবিগুলির মাধুর্য বাড়তো। পুস্তকখানির ছাপা ও প্রচ্ছদ পট মোটের ওপর ভাল। আমাদের মনে হয় "রসিক জয়ন্তী" প্রত্যেকেই একবার পড়লে নিশ্চয় আনন্দ পাবেন।

"পুনশ্চ" [মাসিক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।] সম্পাদক—শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী ১৪১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছ' আনা।

এই নব প্রকাশিত মাসিক পত্রের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যা দেখলাম। প্রথমেই নজরে পড়ে প্রচ্ছদের শ্রী।

অনেকগুলি বিভাগ আছে এই বইটীতে। প্রতিটী বিভাগের পরিকল্পনা বেশ সুচিন্তিত এবং চিত্তাকর্ষক। বিভাগীয় লেখাগুলি সুলিখিত। এঁদের সিনেমা সমালোচনায় যে নতুন ঢঙ দেখতে পেলাম তা' সত্যিই প্রশংসনীয়। গল্পের মধ্যে ছদ্মবেশী এবং ভদ্রস্থ চৌধুরী লিখিত গল্প দু'টী খুবই ভালো লাগলো। শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পটী মোটেই ভালো নয় কিন্তু।

সমগ্র মাসিক পত্রিকাটির মধ্যে যে একটা বৈশিষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে, তা বজায় রাখতে পারলে "পুনশ্চ" পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সন্দেহ নাই।

প্রগতিশীল জাতীয় সাপ্তাহিক

"ফরওয়ার্ড"

নিয়মিত পাঠ করুন

ফরওয়ার্ড হাউস

৩২, আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা—৯

ফোন—বি. বি. ২৬৬০ গ্রাম—ফ্রন্টিয়ার

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

বহুদিন হইতে আগামী তৃতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া পৃথিবীর আকাশে ছাইয়াছিল। গত ২৪শে জুন হইতে সেই ছায়া নিবিড়তর হইয়াছে। সিউলের সংবাদে বলা হইয়াছে যে উত্তর কোরিয়ার সৈন্য বাহিনী ২৫শে জুন ভোরে দক্ষিণ কোরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া সিউলের ৩০ মাইল উত্তরে কেইসং নামক একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র অধিকার করিয়াছে। সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর ২০টি জাহাজ হইতে ১০টি ট্যাঙ্ক লইয়া উত্তর কোরিয়ার একটি রেজিমেণ্ট কাংপুংএ অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উত্তর কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী পিয়ংইয়াং হইতে বেতারে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

যুদ্ধের পরিণতি :—

২৫শে জুন হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধের গতি দ্রুত এক চরম পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল, পরে সিওয়ান উত্তর কোরিয়ার হস্তগত হইয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য-বাহিনী মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট এবং মার্কিণ সামরিক উপদেষ্টা বোর্ডের দ্বারা শিক্ষিত হইলেও ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। বর্তমান অবস্থায় তাহাদের সামরিক সংস্থান বর্তমান আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। হতাহতের সংখ্যা অগণিত। দল ত্যাগের সংখ্যাও নিতান্ত অবহেলার নহে। মার্কিণ বিমানবহর, নৌবহর এবং শেষ পর্যন্ত স্থলবাহিনীও এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর পুরোগামী সৈন্যদল ধর্শাফলকের আকারে চোনানের ১০ মাইল দক্ষিণ ও তায়েজনের ২৫ মাইল উত্তর দিগ্‌বর্তী চোঙ্গুই সহরে প্রবেশ করিয়াছে। তায়েজন সহর সিউল ও পরে সিওয়ান হইতে বিতাড়িত দঃ কোরিয়া সরকারের বর্তমান রাজধানী এবং মার্কিণ সামরিক কেন্দ্র। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর তায়েজনমুখী মূল অভিযান ছাড়াও পূর্বদিকে যুগপৎ কম্যুনিষ্ট সৈন্যদলের আক্রমণে তায়েজনের উত্তরদিকবর্তী এলেকার সমস্ত মার্কিণ স্থলবাহিনী পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একপক্ষকাল পূর্বে উত্তর কোরিয়া বাহিনী যে স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করে, মার্কিণ বাহিনী এখন সেইস্থান হইতে শতাধিক মাইল দক্ষিণে সংগ্রাম করিতেছে।

টোকিওতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তায়েজনের ঠিক উত্তরে চোনান সহরের নিকট এক ব্যাটেলিয়ান মার্কিণ সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ পর্যন্ত তাহাদের সাহায্যের জন্য যে চেষ্টা করা হয় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের হেডকোয়ার্টার হইতে ঘোষিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তায়েজনের ২৫ মাইল উত্তর দিগবর্তী বোলানে ৪০টি কম্যুনিষ্ট ট্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে শত্রুসৈন্যের গতিবেগ হ্রাস পায় নাই।

কোরিয়া রণাঙ্গন হইতে সংবাদদাতাগণের সংবাদ প্রেরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিলেই চলে। তবে টোকিওর সহিত রেডিও টেলিফোনের যোগাযোগ অব্যাহত আছে। কিন্তু রেডিও টেলিফোনে প্রেরিত সংবাদে তথাকার সামরিক অবস্থার কোন উল্লেখ করা হইতেছে না। জেনারেল ম্যাকআর্থারের হেডকোয়ার্টারের জনৈক অফিসার বলেন—কোরিয়ার সহিত টেলিফোন যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে কুম নদীই তায়েজন রক্ষার একমাত্র প্রাকৃতিক রক্ষাব্যূহ।

ম্যাকআর্থারের হেডকোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট সৈন্যেরা কোরিয়ার পূর্ব উপকূল বরাবর তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার অর্থ হইতেছে পুশানের উপর আক্রমণের আয়োজন করা। পুশানেই মার্কিণ সৈন্য ও সমর সম্ভার নামান হইতেছে। মার্কিণ ট্যাঙ্কগুলি দ্রুত রণাঙ্গনের দিকে যাইতেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অস্থায়ী রাজধানী তায়েজন অঞ্চলের উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত সংযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ আরম্ভ করার সম্ভাবনা আছে।

বিমান হইতে সিউলনের আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল পূর্বে অবস্থিত সংজুর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে কম্যুনিষ্ট সৈন্য সমাবেশ দেখা গিয়াছে। উহাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ দুই ডিভিসন হইবে।

কোরিয়ার আক্রমণ ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হইতেছে। এই যুদ্ধের শেষ কোথায় কে জানে। আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রী সরকার আমেরিকা ও ইউ, এন, ও র কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে। এই আবেদন ও ইউ, এন, ও, নিযুক্ত কোরিয়া কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করিবার জন্য স্বস্তি পরিষদের এক জরুরী অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট।

নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়া হইতে সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে যে, এই কার্যের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে এবং তাহাদের সৈন্যদলকে উত্তর কোরিয়ার সীমান্তরেখায় সরাইয়া আনিতে বলিতেছে।

নিরাপত্তা পরিষদ কোরিয়া সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনকে উত্তর কোরিয়ার সীমারেখায় উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদলকে সরাইয়া লইয়া আসার কার্য পর্যবেক্ষণ করিতে এবং এই প্রস্তাব কিভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে তৎসম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে সকল সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিতেছে। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সকল সদস্যকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে এবং উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকারে সাহায্য না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

গত ২৮শে জুন তারিখে স্বস্তি পরিষদ কোরিয়া সম্বন্ধীয় ২য় প্রস্তাবটি পাশ করে। ২য় প্রস্তাবটি এইরূপ :—

নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে যে, উত্তর কোরিয়া বাহিনী কর্তৃক কোরিয়া প্রজাতন্ত্র আক্রমণের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সৈন্যদলকে সীমান্তে সরাইয়া আনিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কোরিয়া কমিশনের রিপোর্টে জানা যায়, যে উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ যুদ্ধও বন্ধ করেন নাই এবং তাহাদের সৈন্যদলকে সীমান্তে সরাইয়াও আনেন নাই। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত অবিলম্বে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্র জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও কোরিয়ার নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত যেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উহার সদস্যগণকে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রকে সেইরূপ সাহায্য দিবার সুপারিশ করিতেছে।

স্বস্তি পরিষদের প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্বেই জাপানে মার্কিন সমর কেন্দ্র হইতে দঃ কোরিয়ার সাহায্যার্থ অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছিল। প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্বেই মার্কিন সভাপতি ট্রুম্যান মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীকে কোরিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফরমোজার উপর যদি কোন আক্রমণ হয়, তবে উহা রোধ করিতে মার্কিন ৭ম নৌবহরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং ফিলিপাইন ও ইন্দোচীনে সাহায্য প্রেরণ তরান্বিত করার জন্যও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আদেশ জারী করিয়াছেন।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী যে প্রতিরোধ চালাইতেছে, উহাতে সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিণ সেনাবাহিনীর প্রতি আদেশ জারী করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপেই তিনি এসকল আদেশ জারী করিয়াছেন।

চীনের মূল ভূভাগে সবপ্রকার নৌ ও বিমান আক্রমণ বন্ধ করার জন্য চীনের জাতীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে চীনা জাতীয় সরকার বৃটেনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছে যে এই অনুরোধ পালিত হওয়ায় বৃটেন চীনের কম্যুনিষ্ট এলাকায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভার সরবরাহ করিতেছে এবং এই অভিযোগ নাকি তাহারা মার্কিণ সরকার ও শান্তি পরিষদের নিকট সরকারীভাবে উত্থাপন করিবে)।

যুদ্ধের গতি দঃ কোরিয়ার প্রতিকূলে দ্রুতভাবে অগ্রসর হইলে ক্রমে ক্রমে মার্কিণ স্থলবাহিনী এবং (সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ) মার্কিণ ট্যাঙ্ক বাহিনীও দঃ কোরিয়ার অবতরণ করিয়াছে। এবং শান্তি পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী সভাপতি ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে ইউ, এন, ও র কোরিয়া সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ইউ, এন, ও র বিশেষ পতাকা ব্যবহার করিবার নির্দেশও দিয়াছেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রকার কার্যকলাপে অগ্রণী। শান্তি পরিষদে গৃহীত তিনটি প্রস্তাবেরই প্রস্তাবক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই দঃ কোরিয়ার সামরিক উপদেষ্টা, বিভিন্ন সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যদানে চুক্তিবদ্ধ। এককথায় বলিতে গেলে দঃ কোরিয়া এশিয়া ভূখণ্ডে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটি।

উত্তর কোরিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাহাদের এই আক্রমণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্ররোচিত দঃ কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং সমস্ত কোরিয়াকে পূর্ব আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একরাজ্যে পরিণত করিবার জন্য করা হইয়াছে।

উত্তর কোরিয়া লোক পরিষদ ৭ জন সদস্য লইয়া একটি সামরিক কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিনা আপত্তিতে এই কমিটির সকল আদেশ মানিয়া লইতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। "সিংম্যানরী'র পরিচালনাধীন যে দস্যুদল এই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দেশের সবত্র জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব" এই কমিটির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। লোকপরিষদ ঘোষণা করিয়াছে যে, অতঃপর দেশের সকল ক্ষমতা এই কমিটির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিবে। সমগ্র লোক সমাজ; সরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, জনসংখ্যা ও সামরিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই কমিটির সর্বপ্রকার নির্দেশ ও বিধান অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে।

উত্তর কোরীয়া সরকার কম্যুনিষ্ট শক্তি সমূহ হইতে নৈতিক সমর্থন ও অপ্রকাশ্যভাবে সামরিক সম্ভারের সাহায্য যে পাইতেছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

চীনা গবর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান মাও সে তুং কোরীয়া, ফিলিপাইন, এবং ইন্দোচীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের হস্তক্ষেপকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদের এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য চীন তথা সারা বিশ্বের জন সাধারণকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইবার আবেদন জানাইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রমূর্তি আজ নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র বটে, কিন্তু দুর্বল কারণ জন সাধারণের সমর্থন তাহার পশ্চাতে নাই। চীনের জনসাধারণ আক্রান্তদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন—মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রলোভন অথবা হুমকির নিকট চীনের জনসাধারণ কিছুতে আত্মসমর্পণ করিবেনা।

মস্কো বেতারে মাও সে তুং-এর এক বিবৃতিতে প্রকাশ, এশিয়াবাসী আমেরিকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে, সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি ও বাধ্য বাধকতা ভঙ্গ ক'রার জন্য তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। চীনের তথা বিশ্বের সাধারণ মানুষ উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন করিবে। এশিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ অচল।

শুধু যাও সে তুংই নহেন সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঃ আন্দ্রেই গ্রোমিকো উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট ও সোভিয়েট প্রভাবিত দেশগুলি ইউ. এন. ও র সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানই বয়কট করিয়াছে। তাহাদের এই কার্যের কারণ হইতেছে ঐসব প্রতিষ্ঠানে কে, এম, টী প্রতিনিধির চীনা জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিতি; তাই স্বস্তি পরিষদে যে কোরিয়া সম্বন্ধীয় তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সেই সেই অধিবেশনে সোভিয়েট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। উল্লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'শান্তির শত্রু'। রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত 'শান্তির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্য্য, যুক্তরাষ্ট্র তাহার দেশকে ধাপে ধাপে প্রকাশ্য যুদ্ধেরদিকে ঠেলিয়া দিতেছে। কোরীয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ সমর্থন করিয়া স্বস্তিপরিষদ গত ২৭শে জুন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে অসঙ্গত বলিয়া অভিহিত করিয়া মঃ গ্রমিকো বলিয়াছেন, শান্তি বজায় রাখার যে প্রধান দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে স্বস্তি পরিষদ সেইভাবে কাজ না করিয়া যুক্তরাষ্ট্র শাসকমহল কর্তৃক যুদ্ধ সৃষ্টির যন্ত্ররূপে সে কাজ করিতেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ২৭ জুনের ঘোষণায় ফরমোজার উপর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ফিলিপাইন দ্বীপে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যের শক্তি বৃদ্ধির ও ইন্দোচীনে সামরিক সাহায্য প্রেরণ দ্রুততর করার সিদ্ধান্তেরও তিনি তীব্র আক্রমণ করেন। মী সরকারকে তিনি 'সন্ত্রাসবাদী', জনসাধারণের সমর্থনহীন, যুদ্ধোন্মাদী এবং আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করেন। স্বস্তি পরিষদে যে মার্কিণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদ লঙ্ঘন করা হইয়াছে। স্বস্তি পরিষদে মার্কিণপ্রস্তাব ৬—১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। চিয়াংএর প্রতিনিধির ভোট ধরিলে অবশ্য সমর্থকদের সংখ্যা লাভ হয় কিন্তু স্বস্তি পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে হইলে স্বস্তি পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য রাশিয়া, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও চীনের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন কিন্তু ২৭ জুনের বৈঠকে স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে কেবল তিনজন—বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র উপস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন, অপর কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিশেষতঃ এই বিরোধ যখন সেই রাষ্ট্রের দুই দলের মধ্যে বাঁধিয়া ওঠে তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রসঙ্ঘ করিবেন না। ইহাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের সোদিত নীতি, কিন্তু কোরিয়া সম্বন্ধে স্বস্তি পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব অবৈধ বিধায়ক উক্তির খণ্ডন করিতে গিয়া বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলিয়াছেন, স্বস্তি পরিষদের ইতিহাসে এইরূপ সিদ্ধান্তের নজির বর্তমান, ইউ, এন, ও র সনদ কখনও কল্পনা করে নাই যে কোন সভ্য শুধু অনুপস্থিত থাকিয়াই ইউ এন ও র কার্যকলাপ বন্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে।

স্বস্তি পরিষদের সমস্ত মিশর স্বস্তি পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবত্রয় সমর্থন করে নাই। এই অসমর্থনের পক্ষে বলিতে গিয়া মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাহাসপাশা ঘোষণা করেন, আন্তর্জাতিক পক্ষপাতিত্বের দ্বারা শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নহে। ন্যায়ের ভিত্তিতে যাঁহারা কামনা করেন এই অসমর্থনে তাহাদের পক্ষ হইতে একটী স্বাধীন জাতির অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, মিশর নিজেও বলাত্মক আক্রমণের ভুক্তভোগী এরূপ আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ আছে যাহাদের অনুরূপ অভিযোগ রহিয়াছে। ইউ, এন, ও তাহার সম্মুখে উত্থাপিত এইসব অভিযোগের ন্যায়সঙ্গত মিমাংসা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কোরিয়ার বেলা তাহার তৎপরতার অন্ত নাই। এইরূপ আন্তর্জাতিক পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে কখনও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ভারত সরকার কিন্তু স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিধাজড়িত গ্রহণের সমর্থনে বলা হইয়াছে, অবৈধতার প্রশ্ন ওঠেনা কারণ বিষয়টী জরুরী এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির বর্তমান। স্বকীয় প্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে ভারত সরকার নিঃসন্দেহই যে উত্তর কোরীয়াই প্রথমে ব্যাপক আক্রমণ করিয়াছে এবং এই আক্রমণ বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ভাষায় "উক্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র কোরিয়া আক্রমণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য—অন্যান্য স্থানের ব্যাপার সম্পর্কে নহে"। ফরাসী শাসিত ইন্দোচীনে মার্কিণ সাহায্যদান ও ফরমোজার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারকেই লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত নেহেরু এইকথা উল্লেখ করেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কোনও সমস্যারই [illegible] হয় নাই। প্রমাণ আমরা [illegible] পর্যন্ত [illegible] এ সংঘর্ষ বিশেষ ভাবে দিচ্ছিল ইউরোপে কিন্তু বর্তমানে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে কোরিয়াতে সেই সংঘর্ষ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের বিরতির অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে জাপানের অধিকৃত দেশ সমূহের উপর নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। তার ফলে কোরিয়াকে কার্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—ঠিক যে ভাবে ইউরোপে জার্মানি ও অষ্ট্রীয়াকে করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়া রুশীয়ার কর্তৃত্বাধীনে কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত সরকার স্থাপিত হয়েছে; অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচলিত সাধারণতন্ত্র মনোভাবাপন্ন সরকার স্থাপিত হয়েছে।

এই দুই সরকারের মধ্যে ছোটখাট খোঁচাখুঁচি প্রায় অনবরতই চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিতান্ত অতর্কিত ভাবে উত্তর কোরিয়া হ'তে কমিউনিষ্ট বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে। সমগ্র কোরিয়া এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকার কথা। জাতি সংঘের পক্ষ হ'তে রুশীয়া ও আমেরিকার হাতে শাসন-ভার ন্যস্ত আছে। সেই হিসাবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। উত্তর কোরিয়া হ'তে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের জন্য বিধি-সংগত ভাবে রুশীয়া জাতিসংঘের নিকট দায়ী।

জাতিসংঘ দুইটী প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে উত্তর কোরিয়ার এই আক্রমণকে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়াতে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছে। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কুমিংটাং চায়না প্রভৃতি আরও নয়টি রাষ্ট্র যুক্ত-রাষ্ট্র-সংঘের নির্দেশ অনুসারে এই সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজে সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে; কিন্তু এই বাহিনী কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির সৈন্য হিসাবে ওখানে কাজ করবে না; জাতিসংঘের বাহিনী হিসাবে এবং জাতিসংঘের পতাকা নিয়ে এই বাহিনী কোরিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। কোনও আন্তর্জাতিক সংঘের পক্ষ হ'তে এবং তার নির্দেশ অনুসারে কোনও সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার এই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘের প্রস্তাবে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যায় আক্রমণের প্রতি-রোধে যুক্তজাতি-সংঘের এই প্রচেষ্টা এক হিসাবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে এবং সে দিক থেকে দেখতে গেলে এই ব্যাপারে আমেরিকা যে উদ্যম উৎসাহের পরিচয় দিচ্ছে তা-ও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

এই প্রসংগে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কাশ্মীর আক্র-মণের ব্যাপারে যুক্তজাতিসংঘ সম্পূর্ণ উদাসীন ও নীরব কেন ছিল। কাশ্মীর রাজ্যের বহুদিন যাবৎ একটী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঠিক কোরিয়ারই মত কাশ্মীর রাজ্যেরও আন্তর্জাতিক সত্তা তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্ত-জাতি-সংঘ একথা আলোচনা কোরেছে যে কাশ্মীর রাজ্য আক্রান্ত হোয়েছিল। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে যায়। কাজেই কাশ্মীর সম্বন্ধেও যুক্ত-রাষ্ট্র-

সংঘ সিদ্ধান্ত দিতে পারত যে ওখানে আক্রমণকারী কে ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-সংঘ তেমন কোনও সিদ্ধান্ত কাশ্মীর বিষয়ে করে নি।

যুক্তরাষ্ট্র সংঘ ও বিশ্বরাজনীতি।—

আমরা পূর্বে বলেছি যে মৌলিক নীতির দিক থেকে কোরিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সংঘের হস্তক্ষেপ করা ও আমেরিকার প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু মৌলিক নীতি বাদ দিয়ে বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে; অনেক জটিল রাজনৈতিক ব্যাপার এখানে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি শক্তিমান জাতি পৃথিবীর আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্বের জন্য তৈরী হচ্ছিল। যুদ্ধে এরা উভয়ে পরস্পরের মিত্র ও সহযোগী ছিল; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই আমেরিকা ও রুশিয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তৈরী হ'তে লাগল। এই দ্বন্দ্ব দুটি শক্তিশালী জাতির আধিপত্যের দ্বন্দ্ব নয়; দুটি বিভিন্ন সমাজনীতির ও অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে সংঘর্ষ এখানে সূচিত হয়। চীন কিছুদিন পূর্বে কমিউনিষ্টদের অধিকারে আসে—তার ফলে প্রশান্ত মহাসাগর হ'তে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর সীমানা পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড রুশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে এসেছে।

কিন্তু যুক্তজাতিসংঘে আমেরিকার আধিপত্য এখন পর্যন্ত প্রবল। যদিও কুমিংটাং সরকার চীন ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত হয়ে ক্ষুদ্র ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে এবং কার্যত যদিও এর কোনও অস্তিত্ব নেই তথাপি যুক্তজাতিসংঘের পাঁচটী স্থায়ী মাতব্বরের মধ্যে কুমিংটাং সরকার একটি আসন দখল ক'রে আছে। আমেরিকার অনুগ্রহ ভিন্ন এ জিনিষ কখনও সম্ভব হতো না। আজ উত্তর দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যে সংঘর্ষ তা হোল কার্যত রুশ ও আমেরিকার ভবিষ্যত সংঘর্ষের ভূমিকা মাত্র। আমেরিকার আগ্রহেই যুক্তজাতিসংঘ কোরিয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং এই যুদ্ধে বৃহত্তর নীতি ব্যতীত আমেরিকার নিজের স্বার্থ অনেকখানি জড়িত আছে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে আমেরিকা কোরিয়ার যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার হয়েছে তা'তে সাধারণতঃ সভ্য জগতের মত বহু পরিমাণে আমেরিকার দিকে যাওয়া স্বাভাবিক।

এই যুদ্ধ কোরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিংবা কোরিয়ার বাইরেও বিস্তৃত হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কোনও অভিমত দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের সেরাজেভো নামে এক অখ্যাত সহরে আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার উপলক্ষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় হিটলার কর্তৃক ডানজিগ আক্রমণ উপলক্ষে। উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ উপলক্ষে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

ব্রিটেন আজ সর্বতোভাবে আমেরিকার অনুগামী; বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকাকে বাদ দিয়ে ব্রিটেনের নিজস্ব সত্তা প্রায় নেই। ব্রিটেনের সাথে তার সহিত সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নগুলিও আমেরিকার অনুগামী হ'তে বাধ্য। যদিও আইনগত বাধ্যবাধকতা এ বিষয়ে তেমন কিছু নেই, অবস্থাগত বাধ্যবাধকতা এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রবল। তাই যে কয়টী জাতি কোরিয়ার যুদ্ধে সশস্ত্র অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে তার মধ্যে নেদারল্যাণ্ড ও কুমিংটাং চীন ভিন্ন আর সকলেই ব্রিটেনের ডোমিনিয়ন। এই যুদ্ধের সংগে চীন ও ফরাসী ইন্দোচীনের ব্যাপার জড়িত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী আছে। কুমিংটাং চীন এই যুদ্ধে যে এতটা উৎসাহী তারও প্রধান কারণ সে আশা করছে এই যুদ্ধ উপলক্ষে চীনের ভবিষ্যৎ ভাগ্য মীমাংসিত হবে। এ সবই ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা আশা করি, এই যুদ্ধ কোরিয়ার সীমানার বাইরে যাবেনা এবং ভবিষ্যৎ তৃতীয় যুদ্ধের বীজ এখানেই নষ্ট হবে।

ভারত ও কোরিয়ার যুদ্ধ।—

যুক্তজাতিসংঘের দুই প্রস্তাবই ভারত সমর্থন করেছে এবং উত্তর কোরিয়ার আক্রমণকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা ভারত সমর্থন করেছে। যুক্তজাতি-সংঘের একটী

উৎসাহী ও বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে ভারতবর্ষের পক্ষে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। সে বিশ্ব-সংঘের সভ্য। যে সংঘের উদ্দেশ্য বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সেই বিশ্ব সংঘের সভ্য হিসাবে তার প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা ভারতবর্ষের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য। এ ভিন্ন এই যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেও ভারতবর্ষের পক্ষে এই পথই গ্রহণ করতে হতো। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে সশস্ত্র আক্রমণ করেছে। একথাও স্বীকার করতে হবে যে এই আক্রমণ একটা হঠাৎ উত্তেজনার বশে নয়; এই আক্রমণ একটা বিশেষ পরিকল্পনাপ্রসূত ও দীর্ঘ প্রস্তুতির ফল। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও শাসন যন্ত্রকে লোপ করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। তাই মৌলিক নীতির দিক থেকে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষে উপযুক্ত।

কিন্তু বর্তমানে এই যুদ্ধে একটা বিশ্ব রাজনীতির কথা নিহিত আছে। তাই এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে অংশ গ্রহণ করতে যাওয়ার পূর্বে সমস্ত অবস্থা ভালরূপে পর্যালোচনা করা ভারতের পক্ষে দরকার। দ্বিতীয়তঃ ভারতের এমন আর্থিক ও সামরিক সম্বল নেই যে কোরিয়ার মত দূর দেশে সৈন্য পাঠিয়ে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারে। তৃতীয়তঃ কাশ্মীরের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রসংঘ যে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে ও দিচ্ছে তা'তে এর পর ভারতবর্ষ ওর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে কিনা সন্দেহ। তাই ওর নির্দেশ মেনে একটা যুদ্ধের অংশীদার হওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ভারত-পাক চুক্তি

এই চুক্তি সাক্ষরের পর তিন মাস অতীত হয়েছে। এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও পাকিস্থান এই উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্টরা যাতে নিজ নিজ আবাসস্থলে সসম্মানে ও নিরাপদে বাস করতে পারে তেমন অবস্থার সৃষ্টি করা। সেদিক হ'তে এই চুক্তি সাফল্য লাভ করেছে এমন কথা কোনও লোকই বলতে পারবে না। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার গৃহত্যাগী হিন্দু পূর্ব বাংলা হ'তে পশ্চিম বাংলায় আসছে। পশ্চিম বাংলা থেকে কিছু মুসলমানও প্রত্যহই পূর্ব বাংলার দিকে চ'লে যাচ্ছে। এই সব গৃহত্যাগী উদ্বাস্তুদের দুঃখের কোনও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিশেষ কারণ না থাকলে আপন বাড়ীঘর ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে নিশ্চিত দুঃখ কষ্টকে বরণ করে কেউ আসতে চায় না। স্বাধীনতা লাভের পর হ'তে এ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৪০।৪৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা হ'তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এসেছে এবং গৃহত্যাগী মানুষের অপমানের মাত্রা প্রায় সমান বেগেই চলেছে। যে ভাবে এখন পূর্ব বাংলা হ'তে লোক আসছে তাতে আশঙ্কা করা যায় এই বৎসর বাকী কয় মাসে আনুমানিক বিশ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা হ'তে পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে চলে আসবে।

পূর্ব বাংলার হিন্দুদের জীবন আজ সর্বপ্রকারেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় এই চুক্তির শবদেহ আঁকড়ে বসে থাকা ভারত সরকারের পক্ষে কতটা বুদ্ধিমানের ও সহৃদয়তার পরিচায়ক হবে, তা বলা কঠিন। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র; যে কোন ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার এ রাষ্ট্রে আছে—এই মূল নীতি আমরা পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী নই। কিন্তু কোনও মূল নীতির সঙ্গে যদি বাস্তবের যোগ না থাকে তবে মূল নীতি প্রাণহীন শবের সমান হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান আজ স্পষ্টতই ধর্মসাপেক্ষ রাষ্ট্র—ধর্মের দিক থেকে দেশ বিভাগ করা হয়েছে এবং ধর্মের দিক থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দাঁড় করান হচ্ছে।

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে যে সব অমুসলমান ছিল একে একে তারা সবাই সে সব অঞ্চল ত্যাগ ক'রে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ব বাংলার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক হিন্দু চলে এসেছে এবং অবশিষ্ট অংশ চলে আসার জন্য তৈরী হয়ে আছে। এ থেকে অনুমান করা চলে

যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিই এমন যে অমুসলমান অধিবাসীদের সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই নীতি ভারতবর্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। দু'জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস না ক'রেও কংগ্রেসকে এটা মেনে নিতে হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে দেশ বিভাগ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে। ঠিক তদনুরূপ কারণে পাকিস্তানে অমুসলমানের বাস সম্ভব নয়। এ বাস্তব সত্যকে কংগ্রেস ও কংগ্রেসদল পরিচালিত ভারত সরকারকে মেনে নিতে হবে। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে ভারত-পাকিস্থান চুক্তির পুনর্বিবেচনা করা আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। পূর্ব বাংলার সোয়া কোটী হিন্দু উদ্বাস্তু ও নিঃসম্বল হয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে যদি এসে পড়ে তবে ভারতীয় রাষ্ট্রের মঙ্গল ও স্থায়িত্বের দিক থেকেই তাদের আগমনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাদের জন্ত সময়োপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার হবে। এছাড়া মানবতার প্রশ্নও এখানে আসছে। এই সোয়া কোটী মানুষ তিন বছর পূর্বে আমাদেরই দেশবাসী এবং আমাদেরই স্বজাতীয় ব'লে বিবেচিত হতো। একটা কৃত্রিম দেশ বিভাগের ফলে বিদেশী বা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী ব'লে তাদের ত্যাগ করা চলে না। এই সব বিবেচনা থেকে আমরা মনে করি, ভারত-পাকচুক্তির অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা হওয়া দরকার।

পূর্ব বাংলার কংগ্রেস।—

ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ হোতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে গুটিয়ে নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক ও সাময়িক আবেষ্টনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না এবং তার ফলে পূর্ব বাংলা হ'তে ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু যে সব কংগ্রেস কর্মী বহুদিন যাবৎ পূর্ববাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তারা তাদের পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করতে রাজী হলো না। বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ প্রায় সকলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সঞ্জীবিত রাখল। মূল প্রতিষ্ঠান হ'তে ছিন্ন হয়ে পূর্ব-বাংলায় কংগ্রেস একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে পুনর্গঠিত হলো।

সাধারণতঃ বাইরের লোকের একটা ধারণা আছে যে বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মীরাও প্রায় সবাই নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চ'লে এসেছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পূর্ববাংলার যে-সব কংগ্রেস কর্মী স্বভাবতঃ পশ্চিম বাংলায় থাকত অথবা যারা কোনও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না তাদের অনেকেই পশ্চিমবাংলায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ণয় করেছে। পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত ক'রে সেখানে কাজ চালাচ্ছে। তাদের একনিষ্ঠ আগ্রহের পরিচয়ই এতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রতিকূল মনোভাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরূপতা ছাড়াও পূর্ব বাংলায় কংগ্রেস পরিচালনা করার জন্য বহুবিধ অসুবিধা আছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আজ জীবিকার প্রায় কোন উপায় নেই। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি যে সব মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা বরাবর পূর্ববাংলার কংগ্রেসকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখত আজ তাদের সে সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই এবং তাদের অনেকেই আজ পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছে। এমনি অবস্থার ভিতর কংগ্রেসের কাজে নিয়োজিত থাকা খুবই কঠিন।

এই একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি পূর্ব বাংলার বাইরের জনসাধারণের দৃষ্টি আজও আকৃষ্ট হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে ময়মনসিংহ সহরে পূর্ব বাংলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পূর্ব বাংলা সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে সম্মেলন হয় তাও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নাই। তিন বৎসর পূর্বে যারা সহযোগী ও সহকর্মী ছিল তারা আজ বিস্মৃত ও অপরিচিতের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব

গৃহীত হয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তা আনবার পক্ষে আঠারোটি সর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে ভারত-পাক চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়েছে যে এই চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। গত দাঙ্গার দুষ্কৃতকারী অপরাধীদের সত্বর দণ্ডের ব্যবস্থা করা; যে সব রাজকর্মচারি দাঙ্গার সময়ে নিজ কার্যে গাফিলতি দেখিয়েছে তাদের সম্বন্ধে দণ্ডের ব্যবস্থা অবলম্বন করা, দাঙ্গার লোকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া, হিন্দুদের গৃহ সরকার তরফ হ'তে দখল করার নীতি পরিবর্তন করা, হিন্দুদের যে সব সম্পত্তি নানাভাবে দখল করা হয়েছে তা প্রত্যর্পণ করা, ব্যবসা বানিজ্য বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকারের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বন্দুক ও আগ্নেয় অস্ত্র দেওয়া, মেয়ে-ঘটিত অপরাধে দ্রুত দণ্ডের ব্যবস্থা করা, আনসার বাহিনীর হয় লোপ সাধন অথবা মৌলিক পরিবর্তন, সরকারি চাকুরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিন্দু নেওয়া, শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ নাগরিক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাকিস্তানকে ইসলামিক রাজ্য ব'লে ঘোষণা বন্ধ করা এবং অসাম্প্রদায়িক গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব'লে ঘোষণা করা এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা প্রভৃতি সর্তের উল্লেখ ঐ প্রস্তাবে করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের পিছনে যে রাজনৈতিক চেতনা ও সৎ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। একথা মনে রাখতে হবে যে এই প্রস্তাব যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা পাকিস্তানে বাস করেন এবং পাকিস্থানের অধিবাসীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে এই সব সর্ত পূরণ না হ'লে পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্টদের বাস সম্ভব নয়।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

—রশ্মি—

ত্রয়োদশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৫৭ | চতুর্থ সংখ্যা

দ্বিতীয়বার জেলে

মেদিনীপুরে আটমাস

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

২৫শে সেপ্টেম্বর। ১৯২৩ সাল।

উত্তরপাড়া বিস্তাপীঠে রেখে চিকিৎসায় ঘরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না, খরচেও কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না ব'লে চারুকে কয়েকদিন আগেই বেলগেছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জি তখন হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—যাদুদা তাঁর নামে একখানা চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। সহজেই ভর্তি করা গেল। নিকটে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে খাবারটা আনিয়ে দেওয়া হয়। সকালে ৮টার আগে একবার বিশেষ অনুমতি ছিল, তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে আসি।

সেদিনও তেল লাগাব ব'লে জামাটা ছেড়েছি, দেখি পঞ্চানন বাবু, আর তাঁর পেছনেই আর একটি লোক, একটু ঠাহর ক'রে দেখলাম আই. বি. র ইনসপেক্টর ইসমাইল

পঞ্চানন বাবু বললেন, দেখুন এরা কি বলছে, আপনাদের কার নামে কি পরোয়ানা আছে।

ইস্‌মাইল এগিয়ে এসে বলে, আপনাকে সাহেব একবার নীচে ডাকছেন।

আমি বলি, কে সাহেব? তার দরকার থাকলে তাঁকে উপরে আসতে বলুন।

মিনিট পনেক বাদে একটি সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল। সে বললে, I have to take you under arrest.

আমি বলি, অপেক্ষা কর, আমি রোগীকে স্নান করিয়ে নিই।

ইস্‌মাইল দাঁড়িয়ে রইলো

সাথে নীচে চ'লে গেল।

চারুকে স্নান করাতে করাতে তাঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা যা বলবার ব'লে নিলাম। ওঁর মনের আশংকাটা স্পষ্ট ক'রেই বললেন, এইবারে শেষ! সান্ত্বনা দিলাম—অসুখ হয়তো হবে, কষ্ট হবে—অমুককে অমুককে খবর দিস্, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

মনে মনে আমিও জানি, কি হবে। দু'জনেরই ব্যাথায় মন ভ'রে ওঠে, কিন্তু অশ্রুপাত হইলে কেউই।

কিছুদিন আগেই খবর শুনেছিলাম, বাংলার কুড়ি জনকে ওনং রেগুলেশনে ধরবার জন্যে গভর্ণর লর্ড লিটন ও টেগার্ট দিল্লী সিমলা দৌড়াদৌড়ি করছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজী হচ্ছে না।

খবরটা যাদুদাকে বললাম, তিনি বললেন, শাঁখারিটোলার মামলার সাক্ষীসাবুদ যখন কোর্টে বের হ'তে থাকবে, তখনই তোমাদের ধরবে।

অসহযোগ আন্দোলন যখন চলছে তখন মিহির ঘোষ —নামটা একটু বদলে বলতে হ'ল—ব'লে একজন পুলিশের এজেন্ট প্রভোকেটর হিসেবে খুব গরম গরম কথা ব'লে বিপ্লবী দল করছিল। তাঁদের পা দেবার মতো নানাবিধ প্রস্তাব নিয়ে সে আমাদের অনেকের কাছেই এসেছিল। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রিতে ১৯১৬-১৭ সালে তার সঙ্গে যে গুপ্ত পুলিশের যোগাযোগ ছিল, তা অনেকে জানতেন। কিন্তু জেনেশুনেও দু'তিন জন তার খপ্পর থেকে অব্যাহতি পান নাই।

১৯২৩ সালে যখন স্বরাজ্য দল গ'ড়ে উঠ্‌ছে, তখন এর দল থেকে কলকাতায় ও আশেপাশে কয়েকটা সামান্য ডাকাতি বা ডাকাতির চেষ্টা হয়। এর উদ্দেশ্য কি, আমরা অনেকে আন্দাজ করেছিলাম। আন্দাজেরও প্রয়োজন ছিল না। দৌলতপুরে ছাত্রজীবনে আমার এক বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন নিরঞ্জন মজুমদার। প্রথম বার জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ইনি সরকারী চাকরী করছেন। প্রাণটা এঁর এত ভাল যে এঁর অনুতাপ হ'ত: বন্ধুরা যখন জেল খাটছেন আমি তখন সরকারী চাকুরী করছি! আমাদের ভালবাসতেন ব'লেও বটে, আর এই অনুতাপের ফলে ইনি অনেক সময় সাধ্যের অতীত সাহায্যও আমাদের করতেন। ফলে, আই. বি-র নজরে প'ড়ে যান। ভূপেন চাটার্জি এঁকে মাঝে মাঝে ডাকিয়ে নিয়ে নানাবিধ সদুপদেশ দিত।

প্রতিবাদে নিরঞ্জন আমাদের কথা বলেন, ওঁরা তো এখন বিপ্লবী দলের কাজ করছেন না, করেন কংগ্রেসের কাজ। ভূপেন চাটার্জি বলে, ঐটেতেই তো আমরা বেশী ভয় পাই; কংগ্রেস, স্বরাজ্যদল—সবটার ভিতরই এরা আছে, এইটেই আমরা চাইনে।

কাজেই মিহির ঘোষের দল যে ১৯২৩ সালে ডাকাতি শুরু করলো, এবং তারই শাঁখারিটোলা ডাকাতির সাক্ষী সাবুদের মারফত যখন লোকের ধারণা জন্মালো যে দেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলছে, তখন আমাদের ধরবে, এটা আমাদের কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে যখন জেলে ছিলাম, তখন কাগজে পড়েছিলাম, লয়েড জর্জ আমেরিকার খোসামোদের অঙ্গ হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটনের মর্মর মূর্তির পদপ্রান্তে ফুলের মালা দিয়েছিলেন। খবরটা প'ড়ে মনে হয়েছিল, জর্জ ওয়াশিংটনও তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন! যতীন মুখার্জিও দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছেন। তফাৎ, একজন সফল হয়েছেন, আর একজন চেষ্টার ব্যর্থতার ভিতর প্রাণ দিয়েছেন। আজ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একজনার পায়ে ফুল দিচ্ছেন, আর আমরা যদি যতীন মুখার্জির স্মৃতি দিবস পালন করি, ওরা কি করে?

কাজটা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১৯২১সাল ২২ সালের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভিতর কথাটা কারও কাছে পাড়াও যায় নাই। ১৯২৩ সালে অনেককে বললাম। নিজেদের বন্ধুবান্ধব সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন। অমরদা কথাটা দেশবন্ধুকে বললেন। দেশবন্ধু বললেন, নিশ্চয়! একটা জাহাজ চার্টার ক'রে আমরা সবাই মিলে বালেশ্বরে যাব এবং যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে একটা স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোগ আয়োজন ক'রে আসব।"

ইতিমধ্যে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস এসে পড়লো, এবং স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম পাশ করানো নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে কথাটা ওখানেই চাপা প'ড়ে গেল।

আমরা কয়েকজন কিন্তু স্থির করলাম, ওখানে কথাটা চাপা পড়তে দেওয়া হবে না। বেশী আড়ম্বর না করতে পারি, কিন্তু সর্বত্র আমরা নিজেদের মতো ক'রে যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ করব। তাছাড়া, কলকাতার যতগুলো কাগজে সম্ভব, ছবি সমেত যতীনদার পরিচয় ও বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী ছাপতে চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে নতুন ক'রে আমাদের দল গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। মনোরঞ্জনদা ও নরেশদা উত্তরবঙ্গ ঘুরতে বেরিয়েছেন। আমি পূর্ববঙ্গ ঘুরে এসে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গেছি। এইবারেই ভগৎসিং-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এর পরই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু।

তখন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বাবা সর্দার কিষেণ সিংএর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। আমি যেদিন যাই, সর্দারজী সেই দিনই তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ ও সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে গ্রামের বাড়ী থেকে খবর দিয়ে লাহোর শীশমহল রোডের বাড়ীতে আনান। যুবক ভগৎ সিং প্রায় সমস্ত রাত্রির ধ'রে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র, যতীন্দ্র নাথ ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী শোনেন। ৯ই সেপ্টেম্বরের আর বেশী দেরী নেই। ভগৎ সিং আমায় বলেন, যতীন্দ্রনাথের কিছু ছবি এবং বালেশ্বর সম্পর্কে লেখা যা পারি, তা পাঠিয়ে দিতে। কাশ্মীরেও তখন আমাদের ভাল দল ছিল। এইভাবে ১৯২৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বালেশ্বর দিবস পালন করা হয়। কলকাতার প্রায় সমস্ত দেশী কাগজে যতীন্দ্রনাথের ছবি, জীবনী ও বালেশ্বরের যুদ্ধের কাহিনী প্রকাশিত হয়। অমরদা ঐ দিনেই "স্বদেশ" ব'লে একখানা দৈনিক কাগজ বের করেন। তার প্রায় পাতা জুড়েই এই দিন ঐ সব ছবি ও কাহিনী ছাপা হয়।

এর কয়েক দিনের মধ্যেই "ইংলিশম্যান" কাগজে পর পর দুটি প্রবন্ধ বের হয়। তার মর্মকথা এই—বালেশ্বর স্মৃতি দিবস যে এইভাবে উদযাপিত হ'ল, তার অর্থ এই যে, বিপ্লবীরা আবার দল গড়তে শুরু করলো।

এর পর, ধর পাকড় সম্পর্কে গুজবটা যে সত্যি হ'তে বাকী নেই, সে-ধারণা আমাদের কারও কারও ছিল।

তবু যাদুদাকে বললাম আমিতো রোগী শুশ্রূষা করি, আমায় ধরবে না।

যাদুদা বলেন, বাংলায় যদি একজনকে ধরে তো তোকে ধরবে।

যাদুদা নিজেকে হয়তো বাদ দিয়েছিলেন। আমরাও কাকে ধরবে, কাকে ধরবে না, সে সম্বন্ধে কিছু ঠাহর করতে পারিনি। তাই যাঁকে যাঁকে খবর দেবার কথা চারুকে বললাম, তাঁদের ভিতর যাদুদা ও অমরদাও ছিলেন।

বেলগেছে হাসপাতাল থেকে ওদের গাড়ী ক'রে আমায় যখন লালবাজারে নিয়ে গেল সেখানে যাঁদের হাঁজির দেখলাম তাঁদের ভিতর যাদুদা, অমরদাও রয়েছেন। আর আছেন উপেনদা, মনোরঞ্জনদা, নৃপতিদা, জ্যোতিষ ঘোষ, মনমোহন ভট্টাচার্য, আর অনুশীলনের রবি সেন, অমৃত সরকার ও রমেশ চৌধুরী।

ঘরে ঢোকা মাত্র প্রচুর অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনার মালমশলা কয়েকটা ঠোঙ্গা ভরা খাবার, আর উপেনদা যখন রয়েছেন, তখন প্রচুর হাসিঠাট্টা।

তারই ভিতর গম্ভীর হয়ে গেলেন যাদুদা, অমরদা ও মনোরঞ্জনদা। যাদুদা জিজ্ঞেস করলেন, চারুকে কেমন দেখে এলি? মনোরঞ্জনদা বললেন, তোমায় ওরা প্রেসে (সরস্বতী প্রেস) আশা করেছিল। মনমোহন বললেন, এইবারে চারুটা মরবে।

যাদুদা বললেন, "চারুর নামেও বোধ হয় ওয়ারেন্ট ছিল। আমার গাড়ী থেকে নামাবার আগেই, আমার পাশের গাড়ীতে অমরদা ছিলেন, ব্যামফোর্ড তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল, where's Bhupen Babu?

"অমরদা বললেন, He must be nursing Charu.

"তখন এসে আমায় জিজ্ঞেস করে, How is Charu?

"আমি বললাম, তার অবস্থা শংকাজনক। ও একটু বিষণ্ণ ক'রে প্রশ্ন করলো, তারপর বললো, Excuse me for a minute please. একটু পরে একখানা গাড়ী বেরিয়ে গেল, তখন আবার আমার পাশে এসে গল্প শুরু করলো। বুঝলাম, তোমায় ধরতেই গেল।"

এর পর একে একে টেগার্টের কাছে ডাক পড়লো। নাম জিজ্ঞেস করার পর আমায় জিজ্ঞেস করে, Were you doing anything particular these days?

আমি বলি, If I have anything to say, I shall say before the court.

ও বলে, You won't be produced before any court, you will be incarcerated under Regulation III of 1818.

আমি বলি, Thank you.

একে একে এসে একখানি ভানে তোলে। উপেনদা টেনে টেনে বলেন, "মনোরঞ্জন, পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা...।" সকলে এক চোট হাসলাম। মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা তখন অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে একত্রে "সারথি" ব'লে সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। কাগজখানার উপরে লেখা থাকতো—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

নিয়ে চল্‌লো আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। পথে পথে "বন্দেমাতরম্" চীৎকার ক'রে গলা ভেঙ্গে ফেল্‌লাম। আর উপেনদা মাঝে মাঝে খুব হাসাচ্ছেন।

জেলে ঢুকে স্নানাহার সেরে ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেলের সামনের মাঠটায় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছি, আর ধর-পাকড় কেন, আর কাকে কাকে ধরবে, ইত্যাদি গবেষণা করছি, এমন সময় জীবনে যতগুলো ভুল করেছি, তার একটি ক'রে বস্‌লাম। যাদুদাকে আলাদা ক'রে ডেকে বললাম, এইবার জেলে এমনভাবে চলতে হবে যাতে ওদের (অনুশীলনের) সঙ্গে ভবিষ্যতে মেশা যায়। প্রফুল্ল বাবু নেই, রবি বাবু ও অমৃত সরকার আছেন, অনেকটা সহজ হবে, কিন্তু রমেশ বাবু আছেন। জেলে মিলমিশের সর্ত্তাসর্ত্তির কথা কিছু নেই, শুধু ভাল ব্যবহার।

অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই এত তফাৎ যে মিলমিশ ওঁদের সঙ্গে আমাদের হ'তে পারে না, বরং সে চেষ্টায় অনিষ্ট হবে, একথা বুঝেও তখনও বুঝিনি, বারবারই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পেয়ে বসেছে, আর মিলমিশের কথা বলেছি। আমার কথাতেই যে মিলমিশের পরবর্ত্তী চেষ্টা হয়েছিল, তা কিছু নয়, কারণ, সে চেষ্টা যখন হয়, তখন আমি বর্ম্মার জেলে। কিন্তু গোড়াতে ঐ যে একটু উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, তার জন্য আজও অনুতাপ হয়।

এই উৎসাহটুকু দেখাবার একটু কারণ ছিল। ধরা পড়ার কিছু দিন আগে থেকে প্রফুল্ল বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে যাওয়া আসা করছিলেন। তখন এঁরা "ভারত সেবক সংঘ" করার দরুণ বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। প্রফুল্ল বাবু একদিন আমায় বলেন, ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভাল হবে ব'লেইতো করতে গিয়েছিলাম!

এর পর আমি চেষ্টা করি, এবং তার ফলে কয়েকদিন ওঁদের কয়েকজন ও আমাদের কয়েকজনে মিলে আলোচনা হয়। তার পর তো ধরাই পড়ি। কিন্তু দেশের ভাল হবে ব'লে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন—একথাটা যে কতো অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হচ্ছে ব'লে।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অনুশীলনের ওঁরা যখন Citizen Protection League-এর নীতি মেনে ও সাহায্য নিয়ে "ভারত সেবক সংঘ" গ'ড়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন, আমাদের বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অনেকেই তখন নিজেদের পরিচিত কর্মী ও অসহযোগী ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও আইন ব্যবসায়ীদের টানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ শুরু করেন। তার ভিতর সুরেন ঘোষ ময়মনসিংহে, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সতীন সেন, অশ্বিনী গাঙ্গুলি বরিশালে, জীবন চ্যাটার্জি ও জিতেন কুশারী ঢাকায়, পূর্ণ দাস ফরিদপুরে, সূর্য সেন চট্টগ্রামে, বসন্ত মজুমদার ও ললিত বর্দ্ধন ত্রিপুরায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী নোয়াখালিতে, যতীন রায় উত্তর বঙ্গে, কালিপদ বাগ্‌চি রংপুরে, বিজয় রায় চৌধুরি গাইবান্ধায়, ক্ষিতীশ সরকার সিরাজগঞ্জে, ডাঃ আশুতোষ দাস ও ভূপতি মজুমদার হুগলীতে, জিতেন মিত্র বর্দ্ধমানে, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ২৪ পরগণায়, আমি খুলনায় ও বিজয় রায় যশোরে বসেন। হাওড়ায় হরেন ঘোষ পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। বীরভূমের জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জির সঙ্গে পুরোনো গুপ্ত সমিতির দিনে প্রথমে অরুণদার এবং পরে কুন্তলের যোগাযোগ ছিল। ইদানীং বাঁকুড়ার অনিল বরণ রায় সরস্বতী প্রেসে মনোরঞ্জনদা ও অরুণদার

সঙ্গে থাকতেন। ফলে, জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বিপিন গাঙ্গুলি ও জ্যোতিষ ঘোষ আমাদের থেকে একটু পার্থক্য অনেক সময়েই বজায় রাখছিলেন, কিন্তু পূর্বে বিপ্লবী দলে এবং এখনও কংগ্রেসে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল। সেই হিসাবে বিপিনদা একদিকে যেমন ২৪-পরগণার কংগ্রেসের সঙ্গে অপর দিকেও তেমনি যতীনদা (মুখার্জি) ও অমরদার সঙ্গে সম্পর্কিত নইলার বিপ্লবী দলের বসন্ত বিশ্বাস, মন্মথ বিশ্বাস, জ্ঞান বিশ্বাসদের অনুগামী অনন্তহরি মিত্র ও তারকদাস ব্যানার্জির সঙ্গে যোগ রাখছিলেন। এঁরা ওখানে তখন কংগ্রেসের কাজ করছেন। আর, জ্যোতিষ বাবুকে আমি অমৃতসরে ডাঃ কিচ্‌লুর আশ্রমে বসিয়ে সর্দার কিষেণ সিংয়ের দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ভূপতিদা আবার তাঁকে ডেকে নিয়ে হুগলী কংগ্রেসে বসান।

এছাড়া, বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত শংকর মঠ বুদ্ধের সময় থেকেই ছিল। অসহযোগের সময় আমি কুন্তল, চারু ও কিরণ মুখার্জিকে নিয়ে দৌলতপুরে সত্যাশ্রম করি, সাতকড়ি ব্যানার্জী ও রসিক লাল দাস করেন আবদালপুর (ডায়মণ্ড হারবার) সত্যাশ্রম, জিতেন কুশারি বাহেরক (বিক্রমপুর) সত্যাশ্রম, যতীনদা (রায়) বগুড়া গণমঙ্গল, অমরদা উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ, ভূপতিদা হুগলি বিদ্যামন্দির, সূর্য সেন চট্টগ্রাম সাম্যাশ্রম। এসব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী প্রচার ও গঠনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়।

এই সবের ফলে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের সংগঠন যা গড়ে উঠছিল, তা গড়ে উঠছিল প্রধানতঃ আমাদের যুগান্তরের বন্ধুবান্ধবের হাতেই। এদিকে সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অরুণ গুহ, সুরেশ দাস প্রভৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।

অপরদিকে কাউন্সিলে যাবার প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দেয়। অনেক বন্ধুর সঙ্গে সেই থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতেই দেশবন্ধু একটি আদর্শ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আমাদের উপস্থিতিতে একদিন তিনি প্রশ্ন করেন কাকে এর ভার দেওয়া যায়? আমার পাশেই ব'সে ছিলেন সুভাষের ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার। আর ছিলেন আমাদের তিনজনেরই বন্ধু অরবিন্দ মুখার্জি। হেমন্তকে বলি, সুভাষকে খবর দিলে কেমন হয়? হেমন্ত তখনই প্রস্তাব করেন। দেশবন্ধু সুভাষের সবিশেষ পরিচয় নেন। রাত্রে এ নিয়ে বাসন্তী দেবীর সঙ্গেও কথা হয়। এর পরই দেশবন্ধু সুভাষকে খবর দেন। সুভাষ তখন আই. সি. এস. পাশ ক'রে বিলাতে ব্যারিস্টারশিপ পড়ছেন।

বঙ্গীয় সর্ববিদ্যায়তন আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। জেল যাবার হিড়িকে সব ভেসে গেল। সবাই জেল থেকে ফিরে আসার পর স্বরাজ্যদল গড়ার মাতামাতি লেগে গেল। স্বরাজ্যদল গঠনে সুভাষ দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

যাদুদা এর আগেই পলাতক জীবন থেকে ফিরে এসেছেন এবং ডাক্তারী পাশ ক'রে কলকাতাতেই আছেন। সুভাষ একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী এবং কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী জেলাগুলির হিসাব নিয়ে। যাদুদাকে তিনি বোঝালেন ময়মনসিংহ থেকে মধুবাবু (সুরেন ঘোষ), বরিশাল থেকে মনোরঞ্জনবাবু ও হুগলি থেকে ভূপতিবাবু যদি মত দেন, তা হ'লেই কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা জয়লাভ করেন।

আমাদের ভিতর জীবন চ্যাটার্জি ছিলেন এদিকে সব চেয়ে উৎসাহী, তারপর সত্যেনদা, আমি, কুন্তল, চারু, অরুণদা ও যাদুদা। মনোরঞ্জনদা ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী। যাদুদা, মধুদা ও ভূপতিদাকে ডেকে আলোচনা করেন; তাঁরা নিজের নিজের জেলার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মত দিলেন। মনোরঞ্জনদার কিন্তু মত পরিবর্তন হয় ১৯২৩ সালে জেলে যাবার পর

কিন্তু ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ ও হুগলি জেলার সমর্থন পেয়েই দেশবন্ধুর দিকে সংখ্যাধিক্য হয়ে গেল। স্বরাজ্য-পার্টির প্রোগ্রামকে এই সমর্থন দিয়েও কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম, আমরা অধিকাংশ কর্মীরা কাউন্সিল অ্যাসেমব্লিতে যাব না—সুভাষ, সত্যেনদা প্রভৃতি বন্ধুরা যেতে চাইলে তাঁদের সমর্থন করব।

যা-ই হোক্, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তা-ই স্বাভাবিক। প্রফুল্লবাবুদেরও এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।

"ভারতসেবক সংঘের" কংগ্রেস বিরোধিতার ফলে তখনকার দিনের সদ্যোজাত "আনন্দবাজার পত্রিকা" এঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে থাকে। তার ফলে এঁরা বুঝতে পারেন যে আমাদের সঙ্গে অন্ততঃ সাময়িক মিল না হ'লে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে আর এঁরা দাঁড়াতে পারবেন না।

তাঁদের এই মনোভাব যখন থেকে বুঝতে পারি, তখন থেকেই ঐ দিনের ঐ সামান্য একটি কথার অনুশোচনা আজও মনে রয়ে গেছে। কারণ, ঐ মিলনচেষ্টার, শুদ্ধমাত্র চেষ্টারই ফল বাংলার পক্ষে ভাল হয় নাই। সে কথা পরে আসবে।

সদ্য ধরা পড়ার উত্তেজনা নানাকথায়, হাসিতে, আমোদে চাপা দেবার চেষ্টা চলছে, এমন সময় অফিসে ডাক পড়লো আমাদের পাঁচজনের—বাদুদা, জ্যোতিষবাবু, রবিবাবু, অমৃত সরকার ও আমি। জেলখানার জীবনের এই ছিল এক চূড়ান্ত ট্রাজেডি। হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে যা হোক একটা সংসার গড়ে ওঠে যার ভিতর মায়ামমতার সম্পর্ক কোনো পরিবারের ভিতর যা থাকে তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ বদলির টান যখন পড়ে, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবারও অবকাশ মেলে না।

ট্যাক্সি যখন হাওড়ার পুলে উঠেছে, বাদুদাকে ইঙ্গিতে দেখালাম, গোপীনাথ সাহা কলকাতার দিকে আসছেন। এই শেষবার গোপীকে দেখলাম।

মেদিনীপুর জেল। রাত্তির বেলায় ভাত, ডাল বা ঝোটাতে পারলো খাইয়ে দাইয়ে বিশ ডিগ্রীতে বন্ধ ক'রে যখন জেলার, জমাদার চ'লে গেল, তখন নতুন নতুন রশারী টাঙ্গাতে গিয়ে দেখি, তার সবই আছে, শুধু চাল নেই। পাঁচ জনেরই ঐ একই অবস্থা। এক রাত্রির জন্যে সেই ১৯১৮ সালের রাজসাহী জেলের অভিনয়—সারা রাত গরমে আর মশার কামড়ে এ সেল থেকে ও সেলে পরস্পরকে ডাকাডাকি আর চেঁচামিচি ক'রে কাটান গেল।

পর দিন সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এল—ইয়ং সাহেব আই. এম. ডি.—মোগল বাদশাই ধাজধরণ! সব শুনে জেলারকে ডেকে বললেন, হরপ্রসাদ, এঁদের কি এখানে রাখা চলে? আর কোথায় ভাল জায়গা আছে বল।

জেলার হরপ্রসাদ মিত্র পুরাণো জেলার, তার ইচ্ছা আমাদের ওখানেই রাখে। ইয়ং একটা ওয়ার্ডের নাম বলতে ও বলে, সেখানে আমার প্রায় ৪০ জন কয়েদী থাকে, তাদের শোবার সব টিবি বাঁধা রয়েছে, তা ছাড়া ওঁরা কি সে জায়গা পছন্দ করবেন?

বাধা পেয়ে বাদশাই মেজাজ আরও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে: ৪০ জন কয়েদীর জায়গা করতে আমাদের আটকাবে না। মাটির টিবি ভেঙ্গে ফেললেই গেল। আর, I know they will like the place, that place is infinitely better than this.

আমরা কোনো গতিকে সেল ছাড়া হ'তে চাই। আর জায়গাটা সত্যি সত্যিই ভাল। সেই দিনই আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেই থেকে জায়গাটার নাম হয়ে গেছে ষ্টেট ইয়ার্ড।

আমরা এগার জন যে দিন কলকাতায় ধরা পড়ি, সেই দিনই চাকায় ধরা পড়েন, সতীশ পাকড়াশি। আর, দিল্লিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়ে বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে ধরা পড়লেন, জীবন চ্যাটার্জি। এঁরা দু'জনও কয়েক দিনের মধ্যে মেদিনীপুর জেলে এলেন। ক্রমে অন্যত্র থেকে বদলি হ'য়ে মনোরঞ্জনদা, ভূপতিদা, মনমোহন ভট্টাচার্য, রমেশ চৌধুরী এঁরা সবও এসে মেদিনীপুরে জমলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হবে, তার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে পাঠালো তখনকার দিনের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ প্রিজন্‌স্, কর্ণেল টমসন। লোকটি ছিল যেমন ভারতীয় বিদ্বেষী, তেমনি অসৎ। হুকুম হ'ল, আমাদের খাওয়া দেবে কয়েদী খানা এবং পোষাকও কয়েদীর পোষাক।

ইয়ং সাহেব অবাক হ'ল। খবরটা আমাদের কাছে গোপন ক'রে আই. জির কাছেও প্রতিবাদ পাঠালো, সেক্রেটারিয়েটে তার এক বন্ধুর কাছেও চিঠি দিল আই. জি.-কে জানালো, বিনা বিচারের বন্দীদের এরকম খাওয়াপরা দেওয়া সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, ৩নং রেগুলেশনের ৬ ধারায় বলে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাজবন্দীর স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। হুকুম অনুযায়ী খাদ্য দিলে এবং বিশেষতঃ চা, সিগারেট যারা খেতে অভ্যস্ত, তাদের তা বন্ধ করলে, স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে পারে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ইয়ং সাহেব এসে হাজির আমরা তখন মুখহাত ধুচ্ছি, রাত্রের মতো বন্ধ হয় বললে, দেখুন, আমি যা করবার তা' করেছি, আমার conscience এখন clear. আমায় বলেছে, Carry out Government orders. কাল থেকে আমায় তাই করতে হবে।

রাত্রে নিজেদের মধ্যে গম্ভীর আলোচনা হ'ল। ভোরে ঘর খুলে দেওয়ামাত্র বাইরে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি এক বালতি লপ্‌সি এনে দরজার কাছে রেখে গেল—কয়েদিখানার ভোরের সংস্করণ।

সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল, বালতিটাকে একটা লাথি মেরে কাৎ ক'রে ফেললাম। অন্ত অনেক দিনই আমার ভাগের লুচি হালুয়া কয়েদীদের দিয়ে ওদের লপ্‌সি আমি খাই। শুধু খেতে ভালো লাগে না, হাজার কয়েদী রোজ যা' খায়, তা খেয়ে একটা তৃপ্তিও পাই। জীবন, অমৃতবাবু প্রভৃতিও প্রায়ই আমার সঙ্গী হন। আজ কিন্তু দেখা মাত্রই লাথি মেরে ফেলে দিলাম।

ঘরে এসে বসতে সুপতিদা চ'টে উঠলেন, বললেন, খাবে না তো পাবে না, ফেলে দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

বুঝলাম, বয়সের সুবুদ্ধি বিপ্লবীর আত্মসম্মানবোধের ঘাড়ে চেপে বসতে শুরু করলো।

একটু বাদে জেলারও এসে ঠিক ঐ ভাষায় ঐ প্রশ্নটিই করলো। বললাম, ফেলেছি, বেশ করেছি, যান, যা পারেন করুন গিয়ে।

সে গিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ব'লে কিন্তু উল্টো কথা শুনলো: ফেলবেই তো! তুমিই বা ঐ লপ্‌সি পাঠাতে গেছ কেন? তোরের খাবার আমাদের লপ্‌সিই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া, কয়েদির রান্নাঘর থেকেই বা ওঁদের খাবার রান্না হয়ে যাবে কেন? গুদামে ভাল আটা আছে, গুড় আছে। তাই আমরা ওঁদের পাঠিয়ে দিতে পারি, ওখানে কাজ করবার কয়েদি আছে, তারা রুটি ক'রে দেবে। প্রয়োজনমতো medical groundএ আমি কাউকে কাউকে চা-ও দিতে পারি।

এরপর জেলারকে নিয়ে আমাদের ঘরে এসে পরিষ্কার চাল, ডাল, বাগান থেকে টাট্‌কা তরিতরকারী ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে গেল, গবর্ণমেণ্টের কাছে একটি নর্দ তৈরি করে পাঠিয়েছে, যদি সেটাতে গবর্ণমেণ্ট সম্মতি জানায়, তা হ'লে দৈনিক এক টাকা এক আনার ভেতর আমাদের মোটামুটি ভাল খাবার ব্যবস্থা হবে।

এদিকে আমাদের কয়েদির আহার চল্‌লো। গিরীনদা তখন আমার বোনকে পড়ান। সেইদিনই তাঁর নামে একটা টেলিগ্রাম গেল, Given convict diet. Make outside arrangements. গিরীনদা টেলিগ্রাম পেয়ে বুঝলেন, বাইরের ব্যবস্থা মানে বাইরে থেকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা নয়। পর দিনই খবরটা "অমৃতবাজার পত্রিকায়" বেরিয়ে গেল।

ষ্টীফেনসন তখন বাংলা গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার। ষ্টেট প্রিজনারদের জন্য কয়েদিখানার হুকুম কি ক'রে গেল, অনুসন্ধানে বের হ'ল, ম্যাকআলপিন ব'লে একটা

সেক্রেটারী ছিল, তার এক সই নিয়ে টমসন অর্ডারটি চালু করেছে

টমসন চট্ করে ইয়ং সাহেবের সেই একটাকা এক আনার ফর্দ পাশ ক'রে দিল কাপড়চোপড়েরও এক আধ-কোঁদি গোছের ফর্দ এল। এ পর্যন্ত ইয়ং সাহেবের মেজাজ আমাদের সম্বন্ধে প্রীতিপূর্ণ।

আমরা কিন্তু খাদ্য ও কাপড়জামার ফর্দ সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে গবর্ণমেণ্টের কাছে লেখালিখি শুরু করলাম। সেটা ইয়ং সাহেবের তেমন পছন্দ হ'ল না। 'তুমি সব কিছু করতে পার, তুমিই সবকিছু ক'রে দেবে' এই বলতে পারলে বাদশাই মেজাজ ভালো থাকতো। যাইহোক, এখন পর্যন্ত চলনসই রকমেই সব চললো, ভেতরের উষ্মা বাইরে প্রকাশ পেল না।

ইতিমধ্যে বাংলা কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হয়ে গেল। দেশবন্ধুর এবং স্বরাজ পার্টির জয়জয়কার!

নির্বাচনের পর সত্যেন মিত্র, অনিল ঘরণ রায় ও অরুণ গুহ এলেন আমাদের সঙ্গে পার্টির প্রোগ্রাম আলোচনা করতে। সত্যেনদা ও অনিলবাবু বাদুড়, মনোরঞ্জনদা প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করতে রইলেন। পার্টির আমার জানার ভিতর কোথায় কি আছে না আছে আমি অরুণদাকে ব'লে দিলাম।

এত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ! আই. বি. তুলকালাম ক'রে ছাড়লো। সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের অনুমতি আগে থেকে ছিল না। কিন্তু মোলাকাতের ওখানে একজন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস ছিল। ইয়ং সাহেব তার অনুমোদনে সবার সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিল। এর পর ইয়ং সাহেবের এবং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-টির অনেক কৈফিয়তের কব্জিতে পড়তে হ'ল। এবং ক্রমে মোলাকাতের আইনকানুনের নানাবিধ কড়াকড়ি দেখা দিতে লাগ্‌লো

শীতকাল এসে গেল। আমাদের আলোয়ানের প্রয়োজন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটি আলোয়ান আনালো। আমরা বললাম, একটি আনালে চলবে না, কয়েকটি আনাবে, আমরা তা থেকে পছন্দ ক'রে দিলে সেই অনুযায়ী সবার জন্যে আসবে ইয়ং সাহেব ব'লে পাঠালো, পছন্দ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের। আমরা বললাম, পছন্দ আমাদের।

ইয়ং সাহেব জিদ ছাড়লো না। আমরাও আধা কয়েদি কাপড়ের ফর্দ এইবারে তুলব। সরকারের কাছে দরখাস্ত গেল, আমরা কয়েদি নই, পছন্দ আমাদের।

বাদশাই মেজাজ এইবারে ক্ষেপলো।

খাওয়াদাওয়ার যে-ফর্দ ইয়ং সাহেব পাশ করিয়ে এনেছিল, তা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। এবং সে আপত্তিও সরকারকে জানানো হয়েছিল। ইয়ং সাহেব এইবারে প্রমাণ করতে উঠে প'ড়ে লেগে গেল, তার ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। একদিন তিনটি বাঙালী ভদ্রলোককে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দেখাবার জন্য ডেকে নিয়ে এল। এঁদের একজন রুনো ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন রায়বাহাদুর, আর একজন সিভিল সার্জনের জামাই।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটটি জিজ্ঞেস করেন, খাদ্য তালিকায় অভাব কিসের?

আমি বলি, দুধ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদির। মাছের পরিমাণ কম।

ফল? বাড়ীতে কি ফল খান?

কেন, আম, কাঁটাল, আনারস, কলা, পেপে···

পেপে? আপনার বাড়ী কোথায়?

বাড়ীর পরিচয় বলি।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী জেরা: সেখানে আমি ছিলাম, সেখানে তো পেপে হয় না?

অমৃত সরকার জিজ্ঞেস করেন, আপনার বাড়ীতে বেগুনের চাষ হয়?

জ্যোতিষ বাবু গম্ভীরভাবে বলেন, You have no right to cross-examine a gentleman. আমাদের দিকে ফিরে বলেন, Friends, let us retire.

এর পর যার মুখে যা এল, ভদ্রলোকদের নির্বাক হয়ে

কিছু সময় দাঁড়িয়ে শুনতে হ'ল। জানলা দিয়ে দেখ্‌ছি, ইয়ং সাহেব বেল তলায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে, আর নিজের হাতের ব্যাটন দিয়ে নিজের পায়ে মারছে। ভাবছি, এই নিমকহারামদের সাথে কেউ পারবে না—এত করলাম এদের জন্যে, এখন আমি যা কিছু করেছি, তারই বিরুদ্ধে কথা।

নিজেদের পছন্দমতো কাপড় চাই, ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাগিদও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইয়ং সাহেব এতে বাধা দিচ্ছে। কাজেই সরকারের অনুমোদনও পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর একটা তাগিদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে এপর্যন্ত যা কিছু কাপড় জামা দিয়েছিল এক একটা পুঁটুলি বেঁধে আফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এর আগে মাঝে মাঝে অনশন ধর্মঘট হয়েছে, এইবারে তার রূপ নিল বস্ত্রবর্জনে। ধরা পড়ার সময়ে যার যা বুদ্ধিজামা সঙ্গে ছিল, তাই রইলো সম্বল।

ইয়ং সাহেব কিন্তু পুঁটুলিগুলো আফিস থেকে ফেরত দিল, ব'লে পাঠালো, না পরতে হয়, না পরবে, পুঁটুলি গুলো আমাদের ঘরেরই এককোণে জমা থাকবে।

আমরা পুঁটুলিগুলো দেয়ালের উপর দিয়ে জেলেরই আর এক অংশে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। জেলখানায় এটার নাম হ'ল mutiny বা বিদ্রোহ—যা নাকি ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাইরা করেছিল!

পরদিন স্নানের বেলায় আগে একে একে আফিসে ডাক পড়লো—যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশি। যে যায়, সে কিন্তু আর ফেরে না। আমরা স্নানের প্লাটফর্মে ওঁদের প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। ডাক পড়লো অমৃত সরকারের। ব'লে দেওয়া হ'ল, এখন স্নানের বেলা হয়েছে, যাঁরা গেছেন, তাঁরা না ফিরলে আর কেউ যাবেও না, এবং খাবেও না।

তা-ই হ'ল। জেলখানায় দেখা গেছে, লড়াই যে ভাবেই শুরু করা হোক, শেষ পর্যন্ত অনশনটি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিকেল বেলায় আবার অমৃত বাবুর ডাক পড়লো। তখন তাস খেলা হচ্ছিল—চারজন খেলছিলেন আর সবাই আমরা খোক্তারী করছিলাম। ব'লে দেওয়া হল, যাঁরা গেছেন, তাঁরা না ফিরলে আর আমরা কেউ যাব না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়ার্ডের দরজা চিচিংফাঁক হয়ে গেল, আর ঢুকলো ইয়ং, জেলার, বড় জমাদার, এবং তাদের পেছনে জন ত্রিশ সিপাই।

তাস খেলা চল্‌ছে।

ইয়ং সাহেব চোখ এবং ব্যাটন ঘুরিয়ে বলে, You অমৃতা সারকার, Will you or will you not obey orders?

অমৃত বাবুরও চোখ দুটো বেশ ঘুরতো, বল্লেন, তোমার brute force তো সাথে ক'রেই নিয়ে এসেছ, তা-ই চালাও।

দু'জন সিপাই এসে দু'দিক থেকে ধরলো, উনি চল্‌লেন।

একে একে এই অভিনয় আমাদের সবার বেলাতেই হ'ল। সবাইকেই নিয়ে চল্‌লো সেই বিশ ডিগ্রিতে, সেলে।

আমি, জীবন, আর অমৃত বাবু খুব হাসছি। দরজা থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা ওয়ার্ডে করেদিরা বন্ধ হচ্ছে। বলি, "বন্দে মাতরম্।"

সকলেই বলেন, "বন্দে মাতরম্।"

সেলে বন্ধ হয়েছি। ভারী বুটের শব্দ ক'রে ইয়ং সাহেব ছুটতে ছুটতে আসে। প্রথম সেলেই আমি। জিজ্ঞেস করে, Did you cry Bandemataram?

"Yes, I did."

আর দাঁড়ালো না। পরের সেলে জীবন। তাঁকে দেখিয়ে পেছনে বড় জমাদারকে হিন্দিতে বলে, এইতো চেহারা! মশলার মতো পিষে ফেলতে পারলে না?

সব সেলের সামনে ঘুরে রাগে গর গর ক'রে বেরিয়ে গেল। যাদুদাদের তিন জনের কিন্তু তখনও খবর পেলাম না। রাতের বেলায় জানলাম, সংলগ্ন আর একটা সেল ব্লকে তাঁরা আছেন।

এদিকে ইয়ং সাহেবের সাথে আমাদের বিবাদ নিয়ে গভর্ণমেণ্ট থেকে এক inquiry commission করলো। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে. এন. গুপ্ত ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিস্ তার সদস্য। ব্যাপার কি বলতে আরম্ভ করতেই মি. গুপ্ত বাংলায় বল্‌লেন, আমি বিভাগীয় কমিশনার, কিন্তু বুঝ্‌তেই তো, বাঙালী, ক্ষমতাটমতা বিশেষ কিছু নেই, now let us know what happened."

ইয়ং সাহেবের সমস্ত নাটকীয় ব্যাপার অভিনয় ক'রেই দেখান হ'ল। শুনে ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হ'ল না, বল্‌লেন, I'll ask the Superintendent not to lose temper and advise you to observe jail rules.

শুনলাম, অন্য সুপারিশের সঙ্গে এই কমিটিই গভর্ণমেণ্টকে বলে, রাজবন্দীদের জেলে রাখা সব দিক থেকেই অনুচিত, বরং এদের চিকলিতে রাখা উচিত। হিজলীর কথা ইয়ং সাহেব আমাদের কাছে বলেছিল। গভর্ণমেণ্টও এর পর আমাদের ওখানে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জলাভাবের দরুণ সেটা তখন ঘটে ওঠে নাই। পরে টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা ক'রে ১৯৩১ সালে ওখানে বিনা বিচারের বন্দীদের নেয়।

মাসের পর মাস যায়, শীতের প্রকোপ নিদারুণ। কাপড় নেই, জামা নেই, আলোয়ান নেই, জুতোও প্রায় নেই। বিছানার চাদর আর একখানি ক'রে সুজনি সম্বল। রাত্তির বেলায় তার সঙ্গে এক একখানি ক'রে কয়েদির কম্বল জুড়ে নিই। দিন কাটে।

স্ফূর্তির কিন্তু অভাব নেই। আমাদের কাজ করার জন্য যে-কয়জন কয়েদি ছিল তার ভিতর কৃষ্ণদাস ব'লে একজন ছিল—মেথরের কাজ করতো। দাগী কয়েদি—পেশা পকেটমারা। ছোট্ট মানুষটি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু চেহারার লাবণ্যের অভাব নেই। চলাফেরা সাধারণতঃ মন্থর, প্রয়োজনে অতি ক্ষিপ্র, কিন্তু সর্বদাই কাঠবিড়ালীর মতো নিঃশব্দ। রসিক লোক—সদ্য বিদেশ থেকে আগত এবং এদেশে বহুদিনের বাসিন্দা মেমসাহেবের চরিত্র বর্ণনা করলো একদিন, স্বভাবসিদ্ধ মৃদুভাষায়: হাওড়া ষ্টেশনে হাত থেকে ব্যানিটী ব্যাগটি টেনে নিয়ে ছুট্ দিতেই যে-মেম সাহেব O my god! ব'লে হা করে থাকবে, বুঝতে হবে সে নতুন এসেছে! পালানো ভারী সুবিধে! আর এদেশে পুরোনো হয়ে গেছে যে-মেম সাহেব নিউ-মার্কেটে তার ব্যাগে টান পড়তে না পড়তেই বলবে, চোর, চোর, পাকড়ো, পাকড়ো!

ছ'চার দিন ধ'রে অমৃত বাবু ওকে নিয়ে ঘরের পেছনে কি শলা পরামর্শ করেন। তারপর একদিন বেলা ১০টা আন্দাজ সবাই যার যার জায়গায় শুয়ে ব'সে পড়াশুনো করছি—হঠাৎ দরজার কাছে আওয়াজ হ'ল, Good morning, Babus! চম্‌কে যেমন সেদিকে সবাই তাকিয়েছি, কে একজন মাথা থেকে টুপি খুলে আবার বসাতে বসাতে বলছে, I am the টাট্টি-General, I come from Madras. ব'লেই লজ্জায় হোক্ বা বড় অফিসারের কর্তব্যসাধনের জন্যই হোক্ চট্‌পট্ আমাদের ঘরের ভিতরকার পায়খানায় ঢুকে পড়লো। বিস্ময় ভেঙে ইতিমধ্যে আমরা সব হাসতে হাসতে দম নিচ্ছি, ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মুখ নীচু ক'রে বলে, I find it all very neat and clean. Good morning! বলে ছুটতে ছুটতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মেথরের কাজ করতে জেল থেকে চুণ, আলকাতরা, পাট, কয়েদির ছেঁড়া কাপড় জাতীয় দু'চারটা জিনিষ পেত। তা থেকেই মাদ্রাজী সাহেবের পোষাক তৈরী হয়েছে। উপদেষ্টা অমৃতবাবু।

সতীশ পাকড়াশী কৃষ্ণদাসকে সাতিশয় যত্নসহকারে বোলশেভিজম্ বোঝান। যাদুদা একদিন ওর পরীক্ষা নিতে গিয়ে বলেন, কারও ঘরে কিছু থাকবে না, কিন্তু যার যা প্রয়োজন, তা সে পাবে, কেমন হ'ল বল্‌তোরে কেষ্ট?

ধীরে ধীরে ও বলে, বাবু, সবই তো হ'লো ভালো! কিন্তু শালা চোরের বড় মুস্কিল হ'ল!

কেন রে?

সবাই সব পাবে, কিন্তু ঘরে কিছু না থাকলে চোর ব্যাটা কি পাবে?

যার যেখানে ব্যথা!—যাদুদা উচ্চ হেসে বলেন।

যাদুদা, ভূপতিদা, সতীশ পাকড়াশি, জীবন এবং আরও কেউ কেউ মিলে এক যাত্রার দল খুলেছিলেন। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন খুলে গান ধরতেন, "নিদাঘে শীতল সিরাপ...।"

গান ধ'রে যাদুদা আলোকিত ঘরে একটি লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চলতেন, আর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাইতে গাইতে দলটি পেছনে। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পরিক্রমা।

গোলমাল লাগবার আগে কয়েদির খানা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমাদের অবস্থা যখন একটু উন্নতির দিকে তখন জেলার হরপ্রসাদ মিত্রের মনোভাবের ব্যাখ্যান ক'রে ভূপতিদা একটি গান বেঁধেছিলেন, প্রথম দুটি লাইন মনে পড়ে :

"মেদিনীপুর জেলে লেগেছে রেকুইজিশন-হাওয়া
দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন বিনামা-চাওয়া।"

ইদানীং নতুন গান শুরু হ'ল—

"ইয়ং সাহেব গেলেন"
"কোথায় গেলেন?"
"গেলেন ক্ষেপে।"

পড়াশুনো বিশেষ নেই, সুযোগও কম। বইপত্র প্রায় পাইনে। রাত্রে যাত্রাগান শুনের পর প্রায় পাখার উৎসাহ লাগে। আমি রস পাইনে, ঘুম তার চেয়ে মিষ্টি লাগে। শুয়ে পড়ি। অমৃত সরকার পেছনে লাগেন, জীবনও সঙ্গে থাকেন।

ঘুমোব এমন সময় বালতিভরা জলের চেউ খেলে গেল নারকেল-ছোবড়ার গদির উপর দিয়ে। এরপর থেকে খেলোয়াড়দের কারও না কারও খাট দখল ক'রে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়ি। একরাত্রে খেয়াল চাপলো, সব খাটেই জল ঢৈ ঢৈ! তারপর সারারাত ধ'রে যাত্রার পালা।

ওদিকে দরখাস্তের পর দরখাস্ত চলেছে। হঠাৎ একদিন ইয়ং সাহেবের বদলির হুকুম এল।

তার জায়গায় রাজনৈতিক বন্দীদের বন্ধু টমসনের কায়দাজিতে এল মেজর মানরো। আমাদের মধ্যে দু'চার দিনের মধ্যেই সে নাম পেল তিলেশ্বর। ছিল পাগলা গারদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত—ঘরে ঢুকেই আলমারীর পেছনে উঁকি দিয়ে দেখে পিস্তল লুকানো আছে কিনা, লুকদানির চুন পা দিয়ে নেড়ে চেড়ে বিপজ্জনক জিনিষের সন্ধান করে।

যে কোনো জিনিষ চেয়ে পাঠাই, জেলারকে বলে, দেখ, আইনে আছে কিনা। জুতো মেরামতের কথা আইনে নেই, বরং নতুন জুতো কিনতে রাজী, জুতো মেরামত করিয়ে দেবে না। জিভ-আঁচড়া আইনে নেই, তা দেবে না। জিনিষপত্র চেয়ে পাঠাই একটা খাতায় লিখে, খাতা আফিসে আটকে রেখে দিল। স্লেটে লিখে পাঠাই। স্লেটের কথা তো আইনে নেই, তাও একে একে সবগুলি আটক করলো। আটকাতে চেয়েছিল দরখাস্তের কাগজও। একজন অ্যাসিস্টেণ্ট জেলার বলে, সেটা পায় না সাহেব, আসল আইনেই আছে যতো খুসি দরখাস্ত ওরা করতে পারে।

প্রতি ব্যাপারে রোজ দু'চারখানা ক'রে দরখাস্ত যায়। ডিকেনসন তো পেয়ে আগুন, Who sent Maj. Munroe there?

অসহযোগের সময় মানরো ছিল বরিশাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। গীতা ও কোরাণ নিয়ে সেখানে এমন কাণ্ড ক'রেছিল যার ফলে, লাটসাহেবের Executive Council-এ স্যার আবদার রহিমকে জেল বিভাগ ছাড়তে হয়।

দিনদিনের ভিতর মানরো সাহেবের মেদিনীপুরের খেলা ফুরোলো। টেলিগ্রাফে বদলি হয়ে গেল। মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেল যে পরবর্তী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বাড়ীর চাবিটি পর্যন্ত না দিয়ে স'রে পড়লো।

সবে ভোর হয়েছে। কেউ কেউ মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় দেখি, জেলারকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন Maj. Denham-Whyte. নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

বললেন, চাটগাঁয় টেলিগ্রাম পেলাম, মেদিনীপুর যাবার আগে সেক্রেটারিয়েটে এসে সব কাগজপত্র দেখে যেয়ো।

What are those miles length of petitions about? Who is the gentleman who wanted a tongue-scraper?

বললাম, আমি

জেলারকে জিজ্ঞেস করলেন, একটার দাম কত?

দু'পয়সা, কি দু'আনা

একটু মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

একে একে ঘ:' চাই সবই আসতে লাগ্‌লো। সরকারী চিঠি এল: খাদ্যের জন্য দৈনিক বরাদ্দ একটাকা চার আনা, তার ভিতর আমরা যা পারবো আনিয়ে নেব। কাপড়, জামা ইত্যাদি পাব নিজেদের পছন্দমতো। জগডার পাঁচমাস কেটে গেল। শীত গিয়ে তখন বেশ গরম প'ড়ে গেছে।

ডেনহাম-হোয়াইট্‌ আসেন, এক এক দিন অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করেন। তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে নিজে হাতে ঘরে আমাদের জন্য অনেকগুলো ক'রে বই নিয়ে আসেন, আর আনেন চকোলেট।

যাদুদা পলাতক হবার আগে মেডিক্যাল কলেজে ডেনহাম-হোয়াইটের ছাত্র ছিলেন। এখানে মাঝে মাঝে বাইরের রোগী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আনন্দ পান। জেল হাসপাতালে কোনো কোনো দিন সাথে ক'রে নিয়ে যান বিশেষ বিশেষ রোগী দেখাতে।

মনোরঞ্জনদা আর ভূপতিদা একদিন বড় আঘাত দেন। আলোচনার মধ্যে বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়া টাকার তাঁতীদের আঙুল কেটে ফেলেছিল।

Don't say, they were so bad!

এঁদেরও ধৈর্যের অভাব নেই, স্নানের সময় চলে গেছে, আমরা সব খেতে বসেছি, তখনও আলোচনা চল্‌ছে।

বন্দনা

শ্রীদিলীপ কুমার রায় (পণ্ডিচেরি)

যে-যুগে পরম সত্য মানিতে মনের লক্ষ বাধা;
কালে কালে অবতীর্ণ হন নররূপে যিনি প্রভু
তাঁহারে বরিতে যারা চায়—তাহাদেরে কণ্ঠে সাধা
হয়না সহজে হায় যে যুগে সে-সুর মানি তবু।
সে-যুগে নিয়ত তাঁরে রাখেন স্মরণে যে-বৈষ্ণব
প্রতি কার্যে অনুক্ষণ জপি' শুধু তাঁরি মিলনাশ,
মহাভাগবত যাঁর কলকণ্ঠে উচ্ছলিত স্তব
তাঁর—যাঁর তরে গান, নমি তাঁরে শ্রীল রামদাস।

প্রণিপাত

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

সার্থক তব জনম গৌড়ে হে মহাসুধী,
গৌর সঙ্গ লভিলে ভক্ত নয়ন মুদি'।
বর্ষেবর্ষে তোমারে বঙ্গে বরণ করি,
প্রণত এ শির রাখিয়া তোমার চরণপরি।
জীবন্মুক্ত তাব বিগ্রহ এখন তুমি,
বন্ধু তোমারে আজো বুকে ধরি বঙ্গভূমি।
মোদেরে তরিতে ধরাতে তোমার আবির্ভাব
যত দিন রও শরীরী সে শুধু মোদের লাভ

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম. এ., বিদ্যাবাচস্পতি

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের বা দেশ বিশেষের নিজস্ব নহেন। তিনি সকলের, সকল সমাজের এবং সকল দেশের। তাঁহার উপদেশ এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বকালিক। তথাপি তিনি বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর; বাঙ্গালা তাঁহাতে বিশেষ গৌরব ও প্রীতি অনুভব করে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে—তিনি বাঙ্গালা দেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীর সঙ্গেই তিনি মিশিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বন্যা বাঙ্গালার বুকেই সর্ব্বপ্রথমে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ তাহা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা এক পূর্ণ অখণ্ড বস্তু। তথাপি আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টিতে আমরা মনে করি—তাঁহার কৃপায় সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের—ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপত্বের, রসস্বরূপত্বের—যে পরম-শোভনীয়, পরম-উন্মাদনাময় রূপের কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এবং কি উপায়ে জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া, আনন্দী হইতে কৃতার্থ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, মুখ্যতঃ বাঙ্গালীর মুখেই তাহা সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর গ্রন্থরাজিতেই তাহা নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি বাঙ্গালীকে সমগ্র ভারতের প্রেমধর্ম্মানুসন্ধিৎসুদের আধ্যাত্মিক গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

কেবল ভারতের কথা বলা হইল এই জন্য যে, প্রচারের অভাবে ভারতের বাহিরে এই প্রেমধর্ম্মের কথা সেই সময়ে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। অধুনা গৌড়ীয় মঠ-নামক লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য দেশেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচারের উদ্যোগ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মানুষের মধ্যে প্রীতি প্রবণতা স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রীতি কোন্ স্থানে গিয়া পৌঁছিলে পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, পরমতম এবং চরমতম মহিমার মহীয়সী হইতে পারে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। তাই আমার মনে হয়, প্রচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে জগতের লোককে এই অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করাইতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে একটী দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত—তাহাও বাঙ্গালার একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু। সমগ্র উত্তর ভারতেরই কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ ছিল না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট বাঙ্গালার প্রতিভা সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রসতত্ত্ব জগতের অধ্যাত্ম সাধনার পথে এক অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধার অক্ষয় সরোবর হইতে উৎসারিত যে কয়টী রসধারা বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী-সাহিত্যকে পরিনিষিক্ত করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারকে চির-রসময় করিয়া রাখিয়াছে, পরবর্ত্তীকালের অনেক খ্যাতনামা কবি ও ভাবুকের চিত্তে তাহারা অপূর্ব্ব প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যোগাইবে। বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারের এক সমুজ্জ্বল রত্ন।

সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা একটু প্রসার লাভ করিতেছে; কিন্তু এই আলোচনা যেন প্রাণহীন দেহের ব্যবচ্ছেদের আকার ধারণ না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সমালোচকদের নিকট সানুনয় নিবেদন জানাইতেছি।

নানা কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন অনেকটা উপেক্ষিত হইতেছিল, তাহার ফলে দেশের মধ্যে কয়েকটী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়; তাঁহারা সকলেই অবশ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের আচরণ দেখিয়া শিক্ষিত সমাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

সপ্ত কবিদের কথাও তো কবি বলিতে পারিতেন—ভারতের সংস্কৃতি তো আজ শুধু হিন্দু সংস্কৃতি নয়! বোধ হয় এখানেই কবির মনের গতির সীমা প্রকাশ পাইতেছে। তাই তিনি বলিতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে যাইতে দাও, কিন্তু হিমালয়! ভীমার্জুনকে তাঁহাদের গদা ও গাণ্ডীব সহ ফিরাইয়া দাও।

কহ দে শঙ্কর সে আজ তরে
যে প্রলয়-নৃত্য ফির একবার ;
সারা ভারত যে গুঁজ উঠে
'হর-হর-বম' কা ফির মহোচ্চার !
সে ঔংগরাঈ উঠ, হিলে ধরা
কর নিজ বিরাট স্বর মেঁ নিনাদ,
তু শৈল-রাট্ ! হুংকার ভরে
ফট জায় কুহা, ভাগে প্রমাদ।
তু মৌন ত্যাগ, কর সিংহনাদ,
রে তপী ! আজ তপ কা ন কাল,
নবযুগ-শংখ-ধ্বনি জগা রহী
তু জাগ, জাগ মেরে বিশাল !

বল না শঙ্করে করুন তিনি,
সে প্রলয় নৃত্য আর একবার ;
ভারত জুড়িয়া উঠুক ধ্বনিয়া !
হর হর ব্যোম ধ্বনিটি আবার।
দাঁড়াও উঠিয়া, কাঁপুক ধরণী,
বিরাট স্বরে তাবে কর নিনাদ,
গিরিরাজ তুমি ! হুঙ্কারে তব
ঘুচুক কুয়াশা, ঘুচুক প্রমাদ।
দূর কর মৌন, ছাড় সিংহনাদ,
তপস্বী, তপস্যার নহে তো কাল ;
জাগায় নূতন যুগের শংখ,
জাগো তুমি, জাগো, হে মোর বিশাল।

হুংকারের প্রথম সংস্করণ ২০০০ সংখ্যা হাতে হাতে বিক্রয় হয়—৪।৬ বৎসর পরে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়।

সফলতা মিলে অথবা পরাজয়—
তাহাতে কি হবে ? দিয়েছি প্রাণ—
চাহি কি বিশ্বের উচ্চ আসন ?
না—না, চাহি শুধু আত্মদান।

তাঁহার 'ধূপছায়া'—বা ধূপছায়ার তিনি বলিয়াছেন, ধূপ কম আর ছায়া বেশি। ইহা ১৬টি কবিতার সংগ্রহ, কিশোরদের জন্য। ইহার মধ্যে দুইটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—"শুধু বিধে দুই" ও "পুরাতন ভৃত্যের" অনুবাদ। শ্রীযুক্ত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর নিকট কবি শুনিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতার অন্য দেশের ভাষায় অনুবাদ করা ঠিক হইবে না বলিয়া পছন্দ করিতেন না ; তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনও কবিতা অনুবাদ করেন নাই ! দুইটি কবিতা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কবিতা হইতে, দুইটি সত্যেন দত্তের কবিতা হইতে, একটি গডফ্রে নামক জনৈক পাশ্চাত্য কবির রচনা হইতে —আর দুই একটি অন্য কবিদের ছায়া হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে কবির মূল সুর—তাহা ইহাতেও স্পষ্ট। প্রথম কবিতাটির নাম "শক্তি ইয়া সৌন্দর্য ?" তাহার মধ্যে সারবস্তু হইল—

হৈ সৌন্দর্য শক্তিকা অনুচর,
জো হৈ বলী ওহী সুন্দর ;
সুন্দরতা নিঃসার বস্তু হৈ
হো ন সাথ মেঁ শক্তি অগর।

সৌন্দর্য হয় বটে শক্তির অনুচর,
যাহার আছে বল, সেই তো সুন্দর ;
সুন্দর সে বস্তু জেনো একান্ত অসার,
শক্তি যদি নাহি রয় সহিতে তাহার।

দ্বিতীয় কবিতাতেও দেখি, 'বল ইয়া বিবেক'—দুই রাজপুত বাদশাহের নিকট আসিয়া ঘি আটা খাইতে চাহিল, গুণপণা দেখাইবার সুযোগ চাহিল। বাদশাহ বলিলেন, তোমরা যে রাজপুত বীরপুরুষ, তাহার প্রমাণ ? অমনি দুজন ঘোড়সওয়ার হইয়া খাপ হইতে তলওয়ার বাহির করিয়া পরস্পর আঘাত করিল, উভয়েরই শির ভূমিতে লুটাইল, থাকিল শুধু ঘোড়া দুইটি ! বাদশাহ

এই দৃশ্য দেখিয়া চিৎকার করিয়া চোখ বুজিলেন। এই 'নিরর্থক' আত্ম-বলিতেও পৌরুষ আছে। কবির ভাষায়—

(১)
মৈঁ কহতা হুঁ, বুদ্ধি ভীরু হৈ,
বলিসে ঘবরাতী হৈ ;
মগর, বীরতা মেঁ গরদন
ঐসে হী লী জাতী হৈ।

(২)
সির কা মোল কিয়া করতে হৈঁ
বহাঁ চতুর নর জ্ঞানী,
ওহাঁ নহীঁ গরদন চড়তী
বহাঁ নহীঁ কুরবানী।

(১)
আমি বলি, বুদ্ধি হয় ভীরু,
বলিদানে সে যে পায় ভয় ;
কিন্তু যেখানে থাকে বীরত্ব,
এমনিই শির দেওয়া হয়।

(২)
মাথার মূল্য কে স্থির করে ?
যেখানে মানুষ চতুর ও জ্ঞানী।
সেখানে শির লুটায় না ভূমির পরে,
সেখানে হয় না কোনও কোরবানী।

দিনকরের 'সামধেনী'ও সংগ্রহপুস্তক—২১টি কবিতা। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪১ হইতে ১৯৫৬ সাল। বিপ্লবের কথাই ইহাদের মূল সুর। কোথাও কবি উৎসাহ দিতেছেন ক্লান্ত চর্বলমতি সহকর্মীকে—

"থক কর বৈঠ গয়ে ক্যা ভাঈ ! মংজিল দূর নহীঁ হৈ।"
ক্লান্ত হয়ে বসে কেন ভাই ! মন্জিল তো নহে বেশী দূর।

নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গায় কবির মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। তথাপি তাঁহার আদর্শের উজ্জ্বল ভাতি ম্লান হয় নাই। ১৯৪৫-এ রচিত 'দিল্লী ঔর মস্কো' বিপ্লবেরই অভিনন্দন। ইহারই অন্তর্ভুক্ত 'কলিঙ্গবিজয়ে' অশোকের মনের ছবি আঁকিতে গিয়া কবি যে ভাবপরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারই অনুষঙ্গি ফল কুরুক্ষেত্র। অশোক দেবতাকে সর্বস্ব সঁপিয়া দিলেন, যাহাতে যুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের জয় গান গাহিতে পারেন।

কুরুক্ষেত্র ৭ সর্গে সমাপ্ত খণ্ডকাব্য। ইহা যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম সংবাদ। কিন্তু এই যুধিষ্ঠির, এই ভীষ্ম, মহাভারতের অর্থাৎ ব্যাসদেবের ধারা অনুবর্তন করেন নাই ; তাহাতে কি ! যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া যুদ্ধ মানুষের বর্জনীয় কি না, তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সর্গে প্রতি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে কি হয়, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্জুনের দ্বৈধী ভাব, মানব-জাতির সনাতন চিত্তধারা। দিনকরের ভাষায় বলি—

হর যুদ্ধ কে পহলে দ্বিধা লড়তী উবলতে ক্রোধ সে,
পর যুদ্ধকে পহলে মনুজ হৈ সোচতা, ক্যা শাস্ত্র হী—
উপচার এক অমোঘ হৈ
অন্যায় কা, অপকর্ষ কা, বিষ কা, গরলময় দ্রোহ কা।

রাগ টগবগিয়ে ফুটিয়ে ওঠে মানুষের মনে, তবু প্রতি যুদ্ধের প্রথমে মানুষের মনে জাগে দ্বিধা, হয় ভাবসংগ্রাম মানুষ ভাবে, শাস্ত্রই কি অমোঘ প্রতিকার অন্যায়ের, অপকর্ষের, বিষের, গরলময় বৈরের ?

তবু যুদ্ধ করিতে হয়, আর যুদ্ধজয়ের পর রণভূমিকে দেখিতেও হয় যে সত্য রোদন করিতেছে। পাণ্ডব শিবিরে যে জয়ধ্বনি, তাহার মধ্যে ব্যঙ্গের সুর কতখানি আছে, কে বলিবে ! দুর্যোধন স্বপ্নে যেন যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—আমরাতো সিন্ধুর ওপারে এসেছি, রাগাইবার জন্য যাহা বল না কেন, কোনও কথা আমাদের আর কানে আসে না। রক্তস্রোতের শেষ কি আছে ? অদৃষ্টের পরিহাস ? —যুধিষ্ঠির কি করিয়া দিব্যবস্ত্রালংকৃতা দ্রৌপদীর সঙ্গে এই রাজ্য ভোগ করিবেন ? ইহার মধ্যে যে অভিমন্যুর রক্তও আছে ! দুঃখবেদনায় পূর্ণ হৃদয়, দীর্ঘ শ্বাস লইয়া তিনি শুধু পার্থকে বলিয়া উঠিলেন—পার্থ, আমি পিতামহের নিকট চলিলাম। ভীষ্ম তাঁহাকে বোঝাইলেন, যুদ্ধ যে অনিবার্য, মানবের মধ্যে দানব যতদিন থাকিবে ততদিন যুদ্ধ ভিন্ন পথ নাই। কিন্তু মানবসভ্যতা কি

চিরদিন এইরূপই থাকিবে? কবি একেবারে ষোল আনা যুদ্ধবাদী নহেন—তিনি জিজ্ঞাসু।

তীব্র উপদেশ দিতেছেন,

আশা কে প্রদীপ কো জলায়ে চলো ধর্মরাজ,
এক দিন হোগী মুক্ত ভূমি রণভীতি সে,
ভাবনা মনুষ্য কী ন রাগ মেঁ রহেগী লিপ্ত,
সে'বিত রহেগা নহীঁ জীবন অনীতি সে:
হার সে মনুষ্য কী ন মহিমা ঘটেগী ঔর
তেজ ন বচেগা কিসী মানব কা জীত সে;
স্নেহ-বলিদান হোংগে মাপ নরতা কে এক,
ধরতী মনুষ্য কী বনেগী স্বর্গ প্রীতি সে।

কবির ব্যাল-বিজয় অতি সুন্দর—কালীয়দমনের উপাখ্যান উপলক্ষ করিয়া তিনি বাঁশরীর স্বর শুনিতেছেন, সে বাঁশরীর তানে গরল অমৃত হইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের সৃষ্টি কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে। বাপুদর্শনে শান্ত সৌম্য স্থিতধীর চিত্র অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—যিনি মহাত্মাজীর এই চিত্র আঁকিতে পারেন, তিনি কখনও পাকা যুদ্ধবাদী নহেন।

কবি দিনকরের উৎকর্ষ বাড়িতে থাকুক, তাঁহার নিত্য অগ্রগতির সহিত পরিচয় স্থাপন করিবার জন্য হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর বাইরে অন্য ভাষাভাষীদের আগ্রহ জন্মাক, এই শুভকামনা করি।

উপস্থিত সভ্যদের একজন, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ও বয়সে প্রবীণ, কবির 'ব্যালবিজয়' বাংলায় অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; ইহাও কবির কাব্য-বেদীতে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের এক প্রকার অর্ঘ্য প্রদান।

কবির মৃত্যু দিনে

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার, কবি-শ্রী

সোনার তরণী বাহি'— বাইশে শ্রাবণ
নিয়ে গেল যত সকল
ধরণীতে রহে তাই ব্যথার প্লাবন,
দাঁড়াইয়া নভঃস্তলে মোর কাঁদে মন
স্মরণের রুদ্ধ দ্বারে
সাড়া পাই বারে বারে
তেরশ-সাতান্নর এই বাইশে শ্রাবণ।
কতনা গানের সুর
বাতাসেতে ভরপুর
স্মৃতির মন্দিরে তুমি নিত্য জেগে রও
নিরাশার ভাষা দিতে প্রাণের কথাটি কও
ছন্দ দিয়ে আঁকা তব জীবনের ছবি
সে তো আনি সত্য রূপ
হবে নাক' ধ্বংস স্তূপ
কাব্য মাঝে চিরন্তনী, তুমি হে কবি।
উননব্বই বছর আগে তব ভাষা কণ্ঠস্বরে
ছিল ছিন্না উত্তরোলা
গানে প্রাণ দিল দোলা
অনুপম সেই বাণী—মন ছুঁয়ে যায় সবে।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(একাদশ পরিচ্ছেদ)

রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রাজগাঙ্গপুর থেকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন। আমার পিতাকে যেতেই হবে সেখানে। এদিকে লালগড়ের ভাবী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায় এসে উপস্থিত। তাঁদের সেখানে যেতে হবে। যোগেনবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। যোগেনবাবু পরে রাজা হন এবং লোকহিতে যথেষ্ট দান-শীলতার পরিচয় দেন। রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রভূত টাকা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁর দেহান্ত হয়।

প্রথমে সুরেনবাবুর কাছে যাওয়া স্থির হয়। তখন বি, এন, আর লাইন সিনি থেকে নাগপুর ও বোম্বাই চলতে আরম্ভ করেছিল। সিনি থেকে কলকাতা ভালমত চলে নি। লাইন তৈরী হওয়া অবস্থায় আমি অনেকবার গার্ডকে বলে ব্যালাষ্ট ট্রেণে (রাস্তা তৈরীর জন্য পাথর, ছুড়ীবাহী গাড়ী) কম্বল পেতে যাতায়াত করেছি। মাল গাড়ীর ওয়াগনেও চড়েছি। কলকাতার পথে ঝড়গপুর হয়ে সাঁকরাইল পর্যন্ত রেল যেত। বাকিটা ষ্টিমারে চড়ে আর্মানী ঘাটে গিয়ে নামতে হত।

মেদিনীপুর থেকে রেলে চড়ে ঝড়গপুর গিয়ে বোম্বাই-য়ের গাড়ী ধরে ঘাটশিলা যাওয়া হল। ঘাটশিলায় মাত্র একঘর বাঙ্গালী ছিলেন। আর কেউ কোথাও নেই। সুবর্ণরেখা গলার হারের মত সুন্দর। ওপারের কাপড়-গাবীর পাহাড় মাথার মুকুট সেজে রয়েছে। সুবর্ণরেখা আর পাহাড় ঘুরে মিলে ছেলেবেলার মন ভোলান ছড়াকে যেন রূপ দিয়ে রেখেছে। ঘাটশিলা ভারী সুন্দর। নির্মেঘ নীল আকাশ যেন সাদর আহ্বানের জন্য আমার পথে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। বনমল্লিকার সারী দেখে মনে হল যেন তারা আহ্লাদে, ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার সুরথ মিত্রের একটি খালি বাংলো ছিল। সেখানে আমরা রইলাম। রামপ্রসাদ সিং বলে এক বলিষ্ঠ রাজপুত দরোয়ানকে সঙ্গে নেওয়া হল। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যেত না। শুধু দুধ ডিম মিলত। ষ্টেশন মাষ্টার জোয়ারদার মশাই খাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পুজো করার ইচ্ছা। তাঁর ও নিজেদের বাজারের জন্য আমি মেদিনীপুরে ফিরে গেলাম। আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে ফিরে এলাম। জোয়ারদার মশায়ের বাসার মেয়েরা অনেক আশীর্বাদ করলেন।

তারপর সিনি হয়ে কুমারকিলা ষ্টেশনে গিয়ে নামা হল। পথে গাধুডি, কালিমাটি, আসনবনী প্রভৃতি ষ্টেশন পড়ল, কালিমাটি যে টাটানগর হবে তখন কে জানত? সত্যই বন কেটে এক পরীভূমি তৈরী হয়েছে।

কুমারকিলার নাম পরে বদলে হয়েছে রাজ-গাঙ্গপুর। চক্রধরপুর এলেই বোঝা গেল দেশের চেহারা বদলে গেছে। মনোহরপুর পেরিয়ে পাহাড় ছিদ্র করে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে রেল চলতে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ও আনন্দ আমায় ছেয়ে বসল। মনে হল মানুষ কি না করতে পারে? শিলাভেদী পথ যে নির্মাণ করতে পারে সে তার এগিয়ে যাবার পথে যাবতীয় বাধার বুক চিরে তো রাস্তা করে নিতে নিশ্চয় পারে? গ্রামে ঘরে বসে থাকার মানুষ আর প্রকৃতি-জয়ী মানুষ ছয়ে কত তফাৎ! আমার কাছে প্রকৃতি-জয়ীদের যাত্রার নবচিত্রগুলি খুব বেশী করে মনোজ্ঞ হয়ে উঠল। গোরেলকিরা জঙ্গলের অনুর্বর পাহাড় অন্ধকার আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। যারা বললেন নাগপুর থেকে মারহাট্টি-মরাঠীরা এই সব পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে উড়িষ্যা ও বাঙ্গলায় আসত। "তারা যদি আসতে তবে বাঙ্গালীরা কেন এই পথে তাদের দেশে আসতে পারবে না?" আমি ভাবতে লাগলাম।

রাজগাঙ্গপুরটা কি? এটি একটি করদ রাজ্য। রাজার নিজের জেল ও পুলিশ আছে। রাজা ইংরেজকে বৎসরান্তে কিছু খাজনা দেন। অন্যথা তিনি স্বাধীন। রাজ্যটি মেদিনীপুর জেলার মত বড়। নেহাৎ কম জায়গা নয়। বাংলায় ময়মনসিংহ সবচেয়ে বড় জেলা। তারপরই মেদিনীপুর। বাংলা ও উড়িষ্যার

মেদিনীপুর। বাংলা ও ছোটনাগপুরের মাঝেও মেদিনীপুর। সিংভূমে "হো" বা লাড়কী কোলেদের বাস। তাদের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। আগে ছোট নাগপুরের কমিশনার ছোটনাগপুর ও বর্ত্তমান ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর অধীনস্থ যত করদ রাজ্য আছে সকলের উপরিস্তন ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ করদ রাজ্যগুলির অনেককে রাঁচি জেলার এলাকায় ধরা হত। কমিশনার রাঁচিতে থাকতেন কিনা! সে হিসাবে মধ্যপ্রদেশের কতকগুলি করদ রাজ্যও রাঁচির এলাকায় পড়ত। এই দিক থেকে আমি রাঁচি জেলায় এসেছিলাম। গাঙ্গপুর ছিল সম্বলপুরের কাছে। লোকেরা উড়িয়া ভাষাভাষী। রাজধানী এখান থেকে বহুদূরে। ঝাড়চোকড়া (ঝাড়খণ্ডা) ষ্টেশন হয়ে ইলা নদী পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। নাম সুন্দরগড়।

সুরেনবাবু এখানে কি করে এলেন? করদ-রাজ্য। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একটা প্রদেশ ছিল। একজন লাটের অধীনে থাকত এতবড় প্রদেশটা। সারা ভারতের কর্ত্তাকে এখনকার মত তখনও বলা হত বড়লাট। প্রাদেশিক শাসককে বলত ছোটলাট বা লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর। ছোটলাট সফরে বেরিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শন করতে গাঙ্গপুরে আসেন। রাজা খুব খাতির, সম্মান দেখালেন। ধুমধামে আতস-বাজী, নাচ গান, খানা-পিনার ব্যবস্থাও হয়েছিল। রাজার সঙ্গে ছোটলাট কর-কম্পন করতে হাত বাড়ালেন। রাজা নিজের হাত সরিয়ে রাখলেন। যারা গরু খায় তাদের সঙ্গে ছত্রি হয়ে কি করে হাতে হাত মেলাবেন? ধর্ম সংস্কারে গেল আটকে। লাট সেটাকে অপমান মনে করলেন। তার ফলে ভারত সরকারের কাছ থেকে আদেশ এল এঁর শাসন প্রণালী পরীক্ষা করতে। অমনি সুশাসনের অভাব প্রমাণিত হল। রাজার সব আমলা যেমন ছিল তেমনি রইল। অধিকন্তু ভারত-সরকার একজন দেওয়ান নিযুক্ত করলেন সরকারী তরফ থেকে। প্রথম দেওয়ান ছিলেন সুরেনবাবু। রাজার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার ছিল সুরেন বাবুর। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। যতদূর সম্ভব একটা সামঞ্জস্য রেখে তিনি চলিতেন।

১৮৯৯-১৯০০ সাল। এখানে আমরা পৌঁছে খবর পেলাম রাঁচিতে মুণ্ডা বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। রাঁচি জেলায় তখন তুলকালাম ব্যাপার। মুণ্ডাদের ইতিহাস খুব লম্বা। মহাভারতে এদের নাম পাওয়া যায়। এরা বৃহস্পতি কৃষ্ণের শত্রু ছিল। কারণ কৃষ্ণের নেতৃত্বে যে সব আর্য-রাজশক্তি ছিল তারা এদের পরাস্ত করতে করতে উত্তর ও পশ্চিম থেকে ক্রমশঃ পূর্ব-দক্ষিণে তাড়িয়ে আনছিল। এরা ছিল ভারতের আদিবাসী অনার্য। ক্রমশঃ এরা মগধের এলাকা যাকে বলত সেদিকে এসে পড়ে। জরাসন্ধের সঙ্গে এই জঙ্গলী জাত করেছিল সখ্যতা। কারণ শত্রুর শত্রু হিসাবে জরাসন্ধ হয়েছিল এদের মিত্র। শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক মত ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। অন্ধক, বৃষ্ণি, পাতালি প্রভৃতি ছিল গণতন্ত্র। কৃষ্ণ নিজে ছিলেন এক গণতন্ত্রের সভাপতি। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে নষ্ট করেছিলেন কংসের সাম্রাজ্য, শিশুপালদের রাজ্য, জরাসন্ধের সাম্রাজ্য। মুণ্ডা কথা হয়েছে মাথা ও মুণ্ড থেকে।

ছোটনাগপুর এখন যাকে বলে আগে তার নাম ছিল ঝাড়খণ্ড বা জঙ্গল-মহল। পাঠান রাজত্বকালে মুণ্ডারা স্বাধীন ছিল। মোগলদের আমলে আকবরের সময় পর্যন্ত তারা স্বাধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় প্রথম তাদের কাছ থেকে কর আদায় হয়। মুণ্ডারা সাধারণত ছিল সাধারণতন্ত্রী। পরে তাদের মধ্যে রাজার আবির্ভাব হল। একটা গ্রামের মাথাকেও বলত মুণ্ডা। কয়েকজন মুণ্ডার ওপর থাকত মানকি বা মাথার মাণিক। বন কেটে বাস করতে করতে যখন তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল ও বহু মানকির ওপর একজন সর্দারের দরকার বোধ হল তখন এল রাজা। ইনি হলেন নির্বাচিত। ক্রমে নির্বাচন উঠে গিয়ে হল বংশগত রাজা। এদের বলে নাগবংশী। প্রথমে এরা কোন বাঁধাধরা কর আদায় করতেন না। উপহার বা

উপঢৌকন যা পেতেন তাই দিয়ে এঁদের চলত। মোগলরা সম্পূর্ণ অধীনে আনেন নি। এরা করদরাজ্য হয়ে রইল। এদের মধ্যে একটা সভ্যতার অভিমান আছে। প্রথম কৃষি যারা আবিষ্কার করে তার মধ্যে ছিল এরা। প্রথম আগুন যারা আবিষ্কার করে তার মধ্যে ছিল এরা। প্রথম নারী-দের স্বাধীনতা যারা দেয় তার মধ্যে ছিল এরা। কৃষি ও আগুন আবিষ্কারের পূর্বের অবস্থায় মানব ছিল বর্বর। কৃষি, আগুন ও লোহার ব্যবহার নিয়ে হল সভ্য। লোহার ব্যবহার এরা তীর ও লাঙ্গলের ফলার জন্য করত। এরা আদিম সভ্যতার দাবীতে অভিমানী।

মোগলের পর এল ইংরেজ। তাদের সঙ্গে এরা প্রায় দেড়শ বছর যুদ্ধ করে এসেছে। মুণ্ডারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। রাঁচিতে রইল মুণ্ডা। মানভূমে যারা গেল তারা হল ভূমিজ; সিংভূমে যারা গেল তারা হল "হো" বা লাড়কাকোল। অর্থাৎ লড়াইয়ের কোল। সময় এদের বিরুদ্ধে চলে গেল বলতে হবে। বন্দুক, কামান আবিষ্কার হল। এরা কিন্তু তীর ধনুক ছাড়িয়ে আর এগুতে পারল না। এরা যদি বন্দুকের সন্ধান রাখত তাহলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মত কতকটা হয়ে যেত। এদের ইতিহাস—ঠিক তাদের মতই। এরা গরিলা যুদ্ধে সুনিপুণ। প্রথম আফগান যুদ্ধে যেমন খাইবারের পার্বত্য পথে একটা বৃটিশ চমূর একজন বাদে সব নির্মূল হয়েছিল তেমনি লাড়কা-কোলেদের সঙ্গে একটা যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য সব নিহত হয়েছিল। কেবল আহত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি ডালটন্ পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তাদের ছিল একদম গণ-শক্তি। তাদের মত হচ্ছে মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে না, কেউ সঙ্গে নিয়ে যায়ও না। মাটি তাদের থাকবে যারা মাটির সন্তান। কোন রাজা, জায়গীরদার বা মহাজন তা নিতে পারে না। তারা ব্যাপক ভাবে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ করেছে বহুবার। ১৮৫৭ সালে তারাও সিপাহীদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যোগ দেয়। হাজারীবাগ থেকে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে রাঁচি যায়। রাঁচির ডোরাণ্ডাস্থিত সিপাহীরাও যোগ দেয়। মুণ্ডারা সিংভূম, মানভূম ও রাঁচির খুব জায়গায় বৃটিশ শাসন ছিন্ন করেছিল।

১৮৯৯-১৯০০ সালের কথা। এইবার তাদের সমস্ত বিদ্রোহের শেষ আক্রমণ। খৃষ্টান ধর্ম, বৃটিশ রাজত্ব, এই দুটোকে উচ্ছেদ করা তাদের লক্ষ্য ছিল। বিরসা ভগবান বলে একজন এদের মধ্যে জন্মায়। সে চাইবাসায় কিছু লেখাপড়া শেখে। হিন্দুধর্ম ও মুণ্ডাধর্ম মিলিয়ে একটা নতুন ধর্ম প্রচার করতে থাকে। অসাধারণ তার প্রভাব হল লোকেদের ওপর। একবার তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। তারপর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে কিছুদিন চুপ করে থাকে। সরকার মনে করে সে নিরীহ হয়ে গেছে। সে কিন্তু গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৯৯ সালের বড়-দিনের সময় রাঁচি জেলায় ও সহরে বিদ্রোহ সুরু হয়। খুঁটি সবডিভিজনে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ যারা ছিল তারা রাঁচি সহর থেকে পালিয়ে গেল। বহু হতাহত হল। শেষ পর্যন্ত দূর পাল্লা বন্দুকের কাছে স্বল্পপাল্লা তীর ধনুকের হার হয়।

বহুলোকের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল হয়। বিরসা বলেছিল তাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। বহুদিন জেলার থেকে পরে সে সিংভূম জেলায় ধৃত হয়। রাঁচিতে এনে বিচার করা হয় ও ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় ফাঁসীর দিনের আগের রাতে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। ফাঁসী তাকে দিতে পারা যায় নাই।

মুণ্ডাদের বার বার বিদ্রোহের কারণ অবধান করলে এই কটি কথা স্পষ্ট হয়। (১) অসাধারণ স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতার স্পৃহা। (২) গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমাজের হাতে থাকবে। অর্থনৈতিক অবনতিতে দেখা যায় বিদেশী জমিদার, রাজা ও মহাজনরা শোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, বিহার বা বাঙ্গলা থেকে লোক এসে মুণ্ডাদের আর্থিক অবনতি ঘটায় এবং তাদের জমী দখল করতে থাকে। ইংরেজের আইনের ফাঁকিজুকিতে পড়ে সাদাসিধে মুণ্ডারা ক্রমশঃ "নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে" ছিল। (৩) আপনার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অভিমানে

মানুষকে ছোট ক'রে অভিজ্ঞ ও যন্ত্রবিশারদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলবে—ঠিক যেমন আদিযুগে পুরোহিত, যাদুকর, ওঝা প্রভৃতির প্রভাব প্রতিপত্তি হয়েছিল। সাধারণ শ্রমিক যন্ত্রের জটিলতার সামনে যখন অবাক হয়ে যায়, তখন যন্ত্রবিশারদ তার মোহন স্পর্শ দিয়ে ঐ দানবকে ইচ্ছামত চালিত করে—ঠিক যেমন মূঢ় অজ্ঞ জনতার সামনে ওঝা ভূতের অত্যাচার প্রশমিত করত। ওঝা এবং যাদুকরও যেমন তার ছাত-সাফাইকে বাড়িয়ে লোককে প্রতারিত করে। যন্ত্র বিশারদও তার হস্ত-চাতুর্যকে মুগ্ধ সাধারণ শ্রমিকের চোখে নিজের কৃতিত্বরূপে জাহির করে। যন্ত্র যখন সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, তখন যন্ত্রের চালকদের প্রভাব ও বিশেষ অধিকার মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সাধারণ মানুষ যায় তলিয়ে, যন্ত্রবিশারদ হয়ে ওঠে নতুন অভিজাত। অনেকে বলে ফরাসীতে পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর বিলোপের পর এই নতুন অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে—যারা অর্থে মর্যাদায় সুবিধাভোগে ও সম্ভোগে সাধারণের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

মার্ক্স্ বলেছেন—he serves the machine—মানুষ যন্ত্রের দাস হয়; গান্ধীও ঠিক এই কথাই বলেছেন—মানুষ যন্ত্রের দাস হয়—তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। আধুনিকতম অবস্থায় ও ব্যবস্থায়—যন্ত্রের আধুনিকতম উন্নতির ফলে এই ত্রুটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানুষকে একেবারেই তার বিরাট অঙ্গের একটি সামান্য অংশে পরিণত করেছে। এই ত্রুটির কোন প্রতিকার সাম্যবাদের ব্যবস্থায়ও পাওয়া যায় না।

মার্ক্সের তৃতীয় আপত্তি হল—যন্ত্র এসে মানুষের জীবিকা হরণ করছে—means is directly proportional to the numbers of workers whose means of livelihood has been destroyed by the machine—যন্ত্রের বিস্তার সেই অনুপাতে হবে যে অনুপাতে শ্রমিকদের বৃত্তি ঐ যন্ত্র অপহরণ করবে। গান্ধী ঠিক ঐ কথাই বলেছেন—The machine does save labour but lakhs of men are reduced jobless and wander on the streets with hunger" আজ বিশ্বে একদিকে যন্ত্রের বিস্তার, অপরদিকে বেকার ও অর্ধ-নিযুক্ত (part-employed) লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। শ্রমের সময় (working period) এই একশ বছরে অনেক কমেছে—১২।১৪ ঘণ্টা দৈনিক শ্রম হ'তে কমে এখন ৭।৮ ঘণ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে বেকারের সংখ্যা না কমে বেড়েই চলেছে। আরও বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় যে ইণ্ডাষ্ট্রির দেশ সমূহে এবং ভারতেও যান্ত্রিক ইণ্ডাষ্ট্রির বিস্তারের অনুপাতে ইণ্ডাষ্ট্রির শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়েনি। বরং শ্রমশীল জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক ইণ্ডাষ্ট্রির দেশেই কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা কমছে যথা :—

		১৯২০	১৯৩০
যুক্তরাষ্ট্র		৩০·৮%	২৮·৯%
ব্রিটেন		৩২·৩%	৩১·৭%
জাপান		১৯·৪%	১৮%
কানাডা		২৩·৬%	১৭·৩%
জার্মাণী	(১৯২৪)	৩৮%	(১৯৩৪) ৩৬%

এই প্রসঙ্গে আরও খেয়াল করবার বিষয় হ'ল এই যে বেকার সমস্যা ঐসব দেশেই বেড়েছে—কেবল জার্মেণী ছাড়া (অবশ্য) জার্মেণীর অনুকরণে বেকার সমস্যার সমাধান কতটা বাঞ্ছনীয়, তা সন্দেহের বিষয়। গান্ধী বারে বারে এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন যে যন্ত্র এসে বহু লোককে বেকার করেছে। তিনি বলেছেন—"যন্ত্রের প্রয়োজনীতা আছে; একে আজ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যন্ত্র এসে মানুষের শ্রমের সুযোগ লোপ করবে—তা বরদাস্ত করবনা।* আজ সকল ইণ্ডাষ্ট্রির দেশেই সমস্যা হল এই—কি করে যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেকার সমস্যা মিটানো যায়। এখানে আরো ভাববার কথা

* "Machinery has its place: it has come to stay. But it must not be allowed to displace necessary human labour."

† "Industrialism depends entirely on your capacity to exploit on foreign markets being open to you and on the absence of competitors.

আছে। গান্ধী বলেছেন—যান্ত্রিক উৎপাদন বা ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদন চলতে পারে যদি বিদেশী বাজারে শোষণ করার সুযোগ থাকে। এবং তা সম্ভব যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে।"† (পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এতদিন বিরাট এশিয়া আফ্রিকা পড়েছিল—ইউরো-আমেরিকার ধনপতিদের শোষণের জন্য। চীন ও ভারতের প্রায় ৮০কোটি লোক, বৃহত্তর ভারতের কয়েক কোটি লোক এবং মধ্য এশিয়ার কয়েক কোটি লোক, একুনে প্রায় ১০০ কোটি লোক জীবন-যাত্রার ব্যবস্থায় ঠিক আদিম বর্বরের পর্যায় ছিল না; কিন্তু এই সব দেশে ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে প্রায় কিছুই ছিলনা; এরা ইণ্ডাষ্ট্রি সমূহের শোষণের ক্ষেত্র ছিল। বর্তমানে এই বিরাট ভূখণ্ড আর তেমন শোষণের পক্ষে অনুকূল হবে না

আজ চীন ও ভারত ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনের পথে অনেক খানি এগিয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধের পূর্বে-ও ভারতেরই ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপন্ন মাল রপ্তানী হত; এই যুদ্ধের মধ্যে তার ইণ্ডাষ্ট্রি অনেক বেড়ে গেছে। চীনের অবস্থাও তাই; এই যুদ্ধের চাপে ইরাণ প্রভৃতি দেশেও ইণ্ডাষ্ট্রির যুগ ঘনিয়ে এসেছে। ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনে এশিয়া যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় কেবল যে স্বাবলম্বী হবে তা নয়; রপ্তানীর প্রতিযোগিতায় সে ইয়োরো-আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। বিরাট রুশিয়া—তার সোভিয়েট সাম্রাজ্য নিয়ে যে ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনে এখনও আত্ম-পর্যাপ্ত হয়ে থাকবে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যাবে না এমন কথা বলা চলে না। এবং এই প্রসঙ্গেই মনে রাখতে হবে—এখনও জগতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা বা অর্থবণ্টন প্রবর্তিত হয় নি। এই ধনাকা-লোলুপ ইণ্ডাষ্ট্রির উগ্র প্রতিযোগিতার ফল কি হবে—তা অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ২।৩ বছর যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্গঠনের প্রয়াসে মালের চাহিদা বাড়বে; কিন্তু প্রয়োজন শেষ হ'লেই আসবে মন্দার বাজার; বেকারের করুণ ক্রন্দন এবং চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের ছড়াছড়ি। এই মন্দার বাজারকে ঘাতিয়ে তোলার জন্য হয়ত আসবে আবার এক নব হিটলার এবং আয়োজন চলবে অধিকতর প্রাণঘাতী এক যুদ্ধের। এই বিষচক্রই আজ মানুষের সামনে।

এর জবাবে সাম্যবাদী বা স্বপ্ন-বিলাসীরা বলবে যে শ্রমের সময় কমিয়ে অধিকতর শ্রমিককে নিয়োজিত করতে হবে এবং যান্ত্রিক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না—আজ-ও মুনাফার লোভ ও শোষণের প্রতিযোগিতা উৎপাদন ক্ষেত্র হতে লোপ পায়নি; কাজেই এ নিয়ন্ত্রণ কতটা সম্ভব হবে তা সন্দেহের। অবশ্য এই কার্যগতিক বিবেচনা বন্ধ রেখেই এখন আমরা আলোচনা করব। আমরা ধরে নিলাম শ্রমের সময় কমিয়ে এক জনের স্থলে ৩ বা ১০জন শ্রমিককে নিয়োজিত ক'রে আমরা বেকার সমস্যা দূর করব। শ্রমের সময় কমাবার সঙ্গে আর একটি ফন্দিরও উল্লেখ হয়—লোকের অভাববোধ ও বিলাসস্পৃহা বাড়িয়ে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে হবে। অশন, বসন, গৃহ, বিলাস প্রভৃতি বাড়িয়ে তুললে অনেক শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা হবে। জনপ্রতি একখানা মটরগাড়ী, একটা উড়ো-জাহাজ, একখানা সুসজ্জিত গৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যায়।

এই ব্যবস্থায় যে অবসরভোগী, বিলাসী মানব সমূহের সৃষ্টি হবে, তাদের পরিণাম কি? যন্ত্রের ক্রম-উন্নতির ফলে তার উৎপাদন শক্তি এবং মানুষের শ্রমকে বাদ দিয়ে চলবার ক্ষমতা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই বিধানে মানবের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াতে বেশী দেরী হবে না। স্বগতি ও ক্ষিপ্রগতি যন্ত্র নামে মাত্র মানব শ্রমের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যের স্তূপ দিয়ে দুনিয়া ছেয়ে ফেলতে পারবে। এর নৈতিক ফল বা কি এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা কি? এর নৈতিক অবস্থার ফল যে খুব ভাল হ'তে পারে না—তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরদেশ-শোষক সাম্রাজ্যিক জাতি সমূহের শেষ পরিণতি যে নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে হয়, তার কারণ-ও হল শ্রমহীন বিলাসী জীবন যাপন। গ্রীসে,

রোমে, ভারতে মোগলসাম্রাজ্যে সর্বত্রই আমরা ঐ বিলাসী, শ্রমহীন, পরশ্রমজীবী সুবিধা-ভোগীদের নৈতিক অধঃপতনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। হয়ত কেউ বলবেন, এ সব পতনোন্মুখ সমাজের কতিপয় বিলাসী, পরশ্রম-উপজীবীদের সঙ্গে সুবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মানুক্রমে স্বশ্রমী ও উচ্চতর জীবিকার অধিকারী সমগ্র জনতার তুলনা হয় না। এই সমাজে শিক্ষার ও পরিচালনার এমনি ব্যবস্থা থাকবে যে কোন নৈতিক অধঃপতন আসতে পারবে না। এ হ'ল নিতান্ত-ই আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের কথা; কারণ এর পরিপূরণের কোন আশাই বর্ত্তমানে দেখছি না।

তেমনি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলে না হয় নৈতিক ঠেকার বন্দোবস্ত হল; কিন্তু দৈহিক যে আপত্তির কথা বলেছি তা তেমনিই থেকে যায়। জীববিজ্ঞানের খুব স্বাভাবিক নিয়ম—যারা প্রতিদিন একটা ন্যূনতম সময় সৃজনী-শ্রম না করে, তাদের প্রজননশক্তি শীঘ্রই কমে যায়। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল ফ্রান্স; ইংল্যাণ্ডেও এই সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রতি সমাজেই দেখা যায়, স্বল্প-শ্রমী পরশ্রম-জীবি বিলাসী লোকেদের সন্তান সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। স্বল্প-শ্রমী লোকেরা দেহে ও মনে পলথলে (flabby) হয়। কোন সমাজ, সভ্যতা বা সংস্কৃতি এমনি লোকেদের দ্বারা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সামাজিক বা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে যতটা বুঝা যায়, তাতে মনে করা যায় যে মানবের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য মানুষের পক্ষে দৈনিক ৮ ঘণ্টা সৃজনীশ্রম (creative labour) করা দরকার; বাকি ১৬ ঘণ্টাকে ৩ই সমান অংশে ভাগ করে নিদ্রা, আহার, বিশ্রাম, আমোদ, উৎসব এবং লিখন-পঠন ও অন্যান্য প্রকারে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যয় করা উচিত। সৃজনীশ্রমের পরিবর্তে ক্রীড়া, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রচলন ক'রে দৈহিক পটুতা বজায় রাখার প্রস্তাব হ'য়েছে; কিন্তু এই বন্ধ্যা শ্রম দিয়ে সৃজনী শ্রমের স্থান পূরণ করা যায় না:—দেহের ও মনের পুষ্টির জন্য সৃজনী-শ্রম যে কাজ করে, বন্ধ্যাশ্রম দিয়ে তা হয় না। ব্যবহারিক কর্মপটুতার, দেহের ও মনের ব্যবহারিক ক্ষিপ্রতার, কাজের লোকের ও ব্যায়ামী লোকের পার্থক্য প্রায় সকলেই লক্ষ্য করেছেন। সমস্ত মানব সমাজকে ব্যায়াম-কৌশলী ক'রে তুললে কর্ম-কৌশলী লোকের অভাব পূরণ হবে না; তেমন লোক দিয়ে সমাজের অগ্রগতি, মানবের উদ্ভাবনী শক্তি বজায় রাখা যাবে না। মানুষের সভ্যতা ঐ অবস্থায় তার গতিবেগ হারিয়ে ধ্বংসের দিকে যাবে, কারণ স্থাণু হয়ে সে থাকতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের এই শিক্ষা উপেক্ষা ক'রে, মানুষের সৃজনীশ্রমকে কমিয়ে কমিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় আনা সুস্থ সমাজব্যবস্থা নয়।

বরষা

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী

শ্রাবণ গগণে আঁধার লগনে
এল যে বরষা বালা।
এলায়িত কেশা কাল মেঘে মেশা,
কণ্ঠে বিজলী মালা।
মেঘলা আকাশে মাতাল বাতাসে
কাঁপিছে ধরণী তল,
যত তরু লতা, বিটপীও যথা
করিতেছে টল মল।
বনে বনে আজ যত শিখী রাজ
পেখম তুলিয়া নাচে,
আকাশের দিকে চাহি অনিমিখে
চাতকেরা বারি যাচে।
বরষা ধারায় মেঘের ছায়ায়
নিভিল দিনের জ্যোতি—
ডাকে শুধু দেয়া কোটে নাকো কেয়া
শান্ত চপল মতি !!

কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের পর

রূপঙ্কর

কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্বাচন আজ অনেক দিক হইতে সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন জিলায় ইহা সমাধা হইয়াছে কোথায়-বা ইহা বিরোধের সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি বার বার প্রশ্ন করিয়াছেন, কেন এই বিরোধ? আমরাও নিজেদের প্রশ্ন করিয়াছি, এই বিরোধের মূল সূত্র কোথায়? ইহা কি শুধুই ক্ষমতার কাড়াকাড়ি না রাজনৈতিক চেতনার অস্পষ্টতা হেতু গোষ্ঠী-বিরোধ, যদি বিষয়টি নিছক রাজনৈতিক গোষ্ঠী-বিরোধ হয়, তবে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে সর্ব দেশেই ইহা হইয়াছে, আমাদের দেশেও ইহা ঘটিবে। আমরা আজ বহুল পরিমাণ সদিচ্ছার দ্বারাও ইহার কোন সমাধান করিতে পারিব না। আদর্শবাদকে একান্তভাবে নির্বাসন দিয়া আমরা যেদিন হইতে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রুপ (দল নহে) করিয়াছি, সেইদিনই সর্বচক্ষুর অন্তরালে ভবিষ্যত বিরোধের বীজ বপন করিয়াছি। আজ নিছক সদিচ্ছা বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমাদের এই কলহমুখর রাজনীতির মধ্য দিয়াই পথ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বিরোধের সূত্র আমাদের (রাজনৈতিক কর্মীদের) মধ্যে যেমন নিহিত রহিয়াছে, তেমন অন্যত্রও রহিয়াছে। সে বিষয়টি একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার রাজনৈতিক বিরোধী প্রবল। বিরোধীর শক্তি যতই ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে ততই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজ ও অর্থনৈতিক বিশিষ্টতা লইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকে। এক পক্ষ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ) যতই দুর্বল হইয়াছে, আর এক পক্ষ (কংগ্রেস) ততই প্রতিপত্তিশালী হইয়াছে কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব সময়ই বিরোধীর নিকট হইতে তীব্র বাধা পায় আর যখন সে (প্রতিষ্ঠান) রাজনৈতিক বিরোধীর নিকট হইতে কোন বাধা পায় না তখন সে (প্রতিষ্ঠান) সামাজিক আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। বাঙ্গালায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ হইয়াছে, গান্ধিজী স্বয়ং হরিজন আন্দোলন করিয়াছেন। এই সব আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (এখানে কংগ্রেস) পুরোপুরি রাজনৈতিক থাকিতে পারে না। তাহাকে বাধ্য হইয়া সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (কংগ্রেস) আধা-জনকল্যাণকামী ও আধা-রাজনৈতিক কল্যাণকামী হইয়া পড়ে। কংগ্রেসও ঐতিহাসের ঘটনাচক্রে তাহাই হইয়াছে আধা-জনকল্যাণকামী ও আধা-রাজনৈতিক কল্যাণকামী। কোন কোন সময় বিরোধীর সংঘাতের সম্মুখে পড়িয়া ইহার খাঁটি রাজনৈতিক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যথায় কংগ্রেস সমাজ ও অর্থনৈতিক কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনসাধারণের মাঝে কাজ করিয়াছে। তাই সমাজসেবা কংগ্রেসকর্মীর জীবনের ভূষণ হইয়াছে। কিন্তু কোথায় আমরা ভুল করিয়াছি? কংগ্রেসকর্মীরা সামাজিক আন্দোলন করিতে গিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছেন,—এই বিশ্বাসে নিজেদের তাঁহারা রাজনীতির দিক হইতে যথেষ্ট প্রতারিত করিয়াছেন কংগ্রেসকে যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক ভূমিকায় নামিতে হয়, তবে প্রথমেই বিচার করিতে হইবে—যে তার কর্মের ফলে সমাজজীবনে কতখানি সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইল। শুধু ইংরেজ তাড়াইব ইহাই রাজনৈতিক চেতনা নহে। ঐ বুলি আসল বাধা অপসরণের একটি অস্ত্র মাত্র—কি সমাজ ব্যবস্থা আনিব, কোন পন্থায় আনিব, কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে সমাজের কোন শ্রেণী আমাদের (কংগ্রেস কর্মীদের) মিত্র হইবে, কোন শ্রেণী শত্রু হইবে। এই সব বিষয় যেখানে স্বচ্ছতর হইয়া বিকাশ লাভ করিবে, সেইখানেই সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

কংগ্রেসের কোন শিক্ষা শিবির নাই, সাধারণ কর্মীদের এই জাতীয় চিন্তার ধারার মধ্যে লালন-পালন করিয়া গোটা রাজনৈতিক মানুষ গড়িবার কোন রেওয়াজ নাই। কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা-পত্রে যে সহি করিল সে-ই সাধারণ

সভ্য হইল। এবার অবশ্য শ্রেণীবিভাগ হইল, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। কংগ্রেস কর্মিগণ সামাজিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া সমাজের এক প্রবল ঘাঁটিকে (এখানে সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি) আশ্রয় করিয়া অন্য ঘাঁটিকে পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করেন। ফলে প্রায়-ই দেখা যায় গ্রামের এক জমিদার কংগ্রেসকর্মীর পক্ষে, আরেক জন তার বিপক্ষে। কংগ্রেসকর্মীরা একবারও একথাটা ভাবিতে চাহেন না যে, জমিদার হিসেবে দুই-এরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা এক, আমরা যে একের স্কন্ধে ভর করিয়া অপরকে জব্দ করিতেছি, কিন্তু অর্থনৈতিক সংগ্রামে ইহারা কেহই আমাদের সহচর হইবে না। বরং একই কাণ্ডের বৃহৎ শাখার মত অর্থনৈতিক সংগ্রামের কড়-ঝাপটায় বাঁচিবার জন্য ইহারা তীব্র বিরোধীতা করিবে। কাজেই সামাজিক আন্দোলনে যাহাকে মিত্র বলিয়া কংগ্রেসকর্মীরা জানিয়াছেন, অর্থনৈতিক সংগ্রামে তাহাকেই শত্রু বলিয়া স্বীকার করিবেন। আধা-সামাজিক আধা-রাজনৈতিক সংযোগ সূত্র তখন ছিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ভবিষ্যত শত্রু পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সবলতা কোথায় বা দুর্বলতা কোথায় জানিতে পারিল তাহার পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিল। সে সুযোগের অপব্যবহার করিবে না। খোঁজ লইয়া দেখুন কত জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী দুর্বলতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছে। এবং কত কর্মীকে তার হাতের পুতুলে পরিণত করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে হয়ত এই জাতীয় মৈত্রী বা অবাধ মিশ্রণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজ আর তাহার প্রয়োজন নাই। বিগত দিনের কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহে যে নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, আজ আর তাহার প্রয়োজন নাই। ইহারা কংগ্রেসের সভ্য হইয়াই কংগ্রেসের নীতিকে অবহেলা করিয়া থাকেন। যেহেতু কংগ্রেসকে আজ অর্থনৈতিক সংগ্রামে নামিতে হইবে সেই হেতু-ই ভাবী আন্দোলনের যারা পরিপোষক হইবে শুধু তাহাদেরই সভ্য করা উচিত ছিল। সেই নীতি গ্রহণ না করিয়া কংগ্রেস আত্মবিনাশের সমন নিজ হাতে জারি করিয়াছে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী হইবার সুযোগ দিয়াছে। কংগ্রেস বড়লোকের প্রতিষ্ঠান একথাটা আজ দেশের যুবসমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে যথেষ্ট ঘাটতি পড়িয়াছে। যুবকরা কংগ্রেসে না থাকিলে কাজ করিবে কে? কংগ্রেসের মধ্যে আজ এক কথায় দেশের যুবশক্তি নাই বলিলেই চলে। গত দুই তিন বছরের মধ্যে অন্তত বাঙ্গালা কংগ্রেসের দিকে বাংলার যুবশক্তি আগাইয়া আসে নাই। ইহার কারণ কি? আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ গোটা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে বিভিন্ন স্বার্থের জঘন্য খেলা চলিতেছে। এই শ্রেণী বিন্যাসের গুরুত্ব অবহেলা করিয়া কংগ্রেস চিরাচরিত প্রথায় সভ্য সংগ্রহ করিয়াছে। যে বিরোধ সমাজ-জীবনের রক্তমাংসে মিশিয়া রহিয়াছে তাহাকে রাজনৈতিক রূপ না দিয়া বা তাহার অর্থনৈতিক সমাধান না খুঁজিয়া কংগ্রেস আপনার অজ্ঞাতসারে ঘূর্ণীস্রোতে পা দিয়াছে। ফলে কংগ্রেস-কাঠামোতে ফাটল ধরিয়াছে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ নীতি সম্পূর্ণ শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত ছিল। এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর হইতে পারে যে, কংগ্রেস কিষাণ-কংগ্রেস ও জাতীয়-ট্রেড্-ইউনিয়ন গঠন করিয়া সমাজের দুই বৃহৎ শোষিত জনগণকে আপন আওতায় আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেস তাহার অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাস্তবে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। যদি তাহাই সত্য হয় যে, কংগ্রেসের মূল কাণ্ডের দুই বৃহৎ শাখা কংগ্রেসের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম বাস্তবে সফল করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছে, তবুও আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, মূলকাণ্ডের রূপ পরিবর্ত্তন হইবে কি না? নচেৎ আন্দোলনে অবতীর্ণ হইয়া দুই শাখাই মূল কাণ্ডকে বিরোধী শক্তি বলিয়া গণ্য করিবে। বস্তুত পক্ষে এই জাতীয় ঘটনা ইতিপূর্বেই দেখা দিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলন করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে, মূল কংগ্রেসের সভাপতি এক পক্ষ শ্রমিক নেতারা আরেক পক্ষ। অথচ বিপদ এই যে, একান্ত বিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। ফলে

শ্রমিকের স্বার্থ পদদলিত হইতেছে, কৃষাণকর্মীরাও অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া একদল কর্মী বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতেছেন। অথচ মূল প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সত্তার কোন পরিবর্তনের লক্ষণ নাই। প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাব করিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপ করিতে হইবে, কহিতেছে, অথচ প্রতিষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা-পত্রে লেখা রহিয়াছে যে কোন ভারতবাসী অত বয়স উত্তীর্ণ হইলে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারিবে। এই "যে কোন"র মধ্যে জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী, চাষী ও শ্রমিক পড়ে। ভাবিয়া দেখুন, সমাজ-জীবনে এদের identity of interest আছে কি না।

কংগ্রেসকর্মী সভ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া আজ কংগ্রেসের কোন আদর্শবাদ প্রচার করিবে? সভ্য সংগ্রহকালে জমিদারকে কহিবে তোমার স্বার্থও রক্ষা হইবে, চাষীকেও কহিবে তোমার স্বার্থও রক্ষা হইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে দুইএর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। অর্থনৈতিক জগতে এই দুইয়ের মিলন কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে। হয় কর্মীকে কংগ্রেসের আসল আদর্শের কথা চাপিয়া যাইতে হইবে, নয়ত তাহাকে শুধু লোক ডাকিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করাইতে হইবে। বস্তুত তাহাই ঘটিতেছে, কংগ্রেসের আসল আদর্শের কথা চাপিয়া রাখিয়া গ্রামদেশের জমিদার জোতদার, চাষী, মুদী, ডাক্তার, গোমস্তা সবাইকে কংগ্রেসের সভ্য করা হইতেছে এবং ইহারা প্রত্যেকেই যে যার সামাজিক সংস্কার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বিরোধ লইয়া আসিয়া কংগ্রেসে ভীড় জমাইতেছে। ইহাদের কাহারও রাজনৈতিক শিক্ষা নাই। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবার শিক্ষা নাই। হয় ইহারা 'বার-বার তার-তার' নয়ত 'এপাড়ার ওপাড়ার'। বড় বেশী যদি কেহ আগাইয়া থাকে তবে তাহা 'এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের'। কোন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কেহই কংগ্রেসের সভ্য হয় নাই। কাজেই ইহারা কেহই দলের নহে। কোন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সাধারণ কংগ্রেস কর্মীকে যদি এই আভ্যন্তরীণ সামাজিক সংস্কার ও বিরোধের স্রোতে পড়িতে হয়—তবে সে যত বড় চেতনা সম্পন্নই হউক না কেন—তাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তাহার গুণগত ক্ষমতা সমষ্টিগত ক্ষমতার কাছে পরাজয় মানিতে বাধ্য।

সমষ্টিগতভাবে জমিদার, জোতদার, মুদী, ডাক্তার, গোমস্তার নিকট যদি কোন কংগ্রেস কর্মীর পরাজয় ঘটে তবে কংগ্রেস আদর্শেরই পরাজয় ঘটিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। আজ পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে যাহারা শুধু সহি করিয়া বা শুধু টাকা দিয়া সভ্য সাজিয়া আসিয়াছেন তাহারা কংগ্রেস আদর্শবাদের শব্দযাত্রার সংকীর্তন করিতে আসিয়াছেন। যেহেতু কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের নীতি নিতান্তই শিথিল ও ভুলপ্রমাদদুষ্ট সেই হেতুই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার গুণে এক ভয়াবহ সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সংহত ভয়াবহ সমষ্টি-গত শক্তির কাছে কংগ্রেস আদর্শের ও কর্মীর নিত্য পরাজয় ঘটিতেছে। সেখানে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব সহায় না হইয়া উদাসীন রহিয়াছেন। তাই কংগ্রেস কর্মীর পরাজয় যত্র-তত্র ঘটিতেছে, কংগ্রেস কর্মীর অপমান সর্বত্র ঘটিতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব সব জানিয়া-শুনিয়াও যেন নীরব রহিয়াছেন। একটি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর পশ্চাতে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়া নাই। যে কোন একজন অ-কংগ্রেসী লোক কংগ্রেস কর্মীকে অপমান করিলে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত শক্তি গোটা মানুষের মত তাহার সাহায্যে ছুটিয়া আসে না। ইহার ফলে কংগ্রেস কর্মীরা একক-ভাবে যেমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তেমনি প্রতিষ্ঠানকে সবাই মিলিয়া অবহেলা করিতে শিখিয়াছে এই নৈতিক দুর্বলতার হাত হইতে কংগ্রেসকে ও তাহার কর্মীসমাজকে রক্ষা করিবার শক্তি বোধ হয় কাহারও নাই। কেননা কংগ্রেস যেন স্বেচ্ছায় সমাজের শ্রেণী বিন্যাসকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ বিপ্লবে

কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, যে শ্রেণী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে তাহাকে স্বেচ্ছায় অথবা ভুল নীতিও ভঙ্গ দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। আজ কংগ্রেসের মধ্যে সর্বশ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিবার দিন গত হইয়াছে। কংগ্রেস সবার স্বার্থ দেখিতে গেলে আপনি বিপন্ন হইবে। কেননা শোষিতেরা শক্তিশালী সংঘবদ্ধ শক্তির চাপে পড়িয়া কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। তখন বিপ্লব ঈপ্সিত পথে না আসিয়া অন্যরূপ লইবে। তখন কংগ্রেস নিতান্তই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় নামিয়া আসিবে।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীশান্তশীল দাশ

পঁচিশে বৈশাখ আসি' জেলে গেল যে-প্রদীপখানি,
নাহি জানি,
কী কারণে বাইশে শ্রাবণ
দীপ্তিময় সে-প্রদীপে করিল হরণ!

• • •

প্রদীপ গিয়াছে চলে, শিখা তার হয়নি কো ম্লান,
সুচির ভাস্বর আজো দীপ্তি তার চির অনির্বাণ।
দিকে দিগন্তরে,
সেই শিখা আলো দেয় বাহিরে, অন্তরে।
যেখানে আঁধার ঘন, যেখানে দীনতা,
আলো তার নাশে মলিনতা।
শুভ্রশিখা ঊর্ধ্বমুখে জ্বলে অবিরত
মানুষের ধরণীরে করেছে শাশ্বত।

• •

ধরণীতে যেথা ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি,
এ-আলোর পানে চেয়ে সহসা তখনি
মাটির ধরিত্রীবুকে এ-মানুষ পায় যেন কিসের সন্ধান;
মুহূর্তে সকল ব্যথা হয় অবসান
মুছে যায় সকল বেদনা,
আঘাতের শত দুঃখে পায় সে সান্ত্বনা!
শত ক্ষুদ্র গণ্ডী মাঝে যে-জীবন হয় মৃত প্রায়,
আঁধারের আবরণ ছিন্ন করা সাধ্যে না কুলায়;—
ভেদ করি সেই কারাগার;
ছিন্ন করি জীবনের তামস আঁধার
নিয়ে যায় মানুষেরে ঊর্ধ্বশিখা সেই দিব্যলোকে
অমরার দেশে, যেথা নাহি দুঃখশোক;
যেথা আছে আনন্দের ধাম
তাপদগ্ধ মানুষেরে এনে দেয় সুস্নিগ্ধ আরাম।

এ-আলোকে করিতে হরণ
স্পর্ধা করেছিল বুঝি বাইশে শ্রাবণ।
আশা তার পুরেনিকো কভু পূরিবেনা তাহা জানি
অনির্বাণ দীপশিখা খানি
আলো দেবে পথহারা ক্লান্ত পথিকে;
বিদ্যুৎ শিখার সম আঁধারের বুকে যাবে লিখে
আলোকের রেখা;
সে-আলোক লক্ষ্য করে সুদূর দুর্গম পথে একা
যুগে যুগে মানুষের হবে অভিযান;
কণ্ঠে লয়ে শাশ্বত আলোকের গান।

পঁচিশে বৈশাখ হ'ল চির স্মরণীয়
দীপ্ত মহিমায়;
তারই পাশে ঠাঁই নিল বাইশে শ্রাবণ
ব্যর্থ হতাশায়।

সিন্ধুর ডাক

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

(পূর্বানুবৃত্তি)

জ্ঞানশরণ তখন জপ করছিলেন। কৃষ্ণশরণ তার পরিচয় জানতে চাইলে সে নম্র ভাবে বললে, "তার নাম হিমানী বাগচী। সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বিলেত থেকে ফিরে দেশে এসেছিল মায়ের সঙ্গে নিজের জন্মস্থান দেখতে। কিন্তু এখানে এসেই পড়ল সে অসুখে। তারপর সেই অসুখ থেকে মুক্ত করলেন ওকে এই স্থানে ঠাকুর। তাই আজ অন্নপথ্য করে সে ঠাকুর সন্দর্শনে এসেছে।

বিলেত ফেরৎ মেয়ে গ্রামের মাটীতে। কৃষ্ণশরণ মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা জানালেন। মুখে বললেন, "দেশ কেমন লাগছে আপনার?"

হিমানী মুখ তুলে কৃষ্ণশরণের দিকে একবার চাইল। তারপর চোখ নত করে বললে, "দেখুন, দেশ আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে এখানকার লোকেদের সঙ্গে আমার মতের মোটে মিল হচ্ছে না।"

কৃষ্ণশরণ বললেন, "কোন বিষয়ে জিগ্যেস করতে পারি কি"?

"নিশ্চয় পারেন—হিমানী বললে, "আপনাদের এই উৎকট বিচার প্রথাটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখকর ঠেকে।"

কৃষ্ণশরণের চোখে মুখে দুরন্ত বিস্ময়। বললেন, "কি রকম একটা উদাহরণ দিন"—

হিমানী বললে, "যেমন, ছোট জাতের কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলে আপনি তাকে বসতে আসন দেবেন না। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করবে। না হয় মাটীতে বসবে। আমি আগে শুনেছিলুম, আপনাদের জল অন্য জাত ছুঁলে সেটা অপবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু এখন দেখলাম শুধু তাই নয়। মাটীও ছোঁওয়া যায়। যেমন আপনার উঠানে একটি ছেলেনী দাঁড়িয়ে আছে। আপনি এক ঘটী জল হাতে নিয়ে সেই উঠান পার হয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করার সময় সে জল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কারণ উঠানের মাটী তখন অপবিত্র ছিল, সেই কারণে, সেই মাটী ছোঁওয়া জলও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই কুসংস্কার ত্যাগ করতে না পারলে, আপনাদের এই গ্রাম্য সমাজের কোনও উন্নতি নেই। এবং এইজন্য দেশের অগ্রগতিও পিছিয়ে রয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যা পুরাতন তাকে ত্যাগ করার সৎসাহস সংগ্রহ করুন। তবেই না নূতন জিনিষ গড়তে পারবেন।" সাংঘাতিক কথা—পুরাতনকে ত্যাগ করুন। কৃষ্ণশরণের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। কে যেন তাঁকে বলছে, তাঁর বুকের একখানি হাড় খসিয়ে ফেলতে। —না, না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। প্রাচীনত্বকেই যদি ত্যাগ করতে হয়, তবে, সুপ্রাচীন চৌধুরী বংশের অনেক কিছু লুপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে। বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করতে না পারলে তার জন্মই ত বৃথা। কৃষ্ণশরণ তখন উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষিত যুবক। পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর তাঁর বিজাতীয় বিতৃষ্ণা।—হিমানীর অভিমতগুলি তখন তাঁর মনে বিগুণ করে সেই বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করল।— তিনি হিমানীর দিকে না চেয়ে বললেন, " দেখুন, মা লক্ষ্মী, নিজের দেশকে বিদেশীর চোখে দেখলে, কখনই তার ভালো দিকটা দেখতে পাবেন না"।

হিমানী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, কেন মনীষী রোমাঁ রোলাঁ কি বিদেশী নন? কিন্তু তিনি কি ভারতবর্ষকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন? রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি যেমন গভীর ভাবে জেনেছিলেন, এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সে জানাকে লোক সমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন কোনও ভারতবাসীর থেকে তা কোনও অংশে হীন নয়।"

"মিস মেয়োর কুখ্যাতি নিশ্চয় আপনি ভুলে যাননি?" কৃষ্ণশরণ উত্তর করলেন। যদিও বিদেশী আলোচনা করতে তাঁর মন মোটেই রাজী ছিল না।

হিমানী বললে, "মিস মেয়োর দুই অপপ্রচারকে ঢেকে

দিয়েছে, বহু আমেরিকান পুরুষ ও নারী হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করায় গৌরব দিয়ে"—সেটা ভালো, সেটা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তবে যেটা অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যকর সেটা ত্যাগ করাই উচিৎ ছোট ঠাকুর মশাই"—

"ছোট ঠাকুর মশাই" বাঃ, সম্বোধনটা ভারী মিষ্টি ? কৃষ্ণশরণের বিতর্ক-বিক্ষুব্ধ মন একটু যেন সান্ত্বনা পেল। তিনি বললেন, এ গ্রাম আপনার উপযুক্ত বাসস্থান নয়। আপনি ফিরে যান সহরে। অনর্থক কেন নিরীহ গ্রাম-বাসীর সমাজ জীবনে আলোড়ন তোলার চেষ্টা করছেন ?"

কৃষ্ণশরণের কথায় হিমানী মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করল। আর কোনও উত্তর না দিয়ে সে দূরে বাঁশ বাগানের দিকে চেয়ে রইল। তার পিছনে বিস্তৃত ধানক্ষেত। ওর মনে পড়ে গেল বিখ্যাত লেখক "মোপাসাঁ"র কথা। কোনও একটী গল্পে তিনি বলেছেন, গ্রামের লোকের জীবনধারা ঠিক ওই ধানক্ষেতের মত। তারা ঠিক ওই ধানচারার মত এক ভাবে গজায়, একই ভাবে বেড়ে ওঠে, তারপর এক সঙ্গে একই ভাবে মারা যায়। ওদের জীবনে কোনও পরিবর্তন নেই ; সামান্যতমও ছন্দ পতন ঘটে না। একঘুরে বাঁধা গৎ।" হিমানী আজ প্রত্যক্ষ করল তার যথার্থ রূপ। সে মনে মনে তার পিতা মাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল তাকে উচ্চ আদর্শে মানুষ করার জন্য। কেননা, সে হিন্দু হলেও, হিন্দুত্ব বোধে অন্ধ নয়।

এমন সময় আরতির ঘন্টা বেজে উঠতেই কৃষ্ণশরণ উঠে গিয়ে শাঁখ তুলে নিলেন। হিমানী সেইখানেই বসে রইল সেই রকমভাবে বাঁশ বাগানের পিছনে ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে। তারপর পূজা শেষ হলে জ্ঞানশরণ যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করে বাইরে এসে চত্বরে বসলেন, তখন কৃষ্ণশরণ প্রণাম ও চরণামৃত নিয়ে গৃহাভিমুখে চলে গেলেন। যাবার সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মেয়েটি একবারও ভবানীর উদ্দেশে মাথা নত করল না। আর সেই গর্বিতা নাস্তিক মেয়েটীকে দেখে জ্ঞানশরণের মুখে ফুটে উঠল আত্মতৃপ্তির স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

হিমানী প্রত্যহ মন্দিরে আসে, তবে ভবানী দর্শন করতে নয় ; জ্ঞানশরণকে দেখতে। একদা কৃষ্ণশরণের মনে আশঙ্কা হোল, প্রত্যহ এই দেখা শোনার ফল ভবিষ্যতে হয়ত ভালো নাও হতে পারে। তিনি ছুতো খুঁজতে লাগলেন কি করে অগ্রজের কাছে কথাটা উত্থাপন করা যায়। সুযোগ পেলেন তিনি অতর্কিতে :— একদিন আরতির পর সকলে যখন দেবী প্রণাম করল, কিন্তু হিমানী করল না, তখন অধৈর্য হয়ে তিনি বললেন "আপনি প্রণাম করলেন না ?"

নির্বিকার মুখে হিমানী উত্তর করলেন "আপনাদের ওসব ঠাকুর দেবতা আমি বিশ্বাস করি না"—

কৃষ্ণশরণের রক্ত বুঝি ফেটে পড়ে। এতবড় অপমান তাঁর বংশের জাগ্রত জননীর ? ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কটুকণ্ঠে তিনি বললেন, "তবে আপনি আসেন কেন মন্দিরে ? আশ্চর্য ! হিমানী একটু রাগ করল না তাঁর তিরস্কারে। বরং স্নিগ্ধ একটুখানি হেসে জ্ঞানশরণের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে সে চলে গেল। তার ব্যবহারে কৃষ্ণশরণ আরও জ্বলে উঠলেন। অগ্রজের দিকে চেয়ে বললেন, দাদা, তুমি ওই বেহায়া নাস্তিক মেয়েটাকে প্রশ্রয় দাও কেন ?"

জ্ঞানশরণ কিছু বললেন না। অনুজের মুখপানে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন মাত্র। কৃষ্ণশরণের তারুণ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। তিনি বললেন "না দাদা, হাসলে চলবে না। মেয়েটাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।"

জ্ঞানশরণ একবার ভাইএর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মন্দির অভ্যন্তরে তাঁর আরাধ্য দেবতা মা ভবানীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। গৌরবর্ণ তাঁর দীর্ঘ দেহ কেঁপে উঠল, কপালে রক্তচন্দনের তিলক জ্বলে উঠল ; মাথার শিখায় গোঁজা রক্তজবা যেন শিউরে উঠল ; জ্ঞানশরণ কথা কইলেন, "কৃষ্ণ, ও মেয়েটীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এই বয়সে ওর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল, ওর বিয়ে হওয়াও অসম্ভব। তারপর ও আমার চায়"—সহসা সেখানে যেন বজ্রপাত হোল। কৃষ্ণশরণ ডাকলেন "দাদা"—

জ্ঞানশরণ তেমনি ভাবে ভবানীর দিকে চেয়ে বললেন, "এখন কি করা কর্তব্য কৃষ্ণ ?"

ব্যাকুল ভাবে অগ্রজের হাতখানি চেপে ধরে কৃষ্ণ বললেন, "দাদা, ওই গর্বিতা মেয়ের ছলনায় আপনি ভুলবেন না। আমাদের প্রাচীন গৌরবময় পিতৃ পিতামহর বংশের পুণ্য মর্যাদা ওকে দিয়ে রক্ষা হবে না"—

"আমি নিরুপায় কৃষ্ণ—অবিচলিত কণ্ঠে জ্ঞানশরণ বললেন," আমি ওকে বিবাহ কোরবো তুমি তার ব্যবস্থা কর"—

কৃষ্ণশরণ উঠে দাঁড়ালেন। নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, "আমি তা পারব না"—

তাঁর দীর্ঘায়ত দেহ বনান্তরে মিলিয়ে গেল। জ্ঞানশরণ সেই দিকে চেয়ে একটুখানি মাত্র হাসলেন। অন্ধকার মন্দির প্রকোষ্ঠে ভবানীর ত্রিনেত্র তাঁর পানে চেয়ে জ্বলে ধ্বক ধ্বক করে।

বলা বাহুল্য জ্ঞানশরণের সঙ্গে হিমানীর বিবাহ হয়ে গেল। বাইরের লোকের প্রকাশ্যে আপত্তি করার কিছুই ছিল না। কেননা হিমানী দেখতে সুন্দরী তার উপর তাদের বংশ ভাল এবং প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে। কিন্তু আড়ালে সকলেই বলল, কানা বউর মুখ কেউ দেখবে না। কৃষ্ণশরণ স্ত্রীর মারফৎ বললেন, "ভবানীর মন্দিরে প্রণাম না করলে তিনি ভ্রাতৃবধূর হাতের জলস্পর্শ করবেন না" সে যা হোক, কারো কোনও কথায় কিছু এসে গেল না। বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। এবং তার দিন পনেরো পর একদিন সকালে জানা গেল জ্ঞানশরণ ও হিমানী নিরুদ্দেশ।—এমনিই হয়। ঈপ্সিতা নারীর জন্য পৃথিবীতে এমন কিছু অকরণীয় নেই যা পুরুষ করতে পারে না। সেই দিনের সেই ব্যথা-বিষণ্ণ সকাল থেকে বজ্রাহত কৃষ্ণশরণ নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন এই ভবানীর মন্দিরের ভার। তবে পূজা আর্চা তিনি তেমন জানতেন না বলে তিনি পূজার ভার দিলেন একজন পূজারী ব্রাহ্মণের উপর। এবং নিদারুন ক্রোধ এবং অভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি লক্ষীক অগ্রজের আর কোনও অনুসন্ধানই করলেন না। কমলা, তখন নূতন বধূ। ভাসুরের অনুসন্ধানের জন্য স্বামীর কাছে সে বহু অনুনয় করেছিল কিন্তু কৃষ্ণশরণের প্রতিজ্ঞা সে ভাঙতে পারে নি। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর একদিন সন্ধ্যা-বেলা ভবানীর মন্দিরে প্রদীপ দিয়ে কৃষ্ণশরণ যখন এই কক্ষাসে এসে বসেছেন, এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল একটি লোক। তার সঙ্গে একটী দেবশিশুর মত সুন্দর ছেলে। লোকটী তাঁর হাতে একখানি পত্র দিল। কৃষ্ণশরণ চিঠি খানি পড়তে লাগলেন,

"পরম কল্যাণীয় কৃষ্ণ,

তোমার অনেক দুঃখ দিয়েছি, তার ফলও আমার হাতে হাতে পেতে হোল। গত তিন দিন হোল হিমানী মারা গিয়েছে। আমিও মৃত্যুশয্যায়। দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত। যাক, তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ হিমানীর এবং আমার এই ছেলেকে আমি তোমার নিকট দিয়ে গেলুম। তুমি একে চৌধুরী বংশের প্রাচীন আদর্শে তোমার মনোমত শিক্ষা দিয়ে তৈরী কোর, নিজ সন্তানের মত করে। হিমানীও অন্তিমে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেছে। আমাদের পিতা প্রপিতামহের বংশের আমি যদি কোনও অমর্য্যাদা করে থাকি, তাহলে আমার এই ছেলে, সূর্যশরণকে দিয়ে তাহা পরিশোধ করে নিও। পৃথিবীর কোনও না কোনও প্রান্তে আবার আমাদের দেখা হবে।"

আশীর্বাদক,

শ্রীজ্ঞান শরণ চৌধুরী।

(ক্রমশঃ)

উদ্বাস্তুর হিড়িক
কি হলে কমতে পারে ?

রঞ্জন কুমার দত্ত

১৯৪৬ সালের কলিকাতা ও নোয়াখালি দাংগার ফলে দুই বংগের হিন্দুমুসলমানের মনে যে বিদ্বেষ ও ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্বায়ত্তশাসন লাভের পর দেশ-বিভাগ সত্ত্বেও বেশ কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বত্রই দুই সম্প্রদায়ের লোক বেশ মিলিয়া মিশিয়া অকপট মনে চলিতে চেষ্টা করিতেছিল; গত দাংগার স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া জীবন নির্বাহে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করিতে পারিতেছিল। সম্পূর্ণরূপে স্বাচ্ছন্দ্য-অনুভব করিতে না পারার মূলে কতক অসুবিধা চলিতে ছিল। সে-অসুবিধা উদারদৃষ্টি লইয়া কাজ করিলে পাকিস্তান সরকার অনেক পূর্বেই দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু সে-আগ্রহ পাকিস্তান সরকারের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আদৌ দেখা যায় নাই। ইতিমধ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব ও পশ্চিমবংগের কতিপয় স্থানে আবার দাংগার পুনরাবৃত্তি ঘটে; ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছে। আজো সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু সে-উদারতা কই? এই অনুদারতার পরিচয় যে কেবল এক তরফেই দেখিতেছি, এমন নয়। যেমন পাক-সরকারের তরফে, তেমনি পাকিস্তানী হিন্দুদের তরফেও; এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে অভিযোগও করিয়া আসিতেছে।

পাক-সরকারের হাবভাবে মনে হইতেছে যে তাঁহারা হিন্দুদের আনুগত্যে আন্তরিকতা অনুভব করিতেছেন না এবং তাদেরকে সংশয়ের চোখেই দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন হিন্দুরা আন্তরিকভাবে পাকিস্তানকে 'স্বদেশ' বলিয়া মনে করে না—ভারতকেই 'স্বদেশ' বলিয়া মানে এবং ভারতের গুপ্তচররূপে যেন তাহারা এখানে আছে। এইরূপ একটা সন্দেহের ভাব পাকিস্তান সরকার বিশেষভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আর এই ধারণা একেবারে অলীকও নয়।

তবে এই অভিযোগ পাকিস্তানের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আনা কখনই সংগত হয় না। পূর্ববংগের অধিকাংশ হিন্দুই পাকিস্তানকে 'স্বদেশ' ও নিজেদের 'পাকিস্তানী' বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং সংসার যাত্রায় অভিনিবেশ সহকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। খুব কম সংখ্যক লোকই অস্থির ও অনিশ্চিত মন লইয়া পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রের গঠন পরিচয়ের দিকে তাকাইয়া ছিল। এইছিল একদিকের অবস্থা।

অপরদিকে দেখিতেছিলাম হিন্দুদের মনের অবস্থা। তাহারা দেখিতেছে (১) সরকারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ প্রধান মন্ত্রী হইতে সর্বনিম্নতম চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই বলিয়া বেড়াইতেছেন 'পাকিস্তান মুসলিম ষ্টেট' বা 'ঐসলামিক রাষ্ট্র'। তাহারা দেখিতেছে (২) পাকিস্তানের মুসলিম নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের শাসনবিধানাবলী ঐসলামিক শরিয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া গঠনের আয়োজন করিতেছেন। তাহারা দেখিতেছে (৩) পাকিস্তানের শিক্ষাশালাগুলির জন্য পাঠাশালা হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত যে সব পাঠ্যপুস্তকাদি লিখিত ও নির্বাচিত হইতেছে তাহাদের মধ্যেও কতক পরিমাণে একদেশ-দর্শিতা পরিলক্ষিত হইতেছে, এবং এমন কি শিশুপাঠ্যেও 'পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র,' এই ভ্রান্ত উক্তি লিপিবদ্ধ, পঠিত ও প্রচারিত হইতেছে। তাহারা দেখিতেছে (৪) মুসলিম সমাজের অধিকাংশের আচরণে এমনভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যে এ রাষ্ট্রে হিন্দুরা যেন পরদেশী, মুসলমানরাই স্বদেশী এবং এই মনোভাব ব্যক্ত হওয়ার সাথে সরকারের যেন সমর্থনই রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে (৫) সরকারের উচ্চতন কর্তৃপক্ষের গুণ্ডাদমনের ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ধনমান রক্ষা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও গ্রামাঞ্চলের সরকারী কর্মচারীরা, ইউনিয়ন বোর্ডের মাতব্বরেরা গুণ্ডা দমন করা দূরে থাকুক, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহাদের অনুকূলে

কাজ করিয়া যাইতেছেন বা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি, এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা দেখিতেছে (৬) আনসার বাহিনীতে কোনো হিন্দুকে ভর্তি করা হইতেছে না এবং সরকারের কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে কোন হিন্দুকে নিয়োগ করা হইতেছে না। তাহারা দেখিতেছে (৭) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের দ্বারাই পাকিস্তান সরকার প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা দেখিতেছে (৮) দুই সরকারই হামেশা পরস্পরকে দুষ্কৃতিকারীর জন্য দায়ী করিয়া আসিতেছেন, দুই রাষ্ট্রের কতিপয় সংবাদপত্রও কতক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। তাহারা দেখিতেছে (৯) সরকারী কর্মচারীরাও বহুক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। তাহারা দেখিতেছে (১০) মুসলিম গ্রাম মাতব্বরেরা স্থানে স্থানে হিন্দুদের 'বর্জন' করিয়া চলিতে মুসলীম জনসাধারণকে প্ররোচিত করিয়া তুলিতেছে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে নানা রকমের অজুহাত দেখাইয়া নিরক্ষর অথচ শান্তিপ্রিয় সরলমতি মুসলমান জনসাধারণের মনকে বিষিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। এই হইল অপরদিকের মানসিক স্থিতি এবং ইহাও অলীক নহে।

বস্তুত পরস্পরের মধ্যে এই সম্পর্ক চলিতে পারে চলা সংগত নয়। রাষ্ট্রীয় কল্যাণে, জাতির কল্যাণে সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণে এই ভ্রান্ত ধারণা ও একদেশদর্শিতার অবসান সর্বতোভাবে কাম্য।

হিন্দুদের মধ্যে যাহারা সংশয়ী মন লইয়া অনিশ্চিত ও অস্থিরভাবে পূর্ববংগে থাকিতেছে, তাহাদের উচিত হইবে অকপট হৃদয়ে পূর্ববংগকেই 'স্বদেশ' বলিয়া স্বীকার করা অথবা পূর্ববংগ ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া যাওয়া ও তথাকার জাতীয়তা স্বীকার করিয়া চলা। সংশয়ী মন লইয়া পূর্ববংগে থাকিয়া তাহারা পাকিস্তান সরকারেরও আস্থা হারাইয়াছে, আবার তথাকার সমগ্র হিন্দুসমাজেরও ক্ষতি সাধন করিতেছে। পাকিস্তান সরকার যাহাতে হিন্দু সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে সংশয়ের চোখে না দেখেন এইজন্যই সংশয়মনা হিন্দুদের পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই কল্যাণকর।

পাকিস্তান সরকারেরও উচিত হইবে যে যেসব কারণে পাকিস্তানের হিন্দুদের মনে সরকারের উপর অনাস্থা ও অনির্ভরতার ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহা আন্তরিকতাবে দূর করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলিয়া ভাবিবার ও তাহার জন্য গৌরব বোধ করিবার এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রেরণা সৃষ্টি করা। এজন্য উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করা প্রথম কাজ।

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে 'পাকিস্তান মুসলিম ষ্টেট বা রাষ্ট্র' বলিয়া উল্লেখ করা বন্ধ করিতে হইবে— তাঁহাদিগকে কায়েদে আজমের কথা স্মরণ করিতে বলি। তাঁহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে কায়েদে আজম জিন্নাহ যখন প্রথম পাকিস্তানের গভর্নর পদে অভিষিক্ত হন তখন তিনি অকুণ্ঠ হৃদয়ে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পাকিস্তান কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র বা ষ্টেট নহে, পাকিস্তানে যাহারা বাস করে বা করিবে ইহা তাহাদের সকলেরই স্বদেশ বা রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে। কায়েদে আজম জিন্নাহ সে বক্তৃতা নির্ঘোষ বাণী কি আজ শুদ্ধ-বিস্মৃত? 'ঐসলামিক রাষ্ট্র' ইহা বলা বন্ধ করিতে হইবে এবং তবেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকল্পে সমগ্র হিন্দু সমাজ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতে পারে এবং পাকিস্তানে থাকার গৌরব অনুভব করিতে পারে। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান বলিয়া আসিতেছেন যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ঐসলামিক শরিয়তের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইবে। তিনি বলেন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনো রক্ষা কবচ থাকিতে পারে না। কেননা ইসলাম শান্তি, সাম্য ও ন্যায়বিচারের ধর্ম; এইরূপ উচ্চস্তরের উক্তি আরো অনেকে করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

বস্তুতপক্ষে ঐসলামিক আদর্শ শান্তি, সাম্য ও ন্যায়-

বিচারেরই আদর্শ, কিন্তু সেই আদর্শের পথে বা লক্ষ্যে কি আমাদের পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ, বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ প্রভাবিত মুসলমানেরা চলিতেছে? ইসলামিক ধর্ম বা নীতির দোহাই পাড়িয়া কার্যত যে জবরদস্তি, অত্যাচার ও নিষ্ঠুর বর্বরতার পরিচয় পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ দিয়াছে তাহার সমর্থন ইসলাম ধর্মে কেবল নহে, কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। এই গুণ্ডামিকেই যদি শারিয়তের ভিত্তি বলিয়া প্রচার করা হয়—তাহাই বস্তুত করা হইতেছে কার্যকলাপে—তবে কেবল হিন্দু নয়, বিশ্বের অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকও ইসলামিক শারিয়তের নামে আতংকিত হইয়া উঠিবে এবং ফলে পাকিস্তানকে সকলে ভয়ের চোখেই দেখিবে। এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উক্তিতে কিছু পরিবর্তন দেখাইতে হইবে। মুসলিম রাষ্ট্র বা ষ্টেট স্থলে পাকিস্তান রাষ্ট্র বা ষ্টেট বলিতে হইবে। শারিয়তের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্র রচিত হউক—তাহাতে আপত্তি না উঠিতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে শারিয়তের শান্তি, সাম্য ও ন্যায়ের পরিচয় দিতে হইবে। ইহা সম্ভব না হইলে পবিত্র শারিয়তের দোহাই পাড়া বন্ধ করিতে হইবে। কার্যত গুণ্ডামি চলিতে থাকিবে, মুখে শারিয়তের দোহাই পাড়া হইবে—ইহাতে পবিত্র ইসলাম ধর্মকেই হেয় ও ম্লান করা হয়, ধর্মকে উপহাসের বিষয় করিয়া তোলা হয়। ইহাকে কোনোমতেই 'আল্লার এলেমে' বলা চলে না।

ইসলামের চারিটি স্তম্ভ—নমাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। ইহাদের মধ্যে নমাজই সর্বপ্রধান। কেননা এই নমাজ আত্মার অর্থাৎ আল্লার সহিত যোগ-সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। আর এই নমাজ সম্পর্কেই কোরান বলিতেছেন :

"নমাজকে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখ। কেননা নমাজ মানুষকে সমস্ত অশ্লীল ও ঘৃণিত কার্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, আর তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লা তাহা জানিতেছেন।" (সুরা আনকাবুত)

এই নমাজ সম্পর্কেই বহু হাদিছে জানিতে পারা যায় যে নমাজ যদি মানুষকে অশ্লীল ও ঘৃণিত অর্থাৎ সর্বপ্রকার অপকর্ম হইতে রক্ষা করিতে না পারে তবে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির নমাজই হইতেছে না। বস্তুত আজ যদি বিচার করিতে যাই তবে বলিতে হয় যাহারা এই সকল গুণ্ডামি, অশ্লীল ও ঘৃণিত কর্মে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত আছে তাহারা মুসলমান নহে, তাহারাই সত্যিকার কাফের। তেমনি যে সকল হিন্দুও আজ এই সকল অপকর্মে লিপ্ত আছে ও হইতেছে তাহারাও হিন্দুধর্মের বিধানানুসারে হিন্দু নামের অযোগ্য। কোনো শাস্ত্র বা ধর্মই এই সব অমানুষিকতা বা দুষ্কার্য ও গুণ্ডামি সমর্থন করে না।

মুসলমান ভাইদের কাছে অনুরোধ—শারিয়তের মর্যাদা বাগাড়ম্বর দ্বারা প্রচার না করিয়া আচরণের দ্বারা করুন। তবেই শারিয়তের নামে অহেতুক ভয় হিন্দু ত্যাগ করিতে পারিবে।

শিক্ষাশালার পাঠ্যক্রম হইতে 'পাকিস্তান মুসলীম ষ্টেট' ইহা বাতিল করিতে হইবে অথবা ইহা সংশোধন করিতে হইবে।

মুসলমান জনসাধারণ কেন এইরূপ মনে করিবে যে হিন্দুরা পাকিস্তানে পরদেশী, তাহারাই স্বদেশী এবং সরকারও তাহাদের এই ধারণার সমর্থক? পাকিস্তানের জাতীয়তা স্বীকার করিয়া থাকিলে জাতি হিসাবে সকলেই পাকিস্তানী। মুসলমান, বা হিন্দু বা খৃষ্টান এগুলি জাতির পরিচায়ক নয়, সম্প্রদায়ের।

এখানে পুরানো কালের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে হজরত মহম্মদ মদিনায় যাওয়ার পর ইহুদী প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও ধর্মের লোকদিগকে লইয়া একটি সর্বসাম্প্রদায়িক সাধারণতন্ত্র গঠন করাইয়াছিলেন, সকল সম্প্রদায়কে লইয়া একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল। উক্ত সন্ধিপত্রের কতকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"(১)·····মুসলমানদের সহিত এক জাতি।

(২) এই সনদের মধ্যকার কোনো সম্প্রদায় বা গোত্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সকলকে সমবেত শক্তি দিয়া তাহা প্রতিহত করিতে হইবে।

(৩) শত্রুদিগের সহিত কেহ কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে না।

(৪) মদিনা আক্রান্ত হইলে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে সমবেতভাবে যুদ্ধ করিবে।

(৫) ইহুদী, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম পালন করিতে পারিবে—কেহ কাহারও ধর্মগত স্বাধীনতায় কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) অমুসলমানদের মধ্যে কেহ কোনো অপরাধ করিলে তাহা ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ তজ্জন্য তাহার সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বত্বাধিকার কোনো প্রকারে খর্ব করা হইবে না।

(৭) উৎপীড়িতকে রক্ষা করিতে হইবে।

(৮) মদিনায় নরহত্যা চিরস্থায়ীভাবে রহিত।

(৯) আল্লার নামে ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যাহারা ইহা ভংগ করিবে—তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত। (মৌঃ আকরম খাঁ অনূদিত কোরান)

স্বদেশের মংগলের জন্য এই প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা তৎকালীন মদিনাবাসী সকল সম্প্রদায়ের লোক নিজেদেরকে 'এক-জাতিভুক্ত' বলিয়া ঘোষণা করেন।

বস্তুত সম্প্রদায় একটা জাতি নয়। উহা ধর্মের বা সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে একটা সম্প্রদায় বটে, জাতি নহে। মদিনাতে অনেক সম্প্রদায় বা গোত্রের লোকের বাস—সকলেই তাহারা ছিল মদিনাবাসী। ইহাই ছিল তাহাদের জাতীয় পরিচয়। আমাদেরও জাতি হিসাবে, ভারতে যাহারা বসবাস করে তাহারা ভারতীয়, পাকিস্তানে যাহারা বসবাস করে তাহারা পাকিস্তানী। ইহার চাইতে গৌরবজনক পরিচয় আর কিসের দ্বারা প্রকটিত হইতে পারে? মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কেন এই উদারতার পরিচয় দিবেন না? ইহাতে কত গৌরব! কত মহানুভবতা! 'মুসলিম রাষ্ট্র'—ইহাত সংকীর্ণতার পরিচায়ক।

এই গৌরব ও মহানুভবতার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হইলে পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণের উচিত হইবে সর্বপ্রকার গুণ্ডামি বর্বরতার অবসানে আত্মনিয়োগ করা, অসৎকে সদাচারী করিয়া তোলা। সরকারী কর্মচারী, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য, গ্রামের মাতব্বর সকলকেই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে দেশের শান্তি ও সুখলা রক্ষায়, সংখ্যালঘুদের সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষায় তাহাদিগকে অকপট হৃদ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের সহযোগিতায় তৎপর হইবে—হিন্দুকে পরদেশী জ্ঞানে তাহার সহিত অসহযোগ করার আন্দোলন বা মনোভাব মুসলমানদের ত্যাগ করিতে হইবে। কায়দে আজম জিন্না ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে বেতার ভাষণে পাকিস্তানের অধিবাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:

"The creation of the new state has placed a tremendous responsibility on the citizens of Pakistan. It gives an opportunity to demonstrate to the world how a nation containing many elements can live in peace and amity and work for the betterment of all its citizens irrespective of caste or creed. Our object should be peace within and peace without."

অর্থাৎ এই নূতন ষ্টেটের জন্ম হওয়ার ফলে পাকিস্তানের নাগরিকদের উপর এক বিশাল দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। বহু উপাদানে (অর্থাৎ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে) সংগঠিত একটা জাতি কেমন করিয়া পারস্পরিক শান্তি ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বসবাস করিতে পারে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকারই উন্নতিবিধানের জন্য কাজ করিয়া যাইতে পারে বিশ্ববাসীকে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পাকিস্তান তাহার নাগরিকদের একটি সুযোগ দিয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক শান্তি।

পাকিস্তানের মুসলমানেরা কায়দে আজমের উক্ত সংকল্পের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে সম্প্রতি পূর্ববংগে

যাহা ঘটিয়া গেল তজ্জন্য লজ্জা অনুভব করিবেন, অনুতপ্ত হইবেন।

পাকিস্তান সরকারকে আনসার বাহিনীর মধ্যে হিন্দুদিগকে ভর্তি করার এবং দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে হিন্দুদেরকে নিয়োগ করার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুমোদন না দিয়া ধার্মিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুমোদন দেওয়া এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পাকিস্তান ন্যাশন্যাল লীগ গঠন করার নির্দেশ দিতে হইবে। এবং এই পাকিস্তান ন্যাশন্যাল লীগে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিক যোগদান করিতে পারিবে। এই সংস্থাই সরকারকে প্রভাবিত করিবার অধিকারী হইবে। মুসলিম লীগ কেবলমাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক চর্চা করিতে পারিবেন। রাজনৈতিক চর্চা তাহার করণীয় নহে।

দুই সরকারকেই সদাচারী হইতে হইবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুর ও অমায়িক করিয়া তুলিতে হইবে। দুই রাষ্ট্রের যেসব সংবাদপত্র বিদ্বেষবহ্নি জাগাইয়া তুলিতে অনবরত ইন্ধন যোগাইতেছে তাহাদিগকে সংযত হইতে এবং করিতে হইবে। তাহারা দুই সরকারের মন্দ দিকটার যেমন সমালোচনা করেন, ভাল দিকটার তেমনি সাধুবাদ করিবেন। তাহাতে সম্ভবত জাতির অধিকতর কল্যাণের সম্ভাবনা আছে। সরকারী কর্মচারীদের আচরণে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পাওয়া চাই—জনসাধারণ তাহাদের সততার উপর যেন আস্থা ও নির্ভরতা রাখিতে পারে। এইরূপ হইলেই দুই রাষ্ট্রে, দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় হইতে পারে, দিল্লচুক্তি সফল হইতে পারে। হিন্দু মুসলমান সকলেই তবে শান্তি ও সুখের প্রত্যাশা করিতে পারে। নিজ নিজ সংসার যাত্রায় শান্তমনে আত্মনিয়োগ করিয়া পরিবারবর্গের ও দেশের কল্যাণসাধনে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারিবে।

উদ্বাস্তুর হিড়িক তবে কমিবে। দুই সরকারেরই অকারণ ব্যয় বাহুল্য বা অপচয় বন্ধ হইবে। উভয় সরকারের মধ্যে, উভয় রাষ্ট্রের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে বর্তমানে যাহা চলিতেছে ইহার শান্তিপূর্ণ কোনো সমাধান নাই।

পাকিস্তানই একটা মস্ত ভুল। অশান্তির মূলে ইহার কল্পনা। শেষদিকে বিভাগকারীরা মনে করিয়াছিলেন যে দেশ বিভক্ত হইলে সব অশান্তি সব বিরোধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। কংগ্রেসও নিতান্ত নাচার হইয়া উহাই শেষাস্ত্র (last resort) হিসাবে বিভাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী জানিতেন যে হৃদয় পরিষ্কার না হইলে শত বিভাগেও কোনো সমাধান নাই। তাই এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই জবাব দিয়াছিলেন "……if Pakistan is wrong, partition of Bengal and Punjab will not make it right. Two wrongs will not make one right." অর্থাৎ পাকিস্তান যদি অন্যায়ই হইয়া থাকে তবে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ করিলে উহা ঠিক হইয়া যাইবে না। দুইটি অন্যায় একটি ন্যায় সৃষ্টি করিতে পারে না।

যাহা হউক দেশ যখন বিভক্তই হইয়া গিয়াছে এবং পাকিস্তান কায়েম হইয়া গিয়াছে তখন উহা লইয়া আলোচনা করিয়া আজ আর লাভ নাই, আর উহার আবশ্যকতাও দেখি না। এখন এই দুইটি রাষ্ট্রই একই শরীরের দুইটি বাহুরূপে সকল চিন্তায়, সকল কর্মে সহযোগিতা ও সৌজন্য সহকারে সর্বতোভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে ইহাই কাম্য।

এই প্রবন্ধে কেবল পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানের কথাই আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষেও হিন্দুরা সমভাবেই গুণ্ডামি বর্বরতার কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন—ইহা সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। হিন্দুরা যেন মনে না করেন যে তাহারা ভারতের মুসলমানদের প্রতি খুব ভালো ব্যবহার করিয়াছেন বা করিতেছেন। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এইরূপ ভাবিতেই পারেন না। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা অবাধে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ নিশ্চিতই জগতের শ্রদ্ধা ও আস্থা হারাইত এবং বিপন্ন হইত। হিন্দুদের ইহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা গান্ধীবাদ বরবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

নাইট্রোজেন ও মৃত্তিকা

শ্রীসুনীল ঘোষ

দেশের খাদ্যোৎপাদনের স্বল্পতার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস একটি কারণ, ভারতবর্ষে চাষের উপযুক্ত জমি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে অর্থাৎ অনুর্বর জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে দুর্ভিক্ষ দেশবাসীর নিত্যসহচররূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। এই দুর্ভিক্ষ হইতে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাইবার বহুপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে 'সপ্তাহে এক বেলা উপবাস, জন্মনিয়ন্ত্রণ, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন, বৃক্ষরোপণ, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী ইত্যাদি পরিকল্পনা অন্যতম।

খাদ্যদ্রব্যের স্বচ্ছলতা হ্রাসের প্রধান কারণ, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, ইহার নিরোধের ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষ হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ। এই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা আদৌ উপযুক্ত নয় এবং পরিপূর্ণ নয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্য গগনে বিজ্ঞানের যে সূর্য্য বিরাজমান তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিশিখার সাহায্য ব্যতিরেকে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস একদিকে যেমন অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে অপরদিকে সমস্যা সমাধানের পথে অধিক দূর অগ্রসরে সাহায্য করে না।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন। এই সারের শক্তি অনুপাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

এক্ষনে বৃক্ষের খাদ্য কি তাহা জানিতে হইবে। গাছ মৃত্তিকা হইতে রস এবং বায়ু হইতে অক্সিজেন (oxygen) সংগ্রহ করে। শিকড় দ্বারা গাছ মাটি হইতে যে রস সংগ্রহ করে তাহা কেবল জল (H_2O) নহে। ইহার সহিত রাসায়নিক বহু প্রকার পদার্থ (chemical compounds) মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে নাইট্রোজেন (Nitrogen) প্রধান। এই নাইট্রোজেন (N_2) এর অভাবে বৃক্ষ মরিয়া যায় এবং মৃত্তিকা তখন অনুর্বর বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। সেই সময় মাটিকে শক্তিশালী অর্থাৎ উর্বর করিবার নিমিত্ত মাটিতে উপযুক্ত সারের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এই সময় মাটিতে নাইট্রোজেন পূর্ণ সার একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি মানুষকে এই বিষয়ে কিছু সাহায্য করে।

বায়ুতে (atmosphere) যে নাইট্রোজেন আছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ অংশ মাটিতে যায় ;কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। বায়ু মণ্ডলে যদিও অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে তথাপি ইহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় (inactive) বলিয়া ইহার অত্যন্ত অল্প পরিমাণ অংশ মাটিতে মিশিতে পারে।

যখন গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হয় সেই সময় নাইট্রোজেন (N_2) এবং অক্সিজেন (O_2) গ্যাস রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (chemical reaction) ফলে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) নামক এক মিশ্র গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক থাকায় নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড গ্যাসে (NO_2) রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড (NO_2) জলকণা (H_2O) শোষণ করিয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার (chemical reaction) নাইট্রিক এসিডে (HNO_3) রূপান্তরিত হয় এবং অনুপরমাণুরূপে মাটিতে অবতরণ করে বলিয়া মানুষ ইহার বিষাক্ত গুণ উপলব্ধি করিতে পারে না। মাটিতে নানারূপ লবণ (Salt) পদার্থ বর্ত্তমান থাকায় এই নাইট্রিক এসিড 'নাইটার' নামক সার পদার্থে পরিণত হয় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে।

এতদ্ভিন্ন একপ্রকার গাছ আছে যাহাদিগকে বিজ্ঞানে বলা হয় লেগিউমিনাস প্ল্যান্ট (Leguminous plants) ছোলা, মটর এই জাতীয় অন্তর্গত। এইসকল গাছের শিকড়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কীট (bacteria) জন্মায়। ইহাদিগকে নোডিউল্‌স্ (Nodules) বলে। ইহাদের সাহায্যে এই গাছগুলি বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিতে

পারে এবং তাহারা নিজেদের আহার তৈয়ারী করিতে পারে। এই সকল নাইট্রোজেন ফসলের মধ্য দিয়া জীব-দেহে প্রবেশ করে। অবশেষে মরণশীল জীব পঞ্চভূতে মিশিলে এবং জীবদেহের মলমূত্র প্রভৃতি হইতে উক্ত নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়া গ্যাসে (NH_3) রূপান্বিত হইয়া মাটিতে পতিত হয়।

এই এ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) তিন প্রকার কীট (bacteria) দ্বারা তিন অবস্থা ধারণ করে। এক প্রকার কীট (bacteria) এই এমোনিয়ার কিছু অংশ নাইট্রাস এসিডে (HNO_2) পরিণত করে অপর দ্বিতীয় প্রকার কীট (bacteria) এই নাইট্রাস এসিডকে (HNO_2) নাইট্রিক এ্যাসিডে (HNO_3) পরিণত করে। অবশেষে ঐ নাইট্রিক এ্যাসিড (NHO_3) মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়। তৃতীয় প্রকার কীট (bacteria) এ্যামোনিয়ার কিছু অংশে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করে এই নাইট্রোজেন পুনরায় বাতাসে মিশ্রিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন যুক্ত সার প্রদান করিলে মৃত্তিকা হইতে অধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে। তাহা হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ কম হইবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার উপায় উদ্ভাবন হয় নাই। সুতরাং নাইট্রোজেনপূর্ণ পদার্থের অনুসন্ধান চলিতে থাকে। অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকার বৃষ্টিহীন চিলি এবং পেরুদেশে নাইট্রোজেন পূর্ণ নাইটারের পর্বতের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশ চিলি এবং পেরু হইতে নাইটার আমদানী করিতে আরম্ভ করে। কিছুদিন পরে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন যে এইভাবে নাইটার বিনষ্ট হইলে পৃথিবীতে শীঘ্রই নাইট্রোজেন দুর্ভিক্ষ (Nitrogen famine) হইবে। সুতরাং তাঁহারা সুদূর ভবিষ্যতে নাইট্রোজেন দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করিয়া জগতে এক নূতন ভীতির বাণী শোনাইলেন।

নাইট্রোজেন আবার বিস্ফোরক তৈয়ারীর অত্যাবশ্যক সামগ্রী, কিন্তু আমেরিকা নানারূপ রাজনৈতিক কারণে গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণীকে চিলি এবং পেরু হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুতের উপাদান নাইটার সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল। জার্মাণী নাইট্রোজেনের অভাবে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নরওয়ের বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত মন প্রাণ নিয়োগ করিয়া বায়ু হইতে নাইট্রোজেন শোষণের উপায় উদ্ভাবনে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাদের গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার হওয়ায় নাইট্রোজেন দুর্ভিক্ষের ভয় দূর হইল। কিন্তু বাতাস হইতে নাইট্রো-জেন পৃথক করিবার পন্থা সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি দেবী নরওয়েকে তড়িৎশক্তির অফুরন্ত উৎস দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক তড়িতের উৎস নাই বলিলেই হয়। এখানে নাইট্রো-জেনের অভাব বড় বেশী। যেদিন বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় ভারতবর্ষ তড়িৎশক্তিতে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে সেইদিনই ভারতের ভাগ্যাকাশে বিজ্ঞানের নূতন সূর্য আত্মপ্রকাশ করিবে।

এই তড়িৎশক্তির উদ্ভাবন দ্বারা ভারতবর্ষ খাদ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারের বৈজ্ঞানিকগণকে সম্পূর্ণ সাহায্য করা উচিত।

সন্দেহ

শ্রীনির্ম্মলেন্দু মাল্লা

গড়গোবিন্দপুরের নতুন ডাক্তার নিমাই বন্ধু আনাও গল্পটি শুনেছেন।

এরকম গল্প তাঁর পক্ষে ভোলা কঠিন কেননা নিজের পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাহিনীটি। এক ডাক্তার ঘুমুচ্ছিলো তার বাড়ীতে। মাঝ রাত্তিরে একটা ষণ্ডা মার্কা লোক ডেকে তুলল তাকে, প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে বলল, এই রাত্রেই ডাক্তারবাবুকে তার বাড়ী যেতে হবে।

এইখানটায় ডাঃ নিমাইবন্ধু হেসেছিলেন। গল্পিক হয়তো ভেবেছিল, এই রকম একটা পরোপকারমূলক গল্প শুনে ডাক্তারবাবু সাবধান হবেন ভবিষ্যতে। উনি যে রকম মানুষ, লোকে একটু কেঁদে পড়তে পারলেই হোলো, নিজের হিতাহিত জ্ঞান ভুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন রোগীর বাড়ী।

নিমাইবন্ধু হেসেছিলেন অন্যকারণে। মাথার পাকা চুল আর টাক, দুটোই সাক্ষী হয়ে রয়েছে তাঁর লোক চরিত্র অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতার। ষণ্ডামার্কা কেউ এলে প্রথমেই তিনি যেতে অস্বীকার করবেন, কারণ সে রোগী বয়ে আনবার ক্ষমতা রাখে। আর টাকার লোভ যখন কেউ দেখাবে তো তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন।

অবশ্য সেজন্য গল্পটা তিনি ভোলেন নি একেবারে। এমন কি শেষটাও তাঁর মনে আছে। ডাক্তার, হ্যাঁ সেই গল্পের ডাক্তার, লোকটির সঙ্গে গিয়ে দেখে একটা জখমী ডাকাতকে গোপন চিকিৎসা করবার জন্যে তাকে ডাকা হয়েছে। তার চার পাশে আরো অনেক ডাকাত। পালাবার পথ বন্ধ।

ডাক্তার বাবু ইচ্ছে করলে গল্পের শেষটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, যেমন আপনি আমি এরকম গল্প অনেক শুনেছি আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি আপনি আমি তাঁর মত অবস্থায় পড়লে গল্পটির সারসত্যটুকুকে অবিশ্বাস করা অসম্ভব হত আমাদের। কারণটা ভেবে দেখুন। রাত্রি গভীর। ঘড়িতে এইমাত্র সাড়ে তিনটে বাজার সঙ্কেত উঠল। একটা সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় জেলাবোর্ডের চাকুরে ডাক্তার নিমাইবন্ধু বদলি হয়ে এসেছেন। রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ চেনা হয়নি। এখানের মানুষগুলি কেমন সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। এবং সর্বশেষের সমস্যাসঙ্কুল খবর হচ্ছে এই যে, এত রাত্রে একটি লোকের ডাকাডাকিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে।

প্রথমে কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পরও তিনি কোনোরূপ সাড়া শব্দ দেননি। কিন্তু শেষকালে তাঁর মত লোকের পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়েছে। তিনি জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কে ডাকে? কি দরকার।

অমনি লোকটি হাউ মাউ করে উঠেছে। প্রচুর আনুনাসিক কান্না মেশানো ক্ষোভ এবং অভিযোগের ভেতর থেকে যে অমূল্য তথ্য তিনি আহরণ করেছেন তাতে মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন, লোকটির বৃদ্ধ পিতাঠাকুর মহাশয়ের নাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। এহেন অবস্থায় তিনিই লোকটির বা বাপ। তিনি না দেখলে আর কে দেখবে! পিতাঠাকুর অতি পুণ্যাত্মা লোক। কিন্তু এখন যা কষ্ট পাচ্ছেন তা চোখে দেখা যায় না। হ্যাঁ, তিনি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক.....

ডাঃ নিমাইবন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। হ্যারিকেনটা হাতে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—তুমি জহর সামন্তর ছেলে?

—আজ্ঞে আপনি যা মনে করেন।

—বাড়ী এখান থেকে কতদূর?

—আজ্ঞে মাত্র দেড় মাইল; ঐ প্রতাপচকের কা কাছি।

—তোমার বাবার কি অসুখ হয়েছে?

—আজ্ঞে তাতো জানি না, তবে হাতপা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দেখে এনু।

তবে এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মনে মনে বললেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু ক্ষণেকের নীরবতাও লোকটির সহ্য হল না। কপাল চাপড়ে হাউহাউ করে উঠল। তাতে বোঝা গেল জহর সামন্ত খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন ইদানীং কিন্তু হরিনাম সঙ্কীর্তনের নেশা ছাড়তে পারেননি। তাই দুদিন আগে একটা আসরে গাইতে গাইতে ফিট হয়ে পড়ে যান।

—তা কালকে দিনের বেলায় আসনি কেন? চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, আজ্ঞে দিনের বেলায় হাতপা গরম ছেল যে।

কথাবার্ত্তায় লোকটিকে খুবই সরল বলে মনে হয় যদিও চেহারাটা ষণ্ডা গোছের। ডাক্তারবাবুর মত চারজন বয়স্ক লোকের জন্যে অমন একটা চেহারাই যথেষ্ট। আশ্চর্য্য, অনেকদিন আগে শোনা কিন্তু ঠিক মনে করে রাখা গল্পটার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। সেই ষণ্ডা চেহারা, সেই নিস্তব্ধ রাত এবং সেই অপরিচয়ের অভেদ্য অন্ধকার।

ডাক্তারবাবু সব বুঝলেন, সব বুঝেও যাবেন বলে স্থির করলেন। লোকটিকে দিয়ে রোগী আনাবার সম্ভাবনা-টুকুই ভুলে গেলেন। রোগী যে মরমর। আর কি ভাববার সময় আছে।

সেই মুহূর্তেই গায়ের ওপর সার্টটা চাপিয়ে, সার্টের ওপর স্টেথিসকোপটা ঝুলিয়ে ডান হাতে ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে পকেটে রাখলেন একটা ছোট টর্চ, আর কিছু না, যেন ঐটেই তাঁর পিস্তল-বন্দুকের মত পরম রক্ষক।

লোকটি নীরবে ডাক্তারবাবুর হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে চলতে সুরু করল। ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে তার অনুগামী হলেন।

আঃ ভগবানই এখন তাঁর সহায় হোন।

এই স্থানটায় আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ডাক্তার বাবুর ঘরে কি তাঁর স্ত্রী নেই?

আছেন, তিনি নিশ্চয় আছেন। কথা হচ্ছে, তিনি তাঁর স্বামীর ধাত বোঝেন।

তাহলে এমনি অন্ধকারে পা বাড়ানোর মধ্যে কি যুক্তি আছে ডাক্তারবাবুর? একথা শুধু আপনি নয়, আমিও জিজ্ঞেস করছি তাঁকে। হয়তো ভেবেছিলেন জহর সামন্তকে না দেখলেও লোকটি চেনাই। এই যেমন আপনার আমার কত সাহিত্যিকদের সঙ্গে চেনা আছে। তাঁদের দেখিনি কোনোদিন, শুধু লেখা পড়েছি। শুধু লেখা পড়েই যেন মনে হয়েছে ওঁদের সঙ্গে আমাদের কতকালের পরিচয়। নয়তো ভেবেছিলেন, জীবনে কত বিপদ যে এলো গেলো, আর এই একটা সৎলোকের মৃত্যু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন!

কী হাস্যকর ভাবপ্রবণ যুক্তি বলুন তো! আপনি আমি হলে কক্ষনো এমন অজানা দেশে অচেনা লোকের সঙ্গে এক কথায় বেরুতুম না। লোকের দয়ামায়ার সুযোগ নিয়ে কত দস্যু যে কত রাহাজানী করছে। এসব ব্যাপারে কি সাবধানী না হয়ে পারা যায়? অবশ্য ডাক্তার বাবু সাবধান হয়েই চলছেন কিন্তু সে আর কতটুকু?

পকেটে একবার হাত গলিয়ে দেখে নিলেন, না, টর্চটা ঠিক আছে। সুইচটা টিপলেই সে তার কানা চোখ মেলে জেগে উঠবে।

এবার তাহলে গল্প করতে করতে যাওয়া যেতে পারে। ঠিক গল্প নয়, এমন কথা তিনি আলোচনা করবেন যাতে লোকটির লুকোনো পরিচয়টুকু তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে আসে। তিনি কি তাহলে সুরু করবেন তাঁর সিংটি-শিব-পুরের অভিজ্ঞতা দিয়ে? সেই যে, এমনি এক রাত তিনি জেগে কাটালেন একটি লোকের কুঁড়ে ঘরে। খুব শক্ত অসুখ ছিল তার মায়ের। কিন্তু লোকটি ছিল, যাকে বলে, একে-বারে গরীব। সেইজন্যে টাকাকড়িও তিনি কিছু নেননি। মানব সেবাই তাঁর ব্রত যে! কিন্তু লোকটি কি টাকার চেয়েও বেশী ছাপ ফেলেনি তাঁর মনে? তারপর আর এক রাত এলো। সেদিন নদীতে ছিল জোয়ার, ভরা জোয়ার। অথচ নদী পেরোতেই হবে তাঁকে, বাড়ী যেতেই হবে

সেই রাতে নইলে হয়তো স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় পাবেন না। সাইকেলটা হাতে নিয়ে ভাবছেন, জনমানবহীন ঘুটঘুটে অন্ধকারে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনো পথই যখন পাচ্ছেন না, তখন সেই লোকের আবির্ভাব যার মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুর হাত থেকে।

ঠিক গল্পের মতো। জীবনে এমন সংযোগ কচিৎ ঘটে।

তারপরে আর কি! সে-চপার করে দিলে তাঁকে, স্ত্রীর জীবন রক্ষার কারণ হয়ে রইল। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির পাশেই এমন ঘটনা স্থান পেতে পারে। অবশ্য তাঁর পত্নীপ্রীতির জন্যে নয়, লোকটির কর্তব্য নিষ্ঠার জন্যে।

কিন্তু কি হবে এমন সব কাহিনী বলে। নিজের মহত্ত্ব কি জাহির না করলেই নয়? ডাক্তারবাবুর মনে হোল একথা। তিনি যেমন নীরবে চলছিলেন সেমনিই চলতে লাগলেন।

মুখ নীচু করে হ্যারিকেনের আবছা আলোয় পথ দেখতে দেখতে তিনি চলেছেন কিন্তু অনুভব করতে বাধছেনা চারদিকের নৈশব্দ্যঃ ভরা ভয়ালু পরিবেশকে। গাছগুলো কুলো কুলো অন্ধকারের ঢেউ তুলে আকাশ পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। কালো আকাশ থেকে অনেকগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টি জ্বল জ্বল করছে তাঁর মাথার ওপর। তাঁদের পথ চলার একটা খসখসে ক্ষীণ আওয়াজ মিশে যাচ্ছে ঝিল্লীরবের সঙ্গে। সঙ্গের হ্যারিকেনটা এক ঝাঁক জোনাকীর চেয়ে বেশী আলো ছড়াতে পারছে না। অনেক দূরে একটা কুক্কুরী বিশ্রী আওয়াজ তুলে থেমে গেল, জানিয়ে দিল সমস্ত গ্রাম ঘুমন্ত, বিপদে সাহায্য করবার কেউ নেই।

মনে মনে সাবধান হলেন ডাক্তার নিমাইবন্ধু। সচকিত দৃষ্টি নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। লোকটি সেই থেকে একটি কথাও বলেনি। ভাবখানা যেন, তোমার বাপে পেয়ে গেছি, আর বৃথা বাকাব্যয় করে কি হবে।

সংশয়ী মন নিয়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তারবাবু. এই, তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে শ্রীগহর সামন্ত।

কথার মধ্যে এতো ভাল মানুষীর সুর তো ভাল নয়। প্রথমটায় নাম বলতে হবে শুনেই ত' তুষার ঢোক গিলল। জহরের সঙ্গে গহর মিল দিতে হবে তো, নইলে যে সমস্ত বেফাঁস হয়ে যায়। আর কি রকম শুকনো মুখে নিশ্চিন্তে চলেছে দেখেছো, মনে মনে হাসছে বোধ হয়, কেমন ডাক্তারখানা ছাড়িয়ে অনেকখানি পথ চলে এলুম, সেদিকে নজর আছে।

তাহলে এই পথের মোড়ে মোড়েই অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ঘুপটি মেরে বসে আছে। যদি বেঁকে বসেন ডাক্তারবাবু তবে লাঠি সমেত বেরিয়ে আসবে।

নাঃ লোকচরিত্র তাঁর এখনো জানা হল না। লোকটির প্রতিটি কথায় আস্থা রেখে তিনি ঠকেছেন। এখন চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিপদ ক্রমশঃ ঘন হয়ে ঘিরে আসছে লোকটির চালচলনও বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। তিনি যে লোকটির ওপর বিশ্বাস করে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন, সে বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই। কতলোক যে নিশির ডাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ে। আজকেও ঠিক তাই। নৈলে একটা লোক লাঠি উঁচিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসবে কেন?

সত্যিই তেড়ে আসছে একটা লোক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। ডেকে উঠলেন, গহর।

প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল সেটা।

লোকটা তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে বললে. কি হল ডাক্তারবাবু?

—ঐ যে লাঠি হাতে ও লোকটা কে?

—ডাক্তারবাবু পেন্নাম হই, আমি নিতাই চৌকিদার —দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এল।

ওঃ, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তারবাবু। এতক্ষণ পরে যেন নিঃশ্বাস ছাড়লেন, এতক্ষণ পরে যেন হৃৎপিণ্ডের দ্রুত নিত্যতাল অনুভব করলেন।

মোটা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চৌকিদার পরিচয়ে লোকটা

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কে জানে, লোকটা চৌকিদার কিনা! হয়তো ওদেরি দলের লোক, একবার দেখে রাখল।

এই সময়ে নিষ্কৃতি পাবার একটি মাত্র উপায় আছে। বিপদের গুরুত্ব বুঝে ডাক্তারবাবু উপায়টি ভাবতে লাগলেন। হয়েছে। তিনি একটু হেসে অথচ উদ্বিগ্ন ভাবটি পুরোপুরি বজায় রেখে বলবেন, তাইতো গহর বড় ভুল করে ফেললুম। গহর তাড়াতাড়ি বলবে, আজ্ঞে কি ভুল করলেন। তখন তিনি আশঙ্কার ভাবটি পুরোপুরি বজায় রেখে বলবেন, তোমার বাবার জন্যে আসল ওষুধটাই নেয়া হয়নি, যাই, এক্ষুণি নিয়ে আসি। কিন্তু ঐ ধূর্ত লোকটা তক্ষুণি বিনয়ে গলে যাওয়ার ভান করে বলবে, আজ্ঞে আপনি আর এতখানি কষ্ট করবেন কেন, আমিই যাচ্ছি। কিংবা হয়তো বলে বসবে, রোগী দেখলেন না, এরই মধ্যে ওষুধের আসল নকল ধরলেন কেমন করে?

না, কিছুতেই কিছু হয় না, কোনো দিক দিয়েই না, এদের হাতে আজ সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছেন তিনি। এখন পেছনের পথ বন্ধ। সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কি আর করা যায়। হতাশায় ডুবে গিয়ে ডাক্তার নিঃশব্দে চলতে লাগলেন। সারা দেহে অনিদ্রার ক্লান্তি, সারামনে অনিশ্চিত উদ্বেগ, অনুক্ষণ উৎকণ্ঠা।

কিন্তু শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? বিশেষ যখন বুঝতেই পারছেন আড্ডার কাছাকাছি এসে গেছেন তিনি।

গহর, এটা কেমন হোল? থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

কি ডাক্তারবাবু? চট করে গহর ফিরে দাঁড়াল। লোকটা কাঁপছে। দুষ্কৃতি ধরা পড়ে যাওয়ায় কাঁপছে লোকটা। বোঝাবার চেষ্টা করছে, ঐ যে, বাড়ীর কাছেই এসে গেছে তারা।

সেতো নিশ্চয়। কিন্তু বড় রাস্তা ফেলে জঙ্গলের ভেতর ঢুকলে যে? কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ডাক্তার বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

লোকটা এক আকস্মিক ধাক্কায় থতমত খেয়ে গেল, তোতলা বনে গেল একেবারে, মাঝে একবার হাউমাউ করে কেঁদেও ফেললে।

আস্ত শয়তান!

অল্প দূরে একটা খোড়ো বাড়ীর জানলায় জ্বলছে মিটমিটে প্রদীপ। থমথমে বাড়ীটাকে দেখাচ্ছে ঠিক নিদ্রিত বনকপোতীর মত—হুঁ। ঐটেই তাহলে ঘাঁটি, আসল আড্ডা।

লোকটা একটা দুর্বোধ্য বিলাপের ভঙ্গীতে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে সঙ্গীদের কাছে।

কী করবেন, কি করতে পারেন তিনি? আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র আছে। তারপর ডাকাতের হাতে বন্দী।

গহর, ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে?

লোকটা তেমনি ত ত করে সঙ্কেত পাঠিয়ে চলেছে। হয়তো বলছে, ওটা কেউ নয়, বাঁশের গায়ে কালো হাঁড়ি।

কে কার কথা শোনে! ডাক্তারবাবু চীৎকার করে বলতে গেলেন, বুঝেছি গহর, বুঝেছি সব,—

আরো বলতে গেলেন, আমায় বেঁধে ফ্যালো, কিন্তু কিছুই লাভ হবে না শেষ পর্যন্ত, তা জানিয়ে রাখছি।

আরো হয়তো বলতে গেলেন.....

কিন্তু না, কিছুই বলতে হলো না। তাঁর গলাটা কেমন যেন চুপসে গেছে। তিনি বলবার জন্যে চেষ্টা করতে যাচ্ছেন এমন সময় দূরের প্রদীপজ্বলা বাড়ীটার একটা বিষম কান্নারোল পড়ে গেল। সেই কান্নার আওয়াজ উঠল অমনি লোকটা 'ওগো বাবাগো, আমার ছেলে কোথা গেলে গো' বলে ব্যাগ হ্যারিকেন সমেত ছুটল বাড়ীর দিকে। ঐ একটা দূরে ধরে কান্নার সুর বাড়তেই লাগল, ওগো তুমি কোথায় গেলে গো.....

ভাগ্যিস টর্চটা সঙ্গে ছিল। টলতে টলতে নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন তিনি।

এসেই শুয়ে পড়লেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ওগো, কেউ এলে বোলো ডাক্তারবাবু অসুস্থ।

আমি তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। তিনি আমার হাতখানা বুকের ওপর চেয়ে বললেন, ললিতা, মানুষের প্রতি মানুষের কেন এই অশ্রাব্য সন্দেহ? বললেন, নিজে সাবধানী হওয়ার অর্থই কি সকলকে কেবল সংশয়ের বিষদৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে যাওয়া?

আমি কোনো কথা বললুম না, শুধু তাঁর গরম কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

আস্তে আস্তে সমস্ত কথা বলতে লাগলেন, সমস্ত কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে তাঁর দুচোখ ভরে নিদ্রা নেমে এল।

ওদিকে বাইরের পুব আকাশ চিতার আগুনের মত লাল হয়ে উঠল।

স্মরণের ভূর্জ্জপত্রে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নিষ্ঠুর শীতের রাতে রিক্তের বেদন
আমার অন্তর মন করেছে কাতর,
পল্লীর বিজন প্রান্তে আত্মপরিজন
বসনভূষণ বিনা হয়েছে পাথর।
কোথা গৃহ আয়তনে পরম উৎসব!
বনে বনান্তরে কাঁপে শীতার্ত্ত পল্লব।
কোথা প্রেম! কোথা প্রীতি!
অশান্তির মরুশিখা চারিভিতে জ্বলে।
কুটীরের জীর্ণদ্বারে শ্যামাঙ্গিনী নারী
আমারে শুনায় তার মরমের কথা।
সে যেন শুকায়ে গেছে: দেয় অশ্রু বারি
সংসার অঙ্গণ মাঝে জীবনের লতা।
অতীতের ধূলিলিপ্ত কত চিহ্ন রেখা,
প্রাণের উৎসাহ ভরা কত চিত্রলেখা
মরুস্তরে অবলুপ্ত।
কালক্ষেত্রে মরণের জয়যাত্রা চলে!
তাপের সমতা শুষ্ক রক্তশূন্য দেহে
বুভুক্ষার অনশনে হোলো শক্তিলোপ,
দুর্য্যোগের আর্ত্তবায়ু দুঃখশ্রমী গেহে
এনেছে কম্পন আর ব্যাধির প্রকোপ।
নিরন্নের নবান্নের যত আশা সাধ—
আমারে হেরিতে হোলো বরিয়া বিষাদ।
পল্লীর পাষাণ গীতি
শুনেছি শৈশবে যাহা হারায়েছে রবি।
পঙ্কিল পল্বলে ঢাকা পল্লীগ্রামী ফল,
মানুষ কোথায় দেখে! আছে মেঘপাল।
সংসারের সরোবরে নাহি শতদল,
আছে শুধু বিষময় কণ্টক শৈবাল।
বসন্ত আসিবে জানি দক্ষিণা সমীরে
হেরিয়া চিতার ধূম দুঃখে যাবে ফিরে।
বসন্ত সেনার যুগ
স্মরণের ভূর্জ্জপত্রে রহে চির ছবি।
দুর্নৈতিক পন্থাচার পৌরুষহীনতা
পাপ ও পাপীর স্পর্দ্ধা হেরি দিকে দিকে,
অসহায় সমাজের বিষণ্ণ দীনতা
মেরুদণ্ডীত করিতেছে অসংখ্য ধনীকে।
কেহ আজ গাহে না'ক মানুষের গান,
স্বার্থ লাগি নিঃস্বার্থেরে করে অসম্মান,
ঈর্ষাদ্বন্দ্বে শক্তি লোভে
নীচতার অনিবার জয় পরাজয়ে।
আত্ম অবলোপ ব্রত করেছে গ্রহণ
রাষ্ট্র চালনার পথে ভ্রান্ত রাজনীতি:
লজ্জাহীন স্তুতিবাদে তার সমর্থন
সৌখীন বাস্তব সেবা দলীয় সম্প্রীতি!
আমার সম্মুখে আনে নিঃশব্দ ভ্রূকুটি
নেপথ্যে যেদিন জাগে বিঘ্ন বাধা টুটি!
আদর্শের প্রতিষ্ঠায়,
আজো যারে বর্ত্তমান ডাকে নি নির্ভয়ে!
আমি তার ছাতিয়ার রচে যাবো আজ
যে মোর দুর্ভাগা দেশে আনিবে স্বরাজ।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

'ভবঘুরে'

পূর্বানুবৃত্তি

(পাঁচ)

পরদিন ভোরে উঠে দেখা গেল—অসুস্থ বন্ধুটীর জ্বর ছেড়ে গেছে। কাল রাতে পথ্য হিসাবে সের খানেক কাঁচী গব্য ঘৃত আত্মসাৎ ক'রেছেন—কাজেই খুব বেশী দুর্বলও হয়ে পড়েন নি। অতএব আর দেরী কেন মিছে—লোটা কম্বল বেঁধে নিয়ে পথে নেমে পড়লাম।

আজ বোঝার ভার অনেক হাল্কা। যমুনোত্রী থেকে ফেরৎ পথে আবার এই পথ দিয়েই যেতে হবে। কাজেই এই কয়েকদিনের মতো আবশ্যক জিনিষপত্র নিয়ে লট-বহরের একটা মোট অংশ যমুনাচটির দোকানদারের হেফাজতে রেখে এসেছি অধিকাংশ যাত্রীই তাই ক'রে থাকেন। এদেশের লোকরাও খুব বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাসভঙ্গের কোন নজীর আজ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি। অবিশ্বাস এবং পরস্বাপহরণ—বর্ত্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ 'অবদান' বলা যেতে পারে। অবশ্য সভ্য জগতে এগুলি ভিন্ন নামে পরিচিত। প্রথমটীর নাম 'রাজনীতি'—এবং দ্বিতীয়টীর নাম দেওয়া হয়েছে—শোষণ। সেদিক থেকে পাহাড়ীরা এখনও ততটা সভ্য হ'য়ে উঠতে পারে নি। কাজেই তাদের সততার উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যেতে পারে—এক তাদের মাইলের জ্ঞানটুকু ছাড়া; ঐ খানটাতেই তাদের মাত্রাজ্ঞানের বড় অভাব।

চটী ছাড়িয়ে যমুনার তীরে এসে হাজির হলাম। এখানে যমুনাকে পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। উপল বাহিনী খর-স্রোতা নদীর উপর গোটা দুই লম্বা লম্বা গাছ ফেলে দিয়ে পুল বানান হয়েছে। লম্বায় খুব বেশী নয়—বড় জোর দশ বার হাত হবে। আমাদের বাংলা দেশের খালে বিলে এরকমটাতো হামেশাই দেখা যায়, কিন্তু তবু এতে আর তাতে অনেক তফাৎ। তাতে পা ফস্কালে—বড় জোড় জলে খানিকটা নাকানি চুবানি খেতে হবে না হয় খানিকটা পাঁক ঘাটতে হবে। তবু আশা থাকে যে হয়তো বা একটা হাত বা একটা ঠ্যাং ছেঁটে ফেলতে হ'লে দৈহিক প্রাণটুকু 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতেই শয়ান' থাকবে। কিন্তু এখানে একবার পদস্খলন হ'লেও চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে। কঠিন প্রস্তরের আলিঙ্গনের চাপে হাড়গোড় গুলো ভেঙ্গে গিয়ে কাঠামোটা যদিও বা বাঁচে—দুর্বার স্রোত তাকেও যে কোথায় নিয়ে কোন পাথরের গায় আছাড় দেবে—তার কোন স্থিরতা নাই। যাই হোক কোন রকমে রাম নাম জপতে জপতে ওপারে গিয়ে পৌছালাম। দুর্ঘটনা যে কিছু ঘটে নি—তা বলাই বাহুল্য—কারণ তা হ'লে তো এতদিনে চিত্রগুপ্তের দরবারেই ভ্রমণ কাহিনী শুনাতাম।

পুল পেরিয়ে এ পাশের পথে এসে পড়লাম। আর বাঁধা পথ নাই। অল্প পরিসর—প্রস্তরময় পথ; দীর্ঘদিনের মেরামতের অভাবে তাও আবার অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। মাটী বা সুরকীর শাসন বিমুক্ত হ'য়ে পাথরের নুড়িগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সময় সুযোগমত তারা যাত্রীদের গায়ে দাঁত বসাতে কসুর করে না। ধন্যবাদ—বাটা কোম্পানীর কেড্‌স্‌কে—তারই কৃপায় পায়ের তলাটা এখনও অক্ষত থেকে গেছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। এখন যে পথে আমরা চলেছি—তা সরকারী পথ নয়। ডাংডাল গাঁও ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে সিমলীতেই তা শেষ হ'য়েছে। সিমলীর পর যমুনোত্রী পর্য্যন্ত পথ সাধু কালী কমলীওয়ালার ঐকান্তিক চেষ্টায় গোয়েঙ্কা প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় শেঠের টাকায় তৈরী হ'য়েছিল। ধর্মশালা হিসাবে যমুনোত্রীর প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই।

যমুনোত্রীর পথ সরকার তৈরী করেন নি, মেরামতের দায়িত্বও তাঁরা ঘাড়ে চাপান নি। সাধু কালী কমলী-ওয়ালাও বহুদিন গতাসু হ'য়েছেন; তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা যাঁরা আছেন—তাঁরা উত্তরাপথে তাঁরই পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত;—এই পথকে মেরামত ক'রবার ফুরসুৎ বা সামর্থ্য তাঁদের নাই। কাজেই এখন এটা No

man's property হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরাও বিশেষ এ পথে পা বাড়ান না। যাঁরা সে দুঃসাহসিকতা মনে স্থান দেন—তাঁদের মধ্যে দু'চার জন ধনী শেঠ হয়ত বা আছেন—কিন্তু তাঁরা তো কাঁধে চড়ে হাঁটেন—মাটীতে পা ফেলবার তাঁদের প্রয়োজনটাই বা কি? বাকী যাঁরা যান—তাঁরা হয়ত পদে পদে প্রস্তরের ঘর্ষণ অনুভব করেন—কিন্তু পাথরের দাঁত ভেঙে দিতে হ'লে মনের বা চাঁদের যে সামর্থ্য দরকার তা তাঁদের নেই।

পথের পাশে দু' একটা ঘর দেখা যাচ্ছে—পাথর দিয়ে গড়া পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া, এদেশের অধিবাসীদের যা কিছু প্রয়োজন—তা তারা পাহাড়ের বুক থেকেই সংগ্রহ ক'রে নেয়। তাই মাটীর টালি বানিয়ে তাকে পোড়াবার জন্য কয়লার পারমিটের প্রয়োজনে ছুটাছুটী করতে হয় না। স্লেট পাথরের এক একটা slab দিয়ে চমৎকার টালি বানিয়ে নিয়েছে। গান্ধীজী তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সভ্যতার রঙীন নেশায় মাতোয়ারা সমতলবাসীদের মধ্যে; এবং সেজন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে গেছেন। সেই নিষ্ফল সময় এবং ব্যর্থ পরিশ্রমের সামান্য অংশ এদের পিছনে ব্যয় ক'রলে বোধ হয় তাঁকে ব্যর্থতার মধ্যে জীবন উৎসর্গ ক'রতে হ'ত না। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলোক এখনো এদেশের 'অন্ধকার'কে সম্পূর্ণ বিনাশ ক'রতে পারে নি—পূর্বাশার তলে তার অরুণ আভা দেখা দিয়েছে মাত্র। সভ্য মানুষের সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের দিশে হারান তাগিদ আজও এদেরকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পারে নি—যদিও দিকে দিকে তার আভাষ দেখা দিয়েছে। তাই মনে হয় নিজের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আজও হয়ত এরা সন্তুষ্ট থাকতে পারত—বিলাস সামগ্রীর মন ভুলানো প্রয়োজনে অন্তের দ্বারস্থ হ'ত না।

তত্ত্বচিন্তা ছেড়ে দিয়ে আবার পথের দিকে মন দিলাম। পথ ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হ'য়ে আসছে। যমুনার ধারাও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে চলেছে। পথের ধারে অন্যান্য গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটা ঘন ডালিমের গাছ দেখা যাচ্ছে। তাতে সাধারণ ডালিম ফুলের মতোই ফুল ধরেছে—ফলটা কি রকম হবে কে জানে? গোলাপ বীথি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। ফুলগুলো দেখতে এক একটা আমাদের দেশের টগর ফুলের মতো—কোন আড়ম্বর নাই—নাই কোন বর্ণবিন্যাস—কিন্তু সব কিছু পুষিয়ে নিয়েছে প্রাচুর্য্যে। এক একটা গোলাপ ঝাড় ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সেইখানেই তার সৌন্দর্য্য। সালঙ্কারা, উদ্ভিন্ন যৌবনা, রিক্তা রূপবিলাসিনীর চেয়ে নিরাভরণা সন্তানবতী সৌন্দর্য্য সুষমায় অনেক মহীয়সী।

পথে চলতে চলতে একটা গ্রামের মধ্যে এসে পড়লাম। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই কাঠের। দু'একটা মাটীর—মানে মাটি আর পাথর মেশান—বাড়ীও দেখা যাচ্ছে। তবে তার সংখ্যা খুব কম। শীতকালীন তুষারপাতের মধ্যে মাটীর বাড়ীর স্থায়িত্ব খুববেশী দিন নয় ব'লেই বোধ হয় কাঠের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গ্রামের ঠাকুর ঘর দেখলাম—ছোট্ট একটী মন্দির—পাথর দিয়ে গাঁথা— তার মধ্যে মূর্তিও আছে—কিন্তু কি মূর্তি বুঝতে পারলাম না। ভীতি থেকেই নাকি মানুষের মনে ভগবান বা দেবতার সম্বন্ধে প্রথম কল্পনার ছায়াপাত হ'য়েছিল। তাই বোধ হয় আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের কল্পনায় দেবতারা নানান রকমের কিম্ভূতকিমাকার রূপ পেয়েছিলেন। পরবর্তী যুগে সেই ধারণা কিছুটা সংস্কৃত কিছুটা পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে—কোথাও কোথাও বা নিরাকার ব্রহ্ম পর্য্যন্ত কল্পনা এগিয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের সেই ধারণা একেবারে লোপ পায় নি। কারণ পরম কারুনিক, সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের পাশাপাশি সংহাররূপী রুদ্রকে স্থান দিতে হয়েছে;—স্থান দিতে হয়েছে ভগবানের অকল্যাণকারী রূপকে। অথবা বার্ণাড শ'র অনুকরণীয় ভাষায় বল'তে গেলে—"belief in God was impossible to any thoughtful person without belief in Devil as well"—শয়তানকে বিশ্বাস না ক'রে ভগবানে বিশ্বাস—কোন চিন্তাশীল লোকের

পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বোধ হয় রুদ্ররূপী ভগবানকে নানা নাম দিয়ে নানা অদ্ভুত বেশে সাজান হয়েছে—যেমন আমাদের মা কালী, শীতলা, ওলা বিবি ইত্যাদি।

দেবতার এই কিম্ভূতকিমাকার রূপ সম্বন্ধে আরও একটা কারণ আছে মনে হয়। দেবতাকে ঘিরে একটা "holy horror" সৃষ্টি করতে না পারলে বা তাঁকে খানিকটা ভীতিপ্রদ রূপ দিতে না পারলে সাধারণ মানুষকে বাগে আনা সহজ হবে না; আর দেবতাকে ভাঙিয়ে যাদের পেটের সংস্থান ক'রতে হয়—বা অন্যের উপর অখণ্ড আধিপত্য চালাবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রতে হয়—তাদের সুবিধা হবে না।

অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই—সে ইচ্ছাও নাই—কারণ প্রশ্নটি এত সূক্ষ্ম—যে আছে কি নাই—বোঝা যায় না। আর এই পবিত্র দেবভূমিতে বাস ক'রে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে এক কথায় নস্যাৎ ক'রে দোব—এত বড় কলমের জোর আমার নাই—সে দুরাশাও মনে স্থান দিই না।

যাই হোক—গ্রামের ঠাকুরটীকে দূর থেকে দর্শন ক'রেই মানে মানে স'রে পড়লাম। পথটা গ্রামের প্রান্তে যমুনার ধারে এসে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেছে। সামনে দেখলাম পূর্বের মতই একটা পুল—মানে গোটা দুই সরু, লম্বা গাছ পাতা। নদীর ওপাশটাও দেখলাম ধ্বসে পড়ে গেছে—রাস্তার চিহ্নমাত্র নাই।

নদীর তীরে বসে মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ সারছি—এমন সময় দেখলাম—ওপাশ থেকে জন কয়েক স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক নেমে আসছেন। দেখে অনেকটা বাঙালী ব'লেই মনে হ'ল। কিন্তু ভারতবর্ষে স্যুটটা আজ-কাল আর বাঙালীদেরই একচেটিয়া নয়—অন্যান্য প্রদেশের লোকরাও এই সিংহচর্ম ধারণে হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। কাজেই চুপ ক'রে বসে রইলাম। একটু পরে তাঁরা নদী পেরিয়ে এপারে এলেন। আশংকা অমূলক—দূর থেকে কথাবার্তা শুনেই বুঝলাম—এঁরা বাঙালীই। একটু আলাপ করলাম। এঁরা কলিকাতা থেকে এসেছেন। যমুনোত্রী সেরেই সোজা ফিরে যাবেন। প্রায় সকলেরই উপজীবিকা চাকুরী। সেটা পিছন থেকে টান মারছে। ছুটীর মেয়াদ বেশীদিন নেই—কাজেই তাড়াতাড়ি ফিরছেন।

'দেশভাইয়া'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথ ধ'রলাম। এ পুলটাও কোনরকমে পেরিয়ে এলাম। খানিকটা আঁচড়ে কামড়ে উপরে উঠে একটা সরু রাস্তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা গেল। সেইটা ধ'রেই এগিয়ে চললাম। এবারে পথটা প্রায় সমতল। সমতলের আগে একটা 'প্রায়' যোগ ক'রতে হ'ল—কারণ পাহাড়িয়া দেশে একেবারে সমতল ব'লে কোন জায়গাই নাই।

পথের পাশে পাশে এক একটা গাঁও পড়ে। গাঁয়ের ছায়াঘেরা পথ সুদূর বাংলার কথা মনে করিয়ে দেয়। একটা জায়গায় রাস্তার পাশেই দেখলাম চমৎকার নটে শাকের ক্ষেত। অনেকদিন পরে দেশের একটা শাক দেখে খুব আনন্দ হ'ল। পথ দিয়ে একটা পাহাড়ী বাচ্চা গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে জিগ্যেস করলাম—

"এ শাক কো ক্যা বোলতা?"

সে কিড়মিড় ক'রে কি ব'লল বোঝা গেল না। পূর্বেই বলেছি এদেশের মাতৃভাষা ঠিক হিন্দী নয়। তবে বয়স্করা প্রায় সবাই হিন্দি বোঝে এবং অধিকাংশ লোকই বলতে পারে। কিন্তু আমরা যে মানবকটিকে সামনে পেয়েছি—তার বিদ্যা এখনও ততদূর অগ্রসর হয়নি। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলুম না যে আমরা কিছু শাক কিনতে চাই; শেষে পকেট থেকে পয়সা বের ক'রে দেখাতে তবে সে বুঝল। তাম্রচক্রের মহিমায় সম্ভব হয় না—এমন জিনিষ বোধ হয় পৃথিবীতে নাই!

আমাদের বাচ্চাটীও চট্ ক'রে আমাদের উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলল। তাড়াতাড়ি পাশেরই একটা ক্ষেত থেকে—তাদের বা কার কে জানে—কিছু শাক তুলে দিয়ে নগদ দু'টী গণ্ডা পয়সা [redacted] গুজে সে মনের আনন্দে চলে গেল।

খানিকটা এগিয়ে দেখলাম—নটে শাকের ক্ষেত একটা দুটো নয়, ক্ষেতের পর ক্ষেতে নটে শাকের চাষ করা হয়েছে। এত শাক নিশ্চয় তরকারী রেঁধে খাওয়ার জন্য নয়। পরে শুনেছি—এরা শাকের বীচি ভেজে নিয়ে তার থেকে গুড়ো ক'রে আটা জাতীয় জিনিষ তৈরী ক'রে নেয়। তাই থেকে রুটী তৈরী ক'রে খায়।

শুধু শাক নয়—পথে আলুও মিলল। হঠাৎ দেখলাম একটী মেয়ে কোঁচড়ে ক'রে আলু নিয়ে যাচ্ছে। সে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল সে আলু বিক্রী ক'রতে চায়। দাম দেখলাম—বেশ সস্তা। এত সস্তা আলু হিমালয়ে পা দেওয়ার পর থেকে আর দেখি নি। তার সব আলুই কিনে নিলাম।

একটু পরে হনুমান চটীতে এসে পৌঁছালাম। এখানে হনুমান গঙ্গা ব'লে একটী ছোট নদী যমুনার ধারার সঙ্গে এসে মিলেছে। নদীর থেকে নাম ধার ক'রে চটীটীরও নাম দেওয়া হ'য়েছে হনুমান চটী। এই খানেই আমাদের সকালে বিশ্রাম করার কথা। কাজেই বিতলের কক্ষ অধিকার ক'রে আস্তানা পেতে বসলাম।

বিকালে কিন্তু আর যাওয়া হ'ল না। যমুনোত্রী এখান থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে। আমাদের ইচ্ছা ছিল—এটুকু পথ বিকালেই মেরে দোব। কিন্তু যমুনোত্রী থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের দু'জন বাঙালী সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণনাথের একদল পাণ্ডা বললেন—আজকে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ পথটা খুবই খারাপ। তাছাড়া অনেক খানি খাড়া চড়াই উঠতে হবে—যমুনোত্রী পৌঁছাতে রাত হ'য়ে যাবে—পথে আর কোন চটীও মিলবে না। কাজেই মহাজনদের বাক্য মাথায় ক'রে নিয়ে সেদিনটা হনুমান চটীতে থেকে গেলাম।

মাছির উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা ক'রে খানিকটা বিশ্রাম করবার পর বাইরে এসে দেখি—পাশাপাশি গ্রাম থেকে অনেকগুলি মেয়ে এসে জড় হ'য়েছে। এদেশের মেয়েরা অপরিষ্কার—কিন্তু খুব সুন্দরী। পাহাড়ী ফুলের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলতে পারে—দেখতে খুব সুন্দর—কিন্তু না আছে সুগন্ধ—না আছে বাইরের চাকচিক্য। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে—যা বাস্তবিকই চেয়ে দেখবার মতো। এমন তিলফুল নাসা, এমন টানাটানা চোখ, এমন দুধে আলতা রং বড় একটা মিলে না। এদের দেখেই বলা চলে—

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে কামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা-নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণী ভারাদলস গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং।
যা তত্র স্যাদ্ যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়েই বোধ হয় প্রাচীন কবিরা পর্বত কন্দর নিবাসী যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরের কল্পনা ক'রে-ছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে অতি প্রাচুর্যের কল্পনা করেছেন—যেখানে আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রুপাত হয় না, পক্ষজরজাত তাপ ভিন্ন অন্য কোন দুঃখ নাই, প্রণয় কলহ ছাড়া বিচ্ছেদ নাই, এবং যৌবন ভিন্ন বয়স নাই—এসব বোধ হয় কবির নিছক কল্পনাই। এই অতুলনীয় সৌন্দর্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্যই বোধ হয় তাঁরা স্বয়ং ধনরাজকেই এদের উপর যাতায়রির ভার দিয়েছেন।

যাক্, কবিদের নিয়ে বেশী টানাটানি ক'রে লাভ নেই—কারণ তাঁরা যে রাজ্যে বিচরণ করেন—সেখানে আমাদের মতো 'অরসিক'দের প্রবেশাধিকার নাই। অগত্যা যমুনোত্রীর পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। পাহাড়টা এবার অনেক কাছে এসে গেছে। মনে হচ্ছে—রাশি রাশি উজ্জ্বল সাদা ফুলে পাহাড়ের চূড়াটা ঢাকা পড়েছে। ফুলগুলো পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে—তারই ফাঁকে ফাঁকে নেড়া ধূসর পাহাড় উঁকিঝুঁকি মারছে।

রাতে বেশ শীত পড়ল। আমাদের দেশের পৌষ মাসের হাড় কাঁপুনে শীতও এর কাছে হার মেনে যাবে। এ শীতে হাড় তো দূরের কথা—মজ্জাতেও কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়, যে ক'টা গরম জামা কাপড় ছিল সবগুলো চড়িয়ে ঘরের ভিতর মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে বসে বেশ গল্প করছিলাম; কিন্তু হঠাৎ তাড়া পড়ল যে খেতে হবে। শীতের দোহাই দিয়েও ওটাকে বাদ দেওয়া যায় না—

কাজেই শীতকে উপেক্ষা ক'রেই বাইরে বেরোতে হ'ল।

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে যা দেখলাম—তাতে কিন্তু মজুরী পুষিয়েও কিছু উপরি পাওনা পেয়ে গেলাম। চাঁদনী রাতের পার্বত্য সৌন্দর্য এর আগে কখনও দেখি নি। মাথার উপরে স্তম্ভিত আকাশ দ্বাদশীর চাঁদের নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই হাসিতে ঈর্ষান্বিত হ'য়েই যেন কয়েকটা তারা করুণ নিষ্প্রভ চোখ মেলে মিট মিট ক'রে চেয়ে আছে—পৃথিবীর দিকে। এদিকে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আনন্দের ফোয়ার বইছে। পাহাড়ী গাছ গুলোর উপর চাঁদের আলো পড়ে সেখানে আলোছায়ার খেলা সুরু হ'য়েছে, স্নিগ্ধ আলোয় মায়ালোকে মাঝখানের নিস্তব্ধ ঘরগুলো যেন স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছে, সামনের নদীটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা গলিত রূপার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, চাঁদের কিরণ-প্রতিফলিত শুভ্র ফেনপুঞ্জ কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠেছে।

বেশ দেখছিলাম। হঠাৎ একটা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস এসে জানিয়ে দিল যে—কম্বলোকে বেশীক্ষণ বাস করা চলবে না। কাজেই পিছন থেকে পবনদেবের তাড়া পেয়ে চন্দ্রদেবকে রেহাই দিলাম। তাড়াতাড়ি বিবরে ফিরে এসে বিছানার নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

পরের দিন বেশ ভোরে উঠেই পথে নেমে পড়লাম। পূর্বগামীদের উপদেশমত মোটা রকমের কিছু খাবার—মানে পরোটা আর চিনি সঙ্গে নিয়েছি—কারণ তাঁরা বলে দিয়েছিলেন যে খুব তাড়াতাড়ি গেলেও দুপুরের আগে যমুনোত্রী পৌঁছাতে পারব না।

পথে নেমে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল—সামনের পাহাড়গুলো। পূর্বাচলে সুষুপ্তিমগ্না তখনও ঘুম থেকে জাগেন নি—তবে আড়মোড়া ভাঙ্গছেন—আকাশে তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ আভায় সামনের বরফের পাহাড়টা দেখে মনে হচ্ছে—যেন চূড়া থেকে গলিত রূপার স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। নীচে সবুজের রেখা ছাড়িয়ে দুপাশে ছোটো বড়ো পাহাড়ের কালো উদ্ধত মাথা আকাশের নীলিমাকে চুম্বন করছে—তারই মাঝখানে জেগে উঠেছে—তুষার কিরিটী পর্বতের চূড়া। ঐ বরফের পাহাড়টাই যমুনোত্রী—যমুনার উৎসমুখ। আজই ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারব। উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চললাম।

পথ আরও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে। কোন রকমে অতি কষ্টে একজন লোক চলতে পারে। তাও আবার মাঝে মাঝে একেবারে পথের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে। দু' একটা জায়গা এমন আছে—সেখান দিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। পৈতৃক প্রাণটুকু হাতে নিয়ে পাহাড়ীদের সাহায্যে পাথর এবং গাছের শিকড় আশ্রয় ক'রে কোন রকমে পারাপার করতে হয়।

[ক্রমশঃ]

প্রাচীন বাংলা গান

শ্রীজয়দেব রায় এম. এ, বি. কম্, বি. এস্. সি

বাংলা দেশের গানের আধুনিক যুগের সৃষ্টি হইয়াছে রামনিধি গুপ্ত হইতে। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু পশ্চিম হইতে শোরীর টপ্পার অনুকরণে যে বাংলা গানের সৃষ্টি করিলেন, তাহারই ভিত্তিতে আজ আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি হইয়াছে, নিধুবাবুর গানেই বাংলা দেশের সঙ্গীত রসিকগণ এক রকম প্রথম হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ রাগ রাগিণীর রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন।

হিন্দুস্থানী গানের অবোধ্য ভাষা বহুদিন বঙ্গভাষী-গণের সুর রস গ্রহণের বাধা স্বরূপ ছিল; নিধুবাবুই প্রথম বাংলার চিরাচরিত সুমধুর গানের ভাষা 'ওস্তাদী গানে ব্যবহার করিতে সাহস করিলেন। তাঁহার যে কোন বাংলা গান আজিকার আধুনিক বাংলা গানেরই ভাষা ও ভাবের সমতুল্য, তবে সুরের গঠনে তাহার কৌলিন্য হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবান্বিত। বাংলা দেশের গান অবশ্য চিরকালই কাব্যভাব প্রধান, তবে বাংলা গানের সুর ছিল লৌকিক ধারায় রচিত; কীর্ত্তন গান তাহার গাহিবার প্রথায় সম্পূর্ণ দেশীয়; যাত্রা, পাঁচালী, কবির গানেও উচ্চাঙ্গ সুর কোনদিনই ব্যবহৃত হয় নাই। নিধুবাবুর গানও কাব্যাংশে সুন্দর, কিন্তু তাঁহার 'টপ্পা ভঙ্গিমা' কাব্যগীতিকে রাগপ্রধান গানে পরিণত করিতে পারিয়াছে।

সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন হইতে নিধুবাবুর জীবনে বৈচিত্র্য ছিল। ১১৪৮ সালে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর অন্তর্গত চাপতা গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই প্রথম বাঙ্গালীর জীবনে ইংরাজী শিক্ষা এবং 'সভ্যতার প্রভাব পড়িতে সুরু করিয়াছিল। বাঙ্গালীরা অল্প ইংরাজী শিখিলেই রাজ সরকারে বড় কাজ পাইত এবং এইভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিধুবাবু কলিকাতায় ইংরাজী স্কুলে পড়িয়াছিলেন, সেই সূত্রে যুক্তপ্রদেশের ছাপরা কালেক্টরীতে কেরাণীর কাজ পাইলেন। ১২৩৫ সালে ২১শে চৈত্র প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল হইতেই নিধুবাবুর গানের বিষয় অনুরাগ ছিল। সুকণ্ঠের তিনি অধিকারী ছিলেন। পরে এই পশ্চিমেই দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে তাঁহার সুর প্রতিভার উন্মেষ হয়। ছাপরা ছিল সেই সময়ে কালোয়াতী গানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র; সেইখানে এবং যুক্তপ্রদেশের নানা অঞ্চলে নিধুবাবুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সকল গুণীগণের নিকট খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল প্রভৃতি গান নিধুবাবু সযত্নে শিখিয়াছিলেন। পরে দেশে ফিরিয়া তাঁহাদেরই সুর অনুকরণে তাঁহার নিজস্ব গানের জন্মদান করেন।

নিধুবাবুর গানের সেই সময়ের প্রচলিত নাম 'আখড়াই গান' অর্থাৎ ওস্তাদী গান। এইগুলি নরনারীর বিরহ-মিলনের প্রেম গানই, কিন্তু সাধারণ প্রেমগান, কবিগান বা খেউড় হইতে শ্লীলতায় বহু মার্জিত ছিল, সুতরাং অতি সহজেই নিধুবাবুর গান অভিজাত সমাজে আসন পাইল। নিম্নের অভিমত দুইটি বাংলা ভাষার অন্যতম আদি ধারাবাহক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত!—

"১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালী মহাশয়দিগের মধ্যে 'আখড়াই' গাহনায় অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুই চন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য (!) 'আখড়াই' বিষয়ে অধিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়। তিনি ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন। কিন্তু নিধুবাবু তাঁহার পর আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইঁহার কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।"

"১২১২ কিম্বা ১২১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। তাহার একপক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ

সমুদায় ভদ্র সন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয় দলে 'বাদী' হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষ হইতে শ্রীরাম দাস এবং ৺কুলই চন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাহাতে শ্রীরাম দাস প্রভৃতি ওস্তানী বিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন, প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুল সেনের উপর ভারার্পণ হইল।"

নিধুবাবুর দুইটি প্রসিদ্ধ গানের উল্লেখ করি—

(১) প্রাণ তুমি বুঝিলে না আমার বাসনা
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তা বোঝ না॥
হৃদয় সরোজে থাক মোর দুঃখ নাহি দেখ
প্রাণ গেলে অদয়েতে, কি গুণ বল না॥

(২) মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমায় সাধনা করি সাধ না পুরিল॥
সাধিয়ে আপন কাজ,
এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিবাদ হইল॥

নিধুবাবুর টপ্পা প্রসঙ্গে আরও একজন কবির নাম করিতে হয়, তিনি শ্রীধর কথক। তাঁহার গানের রীতি ও সুর প্রায় সবই নিধুবাবুর অনুকরণে রচিত, ফলে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক প্রসিদ্ধ গান 'নিধুবাবুর' নামেই চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য বয়স হইতে সঙ্গীতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার নানা স্থলে শ্রীধর ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে যাইতেন; পরে কথকতাকেই তিনি উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তাঁহার গানের উপর নিধুবাবুর অত্যধিক প্রভাব পড়িয়াছিল; কিন্তু নিধুবাবুর অপেক্ষা তাঁহার কবি প্রতিভা যে উচ্চ শ্রেণীর ছিল, সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই। "তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় সরিমিঞা; তাঁহার রসময় ভাবময় টপ্পা, অনেকের মুখে শোনা যায়; কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পার রচিয়তা কে? যিনি গাহিতে জানেন তাঁহার মুখে শ্রীধরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাঁহারও মুখে শুনি। যিনি গাহিতে জানেন, তিনি ভাবে সুরে বিভোর হইয়া গান; যিনি গাহিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব সুখে গাহিয়া কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন। শ্রীধর কথকের যে টপ্পা আছে কেহ কেহ তাহা জানিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে শ্যামা বিষয়ে অপূর্ব্ব ভাবময় গানের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকই জানেন।"

শ্রীধরের যে বিখ্যাত গানটি সকলেই নিধুবাবুর বলিয়া ভুল করেন—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে!
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই—আমি দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিলে।"

এই গানটির ভাবের ধারায় গান আজও বাংলার কবিগণ গাহিয়া আসিতেছেন! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যুগে এই সুরেই গাহিয়াছেন—

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি, প্রাণে কেন বরষিল॥
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল।"
(কালাংড়া খেমটা)

শ্রীধর কথক রাগপ্রধান বাংলা গানের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁহার বহু গানে শুদ্ধ রাগ রাগিণী সুন্দর অনুসরণ করা হইয়াছে। তাঁহার একটী রাগসঙ্গীত ত্রিতাল ঠুংরীতে রচিত—

পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে ?
ছিল না,—রবে না,—প্রেম ! পরে বিচ্ছেদ-কারণে !
পীরিতের রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম,
আপনাতে হলে প্রেম—কি কাজ করে দুজনে ?
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয় ?
বারংবার শ্রুতি কয়,—জনশ্রুতিতে ও জানে,
নিজ সহ প্রেম হলে, কেউ তারে কিছু না বলে,
ভালে না কলঙ্ক জলে, পোড়ে না মন আগুনে।"

নিধুবাবু, শ্রীধর ব্যতীত বাংলা টপ্পা ভঙ্গিমার গানের ক্রমবিকাশে আরও একজন যাঁহার নাম করিতে হয়, তিনি পাঁচালীগানের দাশরথি রায়। ১২১২ সালে কাটোয়ার অন্তর্গত 'বাঁধমুড়া' গ্রামে আমাদের গ্রাম কড়ুয়ের সন্নিকটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের জীবনের সঙ্গে দাশুরায়ের জীবনের বিশেষ মিল আছে। কবি অবশ্য সর্ব্বত্র শ্লীলতার সীমার মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয় গানকে আবদ্ধ রাখেন নাই ! প্রথম বয়সে 'আঁকা বাঈ' নামক গায়িকার গানের বাঁধনদার ছিলেন। তাঁহার পাঁচালী গানের বিশেষ নাম ছিল ; একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায়—

"দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিবার প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। চারি-পাঁচ সহস্র কি দশ সহস্র লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পাঁচালী শুনিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে অবস্থিত, মধ্যস্থলে গায়ক দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিন বার করিয়া উচ্চারণ করিতেন, তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃগণের দিকে চাহিয়া একবার এবং দুই পার্শ্বে কোণাকোণি চাহিয়া দুইবার। ইহাতে সকল দিকের সকল লোকই উত্তমরূপে শুনিতে পাইতেন। আসরে গাহিতে বসিয়া দাশুরায় সময় বিশেষে পাঁচালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন।"

দাশুরায় টপ্পা গানে অবশ্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই ! তাঁহার একটি গানের উল্লেখ করি—

মন্ দিয়ে অরসিকে মরি !
মরিমরি মনাগুনে ঘুমরি (মন+আগুনে)
যায় বুঝি যায় গো।
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে—
বিরলে কাঁদি গুন্ গুন্ রবে সহচরি ॥
অবলারে করে ধারা, সই !
মজালে মজিব ব'লে সে মজিল কৈ ?
যে আমার, যে কাঁদায়,—
প্রেমদায়—একি দায়
তথাপি তাহারে কেন মন চায়, কি করি ?
(নলিনীভ্রমর পালা), সুরতান : কাওয়ালি)

দাশরথীর যে গানটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সেইটীর ন্যায় সূক্ষ্ম সুরবৈচিত্র্য খুব অল্প বাংলা গানেই আছে। জয়জয়ন্তী রাগিণীতে ঝাঁপতালে রচিত—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥
(রাধাকেও সতী বলা হইয়াছে !)
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার ঘর ঘর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় বংস চয়ে, ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই বিনতি ॥
প্রেমরূপ যমুনা কূলে আশা বংশী বট মূলে,
সুধাদ ভাবে সদয় ভাবে, সতত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে এ দাশরথী ॥

প্রাচীন বাংলা গানে আরও একজন সুরগুরু কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ! তবে তিনিও রামপ্রসাদের ন্যায় সাধক কবি ছিলেন, রামপ্রসাদের সঙ্গীত ধারার তিনি ছিলেন সার্থক অনুকারক ! ১২১৬ সালে অম্বিকা-কালনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার গুণ-গ্রাহী ছিলেন ; এবং তাঁহারই আশ্রয়ে কমলাকান্ত বাস করিতেন। রামপ্রসাদের ন্যায় তাঁহার সাধক জীবনের বহু গল্প প্রচলিত আছে। তিনিও তাঁহার শ্যামা সঙ্গীতে বিশুদ্ধ রাগিণী ব্যবহার করিতেন, তবে প্রসাদী সুরের

স্বগোত্রে তাঁহার গীতিরীতি আজ রূপান্তরিত হইয়াছে।

শঙ্কর মনো-মোহিনী তারা, ত্রাণ কারিণী,
ত্রিভুবন অম্বা নিবারিণী, ভবজননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী,
ব্যাস ভাব খলু হাস প্রকাশিনী।
কমলাকান্ত হৃদি কমল তিমির হর বরদায়িনী॥

বৃক্ষাক্ষরে ছন্দবৈচিত্র অপূর্ব, সুর আলেয়া রাগিণী এবং ছন্দে দুইটি তাল অবলম্বন করা হইয়াছে;—কাওয়ালী এবং আড়াঠেকা!

প্রাচীন বাংলা গানের প্রধান অবলম্বন ছিল কীর্তন এবং 'কবির গান'। আমি এই প্রবন্ধে যে সকল কবির গানের আলোচনা করিতেছি, সেইগুলি ঐ দুই ধারার বহির্ভূত বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের ধারায় রচিত। কীর্তনের ধারায় গোবিন্দ অধিকারী রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি অনেকেই সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন, কবির গানে রাম বসু, হরু ঠাকুর, ন্যাণ্টনী সাহেব, ভোলা ময়রা, রাসু ও নৃসিংহ, ভবানী বেণে প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'টপ কীর্তন' নামক এক শ্রেণীর ঢিমা লয়ের কীর্তনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন মোহন দাস বৈরাগীর শিষ্য মধুসূদন কিন্নর, তাঁহার ধারায় রূপচাঁদ অধিকারী বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাংলা গানে আরও দুইজনের নাম উল্লেখ যোগ্য; তাঁহারা নীলকণ্ঠ অধিকারী এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী!

কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ছিলেন; নদীয়া জেলায় কবির জন্ম। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন বিলাস'। তবে সঙ্গীতের ধারায় তিনি গোবিন্দ অধিকারীর অনুকারক মাত্র। তাঁহার একটী গান—

"অমল কমল যাসনে গো যাসনে!
কত কণ্টক আছে গো বনে,—
ছুটিয়ে ছুটি চরণ গো!
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে, গহন কানন মাঝে
কমল-পদে দংশে পাছে গো!
হল,—নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
যাসনে রাধে এত দ্রুত গো!"

নীলকণ্ঠ অধিকারী বীরভূম জেলায় জয়দেবের তীর্থের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার একটী যাত্রার দল ছিল। কবি এবং সঙ্গীত রচয়িতা রূপে এই যাত্রা দলের সূত্রেই তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 'সুরট মল্লার' রাগিণীতে রচিত তাঁহার প্রসিদ্ধ একটী গান হইতেই সুরচাতুর্য্য অনুমান করা যায়—

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম।
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন
(হরি প্রেমরসে মজে)॥

রাগসঙ্গীতের ধারায় রচিত প্রাচীন বাংলা গানের অধিকাংশই নবপ্রবর্তিত 'টপ্পা' গীতিরীতিতে গাওয়া হইত! হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ খেয়াল অথবা ঠুংরি রীতি তখনও বাংলা গানে প্রচলিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা গানে ধ্রুপদ রীতির বহুল প্রচার করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে খেয়ালের প্রভাব সর্বজন সম্মত এবং ঠুংরি গানের প্রথম সৃষ্টি করেন কবি অতুল প্রসাদ সেন। আমার মতে অতুল প্রসাদই আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ composer!

টপ্পা প্রধানতঃ প্রেমের গান। হিন্দু সঙ্গীতের লেখক উইলার্ড সাহেবের মতানুসারে পাঞ্জাব অঞ্চলে উটচালক দিগের গ্রাম্য গান হইতেই গোলাম নবী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এই গীতিভঙ্গির প্রবর্তনা করেন।

গত শতাব্দীতে রচিত "সঙ্গীত সার" ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় টপ্পা গানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"কালের কথা কিছুই বলা যায় না, যে গান পূর্ব্বে উষ্ট্র চালকদের মাত্র মনোরঞ্জন করিত সেই সকল গীত এক্ষণে ভারতবর্ষবাসি সর্ব্বলোকের আহ্লাদবর্দ্ধক হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক, উষ্ট্রপালকেরা সর্ব্বদা টপ্পা গান করিত বলিয়া, ইহাকে হেয় করা বিধেয় নহে, যেহেতু মুক্তামালা বানরের গলায় থাকিলে কি মুক্তার গৌরব ভ্রষ্ট হয়?"

টপ্পাগানের জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী একটী গল্প বলিয়াছেন—

"এ সম্বন্ধেও এই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সদা-রঙ্গের এক সাকরেদ গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে খেয়ালের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁরই ছেলে গোলাম নবী, শোরী নামক এক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে উদ্দেশ করে যে সব গান রচনা করেন, তারই নাম টপ্পা। শোরীর টপ্পা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত সেটা ঠিক; শোরীর নাম শেষে উল্লিখিত আছে, তাতে অনেকের মনে হয় যে শোরী মিঞাই বুঝি রচিয়তা।"

শোরী'র টপ্পার ন্যায় প্রাচীন বাংলার প্রায় সব গানই অতিরিক্ত তানযুক্ত। টপ্পায় ধ্রুপদের মত চারিটি তুক্ লাগে না; খেয়ালের ন্যায় কেবলমাত্র আস্থায়ী এবং অন্তরায় গানের সমাপ্তি; খেয়ালের তাল এবং রাগিণীই টপ্পায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ছন্দের মধ্যে মধ্যমান অর্থাৎ ৮ মাত্রায় তাল এবং সুরের মধ্যে ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, ঝিঁঝিট, দেশ এবং সিন্ধু রাগিণী প্রাচীন বাংলা গানে অনুসরণ করা হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ

(গান)

কুমারী মন্দিরা দাশ

হে অরবিন্দ মোদের প্রাণের
লহগো নমস্কার।
বন্ধুর পথে যাত্রা করেছ
তুমিই কর্ণধার।
সন্তোরে তাই করিয়া বরণ
ভাঙ্গালে সবার মৃত্যুস্বপন
এজীবন হায় নয় কারো নয়
শোনালে যে বারে বারে।
লহগো নমস্কার॥
দীরঘ দিনের সাধনা তোমার
সফল হয়েছে আজ।
হে মহাতাপস দূর হ'তে তুমি
সাধিবে কি তব কাজ?
বাঙলার বুকে দুর্য্যোগভরা
দুখের তিমিরে কাঁদে তাই ধরা
তোমার আশীষ অগ্নিমন্ত্র
দাওহে কর্ণধার।
লহগো নমস্কার॥

দুইখানি পত্র

২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৭

"মন্দিরা" সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

পল্লীর রাজনীতিক ও সাধারণের সেবক (public man) আমি,—সে-ও আবার পাকিস্তানে। সুতরাং সারাদিন অসহায় লোকের দুঃখ কষ্ট শুনিতে এবং তাঁদের দুর্দ্দশা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে এত নানাস্থানে যাতায়াত করিয়া পরের কাজ করিতে হয় যে দৈনিক পত্র ও ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসরই পাই না। সুতরাং বিরল অবসরে আপনাদের প্রকাশিত Forward পড়িয়া আবশ্যকীয় জ্ঞান ও আনন্দ আমি আহরণ করি। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"মন্দিরা" ("মন্দির" নয় "মন্দিরা"—পাকিস্তানে "মন্দিরের" অস্তিত্ব সংশয়াত্মক এবং মন্দিরার চেয়ে অন্য কোন উচ্চ ধ্বনিক যন্ত্রও এখানে চলিবে কিনা সন্দেহ) একখানা প্রতিমাসে পাইতাম; আমাদের সরকার সেই বৃহত্তরা "মন্দিরা"কেও বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন না কি "মন্দিরার" ধ্বনি চলিতে পারিবে। যদি চলে, আমাকে পূর্ব্বেরই মত "মন্দিরা"ও পাঠাইবেন।

অনুগ্রহের দান হইতে বঞ্চিত হওয়াই নিগ্রহ।

বয়সেও বৃদ্ধ হইয়াছি,—দাঁতও প্রায় নাই; সুতরাং বাধ্য হইয়া শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনেকটা বৈষ্ণবধর্ম্মী হ'তে হয়েছে। তাই, এ অবস্থায় দুর্ব্বল শরীরে মন্দিরা ছাড়া আর কোন্ যন্ত্র সাধী হতে পারে? আর চরমের দিকেই তো আমার forward যাত্রার দিন আসিতেছে। যাউক, এ সব অবান্তর।

১লা জুলাইয়ের Forward পড়িলাম। "Notes & Comments" এর The Aristocrat and the Lion "পাঠ করিলাম। উল্লিখিত রায়সিংহ বিবৃতির ("রায় সিংহে"র পরিবর্ত্তে, "রাজসিংহ" বা "সিংহরাজ" লিখিব কি?) মূল কারণ যে "last infirmity of an old age" (বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা) ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য, তাহা জানি না। তবে ঢাকার দাঙ্গার (Dacca riot) সময় শ্রীযুত দত্ত মহাশয়ের যে অবিশ্বাসের অধীর রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সহসা আপোষের পর তাঁহার সে ভাব যে কেন এত শীঘ্র একেবারে শান্ত বিশ্বস্ততায় পরিণত হইল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তবে স্ত্রীলোক পরিজন যদি ভারত রাষ্ট্রে থাকে এবং ছেলেরা যদি সেখানে উপার্জ্জন করে, তা হ'লে আমরা সত্যই তো খুব সংখ্যালঘু পরিবার হইয়া পড়ি; তার পর সেই সংখ্যালঘু পরিবারকে কেন যতদিন পারি এ দেশকে অর্থশোষণের (exploitation) স্থান বলে বাসভূমি করিতে বলিব না? তাহা তো করিতেই হইবে। অপর দত্ত মহাশয়ের বোধ হয় একই অবস্থা। Aristocrat and Lion (রাজ ও সিংহ) দের সহিত আমার সংস্রব খুব কম। নিজে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ বিশেষতঃ দরিদ্র (অর্থে ও সামর্থ্যে)। সুতরাং দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করেছি,—তাই, এঁদের সংবাদ সঠিক বলিতে পারি না। তবে মনে হয় এই রূপই ঘটে। অর্থোপার্জ্জনও যেমন, পদাধিকারও তেমনি লোভনীয়। এই কারণেই ময়মনসিংহের সংখ্যালঘু সম্মেলনে এই কয়জন সংখ্যালঘু পারিষারিকেরা এত আপত্তি করিয়াছিলেন।

কোন সম্মেলনের উপস্থিত সকলেই শত হস্তে প্রস্তাব লেখে না। তা হ'লে সেটা প্রস্তাব হয় না, শতপদ সরিসৃপের মত বর্জ্জনীয় হ'য়ে ওঠে। তাই, সেটা প্রস্তাব হয় না—প্রস্তাবের লড়াই হয় মাত্র। সেইজন্য দু'চার জনই জনমতকে বিবেচনা ক'রে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেন। জগতে বুদ্ধিদাতা অনেক থাকতে পারে, রূপকার থাকে স্বল্প। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তবে সে দুচার জন কে হবে এ নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়া স্বাভাবিক। ময়মনসিংহেও তাহাই হইয়াছিল,—অবশেষে যাঁরা পারিবারিক সংখ্যালঘু নহেন, তাঁদের দুঃখ ও বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠলো এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়া। পারিবারিক সংখ্যাগরিষ্ঠেরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।—পারিবারিক সংখ্যালঘুরা অপ্রতিষ্ঠ হলেন।

আমিও ময়মনসিংহে উপস্থিত ছিলাম। এটাই হলো প্রস্তাবের বাস্তব ইতিহাস, অবাস্তব মতবাদকে আজ এই বাস্তবতার যুগে বাস্তিত্বের দম্ভ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

আমরা যারা সাধারণের সেবক (public man) তারা আমরা যেন এই শিক্ষা কখনই না ভুলি। মতকে আমরা গঠিত করতে চেষ্টা করতে পারি; তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু গঠিত মতকে অস্বীকার করার দুঃসাহস নিয়ে আমরা যেন নিজেকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা না করি। ময়মনসিংহে মতেরই জয় হইয়াছে, মতলবের নহে।

বরা জুলাইয়ের Forwardএ "These Gandhi-ites" প্রবন্ধটী পড়িলাম। অতীব তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ হইয়াছে।

সত্যই তো আজ আর পাকিস্তানে প্রকৃত গান্ধীভক্ত কোথায়? সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ই সত্য গান্ধীভক্ত; কিন্তু তিনিও তো নিয়ত পাকিস্তানবাসী নহেন। এখানে তাঁহাকে দেখিতে হয় পাকিস্তানী মানুষ বা অমানুষকে, আর ওখানে তাঁহাকে দেখিতে হয় হিন্দুস্থানী দুধ দেওয়া গরুগুলিকে। মানুষ চরান ও গরু চরানের কাজ এক-জনের হাতে থাকিলে কাজ খুব ভাল হয় ব'লে মনে হয় না। পাকিস্তানে যে থাকিবে তাঁকে করিতে হইবে অদ্বৈতের সাধনা, আমরা করিতেছি অদ্বৈতের নামে দ্বৈতের সাধনা। তাইতো সাধুরাও সিদ্ধিলাভ করিতেছেন না। গান্ধীজী বলতেন একত্বের সাধনা করিতে। নিষ্ঠাহীন আমরা স্ত্রীপুত্র ও মূল প্রতিষ্ঠান রাখি ভারত রাষ্ট্রে, আর শাখা রাখি পূর্ববাঙ্গালায়। ভারতের শিকড়ের নাড়ী যদি দীর্ঘ হয় ও অর্থরূপ রস চলাচলের ব্যাঘাত না হয়, তবেই হয় তো গান্ধীবাদ পাকিস্তানে শুরু না-ও হইতে পারে। এই পর্য্যন্ত। লাভ-বৃদ্ধি হবে না।

যে দুচারজন অপ্রতিষ্ঠ তথাকথিত গান্ধীবাদী এখানে আছেন, তাঁদের তো সম্বলের মধ্যে দীর্ণ দেহ, আর অসংস্কৃত মন। কারণ পাকিস্তানের সংস্কৃতি তো গান্ধী-বাদের সহিত কিছুতেই খাপ খায় না। অহিংসা এ দেশের পরম ধর্ম নহে। ভাল গ্রন্থ ও পত্র এদেশে আসার সুযোগ পায় না। সংস্কৃতিও তাই তাদের থাকতে পারে না। তাদের কথা শোনে কে? সতীশবাবু বালুকা চষিতেছেন না, বালুকা চষিলে ফসল না-ও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু গভীর চাষে শীতল জল মিলিতেও পারে। তাঁর কাজ অনেকটা মাটির সাথে সংস্পর্শ শূন্য শুষ্ক প্রস্তরখণ্ডকে তুলার আঘাত বা চমরী গাইয়ের ছন্দ তাড়নায় খণ্ড করে রস বাহির করার বৃথা প্রচেষ্টা।

সুরেন ঘোষ মহাশয় এখানে আসিবেন কি করিয়া? যাঁরা আত্মিক ধর্মের (spiritual religion) সাধনা করিবেন, তাঁদের এখানে আশ্রয় বা আশ্রম কোথায়? এখানে শুধু আচার, বিচারের এখানে নির্বাসন।

ভারত রাষ্ট্রে আছেন ব'লেই আমরা এঁদের শক্তি সম্পর্কে এত আশা পোষণ করি। দর্শনকার বলেন "গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী"। দেশের মাটী এবং সমাজ এরাও দ্রব্য। এই আমাদের পারিপার্শ্বিককে আমাদের মনে হয়, গান্ধীজী ছাড়া আর কেহ গুণের আধার রূপ দ্রব্য ক'রে তুলতে পারবেন না। গুণই গুণান্তর সৃষ্টি করিতে পারে। দ্রব্যও দ্রব্যান্তর সৃষ্টি করে। আমাদের গুণও নাই—আমাদের এই দেশ ও সমাজে পদার্থ অপেক্ষা অপদার্থ বেশী হয়ে উঠেছে।

তাই নেতৃত্বের এখানে এত অভাব—আর ওখানে তো নেতার বড়ই বাহুল্য। আর, সত্যকথা বলিতে কি, এখানে নেতার অভাব থাকিলেও বড় বড় নেতারা এখানে আসিলে তো কোন কাজেই তাঁরা লাগিবেন না—বরঞ্চ ওখানে তাঁদের শক্তির ও সাধনার মর্য্যাদা আছে। এখানে তো তার কিছুই নাই। ওখানে যে দ্বন্দ্ব, তাতে হয় শক্তির বৃদ্ধি—আর এখানে যে দ্বন্দ্ব তার ফল শক্তির ক্ষয়, আর প্রাণের নিধন। ওখানে দ্বন্দ্ব বিচারের—এখানে হয় নির্ব্বিচারে।

আমরা শক্তির উপচয়ই চাই,—অপচয় চাই না

আপনারা দোষারোপ করেছেন যে প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁর

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে পূর্ব্ববঙ্গে থাকেন না। হিন্দু কি এখানে আছে? সকলেই যে যাত্রার মুখে। পারস্পরিক সহানুভূতিরও আজ হিন্দু সমাজে বড়ই অভাব। তাই তো এক হিন্দু অপরকে বিপদের মুখে রাখিয়াই এখানে পলাইতেছে—আর ওখানকার হিন্দুও এই দুর্ভাগাদের সানন্দে বরণ ক'রিতেছে না। এখানকার হিন্দু আজ গতিচঞ্চল (dynamic? না shaky?)—সে আর আজ স্থিতি-দৃঢ় নহে।

আমাদের দুঃখ, আমাদের দুর্দ্দশা, আমাদের দুর্ভাগ্যের মূল কোথায় তা নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ। এখানে থাকার দরুণ আশা আজ আর কারও আছে ব'লে মনে হয় না। বিশ্বাসের অভাবে যাঁর মন যত খালি, মুখে তাঁর বিশ্বাসের শব্দের আড়ম্বর তত বেশী।

আবার, আজ যাঁরা দায়ে পড়ে গৃহহারা হয়ে ভারত রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছে, হতেছে বা হবে, ভারত কি সেই সব দুঃখীকে আত্মীয় ভেবে সানন্দে বরণ করতে পারে না? আজ শুধু "রায়" রাষ্ট্রকে দোষারোপ করব কেন? এই মন্ত্রিদল গঠনে আমাদের আত্মীয়দের কার কতখানি দুর্বুদ্ধি ও স্বার্থ ও বিদ্বেষ ছিল তাও তো ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি। শুধু মন্ত্রী কেন, এখানে যদে শুনি, যাঁরা সে যুগের প্রেমিক কংগ্রেস সেবী ছিলেন, আজ বাস্তুহারাদের দেখার জন্য তাঁরাই বেতন-ভুক্ হয়ে ওখানে সর্ব্বভুক্ হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁরাও নাকি এই সব দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদের অর্থসম্পদ ও মান সম্ভ্রম লইয়া স্বার্থক্রীড়া করিতেছেন। শুধু নেতাদের কেন, আমাদের মত কর্ম্মিদেরও যে আজ মুখোষ খুলিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু গান্ধীজীর নাম করার গ্রামোফোনটি আঁকড়াইয়াই আছি।

তাই বড় দুঃখে মনে হয়—

এই বীভৎস দৃশ্য এত প্রকট হইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজীকে বধ ক'রে গডসে বোধ হয় তাঁর মনঃকষ্ট নিবারণ ক'রে পরকালে তাঁর আশীর্ভাজন হইয়া আছে।

২য় পত্র

৬ঠা শ্রাবণ ১৩৫৭

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৭শে আষাঢ় এক পত্র দিয়াছি; আশা করি পাইয়াছেন। আজ আবার কয়েকটী কথা লিখিতেছি।

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ বলিয়া ঘোষিত হয়, কংগ্রেস উহা মানিয়া লইলেন। আমরাও কংগ্রেসের কর্ম্মিরূপে উহা গ্রহণ করিয়া মনকে তদনুযায়ী গঠিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। আমরা কোনও দিনই ভারতে কংগ্রেসের নেতা ছিলাম না; ছিলাম মাত্র আজ্ঞাবাহক সেবক। সুতরাং কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করার বা তাহাকে অমান্য করা, অথবা তাহার সমালোচনা করিয়া সুচিন্তিত পৃথক পন্থা অবলম্বন করার আমাদের কোন অধিকার ছিল না। তাই, পূর্ব্ববঙ্গের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিলাম,—আজও সেই রূপেই আছি। মহাত্মাজীর অনুসরণে নয়, তাঁহার নাম মাত্র স্মরণে এ দেশের হিন্দুমুসলমানের যথাসাধ্য সেবা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখাই ছিল মহাত্মাজীর শিক্ষার অন্যতম আদর্শ। ক্ষুদ্রচেতা আমরা তাহা সম্যক কোনও দিনই পারি নাই;—তবু চেষ্টা করিবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। পাকিস্তানের উন্নতি, আমারই উন্নতি ইহাই ভাবিতাম। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য থাকিবে না, কায়েদে আজমের এই বাণীর প্রয়োগের উপর বিরাট বিশ্বাস রাখিয়াই চলিতেছিলাম।

ইতিমধ্যে ঘটিল তাঁহার মৃত্যু ;—নেতৃত্বের ভার পড়িল যাঁদের উপর তাঁরা রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে ভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে ও কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে পাকিস্তান হবে "ঐস্লামিক রাষ্ট্র"। সুতরাং "ঐস্লামিক রাষ্ট্রে" হিন্দু হবে "সংখ্যালঘু" নাগরিক—কেন না, সেটাও দান করা হবে একান্তই "ঐস্লামিক" ভাবে। সে ভাব হলো "ঐস্লামিক গণতন্ত্র"।

এখানে "ঐস্লামিক" শব্দ যদি গণের বিশেষণ হয়, তবে হিন্দুরা তো "গণের" মধ্যে পড়ে না—গণের মধ্যে তারা গণ্য হবে না। অগণ্য হয়েও তারা নগণ্য। আর "ঐস্লামিক" শব্দ যদি তন্ত্রের বিশেষণ হয়, তবে সেখানে হিন্দু হবে স্বতন্ত্র—আত্মতন্ত্র নয়। যদি উহা সমগ্র শব্দের বিশেষণ হয়, তবে সেটা নির্ভর করিবে ঐস্লামিক শাস্ত্রের বিধানের ব্যাখ্যার (interpretation) উপর। সে ব্যাখ্যা তো অনুশাসনের দ্বারা কৃত হলে সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না।

এই সমস্যা তখন বিকট আকারে প্রকট হয়ে দাঁড়াল আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি রাজনীতিকদের কাছে। অথচ নেহেরুজীর কাছে ইহার অর্থ সত্যই নাকি খুব ভাল ও সরল। আর পূর্ব্ববঙ্গের প্রখ্যাত রাজনীতিক দত্ত মহাশয় তো ইহাকে ফুল চন্দনে বরণ করিয়া লইলেন।

আমরা এই প্রকট তথ্যের বিকট ব্যাখ্যার বিপদে পড়িলাম ঢাকার দাঙ্গায়। এই পটভূমিকায় আমাদেরও আর এখানে পুরাতন ভূমিকা গ্রহণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। হিন্দুর কল্যাণের কথা বলিলে আমরা অভিহিত হইলাম "সাম্প্রদায়িক" ব'লে। আর মুসলমানের প্রতি অনাচারের কথা তুলিলে অপরাধ হলো—আমরা ঐস্লামিক সংহতি নাশকারী fifth columnist বা ভারতের গুপ্তচর।

রাষ্ট্রে তখন আমাদের স্থান, মাদ্রাজ প্রদেশের "পঞ্চম" বেদের মত।

আর বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

আরম্ভ হলো বাস্তুত্যাগের বিরাট বিস্তার। আর তখন কে কার কথা শোনে? ভাষাপ্রসাদের প্রতিজ্ঞাত, প্রফুল্ল চন্দ্রের ব্যাখ্যাত, আর লক্ষ্মীকান্তের প্ররোচিত পশ্চিম বঙ্গের শান্তিপূর্ণ বাসভূমির দিকে হিন্দুরা ছুটিল দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া। তখন দেখা গেল যে হিন্দুর ধনপ্রাণ ও সম্মান লইয়া টানাটানি করিতে এখানে অনেকেই কৃতপ্রযত্ন কিন্তু তাহাকে এখানে রাখিবার টান কাহারও নাই। Search এর মূলে তাকে রাখার টান নহে—তার সম্পত্তি হ'তে তাকে বঞ্চিত করার টান।

আর পশ্চিমবঙ্গেও প্রকাশ হয়ে পড়লো বাস্তুত্যাগীর প্রতি বিরূপ মনোভাব। করলো সরকার তাদের সুব্যবস্থা, না করলেন জনসেবকগণ তাদের অভিনন্দন। এই দোটানায় আজ বাস্তুত্যাগীর ধন তো গিয়েছেই প্রাণও যায় যায়। সম্মানের কোন কথা তো ওঠেই না।

এরই মধ্যে হলো "নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি"। চুক্তির ফলে যেমন নেহেরুজীর তেমনি লিয়াকত সাহেবের সম্মান সকল পৃথিবীতে খুব বেড়ে গেল। সে প্রশংসায় তাঁদের সব সংশয় দূর হলো। লিয়াকত পেলেন দিল্লীতে সম্মান, নিরাপত্তা ও সৌজন্য। আর নেহেরুজীও করাচীতে কি সমাদরেই না আতিথেয়তা গ্রহণ করে কাপড় জামা ও প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন। না হলো search না হলো দ্রব্যজাত কাড়াকাড়ি।

কিন্তু চুক্তি তো আর পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে হয় নাই—তাই, তাদের আজও না আছে নিরাপত্তা, না আছে সমাদর, না আছে সম্মান। বিস্তারিত ঘটনা তো সবই জানেন।

গরু সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু রেলে নেওয়া যাবে না—Booking বন্ধ। হাটাইয়া নিতে গেলে পথে গরুচোরের অভাব নাই।

দ্রব্যজাত নিয়ে যাব border পর্য্যন্ত, parcel book হবে না। Goods traffic তো বাস্তুত্যাগীর জন্য নয়!

পশ্চিমবঙ্গে ঘর তুলবো—নিজের টিন নিয়ে যাবার অধিকার নাই।

ঘর বেচবো—ভাঙতে পারবো না। সম্পত্তি বেচবো:

রেজেষ্ট্রী হবে না—১০ দশ বিঘার বেশী বেচলে শাস্তিও হ'তে পারে।

আজ আর এখানে হিন্দুর সম্পত্তিতে নির্বাধ স্বত্ব নাই।

আপনাদের কর্তৃপক্ষ কি এসব কথা জানেন, না জানেন? আপনারাও কি ইহা জানাইতে চেষ্টা করেন?

সুতরাং চুক্তির সব সুফল জনগণের কোথায়? অবশ্য প্রাণটা আপাততঃ আছে—তবে নিয়মিত চুরিডাকাতিতে (organised theft and dacoities) প্রাণও কখন কখন যেতেছে—আর সম্পত্তি তো যেতেছেই।

এ সব দুর্ভাগ্য একটু ভাবিবেন, এই জন্য এই দীর্ঘ পত্র দিতেছি। হয়তো আপনাদের সময়ের অপব্যয় হলো—তবু আমরা যে দুঃখ না জানিয়ে এই অশান্ত দেশে শান্তি পাই না।

এখন আর একটা দিক্।

কাগজে জানাইতেছেন, আমরাও দেখিতেছি, অনেক হিন্দু এ দেশে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। তাঁদের মধ্যে দুইভাগ আছে, জানেন কি?

একদল মধ্যবিত্ত, যাঁদের দলে আমরা ও আপনারা।—যাঁদের সুখ দুঃখই আমাদের ও আপনাদের কাছে খুব বড়। এঁরাই পশ্চিম বঙ্গে আপনাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করেন। এঁরা বেশ বাড়ী ঘর দুয়ার করেছেন; না হয়, অপরের জমি জায়গা দখল করে বসবাস করিতেছেন। সরকারী ঋণ ও দান এঁরাই একচেটে ভোগ করেন। তাঁরা আসিতেছেন, ফেলে যাওয়া জিনিষ পত্র নিয়ে যেতে, জমি জায়গা বিক্রয় করতে—এদেশে আর বসবাস করতে নয়।

আর একদল আছে সর্ব্বহারা। সর্ব্বহারারা চিরদিনই সবদেশেই সর্ব্বহারা। এদের না আছে ধন, না আছে সম্মান। না আছে বিদ্যা, না আছে দাবী জানাবার বাহুবল। আমাদের বক্তৃতায় ও সংবাদ পত্রে এঁদের জন্য অবশ্য আছে অনুরন্ত আন্দোলন। কিন্তু মানুষের মনে আছে এঁদের জন্য ঝরিয়ে যাওয়া ভালবাসা। তাই এঁরা না পেলেন এখানে থাকবার সুবিধা না পেলেন পশ্চিমবঙ্গে বাসভূমি। অবশেষে নিঃস্ব হয়ে, ব্যাধিরাম নিয়ে শীর্ণদেহে এঁরা আজ আবার দলে দলে ফিরে আসছেন পাকিস্তানে। এঁদের ভবিষ্যত কেহ ভাবছেন কি?

জোর করে যাঁরা অপরের জমি দখল করে আপনাদের বাহবা ও সহানুভূতি নিচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু এঁরা নন। তাঁরা তো মধ্যবিত্তের দল। এঁদেরই জন্য আপনাদের দরদের পরিচয় পাই প্রতি দিনের সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায়। এটা তো আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের সমবেদনা।

আর, তারা তো বুদ্ধিহীন, মূক মূর্খ। ভদ্রলোকের দেখা দেখি এঁরাও বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে। ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে যেখানে গেলেন, সেখানে দেখলেন, ভদ্রলোকের জীবিকা আছে, আশ্রয় আছে। এঁদের তা নাই। পেলেন বিরাট আঘাত।

সরকার নাকি এঁদের দিলেন relief; তাঁরা দিলেন ১২৲ টাকা। আমলা নিল ৬৲ টাকা। ভদ্রলোকের এই ভদ্র চুরি চললো অবাধে। নালিশ করবেই বা কে? এঁরা তো মূর্খ। নালিশ করবে কোথায়? সবই যে শিক্ষিত ভদ্রলোক আমলা। অবশেষে নিরন্ন হয়ে এরা ফিরলো এদেশে। এসে দেখে না আছে ঘর, না আছে দুয়ার; না আছে জোত, না আছে জমা। এখানেও আদর নাই, ওখানে তো ছিল শুধু অনাদর ও ভদ্রভাবে লুণ্ঠন। এই ভদ্র লুণ্ঠন এরা শিখলো কোথায়? সকলেই তো প্রমথ নাথের আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নহে।

আজ, এখনও ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ও ধনী হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। পড়ে থাকলো এই সব হতভাগারা। এঁদের ভবিষ্যত ভেবেছেন কি? আমরা দেখছি, আমরা চলে গেলে এঁদের হতে হবে মুসলমান। সেদিনও একজন না-খেতে-পাওয়া বুড়ো আমার কাছে এসেছিল এই বলতে যে সে মুসলমান হবে। আমি তাকে একমুঠো ভাত দেওয়ায় সে মতি পরিবর্ত্তন করে পথব্রজে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে নবদ্বীপের পথে। আরও এরূপ অনেক হবে। ভেবেছেন, এঁদের কথা?

ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতা থাকার আপত্তি নাই; কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের, জনসাধারণের, আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরিয়াদের অবহেলায়, উপেক্ষায় যে বীভৎস পরিস্থিতি সংঘটিত হতেছে, তার ফলে যে ধর্ম্মান্তর হবে, তার জন্য ইহকালে ও পরকালে অভিশাপের ভাগী হবে কে? আর, যদি ভগবানে বিশ্বাস ও পরকালে আস্থা না থাকে, তবুও অন্নহীনের অন্ন যোগাবার ভার যাঁরা নিয়েছেন বলেন, তাঁদের দায়িত্বই বা এড়ান যায় কি করে?

এই বিরাট সমস্যা জানাইয়া রাখিলাম। অনুগ্রহ করে আপনাদের মত যাঁরা পরোপকারে উৎসৃষ্ট জীবন, তাঁরা মুষ্টু ভদ্র লোকদের সংবাদ না নিয়ে side issue বা bye product হিসেবে এঁদেরও একটু খোঁজ নিলে আমরা কৃতার্থ হব।

আর এক কথা।

শুনিতে পাই, বিহারে ও আসামে বাঙালীদের স্থান হতেছে না। হবে কি করে? তারা হয়তো বাঙালীদের চায় না। কিন্তু তথায় কি শিক্ষিত বাস্তুত্যাগী কেহ যেতেছেন? শিক্ষিতেরা তো ভীড় করিতেছেন শুধু পশ্চিমবঙ্গে। আর এই সব দেশে যেতেছেন যাঁদের শিক্ষা নাই, মনোবল নাই। তাঁরাই সেখানে অত্যাচারিত হতেছেন।

একবার বলুন না,—আমাদের যে সব সে যুগের সহকর্ম্মী আজ পশ্চিম বঙ্গে জাঁকিয়া বসিয়া দল পাকাইতেছেন, সেই সব সাহসী চতুরের দল, বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, good organisers—সাথে করে অনেক মধ্যবিত্ত নিয়ে এক যোগে বিহারে ও আসামে উপস্থিত হলো কেন? যাঁরা ইংরেজকে ভয় করেন নাই, বিদ্রোহ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাঁরা একবার আসামে ও বিহারে এই সব প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া বলুন না কেন পাকিস্তান বাদে ভারত অখণ্ড ভারত—সেখানে সকলেরই সমান অধিকার? সেইখানে এই জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বস্ব পণ করুন না কেন? কই, সেই অগ্নিযুগের কর্ম্মিবৃন্দ! কই সেই অহিংস যুগের কংগ্রেস সেবকদল। কই, সেই leftist এর দল—তারা একবার পশ্চিমবঙ্গ left করে অন্যত্র right assert করুন না কেন! কোথায় সেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা হিন্দু মহাসভার দল! ভাঙ্গা ভারতের ঐ অংশকেই খণ্ড খণ্ড হতে না দিয়ে সত্যিকার অখণ্ড করার চেষ্টা করুন না কেন? এক জাতিত্বের বোধ জাগাইতে দেরী করেন কেন?

আমার লেখনী দুর্ব্বল, শক্তি অল্প, অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র, কিন্তু বেদনা বোধ অসীম, তাই আপনাদের মত মহতের কাছে আবেদন।

পাকিস্তানের হিন্দু যখন পাকিস্তানে থাকিবেই না, অথবা থাকিতে পারিবেই না, তখন তাদের ভারতে রক্ষার জন্য আপনারা কি আজও class ভেদ করে কথা বলবেন? শুধু মুসলমানের অনাচারে নয়, হিন্দুরাও দলে দলে চলে যাওয়ার অবশিষ্ট হিন্দুর এখানে নিঃস্ব অবস্থায় থাকা অসম্ভব হয়ে উঠিতেছে। সুতরাং যত চুক্তিই করুনা কেন, লোক বুঝি এখানে আর থাকে না। তবুও কারো কারো শেষ পর্য্যন্ত থাকতে হবে। তা না হলে অবশিষ্টেরা কাঁদবে কার কাছে?

আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমার শিরেই যেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সব সর্বহারাদের চোখের জলের বন্যা পতিত হইয়া আমার সকল গর্ব ও স্বার্থ এবং শ্রেণীভেদের বোধকে ভাসাইয়া নিয়া যায়।

ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন।

নিবেদন ইতি—

বিনীত—

দেবশর্ম্মা

নয়া ভারত

শ্রীঅশনি ভূষণ মজুমদার বি. এ

ভিখারীর মত ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা পেয়ে আজ,
ভারতবর্ষ হর্ষে ভুলিছে পরাধীনতার লাজ ;
নয়াদিল্লীর লালকেল্লার উন্নত শিরে হেরি
অশোক চক্র উড়িছে গর্ব্বে, বাজে উৎসব ভেরী !

ভগ্নস্বাস্থ্য কারাগার হতে বাহির হইল যারা,—
দেশ ও দশের নবরূপ দেখে তাহারা বাক্যহারা।
দেশ জননীর চরণ মুক্ত কিন্তু অঙ্গহীনা
শঙ্কিত হয় ব্যাথাহত মনে তাঁর অভিমান ক্ষুণ্ণ।

পিশাচের নরমেধ যজ্ঞে লয় বুঝি পায় সৃষ্টি
শোনিতের স্রোতে ভাসমান শবে শকুণের হেন দৃষ্টি !
বিদ্বেষরূপী কুটিল সর্প উগারিছে হলাহল,
বিষ জর্জ্জর হিঁদু মুসলিম করিতেছে কোলাহল।

বাস্তুহারার নগ্ন বিছিল থামিয়া বৃক্ষতলে
লেলিহান শিখা ভিটার দেখিয়া আকুল অশ্রুজলে।
সে আগুন জ্বলে দাবানল সম বিশাল ভারত জুড়ে,
সাগর শুকায়ে মরুভূমি হবে নিভিবে না তার নীরে ?

সাগরের পারে উনো পাতিয়াছে উর্ণনাভের ফাঁদ,
নেতারা বোনের হাজির সেথায় মিটাতে বিসম্বাদ !
গলিত শবের পার্শ্বে দেখেছ শকুনের হুড়োহুড়ি।
লোভী নেতাদের মাঝেও তেমনি লাগিয়াছে কাড়াকাড়ি !

সাদা খদ্দরে ভদ্দরে ভোলে, ভোলেনা শ্রমিক, চাষা ;
নেতাদের ধোঁকা বুঝিয়া তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে আশা
বিলাতী জোঁকেরা শুষিয়া গিয়াছে ছিল যাহা তাহা শুধি,
স্বদেশী মশক শোষণ করিতে বসিল উড়িয়া আসি।

ইহাই স্বাধীন হইবার সুখ ভাবি নাই কোন কালে,—
যে স্বাধীনতা লাগি লক্ষ শহীদ মরিয়াছে পলে পলে !
ভেবেছিনু এই স্বাধীন রাষ্ট্রে শ্রেণী বিদ্বেষ গ্লানি
মুছিয়া যাইবে ধ্বনিবে সদাই ঐক্য সাম্য বাণী

মনে আশা ছিল সমাজ নেতারা ভুলে যাবে শ্রেণী ভেদ,
ধনিক দাঁড়াবে শ্রমিকের পাশে নাশিয়া মনের ক্লেদ।

যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজাদী সৈন্যদল
প্রোথিত করিয়া আজাদী ঝাণ্ডা পূত করে ইন্দ্রল,
তপ্ত শোনিতে লিখে গেছে তারা শৌর্য্যের ইতিবৃত্ত ;
তাদের বীর্য্যে মুগ্ধ হয়েছে বিশ্ববাসীর চিত্ত।

মহামিলনের সে মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে জাতি
কৃপাণে কৃপাণে ঘোর সংঘাত, হতেছে ভ্রাতৃঘাতী।
মহাভারতের মুক্তিযজ্ঞে প্রাণাহুতি যারা দিল,
যজ্ঞ বিফল দেখিয়া তাহারা প্রাণে কি শান্তি পেল ?

মহামিলনের মন্ত্রদাতা হে মহান গান্ধী তুমি !
এই কি তোমার চির স্বপ্নের স্বাধীন ভারত ভূমি ?
চরম দুখের অগ্নি শোধনে শোধিত হইতে হবে,—
তব ইপ্সিত সোনার ভারত সৃষ্ট হইবে তবে।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

কলিকাতার জনপ্রিয় ফুটবলখেলার অন্যতম লীগ খেলা বর্ত্তমান বৎসরের মত শেষ হইয়াছে। গত মাসে লীগ-তালিকার শীর্ষস্থানগুলি লইয়া যে আলোচনা করিয়াছিলাম ফলাফল তাহাই হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব গত বৎসরের ন্যায় এবারেও লীগবিজয়ের গৌরব লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের লীগ বিজয়ের বিশেষত্ব যে তাহারা অপরাজিত থাকিয়া লীগ বিজয়ের জয়টীকা পরিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে একমাত্র মহঃ স্পোর্টিং দল একবার মাত্র এই অপরাজিত অবস্থায় লীগবিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল এবং স্থানীয় দলগুলির মধ্যে ক্যালকাটা দল দুইবার এ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

ইষ্টবেঙ্গল দলের জয়লাভ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বর্ত্তমানে স্থানীয় দলগুলির মধ্যে তাহারা যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধেও দ্বিমত নাই। তাহাদের রক্ষণভাগ আশাতিরিক্ত সবল না হইলেও আক্রমণ ভাগের দুর্ব্বার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা কলিকাতার দলগুলির ত' দূরের কথা ভারতের কোন দলের আছে কিনা সন্দেহ।

মোহনবাগান দল গত বৎসরের ন্যায় এবারেও রানার্স হইতে সক্ষম হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের সহিত পাঁচ পয়েন্ট ব্যবধানে অবস্থান করিয়া ও তিনটি খেলায় পরাজিত হইয়া তাহারা দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। লীগের যখন মাত্র চারিটি খেলা বাকি তখন মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র দুই; কিন্তু মোহনবাগান দল ইষ্টবেঙ্গল ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের সহিত অমিমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়া ও এরিয়ান্সের নিকট পরাজিত হইয়া লীগবিজয়ের সম্ভাব্য স্থান হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। তাহাদের এ বিপর্য্যয়ের মূল কারণ রক্ষণভাগের দুর্ব্বলতা ও আক্রমণ ভাগের মধ্যে বোঝা-পড়ার অভাব ও গোলমুখে ব্যর্থতা। সর্ব্বশেষে তাহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর খামখেয়ালিত্ব ও দৈনিক নূতন নূতন খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের জন্যই ফলাফল এরূপ দাঁড়াইয়াছে

রাজস্থান দল তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও শেষ খেলাটির পূর্ব পর্য্যন্ত মোহনবাগান দলের সহিত সমান পয়েন্ট অর্জন করিয়া প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে এবং যখন সাধারণে একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে রানার্স হইবার সম্মান রাজস্থান ও মোহনবাগান দলই লাভ করিবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আশাতীত ভাবে রাজস্থান দল শেষ খেলাটিতে পরাজিত হইয়া তৃতীয় স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল এ বৎসর চতুর্থ স্থান অধিকার করিবার প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। নবীন বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত এই দলটি শক্তিশালী

কুশলী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলগুলির সহিত যে ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

আমরা বর্ত্তমান বৎসরে লীগবিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সাথে সাথে আশা করি বাঙ্গলায় পতনোন্মুখ ফুটবল খেলার মান উচ্চ করিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা যেন আগামী বারে আরও শক্তিশালী করিয়া টীম গঠনে সচেষ্ট হয় যাহাতে তাহাদের খেলা দেখিয়া নূতন কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান :—

	খে	জ:	ড্র:	প:	স্ব:	বি:	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল—	২৬	১৯	৭		৫৩	৯	৪৫
মোহনবাগান—	২৬		৬	৩	৪৫	১৪	৪০
রাজস্থান—	২৬	১৬	৬	৪	৩৫		৩৮
স্পোর্টিং ইউনিয়ন—	২৬			৬	২২	১৬	৩২
মহ: স্পোর্টিং—	২৬	১০		৫	২৪	১১	৩১
জর্জটেলিগ্রাফ—	২৬	১১	৯	৬	২৮	১৮	৩১
ই, আই, আর—	২৬	৮	৮	১০	২৮	৩০	২৪
ভবানীপুর—	২৬	৮	৮	১০	৩৬	৩২	২৪
এরিয়ান্স—	২৬	৯	৪	১৩	১৯	৩১	২২
কালীঘাট—	২৬	৭	৭	১২	২৬	২৭	২১
ক্যাল গ্যারিসন—	২৬	৬	৪	১৫	২২	৫৪	১৭
ডালহৌসি—	২৬	৫	৬	১৫	১৫	৩৫	১৬
বি, এন, আর—	২৬	৬	৪	১৬	২২	৪৮	১৬
ক্যালকাটা—	২৬		৪	২০	১৩	৫২	৭

বর্ত্তমান বৎসরে ক্যালকাটা দল সব চাইতে কম পয়েন্ট অর্জন করায় আগামী বৎসরে প্রথম বিভাগে খেলিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং দ্বিতীয় বিভাগে সর্ব্বাধিক পয়েন্ট পুলিশ দল অর্জন করায় আগামী বৎসরে প্রথম বিভাগে খেলিবার সুযোগ লাভ করিবে।

অন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতে জাতীয় ফুটবল বা অন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার সপ্তম অনুষ্ঠান সোমবার ৭ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছে। এই ফুটবল প্রতিযোগিতার সাথে বাঙ্গলাদেশ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়াছে। প্রথমতঃ বাঙ্গলার পরিকল্পনাতেই এই খেলার প্রবর্ত্তন; দ্বিতীয়তঃ বিজয়ীর পুরস্কার সন্তোষট্রফি ও রানার্স-আপ কমলা শুল্ড কাপ বাঙ্গলারই দান। তৃতীয়তঃ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি সন্তোষের মহারাজার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই খেলাটি প্রচলিত এবং সবচাইতে আনন্দের যে গত ৬ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সুরু হইবার ৬ বৎসরের মধ্যে বাংলা দল চার বৎসর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে সমর্থ হয়। ১৯৪১ সাল থেকে এই খেলা প্রচলিত হয়।

বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের দল গুলি যোগদান করিলেও বাঙ্গলা দলের শক্তির সহিত কোন দলেরই তুলনা চলে না এবং আশা করা যায় বাঙ্গলা দল এবারেও তাহাদের জয়ধ্বজা উড্ডিন রাখিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে বাঙ্গলাদলের দল নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলী যে নির্বাচন করিয়াছেন তাহা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। উপযুক্ত কুশলী খেলোয়াড়দের দল হইতে দূরে রাখিয়া বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দল হইতে খেলোয়াড় সংগ্রহের উদ্দেশ্য যে কি তাহা আজ কাহারো নিকটে অজ্ঞাত নহে। আগামী বারে খেলার ফলাফল লইয়া আমরা আলোচনা করিব।

পুস্তক পরিচয়

উৎসব—[কিশোর সংকলন গ্রন্থ

সংকলন করেছেন, শ্রীভাস্করানন্দ প্রকাশ করছেন এন্, এম্, রায় চৌধুরী কোং লিঃ ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। একশ' আটাশ পাতার বই। মূল্য দু'টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান বাজারে সস্তা ও হাল্কা লেখার লেখকের অভাব নাই। তাঁদের রচনা পড়ে পাঠকেরা প্রচুর তৃপ্তি-লাভ করেন বটে ; কিন্তু সাহিত্য দেশের ও দশের জন্যই। সাহিত্যের ভেতর এসে গেছে আজকাল একটা উচ্ছৃঙ্খলতা। সাত্যিকার সমাজ বা দেশের শ্রীবৃদ্ধির মনোভাব নিয়ে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নব্য সাহিত্যিকেরা লেখেন না। কতকগুলি বাঁধাধরা হাল্কা সৃষ্টির মূলার' মধ্যেই তাঁরা ঘোরাফেরা করেন। 'উৎসবে'র প্রথম পাতাতেই 'চলার পথে' কবিতাটিতে নতুন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবিতাটি আমাদের জনপ্রিয় কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের রচিত। গ্রাম্য ছেলেটি সহরের পথে এসে বৃষ্টির প্রকোপে পড়ল। আশ্রয় কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না, কিন্তু ছাতার আশ্রয় তার কাছেই রয়েছে, শুধু একটু বুদ্ধির অভাব। তার একটি পরিচিত শিক্ষক যখন সে ভুল ভেঙে দিলেন, কবি তখন ছেলেটির উদ্দেশে বলেছেন :—

"অবাক বালক কাছেই তাহার
সস্ত ছিল যে ছাতা,
ভুলে গিয়েছিল কি করিবে লয়ে
এমন অকেজো মাথা।"

ছেলেদের সব সময়ই তিনি সচেতন হতে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই নীতি মূলক কবিতাটি সত্যিই আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আরও গোটা কতক পড়ে প্রীত হয়েছি। 'উৎসব দিনে' শ্রীসুনির্মল বসু। 'আমরা দু'টি বোন' শ্রীশান্তশীল দাশ, কবিতাটি ছোট মেয়েদের আবৃত্তির উপযোগী হয়েছে। 'বিবেচনা' একাংকিকা, রচনা শ্রীঅখিল নিয়োগী। বিষ্ণুশর্মা রচিত 'শ্রেষ্ঠী-ক্ষপনক-নাপিত কথা' নামক গল্পাংশের ছায়া আমাদের ভাল লেগেছে।

এ ধরণের নাটকের দেশে প্রচুর প্রয়োজন আছে। "দধীচি-লোকা ও বিশ্বকর্ম" লিখেছেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গংগোপাধ্যায় আমাদের তা' বেশ ভাল লাগল।

বইয়ের প্রচ্ছদপট ও ছাপা ভাল হয়েছে। আশা করি প্রত্যেক ছাত্র ও সুধী মহলে প্রচুর সমাদর লাভ করবে।

কাজের কথা

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রচিত। শ্রীবিষ্ণু প্রেস, ৮৪, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা, কলিকাতা ২। একশ' আটাশ পাতার বই। মূল্য দেড়টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে সৃষ্টি হয়েছে মোট দশটি অধ্যায়। এক একটি অধ্যায়ে কাজের কথা বিভিন্ন-ভাবে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের মন কি ভাবে জয় করা যায় তার দার্শনিক তত্ত্বটি তিনি

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। যেমন, "যাঁর কাছে কাজ চান তাঁকে যোগ্য সম্মান, আনন্দ ও সুবিধা দিয়ে আপনার প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে তুলুন। গুণ গ্রহণ ও প্রশংসা দ্বারা তাঁর কর্মশক্তি বৃদ্ধি করুন। তাঁর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে তাকে হিতৈষী বন্ধুতে পরিণত করুন।" এইভাবে লেখক নিজের অভিমতকে নানারূপ উপমা দ্বারা পাঠক মহলে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে সহজে লোকের কাছে কি করে প্রিয় হওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, "পরকে অপমান বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে কাজ পাওয়া যায় না। মিষ্ট আলাপ নম্র ব্যবহার, গুণানুসন্ধান, গুণকীর্তন ও সম্মান দান, তর্ক ও সমালোচনা পরিহার এবং সব সময় সকলের মংগল করবার আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা আপনি পরের কাছ থেকে কাজ পাবেন সহজে।" দশম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "কি উপায়ে সংসার সুখময় করা যায়?" এই সমস্ত জটিল সমস্যাকে নীতিমূলকভাবে ও ভাষার আড়ম্বর তাঁর নিজেরও কিছু কিছু ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে সহজ এবং শ্রাবণীল করে তুলেছেন। আমরা প্রত্যেক অধ্যায় পড়ে খুশী হয়েছি। পারিবারিক জীবনে এবং ছাত্র ছাত্রী মহলেও এ ধরণের শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। অতঃপর সমস্ত পুস্তকটি পড়ে দেখা গেল যে, "ডেল কর্ণেগীর" আদর্শের ওপর ভিত্তি করে লেখক লিখেছেন। তাঁর স্বপ্ন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করুক এই আমরা কামনা করি।

বিশ্ববাণী (মাসিক পত্রিকা) দ্বাদশ বর্ষ ; চতুর্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা ৬। মূল্য—প্রতি সংখ্যা আট আনা মাত্র।

এই পত্রিকাখানির রচনাগুলি বেশ ভাবসমৃদ্ধ ও বিভিন্ন ধরণের চিন্তা ধারায় সুলিখিত। মঠের পত্রিকা হিসাবে যে ধরণের হওয়া উচিত তা' অপেক্ষাও অনেক কিছু নতুন ধরণের লেখা দেখতে পেলাম। "সহরের যান-বাহনের দুর্ঘটনা "সম্পর্কে শ্রীপ্রমথ নাথ শীল, যে সাতটি আকস্মিক মৃত্যুর পরিকল্পনা এবং তার প্রতিকারের উপদেশ দিয়েছেন তা' সত্যিই বেশ উপভোগ্য হয়েছে। এ ধরণের প্রবন্ধের সত্যিই বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। "খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগে ভারতের কাচ শিল্পের তথ্যাবলী প্রবন্ধে স্বামী বেদানন্দ, অনেক কিছু অজানা জিনিষকে পাঠক সমক্ষে সংকলন করে একত্রে তুলে ধরেছেন। তা' আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত, "মন ও মানুষ" পাঠক সমাজকে বিমুগ্ধ করবে বলে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। স্বামী দুর্গানন্দের "পতঞ্জলির যোগানুশাসন" পড়ে সত্যিই আমরা সমধিক আনন্দ লাভ করেছি। প্রশান্ত সেন লিখিত "বর্ষা আহ্বান" কবিতাটি ভাবে ভাষায় ও ছন্দে খুব সুন্দর হয়েছে। ইহা ব্যতীত সমগ্র পত্রিকাটির মধ্যে যে সব নতুন ধরণের লেখার ছাপ বিদ্যমান রয়েছে. তা'তে আমরা আশা করি যে পাঠক মহলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

কাশ্মীর সমস্যা—

প্রায় তিন বছর যাবৎ কাশ্মীর নিয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে গোলমাল চলছে। কতবার কত রকম সমাধান এর জন্য এল; কিন্তু সমস্যা সমানই চলছে। উপজাতীয় লুটেলদের (raiders) আক্রমণ হ'তে ক্রমে প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানের সৈন্যদের আক্রমণ। যুদ্ধ চলল,—যুক্ত জাতি সংঘে এর আলোচনা চলল;—যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হ'ল;—কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হ'ল না। যুক্তজাতি সংঘের তরফ হ'তে সালিসদার এলেন কয় বার; এখন আবার এসেছেন ডিকসন (Dixon) সাহেব। তাঁর সামনে দিল্লীতে ব'সে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর আলোচনা হ'ল। দিল্লী থেকে ফিরে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি সাংবাদিকদের নিকট গল-বিজয়ী সিজারের ঢংয়ে বলেছেন—নিশাতান, তুকতান, বুর্খাণ্ডান—"আমরা মিলেছি, গল্প করেছি এবং তারপর বিদায় নিয়েছি।"

এর অর্থ হ'ল কাশ্মীরের সমস্যা পূর্বের মতোই চলতে থাকবে। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ে যে খেলা খেলছেন, কাশ্মীরের সাধারণ জনতার পক্ষে কতদিন তা সহনীয় হবে বলা যায় না। ইংরাজের যে সব সর্তে ভারত ত্যাগ করে, তার মধ্যে দেশীয় রাজ্য সমূহ সম্বন্ধেও কিছু সর্ত ছিল। সেই সব সর্তঅনুসারে কাশ্মীর রাজ্যের রাজা ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের যে কোন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। কাশ্মীরের রাজা ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরকে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন—খুব স্বেচ্ছায় নয়,—লুটেল হানাদারদের অত্যাচারে ও ভয়ে। তা ছাড়া কাশ্মীরের জনসাধারণের নেতা শেখ আবদুল্লাও ভারতের সঙ্গে যোগ দেবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাই হানাদারদের বাধা দেবার জন্য ভারত যে সৈন্য পাঠায়—তার পিছনে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক অনুমোদন আছে। সে দিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যের কাশ্মীরে অবস্থানকে বেআইনী অপরের দেশ অধিকার বলা যায়। এ সবই হ'ল আইনের ও উচ্চ রাজনীতির কথা। কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ে কথা—সেখানে এসব আইনের কথার মূল্য বিশেষ নেই। ইংরাজ কি সর্ত দিয়েছিল, ভারত ও পাকিস্তান কতটা আইনসঙ্গত পথে চলেছে—তাতে কাশ্মীরের জনসাধারণের সুখ দুঃখের কিছু আসে যায় না।

তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর এবং সেখানকার আর্থিক ব্যবস্থার উপর। যতদিন পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের কলহ চলতে থাকবে—ততদিনই কাশ্মীরে শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে, ততদিনই কাশ্মীরের সংহতি নষ্ট হ'তে থাকবে। পণ্ডিত জওহরলাল নিজের কতকগুলি পূর্ব-গঠিত ধারণা নিয়ে চলেন এবং কাশ্মীরের ব্যাপারেও তাই করছেন। তিনি যদি মনে করেন—শেখ আবদুল্লা তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বশে নিজ দেশের এই বিড়ম্বনা দীর্ঘ কাল সহ্য করবেন—তবে তিনি খুবই ভুল করছেন। কাশ্মীর ব্যাপারের আশু মীমাংসা না হ'লে শেষ পর্যন্ত তিনি কোন পথ অবলম্বন করবেন তা বলা যায় না। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের ভূমি-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ভারতীয় সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের দিক হ'তে তাকে হয়ত কতকটা বেআইনী বা বিধিবহির্ভূত মনে হ'তে পারে। কিন্তু সেখান-

তার আর্থিক ব্যবস্থার দিক হ'তে এবং জনসাধারণের দিক হ'তে এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই সব কথা মনে ক'রে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে।

কোরিয়া—

কোরিয়ার যুদ্ধ ক্রমে একটা সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে পড়ছে। একমাস হয়ে গেল—এখন-ও উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ অভিযান প্রতিরোধ করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয় নি। একটা ক্ষুদ্র দেশের একাংশের উপর যে অস্থায়ী রাষ্ট্র চলছে, তার পক্ষে আমেরিকা ও যুক্ত জাতি সংঘের বিরুদ্ধে এমন ক'রে সশস্ত্র অভিযানে নামবার দুঃসাহস খুব স্বাভাবিক নয়। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে পার্শ্ববর্তী কম্যুনিষ্ট রুষিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীন উত্তর কোরিয়াকে উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু একথা-ও স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করছে কেবল উত্তর কোরিয়া এবং আক্রান্ত হ'ল দক্ষিণ কোরিয়া। কোরিয়ার দুই অংশের এই যুদ্ধকে বলা যায় সমানে সমানে লড়াই। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া এই যুদ্ধে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না;—আক্রমণকারী উত্তর কোরিয়ার সৈন্যকে সে কোথাও বাধা দিতে পারছে না। উত্তর কোরিয়ার নিকট দক্ষিণের এই পরাজয় ও হীনতার কারণ অনুসন্ধান যোগ্য। উত্তর কোরিয়া কিসের জোরে দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং এখন আমেরিকা ও যুক্ত জাতি সংঘকে উপেক্ষা ক'রে এই সামরিক অভিযান চালাতে সাহস পাচ্ছে?

বিধি-বিধান ও আন্তর্জাতিক আইন কানুনের বাইরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। হয়ত একথা সত্য যে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণকে আক্রমণ করেছে; সেই সঙ্গে আরও সত্য যে যুক্তজাতি সংঘের বিচারে উত্তরকে আক্রমণকারী ও আন্তর্জাতিক বিধানভঙ্গকারী ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু একটা জাতির ভাগ্য এমন ভাবে বিধি-বিধান দিয়ে নির্ধারিত হ'তে পারে না। একথা বলা চলে—যে কারণেই হোক উত্তর কোরিয়ার এই সামরিক অভিযানের পিছনে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনতার সমর্থন আছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের পিছনে তেমন কোন সমর্থন নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানে স্থানে জনতা গেরিলা বাহিনী গঠন ক'রে আক্রমণকারী উত্তরের সৈন্যদের সমর্থন করছে;—কিন্তু কোথাও দক্ষিণের জনতা এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে এমন খবর আমরা পাইনি। জনগণের সমর্থন-বিহীন রাষ্ট্রকে বা সরকারকে বিদেশী সাহায্য বা সামরিক বল দিয়ে বেশী দিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না। চীনে কুমিংটাং সরকারের পিছনে লোক ক্ষয় অর্থব্যয় বহু হয়েছে। তারফলে বহুবছর ধ'রে জনতার দুঃখ কষ্টই বেড়ে চলেছে। কোরিয়ার এই সংগ্রাম-ও কতকটা সেই পথেই চলেছে। কোরিয়ার বুকের উপর এই যে লড়াই চলেছে—তাতে সেখানকার লোকদেরই দুঃখ বাড়ছে। জনগণের সত্যিকার মত নির্ধারণ করার কোন উপায় বের ক'রে উভয় কোরিয়াকে একত্র করার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত।

যে ভাবে আজ যুদ্ধ চলছে—তাতে সমস্ত বিশ্বের শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করা যায়। গত দুই বিশ্বযুদ্ধ এর চেয়ে ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে সুরু হয়। আমেরিকা ও যুক্ত জাতিসংঘের বাহিনী আজ কোরিয়াতে পরাজিত হয়ে ক্রমে পিছু হটছে। দক্ষিণ কোরিয়ার
আজ উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের অধিকারে। আমেরিকা এই পরাজয় মেনে নেবে এমন কথা বলা কঠিন। অথবা যদি আমেরিকা ও যুক্ত জাতির বাহিনী জয়ী হয়, তবে উত্তর কোরিয়ার উৎসাহদাতা মুরুব্বী রাষ্ট্র দুটি নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখবে এমন কথা-ও বলা যায় না। কাজেই যে কোন মুহূর্তে এই যুদ্ধ ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে পারে।

পণ্ডিত নেহেরুর প্রচেষ্টা—

কোরিয়ার যুদ্ধে নিয়মানুগভাবে (technically) ভারতবর্ষ-ও একজন অংশীদার। যুক্তজাতি সংঘের যে প্রস্তাবের বলে আমেরিকা কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করেছে, সে প্রস্তাব ভারত সমর্থন করেছে। যদিও

ভারতবর্ষ কোরিয়াতে সৈন্য পাঠায় নি, তবু-ও এই অভিযান ভারতবর্ষ সমর্থন করেছে। সৈন্য না পাঠিয়ে ভারতবর্ষ নিজের শুচিতা রক্ষা করছে; কিন্তু এই ভাবে শুচিতা কতদিন বজায় রাখতে পারবে বলা কঠিন। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল শান্তি স্থাপনের জন্য এক প্রচেষ্টা করেন। তিনি সোভিয়েট রুষিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় একই ভাষায় চ'খানা চিঠি লেখেন। সোভিয়েট রুষিয়া তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কারণ তাঁর প্রস্তাব রুষিয়ার অনুকূল। কিন্তু আমেরিকা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। অথচ আমেরিকার সম্মতি ব্যতীত আপোষ হতে পারে না এবং আমেরিকাকে কোন প্রস্তাবে সম্মত করবার মতো শক্তি বা অধিকার পণ্ডিত জওহরলালের বা ভারতের নেই।

বিশ্ব-রাজনীতির বর্তমান পরিবেশে আমেরিকার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা পণ্ডিতজীর পরিচালিত ভারতের নেই—থাকলে আমরা সুখী হ'তাম। বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারত যাবে বা যেত কিনা—বলা যায় না; কিন্তু আজ ভারতবর্ষ টম-আমেরিকার রাষ্ট্রীয়-চক্রের সঙ্গে বাঁধা। এই অবস্থা বুঝে পণ্ডিতজীর শান্তি প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া উচিত ছিল। আমেরিকা তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল; কিন্তু তবু-ও আমেরিকার আবেষ্টনের বাইরে যাবার ক্ষমতা পণ্ডিতজীর নেই। প্রাকৃতিক ব্যাপারে যেমন ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে প্রাকৃতিক বিধানের অনিবার্যতাই প্রবল হয়, তেমনি রাজনৈতিক ব্যাপারে-ও ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে কাজ করে রাজনৈতিক বাস্তবের অনিবার্যতা। বর্তমান পরিবেশে ভারত আমেরিকার আবেষ্টনের বাইরে যেতে পারে না। তা অনুধাবন না করায় পণ্ডিতজীর শান্তি প্রচেষ্টা কতকটা বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে।

বাজলার সমস্যা—

প্রায় চার মাস হ'ল ভারত-পাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনেকে আশা করেছিল এই চুক্তির ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, তার অবসান হয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সমস্যা মিটে যাবে। ঐ রাজনৈতিক চুক্তির অব্যবহিত পরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল; পূর্ব বাংলার পাট ভারতের বাজারে আবার আসবার সুযোগ পেল। কিন্তু কোন ব্যাপারেই মৌলিক সমস্যার মীমাংসা হ'ল না। ব্যবসায়িক বিষয়ে মৌলিক সমস্যা হ'ল উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রার বৈষম্য, রাজনৈতিক ব্যাপারে মৌলিক সমস্যা হ'ল উভয় রাষ্ট্রের প্রকৃতির বৈষম্য। দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় সহজ ও সুনির্দিষ্ট-ভাবে না হ'তে পারলে জোড়া-তালি দিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক করা যায় না। অপর দিকে উভয় রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে একটা সাদৃশ্য না থাকলে—তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব হ'তে পারে না।

এ কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি—ইউ-রোপীয় রাষ্ট্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে রাষিয়া ও তার প্রভাবান্বিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে প্রতিবেশী পুঁজি-বাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সম্পর্ক কখনও প্রীতির বা বন্ধুত্বের হয় নি। অদূর ভবিষ্যতেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ পরিবর্তন আশা করা যায় না। ভারত ও পাকিস্তান এই উভয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য এমন গভীর ও মৌলিক যে এদের মধ্যে সৌহার্দিক সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি—এই দাবীতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে, পাকিস্তানের পরিচালকগণ আজও ঐ রাজনৈতিক মত পরিত্যাগ করে নি। আজ-ও তারা পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র ব'লে ঘোষণা করতে আনন্দ পায় ও গৌরব বোধ করে। তার পর আর যা-ই তারা বলুক, এ কথাই স্পষ্টই থেকে যায় যে অ-মুসলমানদের পক্ষে ওখানে বাস করা নিজ অধিকারের বলে নয়—সংখ্যা-গরিষ্ঠদের দয়া সাপেক্ষ। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আজ অ-মুসলমান কেউ নেই। এবার সুরু হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে অ-মুসলমান মুক্ত করা। সোয়াকোটি হিন্দুর

মধ্যে পূর্ব বাংলা হ'তে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ হিন্দু বেরিয়ে এসেছে। ভারত বিভাগের পূর্বে গত মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময় ১০।১২ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা হতে কলিকাতা ও ইণ্ডাষ্ট্রির অঞ্চলে এসেছে। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী দাঙ্গার পর, পশ্চিম বাংলায়, ত্রিপুরায় ও আসামে আর-ও অন্তত ২।৩ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ১৯৪৭ হতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় এসেছে ১৬।১৭ লক্ষ হিন্দু। ঐ সময় কুচবিহার, (তখন পশ্চিম বাংলার বাইরে) ত্রিপুরা ও আসামে কম হ'লেও ৪।৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা হ'তে এসেছে। ১৯৫০ সালের এই ৭।৮ মাসে পশ্চিম বাংলায় ৩০ লক্ষ, এবং আসাম ও ত্রিপুরায় অন্তত ৪।৫ লক্ষ এসেছে। তা ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ছুটকো-ছাটকা যা হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে গিয়েছে, তার সংখ্যা-ও প্রায় এক লক্ষর মতো হবে। যুদ্ধের সময়কার আগমনের সংখ্যা ধ'রে অন্যূন পক্ষে ৮০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাংলা হ'তে ভারতরাষ্ট্রে এসেছে। গত মন্বন্তরে বহু লোক মারা গিয়েছে; এই দশ বছরের লোক-বৃদ্ধি তাতেই প্রায় কাটাকাটি হয়ে যাবে। পূর্ব বাংলায় আর বড় জোর ৯০ লক্ষ হিন্দু এখন আছে।

এখন যে ভাবে পূর্ব বাংলা হ'তে হিন্দু আসছে তা'তে এমন অনুমান করা যায় যে এই বছরের আগামী ৪।৫ মাসের মধ্যে আরও ১৫ লক্ষ হিন্দু ভারতে আসবে। এই ভাবে ১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রায় হিন্দু শূন্য হবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। হয়ত সামান্য কয়েক লক্ষ ওখানে থেকে যাবে; তারা ক্রমে ধর্মত না হ'লেও কার্যত মুসলমান হয়ে যাবে। সে ত' গেল ভবিষ্যতের কথা; কিন্তু বর্তমানের সমস্যা হ'ল—গত ২।৩ বছরে যে ৫০।৫৫ লক্ষ হিন্দু এসেছে—তাদের পুনর্বসতির কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে? পশ্চিম বাংলা সব চেয়ে ঘন-বসতি দেশ। পশ্চিম বাংলায় গত ২।৩ বছরে অন্তত ৪০ লক্ষ লোক এসেছে এবং এখনও আরো আসছে। এর মধ্যে মাত্র ২।২॥ লক্ষ লোক সরকারী শিবিরে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আছে বাকি সবাই কোন না কোন রকমে মাথা গুঁজবার স্থান ক'রে কোথাও আছে। কিন্তু এই থাকাতে তাদের সমস্যার সমাধান হল না। এদের আজ কোন জীবিকা নেই; এরা কোন নূতন সম্পদ উৎপাদন করে না। এই ৪০।৪৫ লক্ষ লোক পশ্চিম বাংলার মতো ক্ষুদ্র প্রদেশের উপর ভার হয়ে আছে। অথচ এদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হ'লে—এদের শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগাবার সুযোগ এদের দিলে—এই লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম বাংলার পক্ষে সম্পদ হ'ত।

ভবিষ্যৎ পরিণতি—

এই উদ্বাস্তু সমস্যার আরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। উপজীবিকাহীন, বৃত্তিহীন লোকগুলি প্রত্যেকেই এক একটি অসন্তোষের বিস্ফোরক হ'য়ে আছে। সমাজের উপর, সরকারের উপর, কংগ্রেসের উপর তীব্র বিরাগ ও বিদ্বেষ এদের প্রত্যেকের মনে আছে। সামাজিক নীতির বন্ধন এদের মন হ'তে ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে। নীতির বন্ধন হ'তে মুক্তি একটা সংক্রামক ব্যাধি;—একজন হ'তে অপরের মধ্যে তা সংক্রামিত হয়। তাই তাদের মনের এই বন্ধন-হীন ভাব পশ্চিম বাংলার জনতার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে। কেবলমাত্র প্রদেশের পক্ষে নয়,—সমগ্র ভারতের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পশ্চিম বাংলা একটি প্রান্তিক প্রদেশ; সেখানে যদি একটা সমাজ-বিদ্রোহী মনোভাব গ'ড়ে ওঠে বা ক্রমে বাড়তে থাকে, তবে তা সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপদের সূচনা করবে। এমন রাজনৈতিক দল ভারতে আছে, যারা এই বাস্তব ও মানসিক অবস্থার সুযোগ নিতে কসুর করবে না। নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করা তাদের বিপ্লব সংগঠনের কর্ম-পন্থার অন্তর্গত; মানুষের দুঃখ কষ্টকে বাড়িয়ে তোলা তাদের নিকট বিপ্লবের প্রস্তুতির অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হয়। কাজেই পশ্চিম বাংলায় ৪০।৪৫ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে যে মানসিক ও বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ঐসব রাজ-নৈতিক দল—তাকে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা ব'লে বুঝে নেবে। সে সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার—অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার অবসান অবিলম্বে ঘটাতে হবে।

সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-কষ্টের পরিমাপ করা জাতীয় সরকারের পক্ষে দরকার। আমাদের রাজনৈতিক দাবা খেলার চালের ভুলে এরা আজ গৃহ-হারা ও বস্তি-হারা। ভারতবর্ষ যা'তে স্বাধীনতা পেতে পারে তার জন্য এরা নিজেদের বিপদ জেনেও বঙ্গ-বিভাগ মেনে নিয়েছিল। এদের ঐ ত্যাগস্বীকারের ফলে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীন ভারতের কি এদের প্রতি কোনই দায়িত্ব নেই? মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ছাড়াও এদের প্রতি একটা বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে—কারণ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে হঠাৎ মীমাংসা আমরা মেনে নিয়েছি তার ফলে এরা আজ উদ্বাস্তু।

এই সমস্যার আর একটা দিক-ও আছে। পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে যে সব হিন্দু ও শিখ চলে এসেছে, তারা যে বিষয়-সম্পত্তি ওখানে রেখে এসেছে, তার কোন ক্ষতিপূরণ আমরা পাইনি। ভারতের পশ্চিম অংশের গৃহত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে তার এক-তৃতীয়াংশের মূল্য-ও হয় না। পূর্ব বাংলা থেকে যে সব হিন্দু আসছে ও এসেছে—তারা-ও কয়েক কোটি টাকার বিষয়-সম্পত্তি ওখানে ফেলে এসেছে বা আসছে। এই বিরাট বিষয়-সম্পত্তির বিনিময়ে উদ্বাস্তুগণ বা ভারত কিছুই পাচ্ছে না। ভারত-পাক চুক্তিতে ঐ বিষয়-সম্পত্তির জন্য একটা ট্রাষ্ট (trust) বা অছি-সংঘ গঠন করার প্রস্তাব আছে। তা এখন-ও স্থাপিত হয়নি,—শুনছি শীঘ্রই হবে। অবশ্যই ঐ অছি-সংঘ স্থাপিত হওয়া উচিত;—কিন্তু তা হ'লে ও ঐ সম্পত্তির বিনিময়ে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার; মূল্য ধার্য ক'রে উভয় রাষ্ট্রকেই নিজ নিজ এলাকার অন্তর্গত উদ্বাস্তুদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন।_ ক্ষুদ্র পশ্চিম বাংলার পক্ষে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ভার গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পার্শ্ববর্তী আসাম ও বিহারকে এর অনেকটা দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাহার দাবীতে ঐ দুই প্রদেশের দ্বার বাঙ্গালীর নিকট রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে—ভাবগত দাবী, মানবতার দাবী এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দাবীর দিক হ'তে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই অপ-প্রচেষ্টার প্রতিরোধ চেষ্টা ভারত সরকার এখন-ও করে নি। এ বিষয়ে অবিলম্বে তাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

খাদ্য পরিস্থিতি—

ভারতের নানা স্থান হ'তে খাদ্যাভাবের খবর আসছে। মাদ্রাজ ও বিহারের খবর যথেষ্ট আতংকজনকই ছিল। খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীমুন্সী স্বয়ং বিহারের ঐ সব অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে বলেছেন—প্রকৃত পক্ষে খাদ্যের অভাব বা দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা সেখানে নেই। ৩৩ জনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ কাগজে বের হয়েছিল। শ্রীমুন্সি বলেন, এর মধ্যে ৫১টি মৃত্যুর সংবাদ একেবারেই মিথ্যা। অপর ১২ জনের ৮ জন মরেছে ম্যালেরিয়াতে এবং অপর ৪ জনের মৃত্যুর কারণ এখন-ও অনুসন্ধান করতে হবে। শ্রীমুন্সি যা বলেছেন তা থেকে এ কথা অনুমান করা যায় যে কাগজের খবর অনেকটা অতিরঞ্জিত। যে ৮ জন ম্যালেরিয়াতে মরেছে, তাদের মৃত্যুর কারণের মধ্যে অপর্যাপ্ত আহার অন্যতম কিনা তা বলা যায় না। শ্রীমুন্সি বলেন বিহারে এখন-ও পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য আছে; তাঁর মতে বিহারে এখন-ও তিনমাসের খাদ্য—চাউল ও গম আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বে-ও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিহারের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত আহার পাওয়া কঠিন হয়েছে যে অঞ্চলে এখন খাদ্যের অভাব ব'লে খবর পাওয়া গিয়েছে—সেখানে বড় বড় জোতদার ও চাউলের কলওয়ালাদের নিকট বহু খাদ্য এখনও আছে। কিন্তু ঐ সব খাদ্য শস্য সরকারের তরফ হ'তে সংগ্রহ করা হয় নি। শ্রীমুন্সির ঐ অঞ্চলে যাওয়ার পর, ঐ সব খাদ্য শস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে।

এতদিন কেন যে ঐ মজুত খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা হয়নি—তার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। বিহারে সম্পূর্ণ কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডলী চালু আছে। কংগ্রেসের আদর্শ হ'ল—জনতার সেবা; ধনী মহাজন ও জোতদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ নয়। বিহারে খাদ্য-শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে গাফিলতি দেখানো হয়েছে, তার পিছনে সরকারী মহলের বড়-লোক প্রীতি কিছুটা আছে কিনা—ভেবে দেখা উচিত। যাক, অন্তত এখন-ও যদি ঐ সব খাদ্য-শস্য সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত দামে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে হয়ত দরিদ্র জনসাধারণের অন্ন-কষ্ট অনেকটা দূর হবে।

পশ্চিম বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি-ও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। কোন কোন অঞ্চলে চাউলের মূল্য প্রায় '৪৩ সালের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এক সের চাউলের দাম এক টাকা বা তার চেয়ে-ও কিছু বেশী হ'লে সাধারণ গৃহস্থদের পক্ষে পেট ভ'রে ভাত খাওয়া সম্ভবপর নয়। সংবাদ পত্রের খবরে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় চাউলের দর ৬০৲ টাকা মণ হয়েছে। অন্ন-প্রার্থী একদল লোক বহরমপুর শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মিছিল বের করে। তাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস-বোমা ও কিছু লাঠি পরিচালনা ক'রে শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেয়। একথা মানতে রাজী আছি যে ঐ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পিছনে রাজনৈতিক দলের উস্কানি আছে; কিন্তু তাই ব'লে বুভুক্ষু জনতার উপর লাঠি চালনা করা কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে খুব সুসঙ্গত নয়।

তা ছাড়া সাধারণ ভাবে-ও পশ্চিম বাংলার অবস্থায় এবার একটু বিশেষত্ব আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এ বছর ১ লক্ষ একর (প্রায় ৬৪ লক্ষ বিঘা) আউস ধানের জমি পাটের চাষে নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ মণ চাউল ঐ জমিতে হ'তে পারত। কথা ছিল এই ২০ লক্ষ মণ চাউল কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত দেবে। এ বছর বন্যা, শ্রাবণে বহু ধান নষ্ট হয়েছে। সর্বোপরি এই বছর নিতান্তই আকস্মিক ভাবে প্রায় ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা হ'তে এসেছে। সরকারী হিসাবে ১৮,৬৮,০০০ রেজিষ্টারী বা তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় এসেছে; তা ছাড়া অন্তত ১১ লক্ষ রেজিষ্ট্রারী-না-করা উদ্বাস্তু মিছিমিছি এসেছে। এঁদের নবাগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ। বছর ধ'রে এদের জন্য-ও বহু খাদ্য-শস্য খরচ করা হয়েছে। এই সব কারণে গত বছরের থেকে এবছর বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি কিছু গুরুতর হবেই। তার জন্য গত বছর থেকে এ বছর পশ্চিম বাংলাকে কিছু বেশী পরিমাণ খাদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত।

কিন্তু এবছর কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলাকে দিতে চাচ্ছে ২৪১ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য—তার মধ্যে ১১ লক্ষ টন হ'ল চাউল। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলাকে দিয়েছে ৩১২ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য—তার মধ্যে ১০০ লক্ষ টন ছিল চাউল। পশ্চিম বাংলা প্রধানত ভাত খাবার দেশ; পূর্ব বাংলা থেকে যে ৩০ লক্ষ লোক এসেছে—তারা ততোধিক ভাত খেতেই অভ্যস্ত। এই অবস্থায় ১০০ লক্ষ টন চাউলের পরিবর্তে মাত্র ১১ লক্ষ টন চাউল এবার পশ্চিম বাংলাকে কোন্ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে—তা আমরা বুঝতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী যে সাড়ে ছয় লক্ষ বিঘা জমি আউস চাষ হ'তে পাটের চাষে নিয়োজিত করা হয়েছে—কেবলমাত্র তার দরুণই গত বছরের থেকে ২০ লক্ষ মণ চাউল এবার বেশী দেওয়া উচিত ছিল।

তাছাড়া এবার বহু মুসলমান পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় চলে গিয়েছে। তাদের পরিত্যক্ত জমির মধ্যে সোয়া লক্ষ একর—৪ লক্ষ বিঘা জমি এবার পতিত প'ড়ে আছে। এটা আমন ধান চাষের জমি। এতে-ও ৩০ লক্ষ টনের উপর চাউল পাওয়া যেত। এ সব কারণ পশ্চিম বাংলা সরকারের আয়ত্তের বাইরে। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা বর্তমানে অনেকটা অনিশ্চিত, এখানে ক্ষমতান্বিলাষী ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এখন অনেক আছে যারা মানুষের অসন্তোষ ও দুঃখ-কষ্টকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে আছে। পূর্ব বাংলা একটি প্রান্তিক প্রদেশ, প্রায় ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে আছে। এদের প্রত্যেকের মনে যে অসন্তোষের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে—তার প্রতি-ও কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়াল রাখা দরকার। তাই আমরা আশা করি—কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে পশ্চিম বাংলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। আমরা জানি প্রায় সমগ্র ভারতেই খাদ্যের অবস্থা এবার গুরুতর। সেই অবস্থা বিবেচনা ক'রেই সবাইকে চলতে হবে। যাতে খাদ্যের কোন অপচয় না হয়—সে দিকে সকলের খেয়াল রাখতে হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পরিচয়

ত্রয়োদশ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৫৭ | পঞ্চম সংখ্যা

জন্মাষ্টমী

বাণী রায়

কালো সর্প, ধরো ফণা মস্তকে তাহার—
যে শিশু নিকষ-কালো ইন্দ্রনীল সম
দেবকীর ক্রোড়ে আজি নিয়েছে জনম
—সে শিশুর শিরে ছত্র ধরো বারবার
আজি কংশ-কারাগারে পাষাণের ভারে
মূর্চ্ছিতা-পীড়িতা মাতা—ডেকে তোল তারে
জিহ্বা লকলকি করো ওঠ পরশন
কালো সর্প!

আঁখি মেলে জাগুক, ও'
জাগুক দেবকী সুপ্তা।
নয়নে লাগুক
বিমুগ্ধ জননীস্নেহে মৃদুল কম্পন।
কালো সর্প, ধরো ফণা কালো শিশু শিরে:
সর্পী, যাও ফিরে একা পাতালের নীড়ে
বোলো যেয়ে রসাতলে আসে অবতার
ওই পায় মৃত্যু বরা প্রাণ-অঙ্গীকার।

আজি কি এ ধ্বংসের প্রথম?
আকাশে ডাকিছে মেঘ,
লাগিছে পবনে বেগ,
কংশ, ওঠো দেখ চেয়ে কৃষ্ণের জনম।

আকাশে বিজলী হাসে
পার হয়ে অনায়াসে
কৃষ্ণধারা—নীচেরা
গেল তারা
কোনখানে?
কোথাকার স্রোতটানে
বিপ্লবের ঘূর্ণীপাকে কার আগমন?
গগনে-পবনে এ কি প্রলয়-লগন?

কুলভোর গাঁথে প্রিয়া ছিকোলো-কেয়ে:
পলাশে-অশোকে দেখ, কত সোনা ফলে।
রাধিকার কপোলের রাগে
শ্যামলের ললাটেতে কুমকুম জাগে
প্রেমে আর অনুরাগে
ঘুমহারা আঁখিতারা দু'জনার জাগে
"লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়া রাখনু,
তইও হিয়া জুড়ন না গেল—"
তবু হায়, বাসরের রাতি
কেটে গেল মিছিমিছি!
ম্লান দীপভাতি।
রাধার নয়নে জল? একি শ্যাম, ছি-ছি!

বিদায়ের বাজে বাঁশী—বুক হ'ল উতরোল ;
মিছে মধুমাস এল,
মিছে এল ফুলদোল।
বঁধু মথুরায়—
বিনে-সুতে গাঁথা মালা খসে 'খসে' যায়।
বৃন্দাবন-লীলা হ'ল সায়
প্রিয়হারা-শ্যামহারা দিন,
বিরহিনী রাধে নিদহীন ;
শুক গাহে, শারী গাহে শ্যামের বিদায়।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ !—
• • • •
"বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।"
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন পরে
গীতা হস্তে, হে পার্থসারথী,
নব-দর্শনের বাণী দিগ্‌দিগন্তরে,
—উদার গম্ভীর রূপে পাঞ্চজন্য করে,—
প্রচারিলে ; আত্মার আরতি :
ফণীছত্র সুশোভিত শির,
তারে কি বন্ধন দেয় বলয়-কঙ্কন ?
গোপিনীর প্রেম-আয়োজন ?
মুখে মুখ রতস-বিলাসে,
নয়, নয় তার স্বপ্রকাশ।

তার লাগি, জানি আমি, রাজরাজেশ্বর
অবহেলে বিসর্জ্জন দিল রাজ্য তার ;
তারি লাগি বিরহিনী ছিঁড়ি মুক্তাহার,
তিথি গনে' মুক্তাফলে যমুনার পার'।
অন্ধ হয় যশোমতী নন্দ আঁখিজলে ;
গোকুলের রজঃকণা কাঁদে পথ চেয়ে ;
রুক্মিণীর পূজারতি ফেলে দীর্ঘশ্বাস ;
সত্যভামা গাঁথে মালা স্বর্ণসূত্র সায়।
কামাচারী সেইজন, অণু হ'তে অণু
ইচ্ছামত প্রতিক্ষণে বিচরণ যার ;
যার হৃদি দেউলেতে রাধা প্রিয়তমা ;
জন্মদিনে গাহি আজি বন্দনা তাহার।
বাসনার-কামনার শেষ তারি কাছে,
অবহেলে চিত্তরথ চালায় যে জন ;
প্রলয়-পয়োধিজলে বেদের ধারণ—
হে কেশব—এ ভারত যাচে, তারে যাচে।
শান্ত তপোবন নয়—
ঝড়ের বাহিনী
উদ্দাম, উদ্দাম হোক ;
জন্মাষ্টমী আজি।
একদিন, বহুদিন এনেছ প্রলয়,
আজ আনো বিবর্ত্তন, সুদর্শনপাণি !
প্রলয়ের ধ্বংসরোলে জন্মশঙ্খধ্বনি,
অশনী বিদ্যুতে তার হয় আগমনী ;
সংগ্রামের পাকে পাকে, পুরুষোত্তম,
মোহমুক্ত হে প্রেমিক, নাশ করো তমো।
যুগান্তের ক্লৈবে আজি পার্থ অসহায়,
ভগ্নচক্র কালরথ—সারথী কোথায় ?

● স্বামীজীর সঙ্গে চার বৎসর

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

প্রথম মহাসমর পুরাদমে চলেছে। ধানের দাম তিনগুণ, কাপড়ের দাম চারগুণ বেড়েছে। বাজারে আগুন ধরেছে। ওষুধ দুষ্প্রাপ্য। যে দেশে দু'পয়সা দুধের সের, দেড় টাকা ধানের মণ, সে দেশে দু'আনা দুধের সের আর দু'টাকা ধানের মন খুব বেশী মনে হয়।

গবর্ণমেণ্ট খুব সজাগ। যে সকল ছেলে স্বদেশী করেছে, বন্যায় দুর্গতকে বিপদগ্রস্ত নিরন্ন দেশবাসীর প্রাণ বাঁচিয়েছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছে, তারাই ইংরেজের চক্ষুশূল হয়েছে। তারা তাদের গ্রেপ্তার করেছে, আটক করে রেখেছে। এদের বলা হত ডেটিনিউ। এদের রাখা হয়েছিল ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে ম্যালেরিয়ার পীড়িত সুদূর পল্লীর বনে জঙ্গলে। থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট। সাপ ছিল ছিল করত চারিদিকে। সোনার চাঁদ ছেলে এরা দেশের গৌরব, জাতির অমূল্য সম্পদ। অর্ধভুক্ত অভুক্ত রেখে এদের নির্বীর্য করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এদের ভিতর কেউ হল পাগল, কারুর হল যক্ষা। দেশকে ভালবাসার অপরাধে এমনিভাবে কত ছেলে তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছে, লোহার গরাদের অন্তরালে অথবা মানুষের সমাজ থেকে দূরে জনবিরল স্থানের নিরালা কুটীরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরেছে।

আত্মগোপন করে গোয়েন্দারা ঘুরে বেড়াত সকল সময় সকল স্থানে। তাদের কাছে স্থান-কাল-পাত্রের বিচার বিবেচনা ভেদাভেদ ছিল না। তারা আড়ালে আবডালে তথ্য সংগ্রহ করত। পুলিশ ঘর খানাতল্লাসী করত। পুলিশের দাপটে দেশের লোক মুষড়ে গিয়েছিল। লালপাগড়ী জুজুর ভয়, জেলের ভয়, নির্যাতনের ভয় মানুষকে অমানুষ করে তুলেছিল। অপরিচিত ভদ্রলোককে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ভেবে সকলে এড়িয়ে চলত। ইস্কুল-কলেজে অফিস-আদালতে সভায় মজলিসে গোয়েন্দারা গা ঢাকা দিয়ে থাকত। কেউ কারুকে বিশ্বাস করত না, কেউ কারুর কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে ভয় পেত। তখন ব্যক্তিজীবন সন্ত্রস্ত, সমাজজীবন কলুষিত, জাতীয় জীবন অন্তর্মিত।

আমি তখন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজ-ইস্কুলে মাষ্টারি করি। বোর্ডিং-এর ছেলেদের হয়রানি থেকে বাঁচাবার জন্য মাসে মাসে আমি তাদের ঘর,বই, চিঠিপত্র, ট্রাঙ্ক-বাক্স-পেটরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতাম। এমন কী গীতার ভিতরও পুলিশ বিপ্লবের গন্ধ পেত। জেল খাটা ছেলের চিঠি, দেশ নেতাদের ছবি পুড়িয়ে ফেলা হত। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ইস্কুলে গিয়ে ছেলেদের ভর্ত্তির খাতা টেনে নিয়ে দেখত। অন্য জেলার ছেলের নাম পেলে, সে কে, কোথায় থাকে, কার কাছে থাকে ইত্যাদি আবশ্যক-অনাবশ্যক প্রশ্ন করে জ্বালাতন করত। জেলার গোয়েন্দা বিভাগের একটি লোক সাদা পোষাকে প্রায়ই আসত। লোকে তাকে 'মামা' বলত। 'মামা' এসেছে শুনলে সকলে সাবধান হত।

সকল ঋতুতে আমি ভোরে উঠে বেড়াতে যেতাম। কার্ত্তিক মাস। অল্প অল্প কুয়াশা ভেসে যাচ্ছিল ধোঁয়ার মতো। আমি বেড়িয়ে ফিরে আসছিলাম একটা কাটা খালের বাঁধের উপর দিয়ে। এক দিকে বাঁধের নিচে ভরা ক্ষেত। সবুজের ঘটা। চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাতাস সন্ সন্ করে বয়ে যাচ্ছে। 'থোড়'-গর্ভ ধানগাছ ধীর সমীরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখলাম অদূরে গৈরিক-পরিহিত এক সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি। তাঁর গায়ে জড়ানো গেরুয়া রঙের একখানা উত্তরীয়, গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, এক হাতে দণ্ড আর এক হাতে কাঠের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। ইতিমধ্যে সামনাসামনি এসে পড়েছেন তিনি। গৌরকান্তি বলিষ্ঠ দেহ বিস্তৃত বক্ষপট। দিব্য অপলক নেত্রের মধুর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এক অপরূপ প্রভা।

সাধু সন্ন্যাসীর উপর চিরকাল আমার একটা অশ্রদ্ধা

---

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

ছিল। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি চোর ডাকাত খুনেরাই নাকি সন্ন্যাসীর গৈরিকে আত্মগোপন করে কৃতকর্মের শাস্তি এড়িয়ে চলে। এঁকে দেখে আমার মনে হল ইনি তেমন সন্ন্যাসী নন। কী জানি কেন আমার মাথা লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণতলে। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

প্রসন্ন গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—দিন কয়েক হল আমি এখানেই আছি। রোজ দু'বেলা আমাকে থানায় যেতে হয় হাজিরা দিতে। আপনি আমার সংগে আসবেন না, পুলিশ দেখতে পাবে।

এই কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলে তিনি দ্রুত চলে গেলেন থানার দিকে। তখনও রাস্তায় বেশী লোকজন আনাগোনা করতে আরম্ভ করেনি। তাঁর কণ্ঠস্বর আমার মনে এক অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলেছিল। তাঁর প্রশান্ত দৃষ্টি, প্রসন্ন মুখচ্ছবি, দিব্যভাব আমার মনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেল। কে এই দণ্ডী সন্ন্যাসী? গবর্ণমেণ্ট কেন এই ত্যাগী বিরক্ত পুরুষকে এমনিভাবে ধরে রাখবে? তা'হলে গেরুয়া কী এঁর ছদ্মবেশ? তাও তো মনে হল না।

রাজবাড়ির দৌলতে দু'দিন ছাড়া এখানে অনেক সন্ন্যাসী আসে। কৌপীন এঁটে চিমটা নিয়ে ধুনি জেলে তারা বসে রাস্তার ধারে, গাঁজায় দম দেয়, রাজবাড়ি থেকে ঘি-ময়দা ডালের সিধা আদায় করে, বিশ্বাসী লোকদের হাতের রেখা দেখে পয়সা নেয়, দিন কয়েক পরে চলে যায়। কই, ইনি তো তেমন সন্ন্যাসী নন?

কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় একজন সন্ন্যাসী আমার হাত দেখে কত কী বলে দু'টো টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। সেদিন থেকে আমি সন্ন্যাসী দেখলে সরে দাঁড়াই। আমার মনে হত ওরা কী যাদু জানে। মানুষের ভবিষ্যৎ জানবার একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। তারই সুযোগ নিয়ে ওরা লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। আবার এক একটা লোকের ধর্মের বাতিক আছে। কেউ বা বনেজঙ্গলে, তীর্থস্থানে সন্ন্যাসীর পিছনে ছোটে।

অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত আমি ভগবানে বিশ্বাস করি কিন্তু ধর্মের গুঢ়তত্ত্ব বুঝি না। গীতা ছাড়া অন্য কোন ধর্মের বই আমি পড়িনি। তাও আধা বুঝি। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা আমার ধাতে সয় না। আমি বুজরুকী চক্ষে করতে পারি না। আমি জানি ভারতবর্ষে লাখ লাখ নেংটি পরা সন্ন্যাসী আছে। আমি ভাবতাম এরা সমাজের আগাছা। এরা শোষণ করে, উৎপাদন করে না। এরা গৃহীর অন্নে পুষ্ট অথচ গৃহীকে কৃপার পাত্র মনে করে। তাদের ভিতর যারা ভালো তাদেরও তো পলায়নী মনোবৃত্তি—তারা স্বার্থপর। তারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার থেকে, সমাজ থেকে দূরে থাকে, মাটির পৃথিবীকে ছেড়ে শূন্যমার্গে কল্পনার রাজ্যে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু আজ যে লোকটিকে আমি দেখেছি তাঁর যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে—মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষের সংগে তাঁর যেন একটা নিকট সম্বন্ধ, আত্মীয়তা আছে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Love at first sight—প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়া। শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার প্রথম দৃষ্টিপাতে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল,বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতটা আমার ভালো লাগেনি। যৌন প্রেম ও আসঙ্গলিপ্সা সম্বন্ধে একথা সত্য কিনা জানি না, তবে চরিত্রবল ও পবিত্রতার আকর্ষণ যে কত শক্তিশালী তা আমি সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম।

এই নবাগত সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সংবাদ নিয়ে আমি জানলাম যে তিনি 'ডেটিনিউ'। সন্ন্যাসী কী ডেটিনিউ হয়? যে সংসার মুক্ত, পৃথিবীতে যে থাকে পদ্মপত্রে জলের মতো, কাদার পাঁকাল মাছের মতো, তার কী সম্বন্ধ থাকতে পারে পৃথিবীর সংগে? এই চিন্তা প্রথমে আমাকে বিচলিত করেছিল।

বাজারে বেন্তা-পল্লীর পাশে একখানা ছোট দোতলা বাড়ি। উপরে মাত্র একখানা মাঝারি রকমের ঘর। সামনে খোলা ছাদ। নিচের তলায় রান্নাঘর আর

একখানা ছোট অন্ধকার কামরা। বাড়িটার ভাড়া দশ টাকা—গবর্ণমেণ্ট স্থিত। সন্ন্যাসীর মাসোহারা চল্লিশ টাকা। দণ্ডী সন্ন্যাসী—। আগুন ও ধাতু স্পর্শ নিষিদ্ধ। নিরামিষভোজী। একবেলার খাদ্য আতপ চাল ও কাঁচকলা। রাত্রে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা। ধুনি বাবুনের হাতে টাকা পয়সা থাকত। সেই সন্ন্যাসীর খরচ চালাত। উদ্বৃত্ত টাকায় বই কেনা হত। আমার সংগে মাখামাখি হওয়ার পর গরীব ছেলেদের সাহায্যের জন্য ছ'শ টাকা তিনি আমার হাতে দিতেন।

শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিরাসক্ত সম্ভোগহীন জীবন। সরল সহজ অমায়িক ব্যবহার। অদ্বৈত বেদান্তের মূর্ত্ত প্রতীক। কী জানি কেন প্রথম দর্শন থেকে তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে। আমি রোজ ভোরে থানার পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যেতাম। ফিরবার সময় তাঁর সংগে দেখা হত। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আলাপ আলোচনা চলত। ক্রমে দেখলাম ইনি যেন ছাই-চাকা আগুনের ফুল্‌কী, মহাপ্রাণ দেশ-প্রেমিক। সন্ন্যাসীরা পূর্বাশ্রমের কথা বলেন না। অপরের কাছে শুনেছিলাম তাঁর পূর্বনাম ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্মস্থান বরিশাল। চিরকুমার, আজীবন দেশব্রতী। বরিশালের মনীষী অশ্বিনীকুমারের ডান হাত ছিলেন ইনি। ব্রহ্মচারী অবস্থায় করতেন মাষ্টারি, দেশের কাজ। অবসর সময় কাটতো ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠে। তারপর কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সেখানেই থাকতেন। বৈপ্লবিক কাজে যোগাযোগ ছিল, এই সন্দেহে তাঁকে কাশী থেকে এনে কিছুদিন সন্দীপে আটক করে রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে তাঁকে মহিষাদলে পাঠানো হয়।

(২)

কয়েক মাসের মধ্যে আমি তাঁর অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠলাম। ক্রমে রাজবাড়ির দুই ডাক্তার ৺ক্ষেত্রবাবু, ৺ললিত বাবু প্রভৃতি কয়েকজন স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে একটি মিলনচক্র গড়ে উঠল। স্বামীর পোষ্ট অফিসের বারান্দায় একখানা বেঞ্চির উপর বসে আমাদের আলোচনা চলত। বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টার ৺অম্বর বাবু কাজ করতে করতে অফিসের ভিতর থেকে আমাদের আলোচনা শুনতেন। অনেক সময় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দু'তিন ঘণ্টা নানা বিষয়ের আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতাম। ইস্কুলের জনকয়েক বড় ছেলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করত। তাঁর অলক্ষ্য প্রভাবে তাদের ভিতর দুর্নীতি ও বদভ্যাস দূর হয়ে গেল। একদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেছিলেন—তাড়না করে ছেলেদের শাসন করো না। বেতের শাসনের চেয়ে ভালোবাসার শাসন বেশী কার্যকরী।

একদিন তিনি বলেছিলেন তোমরা আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করবে?

—কী অনুরোধ বলুন।

—রোজ সকালে উঠে প্রার্থনা করবে, বলবে—হে ঈশ্বর, তুমি আমার দেশকে স্বাধীন কর। আমি হেসে বললাম—প্রার্থনায় কী দেশ স্বাধীন হবে?

—দেশের কোটি কোটি লোক যেদিন স্বাধীন হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে, সেদিনই তারা স্বাধীন হবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তাদের স্বাধীনতা রুখতে পারে।

আগে দেশের লোককে সৎ সততা না থাকলে স্বাধীনতা আসে না।

—পরাধীন দেশে সততাই বল, আর ধর্মই বল, কিছুই হয় না। আগে স্বাধীনতা, তারপর আর সব।

আর একদিন তিনি বলেছিলেন—তুমি বেদান্ত পড় না কেন? আমি বেদান্তের নাম শুনে ভড়কে গেলাম। বললাম বেদান্ত? বেদান্তই তো ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। শুনেছি মায়াবাদ ভারতের মানুষকে অলস, কর্মহীন ও অপদার্থ করে দিয়েছে

—দেখছি তুমি সাহেবদের মুখের ঝাল খেয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছ। লোকে বেদান্ত পড়ে না, অথচ বেদান্তের কদর্থ করে।

বেদান্তের শিক্ষা ভারতের অধঃপতনের কারণ নয়। বরং যেদিন থেকে লোক বেদান্তের শিক্ষা ছেড়েছে—'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' কর্ম করতে ভুলেছে, সেদিন থেকে ভারতবর্ষের পতন শুরু হয়েছে।

—কিন্তু ইতিহাসে দেখি যে সময় থেকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার আরম্ভ করেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের পতন আরম্ভ হয়েছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমে তো মুসলমানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল?

—ইতিহাসে মোটামুটিভাবে যুগ বিভাগ করা হয়। মানুষের দেহে কখন রোগের বীজাণু প্রবেশ করে তা জানা যায় না। রোগপ্রকাশের কিছু পূর্বে রোগের বীজাণু যে তার দেহে প্রবেশ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডাক্তাররা তার নাম দিয়েছে incubation period. ভারতবর্ষের সমাজ দেহে ঘুণ ধরেছিল শঙ্করাচার্যের অনেক আগে, অন্ততঃ অশোকের সময় থেকে। আমার মনে হয় বৌদ্ধদের নির্বিচারে সন্ন্যাস গ্রহণ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সংসারধর্ম ত্যাগ, মঠে ভিক্ষুণী ও ভিক্ষুদের অবাধ মিলন, বৌদ্ধ রাজ রাজড়ার দানপুষ্ট অলস জীবন ভারতবর্ষের পতনের অন্যতম কারণ।

—হিন্দুদেরও তো সন্ন্যাস ছিল?

—ছিল। কিন্তু সন্ন্যাস ছিল হিন্দুদের চতুর্থ আশ্রম। হিন্দুরা বলেছে—ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। হিন্দুরা যুবা ও প্রৌঢ় বয়সে সমাজ ও জাতির সেবা করত। তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ সমাজ ও জাতিকে দান করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করত এবং তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করত। তবে বৌদ্ধযুগের শেষ দিকে ভারতবর্ষের পতন আরম্ভ হলেও তখনও তার অন্তর্নিহিত শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। এজন্য ভারতবর্ষ শক হূণ প্রভৃতি জাতিদের আপন করে নিতে পেরেছিল, হিন্দুধর্মের কুক্ষীগত করে নিয়েছিল। পরকে আপন করা শক্তির কাজ। সেই শক্তির বলে গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও উৎকর্ষ আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। তবে সে যেন নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো। ভারতবর্ষের জাতিসাধারণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে তারা মুসলমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু তার একটু পূর্ব থেকে ভারতীয়গণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে বৃহত্তর ভারত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং সেখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও কয়েক শত বৎসর সঞ্জীবিত ছিল।

—তাহলে মুসলমান যুগও কী ভারতবর্ষের পরাধীনতার যুগ?

—নিশ্চয়ই। মুসলমান আক্রমণের সহিত ভারতবর্ষ পরাধীন হয়েছে।

প্রথম প্রথম মুসলমানরা এদেশ আক্রমণ করেছে, ধনরত্ন লুট করে নিয়ে গেছে, নরহত্যা করেছে, মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছে। তারপর ওরা এদেশে বসবাস করেছে, সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, দেশ শাসন করেছে, এদেশের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, জাতিসাধারণকে বঞ্চিত করে নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করেছে। তাদের ভিতর দু'একজন একটু ভালো রাজা যে না ছিল তা নয়। তাদের অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী ছিল। তারা তাজমহল গড়েছে কিন্তু তা সৌন্দর্যচর্চা বা শিল্পকলার উন্নতির জন্য নয়। তাদের স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পকলা—সৌন্দর্যচর্চার—সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফল নয়। এ যেন ইংরেজদের এ দেশে রেলপথ বা বৈদ্যুতিক বার্তাবহ প্রবর্তনের মতো—অথবা খৃষ্টান যাজকদের বাংলায় বই ছাপার মতো স্বার্থ-প্রণোদিত কার্য। তারা যা কিছু করেছে তা নিজেদের সুবিধা বা বিলাসিতার জন্য। পরোক্ষে—তার ফল ভাল হয়ে গেছে। গরীবদের ভাগ্যে খুদকুঁড়ো জুটেছে। হিন্দুরা কেঁদেছে আর ধর্মরক্ষার জন্য শামুকের মতো আধারের শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করেছে। মুসলমানদের উগ্র-ধর্মান্ধতা এবং হিন্দুদের বিধি-নিষেধ আচারের তীব্রতা এই দুটি জাতিকে বরাবর পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু মিলনের যে চেষ্টা একেবারে হয়নি তা নয়। রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি ভক্ত সাধকরা প্রচার

করে ছিলেন যে ভগবানের কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। রঘুনন্দন শিরোমণির কঠোর বিধান ও আচার-নিষ্ঠতা এবং বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের গূঢ় আধ্যাত্মিকতার সার্থকতার সন্ধিস্থানে হয়ে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করলেন। এই যুগে শ্রীচৈতন্য হলেন জাতির উদ্ধারকর্তা, মুক্তিদাতা।

—তিনি কী মুসলমানদের আপন করতে পেরেছিলেন?

—মুসলমানদের আপন করে নিতে পারেননি বটে কিন্তু যারা আচারনিষ্ঠতার অত্যাচারে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলমানদের দলপুষ্টি করছিল তিনি তাদের হিন্দু সমাজে স্থান দিলেন। দু'একজন মুসলমান হিন্দু হয়েছিল কিন্তু চৈতন্যদেব মুসলমানকে হিন্দু করতে চেষ্টা করেন নি, করলেও পারতেন না—কেউ কখন পারেনি।

—কেন?

—মুসলমান ধর্মের মূল শিকড় ভারতবর্ষের বাইরের মাটি থেকে রস ও শক্তি সঞ্চয় করে পুষ্ট ও সতেজ আছে। ইস্‌লামের ঐতিহ্য মিলনের পরিপন্থী। ইসলাম সকল দেশে বোদ্ধবেশে আবির্ভূত হয়েছে। ইস্‌লাম গ্রাস করে, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে—ইসলাম হজম করে, হজম হয় না।

সে বছর রথতলায় সেটেলমেণ্টের চারজন হাকিমের তাঁবু পড়েছে। রাজা ও প্রজার মধ্যে বৃদ্ধি জমির খাজনা নিয়ে মামলা চলেছে। প্রজারা ধর্মঘট করেছে। দুই পক্ষেরই জেদ। প্রজারা এক হয়ে গেছে দেখে রাজা অবাক হয়ে গেছেন। যারা এতকাল ভয়ে কথা বলতে পারত না তারাই এখন তাদের খণ্ড শক্তি সংহত ও একত্র করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রজারা খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে। রাজা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে সার্টিফিকেট জারি করে খাজনা আদায় করবার ক্ষমতা দিলেন। বাকি খাজনা—বিনা নালিশে সুদ-সমেত আদায় হতে লাগল। প্রজাদের সংহতি ভেঙে গেল। তারা ঠকে গেল। রাজার জয়জয়কার হল।

লোকের ভিড় ঠেলে স্বামীজীকে সংগে নিয়ে আমি বোর্ডিং-এ এলাম। তাঁর সংগে মেলামেশায় এখন কোন অসুবিধা ছিল না। জেলার গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা স্বামীজীকে ভক্তি করতেন। তিনি এখন অবাধে চলাফেরা করেন। বোর্ডিং-এ দশ-বারোটি ছেলের বসন্ত হয়েছে। তিনি রোজ দু'বেলা আসেন, রোগী দেখেন, ওষুধ দেন, তদ্বির করেন।

স্বামীজীকে কেন্দ্র করে একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। আমি রোজ ভোরে যাই তাঁর কাছে বেদান্ত পড়তে। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি আমাকে মন্ত্র দেবেন? তিনি বললেন—আমি তো মন্ত্র-টন্ত্র দিই না। যদিও দিই, আমার মন্ত্র অন্য ধরণের।

—সে কী?

—তা পরে বলছি। মন্ত্র নেবার আগে আমার কাছে একটি অঙ্গীকার করতে হবে।

—কী অঙ্গীকার?

—তোমার যথাসর্বস্ব আমায় দান করতে হবে। তার মানে এ নয় যে তোমার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব নিয়ে নেব। দেশের জন্য প্রয়োজন হলে তোমার যা কিছু তোমার যথাসর্বস্ব আমার হাতে তুলে দিতে হবে

তাঁর কথা শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তিনি হেসে বললেন—তোমার চিন্তা কিছু নেই। আমি চাই অকুণ্ঠিত বিশ্বাস, সর্বস্ব ত্যাগ করবার মতো মনোবল, উদারতা। তুমি ভেবে পরে বলো। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মন্ত্র নেবার কথা আমি আর কখনো বলিনি।

প্রথম মহাসমর শেষ হল। ডেটিনিউদের ছেড়ে দেওয়া হোল। স্বামীজীও মুক্তিলাভ করলেন। এন্টালীতে যোগেশবাবুর (মুখোপাধ্যায়) বাসায় তিনি কিছুদিন থাকলেন। বহু বন্দী মুক্তিলাভ করে এখানে এসে জড় হল। কিন্তু কলকাতা তাঁর ভালো লাগেনি। কলকাতার নিকটে কোন স্থানে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুবিধাজনক বাসা পাওয়া যায় নি অগত্যা

তিনি মহিষাদলে এলেন। তাঁর থাকবার জন্য রাজারা একখানি বাড়ি ছেড়ে দিলেন। তাঁর ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থাও হোল। এখন তিনি মুক্ত, স্বাধীন। রোজ সকাল থেকে বেলা দশটা এবং বিকাল চারটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমরা স্বামীজীর কাছে থাকতাম। দুপুরে তিনি নিজে পড়াশুনা করতেন। তাঁর বিপ্লবী শিষ্যদের ভিতর অরুণবাবু (গুহ) মনোরঞ্জন বাবু (গুপ্ত) প্রভৃতি অবাধে যাতায়াত করতেন। গীতা উপনিষদ বেদান্ত আলোচনায় সময় কাটত। এখানে যেন প্লেটোর একাডেমির মতো দার্শনিক তত্ত্ববিচারের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

একদিন স্বামীজীকে বলেছিলাম—আপনি তো বেদান্ত নিয়ে এত আলোচনা করছেন। আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি বই লিখুন না।

—বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি বই লিখতে ইচ্ছা হয়। তবে লিখে কি হবে?

—বেদান্ত নিয়ে কত মতবাদ, কত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ইত্যাদি বিষয় পড়লে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, দেশের উপকার হবে। আমি শুনছি না, আপনাকে কলম ধরতে হবে। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস লিখতে হবে।

স্বামীজী হেসে বললেন—আচ্ছা, তাই হবে। তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। দিনের পর দিন লেখা চলতে লাগল। কয়েক মাসের ভিতর একখানি বিরাট গ্রন্থ লেখা হয়ে গেল। তা ছাড়া 'রাজনীতি' এবং 'সবলতা ও দুর্বলতা' নামে আরও দু'খানি বই লেখা হল। তিনি 'ভারতবর্ষে' দু' একটি প্রবন্ধও লিখলেন। বই ক'খানি তাঁর দেহরক্ষার পর তাঁর শিষ্যদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখে দিলেন, বিখ্যাত বৈদান্তিক ৺রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ যিনি পরে স্বামী চিদ্ঘনানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। গ্রন্থখানি সরস্বতী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

মহিষাদলের বড় রাজা ৺সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভালবাসতেন। তিনি একজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মচারীকে তাঁর প্রাসাদে এনে স্বামীজীকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে যান। ব্রহ্মচারী স্বামীজীকে বলেছিলেন—আপনি দণ্ডী সন্ন্যাসী। মানুষের সমাজে আপনি বাস করছেন কেন? আপনি শীঘ্র চলে যান। নইলে আপনাকে শীঘ্র সংসার ছেড়ে একেবারে চলে যেতে হবে।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করে আসার পর আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—স্বামীজী, আপনার সঙ্গে ওঁর কী কথা হোল? লোকটি ভণ্ড, না সত্যই ভালো? তিনি বলেছিলেন—লোকটি সত্যই সাধক। তাঁর সঙ্গে যে সকল কথা হয়েছিল তা বলা নিষিদ্ধ। তবে তাঁর বর্তমান দেহ যে অন্তের সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় সময় কাটতে লাগল। একদিন আমি বলেছিলাম অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের গোঁড়ামি দেখে আশ্চর্য হই। বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেছেন—ব্রাহ্মণ ছাড়া শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নেই।

স্বামীজী বললেন—যে যুগে শঙ্করের আবির্ভাব হয়েছিল সে যুগে ব্রাহ্মণরা বলত শূদ্রের আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভে অধিকার নেই। শঙ্কর শূদ্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার স্বীকার করেছেন কিন্তু সে অধিকার বেদপাঠ-পূর্বক নয়। পঞ্চমবেদ মহাভারত পাঠপূর্বক। সুতরাং সে যুগের আচার্যদের তুলনায় শঙ্করকে উদার বলতে হয়।

—অনেকে বলেন, পাশ্চাত্য দর্শন যেখানে শেষ, ভারতীয় দর্শন সেখানে আরম্ভ। এর অর্থ কী?

—চিন্তা জগতে ইয়োরোপ ভারতের পিছনে। গ্রীসে প্লেটো এবং জার্মেনিতে ক্যাণ্ট কতকটা অগ্রসর হয়েছিল। প্লেটোর মতে মনোময় জগৎ সত্য। ক্যাণ্ট বলেন, বস্তুর সত্তা নেই, বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানই সত্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শন বলেন, মনন মনের কাজ। কিন্তু মন জড়, সত্য নয়। সুতরাং মন যা মনন করে তা অসত্য। অসত্য বস্তুর কাজ অসত্য। পাশ্চাত্য দর্শনে মনের

অতিরিক্ত কিছু নেই কিন্তু চিন্তু দর্শন বলেন, মনকে জয় করার পর আত্মজ্ঞান আসে। মনের পর আত্মা। মনসো মনো যৎ।

মহিষাদলে প্রায় ছ'মাস থাকার পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে। দু' একদিন ছাড়া তাঁর জ্বর হয়। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কলকাতা থেকে যোগেশবাবু এলেন, অরুণ বাবু এলেন, তাঁর অন্যান্য শিষ্যরা এলেন। সকলে তাঁকে অনুরোধ করলেন কলকাতায় যেতে। তাঁর জীবনের প্রতিজ্ঞা। তিনি কোথাও যাবেন না। সকলে জেদ করতে লাগলেন তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথাও নিয়ে যেতে। তিনি বললেন, সন্ন্যাসীর আবার বায়ুপরিবর্তন? তার তো সকল স্থানই সমান। কারোর কথা তিনি শুনলেন না। আমি বললাম, আপনাকে যেতেই হবে। তিনি বললেন, যে বস্তু জড়, পচনশীল, সেটা জীর্ণ হয়ে গেলে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করা মূর্খতা। আমি বললাম—আপনার শরীর রক্ষায় আপনার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু আপনাকে যে দেশের ও দশের জন্য দরকার। আপনি সে দিকটা দেখছেন না কেন? আপনার শরীর রক্ষা চাই।

—শরীর কিছুই নয়, আদর্শ চিরজীবি। আমার শরীরটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা না করে আমার আদর্শ রক্ষা করতে চেষ্টা করলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

—তা যাই হোক, আপনাকে যেতে হবে। আমার আগ্রহ এবং অন্য সকলের তৃষ্ণীভাব দেখে খেখে কি ভেবে বললেন—তাই হোক, তোমাদের হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। আচ্ছা কোথায় নিয়ে যাবে চল

অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বামীজীর অনুমতি পেয়ে উৎফুল্ল হলেন। স্থির হল মধুপুর যাওয়া হবে। দিন কয়েকের ভিতর যোগেশ বাবু ও আমি স্বামীজীকে নিয়ে মধুপুরে রেখে এলাম। সেখানে তাঁর তিনমাস থাকা হবে ব্যবস্থা হল। মধুপুর স্বাস্থ্যকর স্থান। পৌষমাস। খুব শীত। এখানে বাংলা দেশের মতো সকালে 'পাতায় পাতায়' 'নিশির শিশির' পড়ে না।

একমাস পার হতে না হতে স্বামীজী চিঠি লিখলেন, এ জায়গা আমার ভালো লাগছে না। তোমরা আমায় কোথায় রেখে গেলে? আমাকে শীগ্‌গীর নিয়ে যাও। এখানে অনেক লোক বেড়াতে এসেছে সত্য কিন্তু এরা মোরগ মাংস খায়, ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রীপুরুষ অবাধে, মেলামেশা করে। সৎচিন্তা সদালাপ নেই, সামাজিক বন্ধনের বালাই নেই, এরা শিব ও ঈশ্বর সেবার জন্য এখানে এসেছে। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমায় নিয়ে যাও। আমি ভালো হয়ে গেছি।

তাঁকে কলকাতায় আনা হল। ডাক্তার দেখানো হল। চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে স্থির হল। কিন্তু তিনি জেদ ধরলেন, তিনি মধ্যপ্রদেশে যাবেন। তাঁর এক শিষ্যকে কথা দিয়েছিলেন তার কাছে যাবেন বলে। সেখান থেকে ফিরে এসে চিকিৎসা করাবেন। আর মধ্যপ্রদেশের জলবায়ু ভাল। সেখানে দিনকয়েক থাকলে হয়তো শরীর ভালো হয়ে যেতে পারে। যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন ফিরে এসে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিবেন।

তাঁর মধ্যপ্রদেশে যাওয়ার কিছুদিন পরে হঠাৎ কলকাতা থেকে সন্ধ্যার সময় একখানা টেলিগ্রাম পেলাম, স্বামীজীর অবস্থা উদ্বেগজনক। তখন রাত্রে মহিষাদল থেকে কলকাতা আসার কোন উপায় ছিল না। পরদিন ভোরে নদী পার হয়ে কলকাতা থেকে ট্রেণে এন্টালি পৌছুতে রাত্রি ন'টা হয়ে গেল। স্বামীজী তখন নেই। তাঁর দেহ বরিশালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শঙ্করমঠে সমাধি দেওয়ার জন্য পাঠানো হবে স্থির হয়েছে। কাঠের শবাধারের পাশে বসে ছিলেন তাঁর ছোট বোন। তিনি সংবাদ পেয়ে কাশী থেকে এসেছেন। পাতলা চেহারা, গৌরিক বসন সন্ন্যাসিনী। যেমন ভাই তেমনি বোন এক বোঁটায় দুটি ফুল। মাথায় জটাময় আলম্বিত বেণী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—নিস্পৃহ, নির্বিকার দৃষ্টি। জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর রজনীতে শবাধার পার্শ্বে উপবিষ্টা সন্ন্যাসিনী

সকলের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা করছিলেন। তাঁর মুখে প্রতিভাত হয়েছিল সন্ন্যাস জীবনের এক অপূর্ব শ্রী ও সংযম আমি এ দৃশ্য কখনও ভুলতে পারবো না—একদিকে গৈরিক পরিহিতা এক মহীয়সী রমণী, অন্যদিকে মৃত্যুর পরপারে উপস্থিত—আর এক সন্ন্যাসীর কুসুমাকীর্ণ প্রাণহীন দেহ।

মধ্যপ্রদেশে গিয়ে স্বামীজীর স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে পড়েছিল। কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসার পথে গাড়িতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নি।

সব শেষ! এত জ্ঞান, এত পাণ্ডিত্য, সেই দুর্জয় দেশপ্রাণতা সবই তো ছুটল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে—পর্যবসিত হল মৃত্যুর গাঢ় গভীর অন্ধকারে! জ্ঞানী বলে, ত্যাগী বলে, সন্ন্যাসী বলে মৃত্যু বিশেষ কোন সম্মান করল না। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, গৃহী-সন্ন্যাসী সকলকেই চুকিয়ে দিতে হয় ষোল আনা তার কাছে। কিছুই তো আমাদের রক্ষা করতে পারে না! তবু মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেন প্রাণ রাখতে প্রশান্ত হয়ে ওঠে? আমরা ছেড়ে দিতে চাই না আমাদের প্রিয়কে, আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসার পাত্রকে—কিন্তু ছেড়ে দিতে হয়। হয়তো তার আর প্রয়োজন নাই, হয়তো তার কাজ ফুরিয়েছে,—হয়তো তার চাওয়া পাওয়া দেনা-পাওনা শোধ হয়ে গেছে। আজ যে যুবক, আজ যার চোখে দুরন্ত উল্লাস, বাহুতে অমিত তেজ, অন্তরে অফুরন্ত প্রেম,—কাল সে বৃদ্ধ পলিতকেশ। আজ যে নবীন, সবুজ তাজা,—কাল সে প্রবীণ পক্ক ও শুষ্ক—সংসারে কাল তার প্রয়োজন নাই, সে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুর পদতলে, আত্মাহুতি দেয় পতঙ্গের মতো মৃত্যুর জলন্ত পাবকশিখায়।

আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলির ভিতর এক অদ্ভুত আলোড়ন জেগে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, যুগ-যুগান্তের, কাল-কালান্তরের শত শত মহাপুরুষ, কোটি কোটি নগণ্য নরনারী এমনিভাবে ছুটে চলেছে অবিশ্রান্ত বেগে বিরাটরূপী মৃত্যুর ভিতর চিরসমাধি লাভ করতে। নীরব প্রার্থনার সুরে—আমি বলেছিলাম—

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।

অতীত চারটি বছরের দিনগুলির কথা—আমার মনের পর্দার উপর ভেসে উঠল। মনে পড়ল এক প্রদোষের আবছাওয়ায় সেই স্বপনচারী জ্যোতির্ময় মানুষটিকে—মনে পড়ল তাঁর অহেতুকী অকুণ্ঠ অকৃত্রিম স্নেহের কথা। সবই যেন স্বপ্ন—সবই যেন মায়া! শরাধার রাত্রির গাড়িতে বরিশাল রওনা হলাম। পরদিন প্রভাতে আমি ফিরে এলাম বিষণ্ণমনে "বিসর্জি প্রতিমা যেন বিজয়া দিবসে"।

যুগধর্ম্ম

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিদ্যাবিনোদ

শক্তি কি দুর্বলে সদা করিতে পীড়ন?
বুদ্ধি কি ঠকাতে শুধু হ'বে প্রয়োজন?
অর্থ কি নিজের মাত্র ভোগ বৃদ্ধি তরে?
আত্মার কি নয় আজ ধোকা নামান্তরে?

ভাণ

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিদ্যাবিনোদ

শত্রু করে বেশী ক'রে বন্ধুত্বের ভাণ,
তারই থেকে হ'বে সবে সদা সাবধান।

রাজনীতির কোপে ত্রয়ী সাধনা

নারায়ণ চৌধুরী

অধুনা বাংলা দেশের রাজনীতি-প্রভাবিত কোন এক সাহিত্যিক মহলে রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা জেহাদের মনোভাব দেখা দিয়েছে। এই সব রাজনৈতিক সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ হ'ল এই যে আধুনিক বামপন্থী ধ্যানধারণার মানদণ্ডে রামমোহন ছিলেন বুর্জোয়া সংস্কারবাদী; তাঁকে কোনমতেই বিপ্লবী আখ্যা দেওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনে একটা নূতন গতিবেগ আনলেও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব যথেষ্ট প্রবল ছিল না; বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে ইংরেজ-শাসনকে তিনি বড় রকমের প্রতিবন্ধক মনে করেন নাই। ধর্মকে রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান দিয়ে তিনি কার্যতঃ বিপ্লবী চেতনার বিরোধিতাই ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সংস্কৃতির মানস-সন্তান। তাঁর রচনায় গণতান্ত্রিক প্রবণতার বিশেষ স্থান ছিল না। একমাত্র দেশের দিকের কিছু লেখা ছাড়া সুদীর্ঘ অধ্যায়ে বিস্তৃত সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার পরিপোষক; তাঁর মনের ঝোঁক ছিল স্থিতাবস্থা অর্থাৎ প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের দিকে; গণতান্ত্রিক জনমানসের প্রতিনিধি তাঁকে কোনক্রমেই বলা যায় না।

প্রতিবাদীরা তাঁদের অভিযোগের ভাষায়, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, আরও সব কঠিন শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। ত্রয়ী মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পাঠকদের প্রতি সৌজন্য বশতঃ সেগুলি এখানে উদ্ধার করা হ'ল না। এখানে প্রতিবাদীদের যুক্তি এবং বক্তব্যের সার সঙ্কলন ক'রে দেওয়া হ'ল মাত্র। যাঁরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চান তাঁদের "মার্ক্সবাদী" পত্রিকার সাহিত্য-নিবন্ধগুলি অনুধাবন ক'রে দেখতে অনুরোধ করি।

মানুষের ব্যক্তিত্ব, চিন্তা ও কর্মের বিচারে সমসাময়িক কাল একটি প্রধান ও নির্ভর যোগ্য নিরূপক। অর্থাৎ যে-কালে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে তাঁকে বিচার করতে হয়, নইলে প্রায়ই বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। যে ব্যক্তি একশো বৎসর আগে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন তাঁকে বর্তমান কালের আদর্শ ও যুগপ্রভাবের মানদণ্ডে বিচার ক'রতে যাওয়া তাঁর প্রতি বিনিঃশেষ অবিচার। চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে নিত্য নূতন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে; যুগ থেকে যুগে রুচি বদলাচ্ছে। কালকের ও আজকের দিনে তফাৎ বিস্তর; আগামী কাল এই পার্থক্য হয়তো আরো বিস্তৃত হবে। নিয়ত পরিবর্তমান ভাবাদর্শকে কখনই ব্যক্তির বিচারের নির্ভরযোগ্য মানরূপে গ্রহণ করা যায় না। কেন না আজকের রায়ই যে কাল বাতিল হ'য়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কী? কালকের রায় পর্যন্ত? কাজেই কালের মাপকাঠিতে ব্যক্তিত্ব-বিচার যদি একান্তই ক'রতে হয়, তবে সেটা সমসাময়িক কালের ভিত্তিতে করাই উচিত। সমসাময়িক কাল বলতে শুদ্ধ মাত্র তদানীন্তন খণ্ড কালকে বোঝাচ্ছে না, অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ভাবের যোগফলও এর অন্তর্গত বুঝতে হবে।

রামমোহন—বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ আজকের মানদণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে বিপ্লবী কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। আপাততঃ আমাদের সে বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাঁদের সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী-প্রধান এই ত্রয়ী মহাপুরুষের প্রত্যেকেই যে একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী ছিলেন তা'তে সন্দেহ কোথায়? এঁদের সম্বন্ধে সংস্কারবাদী কথাটা যাঁরা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেন, হয় তাঁরা এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ ধ'রতে পারেন নাই, নয়তো এঁদের সমসাময়িক কালের ইতিহাস ভাল জানেন না। কোন একজনের কোন বিশেষ কর্ম বা আচরণ চিহ্নিত ক'রে তাকে মনোমত আখ্যা দেওয়া সহজ; কিন্তু সেই বিশেষ কর্মের সঙ্গে তার সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গতি আছে কিনা

সেটা বিচার করা দরকার। তা নয়তো আখ্যার অপপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে। 'ফরমুলা'-মাফিক বিচারের গলদই এইখানে যে এই বিচারপদ্ধতিতে সমগ্রের হিসাব নেওয়া হয় না, সমগ্র থেকে খুঁজে খুঁজে শুধু সেই সমস্ত নিদর্শন বার ক'রে দেখানো হয় যা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুগত। এই রীতিতে আগে সিদ্ধান্ত পরে প্রমাণ। অবশ্য এটাও জ্ঞানলাভের একটা স্বীকৃত ধারা, কিন্তু প্রমাণ যথেষ্ট-সংখ্যক এবং যথেষ্ট পরিমাণে নিরপেক্ষ না হ'লে সিদ্ধান্তটি নির্ভুল ব'লে গ্রহণ করার উপায় থাকে না। সিদ্ধান্তের সমর্থনে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধার ক'রেই সিদ্ধান্তের অকাট্যতায় নিঃসংশয় হওয়ার মতো মূঢ়তা আর কিছু নাই।

মনে হয় প্রতিবাদীরা উল্লিখিত ত্রয়ী মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব বিচার কালে এই জাতীয় মারাত্মক ভুলই করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামমোহনকেই ধরা যাক্। রাজা রামমোহন রায় ভারতীয় জীবনের অগ্রগতির পক্ষে ব্রিটিশ শাসন কল্যাণকর ভাবতেন কিংবা ইংরেজের অধীনে সরকারী চাকরী ক'রেছিলেন—মাত্র এই নজীরে তিনি প্রতিবিপ্লবী ব'লে গণ্য হ'তে পারেন না। দেখ্‌তে হবে কোন্ সময়ের পটভূমিতে তিনি এটা করেছিলেন। রামমোহনের অভ্যুদয়ের পূর্বেই বাংলা ও বিহারে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিল। রামমোহনের ঐতিহাসিক ইংরেজ আধিপত্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমপ্রসারিত হয়। নানাবিধ কারণে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েছিল—আর এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হয়—যে সেই সময় ইংরেজ শক্তিকে বাধা দেওয়ার কল্পনাও বাতুলতা ছিল। অন্ততঃ রাজনৈতিক স্তরে এই বাধাদান তৎকালে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তখনও ভারতীয় মানসে আধুনিক জাতীয়তাবাদী প্রেরণার স্ফুরণ হয় নাই। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কেন না প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার মারফতেই এদেশে এক-জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়; আর এই শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যাঁরা বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন রামমোহন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অগ্রগণ্য। (সংরক্ষণকামী গোঁড়া সমাজপতিদের সঙ্ঘবদ্ধ 'বঙ্গদাচরণ উপেক্ষা ক'রে তৎকালে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে চেষ্টিত হওয়াটাই একটা মস্ত বড় বিপ্লবী কার্য ছিল।) আধুনিক অর্থে যাকে রাজনৈতিক চেতনা ব'লে ভারতীয় মানসে তার উন্মেষ হ'তে তখনও অনেক বিলম্ব। রামমোহন ভূয়োজ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিলনা এটা বিশ্বাস করা শক্ত। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব নিশ্চয়ই তাঁর ছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি জান্‌তেন যে সেই বিরূপ মনোভাব তখন তখুনি কার্যকরী করার মত পরিবেশ দেশে অনুপস্থিত। ইংরেজী শাসনের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপিয়ে তোলা তৎকালে অভাবিত ছিল। কাজেই বাস্তব পরিস্থিতি—আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ইংরেজের শক্তি—বিবেচনায় রামমোহন ইংরেজ শক্তিকে বাঁটাবার কথা তখনও মনে স্থান দেন নাই। এতে প্রতি-বিপ্লবী-ত্ব প্রমাণ হয় নাই; রামমোহনের বাস্তববুদ্ধি ও বিচক্ষণতাই প্রমাণিত হ'য়েছিল। আরও অনেক পরে, ঠিক একই কারণে এবং একই মনোভাব বশতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনের গুণগান ক'রেছিলেন। জাতীয়তাবাদের গুরু, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম ছিল না একথা কে বলবে?

রামমোহনের ধর্মীয় আন্দোলন সংস্কারবাদী আন্দোলন রূপে আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। হয়তো আন্দোলনটির প্রকৃত স্বরূপ তা-ই, কিন্তু তদানীন্তন যুগাদর্শের মানদণ্ডে তাকে বিপ্লবী আন্দোলনের মর্যাদা দিতেই হয়। যে কালে ধর্মমনস্কতা ছিল সমাজে সব চাইতে প্রবল মনোভাব এবং তা'তে হস্তক্ষেপ করা ছিল সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত কার্য, সেই কালে রামমোহন ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিলেন, এটা সর্বক্ষণ আমাদের মনে রাখা উচিত। অধিকাংশ হিন্দুর নিকট হিন্দু ধর্ম একটি অপরিবর্তনীয় শাস্ত্রোক্ত বিধান। কেউ কেউ তা'কে

অপৌরুষেয়ও মনে ক'রে থাকেন। এই মনোভাব আমাদের একাংশের মধ্যে আজও কত প্রবল সেটা হিন্দু কোড বিলের প্রসঙ্গে দেখা গেছে। আজকেই যদি এই মনোভাব হয়, রামমোহনের কালে সেটা আরও কত প্রবল ছিল তা' সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আর এই পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বৃঢ়তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ক'রেছিলেন দলবদ্ধ ভাবে নয়, বলতে গেলে প্রায় একক ভাবে। বাঙলা দেশে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট এবং সর্বদা অগ্রণী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছাড়া আর বিশেষ কেউ তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন নাই। মতের বলিষ্ঠতা আর স্বাধীনতার জন্য তাঁকে যৌবনের প্রারম্ভ কাল থেকেই মূল্য দিতে হ'য়েছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের জন্য তাঁর পিতা তাঁর উপর রুষ্ট হ'ন। গৃহে তাঁর স্থান হয় না। তখন রামমোহনের বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। গৃহত্যাগের পর উদাসী ব্রাহ্মণরূপে নানাদেশ পর্যটন ক'রে অবশেষে রামমোহন উপস্থিত হ'লেন তিব্বতে। কিন্তু সেখানেও তাঁর জন্য বিপত্তি অপেক্ষা ক'রে ছিল। তিব্বতের লামার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তাঁকে কোনপ্রকারে প্রাণ নিয়ে তিব্বত থেকে পালিয়ে আসতে হয়।

আর শুধু ধর্মমতের গোঁড়ামি নয়, বদ্ধমূল সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধেও তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরবচ্ছিন্ন এবং আপোষবিহীন। হিন্দু সমাজের সংরক্ষণকামী মাতব্বর এবং ধর্মধ্বজীদের তরফ থেকে এজন্যে তাঁকে কম বিরুদ্ধতা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয় নাই। কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচলিত করতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর একেশ্বর ভিত্তিক ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রতে সমর্থ হ'ন এবং কয়েকটি সামাজিক কুপ্রথার মূল প্রধানতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই উৎপাটিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

রামমোহনের জীবনেতিহাস থেকে বেছে এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই অল্পবিস্তর তাঁর চরিতকথা জানেন। রামমোহন বিপ্লবী ন'ন ব'লে যে অপবাদ তাঁর উপর চাপানো হ'য়েছে সেটা খণ্ডন ক'রবার জন্যেই এখানে তাঁর ইতিবৃত্তের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সঙ্কলন ক'রে দেখানো হ'ল। বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালীন বৎসরগুলির সর্বব্যাপী বৃঢ়তা, অশিক্ষা আর বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রায় একক ভাবে সংগ্রাম ক'রেছিলেন—এটা যদি বিপ্লবী আচরণ না হয় তবে বৈপ্লবিকত্ব কিসে নিহিত জানি না। সমস্ত সংঘর্ষের পথে ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর পতন ঘটানোটাই তো শুধু বিপ্লবের একমাত্র পদ্ধতি বা নিদর্শন হ'তে পারে না। চিন্তার বিপ্লব তার চাইতেও মূলস্পর্শী, তার চাইতেও সুদূরপ্রসারী। আর খতিয়ে দেখ্‌লে চিন্তার বিপ্লব থেকেই তো আসে আচরণের বিপ্লব। রামমোহন মনোজগতেরই একজন প্রধান বিপ্লবী ছিলেন।

আর একটি কথা। একটা নূতন ধর্মাদর্শ প্রবর্তন ক'রতে হ'লে প্রবর্তকের মধ্যে যে প্রবল ধর্মানুভূতি ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা থাকা দরকার রামমোহনের তা ছিল না, এই যুক্তিতে অনেকে তাঁর সমালোচনা করে থাকেন। বলা হয় তাঁর ব্রাহ্মধর্ম একটা কৃত্রিম মিশ্রণের ফল, উপনিষদের একেশ্বরবাদ আর খৃষ্টধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে তিনি যে নূতন ধর্মমতের সৃষ্টি করেন সেটা শুধু একটা নূতন কিছু করার প্রেরণা থেকেই করেছিলেন; এর পশ্চাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জোর ছিল না।

কথাটা যদি বা সত্য হয়, তা'তে রামমোহনের কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র খারিজ হ'য়ে যায় না। বরং এ থেকেই বোঝা যায় রামমোহনের বিপ্লবী চেতনা কত গভীর ছিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রাবল্য থেকে নূতন ধর্মমত তো অনেকেই সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই। নূতন ধর্মবিশ্বাসের খাতে যাঁর ভাবনাস্রোত তীব্রভাবে প্রবাহিত হ'তে সুরু করেছে, এবং তীব্রভাবে যে তিনি আর পুরাতন ধর্মমত আঁকড়ে থাকতে পারছেন না, তিনি তো সেই তীব্রতার বশেই নূতন ধর্মাদর্শ প্রবর্তনায় উদ্যোগী হবেন, এতে আর বাহাদুরি কোথায়? যেখানে অনুভূতির তীব্রতা নাই (সমালোচকদের বিচারে)

অথচ নূতন ধর্মাদর্শ প্রবর্তনের চেষ্টা আছে সেইটেই বরং সমধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের জন্য রামমোহনের আগ্রহ এতদূর চলিবার ছিল যে তিনি তার বিপ্লব-প্রয়াস ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রতেও পশ্চাদ্‌পদ হ'ন নাই। হোক সে প্রয়াস কৃত্রিম অনুভূতি সঞ্জাত, হোক্ অতিমাত্রার সচেতন, তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রচলিত কাঠামোর একটা বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী? রামমোহনের বিপ্লব-প্রয়াস সজ্ঞান-সচেতন, সেই কারণেই আরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সূত্রানুসারী, সেই কারণেই আরও বলিষ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। কিন্তু তা'তে এমন কী অপরাধ হ'য়েছিল বোঝা দুষ্কর। মনে রাখা দরকার, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ভ'রে বাংলা দেশে ধর্মচেতনারই প্রাবল্য ছিল; রাজনীতির স্থান ছিল গৌণ। এই ধর্মচেতনার মূলে ছিল আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, আর এই আত্মোপলব্ধিই ছিল উনবিংশ শতকের বাঙলার মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দ যদি ধর্মকে রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান দিয়ে থাকেন, তবে সেটা যুগপ্রভাব বশতঃই দিয়েছিলেন। আজ তা' নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। আজকের মানদণ্ডে তাঁর সময়ের বিচার হ'তে পারে না। এদেশে অতিমাত্রিক রাজনৈতিক সচেতনতা বিংশ শতাব্দীর দান; উনবিংশ শতকে এটা ছিলনা। যে যুগে যা' ছিল না সে যুগে তা' কেন ছিল না, এই নিয়ে গবেষণা চলতে পারে, তাই ব'লে সে যুগের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি-বিশেষকে দা'য় ক'রে তাঁর উপর সমগ্র যুগের অপরাধের বোঝা চাপানোর কোন অর্থ হয় না।

স্বামীজীর সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে আত্মোপলব্ধির প্রেরণা থেকে তাঁর ধর্মজীবনের আরম্ভ হ'লেও ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ প্রচেষ্টায় তা' সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সেটি ক্রমশঃ সমাজকল্যাণ ভাবনার মধ্যে প্রসারলাভ ক'রেছিল। বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবের কল্যাণের জন্য যদি শতশত বার নরকে যেতে হয়, তাও যাব, তবু শুধু নিজের মুক্তি চাই না।" এখানেই আধুনিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সাদৃশ্য। বলতে গেলে উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম এদেশে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছিল একথা; "তোমরা মুদ্দে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালী, মুচি মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান হ'তে, ভুনাওয়ালীর উনুনের কাঁক থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ-জঙ্গল-পাহাড় থেকে।" মনের মধ্যে সমাজ-কল্যাণের আদর্শ কতো দৃঢ়প্রোথিত থাকলে এই জাতীয় গভীর প্রত্যয়মূলক কথা বেরিয়ে আসতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

তবে বর্তমান সমাজ-ভাবনার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার পার্থক্য এই যে তিনি ধর্মমার্গ থেকে এই চিন্তা ক'রেছিলেন, রাজনৈতিক মার্গ থেকে নয়। আধুনিক সমাজকল্যাণ চিন্তা রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত; দ্বিতীয়টি বাদ দিয়ে প্রথমটি চিন্তা করা যায় না। কিন্তু রাজনীতির এই প্রাধান্য উনবিংশ শতকে ছিল না। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ছিল না। তখন ভারতীয় মানসে, যে কথা আগে বলেছি, ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির আদর্শেরই প্রাধান্য, আর সেই কারণে ধর্মের। বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। কাজেই প্রকৃত ধর্মবোধকে তিনি সবার উপরে স্থান দেবেন তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমার্গীদের ভেদ এইখানে যে যেখানে অন্যান্যরা ব্যক্তিগত মোক্ষের আদর্শকে চরম আদর্শ ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলেন তিনি সেখানে এইরূপ একটি আত্মকেন্দ্রিক, সঙ্কীর্ণ আদর্শ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেন নাই। মোক্ষপ্রয়াসী সন্ন্যাসী হ'য়েও তিনি সমাজসেবার আদর্শকে সব চাইতে উপরে স্থান দিয়েছিলেন, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ অপেক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক

স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের লক্ষ্যকে অধিক মূল্য দিয়েছিলেন, মালী মেপর মুচিকে ভাই বলে সম্বোধন ক'রে হিন্দু সমাজের কৃত্রিম ভেদ-ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হেনেছিলেন। এ সবই আধুনিক প্রগতি অভিমানী বাঙালীর মনঃপূত আচরণ, তবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না ক'রে বিবেকানন্দ এগুলিকে কেন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করলেন, কেন তিনি রাজনীতি চর্চার দিকে ঝুঁকলেন না, এই হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগ একেবারেই অসঙ্গত তা' বলি না, তবে সমসাময়িক কালের হিসাব এর মধ্যে গ্রহণ করা হয় নাই ব'লে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ বা মূল্য আরোপ করা যায় না।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সংস্কৃতির মানস-সন্তান ছিলেন একথা খুবই সত্য। অভিজাত পরিবারে তাঁর বাল্যকালীন পরিমণ্ডলে প্রাচীন উপনিষদীয় আদর্শের সহিত উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য উদারনীতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ মিশে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে গঠন ক'রেছিল, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এদেশে বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন এবং নিজেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার বেড়ের মধ্যে তাঁর জীবন আসে নাই; এদেশে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে বিংশ শতকের তিরিশের বৎসর-গুলিতে, তখন রবীন্দ্রনাথের অস্তিম বয়স। কাজেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি তাঁর চিন্তা ও কল্পনার বাহন হবে এতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রবার মতো, সে হচ্ছে এই, যখনই বুর্জোয়া সংস্কৃতির আদর্শের সহিত গণস্বার্থের সংঘাত বেধেছে রবীন্দ্রনাথ অব্যভিচারীভাবে গণস্বার্থের পোষকতা করেছেন। আর একটি কথা রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ধ্যানধারণার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'লেও এবং তাঁর চিন্তাধারায় তার সুস্পষ্ট ছাপ থাকলেও তাঁকে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনক্রমেই বলা যায় না। বুর্জোয়া চিন্তার দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হ'ল জাতীয়তা, আর শ্রেষ্ঠ উৎপাদন প্রণালী হ'ল পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রণালী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা এই দুটি আদর্শেরই বিরুদ্ধাচরণ ক'রে গেছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তার তিনি ছিলেন আজন্ম বিরোধী। উদার আন্তর্জাতিকতার আদর্শে ছিল তাঁর অবিচলিত আস্থা আর সাম্যবাদী-উৎপাদন ব্যবস্থাকে যে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর প্রমাণ তো "রাশিয়ার চিঠির" ছত্রে ছত্রেই ছড়ানো রয়েছে। যে দুটি বস্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মূল অঙ্গ সেই দুটি বস্তুই রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেছেন। এর পরেও যে তাঁকে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ সইতে হয় সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য বলতে হবে!

রবীন্দ্র-চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যে সংরক্ষণের প্রবৃত্তি বাড়ে, তদনুসারে অভিনবত্বের আকাঙ্ক্ষা ক'মে আসে—এইটেই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কবির বেলায় এই সাধারণ নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যত তাঁর বয়স বেড়েছে তত তিনি অভিনবত্বপ্রয়াসী হ'য়েছেন। কি রচনার ভাব, কি আঙ্গিক, কি ভাষারীতি সকল বিষয় সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। মনের গড়নের মধ্যে গতানুগতিকতার প্রতি একটা প্রবল পরাঙ্মুখতা না থাকলে এটা কখনও সম্ভব হ'তে পারতো না। নূতন নূতন ভাব ও চিন্তা গ্রহণ করার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সেই প্রতিভাই তাঁকে জীবনের শেষ দশায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার স্বাদগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল এবং সেই প্রতিভার বলেই তিনি সমাজতন্ত্রবাদের যৌক্তিকতা মেনে নিতেও পেরেছিলেন। এতে বোঝায় এই কথাই যে আরও কিছুদিন যদি তিনি বেঁচে থেকে যেতে পারতেন, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁর মৌলিক সম্পর্কচ্ছেদ এমন কিছু অঘটনীয় ব্যাপার ছিল না। অবশ্য শেষ দশার সুদীর্ঘ কালে বিস্তৃত আজীবন লালিত কোন জীবনের আকস্মিক মৌলিক রূপান্তর সম্ভব নয়—ব্যক্তিত্ব ওভাবে বদল হয় না—তা' হ'লেও রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের মধ্যে এমন একটা সজীবতা ও স্থিতিস্থাপকত্বগুণ ছিল যে তাঁর পক্ষে নূতন ভাবাদর্শের মূলনীতিগুলি অন্ততঃ স্বীকার ক'রবার পথে

কোনই বাধা ছিল না। হয়ত বেঁচে থাকলে তিনি তা-ই করতেন।

রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়পন্থী ছিলেন। পুরাতনের সঙ্গে নূতন, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য—এই জাতীয় বিরোধী গুণ ও ভাবের মিলনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমন্বয়কেই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বিকাশের শ্রেষ্ঠ পথ ব'লে নির্দেশ ক'রেছিলেন। সেই অর্থে তাঁকে বিপ্লবী বলা যায় না এ কথা সত্য। কিন্তু এই সমন্বয়ের প্রশস্ত সীমার মধ্যে থেকে একজন বিপ্লবীর পক্ষে আর যা' কিছু করা দরকার তিনি তা-ই করেছেন তিনি প্রচলিত কুসংস্কার, বিধিনিষেধ, অন্ধতা, অবিচারকে নির্মম ভাবে আঘাত ক'রেছেন। যে সমস্ত রীতি ও আচার সমাজের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় ভারস্বরূপ চেপে আছে এবং সমাজের স্বাধীন বিকাশ প্রতিহত ক'রছে তা'দের বিরুদ্ধে আর কোন আধুনিক ভারতীয় কবি এমন ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন ব'লে জানি না। আর তাঁর প্রতিবাদের ভাষাও ছিল অতি চোখা আর বিদ্রূপমণ্ডিত। স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের জন্য কবির আগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; আগ্রহেরও না। 'স্থিত'-র মধ্যে যা কিছু সুন্দর, গ্রহণীয়, বরণীয়, সেইটেকেই শুধু তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন —আর কিছু না। প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা 'ইতিহাসের ডাষ্টবিনে' নিক্ষেপ ক'রবার অশোভন উৎসাহে মেতে উঠেছেন হয় তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েন নাই, নয় তাঁদের সাহিত্যবোধ দুর্বল।

অন্তরলক্ষ্মী

—সুরেশ চন্দ্র রায়

তব উল্লোল আঁখি কটাক্ষ খানি
মোর পরে কেন হানিতেছ কৌতুকে!
বুকের উপরে অঞ্চল দিলে টানি,
স্বর্ণবরণ রৌদ্র তোমার মুখে।
অধরে তোমার সলাজ হাস্য,
রক্তিম করি লোভন আস্য
কিসের ছন্দ আনন্দে বাজে
সরু হার তব বুকে।
লাবণ্যময়ি, আমি আনমনা
চেয়ে থাকি শুধু সুখে।
মম উল্লাস কেমনে গোপন করি,
অন্তরে আজি মুখর হোল সে ভাষা।
জীবনে আমার দিলে কি যে সঞ্চরি'
সম্মুখে মোর জাগে অনন্ত আশা।

আমি অধিরাজ, আমি মনচোর,
এই আনন্দে আজি আছি ভোর,
তুমি দিলে মোরে কি যে সান্ত্বনা,
প্রেরণা দৈন্যনাশা।
আমার প্রাণের কামনার ধন,
লহ মোর ভালবাসা।
তুমি যে আমার চিত্তের সঙ্গিনী,
তুমি সহচরী চিরকাল মরমের।
তুমি যৌবনে অনঙ্গ রঙ্গিনী,
সহমর্মিনী জীবনেতে করমের।

তুমি যে কমল, তোমার গন্ধে,
ভৃঙ্গ সমান আসি আনন্দে,
মাখিয়া পরাগ লাঞ্ছনা করি
তব সুখ শরমের।
অন্তরে মোর নেশা জাগে কোন,
আশা নাই তরণের।

মরিলাম তবে মরিলাম আমি, সখি,
কুলবনে তব আমার রক্ষা নাই।
তোমার নয়নে মোর চিতা জ্বলে শুকি!
আমার জীবন দহনেতে হোল ছাই

পঞ্চম স্বরে গুঞ্জন তব
এ যে অপরূপ, এ যে অভিনব
জীবন বদলে কামনা আমার
এ সুখ মরণটাই।
জীবনমূলে বুঝিনু, কৃপণা,
কিছু তব দয়া নাই।

অবসান

ডাঃ সত্যপদ রায় চৌধুরী

— এক —

অমরনাথ আজ সর্বস্বহারা। স্ত্রী-পুত্র সব হারিয়ে সে আজ এক মহাশূন্যের মাঝে। সর্বদা সে ভাবে আজ সে কোথায়? কেন এমন হল তার? মাঝে মাঝে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শূন্যতার মাঝে। কোন জিনিসে তার শান্তি নেই। চোখে ঘুম নেই। তাই সে মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল মুক্ত আকাশের নিচে। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শরতের চাঁদ মেঘের বুকে মুখ লুকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছে। আর আমি নিদ্রাহীন—পিছনে ফেলা দিনগুলি চিন্তা করছি— কি ছিলাম, কি হয়েছি। কেন এমন হ'ল? দীর্ঘ দিন আগে সুখের নীড় বেঁধেছিলাম. একটী ঝড়ে সব উড়িয়ে নিয়ে গেল—কেবল আমায় রেখে গেল হাহাকারের মাঝে।

কেন এমন হয়? সন্তান কেন মা বাবার বুক ছেড়ে দূরে অতি দূরে চলে যায়, স্ত্রী কেন স্বামীকে ছেড়ে কালের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে? কি নির্মম এই সংসার!

পায়চারী করতে করতে সে ভাবছে "সব হারিয়েছি কেউ নেই আমার। সত্যই কি আমার কেউ নেই? না, না, ঈশ্বর আছেন তিনিই আমাকে দেখবেন।"

অনেক দিনের পুরাতন চাকর দীননাথ তাকে চোখে চোখে রাখে. তারও চোখে ঘুম নেই। সে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল বাবুর পিছনে। অনুরোধ করলে "বাবু বাহিরে বসে অমন করে কি ভাবছ? তুমি ঘুমাবে না?"

অমর—"ঘুম? ঘুমত দীনু, অনেকদিন বিসর্জন দিয়েছি। যে দিন তোর মা-ঠাকুরুণ আমার হাতখানি ধরে বলেছিলেন 'আমি চল্লেম. তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' সেইদিন থেকে আমার ঘুম গেছে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে।

ওরে. আমি কি পাগল হয়েছি—আমাকে দেখলে কি পাগল মনে হয়?"

দীনু—কি যে বক বাবু, তুমি পাগল হতে যাবে কেন? তুমি যদি পাগল তা-থেকে বেশী পাগল আমরা। যাক ও সব কথা এখন। চল, এখন ঘরে চল, ভোর হয়ে আসছে আর কতক্ষণ এখানে থাকবে। এমনভাবে শরীরপাত করে কি কোন ফল হবে? বাবু, একটু ঘুমুবে চল? ঐ শোন রাখালরা গরু নিয়ে ক্ষেতে চলেছে। চল বাবু একটু শোবে চল।

ভোরের আলো আকাশের ফাঁকে উঁকি মারছে; আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে; রাখালেরা গান গেয়ে চলেছে মাঠের দিকে। দূরে গান শুনে অমরনাথ বল্লে "ওদের গান বেশ লাগছে, শোন কত মিষ্টি। কত সুখে ওরা আছে না?"

রাখালরা গরু নিয়ে গান গেয়ে চলে গেল অমরনাথের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে।

রাখালের গান—

চলরে মন ব্রজের মাঠে ভোর বেলা
প্রাণের পরশ দিয়ে যে তুই
খেলবি আপন খেলা।
ভোরের নেশায় মাতবে ভুবন
সফল হবে দুঃখের স্বপন
নিতুই পুলক মেলা।
ব্রজের মাঠে ভোর বেলা॥

গান শুনে অমরনাথ অনেকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর দীনুকে বল্লে—"বেশ গায় ওরা। দুঃখের জীবনে ওরা একটা নতুন সুর শুনিয়ে যায়, নারে? কত আনন্দ ওদের। ওরে দীনু চেয়ে দেখ, এই বুকের ভিতরে এখানে দুঃখের গান সর্বদা হচ্ছে। 'কোথা সুখ, কোথা শান্তি' বলে মাঝে মাঝে করুণ-সুর বেজে উঠছে।"

দীনু—"ও সব থাক বাবু, এখন চল। অমন করে নিজের শরীরটাকে আর মাটী কর না। সংসারে এরকম দুঃখ অনেকের জীবনেই আসে। তাই বলে অধীর হলেত চলবে না—তা না হলে ঈশ্বরের সৃষ্টি যে নষ্ট হবে। আবার তোমার সুদিন আসবে বাবু, আবার

আসবে। নতুন নতুন এরকম সকলেরই হয়। চল বাবু খোবে চল।"

অমরনাথ কিছুক্ষণ দীনুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে "সুদিন আসবে দীনু? সুদিন আসবে? সে কবেরে সে কবে? আমার আবার সুদিন! হাসি পায় তোর কথা শুনে। দুঃখে যার জীবন গড়া তার আবার সুখের স্বপ্ন কিরে? দুঃখটাইত তার সুখ!"

দীনু—"বাবু চল, আর রাত কোথায়? একটু গড়িয়ে নেবে চল।"

দীনু একরকম জোর করেই অমরনাথকে ধরে নিয়ে গেল।

— দুই —

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রেবা, পিতৃহীনা। মা নবতারা অনেক কষ্টে তাকে আই, এ, পর্যন্ত পড়ালেন। ভেবেছিলেন মেয়ে লেখা পড়া শিখে সাহায্য করবে সংসারে। কিন্তু হল বিপরীত। তার সংসার ভাল লাগল না। ভাল লাগল পরোপকার, লোক সেবা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ। নিজেকে বিলিয়ে দিলে তার মাঝে। মনের আনন্দে থাকে সে। আজ সে একটী গান শিখেছে—আবার করে এল মার কাছে গান শুনাবে বলে। রেবা মাকে ডাকলে ওমা—মা একটা কথা শুনেছ? আমি আজ একটী নতুন গান শিখেছি। শোন না মা!" মা নবতারা সংসারের খুটি-নাটি কাজ করছিলেন, একটু রাগ করেই বল্লেন "ঠ্যাংরে তুই এমনি ক'রে গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবি? আজ কার টাইফয়েড, তার সেবা করা, কাল কে চাপা পড়ল তার সেবা। এই রকম করেই কি দিনগুলি কাটাবি? সংসার কি তোকে করতে হবে না?"

রেবা—"যখুনি মা তোমার কাছে একটু আব্দার করি, তখুনি তুমি আমাকে এমন ভাবে কেন বল দেখি। লোকের সেবা, লোকের উপকার করা, এটাকি মেয়েদের ধর্ম নয়? আর গান, ওটা মনকে কত শান্তি এনে দেয় মা।"

নবতারা—"আমিত তোকে পরোপকার ক'রতে মানা করছি না—তবে নিজেরটাওত দেখতে হ'বে। তুই বড় হয়েছিস, এমন ভাবে চিরকাল দিনও কাটবে না।"

রেবা—"থাক ও সব কথা মা, আমি যে গান শিখেছি সেটা একবার শোন।"

গান—

জীবন পথের ছিল যে সাধনা
বরণ করেছি তারে
মোর হিয়া তাই গড়েছি সেবার
মায়ার বাঁধনে বারে।
জানি হবে জয় নাহি কোন ভয়
নবীনের মাঝে হবে পরিচয়
জীবনের বীণা বাজিবে মধুর
রজনী অন্ধকারে॥

"বাঃ বেশ গান" বলতে বলতে অনিল বাড়ীর ভেতরে ঢুকল। অনিল একজন দেশভক্ত কর্মী। রেবা ওঁকে সহোদরের থেকে বেশী স্নেহ করে। সংসারে ওর আর কেউ নেই। গানখানি অনিলের খুব ভাল লেগেছে বল্লে—"এ-গান তুমি কোথায় শিখলে? দিন দিন দেখছি তুমি একটী মস্তবড় দেশসেবিকা হয়ে উঠলে।"

নবতারা—"বলত বাপু, দিন দিন মেয়ে যেন কি হয়ে যাচ্ছে।" রেবা—"কেন অনীলদা, আমি কি কিছু অন্যায় ক'রছি? আমরা মেয়ে মানুষ বলে কি আমাদের কিছুই করতে নেই? চারিদিকে হাহাকার, নারীদের উপর কি ভীষণ অত্যাচার! লোক মরছে কুকুর বেরালের মত অনাহারে। আমরা নারী, এর কোনটারই ভার নিতে পারি না? সেবা নারীর ধর্ম নয় কি? পরোপকার করাটা কি মহাপাপ? না অনীলদা, তোমরা ভার না নিতে দিলেও আমি যা পারি করব।"

নবতারা—"ধরেছে। মেয়ের কথা দেখ, ঘর গেল চুলোয়, আমি বুড়ো মানুষ একলা সংসার ঠেলে উঠতে পারি না, উনি আমার একটু সাহায্য করবেন তা না পাড়ায় পাড়ায় লোক সেবা করে আর গান গেয়ে বেড়াবেন! কালে কালে কত কি আমাকে দেখতে হবে।

আর পারি না। বাবা অনীল, মেয়েটার কি করে বুদ্ধি-সুদ্ধি হয় তার একটু চেষ্টা ক'র।"

অনিল—"বুদ্ধি সুদ্ধি সব ঠিক হয়ে যাবে কাকিমা, যখন পড়বেন উনি কারুর হাতে। তখন নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে—পরের কথা মনেও থাকবে না।"

রেবা—"এটা তোমার ভুল অনীলদা। যার ভেতরে জিনিষ থাকে, সে সুখেই থাকুক আর দুঃখেই থাকুক, বন্ধনে থাকুক, আর খোলাই থাকুক, তার ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলি সময় পেলেই উঁকি মারবেই। কেউ রুখতে পারবে না।"

অনিল—"থাম, থাম, আর লেকচার দিতে হবে না। দেখা যাবে যখন সংসারে ঢুকবে। বড় বড় কথা এখন রেখে দিয়ে চট্ করে একটু চা নিয়ে এসত? রেবা কিছু না বলে চা' আনতে চলে গেল।

অনিল—"দেখুন কাকিমা, এবার রেবার একটা ভাল সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দিন। বড়ওত হয়েছে।"

নবতারা—"আজকাল বাবা যে দিনকাল পড়েছে তাতে আমাদের মত গেরস্ত বিয়ের নাম শুনলেই আঁতকে উঠ্‌বে। বিনা টাকায়ত আর হবে না?"

অনীল—"তা ঠিক। তবে দেখতে, চেষ্টা করতে দোষ কি? যদি চেষ্টা করলে ভাল ছেলে পাওয়া যায়।"

নবতারা—"কে করে বল, আমিত আর ছেলে খুঁজতে বাইরে বেরুতে পারি না। তোমরাই আমার বল ভরসা। তোমরা যদি চেষ্টা কর তাহ'লে ওর বিয়েটা হয়।"

রেবা চা নিয়ে এল ভিতরে। অনিলকে একটা কাপে ঢেলে দিয়ে নিজে একটু চা খেতে খেতে বল্লে "মা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি বিয়ের জন্ত আমাকে বিরক্ত করনা সত্যি বলছি মা, যদি বিরক্ত কর তা হলে তুমি আমাকে হারাবে। আমি বলছি আমি বিয়ে করব না।" এই কথা বলে রেবা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

নবতারা—ধন্তি মেয়ে। দেখলে মেয়ের কাণ্ডটা দেখলে? আজকালকার মেয়ে কিনা!

— তিন —

সময় অমরনাথের অন্তরঙ্গ বাল্য বন্ধু। সে স্কুল মাষ্টার, খুব শান্ত স্বভাব। তার স্ত্রী অমিয়া ঠিক তার উল্টো। খিট্ খিটে মেজাজ। স্বামীর কোন কাজই ভাল নজরে দেখে না। খুটি নাটি ব্যাপারে বকাবকি করে। সে জন্ত সময়ের বড় অশান্তি।

তাদের একটী মেয়ে সবিতা, কিছু লেখাপড়া শিখে সংসারে মাকে সাহায্য করে।

সময় অমরনাথের বাড়ী গিয়েছে তাকে দেখতে, তার মানসিক বিকারের লক্ষণ বেড়েছে শুনে। প্রায় রোজই দেখতে যায়। আজ রবিবার তার ফিরতে দেরী হয়েছে। অমিয়া খুবই বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ল খাটের উপরে। নিজের মনেই বক্ বক্ করতে লাগল—"সারাদিন খেটে খুটে মোর তা এ পোড়া অদৃষ্টে জোটে না। এত বেলা হ'ল তবু বাবুর বাড়ী আসবার নাম নেই। কি কপাল আমার! বাপ মা আমাকে ধরে পাকড়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সহ্য হয় না। ওরে সবি, ঘুমুলি নাকি?"

সবিতা পাশের ঘরে বই পড়ছিল, মায়ের কথায় বিরক্ত হয়ে উঠে এল, বল্লে—"তোমার জ্বালায় কি আর ঘুমুবার জো আছে? কেবল সবি আর সবি। বইখানা যাই একটু ধরেছি অমনি তোমার কাজ পড়ে গেল। বল, কি করতে হবে, বল?"

অমি—"মেয়ের মুখ দেখ! আমি নানা জ্বালায় জলে মরি, তার উপরে ইনি হয়েছেন আমার আর একটা কাল। আমি একটু ঘুমুচ্ছি, তোর বাবু এলে দরজাটা খুলে দিস্।"

সবি—"আচ্ছা, ঘুমোও। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ততক্ষণ বইখানি পড়ি।" সবিতা মনে মনে ভাবে "আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! কেন আমার জন্ম হল। এতটা দিন গেল কারুর কোন কাজে লাগলুম না। সংসারে খাটুনি আর খাটুনি। মাতো কিছু করবে না আমাকেই দেখে সব কাজে এগিয়ে। কতদিনে যে এ

খাটার শেষ হবে তা জানি না।"

বাহির থেকে সমর ডাকলে, "সবি ও সবি, ঘুমুলি নাকি? দরজা খোল।" সবিতা দরজা খুলে দিলে সমর ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করল "তোর মা বুঝি ঘুমিয়েছে?"

সবি—"মা বোধ হয় ঘুমুননি। এই মাত্র ত শুলেন।"

সমর—"ওগো ঘুমুলে নাকি?"

অমি—"(সক্রোধে) কি, কি? অত চেঁচাচ্ছ কেন? এত বেলা পর্যন্ত কোথায় থাকা হয়েছিল শুনি? দিন দিন হ'ল কি? আর কত জ্বালাবে?"

সমর নিজের মনে ভাবলে "হঠাৎ রুদ্র উঠলো কেন? এমন কি অপরাধ করেছি যে হঠাৎ আকাশে এমন কালো মেঘ দেখা দিল।" বল্লে—আমি কি কোন দোষ করেছি? আমাদের পরম উপকারী বন্ধু অমরের কথাত জান? সে বেচারা একা থাকে, বসে বসে নানা কথা ভাবে তাই তার কাছে বসে গল্প করছিলাম। এতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছে। তার জন্য এত রাগ কেন?"

অমিয়া—"থাম, থাম দরদে আর কাজ নেই। খুব চরেছে অত দরদ যদি থাকে খেয়ে দেয়ে আমাকে রেহাই দিয়ে গেলেইতো হয়।"

সমর—"উপকারী বন্ধু সে—অসময়ে আমাদের কত উপকার করেছে। এখন তার অসময়। এ সময়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াও কি অপরাধ?"

অমিয়া—"হ্যাঁ অপরাধ। কত আর জ্বালাবে ব'ল। সারা জীবনতো পুড়িয়ে মারলে তাতেও কি শান্তি হল না?" এই বলে অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। সমর ভাবে "হায়রে অদৃষ্ট!" স্ত্রীকে বলে "আচ্ছা তাই হবে। চলরে সবি, কিছু খেতে দিবি চল।"

সবিতা—"বাবা তোমার দেরী দেখে মা তোমার জন্য কিছুই করে রাখেনি।"

সমর—"সেকিরে! আমি কি চিরকালের জন্য চলে গিয়েছিলেম। এমনি কপাল আমার হবে? আমাকে তোরা এত ভুল বুঝিস্ কেন বল্ দেখি? আমাকে নীরবে এ সব অত্যাচার কেন সহ্য করতে হয়? সবিতা ভাবে "কি অদৃষ্ট বাবার!" বলে, "ঘরে কিছু আছে কি না দেখে তোমার জন্য নিয়ে আসছি।" সবিতা চলে গেলে স্বভাবের দোষে সমর গেল স্ত্রীর নিকটে, গায়ের উপর হাত রেখে বল্লে—"তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? অমন করে শুয়ে আছ কেন?"

অমিয়া—"থাক্, থাক্ অত আদরে আর কাজ নেই। এখন যা জোটে একটু খাবে চল।" সজোরে চলে গেল অমিয়া। সমর একটু জোর গলায় বলে "আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। আর অত রাগ করনা, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।" সমর ঘরের জানালার কাছে গিয়ে বাহিরের মুক্ত স্থানের দিকে চেয়ে ভাবে "সংসারটা যে এত সুখের তা আমার জানা ছিল না বিয়ের আগে। বাপ মা ভাবে ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলেকে সুখী করবে। এই আশায় ছেলের গলায় এমন একটী জিনিষ বেঁধে দিয়েছিলেন যার জন্য আজীবন দুখ বুঁজে বুকে ভুবের আগুন জেলে বেড়াতে হচ্ছে। যার সংসার নেই তারও আমার মত আগুন জ্বলছে। আহা বেচারী অমর সে আজ সব হারিয়ে ফকির। কি সুন্দর সাদৃশ্য আমাদের।" সবিতা ধীরে ধীরে সমরের পিছনে এসে দাঁড়াল, বল্লে—"বাবা মা ডাকছেন।"

সমর—"হ্যাঁ, যাই"। সমর চলে গেলে সবিতা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবে "আর ভালো লাগে না, কতদিন যে এমন ভাবে কাটাবো তা জানি না।"

এমন সময়ে এল সমরের অন্য এক বন্ধুর ছেলে নরেন।

নরেন—"সবি, তোমার বাবা কোথায়?"

সবিতা—"কেন? আপনি অসময়ে এখানে? আপনার কলেজ কি এখন বন্ধ?"

নরেন—"না, কলেজ বন্ধ নয়—তবে ক্লাস ছিল না কিনা তাই একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সবিতা—"আচ্ছা বাবাকে ডেকে দিচ্ছি, আপনি একটু বসুন।"

নরেন—"যেও অখন। এত তাড়া কেন? তুমি বেস, এলাম তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আর তুমি কিনা আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছ? বস একটু।"

সবিতা—"আপনি হাসালেন। আপনাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছি। এখুনিত বাবাকে ডেকে ফিরে আসব! আচ্ছা নরেনদা' কলেজে আপনাদের কি রকম পড়া চয়? কখন ক্লাস হয়, কখন হয়না না? ইচ্ছা করলেই যেখানে খুসি যেতে পারেন না? বেশ কলেজ।"

নরেন—"না, না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারবে না। প্রফেসাররা কলেজে না এলে কখন কখন ওই এক ঘন্টার জন্য আমাদের ছুটী হয়।"

সবিতা—"তা বেশ। আচ্ছা, আপনার হাতে ওখানা কি বই নরেন দা' ?"

নরেন—"এ-'খানা সংস্কৃত বই-'শকুন্তলা'। এটারই ক্লাস হবার কথা ছিল।"

সবিতা—"বেশ বই না? আমাকে একটু সংস্কৃত শিখিয়ে দেবেন নরেন দা' ?"

আহারাদি শেষ করে সমর ঘরে এসে নরেনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কখন এলে নরেন? ভাল আছত? তোমার মা ভাল আছেন?"

নরেন—"এই আসছি। মা ভাল আছেন।"

সমর—"তোমাদের কলেজ বুঝি আজ বন্ধ।"

নরেন—"না। তবে এখন কোন ক্লাস ছিল না। ভাবলাম অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় তাই একবার দেখা করতে এলাম।"

সমর—"বেশ, বেশ। সবি যা' নরেনের জন্য একটু চা নিয়ে আয়।"

তোমাদের কলেজে আজকাল প্রিন্সিপাল কে? তোমার কি কম্‌বিনেশন?"

নরেন—"আমাদের প্রিন্সিপাল একজন মাদ্রাজী খুব বিদ্বান লোক। আমার কম্‌বিনেশন সংস্কৃত আর ফিলসফি।"

সমর—"ভাল, ভাল। বি, এ পাস করে কি করবে ঠিক করেছ?"

নরেন—"ভাবছি এম, এ পড়ব। আচ্ছা তা'হলে এখন উঠি।"

সমর—"সেকি? চা আনতে গেছে যে। সবি, চা নিয়ে আয়।" চা নিয়ে সবি এলে সকলকে দিতে দিতে তার পিতাকে বল্ল—"বাবা মাঝে মাঝে আমারও সংস্কৃত শিখতে ইচ্ছা করে। বেশ ভাল ভাষা না বাবা?"

সমর—"সব ভাষাই ভাল। তা বেশত? সংস্কৃত শেখা এমন কি শক্ত।"

নরেন—"আচ্ছা আমি তোমাকে সংস্কৃত শেখবার একখানি 'প্রাথমিক শিক্ষা' এনে দেবো। কাকাবাবু, এখন তবে উঠি।"

নরেন চলিয়া গেলে সবিতা চায়ের সরঞ্জাম রাখতে ভিতরে গেল।

অমিয়া ভিতর থেকেই ব'লতে ব'লতে সমরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল—"দেখ একটা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি। মেয়েকে স্বাধীনতা দেওয়া ভাল নয় এও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? মেয়ে কি বড় হচ্ছে না? নরেন যখন আসবে তখন ওকে ওর সামনে কখনই অমনভাবে আসতে দিতে পারবে না।"

সমর—"এতে দোষ কি হয়েছে? নরেন যে আমাদের এক বাল্যবন্ধুর ছেলে। ওরা আমাদের কত আপনার। তা ছাড়া তো সবি ওর সঙ্গে কত খেলা করেছে।"

অমিয়া—"রাখ আপনার। এখন ও রকম মেলামেশা আমি পছন্দ করি না। মেয়ে আমার, আমি যা ব'লব তাই করতে হবে।

সমর—"বেশ তাই হবে। আমি কিন্তু নরেনকে কিছু বলতে পারব না।"

অমিয়া—"তুমি না পার আমি পারব।

সমর—"না, না, দোহাই তোমার। অমন কাজটী কখন করোনা। আমি কোন ছলে ওকে বুঝিয়ে দেবো।

অমিয়া—"বেশ, আমি এসব অনা-সৃষ্টি দেখতে পারবনা বলে দিচ্ছি।"

এই বলে অমিয় চলে গেলেন অন্তঃপুরে। সমর আপনমনে ভাবতে লা'গল।

— চার —

অমরনাথ সংসারের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে পারল না। দিন দিন তার মানসিক বিকারের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সে আজকাল একা থাকতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে। তার পুরণো চাকর দীননাথ ছাড়া আর তাকে দেখবার আর কেউ নেই। অমরের শরীরের অবস্থাও খারাপ। একটী নির্জন ঘরে বসে আকাশের দিকে চেয়ে ভা'বছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "না, না, আর পারি না। এ নীরবতা, এ শূন্যতা আর ভাল লাগে না। কে? কে? আমার সঙ্গে কে কথা কইছে না? না ওটা একটী পাখী। ও, বুঝেছি, আমার মত ও সাথীহারা একা তাই নীরবতা ভেঙ্গে প্রাণ খুলে চিৎকার করছে। কৈ, আমিত পারছি প্রাণ খুলে চেঁচাব তার শক্তিও আমার নেই। কেন, আমি এমন হ'লাম। আমার শান্তি কোথায়? কে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে।"

বাবুর এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে দীননাথ দৌড়ে এল বাবুর কাছে। ব্যস্ত হয়ে বললে অমরনাথকে, "বাবু, তুমি বসে বসে অমন করে কি ভাব। আমার কিন্তু ভাল লাগে না। তোমার শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল আসে।" অমরনাথ দীনুর মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলে। তারপর বল্লে, "জল? চোখে জল আসে? কেন রে? না, না, না। জল চোখে আনিস না। বুকের আগুনে সব শুকিয়ে দিবি। হা, হা, হা—"হাসি পায় তোর সহানুভূতি দেখে।"

দীননাথ—"হাসছ কেন? কেন এত কষ্ট করছ বাবু? নতুন করে আবার সংসার পাত সুখে থাকবে।"

অমর—"কি বল্লি? সুখ? নতুন করে সংসার পেতে? এই কথা বলে অমরনাথ খুব হেসে নিলে। তারপর বল্লে, "সুখ হবে নতুন করে সংসার পেতে, বেশ বলেছিস্। শুনতে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু বলতে পারিস্ সত্যিকার সুখ কোথায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমরনাথ আবার বল্লে, "সুখ হবে দীনু?" দীনু মনে করলে বাবুর মন একটু নরম হয়েছে তাই সাহস ক'রে বল্লে, "বাবু হবেনা কেন, হচ্ছেইত।" এই রকম করেইতো দুনিয়া চ'লছে। অনেক ভাল মেয়ে আছে তারা স্বার্থত্যাগ করে অপরের সেবা করতে কুণ্ঠিত হয় না।" অমরনাথ একটু ভেবে বলে, "সত্যিই এমন আছে? আমার মতো পাগলকে আপন ক'রে নিতে পারে এমন কেউ আছে এ-সংসারে?"

দীনু- "কেন থাকবে না। তোমার মতামত পেলে আমি এগুতে পারি।"

অমর—"ওরে ভয় হয়। ভয় হয়। তুই জানিস না, আমি এতকাল সংসার করেছি কেবল মুখোস প'রে। প্রাণের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে সংসারে এমনভাবে খাপ খাইয়ে রেখেছিলুম তা' বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারেও নি। তুই না দীনু, তুই ও না। ওতেই আনন্দ ছিল সুখ ছিল, কিন্তু বিধির বিধান—তাতেও বাদ সাধলে। এখন আমি অগাধ জলে।"

দীনু—"বাবু দোহাই তোমার তুমি মত দাও, দেখ সব ফিরে পাবে। আর এক কথা বাবু, তুমি যদি কাজকর্ম ছেড়ে এত ভাব তা হ'লে কি তোমার শরীর থাকবে? কেন এমন কচ্ছ? নিজের কর্তব্য কেন ভুলে যাচ্ছ। তুমি নিজেকে দেশ সেবায় লাগিয়ে দাও, আর আমি তোমাকে দেখবার জন্য তোমার—পছন্দমত একটী গৃহলক্ষ্মীর চেষ্টা করছি।"

অমর—"থাক, থাক, তোর আর কষ্ট করতে হবে না। তবে দেশসেবা, তা আমি করব। আজ থেকে ছোট ছোট ছেলেদের স্কুল করব। তাদের আমিই পড়াব।"

দীনু—"বেশ ভালইত? তোমার মন কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্কতো থাকবে।

অমর—"দেশ সেবা, দেশ সেবা। বেশ ভাল। শুনতেও ভাল, করতেও ভাল। এতদিনত এ ভাবেই জীবন কাটালুম আজ সেজন্যই আমি বেঁচে আছি। আচ্ছা দীনু, তুই কি

কোন দিন আমার ভেতর বেহুয়ো পেয়েছিলি ?

দীনু—"না বাবু, তোমার ধৈর্য অশেষ, তা আমি বরাবর লক্ষ করে আসছি। আজকাল কেন তবে এমন হলে ? তবে কেন অমন ভাব আজকাল ?"

অমর—"সহ্যেরও সীমা আছে। আর কত সহ্য করব বল্‌ত।" অমরনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষিপ্তের মত দীননাথকে বল্লে, "এই এদিকে আয়। আয়। আমার বুকের উপর কান পেতে শোন। আয় শোন।" দীননাথ নিঃশব্দে আসিয়া অমরনাথের বুকের উপর মাথা রেখে শুনল।

অমর—"কিছু শুনতে পেলি ? দীননাথ বিহ্বল ভাবে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "না বাবু। ও কিছু নয়। তুমি কেবলই ভাব।" অমর বল্লে, "কিছুই নয় ? দেখবি ? একখানি ছুরি আনত ? বুক চিরে দেখাচ্ছি, বুকের ভেতরে রক্তের ঝরণা ঝর ঝর করে তালে তালে নেচে চলেছে নিজের কাজে নিঃশব্দে। ওরে দীনু, তুই শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্ না ? ঐ শোন হাহাকার করছে। শুনতে পেলি না ?"

দীনু—"বাবু কি করছ ? স্থির হও।"

অমর—"স্থির ? কিসের ? তুই নাড়ী দেখতে পারিস ? ভাখ, কেমন তাল ঠুকে চলেছে। ওরে, ওরে, বুকের ভেতর ঝড় উঠছে। সব বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে ! ভাখ, ভাখ, আগুন লেগে গেল। আগুন ! উঃ, জ্বলে গেল। যাঃ সব বুঝি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। ওরে আগুন নেবাবার জন্ত কি কেউ নেই কৈ, কেউত আসে না। জল, জল। কৈ, কেউ নেই—আমি একা, কি করি সব জ্বলে গেল আর সামলাতে পারলাম না। গেল সব গেল।"

দীননাথ বাবুর এই অবস্থা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল কি করবে কিছুই স্থির করতে না পেরে নিতান্ত অসহায়ের মত বলে, "বাবু, বাবু, অমন করছেন কেন ? অমরনাথ জ্ঞান হারিয়েছে দীননাথের কোন কথাই কানে গেল না বল্লে, "আজ আমি নিঃসহায়, কেউ নেই আমার—আমি কিছু করতে পারলাম না। আমার সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কেউ এল না। এই মহা শ্মশানে আজ আমি একা।" দীননাথ সভয়ে বল্লে, "বাবু, বাবু স্থির হোন। কেউ নেইও এখানে। আমি এখন কি করি। বাবু স্থির হোন, পাগল হয়ে যাবেন নাকি ?"

অমর—"এই কি শেষ ? না না, এ'ত শেষ নয় ? এখনও যে আমি বেঁচে আছি—আমার শেষ না হলে শেষ কোথায়। এখন আমাকে কোথায় লুকাব ?" অমরনাথ এক বিরাট চিৎকার করিয়া হাসিয়া বলিল, "শেষে পচে মরব তারপর শেয়াল কুকুরে টানাটানি করে একটু একটু করে খাবে।" আর একবার বিকট হাসি হাসিয়া অমরনাথ বিভ্রান্তের মত একটী সোফার উপর বসিয়া পড়িল। দীননাথ খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং বাবুকে সুস্থ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এর গানগুলি শ্রীশিবাজী রতন কর্মকার রচনা
সে জন্ত আমি কৃতজ্ঞ।—লেঃ

উদ্ভিদের খাদ্য ও তাহার গ্রহণ-প্রণালী

—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বৈচিত্রময় এই পৃথিবী। বৈচিত্রের নানা পশরায় সাজান ডালা হাতে বিরাজ করছে শ্যামলা পৃথিবী প্রকৃতি তার সাজ সজ্জা দিয়ে মনের মত করে সাজিয়েছে তাকে। রূপ দিয়েছে বিচিত্র রঙে, বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র সজ্জায়। কত না বিচিত্র উপাদান, কতনা বিচিত্র বস্তুসম্ভার, কতনা বিচিত্র প্রাণী, কতনা বিচিত্র উদ্ভিদরাজী এর অঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে। আমরা যদি ভালভাবে পৃথিবীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি তাহলে এই পৃথিবীকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি ভাগকে আমরা বলতে পারি প্রাণময় জগৎ বা জীবজগৎ আর একটাকে বলতে পারি জড়জগৎ বা প্রাণহীন জগৎ।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ তার জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু এবং প্রাণময় জীব ও প্রাণহীন জড়ের মধ্যে প্রভেদ অনুভব করে আসছে। জলে, স্থলে, বায়ুমণ্ডলে, সাগরতলে, ভূগর্ভে আমরা প্রাণময় ও প্রাণহীন বস্তুর অস্তিত্ব দেখতে পাই। যাদের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ আছে, অর্থাৎ যাদের জন্ম আছে, কলেবর বৃদ্ধি আছে, আকৃতি গঠন আছে, উত্তেজনা শ্বাসক্রিয়া, চঞ্চলতা, অনুভূতি প্রভৃতি আছে তাদের আমরা বলবো প্রাণময়। আর যাদের মধ্যে কোন প্রাণের লক্ষণ নেই, অর্থাৎ যাদের জন্ম নেই, কলেবর বৃদ্ধি নেই, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, গতি, অনুভূতি শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই নেই তাদের আমরা বলবো জড় বা প্রাণহীন। উদ্ভিদ আর পক্ষীকেই আমরা বলবো প্রাণময় আর ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত কিছুই জড় জগতের অন্তর্গত।

এখন প্রাণময় জগতের অন্তর্গত উদ্ভিদই আমাদের আলোচ্য বস্তু। সুবিশাল পৃথিবী তার প্রসারিত বুকে বিবিধ উদ্ভিদরাজীর স্থান দিয়েছে। কতনা বিচিত্র উদ্ভিদে পূর্ণ এর নানা স্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু বিভিন্ন তাপ বৃষ্টিপাত, মাটির উপাদানের তারতম্যের ফলে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, গঠন, উচ্চতা, প্রসারতা নিয়ে বিরাজমান। এই যে উদ্ভিদ সমাজ, এদের জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, উত্তেজনা আছে, তারা আঘাত অনুভব করে, তারা ব্যথা প্রকাশ করে। তারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের চাঞ্চল্য আছে, অপ্রয়োজনীয় বস্তু দেহ হতে বার করে দেয়, তারা বংশবৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার করে। তারা পত্রে, ফলে, ফুলে শোভিত হয়ে উঠে একদিন; আবার একদিন শুকিয়ে নীরস, শ্রীহীন হয়ে মারা যায়। এই যে উদ্ভিদ বীজ হতে জন্মাল, বড় হল, ফলফুল প্রসব করলো, আবার মারা গেল এটা নিশ্চয়ই জীবত্বের লক্ষণ। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম উদ্ভিদের প্রাণ আছে।

আমরা জানি বা দেখতে পাই প্রত্যেক প্রাণীর জীবন নির্ভর করে তার খাদ্যের উপর। সেই খাদ্য গ্রহণ করে তার প্রাণ বিকশিত হয়ে উঠে তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ উদ্ভিদও যখন বীজ হতে তার রূপান্তর ঘটায়, তখন তারও সমুদ্ভব প্রাণ নির্ভর করে খাদ্যের উপর। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনের লক্ষণ ততদিনই থাকে যতদিন সে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পায়। এখন কেবলই এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগছে গাছ আবার কি কি খাদ্য খায় আর কেমন করেই বা খায়। সেই প্রশ্নের সমাধান এইবার আলোচিত হবে।

এই সুবিশাল পৃথিবী, এর গর্ভে বহু উপাদান নিহিত আছে। অনুসন্ধানে আমরা ৯২টী উপাদানের অস্তিত্ব নির্ণয় করেছি। এই মৌলিক উপাদানের অনেকগুলি গাছের খাদ্যদ্রব্য। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি কতকগুলি যৌগিক পদার্থ কমপ্লেক্স অরগ্যানিক সাবস্টেন্স উদ্ভিদের প্রধানতম খাদ্য। সেগুলো হচ্ছে শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় কারবোহাইড্রেটস আমীষ-জাতীয় (প্রোটিনস) ও চর্বি ও তৈলজাতীয় উপাদান (ফ্যাট্স এণ্ড অয়েলস্) এই যৌগিক পদার্থগুলিকে রসায়নিক

প্রক্রিয়ায় (কেমিকাল এ্যানালিসিস্) বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে শর্করা জাতীয় ও চর্বিজাতীয় উপাদানের মধ্যে অঙ্গার (কার্বন), উদজান, (হাইড্রোজেন), এবং অম্লজান (অক্সিজেন) অবস্থান করে আর আমীষ জাতীয় উপাদানের মধ্যে অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান (নাইট্রোজেন), গন্ধক (সালফার), আর ফসফরাস আছে। এ ছাড়া ভস্ম বিশ্লেষণ করে (এ্যাস এ্যানালিসিস) দেখা গিয়াছে, যে আরও কতকগুলি উপাদান যেমন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহজাতীয় উপাদান গাছেরা গ্রহণ করে। ভস্ম বিশ্লেষণ কিরূপে করা হয় কথাটা সততই মনে উদয় হয়। ভস্ম বিশ্লেষণ আর কিছুই নয় খুব সহজেই করা যায়। একটী সুস্থ সবল শিশু-উদ্ভিদকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে, শুকিয়ে, একটী কাঁচের ফ্লাস্কে ভরতে হয়। পরে সেই পাত্রটীকে খুব করে আগুনে উত্তপ্ত করলে পাত্রের মধ্যে একটা গ্যাসের সৃষ্টি হবে এবং গাছের টুকরো গুলো ভস্ম বা ছাইয়ে পরিণত হবে। গ্যাসটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তার মধ্যে উদজান, অম্লজান, সোরাজান, গন্ধক, ফসফরাস্ এবং সময় সময় ক্লোরিন প্রভৃতি থাকে আর ছাই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তার মধ্যে কতকগুলি উপাদান যেমন পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ও সময় সময় সোডিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, এবং সিলিকণ প্রভৃতি আছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে কোন উপাদান গাছের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কোন উপাদানের অভাবে গাছ পুষ্টিলাভ করতে পারেনা তা-ও আমরা পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেছি। সেই পরীক্ষাকে বলা হয় "ওয়াটার কালচার এক্সপেরিমেন্ট"। এই পরীক্ষাটি নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়।

একই আকৃতির প্রথমে আটটী প্রশস্ত একমুখ খোলা কাঁচের জার নিয়ে সেগুলিকে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। এখন নাইট্রিক এসিড, কস্টিক পটাশ ও বিশুদ্ধ জল দিয়ে জারগুলীকে পরিষ্কার করে, ছিদ্রযুক্ত কর্কের ছিপি প্রতিটী জারের মুখে দিতে হবে। এখন বিশেষ কতকগুলি উপাদান দিয়ে তৈরী একটী দ্রবণ (সলিউসান) নিতে হবে যে দ্রবণের নাম হবে "নর্মাল কালচার সলিউসান"। ঐ দ্রবণ তৈরী হয় এক থেকে দুই লিটার বিশুদ্ধ জলে ১ গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট্, ·৫ গ্রাম ক্যাল্সিয়াম সালফেট্ ·২৫ গ্রাম ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট্, ·২৫ গ্রাম ফেরাস ফস্ফেট মিশাইলে। এখন ঐ দ্রবণ কিছুটা এক নম্বর চিহ্নিত জারে ঢালতে হবে আর বাকী জারে "বিভিন্ন দ্রবণ" যেমন একটী দ্রবণে পটাস জাতীয় উপাদান থাকবেনা, আর একটীতে ক্যালসিয়াম, আর একটী দ্রবণে ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ইত্যাদি না দিয়ে তৈরী দ্রবণ ঢালতে হবে। এখন আটটী শিশু, সবল গাছকে প্রত্যেক জারের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে। এমন ভাবে দিতে হবে যেন প্রত্যেক গাছের শিকড়গুলি ঐসব দ্রবণে ডুবে থাকে। জারগুলিকে আলোকিত স্থানে এবার রেখে দিতে হবে। এবং মধ্যে মধ্যে দ্রবণগুলি বদলে নিতে হবে প্রতিটী জারের। কিছুদিন পরে আমরা এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাব গাছগুলির। একটি গাছকে দেখতে পাব বেশ হৃষ্টপুষ্ট, অনেক বেড়ে গেছে এই অবস্থায়, আর বাকীগুলির মধ্যে অনেকের দেখতে পাব বৃদ্ধি হয়নি, কারুর পাতাগুলো ছোট হয়ে গেছে, কারুর বা পাতাগুলো হলদে বা সাদাটে হয়ে গেছে। আবার কিছুদিন পরে দেখতে পাব দু-একটি গাছ মারাও গেছে। কেন এমন হল? উত্তর খুবই সহজ। উপাদানের অভাব। একান্ত প্রয়োজনীয় কয়টী উপাদানের দু-একটী অভাব ঘটেছে। কিন্তু ১নং জারে গাছটী বেশ সুস্থ-সবল আছে। কেননা প্রত্যেকটী খাদ্য উপাদান সে পেয়েছে।

গাছেদের খাদ্যদ্রব্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে কতকগুলি উপাদান সোরাজান শূন্য (নন নাইট্রোজেনাস্), আর কতকগুলি সোরাজান মিশ্রিত (নাইট্রোজেনাস্)।

সোরাজান শূন্য উপাদানগুলো শর্করা জাতীয়, চর্বি ও তৈলজাতীয়। আর সোরাজান যেমান উপাদানগুলো হচ্ছে আমিষজাতীয় প্রোটিনস্ আর অ্যামাইডস্। প্রোটিনস্ হচ্ছে শক্ত আর অ্যামাইড্স হচ্ছে তরল। শর্করা জাতীয় উপাদানগুলো অঙ্গার, উদজান অম্লজান দিয়ে গড়া, আর এইসব উপাদানের কতক জলে দ্রবণীয় আর কতক অদ্রবণীয়। দ্রবণীয় হচ্ছে, চিনি ইনিউলিন, আর অদ্রবণীয় হচ্ছে ষ্টার্চ, সেলুলোস, গ্লাইকোজেন।

চিনি :—জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন প্রকারের চিনি আছে, যেমন আঙ্গুরের, বীটের, আখের, পাকা ফলের ইত্যাদি। যখন গাছ খাদ্য হিসাবে চিনিকে গ্রহণ করে তখন "এনজাইম" নামে এক প্রকার রস (যাহা অদ্রবণীয় পদার্থকে দ্রবীভূত করে খাদ্যের উপযোগী করে) দিয়ে চিনিকে খাবারে পরিণত ক'রে গ্রহণ করে।

ইনিউলিন :—এক প্রকার শর্করাজাতীয় গাছের খাবার। জলে দ্রবণীয়। ডালিয়া, আর্তিচোক প্রভৃতি গাছের মূলে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ষ্টার্চ:—জলে অদ্রবণীয়। গাছের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। সাধারণত, চাল, আলু, বার্লি, গম, যব, ওট, ভুট্টা ও সাগু প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। গাছেরা "ডায়াষ্টেস" নামে একপ্রকার এনজাইন দিয়ে এই খাবার গ্রহণ করে।

সেলুলোস :—শক্ত শর্করাজাতীয় গাছের খাদ্য। জলে অদ্রবণীয়। নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি ফলের বীজে থাকে। এনজাইনের সাহায্যে গাছ ইহা গ্রহণ করে।

গ্লাইকোজেন :—শর্করাজাতীয় গাছের খাদ্য উপাদান। চত্রক (ফাঙ্গাস্) জাতীয় গাছে সাধারণত থাকে। ইষ্ট নামক এক প্রকার ছাতা জাতীয় গাছের মধ্যে গ্লাইকোজেন আছে। তাছাড়া কতকগুলো শৈবালের (এ্যাল্গি) মধ্যেও আছে। এইজাইম দিয়ে গাছ ঐ খাদ্য গ্রহণ করে।

তৈল ও চর্বী :—উদ্ভিদের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। রেড়ি, তিসি, মসিনা, সরিষা, চিনাবাদাম, আখরোট, বাদাম প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। অঙ্গার উদজান আর অম্লজানে ইহা গঠিত।

প্রোটিন্স ও অ্যামাইড্স :—সোরাজান যেমান খাদ্য-উপাদান। অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান, গন্ধক ও ফস্ফরাস দিয়ে ইহারা গড়া। গাছের দরকারী খাবার। এনজাইন দিয়ে গাছ ইহা গ্রহণ করে। রেড়ি, মটর প্রভৃতিতে প্রোটিন উপাদান প্রচুর আছে।

গাছেদের খাবার খাবার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হল, কিন্তু গাছ কি উপায়ে এই সব খাবার গ্রহণ করে তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে কি নিয়মের, কি তত্ত্বের বশবর্তী হয়ে গাছ ঐ সব খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। আমরা যেমন হাত ও মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি গাছেরাও তেমন মূল ও পাতা দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে। আমরা যেমন রান্না ও সিদ্ধ ক'রে খাবার খাই গাছেরাও তেমনি রান্না করে অর্থাৎ খাদ্যোপযোগী ক'রে খায়। গাছ মাটি হতে প্রচুর পরিমাণে জল ও জলমিশ্রিত আকরিক খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করে। আবার গাছের দেহের প্রধান উপাদান অঙ্গার, গাছ মাটী থেকে পায়না। তাই গাছ বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্ল (কার্বন ডাই-অক্সাইড্) গ্যাসকে পাতা দিয়ে শোষণ করে, সূর্যালোক, জল ও পাতার ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থের সাহায্যে আকরিক পদার্থগুলোকে যৌগিক পদার্থে পরিণত ক'রে দেহকোষ নির্মান ক'রে থাকে। গাছেরা প্রত্যক্ষ ভাবে জড় জগৎ হ'তে তাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। গাছ সাধারণত অসমসিস্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অসমসিস্ প্রক্রিয়ার মূল তথ্য হল, যখন কোন দুর্বল দ্রবণ অন্য একটি সবল দ্রবণের সঙ্গে একটী প্রবেশ্য আস্তরণের দ্বারা পৃথক থাকে তখন দুর্বল দ্রবণ সবল দ্রবণে প্রবেশ করে; এই প্রবেশ করাকে বলা হয় অসমসিস্। একটি কাঁচের কাঁপার মুখ পার্চমেন্ট কাগজ অথবা মাছের পটকা, এই প্রবেশ্য আস্তরণ দিয়ে বাঁধা হল এবং কাঁপার মধ্যে সবল দ্রবণ, চিনির জল, দেওয়া হল। এখন এই অবস্থায় যদি ঐ কাঁপাকে দুর্বল দ্রবণে, (যেমন শুধু জল)

ডোবান যায় তাহলে দেখা যাবে জল ঐ প্রবেশ আস্তরণের মধ্য দিয়ে চিনির জলের মধ্যে যাচ্ছে—এই যাওয়াটাই হচ্ছে অসমোসিস্ প্রক্রিয়া। গাছের শিকড় মাটিতে প্রবেশ করেছে। শিকড়ের প্রতিটি কোষ সবল দ্রবণে পূর্ণ। মাটির রস দুর্বল দ্রবণ। সুতরাং অসমোসিস্ প্রক্রিয়ায় ঐ দুর্বল দ্রবণ সবল দ্রবণে আসবে অর্থাৎ আকরিক মিশান জল গাছের মধ্যে যাবে। গাছ সেই দ্রব্য হতে, গাছের উপযোগী খাবার তৈরী করবে। উদ্ভিদ-তত্ত্বের, লেগুইমাইনোসি নামক বিভাগের অন্তর্গত কতকগুলো গাছ আছে, যেমন ছোলা, মটর ইত্যাদি যারা অতি অদ্ভুত উপায়ে সোরাজান গ্রহণ করে বায়ু-মণ্ডল হতে। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে সোরাজান আছে, কিন্তু সব গাছদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যারা ঐ সোরাজান বায়ুমণ্ডল হতে গ্রহণ করতে পারে ঐ জাতীয় গাছের মূলে একপ্রকার জীবাণু বাসা বাঁধে। যাদের বলা হয় সিউডেনোমাস্ রেডিসিকোলা। এই সব ব্যাকটিরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে সোরাজান গ্রহণ ক'রে গাছকে দেয়। গাছ নাইট্রেট রূপে তাহাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আর ব্যাকটিরিয়ারা কার্বহাইড্রেট গ্রহণ করে ঐ জাতীয় গাছ হতে। তারা বেশ পরস্পর উভয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এই প্রণালীর নাম দেওয়া হয়েছে 'সিম্‌বায়োসিস।'

আবার এই বিচিত্র পৃথিবীতে কতকগুলি গাছ আছে তাদের খাদ্য গ্রহণ প্রণালী একেবারেই স্বতন্ত্র। তারা হচ্ছে পরভোজী বা পরগাছা জাতীয় গাছ। তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই খাদ্য তৈরী করবার। তারা খাবারের জন্য নির্ভর করে অপর গাছের উপর। স্বর্ণলতা, আলোকলতা, বেনিয়াবউ, বান্দা, আকসবেল, শ্বেতচন্দন প্রভৃতি গাছ পরভোজী। তারা তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচাল শিকড়, অন্য গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সেই গাছের খাদ্যরস শোষণ করে নেয়। আবার কতকগুলি গাছ আছে তারা কীট ভোজী। তারা কীট ধরবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। তারা রঙীন ফল ফুল, পাতা প্রভৃতি প্রসব করে ফুলে মধু সঞ্চয় করে, কাঁটা, আঁটা ইত্যাদি নিজের দেহে রাখে। এইভাবে তারা মধু ও রঙে, কীট পতঙ্গদের আকৃষ্ট করে কাঁটা ও আঁটা দিয়ে তাদের কৌশলে আবদ্ধ করে আহার করে। রৌদ্র শিশির কাঁকি, কলসমুক্ত ইত্যাদি এই ধরণের গাছ।

বিরহ

লক্ষ্মী দেবী

যদি এসে দেখ দুয়ার বন্ধ
বাতায়নে নাই আলো,
ফিরিওনা প্রিয় অভিমান ভ'রে
জেনো সে বিরহ-জ্বালা।
তোমার পরশ-স্মৃতি-বিজড়িত—
হারানো দিনের যত সঙ্গিত,
সেই সম্বল অবলম্বনে—
ভরেছি জীবন ডালা,
আজও রয়েছে সেদিনের গাঁথা—
বাসি কুসুমের মালা।

কতনা সে মধু ফাগুন রাতি—
আশায় গিয়াছে চলি,
এমনি সে কত বরষার ধারা—
বিরহে পড়েছে গলি।
শারদ রাতের সেফালী সুবাসে—
চেয়েছি জেগেছি প্রেমোচ্ছাসে,
হে মোর পথিক অতীতে রেখেছ—
শূন্য পান্থ-শালা,
ভাবি তাই মনে আঁধারে ফিরিয়া
পড়িবে ছিন্ন মালা।
ফিরিয়া যেওনা অভিমান ভরে
জেনো সে বিরহ জ্বালা।

ভিখারী

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ বি, এস, সি

গৌহাটির শুক্লেশ্বর ঘাট।

দুপুর গড়িয়ে এসেছে, স্নানার্থীর ভীড়ে ঘাট মুখরিত। উপরে ঘাটের অঙ্গনের উপর সুপ্রাচীন সিংহদ্বার; দেয়ালের চির হতে এবং আশে পাশের ঝুলন্ত বটশাখার ফণে ফণে তক্ষক সাপের হুঙ্কার ওখানকার ভারী আবহাওয়াটাকে আরও রহস্যঘন করে তুলে। স্নান সেরে যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, সিঁড়ির অন্ধকার প্রান্তে এক জীর্ণ ভিখারী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভিখারীর মূর্তি বর্ণনা করবার মতন ভাষা আমার আয়ত্তে নেই, এক কথায় ওরকম জীবন্ত বিভীষিকা ইতিপূর্ব্বে আমি আর দেখিনি; ক্ষত বিক্ষত লোল চর্ম্মাবৃত একটি জীবন্ত কঙ্কাল বললেই হয়। পরনে একখানা নোংরা নেংটি, কোটরগত অত্যুজ্জ্বল চক্ষুতে কি যেন এক সর্ব্বগ্রাসী নিষ্ঠুর দৃষ্টি, ক্ষীণ কণ্ঠে তবু যেন এক হিটলারী আদেশব্যঞ্জক সুর। কঙ্কালসার হাত দিয়ে একটা আলি আমার দিকে প্রসারিত ক'রে আমায় আদেশ করলে,—

—'যা তো, আমার জন্য চার পয়সার কিছু খাবার কিনে আন্; অন্ততঃ এক কাপ চা কিংবা চিড়ার মোয়া। আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত। দেরী করিসনে, যাবি ত তাড়াতাড়ি যা। ওঃ, আমায় দেখে ঘৃণা হচ্ছে? ঘৃণা নে? আমায় তুই অবহেলা করলি?'

সদ্য স্নান সেরে শুভ্র পরিচ্ছন্ন বেশে ঘরে যাচ্ছি, এ কিসের জঞ্জাল। আরও কত লোক ত আসছে যাচ্ছে, শেষে কিনা আমাকেই দেবতা পরীক্ষায় ফেল্‌লেন? ওর নোংরা মূর্ত্তি দেখে আমি হয়ত ঘৃণাই করে থাকব ওকে; ভয়ও পেয়েছিল বটে...। ওকেও ভয় পেয়েছিলাম, দেবতাকেও। সত্যিই ত, ওকে অবহেলা করবার অধিকার কি আমার আছে? ছোঁব কি ছোঁব না, আধ্যাত্ম-বিবেকের সঙ্গে বাস্তব বিবেকের দ্বন্দ্ব বাধল। আমি স্নান সেরে ঘরে যাচ্ছি, ওর মরলা হাতে কত রোগের বীজাণু থাকতে পারে; কিন্তু তবু মানুষ হয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানবাত্মার আবেদনকে কি অবহেলায় লঙ্ঘন করতে পারি? ও এত দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত যে নিজে গিয়ে দোকান থেকে কিনে আনবার শক্তি ওর নেই। কে ওকে চারটে পয়সা দিয়েছে, পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমারই। দুর্ব্বলের ক্ষীণ কণ্ঠে কেমন করে আদেশের সুর বেজে উঠতে পারে, এই ভিখারীর অবস্থায় না পড়লে সে কথা নিশ্চয় কেউ বুঝে না। পয়সা আমার নয়, ওর পয়সা দিয়ে ওকে জিনিষ কিনে দেবার স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধটুকুও যদি আমার না থাকে, মানুষ নামের অধিকারী কিসে? উপরন্তু আর্ত্ত-আতুরে দয়াদাক্ষিণ্য দেখান ত কারও সকাতর আহ্বানের অপেক্ষা রাখে না, অন্ততঃ রাখা উচিত নয়।

হাত বাড়িয়ে আনিটাকে গ্রহণ করলাম। ও ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল, কতক্ষণে খাবার নিয়ে আমি ফিরে আসব। সত্যি আমি ভারী বিচলিত হলাম ওর দুঃখে।

মধ্যাহ্ন-সহরের জনবিরল নদীর ধারের পথ। অনেক হেটেও কোন দোকানে চা কিংবা মোয়া, মুড়ি কিংবা অন্য কোন রকমের খাবার (অন্ততঃ চার পয়সায় যা কেনা যায়) পেলাম না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসছি। আমার পকেটেও পয়সা ছিল না। ফিরে এসে ওকে দুঃখ দিতে কোথায় যেন বড়ই বাধছিল। তবু ওর কাছে নিষ্ঠুর সত্যটাকে জ্ঞাপন করতে হল।

ক্ষুধা-অলস দৃষ্টি মেলে ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে সে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করে বললে.—

—'পেলিনা, আমার জন্য কিছুই পেলিনা? এক কাপ চা, অন্ততঃ চার পয়সার বাদাম ভাজা?'.....

—'চা কেন্‌বার মতন পয়সা ত নেই। চার পয়সায় চা হয় না।'

আনিটাকে ঝনাৎ করে ওপাশে ফেলে দিলাম।

—'তোর কাছে নেই পয়সা?'

ওর ধারণা, যতই লাগুক, একবার যখন ওর চার

পয়সা হাতে নিয়েছি, খাবার ওকে কিনে দিতেই হবে।

পিছন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তৎক্ষণাৎ আবার বললে,—

—'ছই হোত'; বাদামওয়ালা যাচ্ছে, আমার জন্যে চার পয়সার বাদাম ভাজা নিয়ে আয়। দেরী করিসনে, যা।'

আমি আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলাম, সত্যি এই জনশূন্য পথ দিয়ে তখন এক বাদামওয়ালা যাচ্ছে। মনে মনে চমকিত না হয়ে পারলাম না যে কেমন করে এই মুহূর্ত্তে এ সম্ভব হতে পারে। এতক্ষণ ধরে এতটা পথ হেঁটে এলাম, কোথাও কিছু পেলাম না; এই মাত্রও চেয়ে দেখেছি সারাপথ জনশূন্য শুষ্ক; আর এখন এই মুহূর্ত্তেই বুঝি ওর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির রূপ ধরে ওর দাবী মিটানোর জন্য এই বাদামওয়ালার আবির্ভাব। আমি যেন ওর আদেশের ভৃত্য! কোন দেবতা আমাকে নিয়ে আজ এ ছলনা খেলায় অবতীর্ণ।

আবার ওর হাত থেকে আনিটাকে নিয়ে ছুটে গেলাম বাদামওয়ালার পিছনে পিছনে। বাদামওয়ালা ততক্ষণে বটের ছায়ায় তার দোকান পসরা নামিয়ে ধরেছে। চার পয়সার বাদাম নিয়ে ফিরে এলাম ভিখারীর কাছে।

ভিখারী বাদামের ঠোঙা আমার হাত থেকে যেন কেড়ে নিল। দৃপ্ততর কণ্ঠে আবার আদেশের ঘোষণা উচ্চারিত হল,—

—'যা, তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে আমার জন্যে ভাত নিয়ে আয়। তোর খাওয়া হয়েছে?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—'যা তুই কেবল অযথা দেরী করিস। আমার মা বলে গেছে তোকে দিয়ে আমার ভাত পাঠিয়ে দেবে। আমাকে অভুক্ত রেখে আমার মা কি খেতে পারে? দাঁড়িয়ে থাকিস কেন, যা না? আমাকে খাইয়ে ত পরে মা খাবে?'

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, কে এর মা? ও পাশের আড়ালে সিংহদ্বারের আচ্ছাদনের নীচে আর এক পথচারিণী মাটির হাঁড়িতে রান্না চাপিয়েছে। মার প্রসঙ্গোল্লেখে ভাবলাম,—এই কি? পরে বুঝলাম যে আমার বৌদির কথা বলা হচ্ছে। বৌদিও এসেছিলেন আমার সাথে স্নান করতে। আমাকে এ মহৎ কাজের ভার দিয়ে তিনি চলে গেছেন। ভাবলাম বৌদি হয়ত ওকে ভাত পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়ে গিয়েও থাকতে পারেন। আমার বৌদি বড় মহীয়সী; অকারণেও তার মাঝে সমবেদনার বাণ ডাকতে দেখেছি। বুঝলাম, বৌদিই ওর উল্লিখিতা মা।

ভিখারীর কথায় তাই বিশ্বাস করে ওর জন্যে বৌদির দেওয়া ভাত নিতে ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে রওনা হলাম। ভিখারী ততক্ষণে গোগ্রাসে বাদাম গিলতে আরম্ভ করেছে।

ঘরে এসে বৌদির কাছে ভাত চাইতেই তিনি বললেন, ও রকম কোন কথা ভিখারীকে তিনি দেননি।

আমি আর ভিখারীর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। কিন্তু ও কি আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে না?

এতক্ষণে আমি যেন প্রকৃতিস্থ হলাম। আমাকে যেন ভূতে না কিলে পেয়ে বসেছিল। সারা গা ঘেন্নায় শিরশির্ করে উঠতে থাকল। সাবান দিয়ে ভাল করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে শুদ্ধ হলাম। ওর গায়ের নোংরা গন্ধ এখনও যেন আমার নাকে লেগে রয়েছে; বারে বারে ওয়াক্ করে গলার ভিতর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে নিলাম। ভিখারীকে কেন্দ্র করে নিজের মধ্যে কোথায় যেন বেশ একটু আত্মানুভূতির দৈন্য অনুভব করলাম। আর এক চাপা রাগে ফুলে ফুলে উঠতে থাকলাম; আমার বিশ্রামের সারা দুপুরটাই এই ভিখারী আজ বিগড়ে দিয়েছে। অদ্ভুত জটিল মনোভাব নিয়ে সক্রোধে এই সিদ্ধান্ত করলাম, ওঘাটে আর স্নান করতে যাবনা কখনো।

এর পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। ওর গায়ের নোংরা গন্ধটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওর রুক্ষ মনে করে আজও যেন আতঙ্কে শিউরে উঠি। অপরাহ্নের প্রারম্ভে নদীর ধারের পথ দিয়ে আসছিলাম, এতদিন আর কখনো পাইনি, আজ আবার দেখলাম ওই জীবন্ত কঙ্কালকে। চেহারা এখনও সেই আগের মতন, একটুও উলিশ-বিশ হয়নি। আমি ভেবেছিলাম ও মরে গেছে: ওর মরে যাওয়াই উচিত, অন্ততঃ এই ভেবে একটু স্বস্তি পাবার চেষ্টা করতাম। সত্যিই ত দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ওর কিসের প্রয়োজন? ও পৃথিবীর একটা অনাবশ্যক জঞ্জাল বই ত নয়? তবু কি মৃত্যু এত সহজে এসব জঞ্জালকে গ্রাস করে? যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, তার স্থায়িত্বই যে সবচেয়ে কম! আমার পা কিসে জানিনা কাঁটা দিয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম, ও উঠে দাঁড়াতে পারছেনা; বসে বসে রাস্তার পিচের সঙ্গে নিজের গায়ের মিহাংশের সংঘর্ষে মন্দমন্দ গতি সৃষ্টি করে চলেছে। ওকে আমার ভয় করে। ওর সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। ঝট্ করে চলে আসলাম, আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, ভিখারী যেন লরী চাপা পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। চীৎকার করে জেগে উঠেছিলাম।

দুনিয়ার বুকে ভিখারী আজও বেঁচে আছে কিনা জানিনা। বোধ হয় আছে। যাদের প্রয়োজন সব চেয়ে কম, স্থায়ীত্ব তাদেরই যে সব চেয়ে বেশী! যম এত সহজে কি ভিখারীকে চেনে! কিন্তু ভিখারী আমার জীবনের একটা মস্তবড় দুঃস্বপ্ন...কায়মনোবাক্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাই, আমার সেরাতের স্বপ্ন যেন এই মুহূর্তেই সফল হয়।.....

সিন্ধুর ডাক

কণপ্রভা ভাদুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

চিঠিখানা পড়ে কৃষ্ণশরণ হাহাকার করে উঠলেন, "দাদা, একটু অপেক্ষা কর; আমি এখনি যাচ্ছি। দাদা, তুমি হাসপাতালে, আর আমি রাজপ্রাসাদে"?

অপরিচিত ব্যক্তি দ্রুত ধাবমাণ কৃষ্ণশরণকে ধরে ফেলে বললেন, "ছোটবাবু স্থির হোন। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? আমি ত তাঁকে শেষ করেই এসেছি"—

"এঁ্যা তুই আমার দাদাকে শেষ করে এসেছিস"? উন্মত্ত কৃষ্ণশরণ সে ব্যক্তির টুঁটি টিপে ধরলেন হিংস্র ভাবে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্তেই তাঁর হিংস্র মুঠি শিথিল হয়ে গেল। তিনি মাটীতে বসে পড়লেন, এবং ধীরে লুটিয়ে পড়লেন শীতল ভূমিশয্যায়। প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, মহামহীরুহ।—

তারপর যেন এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হোল কৃষ্ণশরণের জীবনে। যখন তিনি সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকালেন; প্রথম দর্শনেই, দেখলেন কমলার কোলের উপর বসে রয়েছে একটী বালক। ঠিক যেন বালক জ্ঞানশরণ ফিরে এসেছেন আবার তাঁর জন্মভূমিতে। কিন্তু না এ ত জ্ঞানশরণ নয়—স্বপ্ন নয়, এ যে সূর্য, নূতন সূর্য, তাঁর অগ্রজের সন্তান সূর্যশরণ। কৃষ্ণশরণ ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে বালককে বক্ষে টেনে নিলেন। আদরে তাঁকে অভিভূত করে দিলেন। স্বেচ্ছাচারী জ্ঞান শরণের ছেলে নাস্তিক হিমানীর ছেলে, সূর্য আশ্রয় পেল। চৌধুরী বংশের ছেলে তার প্রাচীন বংশে প্রতিষ্ঠিত হোল। ভবানীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে নিজের রক্ত দিয়ে কৃষ্ণশরণ তাকে দীক্ষা দিলেন। তাদের বংশের নিয়ম এই। সেই বালক আজকের এই পাঠরতা সূর্যশরণ। তার স্বভাবের বৈচিত্র লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে শরণ যখন আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন, তখনই দৃশ্যের

পর দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীতের যত কাহিনী নিয়ে। তাঁর অচেতন মন নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করে; হবে না? ওর রক্তে যে রয়েছে নাস্তিকতার বীজ। ওর রক্তে রয়েছে (সিন্ধুর ডাক; ওর রক্তে রয়েছে পুরাতনকে ভেঙ্গে, নূতনকে গঠন করবার গর্ব। তাকে বাধা দেবে কে? তবুও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন ওকে প্রাচীন চৌধুরী বংশের আদর্শে মানুষ করতে। তাঁর আশা, সূর্য একদিন বড় হবে। তাঁর অবর্তমানে সূর্যই রোজ সন্ধ্যাবেলা ভবানীর মন্দিরে জ্বালাবে তাঁদের সন্ধ্যা বাতী। পরম সান্ত্বনায় তিনি সূর্যর পানে চেয়ে থাকেন। এ জন্মে সন্তান না পাওয়ার দুঃখ তাঁর মন থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।—

সূর্য মন দিয়ে ব্যাকরণ পড়ছে। একটু ভুল হলেই পণ্ডিত মশাই তাহা সংশোধন করে দিচ্ছেন। এমন সময় দ্বারদেশে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী। সে অনেক দিনের পুরানো দাসী,—এবং বয়সও হয়েছে অনেক. তাই সে কাউকে বড় একটা লজ্জা সরম করে না। তবে বাড়ীর নিয়ম মেনে চলে। মাথার কপালে পর্যন্ত কাপড় টেনে দিয়ে সে মৃদু কণ্ঠে ডাকলে, ছোটবাবু."

কৃষ্ণশরণ মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। লক্ষ্মী ধীরকণ্ঠে বললে, বৌদিদি, বললেন. "দাদাকে যেন কাল থেকে ছুটী দেওয়া হয় "।

কৃষ্ণশরণ কোনও কথা বললেন না। পড়তে পড়তে সূর্য একবার শুধু নড়ে উঠল। লক্ষ্মী পুনরায় বললে, "আজ বিকালে বৌদিদি দাদাকে নিয়ে শ্বশুর যাবে"—"তোমাদের শ্বশুর যাওয়াটাই বড় কথা হোল" এতক্ষণে কৃষ্ণশরণ কথা কইলেন। লক্ষ্মী এবার একটু আব্দারের ভঙ্গীতে বললে, "পূজো এসে গেল, আর কত পড়বে ছেলেটা? ছেলেমানুষত? আজ সকালে তার কাকীর কোলে বসে কত কাঁদল"?

"হা সূর্য তুমি কেঁদেছিলে সকালে?" সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণশরণ উত্তর করলেন। অভিমানে লজ্জায় সূর্যর সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠল। লক্ষীর দিকে একবার সে রক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর চোখ নীচু করে বললে, কাকাবাবু, ও সব মিথ্যে কথা বলছে"—

ওদিকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লক্ষ্মী তখন বলছে, "ওইত দাদা কাঁদছে। ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না ছোট বাবু?" সূর্যর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তার কালো বড় বড় চোখদুটী জলে ভরে টল টল করছে। রাগে দাঁত কড়মড় করছে, কিন্তু মুখ তুলতে পারছে না লজ্জা। তা সত্ত্বেও সে চিৎকার করে বললে, "তুই এখান থেকে যা। কেন পড়ার সময় বিরক্ত করছিস"—

কৃষ্ণশরণ স্নেহে আহ্বান করলেন, "সূর্য আমার কাছে আয়"—পণ্ডিতমশাই কপট তিরস্কারের ভঙ্গীতে লক্ষ্মীকে বললেন. "তুমি কেন বাছা অকারণ ওকে ত্যক্ত করছ। আজ থেকে আগামী শ্যামাপূজা পর্যন্ত সূর্যর ছুটী রইল। যাও গিয়ে ছোট মা ঠাকরুণকে বল"—

লক্ষ্মী ততক্ষণ সেখান থেকে চলে গেছে। ওর স্বভাবই এই। যে কোনও ব্যাপার যতই কঠিন হোক না কেন, ও প্রথমে তাকে সরল করে নিয়ে তারপর নিজের কাজ হাসিল করে সরে পড়ে

হাতে ছাতা নিয়ে পায়ে তালপাতার চটী পণ্ডিতমশাইও বিদায় নিলেন। ঘরের মধ্যে শুধু রইলেন কৃষ্ণশরণ আর সূর্যশরণ। প্রাচীন বংশের ছুটী প্রদীপ শিখা। সূর্য জানে এ সময় কাকাবাবু তাকে বকবেন না। তাই সে পরম নির্ভয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কোল ঘেঁসে বসে আছে। কৃষ্ণশরণ তখন ছেলে বলছেন, "বুঝলি সূর্য, সপ্তমীর দিন সেই জরীর পোষাকটা পরিস। দেখিস পরলে তোকে কেমন মানাবে? সকলে তোকে সীতাগড়ের রাজার ছেলে বলে ভুল করবে"?

সূর্য্য বললে, "না কাকাবাবু ওগুলো পরতে আমার বড্ড লজ্জা করে। সকলে বড্ড ক্ষেপাবে। আপনি কোলকাতা থেকে যে কোট প্যান্ট আনিয়ে দিয়েছেন আমি তাই পরবো। কোটপ্যান্ট পরতে আমার বড্ড ভালো লাগে কাকাবাবু"—কৃষ্ণশরণের মনের মধ্যে একটা

হয় করে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই বিজাতীয় পোষাক-প্রীতি সূর্যের মনে কোথা থেকে জন্মাল? তিনি যে বস্তু ঘৃণা করেন সূর্য কেন তাই ভালবাসে? সূর্য কি তাঁদেরই বংশধর নয়? বংশধর হলে কি হবে? সূর্যর রক্তে আজও প্রবাহিত হচ্ছে নাস্তিক হিমালীর রক্তধারা। তাকে অস্বীকার করলে ত চলবে না? সাত্ত্বিক কৃষ্ণশরণ সচকিত হয়ে ওঠেন। একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাকেন, "ভবানী ভবানী"—তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেন, "তাই পরিস সূর্য, তাই পরিস। যা তোর ভালো লাগে তাই পরিস" একটু থেমে আবার বলেন, "ভালো করে লেখাপড়া শেখ, তোকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দোব। টাকা দোব সেখানে মনের মত কাপড় জামা কিনে পরিস। তারপর বড় হলে পাঠিয়ে দোব আরও দূরে সে ইংরেজদের দেশ। সেখানে গিয়ে দেখবি স্বাধীন দেশের মানুষ কি করে বেঁচে থাকে। তবে সাবধান সূর্যশরণ সর্বদা মনে রাখবে, সেটা তোমার দেশ নয় তুমি তোমার দেশের রীতি নীতি অনুযায়ী চলবে। সেক্সপীয়ার পড়ে মুগ্ধ হলেও, কালিদাসকে কোনদিন অশ্রদ্ধা কোর না। অবিশ্বাস কোরনা রামায়ণ মহাভারতকে। ভুলে যেওনা, তোমার ঠাকুরদাদামশাই বিষ্ণুশরণের কথা। তিনি কত বড় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন শুনেছ ত তোমার কাকীমার কাছে। তিনি এত বড় যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন যে, মড়া মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন ভুলে যেওনা তার নিষ্ঠা তান্ত্রিকতা। তিনি কোনও দিন কারো ছোয়া খাবার জিনিষ খাননি। তিনি ছিলেন একাহারী। সন্ধ্যেবেলা রোজ নিজ হাতে শুধু ভাত সেদ্ধ করে আর কাঁচা দুধ খেতেন। ভবানীর আসল মূর্তি তিনি দুবার দেখেছিলেন সন্ধ্যা প্রদীপ দেবার সময়। মনে রেখো এই ভবানীর মন্দিরে, একদিন তোমাকেই জ্বালাতে হবে সন্ধ্যা প্রদীপ"—সূর্য বলে, হ্যাঁ কাকাবাবু বড় হয়ে আমি ঠিক ঠাকুর দাদা মশাইর মতই হবো আপনি দেখবেন। তবে ওই ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় আমি কিছুতেই প্রদীপ দিতে যেতে পারবো না"।

কৃষ্ণশরণ বললেন, "আমি যখন থাকবোনা তখন কে মন্দিরে বাতি জ্বালাবে? অবিচলিত কণ্ঠে সূর্য বললে, "কেন পূজারী ঠাকুর মশাই"?

"পূজারী ঠাকুর"? কৃষ্ণশরণ আত্মগতভাবে বললেন, "আগে যে পূজা চৌধুরীরা নিজেরা করত এখন সেই ভবানীর পূজার ভার গিয়ে পড়েছে পূজারী ঠাকুরের হাতে। তারপর একদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার ভারও গিয়ে পড়বে বাইরের লোকের হাতে? ভবানীর যা অভিলাষ।"

কৃষ্ণশরণ বললেন, "পাগল ছেলে, বড় হলে কি আর ভয় থাকে? এখন চল ভিতরে যাই। বেলা হয়ে গেল অনেক।" সূর্য বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে তাঁর হাত ধরে বাইরে এল।

পূজার তিনটি দিন সূর্য তার কাকীমার সঙ্গে নূতন পোষাক পরে বাড়ী বাড়ী ঠাকুর দেখে প্রসাদ খেয়ে, বাড়ীতে নানা রকম খাবার খেয়ে বেশ আনন্দ করেই কাটিয়ে দিল। কিন্তু গোল বাঁধল বিজয়া দশমীর দিন। নবমীর দিন সন্ধ্যার সময় খীড়কীর দরজায় এসে ডাক দিল জাকড়াদের ছেলে অরুণ। সূর্যর সঙ্গে একক্লাশে পড়ে; উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। লক্ষ্মীদিদির দৃষ্টি এড়িয়ে সূর্য পা টিপে টিপে খীড়কীর দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর দুই বন্ধুতে গিয়ে বসল ঘাটের চাতালে। পুকুরের শালুকগুলো শরতের চন্দ্রালোকে যেন হাসছে। পুকুর ঘাটের চারিটী পাড় সুপারী গাছের সারি দিয়ে ঘেরা। সেই সুপারী পাতার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকের বন জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে রূপালী জ্যোৎস্না। অরুণ বললে "সূর্য একজায়গায় যাবি?"

"কোথায় রে অরুণ?" সূর্যর কণ্ঠে বিস্ময়।

অরুণ বললে, "নদীর ওপাড়ে সীতাগড় রাজবাড়ীতে, কলকাতা থেকে থিয়েটার পার্টি আনিয়েছে। কাল রাত্রি থেকে আরম্ভ হবে গেছে। লক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকবে। উঃ কি সব তাদের চেহারা, কি পোষাকের বাহার, কত জিনিষপত্র, যদি দেখতিস সূর্য?"

"তুই কি করে দেখলিরে অরুণ?" সূর্য জিগ্যেস করল।

আমার মামা ত রাজবাড়ীর পেয়াদা, অরুণ বললে, "মামা যখন ইষ্টিশানে গিয়েছিল ওই থিয়েটারের দলকে নিয়ে আসার জন্য তখন আমিও মামার সঙ্গে গিয়েছিলুম রে সূর্য।—যাবি কাল রাজবাড়ীতে"?

সূর্য কি বলবে?—ও বড় হচ্ছে সবই বুঝতে শিখছে। সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্য বোধের শিকড়ও মনে শক্ত হয়ে গেথে যাচ্ছে। সে ওর ইচ্ছায় নয়, প্রকৃতির ইঙ্গিতে এবং রক্তধারার অনুশাসনে। তাহলেও ও কিশোর মনের উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাকে অস্বীকার করবে কি করে? ও বললে, "কাকা যদি জানতে পারেন রে? তখন কি হবে"।

"কি করে জানতে পারবেন?" অরুণ বললে, "তিনি যখন ভবানীর মন্দিরে আলো জ্বালাতে যাবেন, তখন আমরা চলে যাবো। আর ফিরবো অনেক রাত্রি বেলা। তখন সকলে ঘুমাবে?"

সূর্য বললে, "আমি যে রাত্তিরে কাকীমার সঙ্গে ঘুমাই"—

অরুণ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। "ধুরছাই। বেটাছেলের আবার অত ভয় কিসের"?

অরুণকে বিরক্ত হয়ে চলে যেতে দেখে সূর্য ব্যস্ত হয়ে বললে, "যাবোরে অরুণ, আমি যাবো"—

অরুণ খুশী হয়ে বললে, "আচ্ছা, তবে কাল সন্ধ্যার পর ঠিক হয়ে থাকিস। আমি চণ্ডিতলার বড় বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শীষ দোব। শুনতে পেলেই চলে আসবি। বুঝলি"?

সূর্য মাথা হেলিয়ে জানাল সে বুঝেছে। অরুণ চলে গেল। সূর্যর মনের মধ্যে জেগে উঠল কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ। সীতাপুর গড়ের রাজবাড়ী কলকাতার থিয়েটার পার্টি, নদীতে নৌকা করে যাওয়া রাত্রি বেলা, সবই ওর কাছে নূতন। সবই অভিনব। কতক্ষণে কাল সন্ধ্যা আসবে? সূর্য অস্থির ভাবে সমস্ত বাড়ী ঘুরে বেড়াল। কেউ কোথাও নেই। সকলেই গেছে পূজা দেখতে। কাকা ভবানীর মন্দিরে। কাকীমা রায়দের দুর্গামণ্ডপে। শুধু লক্ষ্মী তার মহলের একাংশে বসে তকলী দিয়ে সুতো কাটছে। সূর্য গিয়ে তার পাশে বসল। লক্ষ্মী ঠাট্টা করে বললে, "কি গো রাজকুমার এখানে কেন, কাকা মেরেছে নাকি"?

অন্যদিন হলে এই রাজকুমার সম্বোধন শুনে সূর্য তাকে মেরে চুল ছিড়ে অস্থির করে তুলত। আজ কিন্তু সে সব কিছুই করল না। লক্ষ্মীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে সে বললে, "একটা গল্প বলনা লক্ষ্মীদি? মস্ত বড় রাজার গল্প"?

লক্ষ্মী তার কপালে হাত বুলিয়ে বললে, "কেন রে, হঠাৎ গল্প শোনার সখ হোল কেন"?

সূর্য তখন আকাশের দিকে চেয়েছিল। শারদ নবমীর সাদা ধবধবে চাঁদ সুপারী পাতা আন্দোলিত করে ইঙ্গিতে ওকে যেন কি বলছে। ও ভাবছে রাজবাড়ীর আকাশেও কি এমনি সুন্দর চাঁদ ওঠে। লক্ষ্মীর প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বললে, "জানিনা যাও" লক্ষ্মীর আজগুবি গল্প শুনতে শুনতে সূর্যর মনের সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে গেল। এক সময়ে সে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। লক্ষ্মীর সুতা কাটা বন্ধ হয়ে গেল। ও আঁচল দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

পরের দিন বিজয়া।

বাড়ীতে ব্যস্ততার আর সীমা নাই। এখন থেকেই আত্মীয় অভ্যাগতদে বাড়ী ভরে গেছে। ময়রা মিষ্টি তৈরী করছে। ভাড়াটিয়া ঠাকুর লুচি পোলাও রাঁধছে। মেয়েরা পান সাজছে, তরকারী কুটছে। ছেলেরা পুকুরে সাঁতার কাটছে কীর্তন গাইছে। মহা হৈ হৈ ব্যাপার। এর মধ্যে আদৌ সূর্যর দিকে দৃষ্টি রাখার কথা কারই বা মনে আছে? ভবানীর মন্দিরে আজ সারা রাত ধরে চণ্ডীপাঠ হবে। তাই নিয়ে কৃষ্ণশরণ ব্যস্ত।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সূর্যর মনের অবস্থাও অবর্ণনীয়। দেবী বিসর্জন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

প্রণাম পর্বও শেষ হয়ে গেল। সূর্য কিছুই খেতে পারল না। শুধু একটা চন্দ্রপুলি খেয়ে সকলকে লুকিয়ে বাড়ি-মহলের ফুলবাগানের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখন বাতাসে ভেসে আসবে সঙ্কেতধ্বনি? কখন সে নৌকায় উঠে বসবে? কংসনদীর কালো স্রোতের মধ্যে দিয়ে ছ ছ করে বয়ে যাবে ওদের নৌকো। সূর্য চলন্ত নৌকার মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে জল ছুঁয়ে দেখবে, নদীর জল ছুঁলে কেমন লাগে? এক সময়ে অরুণের সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল।

সূর্যর রক্ত নেচে উঠল। কোনও দিকে না তাকিয়ে খোঁচার কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। পথ মাইল খানেক হবে। কারণ তার নিকটেই কংস নদী। সেই নদীপথে পাড়ি দেবে সূর্যরা। চণ্ডীতলায় দেবীর স্থান, আজ জনশূন্য। শুধু মিট মিট করে একটা মাটীর প্রদীপ জ্বলছে তারই প্রাঙ্গণে বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল অরুণ। সূর্যকে দেখে একমুখ হেসে বললে, "এসেছিস ভাই; আয়?—পথে যেতে যেতে সূর্যর পরিধেয়ের পানে চেয়ে সে বললে, "এ কি পরেছিসরে? তোরাও ত কম বড়লোক নয়? শুধু রাজা নয়, এই যা। এই রকম বাজে কাপড়ে কি ও সব জায়গায় যেতে আছে? দেখবি, কত লোক আসবে"?

সূর্য অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "মনে ছিলনা ভাই" সে নতুন ছয়ের দাম দিয়ে পরা নতুন মলমল তসরের প্যান্ট, আর কমলার হাতে বোনা রঙীন সুতার গেঞ্জীটার পানে চেয়ে দেখল। সত্যিই বিজয়ার নূতন পোষাক যে আজ একবারও পরেনি। কাকীমা জানতে পারলে খুবই বকবেন। কিন্তু কি করা যাবে? সূর্যর সমস্ত দিন আজ যে কি করে কেটেছে, সে ও নিজেই জানে না।

ঘাটে পৌঁছে ওরা দেখল একখানি পানসী জলে ভাসছে। দুজনে লাফ মেরে উঠে বসল। নৌকা দুলে উঠল। সূর্য ভয় পেয়ে অরুণকে চেপে ধরল। অরুণ তখন নৌকা বাইতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বললে, 'সূর্য, ছাড় ছাড় তা নাহলে ডুবে মরবি যে বোকারাম"?

সূর্য হেসে অরুণকে ছেড়ে দিল; এতক্ষণে ওর মুখে হাসি ফুটল। কংস নদীর কালো জলের উপর দাগ কেটে কেটে ওদের ছোট্ট পানসী ভেসে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ছপাৎ ছপ, ছপাৎ ছপ, গায়ে লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কেউ কোথাও নেই। মুক্ত স্বাধীন, সুখের জীবন। অভিনব উপলব্ধি। সূর্য হাত বাড়িয়ে মাঝে মাঝে জলে হাত দিচ্ছে। কি ঠাণ্ডা জল ইচ্ছে করে সমস্ত অঙ্গ ভরে তার স্পর্শ নিতে। চাঁদের কিরণ পড়ে সে জল ঠিক কাঁচের মত চক চক করছে। চৌধুরীদের সূর্য অনাস্বাদিত জীবনের সংস্পর্শে এসে, বিস্ময়ে, আনন্দে, নির্বাক। আর স্তাকরাদের সব বিষয়ে কুশলী, স্বাধীন, ছেলে অরুণ দাঁড় বাইতে বাইতে মনের আনন্দে কীর্তন ধরেছে—

"এসহে গৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে"

এক সময় সীতাপুর গড়ের ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। অরুণের সঙ্গে নেবে সূর্য হাটতে সুরু করল গ্রামের পথে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রাজবাড়ীর চূড়া।

অরুণ আঙুল দেখিয়ে বললে, "ওই দেখ সূর্য রাজ-বাড়ী"—

সূর্য দেখল, সাদা রংএর একটা বিরাট বাড়ী। ওরকম বাড়ী ত ওদেরও আছে: কিন্তু ওটা যদি রাজবাড়ী হয় তবে নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখী। কুঁচবরণ রাজকন্যা। আরও কত কি? কত আর ভাবা যায়? নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে? সূর্য উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে। তার কাঁধে হাত দিয়ে অরুণ বললে, "আস্তে আস্তে হাঁট সূর্য, এইখানে একটা পানা পুকুর আছে তার পাশে ভাঁটবনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে। এ রাস্তাটা বড় খারাপ ভাই"—

সূর্য ঘাড় নেড়ে বললে "আচ্ছা"

কিছুক্ষণ পর ওরা বনজঙ্গল ঘুরে, ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তায় এসে উঠল। রাস্তার কিছুটা পথ ব্যবধান রেখে সারি সারি গ্যাসবাতী জ্বলছে। পথের দুইধারে বড়

বড় শিরিষ, পাকুড়, দেবদারু ইত্যাদি বৃক্ষ তাদের সতেজ শ্যামল শালপত্র বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বত্র একটা পরিচ্ছন্ন ভাব। একেই বলে সহর। সূর্য জীবনে এই প্রথম সহর দেখল। আরও কিছু দেখার আশায় সে চঞ্চল হয়ে বললে, "তাড়াতাড়ি চল অরুণ এতক্ষণে বোধ হয় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে"—"দূর পাগল" অরুণ হেসে বললে, "আরম্ভ হলে বাজনা শোনা যেত নিশ্চয়ই"—

দশমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে অনেকটা সরে গেছে। আকাশে তেমনি জ্যোৎস্না মাঠে তেমনি নির্জনতা। তার মধ্যে দুটী কিশোর চলেছে সব বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশে। এক সময় তারা এক বৃহৎ নাট্যমণ্ডপে এসে উপস্থিত হোল। উঃ কত লোক, কত আলো, সূর্যর চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল। রেশমী সামিয়ানার নীচে সুসজ্জিত মঞ্চের সামনে গায়ক আর বাদকেরা নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছে। সূর্যরা এসে দাঁড়াতেই এক বিচিত্র সুরে বাজনা বেজে উঠল। সতরঞ্চির একাংশে, যেখানে আরও অনেক ছেলে বসে ছিল সেখানে সূর্যকে বসিয়ে দিয়ে অরুণ বললে, "সূর্য এইখানে বোস আমি একটু ঘুরে আসি"—

অরুণ চলে গেল। সূর্য বসে বসে শুনতে লাগল বাজনা। কি বিচিত্র সুর। এমন মধুর ঐকতান সূর্য জীবনে কোনওদিন শোনেনি। সুরের ইন্দ্রজাল ওর মনকে বহু দূর দূরান্তরে নিয়ে যেতে লাগল। ভুলিয়ে দিল ওকে রাজবাড়ী, রাজকন্যা, ব্যাজমা ব্যাজমীর কথা। এমন সময় তুমুল জয়ধ্বনি করতে করতে দর্শকরা সব উঠে দাঁড়াল! ভীড়ের মধ্যে দিয়ে বহুকষ্টে সূর্য দেখতে পেল, মঞ্চের উপর একটি সুন্দরী রমণী ও একটি পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে বিনীত হাসি, যুক্তকর ললাটে ঠেকানো। কি যেন তারা বলছে, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সূর্য বিরক্ত হয়ে উঠল; দূর ছাই এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। সে আসন থেকে উঠে বহুকষ্টে পথ করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে লোক চলাচলের জন্য পাশে যে সঙ্কীর্ণ পথ পড়ে ছিল, তাই ধরে গিয়ে উপস্থিত হোল একেবারে ষ্টেজের পাশে। তখন ফুলের মালা হাতে নিয়ে ষ্টেজের উপর এসে দাঁড়িয়েছে বেনারসী আর ফুলের গয়না পরা চমৎকার সুন্দরী একটী মেয়ে। সেই পুরুষ ও রমণী দিল্লি দুটী তখন, কিংখাপের গালিচায় বসেছেন। তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে বালিকা তাঁদের কণ্ঠে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। বালিকার সঙ্গে একটী প্রৌঢ় ছিলেন, ঠিক ওর ছোটকাকার মত দেখতে। তাঁর চোখে সূর্যর চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, "আরে এযে দেখছি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে? কার সঙ্গে এসেছ খোকা"?

সূর্যর সুন্দর চেহারা, দামী পোষাক দেখে ওকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে কেউই নিষেধ করেনি। এবং আত্ম-বিস্মৃত হয়ে সূর্য একেবারে মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। লজ্জায় ভয়ে সূর্য পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কি জানি এরা যদি কাকাবাবুকে বলে দেয়? তাহলে? কিন্তু কোথায় পথ? চতুর্দিকে বিশাল জনসমুদ্র। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি আবার বললেন উঠে এস খোকা? সূর্য চোখ তুলে মঞ্চের দিকে তাকাল। সেই লাল শাড়ী পরা সুন্দর মেয়েটী সূর্যর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। সূর্যর ভারী লজ্জা করতে লাগল, এবং তার বেশ ভালোও লাগল মেয়েটিকে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীড় ঠেলে সে এক লাফে বেরিয়ে পড়ে মারলে লম্বা দৌড়। এখনি, এখনি, এখান থেকে পালাতে হবে। সূর্য ছুটছে, ওর মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে, কান দুটো গরম উঠেছে। আর কোনও চেনা লোকের সামনে যেন না পড়তে হয় ও ছুটছে, পিছনে পড়ে রইল ওর অতি সাধের যাত্রামণ্ডপ চোখ ধাঁধানো আলো, বিচিত্র জনসমাবেশ, এখনও শোনা যাচ্ছে ঐকতানের মধুর রাগিণী। সবকে ম্লান করে, নীরব করে, ওর চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে একখানি সুন্দর হাসি মাখা মুখ। একখানি গম্ভীর স্নেহময় মুখ। ওরা কি সূর্যকে চেনে? কিন্তু কই সূর্য ত ওদের চিনতে পারল না।

ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা টপকে, একটা বাঁশ বাগানের

মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ও থামল। এখান সেই আনন্দপুরীর আলো উল্লাস কিছুই দেখা ও শোনা যায় না। শুধু জোনাকী জ্বলা বাঁশ বাগানের মধ্যে ম্লান জ্যোৎস্না আর শান্ত নিভৃতি, পরিশ্রান্ত, উদ্বেজিত, সূর্যকে মায়ের মত স্নেহে জড়িয়ে ধরল। সূর্য নিঃশব্দচিত্তে মাটীতে বসে পড়ল। ভয় ত দূর হোল, আশ্রয়ও পাওয়া গেল, এখন বাড়ী ফেরা যায় কি করে? বাড়ীর কথা মনে পড়তেই সূর্যর কান্না পেতে লাগল। চোখ দুটো জ্বালা করছে; ঘুম পেয়েছে বড্ড। সূর্য দুই হাতে চোখ রগড়াতে লাগল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল কমলার পরিচ্ছন্ন নিভৃত শয্যাটির ছবি। উঃ এখান থেকে চৌধুরী বাড়ী কত দূরে? আরও কত দূরে? নাঃ আর বসে থাকা চলে না—রাত থাকতেই বাড়ী পৌঁছাতে হবে—কাকাবাবু জানতে পারলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু কোন দিকে পথ? কোন দিকে যাবে ও? শ্রান্ত সূর্য উঠে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক লক্ষ্য করতে লাগল। এমন সময় মনে হোল দূরে বাঁশ বাগানের পিছনে কিসের যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। এবং অনেকটা তার দিকেই আসছে—কোনও হিংস্র জন্তু নয় ত? ভয়ে ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। পালাবারও উপায় নেই। এদিকের পথ ঘাট ও কিছুই জানে না। একটু আড়ালে থাকলে হয়ত যে আসছে, ওকে অতটা লক্ষ্য করতে পারবে না। সাহসে বুক বেঁধে সূর্য পা, পা, করে জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে লাগল। তার পায়ের চাপে শুকনা পাতা মরমরিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোক রশ্মি কেঁপে উঠল, এবং মানুষের কণ্ঠ ভেসে এল, "কে ওখানে ভাই"? এযে অরুণের গলা। সূর্যর মনের বল ফিরে এল। জবাব দিল। "আমি চৌধুরীদের সূর্য, তুমি কে ভাই"?

আলোক রশ্মি তখন নিকটবর্ত্তী হয়েছে। একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে সে বললে," আরে তুই এখানে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়। আমি ডাকরাদের অরুণ" এতক্ষণে সূর্যর মুখে হাসি ফুটল। জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সে অরুণের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু একটাও কথা বলতে পারল না। কি জানি অরুণ যদি ওকে বকে। ও শুধু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল অরুণের হাতের জ্বলন্ত বিড়িটার দিকে। বিড়িটাতে শেষবারের মত খুব জোরে একটা টান দিয়ে সেটাকে দূরে ফেলে দিয়ে খানিকটা কেশে অরুণ বললে, আচ্ছা তোর বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নেই? রাজবাড়ীর অমন সুন্দর ঘেরেটার ছেড়ে এসে বসে রয়েছিস পচা জঙ্গলে, তোর জন্যে আমার দেখাটা মাটী হয়ে গেল। নে, নে, দেখবি ত চল। এখনও বোধ হয় পালা আরম্ভ হয়নি। সখীদের গান হচ্ছে"।—

সূর্য বললে "আমি বাড়ী যাবো অরুণ"

এঁ্যা বাড়ী? অরুণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল; লজ্জা করে না বলতে, তবে এসেছিলি কেন? ভীতু কাঁহাকার। থাক এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে। আমি চল্লুম রাজবাড়ীতে" সূর্য ব্যাকুল হয়ে অরুণের একখানি হাত চেপে ধরে বললে, লক্ষ্মীটী অরুণ আমায় শুধু পথ দেখিয়ে দাও, আমি নিজেই বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমার কাকাবাবুকে তুমিত খুব ভালো করেই চেন; তিনি জানতে পারলে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না।"

সূর্যর কাকাবাবু; পণ্ডিত কৃষ্ণশরণ চৌধুরী। প্রাচীন বালাখানায় সুপ্রাচীন কিংখাবের আসনে গম্ভীর মুখে বসে যিনি তাকিয়ে থাকেন দূরে ভবানী মন্দিরের চূড়ার দিকে। চোখে সোনার চশমা দিয়ে যখন লেখা পড়া করেন; তারপর প্রজাদের যখন শাসন করেন তাঁর ফরসা ধারালো নাকটা লাল হয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে তারপর তিনি যখন হাতে বেত্রদণ্ড ধরেন, যখন "খ্যাস" বলে গর্জ্জন করে উঠেন; সেই চির পরিচিত সূর্যর কাকাবাবুকে অরুণ চেনে, এবং খুব ভালো করেই চেনে। তারা ওঁদের প্রজা। অরুণ ওরে কোনওদিন তাঁর সামনে যায় না—সেই কাকাবাবু যদি রেগে ওঠেন, বোকা সূর্য যদি ভয়ের চোটে বলে দেয় যে, অরুণই তাকে নিয়ে গিয়েছিল ডেকে; তারপর সেই কথা যদি গিয়ে ওঠে অরুণের বাপের

কাণে তাহলে কি আর রক্ষা আছে? মনিবের সঙ্গে চালাকী করতে যাওয়া? বাপ বোধ হয় রাগে জ্ঞান হারিয়ে ওর গায়ের চামড়া কাঁচাই ছাড়িয়ে নেবে। দরকার নেই বাবা জেনে শুনে এই সব ঝামেলাটু মধ্যে গিয়ে? আরও তিনদিন এখন যাত্রা হবে। কাল একলা চলে এলে ভালো হবে। এই ভীতুটাকে আনাই ভুল হয়েছে। মনের ক্ষোভ কিছুতেই সে দমন করতে পারল না। নীরস কণ্ঠে বললে, "তোর মত কাঠ ভীতু আমি জন্মেও দেখেনি—চৌধুরী বাড়ী না জন্মে তোর তাঁতীদের বাড়ী জন্মানো উচিৎ ছিল। নে নে, পা চালিয়ে চল এখন।"

অরুণের পিছন পিছন সূর্য হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ পরে মনে ও নিশ্চয়তা ফিরে পেয়েছে। যাক এবার তাহলে সত্যিই ও বাড়ী যাচ্ছে। গিয়েই কাকীমার পাশে শুয়ে ঘুমাতে পাবে। এত রাত্তিরে সকলেই ঘুমাচ্ছে। কেউই কিছু জানতে পারবে না: পাচীল টপকে উঠানে একবার নাবতে পারলেই হয়। তারপর কাকী-মার ঘরে ঢোকার কোনও অসুবিধা নেই। কারণ রাত্রে তিনি ঘরের অর্গল বন্ধ করেন না। নিজের শয্যায় যেখানে পাশ বালিশটাকে আলোয়ান চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল, সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে হয় একবার—তারপর সূর্যকে আর কে পায়? নিশ্চয়তার আশায় সূর্য চঞ্চল হয়ে উঠল মনে মনে। বললে, "তুই জানিস না অরুণ আমার যে কি ভয় হয়েছিল? ঠিক ছোটকাকার মত দেখতে একজন লোক আমায় দেখেই বলেন, "চৌধুরীদের সূর্য"। সে কথা শুনেই আমি সেখান থেকে দৌড় মেরেছি। কি জানি যদি কাকাবাবুকে বলে দেয়।

অরুণকে নীরব দেখে ও আবার বললে," তুই এখানে এলি কি করেরে অরুণ"?

অরুণ কড়ার দিয়ে বললে," কি করে আবার? আমি ফিরে এসে দেখলুম—তোর জায়গায় তুই নেই। তখন এদিক ওদিক ঘুরে দেখছি এমন সময় একটী জানা লোক আমায় বললে, "একটী সুন্দর মত ছেলে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল এইমাত্র"। আমি তখনি বুঝতে পারলুম সে আর কেউ নয় তুমিই। সঙ্গেচ বশে প্রথমেই এই ভরসা হয়নি—তোকে আনাই আমার ভুল হয়েছে"—

"রাগ করিসনা অরুণ, আমার কাকাকে তুই চিনিসত ভাই"? সূর্য বাধিত কণ্ঠে বললে।

অরুণ সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে "ওইত ঘাট দেখা যাচ্ছে নে পা চালিয়ে হাঁট—"

নৌকায় উঠে, সূর্য ফিরে একবার তাকাল সীতালুর গড়ের দিকে। অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলোয় রাজবাড়ীর চূড়া অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে? এতক্ষণ পর সূর্যর আবার মনে পড়ল, সেই ফুলের গয়না পরা মেয়েটীর কথা। ওর যদি একটা ওইরকম বোন থাকত? ঠিক ওই রকম?

ঘাটে নেবে অরুণ বললে, "সূর্য তুই চলে যা; আমি এদিক দিয়ে বাড়ী চলে যাই। ফিরে পারবিনে যেতে"?—

একটা ঢোক গিলে সূর্য বললে, "হ্যা পারব"—

"তবে তুই চলে যা" বলে অরুণ নদীর ধারের পথ ধরল। আর সূর্য চণ্ডীতলার পথ ধরল। এ পথ সূর্যের জলের মত পরিষ্কার জানা। কাজেই বাড়ী পৌছাতে ওর বেশী দেরী হোলনা। কিন্তু দেউড়ীর কাছে এসেই ওর পা আটকে গেল। দরদালানে ও কে পায়চারী করছে? ম্লান জোৎস্নায় শুধু দেখা যাচ্ছে, একটী চলমান দীর্ঘকায় মূর্ত্তি। সূর্য কি ও মূর্ত্তিকে চেনেনা? সঙ্গে সঙ্গে বজ্রকণ্ঠ ভেসে এল "কে"?

সূর্য যাদুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল সেইখানে। মূর্ত্তি আলিসার উপর ঝুকে পড়ে বললেন,—"কে, কথা কইছনা কেন? এত রাত্রে কি করতে বেরিয়েছ"?

সূর্য তবুও নীরব। কি জবাব দেবে ও? ওই সুদীর্ঘ কাঁপা কাঁপা চোখের সামনে দিয়ে পালানোও এখন অসম্ভব। একমাত্র উপায় ধরিত্রী যদি দ্বিধা হন—"মূর্ত্তি

হাঁক ছাড়লেন, "হরিহর, নরহরি, "জী হুজুর, আজ্ঞে, বাবু কর্ত্তা"? বাঁশের লাঠি হাতে প্রহরীরা ছুটে এল মূর্ত্তির ইঙ্গিতে সূর্যর নিকটে এসে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "একি ছোট বাবু যে"?

ছোটবাবু হলে কি হয়? মনিবের আদেশ ওরা অমান্য করতে জানে না। সূর্যর হাত ধরে মৃদু কণ্ঠে তারা বললে, "মাপ চেয়ে নিও বাবু, তাহলে আর কিছু বলবেন না? কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি"?

সূর্যর কণ্ঠ পাথর হয়ে গেছে? ওকি আর জগতে আছে?

প্রহরীদ্বয় সূর্যর হাত ধরে, দালানে গিয়ে উপস্থিত হতেই, সেই দীর্ঘ মূর্ত্তি আতঙ্কে বিলাপ করে উঠলেন, এঁ্যা সূর্য? এতরাত্রে বাইরে?

সূর্যর চোখের সামনে তাঁর সুদৃঢ় দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর অপেক্ষা করলে রক্ষা নেই। সূর্য তাঁর পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। "কাকা-বাবু আরুণ আমায় নিয়ে গিয়েছিল সীতাপুর গড়ে যাত্রা শুনতে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি"—

সীতাপুর গড়ে, হরিশঙ্কর সিংহরায়ের বাড়ী? কৃষ্ণকরণ স্বগোক্তি করলেন, "ঁ, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে শোবে, যাও"—

এই নিদারুণ ব্যাপারে কাকাবাবু যে এত কম রাগ করবেন সূর্য তা কল্পনাও করতে পারেনি। যাহোক সে কোনও রকমে গুটীসুটী মেরে গিয়ে কাকাবাবুর বিছানায় শুয়ে রইল। কিন্তু কি বিপদ সূর্যর যে এখানে কিছুতে ঘুম আসছেনা? বালিশটা বড্ড শক্ত। আলোয়ানটা কুটকুটে। ঘুম এখানে কি ঘুমানো যায়? নিষ্ফল অভিমানে বালক বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণকরণ শয্যায় এসে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সবই। তিনি তখন সস্নেহে ওর হাত ধরে তুলে ভিতর মহলে নিয়ে গিয়ে নিদ্রিতা কমলার পাশে ওকে শুইয়ে দিয়ে চলে এলেন। সূর্য কাকীমাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।—

তারপরের দিন থেকে সূর্যর জন্য একটী দাস ভৃত্য নিযুক্ত করা হোল। তার নাম পূর্ণ। সূর্য সব সময় তারই রক্ষণাবেক্ষণে থাকার ফলে সূর্যর এখানে ওখানে যাওয়া, এর তার সঙ্গে ডাংগুলি খেলা, সাঁতার দেওয়া, পাখীর বাচ্চা ধরা সব বন্ধ হয়ে গেল। কোলকাতা থেকে এল রাশি রাশি গল্পের বই, নানারকম খেলনা—তার বহির্মুখী মনকে ভোলাবার নানাবিধ উপকরণ। প্রথম প্রথম স্বাধীনভাবে বাহিরে চলাফেরা করার জন্য মনে মনে সূর্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করত। কিন্তু ওরে কোনও প্রতিবাদ করতে পারত না। তবে কমলা, ভাণ্ডী, আর লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে লুডো খেলতে ওর ভারী মজা লাগত। ফুল মাসীমার মেয়ে ভাণ্ডী, আগে বড় দুষ্টু ছিল। সূর্য ডাকলে কিছুতে আসত না। এখন কিন্তু ভাণ্ডী রোজ আসে, সূর্যর সঙ্গে খেলা করে, গল্পের বই পড়ে। এরই মধ্যে সূর্যকে ঘিরে গড়ে উঠল তার একটী নিভৃত পৃথিবী। পূর্ণ খুব ভালো কাগজের নৌকা তৈরী করতে পারত। বিকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে, সূর্য সেই নৌকা জলে ভাসিয়ে দিত। স্রোতের সঙ্গে ভেসে নৌকা তর তর করে চলে যেতো। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যর মনও ভেসে যেত বহু দূর দূরান্তরের দেশে। বইয়ে পড়া নানা দেশের কাহিনী হাতছানি দিয়ে ডাকতো ওকে।

ক্রমশঃ

রাষ্ট্র ও জনমন

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী—

প্রাচীন যুগের রামরাজ্যই হোক, আর বর্তমানের লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্রই হোক, একটি রাষ্ট্রকে ত্যাগ করলে দুটি শ্রেণীর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। (১) শাসন পরিষদ পার্লামেন্ট বা মন্ত্রীসভা এবং ধনীগনেতা প্রেসিডেন্ট্ বা রাজা—এই হোল শাসকশ্রেণী, আর অন্যদিক (২) অগণ্য জনগণ—যারা শাসিত হয়। গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে মেজরিটির জোরে একটি দল ও ধনীর সমর্থনে একজন নেতা রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করলেন। আবার ছ' মাস কি ছ' বছর পরে ঐ মেজরিটি উল্টে গিয়ে আর একটি দল ও ঐ দলের নেতা শাসনভার নিলেন হাতে। দলের মেজরিটি হাতে রাখতে পারলে নেতা নিজের ক্ষমতা ও শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

শাসনদায়িত্ব যাঁর হাতে, দায়িত্বপালনের মত জ্ঞান ও প্রেরণা তাঁর থাকবে এইটেই স্বাভাবিক। গান্ধীজী রামরাজ্যের ওপর অত জোর দিয়েছিলেন তার অর্থ এই নয় যে রাজ্যবাদকে বা একক অধিনায়কত্বকে তিনি সমর্থন করেছেন; রামরাজ্য সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। একটি মাত্র প্রজার মনোভাব প্রতিকূল থাকলেও রাজা অস্বস্তি বোধ করেন—এইটাই হোল রামরাজ্যের মূল কথা। এই অর্থে অবশ্য মেজরিটির প্রশ্ন ওঠে না। মাইনরিটির—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক—দাবীকে স্বীকার করে নেওয়াই রাজার ধর্ম। গান্ধীজীও স্থানান্তরে বলেছেন—"মেজরিটির কাছে মাইনরিটিকে নত করার অর্থ দাসত্বকে কায়েম রাখা। কাজেই গান্ধীজীর রামরাজ্যের অর্থ—রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের হীনতম ও নগণ্যতম ব্যক্তিরও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকবে অটুট হ'য়ে। রাজা হবে প্রজাশাসক নয়, প্রজারঞ্জক।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমই দেখা যায়। ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হ'লেই মাটির দিকে নামে, ক্ষমতা হাতে এলে মানুষও তেমনি ক্ষমতাপ্রিয় হ'য়ে পড়ে। সে তখন ভুলে যায় যে, সে সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র ক্ষমতার সঙ্গে মানুষকে আশ্রয় করে লোভ ও মত্ত। প্রতিকূলতাকে ধ্বংস করতে গিয়ে সে হয়ে ওঠে নির্দ্দয়।

আর অগণ্য শাসিত জনসাধারণ যেন স্বাভাবিক ভাবেই তার শাসককে মেনে নেয়—তার স্বেচ্ছা-চারিতাকেও। শাসক স্বেচ্ছাচারী কিনা এ প্রশ্ন বড় ওঠেনা। যে রাজা প্রেসিডেন্ট্ বা রাষ্ট্রপাল তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শাসনের জন্যে। ক্ষমতার প্রয়োগ অন্যায় এমন কি অত্যাচার হয়ে দাঁড়ালেও লোকে তা মেনে নেয়। সে অত্যাচার তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয়। যদি কোন দেশে কোন কালে মানুষ সে অন্যায় শাসনকে মানতে রাজী না হয়, তাহ'লে তারা প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদ যখন সক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলে বিপ্লব।

কিন্তু বিপ্লব আসে কদাচিৎ। মানুষ যখন মনপ্রাণ দিয়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন কামনা করে তখনও সে বিপ্লবকে এড়িয়ে যেতে চায়। তার কারণ শুধু মানুষ ভয় করে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলাফলকে—যুদ্ধ ও রক্তপাতকে।

মানুষ চায় নিরুপদ্রব শান্ত জীবনযাত্রা। সুখ ও শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে মোটামুটি নিয়মগুলি পালন করা দরকার বলে মনে করেছে, সেগুলিকে শক্তিশালী করতেই সমাজ সৃষ্টি হ'লো। সুবিধাগুলি আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে উপভোগ করবার জন্যই দরকার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার। জীবনযাত্রার পথ যদি মোটামুটি সুগম থাকে তাহলেই মানুষ সন্তুষ্ট। তাই সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্যে তারা দলপতির সৃষ্টি করলো। কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলপতি রাজায় ও রাজা প্রেসিডেন্টে রূপ নিলো। প্রেসিডেন্ট ও জনসাধারণ এবং জনসাধারণের মধ্যেও শক্ত ও দুর্বল ধনী ও দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যেকার সম্বন্ধকে নানাভাবে নানা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করা হলো। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

দৃষ্টিও হলো তীক্ষ্ণ। সেই আদিম শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার সম্বন্ধকে মনোরম একটি নাম ও রূপ দিয়ে মানুষ গ্রহণীয় করে নিলো। এইভাবে জন্ম নিলো গণতন্ত্র।

কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন অত সহজে হয় না। ডারুইনের বিবর্তনবাদ মানব চরিত্রে প্রযোজ্য হয়নি। আধুনিক মানুষ সেই আদিম মানুষের মতই লোভী উৎপীড়ক হিংস্র ও নির্মম।

তাই রূপ বদলালো, নাম বদলালো কিন্তু সম্বন্ধ একই রইলো। এ' যেন নতুন বোতলে নতুন নতুন লেবেল লাগিয়ে পুরানো ধেনো মদ কাটানোর চেষ্টা। মানুষের মন দেবত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এমন কল্পনা অনেকে করেছেন, কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা। বরং পুরাকালে মানুষ বেধ পূজা করতো, পূজো করতো সুন্দরের কল্যাণরূপকে। আজ সেই স্থান দখল করেছে বিজ্ঞান ও শক্তি। বিজ্ঞান মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে শুধু সৃষ্টিতে নয়, ধ্বংসেও। শক্তিমত্ত বিজ্ঞান আজ শক্তির প্রসারে বিশ্বকে ধ্বংস করতে উদ্যত।

পৃথিবীতে সেই দুটো শ্রেণীই রয়ে গেলো। তার মধ্যেকার জটিলতার প্রগতি এলো। শাসকের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুক্ত হলো ধনিকের অর্থলোলুপতা, অভিজাত্যের শ্রেষ্ঠকুলীনতা। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী করে শোষিত হচ্ছে।

শোষিত হওয়ার অভ্যাসটাই যেন মিশে রয়েছে রক্তে। অত্যাচারী হয়ত একজন বা দশজন আছে কিন্তু দশ লক্ষ বা দশ কোটী লোকের মধ্যে অত্যাচারিত হওয়ার প্রবণতাটুকুও আছে। দুঃসহকে সহ্য করবে বলেই যেন পৃথিবীর অটল সহিষ্ণুতা।

মানুষের অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। দার্শনিকেরা স্বার্থের খাতিরে এই অজ্ঞতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। রাজাকে বলা হয়েছে ভগবানের দূত। রাজার স্বার্থের অনুকূল ও সমাজ রক্ষার সহায়ক নিয়মগুলিকে ধর্মের আবরণে পালনীয় ক'রে তোলা হয়েছে। তাই যারা সত্যকার বিপ্লবী মন নিয়ে জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা অনুভব করেছেন যে আদর্শ সমাজ গড়তে হ'লে সকল প্রকার অজ্ঞতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া দরকার। তাঁরা বুঝেছেন যে অনুশাসন দিয়ে মানুষকে বাঁধা চলেনা। তার বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে তার মঙ্গলের চেষ্টা করার মত ভ্রান্তিকর আর কিছুই হতে পারেনা।

আদর্শ সমাজ গড়তে হ'লে অশিক্ষাকে দূর করতে হবে; আর ভাঙতে হ'বে মনের নির্ভরশীল জড়তাকে। যে মানব হিতৈষী, সে মানুষকে সকল সম্ভাব্য ক্ষতির ও অশুভর হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। যে ক্ষতিকে আমরা চেষ্টা করলে এড়িয়ে যেতে পারি, অথচ চেষ্টা করি না বলে সহ্য করি, সেই ক্ষতির বীজ আমাদের নৈতিক জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের ঔদাসীন্যে ও বিচারশূন্য অনুবর্তিতায় আমাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। তাইত Aldous Huxly বলেছেন—No reform which leaves the masses of the people wallowing in the slothful irresponsibility of passive obedience to authority, can be counted as a genuine change for the better.

পৃথিবীর সবগুলি সভ্যদেশেই গুটিকয়েক ক্ষমতালোভী মানুষ জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলে। তারা নিত্য নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হয়, যাতে রাষ্ট্রের মানুষ স্বাতন্ত্র্যবোধকে ভুলতে পারে। যুগে যুগে এক এক জন মহামানব এসেছেন এই পৃথিবীতে, চেষ্টা করেছেন মানুষকে এই সর্বগ্রাসী প্রবঞ্চনার ও কুৎসিৎ নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন আসেনি। একদিকে যেমন একই ভাব থেকে গেছে ক্ষমতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, অন্যদিকে তেমনি এক সীমাহীন জড়তা মানুষকে নির্ভর করতে শিখিয়েছে শক্তিমানের ওপর।

তাই শ্রেণীহীন ও শোষণহীন গণরাজের প্রতিষ্ঠা আকাশকুসুম হয়ে রয়েছে। রক্তাক্ত বিপ্লবে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়না। রক্তহীন কোন অহিংস বিপ্লবেই হয়ত সম্ভব হতে পারে সে স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলা। যেদিন মানুষ নির্স্পৃহ ও নির্লোভ হ'য়ে ক্ষমতার লাগাম ধরবে হাতে সেদিনের প্রতীক্ষায় আজও পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। সে বিপ্লবে কোন এক শাসনতন্ত্রের নয়, সমস্ত মানুষের অন্তঃপ্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটবে। সেই মহাবিপ্লবের অপেক্ষা করবো আমরা।

জীবন-দোলায়

পুষ্পরাণী ঘোষ

প্রকাণ্ড স্কুল মস্ত বড় কম্পাউণ্ড; সবুজ ঘাসে ঢাকা বড় বড় খেলার মাঠ—মাঠের ধারে ধারে লাল সুরকী ঢালা সরুপথ—তারপরে কেয়ারী করা জমিতে দেশী বিদেশী নানারকম ফুলের গাছ তার মাঝে দু'একটি কাঠের বেঞ্চি পাতা। ফুলবাগানের পাশ ঘেঁষেই দেওয়াল, দেওয়ালের ধারে কয়েকটি বড় গাছও আছে। স্কুলটি মেয়েদের।

হেমন্তের ম্লান অপরাহ্ণ—গাছের মাথায় মাথায় সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ঝুঁকে পড়া একটা কাঠালী চাঁপা গাছের তলায় রজনী গন্ধা ঝাড়ের ধারে বেঞ্চিতে বসে একটি মেয়ে একটা মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। তার হাতের চোখের চকল ভঙ্গী একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে পুস্তকে তার বিশেষ অভিনিবেশ নেই। অদূরে মাঠে তার অন্য সঙ্গিনীরা তখন খেলায় ব্যস্ত—হঠাৎ একটি দুষ্টু মেয়ের চোখ পড়ে গেল তার দিকে, সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে সে বলে উঠল "কেরে ওখানে" এমন বিকেল বেলায় খেলা না করে গাছ তলায় বিরহী যক্ষের মত বসে আছে, আয়ত দেখি—অমনি ৫।৭টি মেয়ে হুড়মুড় করে ছুটল সেইদিকে। বৃক্ষতলে উপবিষ্টা মেয়েটিকে দেখেই তারা চেঁচিয়ে উঠল—"এাক কল্যাণী—তুই? একা? কিমাশ্চর্যমতঃপরম? বলি সূর্য্য উঠেছিল আজ কোন দিকে। মানিক জোড়ের জোড় ভাঙলো কেন? ও মানিনীর মান হয়েছে বুঝি? কইরে ইলা গেলি কোথায়? আয়, মান ভঞ্জন করবি আয়"—একটি মেয়ে ক্রীড়ারতা অপর একটী মেয়ের বিনুনী ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মেয়ে বলে উঠল "আর মান ভঞ্জনে কাজ নেই, ঐ দেখ বাস এসে গেছে, আজকের মত এখন বাড়ী যেয়ে পেঠ ঠাণ্ডা করবে চল—যাযাবর বাবা! শীতকালে সেকেণ্ড ট্রীপে বাড়ী যেয়া যে যে কী পাপের শাস্তি। রোজই বাড়ী যেতে যেতে রাস্তার আলো জ্বলে ওঠে আর এদিকে ক্ষিদের চোটে ত নাড়ীভুড়ি শুদ্ধ হজম হবার যোগাড় হয়"—

হুড়মুড় করে মেয়েরা বাসে উঠে পড়ল। খেলার মাঠে অনেকটা ফাকা হয়ে গেল। বোর্ডিংএর মেয়েকটিই খালি খেলা করতে লাগল। দু'একটি মেয়ে তখনও কল্যাণীকে জ্বালাতন করছিল কিন্তু তার মুখ থেকে একটি ও কথা বের করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেল একটু পরে—সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসতেই ঘন্টা বেজে উঠল—অন্য মেয়েদের সঙ্গে কল্যাণীও বোর্ডিংয়ে ফেরে বইখাতা নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকলো।

ইলা আর কল্যাণীর বন্ধুত্ব ছিল স্কুলের মধ্যে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ছোট ছোট মেয়েদের থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা অবধি সবাই এটা জানত এবং সকলেই এ নিয়ে ওদের অল্পবিস্তর ঠাট্টা তামাসা করতো। ইলা বহুদিন থেকেই পড়ছে এখানে—স্কুলের একেবারে নিম্নতম শ্রেণীতে সে ভর্ত্তি হয়েছিল—একটা মফস্বল স্কুল থেকে ফোর্থ ক্লাশে এসে ভর্ত্তি হয়। এখন ওরা দুজনে পড়ছে প্রথম শ্রেণীতে। কল্যাণী থাকে বোর্ডিংয়ে, ইলা বাড়ী থেকেই যাওয়া আসা করে।

কল্যাণী আর ইলার বন্ধুত্ব একটু অনন্যসাধারণ। ওদের দুজনের প্রকৃতিতে এমন একটা ঐক্য ছিল যার ফলে অল্প পরিচয়েই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব অতি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐক্য ছিল যেমন প্রগাঢ় অনৈক্যও ছিল তেমনি প্রবল। দুজনেই ছিল অতিরিক্ত অভিমানী ও আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্ন—কেউই এতটুকু কথা সহ্য করতে পারত না—যাতে কারুর কোন কথা শুনতে না হয় সেজন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতেও তাদের আপত্তি ছিল না। এমনি ভাবে মনের প্রধান বৃত্তিগুলি—যা নিয়ে আসল প্রকৃতি গঠিত হয় তা দুজনেরই ছিল একরকম। কিন্তু স্বভাবের ছাঁচ ছিল আলদা। কল্যাণীর স্বভাব অন্তর্মুখী শান্ত—নিজের চারিপাশে ছোট্ট একটি গণ্ডী কেটে তার মধ্যেই বেশ স্বচ্ছন্দে সে থাকতে পারে।

বহির্জগতের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখতে তার আগ্রহ নেই। অপরপক্ষে ইলার স্বভাব বহির্মুখী সকলের সঙ্গে সব রকম যোগ রেখে সে চলতে চায়। হাসি গানে অভ্যস্ত চঞ্চলতায় স্কুলের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে তার প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্য চতুর্দ্দিকে উৎসারিত হয়ে ওঠে—আর এইখানেই বাধে বিরোধ। চঞ্চলা ইলা অন্য দুই মেয়েদের সঙ্গে মিলে নানারকম দুষ্টুমী করে বেড়ায়—কল্যাণীর সে সময়টা কাটে একা—কল্যাণী অভিমান করে—ইলাকে তখন নানাভাবে আবার কল্যাণীকে শান্ত করতে হয়। কখনও বা কল্যাণীই বন্ধুত্বের খোটা দিয়ে অনেক কঠিন কথা বলে ইলাকে—তখন অভিমানের পালা পড়ে ইলার আর তাকে শান্ত করতে কল্যাণীর প্রতিদিন প্রত্যেক ঘণ্টাতেই তাদের পাশাপাশি বসা চাই—একটি দিনও তার অন্যথা হবার যো নেই অথচ মাসের মধ্যে পনরদিনই প্রায় কথা বন্ধ থাকে—তখন চলে পত্রবিনিময়। দুজনেই বাড়ী থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিঠি লিখে নিয়ে আসে, ক্লাসে কোন কথা বলার দরকার হলে সে প্রয়োজনও মেটে লিখে। কল্যাণী প্রতিদিন ভোরে উঠে বোর্ডিংয়ের বাগান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে রাখে ইলার জন্য, ইলা বাড়ী থেকে নিয়ে আসে তার মায়ের হাতে তৈরী নানা উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য কল্যাণীর জন্য। পরীক্ষার আগে দুজনে এক সঙ্গে পড়ে—ইলা কল্যাণীকে ইংরিজী পড়তে সাহায্য করে, কল্যাণী ইলাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। ছুটীর সময়টা কাটে তাদের পরস্পরকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিঠি লিখে—যার অধিকাংশই তারা পাঠায় যুক্তিতর্কপূর্ণ নানা সমস্যামূলক আলোচনায়।

সত্যই ইলা ও কল্যাণীর বন্ধুত্ব ছিল অতি মনোরম—প্রভাতসূর্য্যের মত তা দীপ্ত, বায়ুর মত নির্ম্মল, পুষ্পের মত কোমল ও স্নিগ্ধ। তাদের কিশোর মনের সমস্ত আকাশ জুড়ে তখন ঐ একটি রংয়েরই প্রাধান্য ছিল। কৈশোরের অনুরাগ যত পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হয় তেমন বোধ হয় আর কোন বয়সেরই হয় না। কল্যাণী ও ইলার মিলন হয়েছিল ততটা বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে নয় যতটা অনুভূতি দিয়ে, আবেগ দিয়ে, ভাব দিয়ে, উপলব্ধি দিয়ে সেই জন্যই আরও সে মিলন হয়েছিল অত নিবিড় ও পরিপূর্ণ। যে বন্ধুত্ব প্রকৃত—যা মানুষকে উচ্চতর মহত্তর করে তোলে, ওদের বন্ধুত্ব ছিল সেই জাতের। পরস্পরকে ভালবেসে পরস্পরের বন্ধুত্বের আলোয় ওদের মনে মহত্তর উন্নততর হবার প্রেরণা জাগতো—অনেক সময়েই পরস্পরের বন্ধুত্ব তাদের বহু প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

৪ বছর এমনি বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে তারা এখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ছে—সামনেই টেষ্ট—আর বেশি দেরী নেই। প্রথম শ্রেণীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ভাবনা হয়েছে এবার তো আসছে বিচ্ছেদের সময়—কে জানে কার জীবনের গতি কিভাবে কোন পথ অবলম্বন করবে? কলেজে পড়া সম্বন্ধে কারুরই বিশেষ কোন স্থিরতা নেই—আর যদি পড়া হয়ও সেও ত বড় জোর আর ৪ বছর তারপর তো বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ওদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে পরস্পরকে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হচ্ছে।

যথাকালে পরীক্ষা হয়ে গেল। দুইজনেই ভালভাবে পাশ করে একই কলেজে ভর্ত্তিও হল। প্রথম বছরটা হাসিগল্প পড়াশুনোর ভিতর দিয়ে বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল কিন্তু দ্বিতীয় বছরের প্রথমেই ঘটল বিপদ। কল্যাণীর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন—ওর পড়া বন্ধ হয়ে গেল মফঃস্বলের যে ছোট সহরে কল্যাণীর বাড়ী ও সেখানে চলে গেল এবং সেখানকার মেয়ে স্কুলে একটী কাজ নিল। ইলা পড়তে লাগল; কল্যাণীর অভাবে তার অবশ্য খুবই বিশ্রী লাগত—কেমন যেন সব শূন্য বোধ হত কিন্তু তার কর্ম্মপ্রিয় স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়ে সে ধীরে ধীরে কলেজের ও বাইরের নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সময় কাটাতে লাগল। প্রথমটা যত ফাঁকা বোধ হয়েছিল সেভাবটা ক্রমশই কমে আসতে লাগল। চিঠির সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য কমে এল। অবশ্য অভাববোধ—একটা বেদনা প্রায় সবসময়ই মনে জেগে থাকত।

ইলা যখন তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে তখন কল্যাণীর বিয়ে হয়। তারপরও বছরখানেক তাদের মধ্যে পত্র বিনিময় মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ ও খোঁজখবর নেওয়া বেশ নিয়মিতভাবেই চলেছিল কিন্তু তারপর থেকে ক্রমশঃই শিথিল হয়ে এল। বছরদুই যাবে ইলারও বিয়ে হল। বাবা মার ঠিক অমতে না হলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় জোর করেই ইলা মফঃস্বল কলেজের এক অধ্যাপককে বরণ করে নিলে। কল্যাণী চেষ্টা করেছিল আসতে কিন্তু সে তখন কলকাতা থেকে দূরে তাছাড়া তার ছেলে তখন খুব ছোট তাই তার আসা আর হয়ে ওঠেনি। এরপর থেকে দুইবন্ধুই আপন আপন স্বামীর কর্মস্থলে ঘুরে বেড়ায় আর দেখাশোনাও হয়না—চিঠিপত্রের সংখ্যাও কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। দুজনেই নিজের নিজের সংসার, স্বামীপুত্রকন্যা নিয়ে ব্যস্ত। মানুষের জীবনে বর্ত্তমানের প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি—তার দাবীই সবচেয়ে বড় তাকে এড়িয়ে চলার সাধ্য কারও নেই।

কিন্তু ইলা ও কল্যাণীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেছে বলেই যে তারা পরস্পরকে ভুলে গেছে একথা মনে করলে ভীষণ ভুল করা হবে। তাদের দুজনেরই অন্তরের অন্তরতম কোণে পরস্পরের প্রতি স্নেহ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে তবে তারা বোঝে যে সময় ও পারিপার্শ্বিকের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করে মাত্র চিঠির সাহায্যে পূর্বের সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব—সে চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। বর্ত্তমানের দৃশ্যমান স্থূল ধরার নীচে চাপা পড়ে গেছে অতীতের যে ক্ষীণ স্রোত অবসরের সময় নেড়েচেড়ে দেখবার পক্ষে তার মাধুর্য্য তো নিতান্ত কম নয়। এখনও তা জীবনে এনে দেয় শান্তি, তৃপ্তি,—একটা মধুর স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দেয় মনে—জীবনে এর মূল্যই কি কম?

তাছাড়া পরিবর্ত্তনশীল জগতে সবচেয়ে পরিবর্ত্তনশীল মানবমন যদি পরিবর্ত্তন লাভ করেই তবে সেইত সহজ ও স্বাভাবিক—তার যা ধর্ম্ম সে তাই অনুসরণ করেছে মাত্র। কাজেই কল্যাণী ও ইলার সেদিনের সেই শিক্ষাদীক্ষা কিশোরমনের আবেগ কোমল উদ্দাম উচ্ছ্বাস যদি আজ তার পারিপার্শ্বিকতা ত্যাগ করে সমতল প্রদেশে এসে শান্ত ও সংযত হয়ে ওঠে তাতেই বা কী এমন ক্ষতি? তাদের স্নেহ ওপরের কোমলটুকু বাদ দিয়ে ঠিক তেমনিই আছে—বাইরে কোন সংযোগ না থাকলেও দুজনেই অন্তরে অন্তরে এটা উপলব্ধি করে।

এমনি করে সুখে দুঃখে, নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে দুই বন্ধুর জীবনস্রোত অগ্রসর হয়ে চলছিল; এমন সময় দেশে এল আইন-অমান্য আন্দোলনের যুগ। দেশব্যাপী এই বিপুল বিক্ষোভের আলোড়ন দুই বন্ধুর জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আঘাত হান্‌লো।

কল্যাণীর স্বামী শুভেন্দুবাবু আই, বি ইন্‌স্‌পেক্টর। তার উপরে এবারে তার পড়ল স্বদেশপ্রেমিক, তথাকথিত রাজনৈতিক অপরাধীদের অনুসন্ধানের ও সুযোগ পেলেই অর্ডিন্যান্স আইনের বলে আটক করবার। এই বিভাগের বহু কর্ম্মচারীর মত শুভেন্দুবাবুও মনেপ্রাণে তার কাজকে পছন্দ করতেন না বিশেষ করে এই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে উদারপ্রাণ দেশ-সেবকদের পিছনে লেগে থাকার এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করতে তাঁর নিজেরই নিজের ওপর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মাত। কিন্তু সমব্যবসায়ী অন্য বহু লোকের মত তাঁকেও স্ত্রীপুত্র পরিজনের কথা ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে এই কাজ করতে হত।

ইলার স্বামী অরুণকুমার ছাত্রজীবনে একজন নামকরা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম এ পাশ করার পর দু'একটি ভাল চাকরী পাবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় অধ্যাপকের কাজই বেছে নেন কারণ বহুদিন থেকে শিক্ষাদানকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর সংকল্প। ছাত্রদের তিনি মাত্র পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিদ্যাদান করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা করে তাদের মনে মহৎ প্রেরণা, উন্নত ভাব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করতেন।

ছাত্রদের কাছে তিনি শুধু অধ্যাপক হয়েই থাকতেন না—বন্ধুভাবে মিশতেন। ফলে তাঁর মত জনপ্রিয় অধ্যাপক খুব কমই ছিলেন। এখন তিনি ছাত্রদের নানাভাবে স্বদেশ হিতৈষনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে কিন্তু একথা অগোচর রইল

অরুণ কুমারের সর্বপ্রকার কার্যকলাপ—গতিবিধি—ভাব বিষয়ে সবরকম খুঁটিনাটি খবরই তারা সংগ্রহ করতে লাগল। অরুণ যে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ছাত্রজীবনে সেই কলেজেই পড়তেন। কলেজের প্রবীন অধ্যক্ষ তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন—তিনি বুঝেছিলেন যে অরুণের উপর সরকারের বিরাগদৃষ্টি পড়েছে—তাকে এখন কিছুদিনের জন্য কর্মক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরান দরকার—এই ভেবে তিনি অরুণের শারীরিক অসুস্থতার অছিলা করে তাকে একরকম জোর করেই পূজার ছুটিতে শিলংএ পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে আপন কর্মে বিরক্তচিত্ত শুভেন্দুবিকাশও অনেক চেষ্টায় করেকদিনের ছুটী জোগাড় করে শিলংএ আসবার ৪।৭ দিন পরেই হেড্‌অফিস থেকে তাঁর নামে এই মর্মে জরুরী তার এল যে অধ্যাপক অরুণকুমারও এখন শিলংএই আছেন তিনি যেন তাঁকে অবিলম্বে অর্ডিনান্স আইনে এ্যারেষ্ট করেন।

বিরসবদনে টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে শুভেন্দু কল্যাণীর কাছে এসে বললেন, "এই দেখ আবার কি মুস্কিলে পড়েছি পরের দাসত্ব করার মত পাপ আর নেই। বিশেষ এই রকম দাসত্ব কি কুক্ষণেই যে এই কাজ নিয়েছিলাম এক মুহূর্তও কি শান্তিতে থাকার উপায় নেই; এখনি যেতে হবে এক উদ্বরপ্রাণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে তাঁর শান্তিপূর্ণ গৃহ থেকে ছিনিয়ে আনতে। সন্ধান নিয়ে জানা গেছে যে ভদ্রলোকের সংসারে আছে শুধু স্ত্রী আর একটি শিশুপুত্র। তারাও তাঁর সঙ্গে এখানে এসেছে। এখন আমাকে ঘুমকেতুর মত যেয়ে সেই সুখের নীড় ভেঙ্গে দিতে হবে। ভাবত একথার অবস্থাটা। ভদ্রমহিলা একা একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে বিদেশে এরকম বিপর্যস্ত হয়ে কি যে করবেন!—"আচ্ছা শোনই একটা কাজ করলে হয়না! তুমিও বরং চলনা কেন আমার সঙ্গে?"

এরকম অভূতপূর্ব্ব অনুরোধে প্রথমটা একটু ইতস্তত করলেও শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণীর সেই একাকিনী অপরিচিতা নারীর অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে রাজী না হয়ে পারল না।

এদিকে সরকারের এই অনুগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অরুণকুমার ও তাঁর স্ত্রী তখন তাঁদের বাড়ীর সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন। সামনে একটা মাঝারিগোছের টেবিলের ওপর বসে তাঁদের তিনবছরের শিশুপুত্র তার চারধারে ছড়ান অরুণের নিজের তোলা ও ইলার নিজের হাতে ডেভেলপ করা তারই কতকগুলো ফোটো। হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ী থামার শব্দে ওরা সচকিত হয়ে উঠল। অরুণ উঠে এগিয়ে গেল কে এসেছে দেখতে। শুভেন্দুর সরকারী পোষাক দেখে ব্যাপার অনুমান করে নেওয়া কঠিন হল না। শুভেন্দু অরুণের কাছে এসে ওয়ারেন্টটা তার হাতে দিয়ে বললে "দেখুন বাধ্য হয়েই আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে—বুঝতেই তো পারছেন আমি নিরুপায়—অরুণ বললে না, "আপনি আর কি করবেন নিজের কর্ত্তব্য করছেন মাত্র"—

কল্যাণী ততক্ষণে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে—অরুণের বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে সেইদিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললে "উনি আমার স্ত্রী, সংবাদ পেলাম এখানে আপনার স্ত্রী একা আছেন—বাড়ীতে আর কেউ নেই আমি হঠাৎ এসে এই উৎপাত ঘটাব—সেইজন্যই"—

ইলা এতক্ষণ প্রস্তর প্রতিমার মত নিস্তব্ধভাবে খোকাকে কোলে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল—একজন মহিলাকে আসতে দেখে এবারে নীচে নেমে এল—সিঁড়ির শেষধাপে এসে দু'জনের দেখা হল।

হতভম্বের মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা কিছুতেই যেন চোখকে বিশ্বাস হতে চায় না। বিস্মিত, স্তম্ভিত তাদের রুদ্ধকণ্ঠ হতে কোন রকমে মাত্র এই দুটি কথা উচ্চারিত হল—"ইলা তুই।"

"কল্যাণী?"

অনন্ত কালপ্রবাহ মাঝে বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে কত যুগীর ভিতর দিয়ে, কত শিলার বাধা অতিক্রম করে কত বিচিত্র পথে, কত বিভিন্ন ধারায় জীবননদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

জিজ্ঞাসা

শ্রীজয়ন্তী ঘোষ

পাষাণ বেদীর শুভ্র আসন মূলে,
কি দিয়ে রচিব আলপনা বলো আজ?
অন্ধ দিনের রুদ্ধ কারার মাঝে,
পড়েছে আসিয়া নবচেতনার বাজ।
রক্ত দিয়ে তো আঁকা হলো বহু লেখা,
তবু তো হলো না প্রতিষ্ঠা দেবতার;
চারিদিকে তাই আজো হেরি অনাচার,
আজিও দৈন্য, ক্লেশ আর হাহাকার।
মায়ের চোখের জল আজো ঝরে পড়ে,
প্রেয়সীর মুখ গভীর ব্যথায় ম্লান,—
স্বপ্ন-নিশীথে দুয়ারে আঘাত হানি,
করাল দৈন্য, হৃদি ভেঙ্গে ক'রে খান।
আনন্দ নাই, নাই কলতান-গীতি,
উৎসব দিন ফুরায়ে গিয়াছে কবে,—
মুখরিত পথ আজিকে নীরব ম্লান;
মূক দৃষ্টিতে চাহিছে জনতা সবে।
জীবন কি শুধু ব্যথা আর যন্ত্রণা?
স্বার্থপরতা, অন্যায় নিপীড়ন?
প্রেম নাই! স্নেহ নাই দয়া, মায়া, প্রীতি,
জেগে আছে শুধু বাস্তব অকরুণ।
আলপনা হেথা কি রঙে আঁকিব তবে?
সাদা রং! সে যে কালো হয়ে যাবে ওরে
শুভ্র হইয়া ফুটিতে কি না ফুটিতে,—
কেন মিছে দেব মুহূর্তেকের তরে!
শতদল আর আঁকিবনা বেদীপরে,
আঁকিবনা আর কুসুম শঙ্খ মত;
মালা গাঁথা হেথা হবে বৃথা আয়োজন,
রক্ত ঝরিছে—হৃদয়ে গভীর ক্ষত।
অবিরাম শুধু আঁখির ধারায় চালি,
তোমার আঙিনা ধুয়ে, মুছে দিয়ে যাই
যদি কেউ পারে সাজাতে তোমায় তবে,
নিষ্ফল আমি! তাই আর হেথা নাই,
একটী বিন্দু আমার চোখের জল,
থাক্ আঁকা হেথা নিরমম, অক্ষয়—
বরষের পর বরষ চলিয়া যাক!
এইটুকু থাক বেদনার পরিচয়।
চেতনার বীজ রহিল হেথায় পড়ি,
যদি কোনদিন মহীরুহ উঠে জেগে—
ভবিষ্যতের সে মহান্ যদি জাগে,
অরুণ আলোর সোনালী পরশ লেগে;
এইখানে আমি আঁকি রেখে যাবো, ওগো,
নূতন প্রভাতে নূতন দিনের জয়,
আজকে কিন্তু বেদনার মাথা নত,
আলপনা তাই করে দিয়ে যাই লয়।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

ভবঘুরে

(পূর্বানুবৃত্তি)

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালামৌ' বইএ একটি পাহাড়ে অশ্বত্থ গাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"মনে হইতেছিল অশ্বত্থগাছ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস সংগ্রহ করিতেছে কিছুকাল পরে আর একদিন আমার মনে পড়িয়াছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম—বুক্ষটী বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

সত্যিই পাহাড়ী গাছগুলোর শোষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। সে ক্ষমতা এরা ধনবাদী সমাজের বুর্জোয়াদেরও ছাড়িয়ে গেছে। মাটীর লেশমাত্র নাই—এমন কঠিন পাথরের বুকেও শিকড় চালিয়ে রস সংগ্রহ ক'রে বেঁচে আছে। শুধু তাই নয় বুর্জোয়াদের ভুঁড়ির মত এদের গুঁড়িও উত্তরোত্তর মোটা হ'য়েই চলেছে।

কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—চারিদিকে রুক্ষ, ধূসর পাহাড়—কোমলতার লেশমাত্র নাই—তারই মাঝখানে দু' একটী গাছ চারিদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে পাহাড়ের রুক্ষতাকে নিজের শ্যামলিমার আড়ালে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। তখন মনে হ'ল —না, পাহাড়ী গাছগুলো আদর্শ প্রেমিক। কঠিন পাথরের নীরস আলিঙ্গনে ধরা দিয়েও সে নিজের কোমলতা বজায় তো রেখেছেই —পাহাড়ের রুক্ষতাকেও শ্যামলিমায় ঢেকে দিয়েছে।

এতদিন ধ'রে একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে আসছি—পাহাড়ের এক একটা স্তরে এক এক রকম গাছ জন্মায়, সমতল ছাড়িয়ে পাহাড় যখন উঁচুতে উঠতে থাকে—তখন কিছুদূর পর্য্যন্ত সমতলেরই গাছপালা দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা ক'মতে থাকে—চীড় জাতীয় গাছের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তার চেয়েও যত উঁচুতে ওঠা যায় ততই চীড় গাছের সংখ্যা কমতে থাকে—দেখা যায় ফার, পাইন জাতীয় গাছ। তারও উপরে—যেখানে—নিরবিচ্ছিন্ন বরফের রাজ্য—নৈদাঘ আতপের অধিদৃষ্টিও যেখানে জয় গলাতে সক্ষম হয়নি—সেখানে কোন গাছই টিকতে পারে না। শুধু ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটা ভূর্জপত্রের গাছ খোলস বদলাতে বদলাতে কোনরকমে মাথাটা টিকিয়ে রাখে।

বিচিত্র হিমালয়ের আবহাওয়া—বিচিত্র এর প্রকৃতি, কোথাও হয়ত গম কেটে নেওয়া হ'য়েছে, ধূসর ফাঁকা মাঠ ধুধু ক'রছে—সবুজের চিহ্নমাত্র সেখানে নাই; আবার হয়ত তারই কিছু দূরে কচি ধানের বা গমের ক্ষেত সবুজের আভায় ঝলমল ক'রছে; পাহাড়ের আর একটা স্তরে হয়ত দেখা যাচ্ছে—গমের ক্ষেতে ঘুণ ধ'রছে—তারই ও পাশেই হয়ত পাকা গমের শীষে সোনালী রং ধরেছে। কোথাও বা ইতিমধ্যেই কাটা সুরু হ'য়ে গেছে।

এই একটু আগে দেখে এসেছি—পথের পাশের ক্ষেতগুলিতে গম কাটা শেষ হ'য়ে গেছে। এখানে দেখছি—সবুজ গমের ক্ষেত, পাকতে এখনও বহু দেরী, পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে আবহাওয়ার বিভিন্নতাই এর একমাত্র কারণ। ইচ্ছে করলে পাহাড়ীরা অবশ্য বছরের ৩৬৫ দিন ধ'রেই নবান্ন উৎসব চালাতে পারে —পাশেই একটা গ্রাম পড়ল। গ্রামটীর নাম বীড। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী—ভয়ানক নীচু উচ্চতায় আমাদের দেশের একতলা কাঁচা মাটীর বাড়ীর সমানও হবে না। কিন্তু ঐটুকু উচ্চতার মধ্যেই এরা তিনতলা বানিয়েছে। গ্রামের মাঝখানে একটা বাড়ী দেখলাম—খুব কারুকার্য্যময়। সম্ভবতঃ বাড়ীটী গ্রামের মোড়লের। মোড়লগৃহিনী পিঠে ক'রে কুড়িভর্তি ঘাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসছেন দেখলাম;

একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে আসছি—এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের গলার কাছে চিবুকের নীচের গ্রন্থি বা gland দুটো ঝুলে ঝুলে পড়েছে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই এটা বেশী দেখা যায়। সম্ভবতঃ এদেশের জলবায়ুর মধ্যে এমন একটা কিছুর অভাব আছে—যার ফলে এ রকমটা হ'য়েছে। যেমন মেদিনী-

পুরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের গোদ (elephantiasis), বাঁকুড়ার কুষ্ঠ প্রাধান্য লাভ ক'রেছে—এও তেমনি। কনখলে রামকৃষ্ণ মিশন নাকি এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছেন যে এদের খাদ্যের মধ্যে একজাতীয় iodine এর অভাবই নাকি এর কারণ।

বাড় গ্রামের সোজাসুজি—নদীর ওপারে খরসালি গ্রাম—যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের আস্তানা এবং যমুনাজীর শীতকালীন আবাস। শীতকালে—যখন যমুনোত্রীর চারিদিক বরফে ঢাকা পড়ে যায়, পথঘাট দুর্গম হ'য়ে উঠে—যাত্রী থাকে না তখন যমুনাজী শীতে জমে যাওয়ার হাত থেকে পাথরের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পাণ্ডাদের আশ্রয়হীন আরতি পেয়েই তুষ্ট থাকেন। আবার বসন্তের প্রারম্ভে যখন বরফ গলতে আরম্ভ ক'রে, পত্রশূন্য বৃক্ষ শাখায় নব কিশলয় প্রাণসুন্দরের সূচনা জানায়, পথে ঘাটে দু' চারজন যাত্রী দেখা দেয়—তখন যমুনাজীকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পাণ্ডারা যাত্রী শিকারে বেরিয়ে পড়েন। খরসালি গ্রাম তখন কাঁকা হ'য়ে যায়।

খরসালের একটু পরেই একটা চটী পড়ল। চটীটার নাম জানকীবাই চট্টি। এখানে একটা ঈষদুষ্ণ ঝরণার ধারে বসে জলযোগ সেরে নিলাম। অবশ্য 'জলযোগ' এর মধ্যে জলের পরিমাণটাই সবচেয়ে কম। কয়েকদিন আগে থেকেই জল খাওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলটা এত ঠাণ্ডা যে গলা পর্য্যন্ত পৌঁছাবার আগেই মনে হয় মুখের ভিতরটা বুঝি জমাট বেঁধে গেল। কোন রকমে হয়ত দাঁত, জিভের সংস্পর্শ এড়িয়ে সোজাসুজি গলা দিয়ে খানিকটা জল জঠরানলে আহুতি দেওয়া গেল—কিন্তু অনল তৃপ্ত হওয়ার আগেই জঠরের collapse হওয়ার জোগাড়। কাজেই পারত পক্ষে জলটা যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে কাজ সারতে হয়।

ঝরণাটার কাছে একটু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আবার চলতে সুরু করলাম। খানিকটা পরেই চড়াই পড়ল। বেশ খাড়া চড়াই। তার উপর আবার রাস্তাটা অত্যন্ত অপরিসর। পাকদণ্ডির পথে চলে চলে খাড়া সরু রাস্তায় চলা বেশ অভ্যাস হ'য়ে গেছে কাজেই খুব অসুবিধা হ'ল না।

শুনেছিলাম—চড়াইটা মাত্র তিন মাইল। কিন্তু মনে হচ্ছে—এ তিন মাইল বোধ হয় আর শেষ হবে না। ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম—পথ চলতে কাউকে 'অমুক জায়গাটা কতদূর জিগ্যেস ক'রলে উত্তর পাওয়া যায়—বেশীদূর নয়, 'পোয়াখাট দিখুছি' (পোয়াটাক পথ ঐ দেখা যাচ্ছে) তারপর মাইল খানেক গিয়েও যখন 'পোয়াখাট' শেষ হয় না তখন হয়ত আর একজনকে জিগ্যেস ক'রলে সেও জবাব দেয়—'পোয়াখাট'দিখুছি"। আমাদের এই তিন মাইল চড়াইও বোধ হয় 'পোয়াখাট' এর মর্য্যাদা পেয়ে গেছে।

শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে একটা পাথরের উপর ব'সে পড়লাম। দু'টী বন্ধু পিছনে আসছেন, তাঁরা কতদূরে পড়েছেন—কে জানে! যাত্রীর দল যাচ্ছে—তাদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। কেউ কেউ ফিরেও আসছে—তাদের হাসি খুসী মুখ, সাহস দিয়ে ব'লছে—"আ গয়ে, বাহুজী থোড়েই দূর হ্যায়"।

ও তো 'বাঘুলী বাৎ' অনেক দূর থেকেই শুনে আসছি। যাই হোক, যেতে তো হবে, বসে থেকে লাভ নেই—উঠে পড়লাম।

চলতে চলতে দেখছি—গাছের গায়ের পুরু ছাওলা জমেছে, পাথরের গায়েও ছাওলার একটা স্তর পড়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন—গাছগুলো ছাওলার সাহায্যে নাকি শীত থেকে আত্মরক্ষা করে। পাথরেরও শীত পায় কিনা—কে জানে?

গল্প ক'রতে করতে এগিয়ে চলেছি, মনে হচ্ছিল—কিছু যেন একটা ছেড়ে এসেছি। হঠাৎ বন্ধুদের ছাতার দিকে নজর পড়তেই মনে হ'ল—তাই তো ছাতাটা হাতে নাই, নিশ্চয় যেখানে বসেছিলাম সেখানেই ফেলেছি। সেটা অনেকটা নীচে। একটা নেমে ছাতা উদ্ধার ক'রে আবার উঠতে হবে—তা হ'লেই হয়েছে

আর কি? কিন্তু নূতন ছাতাটার মায়া ছাড়তে ও মন সরছে না—আসবার আগে নগদ দশটী মুদ্রা ব্যয় ক'রে কিনে এনেছি। তা ছাড়া এখনও দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে ছাতার প্রয়োজনও যথেষ্ট। অগত্যা নামতে লাগলাম।

নামতে নামতেই ছাতাটার হদিশ মিলল। একটী কুলি বেওয়ারিশ ছাতাটি পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে আনছিল তাকে বলতেই সে ছাতাটা ফিরিয়ে দিল।

আবার সেই চড়াই। আরও প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে গেলাম নীচের দিকে 'সিমরু' নামধারী যে ফুল-গুলোর রং লাল দেখে এসেছি—এখানে দেখছি—সেগুলো যেন ক্রমশঃ সাদা হ'য়ে যাচ্ছে। পথটা আরও খারাপ হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে কোন পথই নাই। গাছের ডাল-পালা ধ'রে রীতিমত জিমন্যাষ্টিকের কসরত দেখিয়ে তবে সেখানে উঠতে হয় এমনি এক তাগুনের মুখে এক সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হ'ল। সাধুটি পরিচিত—ডংডাল গাঁওয়ের গুজিনের সাথী। আমাদের আগে চলে এসে যমুনোত্রী সেরে ফেরৎ পথ ধ'রেছেন। আমাদের দেখে হেসে বললেন—

—"কাঁ:—অ্যা গয়ে, আপলোগ?"

—"অ্যা তো গয়ে—লেকিন' ঔর কিতনী দূর হ্যায়, মহারাজ?

আমাদের শুকনো মুখগুলোর দিকে চেয়ে খানিকটা উৎসাহ দেওয়ার জন্যই যেন বললেন—"আরে নেহি, নেহি, বিলকুল নজদীক হ্যায়। —থোড়েই দূর হ্যায়"

আবার সেই 'থোড়া'—তা হ'লেই হ'য়েছে আর কি? কিন্তু এবার নিরাশ হ'তে হ'ল না। মোড়টা ফিরতেই সামনে দেখি—তুষার কিরিটী পাহাড়ের চূড়া থেকে কয়েকটা স্রোত নেমে এসেছে—সেই স্রোতগুলো এক জায়গায় মিলে যমুনার রূপদান ক'রেছে।

বরফের পাহাড় এখন আর দূর থেকে মায়া লোকের সৃষ্টি ক'রছে না। পাহাড়ের বরফ চোখের সামনে দেখছি। বরফের দানাগুলো স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে আছে —পথের পাশে। খানিকটা হাতে তুলে নিলাম। আমাদের দেশে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী বরফে হাত রাখা যায় না: কিন্তু এ বরফ ততটা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না। অনায়াসে মাইল খানেক পথ হাতে ক'রে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। নদীর উপরে জায়গায় জায়গায় বরফ জমে গেছে। নীচ দিয়ে স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—উপরে বরফের একটা আস্তরণ পড়ে আছে।

শেষ পর্য্যন্ত প্রায় একটার সময় যমুনোত্রীতে এসে পৌঁছালাম। পৌঁছেই প্রথমে মনে পড়ল—পেটের ভিতরে অগ্নিদেবের তাণ্ডব নর্ত্তন। কাজেই প্রথম প্রয়োজন হ'ল—তাকে শান্ত ক'রবার। কালীকমলীর ছোট একটা ধর্ম্মশালা আছে। সেইখানে লট বহর নামিয়ে রেখে রান্নার ব্যবস্থায় লেগে পড়লাম। রান্না খাওয়া শেষ ক'রে দেখতে বেরোলাম।

বেশ শীত। তখনও বেশখানিকটা বেলা আছে। কিন্তু এরই মধ্যে হাতে পায় কাপুনি সুরু হ'য়ে গেছে।

সামনে বরফের মুকুট মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে —উঁচু পাহাড়। পাশ দিয়ে ক্ষীণকায়া, স্বচ্ছতোয়া, যমুনা কুলকুল শব্দে অবিরাম ব'য়ে চলেছে। তারই মাঝে অল্প-পরিসর প্রায়-সমতল জায়গার উপর গোঁ কয়েক ঘর এবং যমুনাজীর মন্দিরটী নিয়েই যমুনোত্রী।

নদীমাতৃক দেশ ভারত। এদেশের নদনদী এদেশের অধিবাসীদের জীবনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। নদীর বন্যাপ্লাবিত অববাহিকায় উপজাত শস্য সম্ভার তাদের আহার্য্য জুগিয়েছে, নদীর নির্ম্মল জল জুগিয়েছে পানীয়। নদনদীর অসংখ্য স্নেহের বন্ধন এদেশের আবহাওয়াকে ক'রেছে সুখশীতল—তাই তো এদেশের অধিবাসীরা সেই স্মরণাতীত কাল থেকে নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা ক'রে এসেছে—নদীর জলকে পবিত্রতার সব কিছুর ঊর্দ্ধে স্থান দিয়ে এসেছে।

নদীকে কেন্দ্র ক'রেই সেই কোন প্রাচীন যুগে এদেশে বৈদিক আর্যসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারই ভিত্তি প্রস্তরের উপর উত্তরকালে হিন্দুধর্ম্মের প্রাসাদ রচিত

হ'য়েছিল। মাতৃস্বরূপা নদনদীও হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রেছে।

ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ ক'রেছেন—যে আর্যরা ভারতে এসে প্রথমে সিন্ধু নদীর তীরে বসবাস করেন। 'হিন্দু' শব্দটা 'সিন্ধু' থেকেই ধার করা। মনে হয় সিন্ধুতটে ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার যখন আদিপর্ব সুরু হয়েছিল—তখনও পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম ভালোভাবে দানা বেঁধে ওঠে নি। পরবর্তীকালে আর্য উপনিবেশ যখন সিন্ধু ছাড়িয়ে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'ল—তখন গঙ্গাই হিন্দুর জীবনে মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে বসল—সিন্ধু পড়ে রইল অনেক পিছনে। পরবর্তীকালে যমুনা, গোদাবরী সরস্বতী, নর্মদা ইত্যাদি যোগ হ'য়েছে—কিন্তু গঙ্গার প্রাধান্য তাতে হ্রাস পায়নি।

হিন্দুর কাছে গঙ্গোদকের মত পবিত্র জল আর নাই—হিন্দুর কোন শুভকর্মই গঙ্গাজল ছাড়া চলতে পারে না, যত বড় পাপীই হোক—গঙ্গার জলে একটা ডুব দিয়ে নিতে পারলেই সব পাপ ধুঁয়ে যাবে—একথা হিন্দু বিশ্বাস করে—হিন্দুর জীবনে, এবং হিন্দু সভ্যতার মধ্যে গঙ্গার প্রভাব অসীম। এর কারণ—আর্য্যাবর্ত্ত বা উত্তর ভারত—বৈদিক আর্য সভ্যতা তথা হিন্দু ধর্মকে যে দেশ রূপদান ক'রেছে—সেই সারা উত্তর ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে—গঙ্গা অথবা তার শাখা নদী, উপনদী। এদেশের অধিবাসীদের জীবনে তার প্রভাব যে প্রতিফলিত হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? হাজার হাজার বছরের উত্থান পতনের মধ্যেও তার সে প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু আজ হয়ত অনেক হিন্দু সন্তানই গঙ্গোদকের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন—কিন্তু গঙ্গার প্রতাপকে অস্বীকার ক'রবার দুঃসাহস তার আজও জন্মায় নি।

গঙ্গার পরেই স্থান পেয়েছে যমুনা। যমুনা গঙ্গার সব চেয়ে বড় উপনদী, তারপর যমুনা পুলিনে রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাকে আরও মধুরতর রূপ দিয়েছে। পবিত্রতার প্রতিযোগিতায় যমুনার জল গঙ্গাজলের সমকক্ষ না হ'লেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রতে পেরেছে, আর যমুনার উৎসমুখ—যমুনোত্রী হ'য়েছে—অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই যমুনাজীর মন্দিরে গেলাম। যমুনার নীলজলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বোধ হয় মূর্তিরও রং হ'য়েছে নীল, চারিহাতে শঙ্খ, পদ্ম, বরাভয়—মকর বাহিনী। ছোট মন্দিরের মধ্যে ছোট প্রতিমাটী মানিয়েছে ভালই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি—যাত্রীরা প্রণাম ক'রে প্রণামী দিচ্ছে। প্রণামী আদায়ের ব্যাপারে যাত্রীদের স্বেচ্ছাকৃত সশ্রদ্ধ উপহারের চেয়ে পাণ্ডাদের জবরদস্তীটাই বেশী দেখলাম। একেবারে কিছু না দিয়ে হাতথেকে উদ্ধারের কোন আশা নাই—পিছনে পিছনে ছুটতে আরম্ভ ক'রবে। Devil's due দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যদি কেউ সৃষ্টিকর্তা থাকেন,—তিনি ধার্মিকের 'ভগবান'ই হোন, বা বৈজ্ঞানিকের 'প্রকৃতি'ই হোন—অদ্ভুত তাঁর খেয়াল,—বিচিত্র তাঁর এই সৃষ্টি, তিনি কণ্টকের বনে আসন পেতেছেন কমলের, প্রস্তর মরুর মাঝে সৃষ্টি ক'রেছেন মনোরম উদ্যান, শীতল সমুদ্রের বুকে স্থান দিয়েছেন অগ্নিগর্ভ পর্বতকে, আর তুহিনশীতল নদীর পাশেই সৃষ্টি ক'রেছেন—উষ্ণ প্রস্রবণ।

যমুনোত্রীর মন্দিরের পাশেই একটা উষ্ণ প্রস্রবণ। আর সেই প্রস্রবণের জল আবার এত গরম যে একটা কাপড়ে চাল বেঁধে নামিয়ে দিলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভাত হয়ে যায়। এই কুণ্ডে চাল সিদ্ধ ক'রে নিয়ে যাত্রীরা যমুনোত্রীর প্রসাদ তৈরী ক'রে নেয়—ফেলে-আসা আত্মীয়স্বজনদের পুণ্যের ভাগ দেওয়ার জন্য।

প্রস্রবণের জল কয়েকটা কুণ্ডে ধরে রাখা হ'য়েছে। বহুদিন পরে উষ্ণ কুণ্ডের জলে নেমে অবগাহন স্নান করলাম। স্নান সেরে প্রস্রবণটার ধারে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের বুক ভেদ ক'রে যেখান থেকে প্রস্রবণটা

বেরিয়েছে—তার চারিপাশে একটা লাভা জাতীয় আস্তরণ পড়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা উষ্ণ প্রস্রবণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—মাতামহ সূর্যের অঙ্ক থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর লক্ষ কোটী বছরের ব্যবধানে মাতা ধরিত্রীর বাহিরাঙ্গটুকু ঠাণ্ডা হলেও ভিতরটায় নাকি এখনও প্রচণ্ড গরম তরল লাভাস্রোত বইছে। অনুৎপাতের মধ্যে তারই পরিচয় পাই। উষ্ণপ্রস্রবণের জলেও সেই গরমেরই ছোঁয়াচ লেগেছে, যমুনোত্রীর উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে লাভা জাতীয় আস্তরণ পড়েছে দেখে ভাবছিলাম—বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা সত্যি হলেও বা হ'তে পারে—হঠাৎ কাণে গেল—'প্রসাদ লিজিয়ে সেঠজী, যমুনা মায়ীকা অপনা হাতসে পাকা হুয়া হ্যায় এ পেরসাদ।"

ফিরে দেখলাম—কতকগুলি মেয়ে উষ্ণ প্রস্রবণে চাল সিদ্ধ করছে। আমাদেরই একটি বন্ধুবর দাঁড়িয়ে বোধ হয় তাই দেখছিলেন। পাণ্ডাজী তারই ঘাড়ে 'পেরসাদে'র বোঝা চাপাতে চলেছেন। এগিয়ে গিয়ে পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞেস করলাম "কাঁহা মিলা আপকো এ পেরসাদ"। পাণ্ডাজী খানিকটা অবাক হয়ে পাশের উষ্ণ কুণ্ডটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—

—"ইয়ে হ্যায় সূরজ কুণ্ড—ইহাঁ যমুনামায়ী অপনা হাতসে পাকাতে হৈঁ" মাথা চুলকে চুলকে বললাম "মাপ কীজিয়ে, পাণ্ডাজী মায় এক বাত আপকো পুছনে চাহতা হুঁ" পাণ্ডাজী বোধ হয় ভাবলেন—ওষুধ ধরেছে। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন "জরুর,—পুছিয়ে মহারাজ"

—"ইসকে নীচে যমুনাজী বৈঠে হৈঁ কা?"

পাণ্ডাজী একটু ঘাবড়ে গেলেন বোধ হয়। এতটা তিনি আশা করেন নি। আমতা আমতা করে বল্লেন—"পুরাণমে লিখা হুয়া বাবুজী, আপ 'বিশোয়াস্' নেহি করতে হৈঁ—"

পাণ্ডাজীর মুখটা করুণ হয়ে উঠল। যাত্রীদের অন্ধ-ভক্তির সুবিধা নিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়াই এদের কাজ। তার বেশী কিছু জানে না এরা। বেশী কিছু বললেই 'অবিশ্বাসী' বলে উড়িয়ে দেয়। কঠিন কথা বলব কি না ভাবছি এমন সময় পিছন থেকে বন্ধুবর বল্লেন "আরে নেহি নেহি, আপ তো ইনকা বাত সমঝে হি নেহি। ইনকা বোলীকা মতলব এ হ্যায় কি—যমুনা মায়ী রোজভর কুণ্ডকে নীচে বৈঠে হৈঁ তো জরুর উনকা বহুত তকলীফ হোতা হ্যায়"

বন্ধুর ভক্তির বহর দেখে বোধ হয় পাণ্ডাজীর মুখে করুণার হাসি দেখা দিল। আকর্ণবিস্তৃত দন্তব্যাদন ক'রে বল্লেন—তকলীফ তো হোগা হি বাবুজী, বেটা বেটীকে লিয়ে মায়ীকো তো তকলীফ করনা পড়েগা।"

মনে মনে ভাবলাম এইজন্যই বোধ হয় অধিকাংশ দেবমূর্তিই পাথরের না হয় ধাতু দিয়ে গড়া।

নিষ্প্রদীপ

বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

স্বল্প লেখাপড়ার সংগে ছিল খানিকটা রূপ। তারা দেহ ঘিরে একুশ বছরের যৌবন ; দুশ্চিন্তায় আর দুর্গতিতে অভাবে আর দারিদ্র্যে শীর্ণ হওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া মুখের উপর তবু যৌবনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যেতো, উপবাসের পাণ্ডুরতা ছাপিয়েও উঁকি দিত ভিতরের লোহিত রক্ত ধমনিতার রক্তিমাভা। বাবা শিবশংকর বাবুর চোখে কল্পনার এই রূপটা চোখে পড়েনি, উনি যৌবনের পিছনে দেখেছেন দিনে-দিনে ফুরিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটি মানবদেহ। মেয়েটি শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বিশেষ সত্য নয় তার কাছে—শুধু কল্পনা কেন কল্পনার ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আরও সাতটি। তারাও নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। নিজের আর স্ত্রীর কথা ত হিসেবের বাইরে। জীবনের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে এখন কেবল বিদায় নেওয়ার বিশেষ ক্ষণটি বাকী। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্ত যেন অসম্ভব ভয়ংকর আর বীভৎস হয়ে উঠবে—এমনি একটা ভয়ে দিন রাত আচ্ছন্ন থাকেন শিবশংকর বাবু।

কল্পনার উপর অতিরিক্ত করুণা নেই কিন্তু অভিযোগ আছে। অভিযোগ হয়তো ঠিক নয়, অভিমান। কল্পনার উদ্ধত যৌবনটাই কাল হলো শেষ পর্যন্ত, কল্পনাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বাস্তুভিটা হারাতে হলো, সবাইকে নিয়ে পালিয়ে আসতে হলো এমনি একটা ধারণার আক্রমণে ও ঘাপে-মাপে জর্জরিত হল শিবশংকর বাবু।

অতীতের ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত, মুখর নয় বেদনায় নিঃশব্দ। ভেবে আবছা সেই বেদনা আছে, অসহায়ের অনুশোচনা আছে। জেলা সহরের হাইস্কুলে মাষ্টারী করতেন। সচ্ছলতা না থাকলে ও অভাব ছিল না। সম্মান ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। আটটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে কখনো ভাবনায় পড়তে হয়নি, বেশ নির্বিবাদে সংসার চালিয়ে এসেছেন।

দেশবিভাগের প্রথম অবস্থায়ও আসেন নি, নিশ্চিত জানতেন এই আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও ঘর বাঁধবার বাধাবরা বৃত্তি অবলম্বন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকেও উপেক্ষা করেছেন, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস আর নিষ্ঠায় অবিচলিত থেকেছেন, হিন্দু-মুসলমান গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে গঠন করেছেন শান্তি কমিটি। মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন। কঠা বিক্ষুব্ধ রাজপথ দিয়ে কল্পনাকে স্কুলে পাঠাতে কুণ্ঠিত হন নি। ভেবেছেন মেঘ কেটে যাবে, ভেংগে যাবে নির্মোক রক্তাক্ত চক্ষু থেকে ও শীতল শান্ত দৃষ্টি একদময় প্রকাশ পাবে।

কিন্তু নিজের বিশ্বাসেও এতদিন ঘুণ ধরেছে, অসতর্ক মুহূর্তে দুর্বল বোধ করেছেন তিনি। স্কুল থেকে ফিরবার পথে কারা কারা পিছু নিত কল্পনার, রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে বিশ্রী ভাবে শিস্ দিত, জোরে হাঁক দিতেও কুণ্ঠিত হত না। বাড়ীর কাছাকাছি এসেই কল্পনার ত্রাস করতো সবচেয়ে বেশী। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সোজা বাসার দিকে দৌড় দিতে ইচ্ছা হতো ওর।

শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ করে বাসায় বসে বসে আই. এ. টা পড়তে হলো ওকে। কিন্তু পরীক্ষা দেবার অবকাশ পেলো না। আশে-পাশের সবাই এর আগেই পালিয়ে এসেছেন ; মেয়েকে নিয়ে আর থাকতে ভরসা পেলেন না শিবশংকর বাবু। চায়ের দোকানটা পুরাণো জায়গা ছেড়ে বাসার সামনা সামনি-এসে বসেছে। আর উপায় নেই।

কল্পনা আর তার ছোট দু'টা ছেলে বিনু আর মনু, তারপর তিনটি মেয়ে অনু, মধু আর দীপু। তারপর আরও দু'টী ছেলে ছোটটির বয়স মেড় বৎসরের বেশী নয়। এদের নিয়ে কলকাতায় এলেন শিবশংকর বাবু। এবং তিনমাস ধরে অবিরাম দরখাস্ত লিখলেন এখানে ওখানে।

ছোট ছোট দু'খানি ঘর, সামনে একফালি বারান্দা, তারি ভাড়া মাসে চল্লিশটাকা, তাও তিন মাসের অগ্রিম দিতে হয়েছে। আজীবনের সামান্য সঞ্চয় বেরিয়ে গেছে এই তিনমাসে, কোন উপায় নেই, কোন সম্ভাবনা নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। উপন্যাসের ভয়ংকর দিনগুলি এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ, একটু-একটু করে অনিবার্য্য-গতিতে।

কেন ভয় করছো বাবা—কল্পনা বলেছে এক দিন রাত্রিতে। তোমার কাজ না হয়, আমার বোধ হয় হবে। মুখার্জি এণ্ড চৌধুরী কোম্পানীর চাকরিটার জন্য যে দরখাস্ত করেছিলাম তার ইণ্টারভিউ পেয়ে গেছি। ওরা লিখেছিলেন বাস্তুহারা মেয়েদের দাবী অগ্রগণ্য হবে—তাতে একটু ভরসা হচ্ছে।

তোর চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থী বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে-ও ত থাকতে পারে। কোন কিছুতেই ভরসা করতে ইচ্ছে হয় না শিবশংকরবাবুর।—তোর লেখাপড়াও ত তেমন বেশী নয়, তার উপর টাইপ কিংবা শর্টহ্যাণ্ডের তুই ত কিছুই জানিস না!

দেখি কি হয়?—কল্পনা বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্য-মনস্ক হতে চেষ্টা করে।

মনু কোথায় গেছে জানিস, মা রান্না ঘর থেকে প্রশ্ন করেন।

কি জানি কোথায় রাস্তায় কুলীর ছেলেদের সংগে হয়তো খেলছে। ছেলেটা একেবারে উৎসন্ন যাচ্ছে।

আর বিনু, মৃণালিনীদেবীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন এখান থেকেই শুনতে পেলো কল্পনা।

ওর কথা জিজ্ঞেস করো না। ষষ্ঠীর সামনের সেই লম্বা চুলওয়ালা-ছেলেটার সংগে মিশছে। আমার মনে হয় ছেলেটা পিকপকেটের সাকরেদ করে তুলছে বিনুকে?

তোর বড় ছেলেমানুষী। আজীবনের ভাল মানুষী মন আর আদর্শবাদ দিয়ে বর্তমানের সন্দেহকে ঢেকে রাখতে চান শিবশংকর বাবু। বিশ্বাস করতে চান, বিশ্বাস করে ঠকতে চান।—কেমন করে বুঝলি!

মাঝে-মাঝে যে এটা-সেটা নিয়ে আসে, তা' কো-থেকে পায় ও। কল্পনার গলা কর্কশ হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে বাজার করে আনে কি করে; পয়সা ছাড়া দিনরাত ঘুরে বেড়াবার সাহস পেলো ও কোত্থেকে?

তোর সন্দেহ অমূলক।

না। সময় থাকতে ওদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে হবে। নইলে অত্যন্ত দুর্গতি ভোগ করতে হবে আমাদের।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া দুঃখ প্রকাশের আর কি মাধ্যম আছে? দু'বেলা খেতে দিতে পারেন না, স্কুলে পাঠাবেন কি করে শিবশংকরবাবু। কোন উপায় নেই। একটা ক্ষুধিত অক্টোপাস সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন জড়িয়ে ধরেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মুখার্জী এণ্ড চৌধুরী কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধি-কারী সুরঞ্জিত চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়ালো কল্পনা। দৃঢ় উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা সুরঞ্জিতের, জ্বল জ্বল করছে দু' চোখে তার বুদ্ধিদীপ্ত আধিপত্য। কল্পনার সারা দেহের উপর দিয়ে ওর বলিষ্ঠ দৃষ্টিটা একবার বিচরণ করে গেল, তারপর স্থির হলো মুখের উপর, দু'চোখের ঠিক নীচে। প্রশ্ন করলেন—কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

—ম্যাট্রিক পাশ করেছি। আই, এ, পড়েছিলাম, পরীক্ষা দিতে পারিনি।

—টাইপ শর্টহ্যাণ্ড কিছু জানেন।

—না, তবে খুব অল্পদিনের মধ্যে আমি শিখে নিতে পারবো।

—আপনাদের পরিবারে আর ক'জন লোক আছে।

সব মিলিয়ে যে আমরা দশ জন। মা বাবা আর আমরা আট ভাইবোন।

—তাই নাকি। সুরঞ্জিতবাবু বিস্মিত হয়ে চোখ দু'টি কপালে তুললেন। এতজনের কি করে চলে?

—চলে না বলতে পারেন। কল্পনা ম্লানভাবে হাসলো,—বাবা আসবার সময় কিছু টাকা এনেছিলেন, তাতে এই কটা দিন কেটেছে। এবার উপোষ করা

ছাড়া উপায় নেই।

—বাবা কী করতেন?

—স্কুলে মাষ্টারী করতেন। এখানে এসে অবধি খুঁজছেন, এখনো জোগাড় করতে পারেন নি।

চুপ করে রইলেন সুরঞ্জিতবাবু। একটু পরে বললেন—আচ্ছা, আপনি যান। আমি পরে খবর দেবো আপনাকে।

সুরঞ্জিতবাবুর মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো কল্পনা। মনে হচ্ছে সুরঞ্জিতের একটা ভিক্ষার জন্য—ওর একটু প্রসাদলাভের জন্য এক্ষুনি কেঁদে ফেলতে পারে কল্পনা। মা আর বাবার বিষণ্ণ দৃষ্টি নিরন্তর চোখের উপর ভাসছে। সকাল থেকে অসুস্থ প্রহর গুণছে ওরা—কখন ফিরবে কল্পনা, আটটা ভাইবোন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে চলেছে।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সুরঞ্জিতের কণ্ঠস্বর উদাসীন।—যান, অন্য আর একজনকে এবার ডাকতে হবে; আমার সময় অল্প।

—আমার জন্য একটু বিবেচনা করে দেখবেন। কোন রকমে বললো কল্পনা। নইলে.....।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ঠোঁট দু'টি হাসিতে ফাঁক হয়ে গেলো সুরঞ্জিতবাবুর। হয়তো অবজ্ঞার, অবহেলার হাসি। তবু অপমানিত বোধ করার সাহস কৈ কল্পনার।—আচ্ছা আমি দেখবো। সুরঞ্জিতের শেষ কথাটি না শুনে বেরুতে পারলো না সে।

দিনকয়েক পরে মুখার্জি এণ্ড চৌধুরী কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারি সুরঞ্জিত চৌধুরীর স্বাক্ষর-যুক্ত চিঠি পেল কল্পনা। যদি সম্ভব হয় একবার যেন দেখা করে কল্পনা। দরকারী কথা আছে।

—চাকরিটি বোধ হয় হলো? সকালবেলা মুখ ধুতে যাবার আগে মাকে বললো কল্পনা।

—কি জানি নিষ্প্রাণ আর নিষ্প্রদীপ কোন অকূল থেকে একটু যেন সাড়া এলো।—কি জানি ভগবানের মনে আর ও কি আছে?

কতদিন মার মুখের দিকে তাকায়নি কল্পনা, তাকাতে পারে নি। যেন মা নয়, বাবা নয় নিষ্প্রাণ আর নিস্তেজ দু'টি জীবন শুধু, ধসে যাওয়া, ঝিমিয়ে পড়া স্মৃতির ভগ্নাংশ।

সকাল বেলাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনু—কল্পনা হাত চেপে ধরলো, এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস?

—যেখানে যাই তোর কি? উদ্ধত ভংগীতে নয়, হাসতে হাসতেই জবাব দিল বিনু।

—তোর লেখাপড়া নেই? কল্পনা একটু শক্ত হতে চেষ্টা করে।—না, এখন বেরুতে হবে না তোকে।

—যেশীদূরে যাচ্ছি না—এই গলির মোড় থেকে ঘুরে আসবো। বিনু মিনতি করে।

—কেন, গলির মোড়ে কি দরকার।

—এক কাপ চা খেয়ে আসি।

—চা? আকাশ থেকে পড়লো কল্পনা। চা খাওয়া ধরলি কবে? বাড়ীতে থাকতে ত কখনো চা' খেতিস্ না।

—চকলদা শেখালেন। এখন না খেলে আর পারি না। মাইরি বলছি দিদি ছেড়ে দে।

—চকলদা? সে আবার কে? কল্পনার স্বর কর্কশ হয়ে উঠলো। চা খাস, আর কি করিস?

—আর কি করবো আবার?

—তুই পয়সা পাস কোত্থেকে। অন্নু, মনুর জন্য জামা কিনে এনেছিস দেখলাম, টাকা পেলি কোথায়?

—রোজগার করছি। বিনু সংক্ষেপে উত্তর দিলো।

—তাতে ভুলছি না। কেমন করে রোজগার করছিস তাই বল্।

—ভারী ত আমার। সস্তা শেখা একটি অশ্লীল ভঙ্গী করে বিনু, এই ত বেশ চমৎকার করে সেজে বেরোস, কই একটা পয়সা আনতে পেরেছিস? সেই মুরোদ নেই তোর। আমি কিছু না আনলে সংসারের সবাই এতদিনে উপোস করে মরতো জানিস? ছেড়ে দে এখন, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিনু চলে গেলেও সেখান থেকে এক পাও নড়তে পারলেন না কল্পনা। আর নড়তে পারলেন না ঘরের ভিতর উপুড় হয়ে বসা শিবশংকরবাবু। কোন গোপন গলির জানালা দিয়ে বিনু রোজগার করছে আজ আর তার জানতে বাকী নেই। কিন্তু আজীবনের আদর্শ আর চরিত্র ভেংগে পড়ছে তার, মাষ্টার মশায়ের উদ্যত চাবুকটা আর প্রয়োগ করে পড়েনা কারও উপর।

—মনু বলেছে কাল আমাকে সব কথা। শিবশংকর বাবু আস্তে আস্তে বলেন। পাড়ার বদছেলেগুলির সংগে মিশছে বিনু।

—তুমি একটু শক্ত হও বাবা। আর সময় নেই। এমন হয়ে থেকো না।

—কি করবো আমি। কি করতে পারি। শিশুর অসহায়তা শিবশংকর বাবুর কণ্ঠে।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলো কল্পনা। মুখ ধুতে চলে গেল কল ঘরের দিকে। আর এতদিন যা হয়নি তাই হলো; কল্পনার গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা চোখের জল।

—দেখুন, একটা প্রস্তাব আছে আপনার কাছে, যদি সম্মত হতে পারেন—সুরঞ্জিত বাবু বললেন কল্পনাকে।

—বলুন? কল্পনার চোখের দৃষ্টি প্রত্যাশায়,

—মাস কয়েক কাজ শিখতে হবে আপনাকে, শিক্ষা-কালীন অবস্থায় আপনি মাসে পঞ্চাশ টাকা পাবেন। যত তাড়তাড়ি কাজ শিখতে পারবেন আপনার পক্ষে ততই ভাল হবে। মাইনেও বেশী পাবেন।

—আমি রাজী কল্পনা বললো।

—আচ্ছা, কাল থেকে জয়েন করুন, ওর মুখের দিকে সস্মিত চোখে তাকালেন সুরঞ্জিত বাবু। কল্পনার মনে হলো ওর রক্তরাঙা মুখের রং সহানুভূতিতে নরম হয়ে গেছে।

আরও অনেকগুলি দিন ফাঁকা ফাঁকা, অখিষণ্ণ, অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেটে গেছে। কিছু ভাবতে পারেনি সম্বিত। কোনদিকে নজর দেবার অবকাশ পায়নি। বিনু মনু কি করছে তাও জানবার ইচ্ছা হয়নি—যা কিংবা বাবা মুখের বদলানো লক্ষ্য করেনি, সব মিলিয়ে যেন একটা ঝিমিয়ে পড়া সন্ধ্যা, ব্যাকুল করে, অন্যমনস্ক করে ক্লান্তি আসে নেমে আর মনে।

দশটা থেকে পাঁচটা একটানা কাজ—তারপর ঘণ্টা খানেক শর্টহ্যাণ্ড কলেজ শিক্ষানবিশী, সকাল আটটা থেকে অফিসে বেরোবার তোড়জোড়, সন্ধ্যার সময় নতমুখ আর ক্লান্তচোখে ফিরে আসার মধ্যে কোন উৎসাহ, কোন উদ্যমের অবকাশ নেই। গতিশীল পৃথিবীর অগুনতি চক্রের একটিমাত্র কল্পনা দিবারাত্রির দীর্ঘ সময়ের পরিধি মেপে খালি আবর্তন।

এমনি করে ছ'মাস কাটাবার পর একদিন কল্পনার ডাক পড়লো সুরঞ্জিতবাবুর ঘরে।

—বসুন, চমৎকার উত্তরে গেছেন আপনি।

—চুপ করে রইলো কল্পনা। আত্মপ্রসাদের দীপ্তিতে সারা মুখে আবীর ছড়িয়েছে ওর।

—কি অদ্ভুত বলুন তো। সুরঞ্জিতের কণ্ঠস্বর অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ট হয়ে এলো। এত কম বেতনে এমন করে খাটছেন। আমারই অপরাধ হয়ে গেছে। ছ'মাসের মধ্যে আপনার বেতন খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আপনাদের সংসারের অবস্থা কেমন? আপনার বাবা কাজ জোগাড় করেছেন কিছু?

—না এখনো তেমন কিছু পাননি। আশে পাশের কয়েকটি ছেলেকে সকালবেলা বাসায় ডেকে এনে পড়ান—তাতে সামান্য কিছু পান। ক্লান্ত গলা কল্পনার। ভাই-বোনগুলোর লেখাপড়া আজও বন্ধ।

—তাই নাকি? কি করবেন বলুন। কাল থেকে এই ঘরেই বসবেন আপনি আমার সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ছুটী নিয়েছে মাস দু'য়েকের। কাজেই ছ'মাস অন্ততঃ ভাল বেতন দিতে পারবো আপনাকে। তারপর দেখি অফিসে কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

—কিন্তু শর্টহ্যাণ্ড আমি ভাল করে শিখতে পারিনি। কুণ্ঠিত হয়ে গেল কল্পনা, আমাকে দিয়ে কি আপনার কাজ চলবে?

—আমার তেমন কাজ নেই। হাসলেন সুরঞ্জিত বাবু। কোন রকমে চালাতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলো কল্পনা।

দু'পায়ে দু'টা যেন পাথর গজিয়েছে। ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। ডালহৌসী থেকে উল্টাডাঙ্গা যেন এক দৌড়েই চলে যেতে পারে কল্পনা বাবার শান্ত শীর্ণ মুখে আজ হাসি ফুটবে—মাও অনেক দিন ধরে হাসেন না। আজকাল যেন কথা বলাই একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। সেদিন বিনুর হাত ধরে কাঁদছিলেন তিনি, দেখতে পেয়েছে কল্পনা—আমি উপোস্ করবো কিন্তু তবু তুই বাজে ছেলেগুলোর সংগে মিশিস নে বিনু, তোর সাহায্য আমার দরকার নেই, জোর নেই, দুর্ব্বলতার কান্না, তোকে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারবো না আমি।

কাঁদছিল নাকি বিনু? বড় বড় চোখের কোলে কিসের আভাষ দেখেছিল কল্পনা? ব্যংগের না সমবেদনার—বিদ্রুপের না বিপর্য্যয়ের। আস্তে আস্তে বলেছিল বিনু, আমার কোন উপায় নেই তোমার কষ্ট সহ্য হয় কিন্তু মনু, মনুর চেহারা কেমন হয়েছে দেখছো। মনুটা দিনরাত কেমন মুখভার করে থাকে। আমি কি করবো বলো?

—তোর দিদি ত কাজ করছে।

—কাজ না ছাই। ব্যংগে মুখটা বেঁকে যায় বিনুর। সারাদিন খেটে খেটে মাসের শেষে পঞ্চাশটা টাকা আনে। তার চেয়ে চঞ্চলদা একদিনেই...কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল বিনু।

ঘরের ভিতর দাঁতে দাঁতে চেপে গিয়েছিল কল্পনার। অফিসে যাবার সময় রোজই দেখতে পায় চঞ্চলবাবুকে। চায়ের দোকানের সামনের রকটিতে বসে নির্বিকারভাবে সিগারেট টানে, নইলে বন্ধু বান্ধবদের সংগে গরম মুড়ি আর ভেলেভাজা খায়। মুখ তুলে আড় চোকে কল্পনার দিকে তাকায় বারবার—কুৎসিৎ বীভৎস দৃষ্টির সামনে ওর চোখের শুরু দু'টিও যেন লজ্জা পায়। এমনি চঞ্চলের একদিনের রোজগার...কিন্তু কেমন করে রোজগার করেন চঞ্চলবাবু?

বাসায় ফিরে কিন্তু অবাক হয়ে গেল কল্পনা। ফিনফিনে ধুতী আর আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে সুদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাবার সংগে গল্প করছেন। দরজার পাশে মাও দাঁড়িয়ে আছেন। চোখের সোনালী চশমাটা হাতে নিয়েছেন তিনি—পার্কার পেন্ডকেসের কলমটা ও রয়েছে সামনে। চিনতে না পেরে আরও অবাক হয়ে গেল কল্পনা।

কল্পনা এসেছিস? ইনি তোর হরিশকাকা, গ্রাম সম্পর্কে আমার ভাই। প্রণাম কর। শিবশংকরবাবুর কণ্ঠস্বর উল্লসিত।

থাক্ থাক্। ওমা তুই কত বড় হয়েছিস! কত ছোট দেখেছিলাম তোকে। কি বলুন বৌদি, প্রথম মাষ্টারী নিয়ে আপনাদের ওখানে যখন থাকতাম—তখন ওর বয়স পাঁচ ছ' বছরের বেশী হবে না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বস, বস, আমার পাশেই বস।

চোখে মুখে কথা হরিশকাকার। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন কল্পনার মুখের দিকে, ওর সন্ধানী দৃষ্টি ও যেন কি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বললেন কোথায় কি কাজ নিয়েছিস শুনলাম।

—হ্যাঁ, শান্তকণ্ঠে কল্পনা বললো চৌধুরী কোম্পানীতে।

—মাইনে ত বলতে গেলে কিছুই পাস না।

—এবার কিছু বেশী পাবো।

—আচ্ছা, তুই যা। কাপড় চোপড় ছাড়গে। কতদিন পরে তোকে দেখলাম। তোরা যে এতদিন এখানে আছিস তাও যদি জানতাম। ভাগ্যিস শিবুদার সঙ্গে আজ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।

রাত আটটা অবধি গল্প করলেন হরিশকাকা—ইট আর সিমেন্ট দিয়ে ঘেরা ছোট ঘরের পরিসীমার মধ্যে বন্দী এই পৃথিবীকে যেন এক নূতন জগতের বার্তা

শোনালেন হরিশকাকা। আলো বাতাসের রাজ্যের কথা, সুর ও সবল মানুষের যে পৃথিবী তার কথা। শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল কল্পনা আর শিবশংকরবাবু।

যাবার সময় আরও একটি কথা বলে গেলেন হরিশকাকা। বললেন—কথাটা আমার একটু আগেই মনে পড়লো শিবুদা—কল্পনাকে দেখবার পর। সিনেমা কোম্পানীতে চাকরী করি সিনেমার লাইনটা ওর পক্ষে সুখ প্রসপেক্টিভ হবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

—কি বলছো তুমি। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল শিবশংকরবাবুর মুখ।

—চাকরী যখন করতেই হবে তখন যাতে ভাল রোজগার হয় তাই দেখা ভাল, কল্পনা যদি সিনেমায় যায় তবে ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে পারি।

সিনেমায় নামবে? শিবশংকরবাবুর চোখের তারা দু'টী অন্ধ আক্রোশে কেঁপে উঠলো। সারা জীবনে একবার ও সিনেমায় যাননি তিনি, সিনেমাকে ঘৃণা করে এসেছেন সারা মন দিয়ে, সমস্ত আদর্শ দিয়ে। আজ অবস্থাবৈকল্যে দুদিনের সামনে পড়েছেন বলে মেয়েকে সিনেমায় পাঠিয়ে তার রোজগারে জীবনধারণ করবেন এতটা অমানুষ হতে এখনো বাকী আছে শিবশংকরবাবুর।

—অভিমানের প্রশ্ন নয় শিবুদা—আদর্শের প্রশ্ন ত উঠতেই পারে না। সিনেমায় যাওয়াটাই যদি অন্যায় হতো তবে তোমার সামনে এমন প্রস্তাব তুলতে আমিই লজ্জায় মরে যেতাম।

—তোমার আর আমার আদর্শে অনেক তফাৎ হরিশ, শিবশংকরবাবু কণ্ঠে পুরাণো শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তা হয় না হরিশ, হতে পারে না।

—আচ্ছা আমি তা হলে উঠি। হাসলেন হরিশকাকা; কল্পনার দিকে তাকিয়ে বললেন কিছু মনে করিসনে মা, তোদের অভাব বলেই প্রস্তাবটা করেছিলাম আমি। কলকাতায় ত রোজই যাস্, আমার বাসায় যাস। তোর কাকীমা খুবই খুসী হবেন তোকে দেখে।

পকেট থেকে নিজের নামের একটা কার্ড বার করে কল্পনার হাতে দিলেন হরিশকাকা।—আচ্ছা, চলি শিবুদা, চলি বৌদি। অভিমান করে নয় সাধারণভাবে কথাটা আপনি ভেবে দেখবেন। মুখার্জি এণ্ড কোম্পানীর কাজ থেকে এটা ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।

অপরিচিত স্বচ্ছল একটি পৃথিবীর বার্তা শুনিয়ে গেলেন হরিশকাকা। আচ্ছন্ন হয়ে গেল কল্পনার মন। যেন রূপকথার রাজ্য থেকে এখনো ফিরতে পারেনি সে। সুরঞ্জিতবাবুর কথাটা বলতেই ভুলে গেল বাবাকে।

সারারাত্রি বিনিদ্র কাটলো কল্পনার। একুশ বছরের ঘুমন্ত যৌবন আজ যেন হঠাৎ জেগে ওঠে মাথা তুলেছে। সিনেমায় গেলে আপত্তি কিসের বাবার, আপত্তি কেন? সিনেমা অভিনেত্রীর রোজগারের হিসেব মাসে মাসে তারও কানে এসেছে। বিনু, মনু পড়াশুনার জন্য তা'হলে আর ভাবতে হবে না। আর ব্যংগে বিধুর মুখ উলটে যাবে না। বলবে না—চাকলদার একদিনের রোজগার দিদি একমাসেও করতে পারে না।

পরদিনও সংকোচে বাবার কাছে প্রস্তাবটির পুনরাবৃত্তি করতে পারলো না কল্পনা। কি মনে করবেন বাবা, কি ভাববেন। আজীবন যে আদর্শকে নিষ্ঠার সংগে মনের মধ্যে পালন করেছেন, মেয়ের কাছে প্রথম আঘাত পাবেন—এ'কথা ভাবতেও কষ্ট হল কল্পনার। না, বাবা নিজে আলোচনা না তুললে এ'সম্পর্কে আর কিছুই বলা যাবে না।

—আমার বেতন অনেক বেড়ে গেল বাবা,-কল্পনা বললো। অবশ্য মাস দু'য়েকের জন্য।—বেড়েছে নাকি? শিবশংকরবাবু খুসী হয়ে উঠলেন,—কেমন করে বাড়লো।

কালকের ঘটনা আগাগোড়া খুলে বললো কল্পনা। তারপর বললে—বিনুকে একটু কঠোরভাবে শাসন করুন বাবা, মনুকেও। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত অন্ততঃ বাসায় হলেও বসে থাকুক।

শিবশংকরবাবু চুপ করে থাকেন, জীবনের অপরাহ্নে অসহ্য একটা ক্লান্তি এসেছে মনে, ছায়া ছায়া মনে হয়

ছেলেপুলে, সংসার, রাশ টেনে ধরার শক্তি বোধ করেন না নিজের মধ্যে। তুই নিজে যা পারিস্ কর। শেষ পর্যন্ত বলেন তিনি,—তোর উপর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই আমি।

আমি পারবো কেন? কল্পনা হাসলো। তুমি আমাকে একটু শক্তি দাও। আমি মেয়ে, আমার ভয় করে। বাবার কোলের কাছে সরে গেল সে।

ভয় করবে কেন? আমি ত আছি। তাই বোন গুলো অন্ততঃ মানুষ হতে পারে কিনা দেখ। আমি জীবনে কারও ক্ষতি করিনি—কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, মিথ্যার সংগে আপোষ করিনি। তবু আমার ছেলেরা কেন অমানুষ হবে—কেন ভেসে যাবে?

বাবার চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। চুপ করে দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন শিবশংকর বাবু।—একটা মেঘ কল্পনা—একটা মেঘে শুধু একটু ক্ষণের জন্য সূর্য্য ঢাকা পড়েছে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার আলো দেখতে পাবো আমরা।

আত্মবিশ্বাসের জলন্ত আগুনের ছোঁয়াচ যেন কল্পনার মনকেও ছুঁয়ে গেল।

আরও কয়েকদিন পরে সুরজিতবাবুর সংগে সম্পর্কটা যখন আরও অন্তরংগ হয়ে উঠেছে তখন একদিন হরিশ কাকার প্রস্তাবের কথা কল্পনা বললো সুরজিতবাবুকে। জানেন, আমার সিনেমায় যাবার কথা হচ্ছে।

—তাই নাকি। হাসলেন সুরজিতবাবু।—তা'হলে তারকা হয়ে যাচ্ছো বলো।

—অন্ততঃ সম্ভাবনা আছে। তাতে অন্ততঃ সংসারটা সহজভাবে চলবে।

—কেন এবার তো এখানেও বেশ ভাল বেতন পাবে।

—কিন্তু সে ত দু'মাসের জন্য। তারপর,

—তারপর আমি আছি। বলিষ্ঠ চোখের তারা দু'টী কল্পনার মুখের উপর এসে থমকে দাঁড়ালো। আমার উপর নির্ভর করো, বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করতে শেখো।

সহানুভূতির চেয়েও আর কিছু বেশী ছিল সুরজিত বাবুর দৃষ্টিতে—বুঝতে দেরী হল না কল্পনার। ওর একুশ বছরের যৌবন বুলিয়ে দিলো ওকে—বিস্মিত করে দিলো। সুরজিত বাবুর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় পেল কল্পনা—কি জানি আরও কি দেখা যাবে সেই চোখে।

—চলো, এখন একটু ঘুরে আসি। থাকতে ভাল লাগছে না।

—ঘুরে আসবো, প্রস্তাবের আকস্মিকতায় বিস্মিত হলো কল্পনা। আমাকে ত একখানি চিঠি এখনি টাইপ করতে হবে।

—ড্যাম ইট। চিঠি কালকে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না, চলো।

—আচ্ছা, চলুন। কল্পনার কণ্ঠ নিস্পৃহ।

তখনো ছুটী হতে ঘন্টাখানেক দেরী ছিল। আর অফিসে কল্পনাকে ফিরতে দিলেন না সুরজিতবাবু। ট্রাংক রোড ধরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গায় গাড়ীটা থামলো। সামনে অতল ছলছল গংগা কালো কালো ঢেউ শুধু চকচক করছে। জলের ধার ঘেঁসে এক জায়গায় বসলেন সুরজিতবাবু। এখানে বসো।

স্পষ্ট আহ্বান। বসলো কল্পনা। গংগার কালো ঢেউয়ের তালে তালে ওর হৃৎপিণ্ড কাঁপছে নিজের মনের রহস্য যেন গংগাকে ছাপিয়ে গেল।

—তুমি হয়তো সংকুচিত হচ্ছো—হয়তো ভয় পাচ্ছো আমাকে, কিন্তু তার কোন কারণ নেই।

—না, ভয় করবো কেন? কল্পনা সহজ হতে চেষ্টা করলো।

—সিনেমায় যাবে কেন? তোমার কিসের অভাব।

—অভাব আমার ত নয়, সংসারের। আমি না থাকলে সবাইকে উপোস করে মরতে হবে।

—তোমাকে ভাল লেগেছে আমার। যদি সম্ভব হয় যেও না। তোমাকে বিদায় দিতে কষ্ট হবে আমার।

সুরজিতের চোখের দৃষ্টি ম্লান অথচ মিষ্টি হয়ে উঠেছে,

ঠিক মনের তারে গিয়ে যেন ঝংকার তুলছে কল্পনার। এত মিষ্টি কথা, এমন দরদভরা দৃষ্টি অনেকদিন দেখেনি কল্পনা।

অনেকক্ষণ বসে রইলো দুজনে গংগার কালো জলের উপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এলো ধীরে ধীরে। চুপ—নিথর নিস্তব্ধ মন দুজনের। কথা নেই, কথা ফুরিয়ে গেছে।

—চলো উঠি, কল্পনার হাতটি তুলে তাতে মৃদু একটি চাপ দিলেন সুরঞ্জিতবাবু। রাত হলো।

ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো কল্পনার। আজকের নূতন অভিজ্ঞতার নূতন আবিষ্কারের রং হয়তো ওর মুখের উপর এখনো লেগে আছে, বাবা যদি তা ধরে ফেলেন। যদি প্রশ্ন করেন কি জবাব দেবে কল্পনা। ভাল লেগেছে সুরঞ্জিতবাবুকে—একটি কল্পনার রঙে মনের মধ্যে জাল বুনতে লাগলো সে।

বাসায় ফিরে দেখলো গোলমাল চেঁচামেচি চলছে—মা মন্নুকে বকছেন।

—কি হলো? কল্পনা জিজ্ঞেস করলো।

—বিনু এখনো ফেরেনি। মা বললেন। মন্নু বলছে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে বিনুকে।

—ধরে নিয়ে গেছে। কারা? কেন? অনেকগুলি প্রশ্ন ভীড় করে এলো কল্পনার মুখে।

কোন জবাব নেই। মা জানে, মন্নু জানে হয়তো বাবাও শুনেছে এতক্ষণে কেউ কোন কিছু বলছে না। বলবার কিছু নেই, কল্পনা ঠিক জেনেছে চুরিতে ধরা পড়েছে—মার খাচ্ছে পথে।

দাঁতে দাঁতে চেপে গেল কল্পনার। মন্নুকে ধরে ঠাস্ করে একটা চড় মারলো সে। কাল থেকে বাসা থেকে বেরুবি ত খুন করে ফেলবো একেবারে। আগামী সপ্তাহে ভর্তি করে দেব স্কুলে।

বেশ খানিকটা রাত করে ফিরলো বিনু। তেমন কিছু হয়নি, কপালের কাছে খানিকটা কেটে গেছে শুধু। রান্নাঘরে এসে হাসি মুখে বললো খেতে দাও মা।

—এত রাত হলো কেন? মার বদলে কল্পনাই জিজ্ঞেস করলো। কপাল কেটে গেল কি করে?

—ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

—মিথ্যে কথা বলিস না। তোকে নাকি কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল—ধরে মেরেছে?

চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো বিনুর। কল্পনার বয়স একুশ হলে কি হবে, আঠারোয় পা দিয়েছে বিনু। বললে—কি বললি দিদি। তুই রোজগার করিস—বেশ ত চমৎকার শাড়ী আর জুতো পরে অফিস চলে যাস্। আমাদের কি আছে? ভাল খেতে পাই—পরতে পাই? তুই এমন মুরুব্বি চালে কথা বলিস কেন?

—তোর বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে বিনু। রাগে ফেটে পড়ে কল্পনা।

—বাড়াবাড়ি নয়, তুই আরামে আছিস, স্ফূর্তি করে ঘুরে বেড়াস—তোর কি, হ্যাঁ, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। রোজগার না করলে সংসার চলবে কি করে, আমি বেঁচে থাকতে আমার ছোট ভাই বোনদের উপোস করে মরতে দেব না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনু। অন্যায় করেও ভেংগে পড়ছে না, অন্যায়কে স্বীকার করে নিয়েছে।

আমি চোর—কর ঝর করে কেঁদে ফেললো বিনু। দিনরাত গালাগালি করছিস্ আমাকে, হাঁ চুরি করে বেঁচে থাকবো আমি, বাঁচাবো সবাইকে, মরতে আমি পারবো না।

চলে যাচ্ছিল বিনু—খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরলো কল্পনা। টেনে ওর মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিলো।—নিজের শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল বিনুকে।

আশা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে—ভবিষ্যত দিয়ে ভোলালো বিনুকে। দরকার নেই অন্যায় করে রোজগার করার। চঞ্চলবাবুর সংগে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করার। আমি ত আছি আমি তোর দিদি, আমার মাইনে বেড়েছে, তোদের সবাইকে চালাতে পারবো আমি। তুই স্কুলে ভর্তি হয়ে যা, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দে এবার। তারপর

...তারপর ভবিষ্যত রয়েছে তোর। চঞ্চলের তোর সংগে মিশবার যোগ্যতা আছে নাকি ?

ভাইবোন দু'জনে কাঁদলো—দু'জনে দু'জনের কাছে সান্ত্বনা খুঁজলো, আশ্রয় খুঁজলো—পরস্পরের কাছে পরস্পরকে অর্পণ করলো।

ওঘরে শিবশংকরবাবুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস এখান থেকেই শুনতে পেল কল্পনা। আশ্চর্য্য, এর সংগে সংগে মনে পড়ল হরিশকাকার কথা।

পরদিন, তার পরদিন আরও পরের দিন। সারা মনোবৃত্তি দু'টা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা সুরঞ্জিতবাবুর সংগ কামনা করে—মহানগরের পথে পথে ঘোরাটে বুইক গাড়ীর কোলে নিজেকে অর্পণ করে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনার রঙীন স্বপ্নের জাল বুনে—অকারণে হাসে, অকারণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে—একুশ বছরের দুরন্ত জোয়ারের ঢেউ সারা শরীরের উপর ভেংগে ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আরও একটা মন সকাল আটটায় অফিসে বেরোয়, নির্বিকার ভাবে কাজ করে যায়, মাসের শেষে আরও নির্বিকারভাবে টাকাটা মার হাতে তুলে দেয়। রাত্রে শিবশংকরবাবুর কোলের কাছে মাথা রেখে অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, মধু বিধুর সংগে ঝগড়া করে আনন্দ পেতে পারে অথবা অনু, মধু আর দীপুর পুতুল খেলার সাথী হতেও তার আপত্তি থাকে না। এই দু'টো ধারাকে বুকে করে, মনে মনে সেতু তৈরী করে জীবন ধারণ করছিল কল্পনা বলে একটি মেয়ে কিন্তু প্রথম বাদ সাধলেন সুরঞ্জিতবাবু। বললেন—কল্পনা, আমাদের বিয়ে হোক্।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের ঠাণ্ডা কক্ষেও ঘেমে উঠলো কল্পনা। একটু আগেও ছুরিটা নিয়ে যে হাতটা কাটলেটের উপর চেপে বসেছিল তাই একেবারে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল। সুরঞ্জিত বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কল্পনা।—আশ্চর্য হচ্ছো, ভাবছো বত্রিশ বছর বয়স হয়েও, অনেক টাকার আর অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েও সুরঞ্জিত চৌধুরী এখনো বিয়ে করেনি কেন ? কেন এতদিন পরে অপরিচিতা নিঃস্বজনা কল্পনা রায় বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে ? তাই ভাবছো, না ?

—না, কোন কিছুই ভাবতে পারছি না আমি।

—বিয়ে করা প্রয়োজন বোধ করিনি তা নয় কিন্তু আবিষ্কার করতে পারিনি সেই মেয়ে যাকে বিয়ে করতে পারি। প্রথম যেদিন তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম সেদিন তোমাকে দেখে দারুণ মনের তন্ত্রী বেজে উঠেছিল, মনে হয়েছিল এবার পেয়েছি। তোমার আপত্তি আছে কল্পনা ?

—হ্যাঁ, স্পষ্ট জবাব কল্পনার। সংসারের কথা ভাবছি আমি, মা বাবা ভাই বোন—তাদের ছাড়তে পারবো না। তাদের জীবনের বিনিময়ে নিজের সমৃদ্ধি চিনতে পারবো না আমি।

—ওসব, সেন্টিমেন্টালিটি ছাড়ো। নিজেকে অসুখী করার কোন মানে হয় না, মানে নেই, তোমার ভায়েরা বড় হয়েছে, তারা কিছু করতে পারবে, হয়তো আমিও কিছু সাহায্য করতে পারবো।

কল্পনা চুপ করে রইলো।

সেদিন নয় আর ও দু'তিন দিন পরে অত্যন্ত কুণ্ঠার সংগে বাবার কাছে কথাটি বললো কল্পনা। শিবশংকর-বাবু তাকালেন মেয়ের দিকে। স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওগো শুনছো কল্পনা কি বলছে ?

আশ্চর্য মা বাবার মন। কল্পনা ভেবেছিল এরা দুঃখিত হবেন, বিষন্ন হবেন, সুরঞ্জিতকে প্রত্যাখান করার মত জোর পাবে কল্পনা মনে মনে কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে সংসার কি করে চলবে তাও ভাবলেন না। ছোটখাটো একটা উৎসব সুরু হয়ে গেল বাসার মধ্যে। সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে শিবশংকরবাবু বললেন—জানিস্ খোকা, তোর দিদির বিয়ে।

—আমাকে কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। বাবা খানিকটা আপত্তি করুক এটাই যেন কল্পনা কামনা করে। তাহলে সংসার চলবে কি করে ?

(৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা :—

ভারতের ফুটবল খেলার প্রধান প্রতিযোগিতার 'সন্তোষ স্মৃতি ট্রফির' খেলা গত ২৭শে আগষ্ট শেষ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাছাই করা দল এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও বাঙ্গলা দল উপর্যুপরি তিন বৎসর জয়লাভ করিয়া বাঙ্গলার ফুটবল আজও যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। গত ১৯৬১ সাল হইতে এই প্রতিযোগিতা সাত বার অনুষ্ঠিত হয় এবং বাঙ্গলা দল প্রতি বৎসরেই ফাইন্যালে উঠিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়া মোট পাঁচবার সন্তোষ ট্রফি লাভ করে।

বাঙ্গলা দল জয়লাভ করিলেও ফাইন্যালে হায়দ্রাবাদ দলের বিরুদ্ধে তাহারা যেরূপ অতিকষ্টে মাত্র ১-০ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়াছে তাহাতে সত্যই কোন প্রশংসার কার্য্য করিতে পারে নাই। শক্তিশালী বাঙ্গলা দল গত বৎসরেও ফাইন্যালে হায়দ্রাবাদ দলকে ৫-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু এ বৎসরে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কুশলী ফরোয়ার্ড লাইনের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য কোনক্রমে জয়লাভ করিয়াছে বলা চলে। হায়দ্রাবাদ দলের রক্ষণভাগ যেরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা দর্শকগণের মনে বহুদিন জাগরূক থাকিবেন।

ভারতের ফুটবলের মান ক্রমশঃ যে দ্রুত অবনতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহা যাহারা এ বৎসরের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় সকল প্রদেশের খেলা দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। ফুটবলের মান আজ যদি এমনি অপ্রতিহতভাবে অবনতির পথে আগাইয়া চলে তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলা তথা ভারতের ফুটবল যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। আজ তাই অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেসনকে এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পথ হইতে মুক্ত করিতে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও রানার্স আপ

বাঙ্গলা (৫) দিল্লী (১)

} প্রতিযোগিতা হয় নাই

দিল্লী (২) বাঙ্গলা (০)

বাঙ্গলা (১) বোম্বাই (০)

মহীশূর (১) (২) বাঙ্গলা (১) (১)

বাঙ্গলা (০) (১) বোম্বাই (০) (০)

প্রতিযোগিতা হয় নাই

বাঙ্গলা (৫) হায়দ্রাবাদ (০)

আই, এফ, এ, শীল্ড :—

কলিকাতার জনপ্রিয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অন্যতম আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা প্রায় শেষ হইতে চলিল। এই খেলা শেষ হইবার সাথে সাথে বাংলার ফুটবলের যবনিকা পড়িয়া যাইবে। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতায় একে একে বহিরাগত সকল দলই বিদায় লইয়াছে এখন অবশিষ্ট দলগুলির মধ্যে মোহিসেন দল জনপ্রিয় মোহনবাগান দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। অন্যদিকে রাজস্থান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ান দলের মধ্যে যাহারা অবলাভ করবে তাহাদের সহিত ইষ্টবেঙ্গল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। আমরা আগামীবারে আই, এফ, এ শীল্ড খেলার বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

ক্রিকেট :—

আগামী শীতে লেসলি এমসের নেতৃত্বে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসিতেছে। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তিশালী খেলোয়াড়দের দ্বারা গঠিত এই দলটির খেলা দেখিবার জন্য ভারতের অনাগত উৎসাহী দর্শকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। গত বৎসরের কমনওয়েলথ দল ভারতের নিকট পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান বৎসরে অধিক শক্তিশালী দল নির্বাচিত হওয়ায় খেলাগুলি আরও আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর দলটি বোম্বাইয়ে অবতরণ করিবে এবং ১লা অক্টোবর হইতেই খেলা সুরু হইবে।

বিভিন্ন টেষ্ট খেলার তালিকা

৪ঠা হইতে ৮ই নভেম্বর—প্রথম টেষ্ট—দিল্লী

১লা ৫ই ডিসেম্বর—দ্বিতীয় „ —বোম্বাই

৩০শে „ ৩রা জানুয়ারী—তৃতীয় „ —কলিকাতা

১৯শে „ ২৩শে —চতুর্থ „ —মাদ্রাজ

৩রা ফেব্রুয়ারী ৭ই ফেব্রুয়ারী—পঞ্চম „ —কানপুর।

নিষ্প্রদীপ

(৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

—যেমন করে হোক চলবে। হরিশ বলেছে একটা কাজ যোগাড় করে দেবে আমাকে, তাছাড়া বিনুর পরীক্ষা হয়ে গেলে সে ও খানিকটা রোজগার করতে পারবে।

—আমাদের কথা ভেবে তোর অসুখী হবার কোন কারণ নেই। যা মীমাংসা করে দিতে চান সবকিছু অর্থ কথায়; সুরঞ্জিতের মত পাত্র পাওয়া যাবে না আর কোনদিন।

—আমি বিয়ে করবো না। কল্পনা শেষ চেষ্টা করলো।

—ওমা কি বলছিস? সস্নেহে ওর হাতটী নিজের মধ্যে টেনে নিলেন শিবশংকরবাবু। এখন কি আর ছেলেমানুষী করবার বয়স আছে। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস স্বামীর ঘর করতেই হবে। আমি আশীর্বাদ করছি এতে তোর ভাল হবে।

—কিন্তু তোমাদের?

—তোর যতখানি এবং যতদিন সাধ্য তুই করেছিস। তোর দায়িত্ব ফুরিয়েছে। তুই কেন চিন্তা করছিস। অন্যের উপকারের জন্যও নিজেকে অবহেলা করতে নেই কল্পনা।

আর কিছু বলবার খুঁজে পেলো না কল্পনা দরজার বাইরে চোখ মেলে দেখলো বিনু বসে বসে মেজের উপর আঁকজোক কাটছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কাশ্মীর ও ডিক্‌সনের ব্যর্থতা—

কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সংঘের তরফ হতে স্যার ওয়েন ডিক্‌সন মধ্যস্থরূপে এসেছিলেন। দিল্লী, শ্রীনগর ও করাচী নগরে কয়েকবার পুরাপেক্ষার পর ও ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করে, তিনি যুক্তরাষ্ট্র সংঘের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেছেন যে এই সমস্যার মীমাংসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করেছিলেন। তার ভিতর একটা প্রস্তাব ছিল যে কাশ্মীর রাজ্যের কতক অংশের অধিবাসীদের মনোভাব মোটামুটি জানা আছে। অধিবাসীদের সেই সুস্পষ্ট মনোভাব অনুসারে—সেই সেই অংশ সমূহ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে—অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীদের মনোভাব জানবার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করা হোক। ভারতবর্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত কিন্তু পাকিস্থান উহাতে রাজী হয় নি। এই প্রস্তাবের মর্মার্থ মোটামুটি এই দাঁড়াতো যে "আজাদ" কাশ্মীর নামে অভিহিত অংশ পাকিস্থানের অন্তর্গত হবে; জম্মু, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কাশ্মীর উপত্যকার গণভোট নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হতো।

ডিক্‌সন সাহেবের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল কোন অংশেই গণভোটের ব্যবস্থা না ক'রে—সরাসরি কাশ্মীর রাজ্য দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করা হোক। এই প্রস্তাবের বিষয়ে ডিক্‌সন সাহেব বলেছেন কাশ্মীর বিভাগ সম্বন্ধে ভারত বা পাকিস্থান কারুরই নীতিগত আপত্তি নেই। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রই মূল কাশ্মীর উপত্যকা দাবী করছিল। কাজেই সরাসরি কাশ্মীর বিভাগ কার্যকরি হয় নি। এর পর তৃতীয় পন্থা থাকে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে গণভোট নেওয়া। পূর্বেকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্যের কোন সম্ভাবনা ডিক্‌সন সাহেব পান নি। কাজেই ডিক্‌সন সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কাশ্মীরের ব্যাপারে মতের ঐক্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনা বর্তমান অবস্থায় নেই। কতকটা পরিতাপের সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু প্রস্তাব তিনিই করেছেন;—ভারত বা পাকিস্থানের তরফ হতে কোন প্রস্তাবই আসে নি। তবু পরিশেষে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে হয়ত কোনদিন উভয় রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে—এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। অবশ্য তাঁর এই আশা প্রকাশ—নিতান্তই সৌজন্য সূচক; এর পিছনে কোন বাস্তব সত্য নেই

উভয় রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্ক—

ডিক্‌সন সাহেবের এই বিবৃতির পর দিনই পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলি খাঁ এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা উপলক্ষে তিনি মোটামুটি ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক ঐ বৈঠকে আলোচনা করেছেন। ডিক্‌সন সাহেবের ব্যর্থতার জন্য তিনি ভারতবর্ষকেই বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। পরদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান বিষয়ে ভারতবর্ষের তরফের কথা বলেছেন। জনাব লিয়াকত আলি খাঁর উক্তিতে ভারত সম্বন্ধে কিছু কিছু কটূক্তি ও অভিযোগ করা হয়েছে; তিনি প্রকারান্তরে এমন কথাও বলেছেন যে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠান পরোক্ষ আক্রমণের সমান এবং এই অপরাধের

প্রতিবিধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সংঘ যাতে অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তার জন্য কতকটা অসহিষ্ণু ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতঃই এ প্রসংগে মনে হবে কোরিয়াতে যুক্তরাষ্ট্র সংঘ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে কাশ্মীরেও সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত জনাব লিয়াকত আলি করেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে জনাব লিয়াকত আলি ভারত পাকিস্থান সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যাহাই হোক না কেন —অন্যান্য ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপক সম্পর্কের ও মনোভাবের ব্যতিক্রমের কোন আশঙ্কা তিনি দেখেন না। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের যথেষ্ট তারিফ করেছেন। সেখানকার শাসনযন্ত্রের যে কোন ত্রুটি আছে, তা তিনি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন।

পরদিন পণ্ডিত নেহেরু যে সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন, তাতে জনাব লিয়াকত আলি খাঁর অনেক অভিযোগ ও উক্তির তিনি জবাব দিয়েছেন। তিনিও বলেছেন—তিনি আশা করেন, কাশ্মীর সমস্যার উপলক্ষ্য নিয়ে অন্যান্য বিষয়ে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্কের কোন ব্যতিক্রম হবে না। অন্যান্য ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক বলতে দুই প্রধান মন্ত্রী কি মনে করেছেন, তা আমাদের পক্ষে সঠিক বলা মুস্কিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে কয়টি সমস্যা আছে তার মধ্যে—এক এক করে হিসাব করা যাক। পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বহুদিন যাবৎ মতদ্বৈধ চলে আসছে। এখন পর্যন্ত তার মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যায় নি। দ্বিতীয় সমস্যা হল পাঞ্জাবের নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে। তারও মীমাংসার এখন পর্যন্ত কোন লক্ষণ নেই। উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রা বিনিময় নিয়ে যে বিরোধ চলছে, তারও আশু সমাধানের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে—এপ্রিল মাসের চুক্তির নাম করে তাকে কতকটা ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে সত্য; তার কোন সত্যিকার মীমাংসা হয়েছে এমন কথা আজও বলা চলে না। তার উপর কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাকিস্থানের তরফ হতে যেরূপ হুমকি বার বার দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষও কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেকটা দৃঢ় সংকল্প। কাজেই উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক মৈত্রীর পথে চলবার কোন সম্ভাবনা নেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এই বিরোধের ফলে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ট উভয় রাষ্ট্রের তরফ হতে বার বার সংখ্যালঘুদের আশ্বাস ও ভরসা দেওয়া হচ্ছে। এ যেন দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষায়— "কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হয়।" সংখ্যালঘুদের পক্ষে এ অবস্থা যে মোটেই নিরাপদ নয়— তাহা বলা বাহুল্য। তাদের মর্যাদা বোধের কথা না হয় বাদই দিলাম। উভয় বাংলার সংখ্যা লঘিষ্ঠদের এ অবস্থা সম্বন্ধে আজ অবহিত হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে অবহিত হওয়া দরকার উভয় বাংলার সংখ্যা-গরিষ্ঠদেরও।

উভয় বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের যুক্ত বিবৃতি—

ভারতের স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ বাংলা বিভক্ত হয়েছে। অথচ প্রাচীন কাল হতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলার একটা বিশেষ সংহত ভাব ছিল। পাঞ্জাবের-ও কতকটা ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ছিল; আর সব প্রদেশই মোটামুটি ইংরাজের শাসন কাজের তাগিদে তৈরি। ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক হতে বাংলার একটা স্বাতন্ত্র্য বরাবরই ছিল। তারপর ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রতি অন্তরঙ্গ ও ঐক্যভাব অনুভব করত—যা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ছিল না এবং নেই। তারপর এল রাজনৈতিক উন্মত্ততা,— তার বশে আমরা পরস্পরকে আঘাত করেছি এবং ঘুরে ঠেলে দিয়েছি। গত চৈত্র বৈশাখ মাসে এই উন্মত্ততা চরমে উঠেছিল; লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান গৃহ ছাড়া উদ্বাস্তু হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এত বড় দুর্যোগের সামনে একেবারে মুহ্যমান না হয়ে বাংলার প্রতিভা যে নূতন পথের সন্ধানে প্রয়াস করছে—এটা খুবই আশার কথা।

এর প্রথম নিদর্শন আমরা দেখতে পাই রঙ্গমনসিংহের সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমাবেশে। যখন কোন দিকেই আশার রেশ-ও দেখা যাচ্ছিল না, তখন পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় এই সমাবেশে পূর্ব বাংলার নাগরিক হিসাবে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নিজেদের দাবী উপস্থিত করে। কতিপয় ছদ্মবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় যে সাময়িক উন্মত্ততা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল—তাকেই স্থায়ী অবস্থা বলে গ্রহণ না করে, ঐ সমাবেশে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নিজের দাবী ও ইজ্জত সহ পূর্ণনাগরিক অধিকারে ওখানে বাস করবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র বাসগুপ্ত, শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীমনোরঞ্জন ধর প্রভৃতি নেতৃবর্গ ঐ সমাবেশের উদ্যোগ ক'রে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

এর পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতৃবর্গ কলিকাতায় কয়েকবার ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। এই আলোচনা-আলোচনার ফলে তাঁদের অনেকের স্বাক্ষরে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ যে একই, তাদের দাবী যে একই, এবং তাদের উদ্দেশ্য-ও যে একই, তা ঐ বিবৃতিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। ঐ বিবৃতিতে খুব নূতন কথা বিশেষ কিছু নেই; এই বিবৃতির বৈশিষ্ট্য হল মনোভাবে ও দৃষ্টিকোণে;—যে মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ এতদিন সাময়িক উত্তেজনার চাপা পড়েছিল, সেই মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ যে আবার ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে—এটাই আনন্দের। উভয় সম্প্রদায়ের যে সব নেতা সাহস ক'রে একযোগে এই নবচেতনার বাহক হয়েছেন—তাঁরা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

সংখ্যালঘিষ্ঠরা পূর্ণনাগরিক অধিকার নিয়ে ওখানে বাস করবে, তার জন্য যা যা দরকার, তা-ই ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছে। গত দাঙ্গায় যা এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার বা জুলুম করেছে বা করবে—তাদের যথাযোগ্য শাস্তির দাবী করা হয়েছে; গত দাঙ্গায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে—তাদের ক্ষতিপূরণ ক'রে পুনর্বসতির ব্যবস্থার দাবী এতে আছে। কোন সরকারী কর্মচারী যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি কর্তব্যে ত্রুটি ক'রে থাকে, তবে তার শাস্তির দাবী-ও করা হয়েছে। যে অঞ্চলে লঘিষ্ঠদের উপর কোন জুলুম বা অত্যাচার হবে—সে অঞ্চলের সরকারী কর্মচারী, সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রভৃতিকে এর জন্য দায়ী করতে হবে। আরও বলা হয়েছে যে আনসারদের মতো কোন সাম্প্রদায়িক অর্দ্ধসামরিক সংঘ থাকতে পারবে না; সরকারী কাজ-কর্মে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, শিক্ষায়, অর্থ-ব্যবস্থায়, সামাজিক অধিকারে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্য থাকবে না। আগ্নেয় অস্ত্রের সনদ বা লাইসেন্স সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিকট হতে যা প্রত্যাহার করা হয়েছে—তা আবার তাদের দিতে হবে। এমনি ২০টি দাবী ঐ বিবৃতিতে করা হয়েছে।

উভয় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যে সব লোক অপর বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য খুব উৎসাহী—ঐ বিবৃতির প্রতি তাদের দৃষ্টি বিশেষ ক'রে আহ্বান করি। তাদের এটা অনুধাবন করা দরকার যে এক বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের হানি হ'লে অপর বাংলার সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও স্বার্থের হানি হবে। এই ইঙ্গিত-ই বিশেষভাবে ঐ বিবৃতি দিচ্ছে। ঐ বিবৃতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—উভয় বাংলার স্বার্থ এক সূত্রে গাঁথা। এই একত্ববোধ যদি আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে, তবে আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বিভক্ত বাংলার অন্তর থেকে এক নূতন বাণী উঠবে—যা সমগ্র ভারত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে বাধ্য হবে। বাংলার অতীত হ'তে আমাদের মনে যে গৌরব ছিল, আশা করি, বাংলার ভবিষ্যৎ সেই গৌরববোধকে আর-ও প্রবল করবে।

পূর্ববাংলার গভর্ণরের ভাষণ :—

পূর্ব বাংলার গভর্ণর জনাব ফিরোজ খান নুন বরিশাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের দাঙ্গার বরিশাল বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ১৯০৫ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বাংলাদেশে ও পরে সমগ্র ভারতে তীব্র হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বরিশাল জেলায় কোন উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তা এতকাল বলবৎ ছিল ; বঙ্গ বিভাগের পর হয়ত তার প্রভাব অনেকটা মৃদু হয়ে গিয়েছে। তাই এ'বছর বরিশালে এই দাঙ্গা সম্ভবপর হয়েছিল। গত চৈত্র বৈশাখ মাসে বরিশালে যে সব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, অন্যান্য জেলার তুলনায় তা অনেক গুরুতর। বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পর্কে এই ব্যাপার নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে। দাঙ্গা বিধ্বস্ত অন্যান্য অঞ্চলের কর্মচারীরা প্রায় সবাই অনেকদিন পূর্বেই স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলির দাবী বহুবার ওঠা সত্ত্বেও, তিনি এখন পর্যন্ত-ও সেখানে আছেন। শোনা যাচ্ছে তার বদলির হুকুম মাস দুই পূর্বে হয়েছে এবং তার পরিবর্তে যিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন বলে নির্দ্ধারিত হয়েছেন, তিনিও নাকি বরিশালে গিয়ে বসে আছেন। অথচ সেই দাঙ্গাকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এখন ও সেই খানেই রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় গভর্ণর সাহেবের বরিশাল পরিদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পূর্বে ডাঃ মালেক ও শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। ডাঃ মালেক ওখানকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। সজ্জন ও স্পষ্টবক্তা বলে ডাঃ মালেকের বরাবরই খ্যাতি ছিল। ওখানকার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয়ে যে তিনি নিজের মনোভাব স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করবেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জনাব ফিরোজ খান্ নুনের তেমন কোন খ্যাতি ছিল না। বরং উগ্রপ্রকৃতির সাম্প্রদায়িক বলেই তাঁর খ্যাতি ছিল।

বরিশালে তাঁর পরিদর্শনের সময় তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছেন, তাতে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের নিকট কতকটা আনন্দদায়ক ও বিস্ময়জনক। তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে যে আশ্বাস ও ভরসা দিয়েছেন এবং অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সত্যই আশাপ্রদ। যদি পূর্ব বাংলার সরকার তাঁর ভাষণের ঐ সব নীতি অনুসারে চালিত হয়, তাহলে শুধু পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার সমস্যা নয়, ভারত ও পাকিস্থান সমস্যারও অনেকটা মীমাংসা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু উৎসাদিত হলে, পূর্ব বাংলা সরকার এবং পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। আশা করি, গভর্ণর সাহেবের এই ভাষণের পর বরিশালের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা অনেকটা সহজ হবে। কিন্তু নীতিকে কার্যে পরিণত করার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

বাংলার কংগ্রেসের নির্বাচন :—

বাংলার কংগ্রেসের নির্বাচন প্রহসন শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। হঠাৎ কংগ্রেসের উর্দ্ধতম কার্য্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করলেন, বাংলার কংগ্রেস নির্বাচন তাঁদের নিজেদের হাতে না নিলে কিছুতেই তা শেষ হবে না। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত করার পক্ষে কি যুক্তি তাদের ছিল, বাইরের কেউ জানে না। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই বাংলার কংগ্রেসের নির্বাচন শেষ করতে পারত—কিন্তু প্রতি পদে পদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস হতে সেই কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। তারপর তিন চার মাস পর্য্যন্ত চলল উভয় বঙ্গের দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তুর ভিড়। ঠিক সেই অবস্থায় কংগ্রেসের নির্বাচন কার্য্য হতে পারে বলে, কেউ হয়ত বলবে না। কিন্তু জুন-জুলাই মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসের নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারত এবং রাজীও ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ তাদের না দিয়ে, হঠাৎ কার্যকরী সমিতি নিজ তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কার্য্য চালাবার দায়িত্ব নিলেন।

পরবর্তী ঘটনা হতে একথা অনুমান করা চলে যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি নিয়েই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ঐ সিদ্ধান্ত করেছিল। প্রথম এই কাজের ভার নিয়ে এলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃপালনী। তিনি যে ভাবে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন সম্পন্ন করলেন, তাতে বহু প্রতিবাদ এবং আপত্তি উঠল। এই সব প্রতিবাদ একদিকে রূপ গ্রহণ করল কংগ্রেসের কার্যকরি সমিতির নিকট নালিশ দায়ের করায়; অপরদিকে তা প্রকাশ পেল হাইকোর্ট ও কয়েকটি নিম্ন আদালতে অনেকগুলি মামলা দায়ের করায়। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তার সাধারণ সম্পাদকের কার্যাবলী সমর্থন করতে না পেরে, পশ্চিম বাঙ্গালার নির্বাচনের দায়িত্ব হতে তাঁকে অব্যাহতি দেন। তারপর কার্যকরী সমিতি তিন জন প্রতিনিধিকে বাঙ্গালার নির্বাচনের ভার দিয়ে পাঠান। যে তিন ব্যক্তিকে পাঠানো হয়, এই গুরু দায়িত্ব বহনের মতো তাঁদের ব্যক্তিত্ব, বয়স এবং কংগ্রেস কর্মী হিসাবে খ্যাতি নেই; নৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডের কথা না হয় বাদই দিলাম দ্বিতীয়তঃ কার্যকরী সমিতির কোন কোন সদস্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এমনই লোক উপযোগী হবে, এই মনে করেই হয়ত এঁদের মনোনয়ন করা হয়েছিল।

কার্যকরী সমিতির যে প্রস্তাবের বলে এঁরা নিযুক্ত হলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে "বাংলা, অন্ধ্র ও রাজস্থানে প্রাথমিক পঞ্চায়েত ও কংগ্রেস প্রতিনিধি ব্যাপারে পুনর্নির্বাচন হবে যদি কার্যকরী সমিতির প্রতিনিধিগণ মনে করেন যে পুনর্নির্বাচন হওয়া দরকার।"

(In case of Bengal, Andhra and Rajasthan re-election of Primary Panchayats as well as delegates should be held provided the representative or representatives sent in this behalf by the Working Committee hold that such re-election should be held). এই প্রস্তাবের ভিতর কোথাও এমন কথা নেই যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের মৌলিক ও গঠনতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে এই নির্বাচন করার অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির। কিন্তু এই প্রতিনিধি-ত্রয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমস্ত ক্ষমতা নিজের অধিকার করে নিজেদের খুসীমতো নির্বাচন কার্য্য চালান। শুধু তাই নয়, নিজেরাই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হলেন এবং নির্বাচনের পর ঐ সম্বন্ধে অভিযোগ শোনবার বিচারকও নিজেরাই হলেন। যদিও অভিযোগ শোনবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দ্বারা গঠিত একটি ট্রিবিউন্যাল বা বিচারক-কমিটি বহুদিন পূর্বে স্থাপিত হয়েছে।

এ ভিন্ন গ্রামে গ্রামে নির্বাচনের সময় সরকারি প্রভাব প্রতিপত্তির যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সব বিভিন্ন ঘটনার যোগাযোগে বাংলার কংগ্রেস আজ মন্ত্রিমণ্ডলীদের অধিকারে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীবিজয় সিং নাহার পর্যায়ক্রমে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। প্রত্যেক নির্বাচনেই কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়; নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অভিযোগ ও নালিশ ওঠে। এই নির্বাচন নিয়েও নির্বাচনের সময় তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, এবং নির্বাচনের পর নালিশ এবং অভিযোগও বহু উঠেছে। হয়ত এর জের আরও কিছুদিন চলবে। এ সব অভিযোগের বিচারে কি দাঁড়াবে—জানি না। ইতিমধ্যে আমরা আশা করব যে কংগ্রেসের নূতন কর্মকর্তাগণ কংগ্রেসের সংগঠনকে বাঙ্গালায় জনপ্রিয় ও কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস দল নির্বিশেষে তাঁরা সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করবেন।

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন :—

নাসিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন—বাবু পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন, আচার্য্য কৃপালানি এবং শ্রীশঙ্কর রাও দেও। ছয়টি ভোটের ব্যতিক্রম হলে হয়ত টেণ্ডনজী জয়লাভ করতে পারতেন না। এ থেকে বোঝা

যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিরকম তীব্র হয়েছিল।

এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল এই তিনজন প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কার্যতঃ সর্দার বল্লভভাই পেটেল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সবাই জানত যে টেণ্ডনজী সর্দার বল্লভভাই পেটেলের মনোনীত এবং পণ্ডিতজী তাঁর ঘোরতর বিরোধী। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে টেণ্ডনজী সভাপতি নির্বাচিত হলে তিনি কার্যকরী সমিতিতে থাকবেন না। সর্দারজীর মনোভাব যেমন তাঁর মনোনীত প্রার্থী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছিল, পণ্ডিতজীর মনোভাব তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। প্রথমে সবাই জানত শঙ্কর রাও দেও পণ্ডিতজীর মনোনীত প্রার্থী। কিন্তু নির্বাচনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ শোনা গেল আচার্য কৃপালনী তাঁর মনোনীত প্রার্থী। হঠাৎ এইভাবে যদি পণ্ডিতজী মত ও মন পরিবর্তন না করতেন, তবে হয়তঃ পণ্ডিতজীর প্রার্থি এভাবে পরাজিত হত না। হঠাৎ যখন পণ্ডিতজি তাঁর সমর্থন শঙ্কর রাও থেকে সরিয়ে নিলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল শঙ্কর রাওকে বলে সরে দাঁড়াতে রাজি করানো। তা না করে, তিনি নিজের ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করেছেন।

সে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে হয়ত ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির হতে পারে। পণ্ডিতজী ইতিমধ্যে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাতে তিনি এই সভাপতি নির্বাচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সত্যিভাবে বিচার করলে যে পরিস্থিতিতে টেণ্ডনজি নির্বাচিত হয়েছেন, তাতে বলা চলে যে এই নির্বাচন পণ্ডিতজীর পরাজয়। যে ভাবে ঘটনা বিস্তার লাভ করছে, তাতে নাসিক কংগ্রেস কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধিবেশন বলে বিবেচিত হয়ে থাকবে।

আজ তিন বৎসর হল দেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কোন বিষয়েই কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখাতে পারে নি। এর কারণ কতকটা অবস্থা-গতিক এবং কতকটা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটির জন্য। আবার এই আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটির জন্য অনেকটা দায়ী কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষদের মতের অস্থিরতা বা অনিশ্চিয়তা। যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের আছে তার প্রায় কোনটাতেই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্ট মত প্রকাশ এবং সুস্পষ্ট কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে নি। জয়পুর কংগ্রেসে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য বহু সাধু সঙ্কল্পসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল; কিন্তু তার কোনটাই কার্যে পরিণত করার কোনও প্রয়াস-ই হয় নাই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এখন দেশের শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কেবল লম্বা লম্বা প্রস্তাব পাশ করে শাসন কার্যে তাহা প্রতিফলিত করতে না পারলে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও যশের হানি অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয় (industrial) নীতির বিবৃতি ভারতীয় পার্লামেন্টে গ্রহণ করা হয়েছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কংগ্রেসের অর্থনৈতিক এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ সবই কেবল কাগজ-গত প্রস্তাব হয়ে রয়েছে। কংগ্রেস আজও যেন ঠিক করতে পারে নি, তার এতদিনকার প্রতিশ্রুত সামাজিক ও আর্থিক কার্যক্রমকে সে কতখানি কাজে পরিণত করবে এবং তার কতটা সে বর্জন করবে। বিপ্লবের এই সন্ধিক্ষণে চিন্তার এই প্রকার আড়ষ্টতা অত্যন্ত মারাত্মক ত্রুটি। এই তিন বছর যা চলছে, তাকে বলা চলে পণ্ডিতজীর ও সর্দারজীর মধ্যে সমন্বয় চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে কংগ্রেস কোন বিষয়েই মন স্থির করতে পারছে না।

এ কথা সুবিদিত যে বহু ব্যাপারেই পণ্ডিতজী ও সর্দারজীর মধ্যে মতের ঐক্য নেই। তার ফলে যা আমরা কথায় প্রকাশ করি, কার্যে তা নাকচ করে দিই ও নীতি হিসাবে যা গ্রহণ করি কার্য হিসাবে তা বর্জন করি। কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করা সাধু প্রচেষ্টা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐক্য রক্ষা করাই একটা

উদ্দেশ্য হতে পারে না; কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা হিসাবেই ঐক্যকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐক্য রাখতে গিয়ে যদি সেই উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করা হয়, তাহলে সে ঐক্য রক্ষার কোনও মূল্য নেই। আমরা মনে করি সর্দারজীর ও পণ্ডিতজীর মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা অর্থাৎ কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা আজ কংগ্রেসকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গা-চুরা, ছাড়াছাড়ি অনেকবার হয়েছে, তাতে কংগ্রেস দুর্বল হয় নি; এবারও যদি তেমনি কিছু ঘটে তাহলেও কংগ্রেস দুর্বল হবে বলে আমরা মনে করি না। বরং আমরা মনে করি—যে বিপ্লবের দায়িত্ব কংগ্রেস নিয়েছে, সেই বিপ্লবকে ঠিকমত পরিচালনা করতে হলে কংগ্রেসের ভিতর আজ বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বর্জন করে উহাকে একাগ্র ও একমুখী প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তোলা দরকার।

আসামের ভূমিকম্প

ভারতবর্ষের তৃতীয় স্বাধীনতা উৎসব দিবসে আসামে প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। যে অঞ্চল এই ভূমিকম্পের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে, তা সাধারণ লোকজন চলাচলের অনেকটা বাইরে। যাকে সাধারণতঃ আমরা সভ্য জগত বলি, এই অঞ্চলের অনেকখানি তারও বাইরে। তাই ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে তার ব্যাপকতা ও তীব্রতা সম্বন্ধে সঠিক খবর আমরা পাই নি। ভূমিকম্পের একমাস পরেও সমস্ত অবস্থার সঠিক খবর আমরা পেয়েছি বলে মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকদের মত এতবড় ভূকম্পন বহু বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে হয় নি। এই অঞ্চল খুব ঘন-বস্তি দেশ নয়; পাকা বাড়ীঘরের সংখ্যা তেমন নেই, ভূমিকম্পে বাড়ি পতনের ফলে সাধারণতঃ লোক চাপা পড়ে মারা যায় এবং ভূমিকম্প হয়েছে কতকটা দিবাভাগে। এই সব কারণে এই ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী হয়তঃ হয় নি। বিহার বা বে কোন ভূমিকম্পে যে রকম প্রাণহানি হয়েছিল আসামে সে তুলনায় প্রাণহানি অনেক কম হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় কিঞ্চিত অধিক চারশত লোকের মৃত্যু হয়েছে।

ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব। মিশমি, আবর প্রভৃতি উপজাতীয়দের সম্পত্তি বলে বিশেষ কিছু নেই। তবুও ঐ অঞ্চলে যে সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হবে। দরিদ্র অঞ্চলের পক্ষে এই ক্ষতি অতি গুরুতর।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার হল যে আসামের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত ভূখণ্ডের একটা প্রাকৃতিক পরিবর্তন এই ভূমিকম্পের ফলে আশঙ্কিত হয়েছে। প্রথমদিন ভূমিকম্পের পর প্রায় একমাস পর্যন্ত ছোটখাটো কম্পন প্রায় প্রত্যহই অনুভূত হচ্ছিল। উত্তর লখিমপুর, বালিয়া, মার্গেরিটা এবং আরও উত্তর-পূর্ব কোণে এমনি বহু পরিবর্তনের সূচনা অনেক দেখা দিয়েছে। অনেক নদী নদী হঠাৎ স্রোতস্বতী হয়ে উঠেছে। ঐ অঞ্চলের রাস্তাঘাট এমনি বিরল। ডিহাং, ডেম্বা, লোহিত প্রভৃতি নদীতে বন্যা সুরু হয়েছে। বাঘ, বানর এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর মৃতদেহ বন্যার স্রোতে পাহাড় অঞ্চল থেকে ভেসে নামছে। আসামের প্রধান রাস্তা ট্রাঙ্ক রোড নানা জায়গায় ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে এবং ১২।১৪ মাইল রাস্তা জলের নীচে প্লাবিত হয়েছে।

এতবড় দুর্যোগের সমগ্র ভার বহন করা দরিদ্র আসামের পক্ষে কঠিন অথবা অসম্ভব। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পেটেল আসামের সাহায্যের জন্য সমগ্র ভারতের নিকট আবেদন করেছেন। আশাকরি সমগ্র ভারত আসামের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে। এই বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গলার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। আসামের নিকটতম প্রদেশ হল পশ্চিম বাঙ্গলা। ভাষা এবং কৃষ্টিগত সংযোগও বাঙ্গলার সাথে আসামের সবচেয়ে বেশী। বাঙ্গলার মুখ্যসচীব

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিস্তৃত অঞ্চলে ঔষধপত্র ও ডাক্তার পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। আশাকরি বাংলা হতে যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক আসামে গিয়ে সেবা কাজের দায়িত্ব নিবে। আসাম ও বাংলার মধ্যে বর্তমানে যে মনোমালিন্যের ভাব চলছে তা উভয় প্রদেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবস্থায় বাঙালি যুবকগণ তাদের অকুণ্ঠ সেবাদ্বারা যাতে আসাম ও বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করতে পারে, তার চেষ্টা তাদের করা উচিত। বাঙালির পক্ষে অর্থ সাহায্য করার খুব বেশী সামর্থ্য আছে বলে মনে হয় না। জনবলের দিক দিয়ে বাংলা এক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে; সেবাকার্যে বাঙালি যুবকদের বহুদিন যাবতই খ্যাতি আছে আশাকরি সেই খ্যাতি আসামের দুর্যোগের মধ্যেও থাকবে।

বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা

গত এপ্রিল মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল বহুবার বলেছেন যে পূর্ব বাংলা থেকে যত সংখ্যক উদ্বাস্তু আসুক ভারত সরকার তাদের পুনর্বসতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তখন পূর্ব বাংলার অবস্থা যা ছিল তাতে যে কোন অবস্থাতেই ওখানকার হিন্দু অধিবাসীরা চলে আসার জন্য উদগ্রীব ছিল। পণ্ডিতজীর উপরোক্ত আশ্বাস বাণীতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা হয়ত আরও কিছু বেড়েছে। কিন্তু এখানে এসে উদ্বাস্তুরা যে ব্যবস্থা ও ব্যবহার পেয়েছিল এবং পাচ্ছে তাতে পণ্ডিতজীর ঐ আশ্বাস বাণীর কোন মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না।

পূর্ববঙ্গ হতে আগত কতক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হলে, যদি তারা ফিরে যেত তবে খুবই সুখের বিষয় হত কিন্তু এরা ফিরে যাচ্ছে এখানকার অব্যবস্থায় কষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে। পূর্ব বাংলার বর্তমান অবস্থায় সেখানে গিয়ে যে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা বলা যায় না। আর আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে হিন্দুরা পূর্ব বাঙ্গালায় নিশ্চিন্তভাবে এবং সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে বাস করতে পারুক। কিন্তু পূর্ব বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থায় আমাদের এই কামনা পূরণ হবার বিশেষ সম্ভাবনা আমরা দেখি না। কাজেই এ বছরে যে ২০।২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে যে ভারতবর্ষে এসেছে তাদের পুনর্বসতি ভারতের পক্ষে গুরুতর সমস্যা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছিলেন। সেখানে তিনি যে সব উক্তি করেছেন তাতে মনে হয় তিনি এ সমস্যা সম্বন্ধে আন্তরিক ভাবে উদগ্রীব। আমরা জানি উদ্বাস্তুদের সমস্ত দাবী, এমনকি তাদের মোটা মুটি যুক্তিসংগত দাবিও, মেটানো ভারত সরকারের সাধ্যের অতীত কাজেই উদ্বাস্তুদের অসন্তোষ বিরক্তির ভাব সম্পূর্ণ দূর হবে—এমন আশা আমরা করি না। তবুও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এদের দাবী অনেকখানি মেটান যায় সরকারি নীতির অব্যবস্থা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অদূরদর্শিতা ও অসততা দূর করতে পারলে এই কাজ অনেকাংশে সহজ হতে পারে। আশা করি শ্রীঅজিত প্রসাদ সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মধ্যে মহিশুর, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশের, ত্রিপুরা অঞ্চল ও আন্দামান দ্বীপে বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

আন্দামান দ্বীপে বহুলক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু যাওয়া এটা আমরা সমর্থন করি। একটু চেষ্টা করলে ১০।১২ লক্ষ উদ্বাস্তুর ব্যবস্থা ওখানে সহজেই হতে পারে। তাতে ঐ দ্বীপসমূহ সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীর অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হতে পারে। বাঙ্গালী উপনিবেশীগণ নিজেদের ভাষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সেখানে বাস

করতে পারবে। কিন্তু ২৫।৩০ হাজার কি পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালীকে মহিশুরে বা হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া—আমরা মোটেই সমর্থন করি না। মহিশুরের কোনও একটা বিশেষ অঞ্চলে যদি এক চাপে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালীকে বসাবার ব্যবস্থা হতে পারত—তাতে আমাদের তেমন আপত্তি হয়ত হ'ত না। কারণ মহিশুরের প্রাকৃতিক আবেষ্টন অনেকাংশে পূর্ব্ব বাংলার সদৃশ। এবং এক চাপে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী কোনও একটা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারলে তারা তাদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারত। হায়দ্রাবাদের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বহুলাংশে পূর্ব্ব বাংলার আবহাওয়ার প্রায় বিপরীত। কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে সেখানে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত ভরসাহীন ব্যবস্থা বলে আমরা মনে করি।

সমস্ত দিক বিবেচনা করলে পূর্ব্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে আসামে, ছোটনাগপুরে এবং সরাইকালা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য অঞ্চলে। বাংলার সন্নিকটবর্ত্তী এই সব অঞ্চলে মোটামুটি লোকের বস্তি বিরল; প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনেকাংশে পূর্ব্ব বাংলার অনুরূপ এবং এই সব অঞ্চলে বাঙ্গালী অধিবাসী বহু আছে। আজ কোনও বিশেষ অভাব দাবীতে ঐ সব অঞ্চল যদি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের নিকট অবরুদ্ধ করে রাখা হয়, তবে সব দিক দিয়েই তাকে অন্যায় ব্যবস্থা বলতে হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্য্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ — ৩য়-সংখ্যা — [illegible]

ভারতী

ত্রয়োদশ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৫৭ | সপ্তম সংখ্যা

বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সঙ্কট

শ্রীহেমন্ত কুমার তরফদার

গত বারো বছর ধরে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে চলেছে। প্রথম মুসলিম-লীগ মন্ত্রিসভা, তার উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিয়াল্লিশ সালে ইংরাজের অত্যাচার, জলপ্লাবন, তারপর দুর্ভিক্ষ, মহামারী আবার দাঙ্গা, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, পাকিস্তান, সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা নিরাশ্রয়। গোটা বাঙ্গালী জাতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। অস্তিত্বের সংগ্রাম ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে উঠেছে। আজ বাঙ্গালীর আত্মস্থ হবার প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতির মধ্যে জাতির প্রাণ-শক্তির পরিচয়। তাই সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা এই আত্মস্থতার সাধনার একটা প্রয়োজনীয় অংশ।

অনেকের মনেই একটা উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বাঙ্গালী সমাজের একটা বড় অংশের সঙ্গে গোটা বাংলার সংস্কৃতিও নষ্ট হ'তে বসেছে। বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে। নষ্ট হ'তে বসেছে একথা যদি সত্য হয় তা হ'লে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমে জানতে হবে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি বস্তুটা কি। দারোয়ান ব্যাঙ্কের টাকা পাহারা দেয়, টাকার পরিমাণ বা কারেন্সী তত্ত্ব তার জানার প্রয়োজন নেই। বন্দুক হাতে সজাগ থাকলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু গানের সময় সুরের অবস্থান হচ্ছে কিনা তা বুঝতে হলে সুরের বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ আরো জানতে হবে এই সংস্কৃতির উৎপত্তির ইতিহাস—এর শক্তি কতখানি, কি কি আঘাতে একে সইতে হচ্ছে যার সঙ্গ করবার শক্তি এর আছে কি না অর্থাৎ জাতির উপর যত দুর্যোগই আসুক না কেন, এর নিজস্ব এমন কোন শক্তি আছে কি না যার দ্বারা এ টিকে থাকতে পারে মানুষের জীবন থেকে, সাধনা থেকে যে সংস্কৃতি তার প্রাণরস আহরণ করছে, সেটে তার বিনাশ হওয়ার কথা নয়। টবের রজনীগন্ধা অনেক সযত্নপোষে আগলে রাখতে হয়, স্বচ্ছন্দতার বনস্পতি নিরাকরণ ঝঞ্ঝার মধ্যে স্বকীয় শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে সুতরাং বুঝে দেখতে হবে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয়টা কি

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই কথা ওঠে সংস্কৃতি বস্তুটাই বা কি। কিন্তু সে আলোচনায় আমরা যাব না। সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুব কঠিন কাজ। কোন সংজ্ঞাই সর্বজন গ্রাহ্য হয় না, আবার কোন সংজ্ঞাই সর্বথা অগ্রাহ্যও হয় না। সেই জন্য অবতারণা করতে গেলেই তর্ক ওঠে। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে এ তর্ক প্রয়োজনীয় নয়। সংজ্ঞা ছেড়ে উপমার দিক থেকে এগোলে আমাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত

সহজ হ'তে পারে। সংস্কৃতি বা কালচার যাই হোক না কেন—এটা নিশ্চয় কোন স্থূল বস্তু নয়, এর রূপ আছে কিন্তু সেটা ভাবরূপ—যেমন ফুলকে ঘিরে থাকে তার সৌরভ। গোলাপ গাছের বীজ রয়েছে মাটির নীচে, সেখান থেকে রস টেনে নিয়ে সে বেড়ে উঠছে। তার কাণ্ডটা সবুজ হ'য়ে উঠলো, শাখা, প্রশাখা, পাতা গজালো, তারপর একদিন পাতার ফাঁকে দেখা গেল একটা কুঁড়ি। এই কুঁড়িটা গাছের কীর্তি। এই কীর্তি যেদিন সমগ্রভাবে ফুটে উঠলো রক্তিম সৌন্দর্যের আর অবর্ণনীয় সুগন্ধের মধ্যে নিজের ফুটে ওঠাটাকে অভ্রান্তভাবে ঘোষণা করলো, সেদিন বলা যেতে পারে গাছটার কালচার হয়েছে। ফুলটা তার কীর্তি, এর অবয়ব আছে, গঠন আছে, ওজন আছে, একে ল্যাবরেটরীতে নিয়ে পরীক্ষা করা চলে, বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু এই স্থূলবস্তুটিকে অবলম্বন ক'রে যে সৌন্দর্যের আবির্ভাব হ'লো সেটা একটা নিরবয়ব সত্তা, তার ওজন নেই তার কেমিষ্ট্রী নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে যে এই সৌন্দর্য বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। ফুলটা নেই কিন্তু তার সৌন্দর্যটা আছে, তাল তাল গোলাপী আভা ওয়াগণ ভর্তি হয়ে চলে আসছে—এমন ঘটনা কোথাও দেখা যাবে না। বরং সৌন্দর্য ছাড়াও ফুল হ'তে পারে কিন্তু ফুল ছাড়া সৌন্দর্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ সব কীর্তিরই কালচার থাকে না, কিন্তু কোন কালচারই কীর্তিহীন নয়।

এ যুক্তির মধ্যে যদি সত্যতা থাকে তা হ'লে মানতে হবে যে বাঙ্গালার বা অন্য যে কোন জাতের কালচারের সংজ্ঞা দিতে আমরা পারি বা না পারি, তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে বাধা হবে না যদি সে জাতের বিশিষ্ট কীর্তির স্থূলরূপগুলো আমাদের চোখের সামনে থাকে। এই পরীক্ষা-নীতি প্রয়োগ ক'রে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি বাঙ্গালা কালচার কি বা তার বৈশিষ্ট কি?

দুই একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ইংরেজী কালচার কি, তবে ইংরাজ দেখাবে তার ইতিহাস, মুক্তিস্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সাতশো বছরের বিচিত্র সংগ্রাম-মুখর ইতিহাস এবং সেই দুর্বার মুক্তি-সাধনার ফল (অন্ততঃ আংশিক ফল) তার ম্যাগনা কার্টা, তার পার্লিয়ামেণ্ট; ইংরাজ দেখাবে তার ভাষা—সাড়ে চার লক্ষ শব্দ-সম্বলিত সে বিশাল ভাষা সমুদ্রের এক অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান অধিকার ক'রে আছে তার অতুলনীয় মহাকাব্য, কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সাহিত্য—যে ভাষার ইতিহাস, গণিত, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানবজাতির ইতিহাসের সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে যেখানে উৎকৃষ্টতম যা কিছু লাভ করেছে সে সবের বিশাল সঞ্চয়; ইংরাজ দেখাবে তার (অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত) পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্য; আর দেখাবে তার ব্যক্তি-জীবনের স্বদেশপ্রীতি, মার্জিত রুচি, নিয়মানুবর্তিতা, সততা আর তার বড় বড় কল কারখানা, তার বাণিজ্য-তরী ও রণতরীর বহর। এই বিপুল বহুমুখন কীর্তি নিরন্তর বিচ্ছুরিত করে চলেছে যে মানসিক সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য, যে বলিষ্ঠ পৌরুষ, যে অদম্যনীয় অভীপ্সা—সেইটাই হচ্ছে ইংরেজী কালচার। মেরু থেকে মেরু অবধি এই কালচারের সুষমা ছাড়িয়ে গেছে ইউনিয়ন জ্যাকের সাথে সাথে। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেলেও কালচার টিকে আছে। এ কালচারের বনিয়াদ যদি হ'তো নিছক রণতরী তবে সেটা সম্ভব হ'তো না। রাজারাম চেঙ্গিস্ খাঁও করেছিলেন; সে রাজা কুবলা খাঁর সময় পর্যন্ত টিকে থাকে নাই, তার কালচার টিকেছিল আরও অল্প সময়।

জিজ্ঞাসা করা যাক কোন আমেরিকানকে তার কালচার কি। ইংরাজের এই কীর্তি-তালিকার অনেক-গুলি সেও দাখিল করবে। তার ওপর আছে তার নিগ্রো-দাসত্ব মোচনের গর্বোন্নত কাহিনী, তার নাগরিক অধিকারের সনদ (Bill of Rights), তার বিশাল বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, অতিকায় বন্দর। ফরাসী বলবে তার আছে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা" ত্রিমন্ত্রের সাধনায় রক্তকরা তান্ত্রিক তপস্যা, তার সৌন্দর্যপ্রীতি, নারীর প্রতি সম্মান। জার্মানের আছে কাব্যবীর্য, সমর-

নিপুণতা, সংগঠন কুশলতা, কর্তব্যকর্মে নিরলস নিপুণতা, উত্তুঙ্গ দার্শনিকতার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন বিষয়নিষ্ঠার অপূর্ব সমাবেশ—যার ফলে মাত্র দশ কোটী লোকের একটা জাতি বার বার গোটা পৃথিবীকে ত্রস্ত, শঙ্কিত, ও হতমান করে তুলেছে।...

কীর্তির স্তবকের মধ্য থেকে জাতির মানসিক সুস্বাস্থ্য এমনি পরিচয় আরো সন্ধান করা যাক অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে—রোমের আইন-শৃঙ্খলায়, গ্রীক মহাকাব্য ও ভাস্কর্যে, মিশরের মমি ও পিরামিডে। চার হাজার বছর আগে উত্তর ভারতের কোন আর্য-সন্তানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত তোমার কালচার কি, তিনি বলতেন 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' —এই মন্ত্রের উপলব্ধি। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম শুধু এইটুকু? আর নেই কিছু? তিনি হেসে বলতেন, এটা অবশ্য টুকু নয় কিন্তু আরও আছে; আছে আমার নিত্যকার প্রার্থনা:

সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ!

আমরা বলতাম কিন্তু এতে লাভ কি হ'লো? তিনি তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিতেন পরশ্রমজীবী-পরগাছা-হীন চাতুর্বর্ণ্য সমাজ—যে সমাজের নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনা করে চলেছে—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু—

আর যে সমাজের সাধারণজন বিনা বাধায় বিনা দ্বিধায় আপন স্বভাবসৃজিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে পূর্ণতম তৃপ্তির পথ অনুসরণ করছে।...

কালচারের এই মাপকাঠি এবার প্রয়োগ করা যাক বাঙালীর ওপর—অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে বর্তমানে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয় তার অধিবাসীদের উপর। এদের কীর্তির কাহিনী ঋগ্বেদের আমল থেকে উদ্ধার ক'রে দেখাবার মত পাণ্ডিত্য এই প্রবন্ধ লেখকের নেই। পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি বৈদিক সাহিত্যে বাঙালী সম্বন্ধে "বঙ্গাঃ পাপাঃ" "বঙ্গা পক্ষীণঃ" ইত্যাদি অসম্ভ্রমসূচক মন্তব্য আছে। তবে সে কথা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, হাজারখানেক বছরের পরিচয়ের মধ্যে আসা যাক। আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া বর্তমান মানবজাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য তার প্রায় সবগুলিরই সৃষ্টি এই হাজার বছরের মধ্যে হয়েছে। কিন্তু এ দীর্ঘ ইতিহাসের পথে-প্রান্তরে অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অন্বেষণ করে বাঙালীর কোন বিশাল সাম্রাজ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কোন উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের সন্ধান মিলছে না (আজও মেলে নাই অন্ততঃ) তুখারীদের ভূমি ব্রহ্মোত্তরের দলিল ছাড়া কোন সাহিত্যও বিশেষ হস্তগত হচ্ছে না। বাংলার চিত্রশিল্প একেবারে আমাদের সমসাময়িক কালের। দুই এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত ছাড়া বাংলার যা বিশুদ্ধ সঙ্গীত তার প্রায় সবখানিই উত্তর ভারতের সৃষ্টি। এমন কি শ্রীখোল এবং একতারা (বৈরাগীর অবলম্বন) ছাড়া কোন উচুদরের সুরযন্ত্র বাংলার মাটিতে জন্মেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের দ্বীপপুঞ্জের হিন্দু উপনিবেশ প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের কীর্তি। সিংহল-বিজয়ী বিজয়সিংহকে বাঙালী কবিরা তাঁদের সহোদর মনে করলেও, তিনি আসলে ছিলেন গুজরাটি। বাঙালীর এই অতীত ইতিহাসের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলীর পর্বত-কন্দরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিরন্তর সংগ্রামরত রাণা প্রতাপের কাহিনী নেই। অজানা দিগন্তের লুব্ধ ইসাবেল বিশ বছর ধরে ইউলিসিসের মত ঊর্মিমুখর সাগরবক্ষে ভেসে বেড়াবার গল্প নেই। অখ্যাত, অজ্ঞাত দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে উন্নত করার জন্য সিসিল রোডসের মত জীবনব্যাপী সাধনার আখ্যায়িকা নেই। একা চাঁদসদাগর কতদিক সামলাবে সেটা বাঙালী-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের বিচার্য।

এই বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে গৌরবের বস্তু বাংলা সাহিত্য—ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি লোক-সাহিত্য এবং চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সাহিত্য। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা আর একটু বস্তুগতের লোক তাঁদের আর একটা গর্বের বস্তু বাংলার মসলিন। ভেবে দেখলে

বোঝা যাবে বৈষ্ণব-কবিতা আর মসলিন—এ দু'টি এক জাতের সৃষ্টি। একটি ভাবের জগতের এবং অপরটি কাজের জগতের কীর্ত্তি। কিন্তু দু'-এরই মূল সুর হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে refinement—দুটিই ভাবলোক ও কর্মলোকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও নেই। কিন্তু দুটিই তৎ-তৎ লোকের; elite বা বিশিষ্টজনের উপভোগ্য, জনসাধারণের নয়। যে সৃষ্টি সমাজ-প্রাণের অঙ্গে বহে, মূল বিস্তার করেছে সমগ্র সমাজকে ধ্বংস ক'রে না ফেললে তাকে বিনষ্ট বলা যায় না। যা দুষ্টিমের লোকের মার্জিত রুচির পোরাক তার উৎস রুদ্ধ হলেও সমগ্র সমাজদেহে তার কোন বিষক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে না। কয়েকজন তাঁতির আঙুল কাটাতেই মসলিন বন্ধ হ'লো। আর চৈতন্যদেবের পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যেই বৈষ্ণব কবিতার উৎস আপনা আপনি রুদ্ধ হ'য়ে গেল। অবশ্য সাহিত্যের কোন বিশেষ একটি ধারাই দীর্ঘকাল চলতে পারে না, চললে তার সজীবতাও থাকে না। বৈষ্ণব কবিতা যে নির্বচ্ছিন্ন দু-শো বছর চলেছিল সেটাই সৃজনী প্রতিভার অভাব সূচিত করে। কিন্তু এখানে বিশেষ লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে বাঙালীর কাব্য-প্রতিভা বৈষ্ণব কাব্যের ধারা থেকে ধারান্তরে নবতর সৃজনের পথে অগ্রসর হোলো না। সাময়িকভাবে লুপ্তই হ'য়ে গেল। বাংলার শেষ বৈষ্ণব কবি লোচনদাস। তারপর বিরাট শূন্যতা—তারপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর! —অর্থাৎ কীর্ত্তি দেখে যদি বাঙালীর কালচারের মূল্য নির্ণয় করতে হয় তাহলে বাঙালীর কালচার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যাচ্ছে না, যেহেতু অন্ততঃ ইংরেজ যুগ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

এইখানে—আশঙ্কা করি—অনেকেই চঁ-ইা ক'রে উঠে বলবেন, কেন, চৈতন্যদেবের ধর্ম, নব্যন্যায় প্রভৃতি এ গুলো কি কীর্ত্তি নয়? এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর কালচারের কোন পাত্তা মেলে না?—জবাবে বলা যায়, মেলে এবং মেলে না। কথাটা সুতরাং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

দুটি কথা মনে রাখতে হবে—প্রথমতঃ বাংলাদেশ ইংলণ্ড বা জাপানের মত স্বতন্ত্র নয়, ভারত মহাদেশের একটি অখণ্ড অংশ। বাংলা এক মহাদেশের সনাতন কালের ভ্রাবিড়-আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এই হিসাবে বাঙালীর ধর্ম, দর্শন, নীতি, সামাজিক কাঠামো চৈতন্যাদি সবই বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস থেকে নেওয়া বা পাওয়া। এর মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি কি আছে সেটা দেখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান আলোচনার context হচ্ছে এই যে বাঙালীর একটি স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট কালচার আছে এই দাবী। সুতরাং এই দাবীর যথার্থতা বিচার করতে হ'লে যা একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি তাই খুঁজতে হবে। বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যদেবের স্বকীয় সৃষ্টি নয়; সনাতন বৈদিক ধর্মের তিনি একজন ব্যাখ্যাতা মাত্র এবং তাঁর সমসাময়িক কালের অন্ততঃ আট দশ জন ব্যাখ্যাতার তিনি অন্যতম। আর নব্যন্যায় নামেই প্রকাশ—ন্যায়ের মত কোন মৌলিক দর্শন নয়, মূলের অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র এর মধ্যে বাঙালীর বুদ্ধিমত্তা আছে, কীর্তিমত্তা নেই।

এই উক্তির মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রতি অবজ্ঞা আছে এমন সন্দেহ যেন কেউ না করেন। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব বা তাঁর ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হচ্ছে সমষ্টিগত ভাবে বাঙালীর সৃজনী-প্রতিভা। তাই বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক কথা হচ্ছে এই ধর্ম নিয়ে বাঙালী তার সমাজ জীবনে কি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য (যার আর এক নাম কালচার) সৃষ্টি করেছে। আসাম বা উড়িষ্যা বৈষ্ণব ধর্ম যত গভীরভাবে গ্রহণ করেছে বাঙালী তা করে নাই—এটা আজকার দিনে চোখ চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু আজই নয়; বাংলায় বৈষ্ণব প্রেরণায় চৈতন্যদেবের জীবনকালেই ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। তাঁর জীবনচরিতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর তিরোধানের অল্পদিন পূর্বে অদ্বৈত গোসাই লোক মুখে তাঁকে ইঙ্গিতে বার্তা পাঠাচ্ছেন:

"বাউলকে কহিয়ো লোকে হইয়াছে বাউল,
বাউলকে কহিয়ো হাটে না বিকায় চাউল…"

এই ব্যর্থতার বার্তার সঙ্গে তাঁর তিরোধানের সম্পর্ক থাকতেও পারে। সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে বাংলার মাটিতে কোন আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বৈদিক কালের কথা জানা যায় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাঙালী বৌদ্ধ হয়েছে, তান্ত্রিক হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে আবার ফিরে শাক্ত হয়েছে। তারপর ব্রাহ্ম হয়েছে, বিবেকানন্দপন্থী হয়েছে, বিপ্লবপন্থী হয়েছে আপাততঃ কমিউনিষ্ট হয়েছে। গড়পড়তা বাংলাদেশে এক একটা বড় আন্দোলনের পরমায়ু পঁচিশ বছর।

নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা থেকে অনেকে আন্দাজ করেন যে বাঙালীর বুদ্ধি এতই তীব্র যে সে অধিরত ভালো থেকে ভালতরের দিকে ছুটেছে, এ স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতেই পারে না। কিন্তু ভিন্ন দিক থেকে দেখলে মনে হবে বাঙালীর বুদ্ধির কোন গভীরতা নেই, তার বুদ্ধি হচ্ছে প্রধানতঃ স্নায়বিক [nervous]. যা কিছু তার স্নায়ুতন্ত্রে প্রবল আঘাত করে তাই নিয়েই বাঙালী নেচে কুঁদে অস্থির হ'য়ে উঠতে পারে। সমবেত ভাবে নাচবার জন্য তালের প্রয়োজন তত নেই যত আছে তালের। বাংলায় বীণা না হ'য়ে হ'য়েছে যে মৃদঙ্গ, এর নিশ্চয় একটা সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু নর্তন যতই ভাল সম্বিত হোক না কেন, তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনার পর গভীর অবসাদ আসবেই। উত্তেজনা কোন স্থায়ী সৃষ্টির সহায়ক নয়, অবসাদ তো আরোই নয়। তাই বাঙালীর পর্যায়ক্রমে হঠাৎ উল্লাস-মূর্ত্য এবং তার ফাঁকে ফাঁকে অলস অবসাদ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলার ইতিহাস চলেছে একটানা কীর্তিহীনতার ইতিহাস।

কিন্তু শুধু এই নয়। এই কীর্তিহীন দৃশ্যপটের নেপথ্যে কিছু অপকীর্তির তালিকাও আছে। সুজলা সুফলা বাংলায় জীবিকানির্বাহ খুব কঠিন কাজ ছিল না। উদরপূর্তির পর বহু অবসর হাতে থেকেছে। সেই অবসরে বাঙালী সৃষ্টি করেছে কৌলিন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বালিকা বিধবার চির বৈধব্য, সতীদাহ, অস্পৃশ্যতা, বৌদ্ধ-নিগ্রহের নানা নূতন কারণ। অবশেষে তাদের মুসলমান সমাজের গহ্বরে ঠেলে দেবার কৌশল, প্রতিবেশীকে জাতিচ্যুত করবার নিত্যনূতন ফন্দি [যার ফল এখনও ভুগতে হচ্ছে এবং আরো কতদিন হবে কে জানে।] বৈদিক বর্ণাশ্রমকে রঘুনন্দনের অনাভিবর্তনীয় স্মার্ত ধর্মে পরিণত করার কুশাগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর সবগুলি বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি নয়, কতকগুলি সর্বভারতীয় পাপ। কিন্তু বাঙালীর সৃজনীপ্রতিভা নিয়ে যে বিপুল আস্ফালন বর্তমানে আমরা করে বেড়াচ্ছি তা যদি সত্য হ'তো তাহ'লে সর্বভারতীয় পাপ দ্বারবঙ্গের দ্বারে এসে প্রতিহত হতো এবং তার পূর্ব দিকে ভাগীরথী তীরের মাটিতে নতুন পাপের বীজ উপ্ত হ'তেই পারতো না।

বাংলা সংস্কৃতির পূজারীরা বলতে পারেন, ছেড়ে দাও ওসব কথা, ও হোলো অতীত যুগের কথা, মধ্যযুগের কথা, তখনও বাঙালী আত্মসম্বিৎসম্পন্ন জাগ্রত জাতি হয়ে ওঠেনি। বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে ঐ সব কালের কথা হচ্ছে না; হচ্ছে বর্তমান যুগের কথা, অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় রবীন্দ্রযুগের কথা। এই যুগের বাংলা সংস্কৃতি যে পৃথিবীর মধ্যে একটী বরেণ্য বস্তু এতেও আর কোন সন্দেহ নেই?

অতএব আসা যাক্ রবীন্দ্র যুগের বাংলায়।...

(৩

আধুনিক বাংলার প্রবেশ তোরণে চার মূর্তি।—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাম দুর্লভ, জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদ (মীরজাফর মুসলমান এবং তাও অবাঙালী মুসলমান বলে তাঁকে এ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।) শেষোক্ত দুই ব্যক্তিও অবশ্য আসলে বাঙালী ছিলেন না, কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং বাঙালী সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। এই চারজন নেতা ইংরেজকে এদেশে এনেছিলেন।

এই বহুকৃত কাহিনীর পুনরাবৃত্তির দ্বারা বাঙালীকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে বাঙালীকে বোঝবার জন্য। বাইরের ব্যবহারে যা প্রকাশ পায়, স্বভাবের মধ্যে তার বীজ থাকে। স্বভাবের পরিচয়

পেতে হলে সুতরাং এই বীজের বটানি (botany) জানা দরকার।—এই বাঙালী নেতাদের কাজের সঙ্গে অনেক সময় বহুপূর্বেকার রাজা জয়চন্দ্রের কাজের তুলনা করা হয়ে থাকে; তিনি মুসলমানকে এদেশে রাজ্যস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তুলনাটা কতখানি যুক্তিসহ দেখতে হবে। জয়চন্দ্র ছিলেন পৃথ্বিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা, এমনকি তাঁর বিশ্বাস ছিল যে দিল্লীর সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য; সুতরাং পৃথ্বিরাজের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর স্বাভাবিক। সংযুক্তার অপহরণের ব্যাপার নিয়ে বিদ্বেষ রক্তরক্ত ঘৃণায় দাঁড়িয়ে যায়। আধুনিক কালের সাধারণ লোক হলে তিনি দু-চারজন সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করে আদালতে যেতেন। সামন্তযুগে এক প্রতিদ্বন্দ্বি রাজাকে উৎখাত করবার জন্য অন্য রাজার সহায়তা গ্রহণ করা রীতিবিরুদ্ধ ছিল না। লড়াইটা ছিল তখন রাজায় রাজায়; সম্প্রদায়ে—সম্প্রদায়ে নয়! মহম্মদ ঘোরি যদি মুসলমান না হয়ে হিন্দু হতেন, তবে থানেশ্বরের যুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য সাধারণ লোকে এতদিন ভুলেই যেত। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণচন্দ্রদের দলের কারো ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। এঁদের কাউকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করেছিলেন তারও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। সিরাজউদ্দৌলা অত্যাচারী নবাব। এঁরা সমাজের নেতা হিসাবে দেশের জনসাধারণকে অত্যাচারের কবলমুক্ত করার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। এ দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে সামাজিক দায়িত্ববোধ গোটা সমাজমনে সঞ্চারিত করে সমাজগতভাবে মুক্তির প্রচেষ্টার কথা কারো মনে এলো না। কর্মচেষ্টা প্রবাহিত হোলো কুটিল ষড়যন্ত্রের পথে অজানা বিদেশীর অনিশ্চিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অবলম্বন করে। অর্থাৎ, সাদা কথায়, ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলার সমাজ নেতারা এটা সুস্থচিত্তে বিশ্বাস করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি যে এদেশের জনসাধারণ যেমন আছে তেমনি থাকবে এবং তাদের পথের কাঁটা অন্যেরা এসে নিঃস্বার্থভাবে সরিয়ে দেবে।—এই ঐতিহাসিক কাহিনীর মর্মান্তিক (moral) হচ্ছে বাঙালীর চরিত্রে আত্মনির্ভরশীলতা নেই। কৌতিহীনতা এই কলঙ্কেরই অপর আর একটি দিক এবং আংশিক ভাবে তার অন্যতম ফলও বটে।

এই ঘটনার পরবর্তী দু-শো বছর বাংলার বড় গর্বের যুগ। এই গর্বের ভিত্তিটা একটু নিরীক্ষণ করে দেখা দরকার। খুব সহজেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে গত শ-খানেক বছর বা তারও কিছু বেশী সময়ে বাংলাদেশে কয়েকজন বড় বড় মানুষ জন্মেছেন। এঁরা—বিশেষতঃ এঁদের মধ্যে তিনজন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ—বিশ্বজয়ী প্রতিভার অধীশ্বর, এবং বিশ্ব-কল্যাণের জন্য চিন্তা করেছেন, ধ্যান করেছেন, কাজ করেছেন। [প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত এঁদের কেউই যে নিজেকে বাঙালী বলে বিশেষ গর্ব বোধ করেছেন তার পরিচয় কোথাও নেই, বরং বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যে শেষজীবনে বাঙালী জাতির সম্বন্ধে কিছু নিরাশ হয়েছিলেন তা অনুমান করবার ভিত্তি আছে। শ্রীঅরবিন্দ এতদিন অবধি এ সব ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন না। সুতরাং তাঁর মত সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু এটা মোটের ওপর অপ্রাসঙ্গিক] এই সব মহাপুরুষরা সকলেই থাকে বলে বিশ্বনাগরিক—citizens of the world. কিন্তু তাঁদের কাজের ফলে বাঙালীর জীবনের নানাদিকে—বিশেষতঃ ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে—বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এঁদের চিন্তা ও কাজ গোটা ভারতের অগ্রগতির পথে বহু নূতন পাথেয় যুগিয়েছে। প্রতিদানে অল্প অল্প প্রবেশ ও ভারতের বাইরের বহু লোকে এঁদের যে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়েছে সে অর্ঘের কিছু চন্দনবিন্দু, দু-চারটা ফুলের পাপড়ী বাঙালী জাতির গায়েও লেগেছে; অন্ততঃ লেগেছে বলেই আমাদের গভীর বিশ্বাস। আমাদের গর্বের ভিত্তিটা রচিত হোলো এই বিনা মূল্যে পাওয়া ফুলে এবং চন্দনে। পাওয়াটা যে আংশিক ভাবে অর্ঘদাতাদের হাতের তাকের অভাবের এবং আংশিক ভাবে সৌজন্যের ফল এমন সন্দেহ আমাদের আজো জাগেনি। গোপাল কৃষ্ণ গোখেল যখন বাঙালীর সুদূরস্পর্শী চিন্তাশক্তির স্তুতি

করেছিলেন, দুই-একজন বিশেষ বাঙালীর কথাই নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল, কিন্তু আমরা নিঃসংশয়ে ধরে নিয়েছি যে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এই স্তুতির অধিকারী।

সংস্কৃতি-গবীয়ান বলে থাকেন—বুঝে নেবো না কেন মশায়? কবি হোন বা যোগী হোন বা শিল্পী, তাঁরা যিনি যত বড় কথাই বলুন বা কাজই করুন—সে সব তাঁরা পেলেন কোথায়? আমাদের সবার মধ্যে এ সব ছিল বলেই ত তাঁরা এগুলিকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন?...সুতরাং প্রতিভার জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্ম সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। এ আলোচনার সোজা কথা হচ্ছে এই যে সমাজ জীবনের যা কিছু কীর্তি, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যা কিছু—সবের স্রষ্টা, ধারক ও বাহক হচ্ছে যাকে বলে average man, গড়পড়তা মানুষ। আগলে অবশ্য গড়পড়তা মানুষ বলে কোন ব্যক্তিবিশেষ সমাজে নেই, বক্তব্যবিষয়কে অঙ্কের হিসাবের মত সঠিক করবার জন্য সাধারণ মানুষকে একটা অসাধারণ নাম দেওয়া হয়, এ্যাভারেজ ম্যান। বক্তব্যটা হোলো এই যে, প্রতিভা হচ্ছে আর কিছুই নয়, এই 'গড়পড়তা'রই একটা বহুগুণিত সংশোধন মাত্র। অর্থাৎ, কোন বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজের 'গড়পড়তা'দের শ্রেষ্ঠত্বের একটা মাপকাঠি। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যদি মহাকবি হন, শ্রীঅরবিন্দ যদি মহাযোগী হন, তা হলে নিঃসংশয়ে বাঙালী জাতি একটি মহাজাতি। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে এই যুক্তি অনুসরণ করে আমরা অনেক হোমাফেরার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যথা—কর্সিকা দ্বীপের অধিবাসিরা সবাই ছোট সংস্করণের নেপোলিয়ন, ডাবলিনের নাগরিকেরা এক একটি ক্ষুদ্র বার্ণার্ড শ', ইংরাজরা সবাই শেক্সপীয়র, শেলী এবং নিউটনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, এবং কাজে কাজেই গুজরাটিরা বাপুজী হিসাবে আমাদের পূজনীয়। কিন্তু এটাও অপ্রাসঙ্গিক।

প্রতিভার জন্মতত্ত্ব আমাদের আলোচ্য আমাদের আলোচ্য হচ্ছে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং উত্তুঙ্গ প্রতিভা তাঁর পারিপার্শ্বিক গড়পড়তাদের সমজাতীয় কি না সে তত্ত্ব ছেড়ে গড়পড়তাদের জীবন কাহিনীতে আসা যাক। রাসায়নিকের চোখে কয়লা ও হীরক মূলতঃ এক বস্তু যদি হয়ও, হীরকের অলঙ্কার নিয়ে যার কারবার রাসায়নিকের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য তার কোন কাজে লাগবে না। সুতরাং দেখা যাক বর্তমান যুগের গড়পড়তা বাঙালীর কীর্তি কি?

ইংরাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে নানাধিক থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশের পরিচয় ঘটলো। এ দেশের লোকের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো একটা নতুন জগৎ। ইংরাজের প্রথম ঘাঁটি হলো বাংলাদেশ। সুতরাং এই নতুন জগতের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো বাঙালীর। আগে দেখা গেছে বাঙালীর কোন আকর্ষণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এটা চরিত্রের দুর্বলতা সূচিত করে। কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। সেটা হচ্ছে এই যে বাঙালী অন্য অনেকের চেয়ে সহজে নতুনকে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং বাঙালী অবাধে ইংরাজী শিখলো, ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি আয়ত্ত করলো, ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতির পরীক্ষা সুরু করলো। পরীক্ষকদের মধ্যে যাঁরা বিশাল প্রতিভার অধিকারী তাঁদের চেষ্টায় উদার ধর্মমন্দির গড়ে উঠলো, ভালো সাহিত্য হোলো, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক অধিকারের চেতনা বিকশিত হয়ে উঠলো। আরো কিছু পরে স্বাধীনতার জন্য দধিচীর মত নিঃশেষ আত্মদানের মহত্তম আদর্শও বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া গেল। এই সব বা এই সবের যে কোন দুই একটি দেখে চোখে ধাঁধা লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার গড়পড়তাদের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি?

এ কথা ভুললে চলবে না যে এই গড়পড়তারা রাজা রামমোহনকে খুন করতে গিয়েছিল, এবং বিদ্যাসাগরকে

অপারেশন করেছিল, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্য সম্মান আদায় করতে হয়রান হতে হয়েছিল, এবং শ্রীঅরবিন্দ আজো পর্যন্ত অবোধ্য। অন্যদিকে, এই গড়পড়তারা ইংরাজের তল্পিবাহক হয়ে অর্থাৎ গোরেন্দা ও কেরাণী হয়ে ইংরেজ সৈন্যদলের সাথে সারা ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে এরা গেছে সেখানে এরা (দু-চারজন ছাড়া) কেউ এমন কিছু করে নি যার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের মনে এদের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা বা ভালবাসা জন্মাতে পারে। কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব হতে পারে এমন কাজ ভূরি ভূরি আছে। এই হচ্ছে এ যুগের গড়পড়তা বাঙালীর প্রাথমিক কীর্তি।

দ্বিতীয় কীর্তি দেশজোড়া কেরাণীগিরি। বাঙালী হচ্ছে সংস্কৃতি সম্পন্ন, অর্থাৎ কালচারড জাতি—মানে, ধোপ-দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরা বাবুর জাতি। ধুতি ময়লা হয় এমন কোন কাজ বাঙালীর মানায় না। গোল আলুর চাষ করতে হলে গায়ে জল কাদা লাগে, সেটা করা সম্ভব নয়। গোল আলুর বড় আড়তদার যে, আলুর বস্তা তাকেও মাঝে মাঝে হাত দিয়ে ধরতে হয় এবং তাতে গায়ে ধুলা লাগে। কালচারড মানুষের পক্ষে সেটাও অসম্ভব। সুতরাং কালচারড বাঙালী ধুতি পাঞ্জাবীর পবিত্রতা রক্ষা করে আড়তদারের কেরাণীর কাজ করে। সব ক্ষেত্রেই এই রকম। কৃষি, শিল্প, বড় ব্যবসা, বিস্তৃত বাণিজ্য—যা কিছু বড় সৃষ্টি, যা কিছু সমাজের ধনিয়াদ, যার জন্য একাগ্রতা দরকার, অধ্যবসায় দরকার, নিরন্তর সাধনা দরকার, বহু সমব্যবসায়ীর সহযোগিতা দরকার, যে কাজ করতে গেলে প্রচণ্ড দায়িত্ববোধের প্রয়োজন, বিপুল পরিশ্রমের প্রয়োজন—অসাধারণ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন—সে কাজের ভার বাঙালী ছেড়ে দিয়েছে অন্যের ওপর; তারপর প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবার পর বাঙালী সেখানে হয়েছে মুচ্ছুদ্দী। কেরাণীর জীবনে দশটা—পাঁচটার হিসাব; দায়িত্ব নেই, মনের ওপর চাপ নেই, গায়ে ধুলা লাগে না—কালচারের নির্মল শুভ্রতা নিয়ে বংশপরম্পরাক্রমে টিঁকে থাকা যায়। এটা শুধু সাধারণ গড়পড়তাদের কথা নয়। অসাধারণদের বেলাও এই একই দিকে। ভাল করে পাস করা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ররাও ভাল একটা চাকরী পেলে কলেজী বিদ্যা সার্থক বলে মনে করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরাজ-নির্ভরতা আকস্মিক ঘটনা নয়।

এই বাবু কালচারের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, কোন সুস্পষ্ট জীবনদর্শনের উপর এর ভিত্তি নয়। ফলে এই কালচার বিলাসীদের জীবনোপলব্ধির মধ্যে কোন আন্তরিকতা নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ছবি পূজা করা এবং কন্যার বিবাহের সময় প্রস্তাবিত বরপক্ষের চতুর্দশ পুরুষের কুলপরিচয় সংগ্রহ করার মধ্যে শতকরা আটানব্বই জন কালচারড বাঙালী আজো কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পান না। সারাজীবন ইংরাজের চাকরী করে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে·····"ইত্যাদি গাইতে গাইতে স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে বাঙালীর বাধে নি। রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে ঘরে ঘরে, তাঁর বই-ও আভিজাত্যের খাতিরে আলমারীতে সাজিয়ে রাখাটা আবশ্যক হয়েছে। গান্ধী কলকাতায় এলে ভীড়ের চাপেই অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে। তাঁদের এক-জনকে আমরা বলেছি গুরুদেব, আর একজনকে মহাত্মা। কিন্তু অন্তরালে তাঁদের unpractical, অর্থাৎ সাদা কথায়, পাগল বলাটা আমাদের অন্যায় মনে হয় নি। আমাদের কালচার জীবনের কোন গভীর উপলব্ধি থেকে আসে নি, এসেছে বাইরের স্লোগান (slogan) থেকে। ভাল কথা আমরা মুখস্ত করেছি—'সবার ওপরে মানুষ সত্য' ইত্যাদি, কিন্তু এ কথার রসে মন আমাদের রসিয়ে ওঠে নি। খাঁচার পাখী যতই 'রাধাকৃষ্ণ' বলুক, কৃষ্ণভক্তিতে সে গদগদ হয়ে ওঠে না। স্মরণাতীত কাল আগে যাঁরা বলেছিলেন 'বক্যঃ পক্ষীণঃ' তাঁরা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন নিঃসন্দেহ, এখানকার লবণাক্ত আর্দ্র আবহাওয়ায় কি ধরণের মানুষ জন্মাতে পারে তা তাঁরা বুঝেছিলেন।

বাবুবাঙালীর সবচেয়ে গর্বের বস্তু হচ্ছে তার সাহিত্য।

এ সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের দিক থেকে দেখলে এতে গর্বের বস্তু বিস্তর আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্রভাবে বাঙালীজাতির সমষ্টিগত সৃষ্টি হিসাবে দেখলে গর্ব কিঞ্চিৎ স্তিমিত হতে বাধ্য। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের আবশ্যকীয় বিষয়—বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতির কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা আজো এ সাহিত্যে স্থান পায় নি। আজো পর্যন্ত এ সাহিত্যের প্রধান উপাদান গীতি কবিতা ও গল্প। কিন্তু War and Peace বা John Christopherএর মত কোন গল্প এ সাহিত্যে এখনও নেই। অর্থাৎ যে সৃষ্টির জন্য শ্রমসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন হয়, বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়, অথবা মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড় প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, সে রকমের সৃষ্টি এখনও বেশী কিছু হয় নি। এ সাহিত্যের অধিকাংশের মূল উপাদান হচ্ছে প্রেম। এটা আকস্মিক নয়। বাঙালী কালচারের অভিজ্ঞতার পরিসর কতটুকু? অফিসের পর নিজের ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে অনায়াসে যা দেখতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে বর্ষার মেঘ, পথ চলতি মানুষ। এরা সত্য নিশ্চয়ই। এবং এদের নিয়ে কল্পনার রং ভাল করে ফলাতে পারলে তা উপভোগ্য হতে পারে। কিন্তু সে কল্পনা নিয়ে "শুধু অকারণ পুলকে" গান গেয়ে ওঠার চেয়ে বেশী কিছু আর বড় একটা করা যায় না। তাই বাংলায় কবিতা ও ছোট গল্পের এত ছড়াছড়ি।

গড়পড়তাদের হাতে পড়ে এই গীতি কবিতার রীতি ও প্রেমের গল্পের প্রেম কি আকার লাভ করেছে তা রেডিয়োতে যে কোন দু-তিন দিনের কয়েকখানি আধুনিক গান শুনলে এবং সিনেমায় কয়েকখানি বাংলা ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। সিনেমার পর্দায় আধুনিক বাঙালীর রুচিরও খবর মিলবে। সিনেমার সঙ্গে আরো দু-চারটা জিনিস যোগ করা যেতে পারে, যথা, খেলার মাঠ, সার্বজনীন পূজামণ্ডপ, করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ, বইয়ের দোকানে স্তূপীকৃত যৌনতত্ত্বের ও 'মোহন সিরিজের' বই, পরীক্ষা পাশের হার, রেস্তোরাঁর নিরঙ্কুশ অপরিচ্ছন্নতা, সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর আলাপ আলোচনার বিষয় ও ধরণ, বাংলার বাইরের সহরগুলিতে বাঙালীর জীবনযাত্রার প্রণালী ও অবাঙালীদের প্রতি ব্যবহার! এবং বাংলার যে কোন বিপদে আপদে সর্বভারতীয় নেতাদের দিকে চেয়ে আকুল আহ্বান ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে বাঙালীর সুসংস্কৃতির কি পরিচয় পাওয়া যায়?—দেশের কোন অংশে মানুষ বিপন্ন হলে অন্য অংশে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। অন্যের বিপদে আনন্দ নয় অবশ্য, বিপদ ত্রাণের জন্য আনন্দ,—নাচ, গান, সিনেমা, ফুটবলের চাঞ্চিটিশো। বাঙালী কালচারড্‌জাতি, নাচ, গান সে ভালবাসে; তাই ক্ষুধার্তকে পয়সা দিতে হলেও একটা আর্টের মাধ্যমিকে ছাড়া সে কি করে দিতে পারে? অথচ এই বাংলায় বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন একথা না মেনে উপায় নেই। শুধু এই একটি উদাহরণ থেকে প্রতিভা ও গড়পড়তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এই দুই শ্রেণী দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক। তাই a prophet is least respected by his own people.

ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কালচারড্ বাঙালী কাচের পুতুলের মত ঝকঝকে এবং পুতুলের মতই টুনকো নির্জীব বস্তু। তার জীবন কীর্তিহীন, তাই তার কালচারও আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখা কাগজের ফুলের মত, সজীবতাহীন, গন্ধহীন। এ কালচার জীবনের কোন দুর্লঙ্ঘ্য সিদ্ধির ফল নয়। কয়েকজন মহাপুরুষের বাণীর প্রতিধ্বনী মাত্র। প্রতিভাশালীদের জীবনের ব্যর্থ অনুকরণ—তাদের চালচলনের লোক দেখানো ব্যর্থ অভিনয়—চাঁদের আলোর মত দীপ্তি তার যতই থাক, সুন্দর, স্নিগ্ধ যতই হোক, সে আলো ধার করা; জলদগ্নি তারকার জ্যোতির মত নিজেকে দগ্ধ করে সে আলো জ্বলে না; তাই সে আলোয় ফল পাকে না, ফসল ফলে না, প্রাণী ও উদ্ভিদের জগতে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় না, সৃজনীশক্তিহীন সে আলো শুধু অলস কল্পনাবিলাসের উপাদান।

(৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে আজো পর্যন্ত বাংলার সমাজ জীবনে দুটি সমান্তরাল প্রণালী চলেছে: একটি হচ্ছে

জনসাধারণ প্রতিভা, অন্যটি গড়পড়তার জীবন। প্রথমটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হবে ধর্মে, দর্শনে, কাব্যে, সাহিত্যে, স্বদেশপ্রেমে বাঙালী পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতের সমকক্ষ। কিন্তু বস্তুতঃ এই দৃষ্টি ভুল। এই সব ক্ষেত্রে যাঁরা মৌলিক স্রষ্টা, মৌলিক কর্মী, সংখ্যায় তাঁরা অতি নগণ্য এবং তাঁদের জীবনের প্রায় কোন প্রভাব আজো গড়পড়তা বাঙালীর অলস, স্বার্থময়, সমাজবিমুখ জীবনের নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে বড় কোন তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে নি। বাঙালীর স্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখে অনেকে মনে করেছেন বাঙালী স্বভাবতঃই বিপ্লবী। কিন্তু আসলে বাঙালীর মত রক্ষণশীল জাত আর আছে কি না সন্দেহ। রক্ষা করতে পারার জন্য শক্তি চাই, সে শক্তির অভাবে অনেক কিছু আমাদের আলগা আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়; অভিনয় চাতুর্য থাকার ফলে লোককে আমরা বোকাতে পারি যে আমরা পুরনোকে ছেড়ে দিয়েছি মাথার চৈতন-চুটকী ও রামকৃষ্ণ পূজা যারা ছাড়ে নি তাদের আমরা ব্যঙ্গ করি—কিন্তু ভুলে যাই যে ঐ অভ্যাসগুলা আঁকড়ে থাকার জন্য যে বহু কঠোর পৌরুষ দরকার হয় তা আমাদের নেই বলেই চৈতন আমাদের কাটা গেছে। এই আত্মসমীক্ষাহীন দুর্বলতার ফলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব ও বাঙালীত্বের মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে গেছে। আত্মবঞ্চনা স্বভাবগত হয়ে যাওয়াতে এই ব্যবধানকেই আমরা বাঙালী কালচারের বৈশিষ্ট বলে লোককে বোকাতে চেষ্টা করেছি। মহাপুরুষরা বার বার আমাদের টেনে তোলবার চেষ্টা করেছেন, আমরা প্রতিবারই তাঁদের প্রতিহত করেছি। আমাদের অন্ত্র অমোঘ; মহাপুরুষকে মনুষ্যত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে মহাদেবত্বের কোঠায় তুলে দিয়ে মন্দিরে বসিয়ে একবার ফুল চন্দন দিয়ে পূজা দিতে পারলেই আমাদের মহাজাতিত্ব টিকে গেল। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কেউ আজ আর মানুষ হিসাবে বাঙালী সমাজে বেঁচে নেই; দেবতা হয়ে মন্দিরে পূজা নিচ্ছেন। এত কম চ্যালেঞ্জ দিয়ে যতদিন আমাদের বাঙালীত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারছি ততদিন আমাদের মহাজাতিত্বের এবং মহান সংস্কৃতির আর ভাবনা কি? সংক্ষেপে বাঙালী সংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে আত্মপ্রবঞ্চনা, পরনির্ভরতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অভিনয় কুশলতা। আজ ভেবে দেখতে হবে শুধু এই সম্বল নিয়ে একটা জাতি টিকতে পারে কি না।

এই সংস্কৃতির একটি মাত্র দৃশ্যতঃ ভাল দিক হয়ত আছে—সে হচ্ছে এর refinement. বিশ্বসংস্কৃতির অনেকগুলি বড় বড় তরঙ্গ বাংলার বুকের ওপর দিয়েও বয়ে গেছে—বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদ, বৌদ্ধের করুণা ও মৈত্রী, বৈষ্ণবের প্রেম, শাক্তের মাতৃ পূজা, পাশ্চাত্যের মানবিকতা (humanism); আমরা এর কোনটাকে সমগ্র সত্তা দিয়ে গ্রহণ করি নি, সে শক্তি আমাদের নেই; কিন্তু এখানকার উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় আমাদের প্রাণতন্ত্রী হয়ে গেছে স্বভাবতঃই দুর্বল; এই দুর্বলতার সঙ্গে বহু বড় আদর্শের অগাধিচুড়ী এক হয়ে আমাদের চারদিকে একটা refinement-এর পালেস্তারা লাগিয়ে দিয়েছে। দক্ষ অভিনেতা হিসাবে এটা হচ্ছে আমাদের make-up, একে উঠিয়ে ফেলেই আমাদের নিজমূর্তি বেরিয়ে পড়ে; কাজেই যথাসম্ভব এই make-up আমরা বজায় রেখে চলি। এই হচ্ছে বাঙালী সংস্কৃতি।

সমাজ জীবনে আমাদের অধিকাংশ কর্মপ্রচেষ্টা হচ্ছে এই make-up বজায় রাখবার চেষ্টা। কিন্তু যখন গোটা জাতির ওপর দিয়ে কোন বড় রকম দুর্যোগের ঝড় বয়ে চলে, তখন ব্যক্তিবিশেষের মুখের পাউডার উড়ে যাচ্ছে কি না সে দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে চলে না। বর্তমান অবস্থায় বাঙালীর এই অন্তঃসার-শূন্য সৌখীন কালচার টিকতে পারে না। জাতি হিসাবে টিকতে গেলে দুটি-একটি মূল সত্য বাঙালীকে শিখতে হবে বা আজো সে শেখে নি। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙালীর স্বার্থকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত করতে হবে, সংস্কৃতির অজুহাতে টবের রজনীগন্ধা হয়ে উদ্ভাসিক সৌখীন জীবনযাপন করতে চাইলে জীবনই বাঁচবে না। দ্বিতীয়তঃ, কালচারের দোহাই দিয়ে কেরাণী-জগতের যা-কিছু সুখ-সুবিধা আমরা এতদিন ভোগ করে এসেছি; এটা এখন ছাড়তে হবে। তৃতীয়তঃ, এটা

মেনে নিতে হবে যে সামাজিক কালচার হচ্ছে সমাজগত সাধনার ফল; ওটা প্রকৃতি দিয়ে হয় না—একজন রবীন্দ্রনাথ বা একজন বিবেকানন্দকে দেখিয়ে সংস্কৃতির জগতে গোটা সমাজের অন্য কোন সম্মানের আসন দাবী করতে গেলে হাস্যাস্পদ হবে। চতুর্থতঃ, কালচার জিনিষটাই হচ্ছে অন্তর্জীবনের সাধনার দীপ্তি, যেমন ফুলের সৌন্দর্য, প্রদীপশিখার আলো। যেখানে বিকাশ নেই, দাহ নেই, সেখানে সৌন্দর্যও নেই, আলোও নেই। সমাজগত ভাবে বাঙালীর জীবনে কোন বৃহত্তের সাধনাই নেই, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধ্যবসায়ও নেই; তাই বাঙালীর কালচার বলে আজো কিছু গড়েই ওঠে নি। আজ যা কালচার নামে চলছে সে শুধু বাঙালীকে ভারতের বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালীর আত্মঘাতী আত্মাভিমানকে পুঞ্জীভূত করে তুলেছে। এই ঠুনকো কালচারের পালেস্তারা যত শীঘ্র ভেঙ্গে যায় ততই মঙ্গল।

"গান"

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[স্বপনঘুড়ো]

তোমার মাটির প্রদীপ খানি যদি আড়াল করো—
আঁধার পথে চলতে গিয়ে আমরা জড়ো সড়ো!
বিঘ্ন-বিপদ সাপের ফণায় নাচে—
সব অশুভ দাঁড়ায় এসে কাছে
অমঙ্গলের শঙ্কা জাগে...পরাণ ঘরো ঘরো!
প্রদীপখানি যদি আড়াল করো।

সন্ধ্যা-দীপের উজল শিখায় আঁচল দিয়ে ঢাকি—
যাও পরিয়ে ভীরু মনে অমঙ্গলের রাখি।
মনের আশায় যাও চরণে দলি—
ভবিষ্যতে যাও যে অলাজলি
তোমার হাতে ভয়ঙ্করের খেলা কেমনতরো!
প্রদীপখানি যদি আড়াল করো!

দেয়াল

সন্তোষ কুমার ঘোষ

(১)

প্রতিদিনের মতো আজও লিফটম্যান সেলাম করল। কাউন্টারের আড়ালে বুড়ো খাজাঞ্চিবাবু ক্যাশবাক্স মুছছিলেন। ওর গোড়ালির শব্দ পেয়ে স্মিত মুখ তুললেন। নমিতার তবু ভরোসড়ো ভাব গেল না। পরিশ্রম বিশেষ করেনি, সব পথটাই এসেছে ট্রামে, তিন-তলায় উঠেছে লিফটে। তবু নিজের খোপে অভ্যস্ত আসনটাতে যখন বসল, তখন কপালে অল্প অল্প ঘাম ফুটেছে, শ্বাস দ্রুততর। পাখা খুলে দিতেও উত্তেজনা গেলনা। অফিসে যোগ দেবার প্রথম দিনটি আবার

একে একে যতোগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেল করিডোরে, নমিতা সব গুণলো। কেরানীরা আসছে। হলঘরটায় গুঞ্জন এখন স্পষ্টতর। চেয়ার টানাটানির আওয়াজে নমিতা বিরক্ত হ'ল। কাঠের পায়া মেজের সঙ্গে কি এমন কর্কশ শব্দ হয়। হঠাৎ সব গুঞ্জন থেমে গেল। মুহূর্তের জন্যে ঘনঘনে তটস্থতা। সাহেব এলেন। নমিতা ওর প্লাইউড পার্টিশনের আড়ালে বসে একজোড়া আত্মপ্রত্যয়ী অক্সফোর্ড জুতোর মন্দ মন্দ শব্দ শুনল।

একটু পরেই সাহেবের খাস চাপরাসি শম্ভু এসে দাঁড়ালো। সাহেব ডেকেছেন। পেনসিল, নোটবই নিয়ে নমিতা তৈরি। চুল ঠিক আছে তো, পাউডার কি অতিপ্রকট? এখন আয়নায় দেখে নেবার সময় নেই।

মিঃ সামন্ত ফোন করছিলেন। নমিতাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। কথা সারা হতে মিনিট দুইয়ের বেশি লাগল না। সামন্ত নমিতার হাতের দিকে চেয়ে বললেন, 'আরও কাগজ পেনসিল এনেছেন? না মিসেস্ চক্রবর্তী, আজ আর নোট্ নয়। আজ তো আপনার সেরদিন।'

নমিতা বলল, 'আজই শেষ।'

সামন্ত বললেন, দুঃখ প্রকাশ করব, না, আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করব, বুঝতে পারছি না। বোধ হয় দুটোর কোনটাই খাটে না। অফিসে আপনার তো কাজ করবার কথা নয়, একটা স্পেশ্যাল এ্যারেঞ্জমেন্টে এসে ছিলেন, সেটা আজ শেষ হয়ে গেল। অসুস্থ স্বামীর সাবষ্টিটিউট হিসেবে কাজ করেছেন। স্বামী সেরে উঠে ফের রীজিউম করছেন, এতো আনন্দের কথা। নো কম্ফর রিগ্রেটস্। আপনি আপনার নিজের ক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছেন, মাঝখান থেকে বছর দুইয়ের মতো একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল মন্দ কী। মিঃ চক্রবর্তী কালই জয়েন করছেন তো?

নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

সামন্ত বললেন, বেশ। আপনি আপনার সব ডিউজ ক্লিয়ার করে নিয়ে যাবেন, আমি ক্যাসিয়ারকে বলে দিয়েছি।

নমিতা নমস্কার করে উঠতে যাচ্ছিল, সামন্ত বললেন, দাঁড়ান, আরো একটু আছে। চেক বই খুলে সামন্ত একটা পাতা ছিঁড়লেন, সই ইত্যাদি বোধ হয় আগেই করা ছিল। নমিতার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইন রেকগ্নিশন অব ইয়োর গুড্ সার্ভিসেস্। এটা কোম্পানী আপনাকে দিচ্ছে। আড়াই বছর কাজ করছেন, আড়াই মাসের মাইনে। আপনি এ্যাক্সেপ্ট করছেন তো?

এত অভিভূত হয়েছিল নমিতা যে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেল। সামন্ত চেয়ার থেকে পুরোপুরি উঠলেন না। একটুখানি ঝুঁকে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নমিতাকেও হাত বাড়িয়ে দিতে হ'ল। করতলে আর একটি কর্কশ কঠিন হাতের তাপ অনুভব করতে করতে মনে হল, এই লোকটি সম্পর্কে এতদিন একটা বিরূপতা পোষণ করে অবিচার করেছে। সামন্ত আসলে, সুপ্রিয়রা যেমন বলত, তেমন জবরদস্ত ডিক্টেটর নন।

নিজের খুপরিতে ফিরে নমিতা কিছুক্ষণ এটা ওটা নাড়া চাড়া করল। হলঘরটাতে আবার গুঞ্জন উঠেছে।

একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে খোসগল্পের সঙ্গে কাজ চলেছে। ওরা নমিতাকে নিয়ে আলোচনা করছেনা তো?

টেবিলের টানাটা বন্ধ করতে গিয়ে মনে পড়ল চাবিটা ফেরৎ দিতে হবে। তার আগে ভেতরে দরকারি কিছু রয়ে গেল কিনা দেখে নেওয়া যাক। নমিতা টানাটা একেবারে বাইরে টেনে আনল—ঘেঁটে দেখল, বিশেষ কিছু নেই। ব্যবহৃত নোটবইয়ের স্তূপ, কয়েক আস্ত পেনসিল, পিন, ক্লিপ, কার্বন কাগজ। টেনেটুনে টাইপিস্টের ঐহিক দরজায়। নোটবইগুলো ফেলে দিলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে কার্বনগুলো থাক। নমিতার পরে যে আসবে, তার কাজে লাগবে।

পাশের টানাটা খুলতেই খান কয়েক বই আর মাসিক পত্রিকা বেরুলো। অফিস লাইব্রেরির সম্পত্তি। এগুলো ফিরিয়ে দেবার কথা একেবারে ভুলে ছিল, আশ্চর্য। কিন্তু এই কবিতার বইটা কাকে ফিরিয়ে দেবে, সুপ্রিয় যেটা উপহার দিয়েছিল? এটা তো বাড়ী নিয়ে যাওয়া চলবে না। নমিতা অলস আঙুলে বইটার পাতা ওলটাতে আরম্ভ করল উৎসর্গের পৃষ্ঠাটা ছাড়িয়ে কিছুতেই, কিন্তু এগোতে পারল না। "শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তীর জন্মদিনে—সুপ্রিয়"। জড়ানো জড়ানো পুরুষালি হাতের লেখা। সুপ্রিয়র হাতের লেখা বরাবর এমন বিশ্রী!

"জন্মদিনে" কথাটায় এতদিন পরেও নমিতার হাসি পেল। সুপ্রিয় আজও বোধহয় জানে না যেদিন বইটা দিয়েছিল, সেদিন কেন, তার কাছাকাছি কোন দিনও নমিতার জন্মদিন ছিল না। সে এক মজার ভ্রান্তিবিলাস। অফিসে আটপৌরে শাড়ী পরে আসাই নমিতার অভ্যাস। সেদিনকার পোষাকটা বুঝি একটু জমকালো গোছেরই ছিল। সুপ্রিয় প্রথম থেকেই ঠাট্টা করতে শুরু করল। ওর স্বভাবটাই ওই রকম। শেষ পর্যন্ত লজ্জার আরক্ত হবার আগেই নমিতা আত্মরক্ষার সহজ উপায় হিসেবে মুখে যে কথাটা এল, তাই বলেছিল।

—আজ আমার জন্মদিন।

—তাই নাকি। সুপ্রিয় কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। টিফিনের পর, নমিতা কী একটা জরুরী চিঠি টাইপ করছিল, সুপ্রিয় সেখানে এসে হাজির। মুখে কিছু বলল না, বইখানি নমিতার হাতে তুলে দিল। তারপর নমিতাকে অবাক হবার সুযোগটুকুও না দিয়ে উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা ওর চোখের সামনে খুলে ধরল। রক্ত ছড়িয়ে গেল নমিতার কপোলে। একী কাণ্ড করেছে সুপ্রিয়। ওর একটা হঠাৎ ঠোঁটকাটা ঠাট্টার বিশ্বাস করে একেবারে কিনে নিয়ে এসেছে? একবার মনে হল সুপ্রিয়র ভুলটা ভেঙে দেয়, বলে, নমিতার সারা বছরে একটা জন্মদিন আছে বই কি, কিন্তু সেটা আগামী ছ'মাসের মধ্যে ক্যালেণ্ডারের কোন পাতায় নেই। চোখ তুলে একবার সুপ্রিয়র চোখের দিকে তাকালো: কিন্তু কী ছিল সেই ঘন ভ্রূ চোখের প্রগাঢ় চাউনিতে, সত্যি কথাটা কিছুতেই নমিতা উচ্চারণ করতে পারল না।

একটি মিথ্যার মাধুর্য মৌনমুহূর্তটিকে ঘিরে রইল। আর সবটাইতো মিথ্যা নয় সীঁথিতে রক্তিম ক্ষীণ রেখাটুকু না থাকলে সেই মুহূর্তে নমিতার নবজন্ম হওয়া কি অসম্ভব ছিল?

প্রথমে সুপ্রিয়ই কথা বলেছিল। ইউনিয়নের সভায় যা'র মুখে খৈ ফোটে, পৃথিবীর সর্বত্র মালিকদের অবিচার অত্যাচারের নজির যার নখদর্পণে, সেই চাক দাঁড়িওয়ালা বলিষ্ঠ লোকটাকে কথা বলতে গিয়ে তোতলামি করতে নমিতা সেই প্রথম শুনল। মনে মনে না হেসে পারল না।

'ভেবেছিলুম' সুপ্রিয় বলল, 'উপহারটা একটু নতুন ধরণের লিখবো। To a lady with a guiter; কেমন হ'ত?'

'মন্দ হ'ত না', ঠোঁট টিপে হেসে নমিতা বলেছিল, 'সামান্য একটু সত্যের অপলাপ হ'ত আর কি To a lady with the typewriter বললেই ঠিক হ'ত, না?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল, বারোটা। অফিস কামরার গুঞ্জন এখন প্রায় গোলমালে পৌঁচেছে।

কিন্তু একবারও তো শোনা গেল না সুপ্রিয়র গলা। সুপ্রিয় একবার এ ঘরে এলোও না তো। কে জানে সুপ্রিয় আজ অফিসে এসেছে কিনা।

হাত ব্যাগটা খুলে নমিতা ছোট আয়নায় মুখ দেখল। ঈষৎ পাউডারের প্রলেপে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল মুখের বিলুপ্তপ্রায় চিক্কণতা। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আয়নায়। আত্মরূপ মোহ নয়, বিস্ময়। কত তাড়াতাড়ি মানুষ বদলায়, ভেতরটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরেটাও। এই দু'তিন বছরে কম পরিবর্তন হ'ল না নমিতার। বড়ো করে টিপ পরতো কপালে, সিঁদুর দিয়ে প্রায় লেপে দিতো সিঁথির সাদা টুকু। কবজি থেকে কনুই দেখা যেতো না এমনি ছিল চুড়ির বহর। ফিস্ ফিস্ কথা, তাও আকণ্ঠ ঘোমটার বাইরে পৌঁছত না।

সেই নমিতা এখন কপালে সিঁদুর টুকুও ছোঁয়ায় না। সিঁথির রেখাটা ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে এখন অদৃশ্যপ্রায়। যেটুকু আছে সেটুকু স্বামীর অকল্যাণের ভয়ে না হোক লোকনিন্দার ভয়ে। বাঁ হাতে এখন শুধু একটা কব্জি ঘড়ি, ডান হাতে দু'গাছি চুড়ি, গলায় সরু হার। অলঙ্কারের সব বাহুল্য বহু কালই বর্জিত। আঁট সাঁট করে পরা সাড়ি, কিন্তু ঘোমটাটুকু প্রায়ই অবিন্যস্ত। শুধু অফিসের কাজের উপযোগী বলে নয়, এই পোষাকের সঙ্গে নমিতার রুচিরও যেন সায় আছে। আগে শালীনতা ছিল, এমন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না।

শুধু খোলসটা নয়, ভেতরটাও যে বদলেছে, এ-তো নমিতা নিজেই বোঝে। নবু বধূ বৌ হয়ে শ্রীধর মল্লিক লেনের জীর্ণ বাসাটায় ঢুকেছিল। প্রথম ক'দিন মন্দ লাগেনি। সাধে, উলুতে, অভ্যাগতের কলরবে সাত আটটা দিন যেন নেশার মতো কাটলো। বাপের বাড়িতে আর পাঁচটা ভাই বোনের মধ্যে ওর আলাদা কোন অস্তিত্বই ছিল না। দু'বেলা দু'খানা ভাত, বছরে চার জোড়া কাপড় মাত্র বরাদ্দ। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, আই. এ. ও কিছুদূর পড়া ছিল, কিন্তু সব ভুলতে শুরু করেছিল শেষের দিকে।

সেই নমিতা শ্রীধর মল্লিকের লেনের স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দুধে আলতার বরণ, চড়া শক্তির আলোর মালা। সেই মালা খুলে নিয়ে গেল ডেকরেটর; অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নিলেন। ভাঁটায় টানে নদীগর্ভের আসল চেহারা ফুটে উঠল। বিয়ের সময় মনে হয়েছিল গোটা বাড়িটাই বুঝি ওদের; সোর গোল মিটে যেতে দেখা গেল, ওদের ভাগে মোটে একতলার দু'খানা ছোট ছোট ঘর। একখানায় বাতপঙ্গু শ্বশুরকে নিয়ে আছেন সৎ-শাশুড়ি। আরেকখানা ওদের, স্বামিস্ত্রীর জন্যে। আগে দেওরও বোধ হয় এই ঘরেই শুতো, সে এখন চালান হয়ে গেছে তিন দিক ঘেরা সরু একটা প্যাসেজে। সিঁড়ির নিচে ল্যাম্প জেলে রান্নার বন্দোবস্ত। অতোদূর পর্যন্ত বিজলী আলোর তাঁর যায়নি। বাড়ির অন্যান্য অংশ,—দোতলা, চিলেকুঠি, ছাদ, সব অন্য ভাড়াটেদের কবলে। বিয়ের সময় খাতির করে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল।

বিবাহিত জীবনের আসল রূপ অষ্টমঙ্গলের ফিরে আসার পর থেকেই স্পষ্ট হতে আরম্ভ হ'ল। ঘর বেঁধে সিনেমা আর ট্যাক্সি করে শখের চক্কর একেবারে যেন ফুরিয়ে গেল।

একটু বেলা করেই চা খাচ্ছিল; সৎ-শাশুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এলেন। গালে হাত দিয়ে অবাক হলেন।—ওমা, লক্ষ্মী বৌয়ের আমার এখনো চা খাওয়াই হয়নি? তবে রান্নার কাজে হাত দেবে কখন মা? বরাবরই কি এই বুড়ি নাগি চাঁড়ি ঠেলতে পারবে, না পারে? সকালে আমার পুজোর কাজ থাকে, তবু তো ঘর দোর নিকিয়ে উনুনে আঁচ দিয়েছি। তোমার শ্বশুর কাল সারা রাত যন্ত্রণায় চেঁচিয়েছে, এর পর তাকে তেল মালিশ করা আছে। তুমি তো বাছা ভুলেও ও-ঘর মাড়াও না, বুড়ো শ্বশুর রইল কি গেল। আটটায় নিত্যর অফিস, ন'টায় সত্যর। আজ আবার টিকে বিটা আসে নি। বাপের বাড়ি কি কাজকম্মো করতে, না এমনি বেলা করে ঘুমুতে?

ততক্ষণ নমিতা চায়ের পেয়ালা দূরে সরিয়ে রেখেছিল। শক্ত করে আঁচল বেঁধেছিল কোমরে। মৃদুস্বরে শাশুড়িকে বলল, আপনি কিছু ভাববেন না মা, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

বাটনা বাটলো নিজেই। প্রয়োজনীয় দু'একখানা বাসনপত্র তাড়াতাড়ি মেজে নিল। কলসীতে জল ভরতে গিয়ে কলতলায় পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, শাশুড়ির চোখে পড়ে গেল।

—সংসারের কাজ করতে হলে কাপড় একটু গুছিয়ে পরতে হয়, বৌমা। আর দামি শাড়ি পরে তুমি রান্নার কাজ করবে, তবেই হয়েছে। ছদ্দুদের ছোপে দু'দিনেই যে নষ্ট হয়ে যাবে। বাপের বাড়ি থেকে যদি না দিয়ে থাকে, তবে সত্যকে বলে খান দুই মোটা পাড়ের কাপড় আনিয়ে নিয়ো। বেনারসী পরে কেউ রান্না করে না।

পোশাকী শাড়ি একে একে তোরঙ্গে উঠল। এলো শাদা জমির ওপর চওড়া লাল কিম্বা কালো পাড়ের কাপড়, সর্বদা ব্যবহারের। সৎ-শাশুড়ি চাবি দিলেন না, কিন্তু সব কাজের ভার তুলে দিলেন একে একে। নিজে জপতপের পরিমাণ বাড়ালেন। গঙ্গাস্নান প্রাত্যহিক হ'ল। এর ওপর ঠিকে ঝিটা যেদিন কামাই করত (প্রায়ই করত) সেদিন তো নমিতার প্রাণান্ত। দেওর নিত্যব্রতকে না খেয়েই কারখানায় ছুটতে হ'ত, আর স্বামী সত্যব্রতও আধপেটা খেয়েই অফিসে যেতো।

সারা সকাল দুপুর কাটতো রান্নাঘরে। শ্বশুরকে খাইয়ে, শাশুড়িকে খাইয়ে নিজে স্নান সেরে খেতে বসত যখন, তখন বেলা দু'টো। তারপরেও ভালো ঘুম হ'তনা। শোবার ঘরখানা অসহ্য গরম; একটাই মোটে জানালা, সেটা আবার পশ্চিমে। খোলবার উপায় ছিল না। তা ছাড়া বেলা পড়বার আগেই আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে। দিবেলের খাবার করার পালা আছে। রাবণের চিতা কলিকালেও যদি কোথাও জ্বলে তো গৃহস্থবাড়ির হেঁসেলে।

আরো ছোট ছোট ভুল জমলো একে একে। সম্বন্ধ আসবার সময় শুনেছিল, স্বামীর মাইনে দু'শো টাকা, এসে জানলো একশো পঁচিশ। গ্র্যাজুয়েট নয়, বি, এ, পর্যন্ত পড়েছিল। ছোট দেওর এনজিনিয়ার, এমনি একটা কথা কানাঘুষায় শোনা গিয়েছিল বিয়ের আগে। এসে দেখল, এনজিনীয়র দূরে থাক, ওভারসীয়রও নয়। নিত্যব্রত ম্যাট্রিকও পাশ করে নি, বছর কয়েক বসে থেকে সম্প্রতি একটা কারখানায় মিস্ত্রী হয়ে ঢুকেছে।

তবু যখন সব কাজের শেষে পশ্চিমের জানালায় এসে দাঁড়াত, ঝিরঝিরে হাওয়ায় শুকিয়ে যেতো কপালের ঘাম; কোঁটা কোঁটা ঘিম মনের ওপর পড়ত টপ টপ করে।

একদিন সত্যব্রতকে বলল, শোবার ঘরে একটু চড়া পাওয়ারের আলো হয় না? এটা মোটে পনেরো।

—ওরে বাবা, এতেই ইলেকট্রিক বের বিল উঠছে চার পাঁচ টাকা, শালা বাড়িওয়ালা ওয়্যারিং পাল্টেও দেবে না। কেন, বেশি পাওয়ারের আলো দিয়ে কি হবে।

—গা ধুতে ধুতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ভালো করে দেখে মাথাও আঁচড়াতে পারি না।

আস্তে আস্তে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এলো সত্যব্রতর।—রাত্তিরে মেয়েমানুষের আয়নায় মুখ দেখা বারণ, জানো না?

—বারণ কেন? মুখ টিপে হাসলো নমিতা, কী হয় দেখলে?

—নষ্ট হয়ে যায়।

প্রথমে নমিতার মনে হয়েছিল সত্যব্রত ঠাট্টা করছে। কিন্তু ভারি কণ্ঠস্বর শুনে কেমন সন্দেহ হ'ল। ভালো করে চেয়ে দেখল, সত্যব্রতর মুখ গম্ভীর, পরিহাসের চিহ্নমাত্র নেই।

কেমন যেন রোখ চেপে গেল নমিতার, আবার বলল, এ-আলোয় তো বই-টইও পড়া যায় না।

বই? সত্যব্রতর ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হ'ল। সন্দিগ্ধ সুরে বলল' বই পেলে কোথায়। কে বই এনে দেয় তোমাকে?

—কে আবার। বিয়ের কয়েকখানা পেয়েছিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে দেখতাম।

নমিতার সব কথা যেন এক ফুঁয়ে উবে গেল।—পুরুষ মানুষের আবার নষ্ট হওয়া। ব্যাটা ছেলে নষ্ট হয় না বৌ, নষ্ট হয় মেয়ে মানুষ।

তা জানি। কঠিন, চাপা গলায় নমিতা বলে উঠল, যদি বলি ও একজন মেয়েমানুষকে নষ্ট করতেই চেষ্টা করছে!

সত্যব্রত এবারেও পাত্তা দিল না স্ত্রীকে।

—মেয়েমানুষ নষ্ট করবে নিত্য? ও তো দুধের শিশু। বলতে বলতে আরো সন্নিহিত হয়ে এলো সত্যব্রত, পরিহাসতরল গলায় বলল, কে সেই মেয়েমানুষ শুনতে পাইনা? তুমি নও তো।

বলতে বাধছিল, তবু ক্লিষ্টস্বরে নমিতা বলল, যদি বলি হ্যাঁ।

সত্যব্রত হঠাৎ নমিতাকে ছেড়ে দিল, সরে গেল বিছানার ওপাশে। অন্ধকারেও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নমিতার চোখে চোখে। তারপর পাশ ফিরে শুষ্ককণ্ঠে বলল, নিত্য ছেলেমানুষ, ঠাট্টা করে কী বলতে কী বলেছে, তুমি ভুল বুঝেছ। এবারে তুমি ঘুমোও দিকি। মাকরাত্তির এসব ছেলেমানুষি ভালো লাগে না। কাল সকালে আমি ছোঁড়াটাকে ধমকে দেবো এখন। সম্পর্কের পরিষ্কার বোঝে না!

পাশ ফিরে নাক ডাকাতে লাগল সত্যব্রত, তারও পরে অনেকক্ষণ ধরে নমিতা বিনিদ্র চোখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল। দূর সদর রাস্তায় শেষ ট্রামের শব্দ শুনল, শেষ রিক্সার টুং টুং গলির মোড়ে মিলিয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেছে, উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল খেলে হয়, কিন্তু সমস্ত উচ্ছ্বাস গলায় কে যেন একটা ভারি ওজনের পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে। শুধু বীতঘুম চোখের শুকনো পাতা দু'টো জ্বলছে। চেয়ে থেকে থেকে নমিতার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, হঠাৎ মনে হ'ল, এ ঘরের দেয়াল-গুলো যেন নড়তে আরম্ভ করেছে, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পা ফেলে ওর খাটখানা লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। কড়িকাঠে বুঝি মড় মড় শব্দ হ'ল। অসাড় প্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে নড়ে উঠতে চাইল নমিতা, চীৎকার করতে চাইল, পারল না। দেয়ালগুলো আরো ঘন হয়ে এসেছে, দূরত্ব এখন দু'হাতের বেশি না। আসছে যদি, আরো তাড়া-তাড়ি আসুক না, চূণওরকির পলেস্তারা আর ভারি ভারি ইঁটগুলো চেপে বসুক ওর বুকের ওপর। এই বিব্রত বিড়ম্বিত জীবনের ইতি হয়ে যাক।

নমিতা চোখ বুঁজে রইল কিছুক্ষণ, তারপর শুয়ে শুয়ে মিট মিট করে তাকালো। কই পিষে যায়নি তো। দেয়ালগুলো এখনো এগিয়ে আসছে, কিন্তু কেঁচোর মতো গতিতে। নমিতা ফুঁপিয়ে উঠল, টপ টপ করে কয়েকটা উষ্ণ জলের ফোঁটায় বালিস ভিজে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই বিড়ম্বনার এত সহজে শেষ নেই। এই দেয়ালগুলো ক্রমাগত এগোচ্ছে কিন্তু কখনো পিষে ফেলবে না, চক্রান্তটা নমিতার জানা হয়ে গেছে।

(২)

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল, একটা। দৃপ্ত পদক্ষেপে একজোড়া অক্সফোর্ড জুতো কামরা থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে আড়াল হয়ে গেল। লাঞ্চ আওয়ার। হলঘরের গুঞ্জন এতক্ষণে প্রায় হট্টগোলে পরিণত হয়েছে। টেবিল চাপরানি, চেয়ার টানাটানি, পুরুষগুলো হৈ-চৈ করতেও পারে এত! এবারে ওরা কেউ কেউ এ-ঘরে আসবে নাকি, নমিতাকে শেষ দিনে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে না? সকলের গলা এক হয়ে মিশেছে, তবু নমিতা কান পেতে আলাদা আলাদা কণ্ঠ-স্বর ধরতে চেষ্টা করল। টেবিল চাপড়ানিটা নীরদ বাবুর, ঐ গুন গুন গানের গলা প্রকাশবাবু ছাড়া আর কার? সরকারের শিল্পনীতি নিয়ে কূটতর্ক জমিয়ে তুলেছে সন্তো কলেজ থেকে বেরুনো ছোকরা ক'টি। কেরানিবাহিনীর সব চেয়ে শেষের রিক্রুট। কিন্তু সুপ্রিয়র সাড়া নেই কেন। সুপ্রিয় কি আজ আসেনি।

বিবাহিত জীবনের দেয়াল ঘেরা বন্দিত্ব থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে মুক্তি মিলেছিল কিন্তু। একটা

শোচনীয় দুর্ঘটনা নমিতার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল।

প্রথম দিকে বোঝা যায় নি। সত্যব্রত অফিস থেকে এসেই কিছুদিন থেকে বিছানায় শুয়ে পড়ত, বলত মাথা ধরেছে। ক্লান্তির ছাপ ছিল চোখের কালিমায়। তারপর ক্রমশঃ মনে হ'ল অল্প অল্প জ্বর, থার্মোমিটারে ধরা পড়ে কি পড়ে না। নমিতা ডাক্তারের কথা তুলতে সত্যব্রত ধমক দিয়ে বলল, গা গরম হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে, এমন নবাবের ব্যাটা আমি নই। অফিসে যেতে থাকল যথারীতি।

কিন্তু মুখ দিয়ে যেদিন রক্ত উঠল, সেদিন আর সন্দেহ রইল না। সৎ-শাশুড়ি কেঁদে বাড়ি মাথায় করলেন, নিত্য গম্ভীরমুখে ডাক্তার ডাকতে ছুটল, অক্ষম পক্ষাহত শ্বশুর পাশের ঘরে গোঙাতে লাগলেন, দোতালার ভাড়াটেরা নাকে কাপড় দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে এদিকে তাকাতে তাকাতে নেমে গেলেন, আর চৌকাঠের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নমিতা সব দেখল। মুখের একটা পেশিও কুঞ্চিত হ'লনা।

শাশুড়ি নতুন করে সেদিন বৌকে শাঁখা পরালেন, স্বামীর কল্যাণের জন্যে সিঁদুরে লেপে দিলেন কপালটা। কালো পাড় শাড়ি পরা নমিতার ধারণ হ'ল। রোজ পুরুত আসেন, কুলগুরু আসেন, ধূপ ধুনো জেলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন চলে।

ওদিকে সত্যব্রত রক্ত তুলছে ক্রমাগত। ডাক্তার রোজ বলছেন, এ চিকিৎসায় হবে না। একটা স্যানি-টেরিয়মে পাঠাতে পারলে—

পারলে ভালো, সেকথা বুঝতে ডাক্তারী বুদ্ধি লাগে না। কিন্তু খরচ কই। সত্যব্রতর ছুটি পাওনা ছিল মোটে মাস দেড়েক, তার ওপর অফিস দয়াপরবশ হয়ে আরো তিন মাস মঞ্জুর করলে। নিত্য লেখাপড়া জানে না, তাকে দিয়ে কোন কাজ হয় না, নিজের বিদ্যাবুদ্ধিমত ইনিয়ে বিনিয়ে দরখাস্ত লিখে আরো তিন মাস আধা মাইনের ছুটি নমিতা আদায় করে দিলে। সেই তিন মাসও ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রাজরোগ গেল না। নমিতা আরো তিনমাসের ছুটির দরখাস্ত করল, সে চিঠির কোন জবাবই এলো না।

সত্যব্রত ক্ষীণকণ্ঠে বলল, এবার উপায় ?

উপায় আছে, নমিতা শান্ত গলায় বলল। আমি তোমার অফিসে যাবো। মিঃ সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।

সত্যব্রতর অবিশ্বাসী চোখের বারকয়েক পলক পড়ল। —তুমি অফিসে যাবে !

কপালের সব সিঁদুর মুছে নমিতা সংযত ছোট্ট একটু টিপ মাত্র রাখলে। ভদ্রগোছের একটা পোষাকী কাপড় বেরুলো তোরংগ থেকে। অনেকদিন পরে একা রৌদ্রস্নাত পথে পা দিয়ে নমিতার চোখ ঝলসে গেল, বুকটাও যে একটু কাঁপল না তা নয়।

ঘন্টা দুই পরে ফিরে এলো যখন, নমিতার মনে হ'ল ঘরের দেয়ালগুলো আর তেমন ঘন হয়ে নেই, কেঁপে কেঁপে ফিরে গেছে যথাস্থানে। ঘর্মাক্ত কপালের সিঁদুরের টিপটা আরেকটু ছড়িয়েছে, ছড়াক। আজকের সাফল্যের জন্যে নমিতা যে-কোন মূল্য দিতে রাজি।

সত্যব্রতর অফিসের বড়ো সাহেব মিঃ সামন্ত ওর সঙ্গে শুধু যে দেখা করেছেন তা নয়। যত্ন করে বসিয়েছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সত্যব্রতর স্বাস্থ্য, ওদের সংসারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। তারপর,—তারপর অবশ্য আপশোষ করে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, অফিসের আর নিয়ম নেই ছুটি দেবার। তবে বিনা-মাইনের সত্যব্রত যতদিন প্রয়োজন ছুটি পেতে পারে।

—কিন্তু তাতে তো সমস্যা মিটবে না। নমিতা নম্রগলায় বলেছে।

—না ,তা হবে না। এভিডেন্টলি নট্। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আপনারা পেতে পারেন, কিন্তু তা হলে সার্ভিস ডিসকনটিনিউড্ হয়। আরেকটা উপায় আছে। অফিস থেকে কিছু লোন। মিসেস চক্রবর্তী, আপনি কাল একবার আসতে পারবেন ?

পরদিন মিঃ সামন্ত জানালেন, অফিস থেকে লোন

পাওয়া যাবে। বেশি না, হাজার দুই। সত্যব্রতর যা অসুখ—ইউ স্ত ওয়র্স কামস্ টু ওঅর্স্ট, (ঈশ্বর না করুন), টাকা ফেলে রেখে অসুবিধে হবে সেই জন্যে ফিফিউরিটি চাই আছে কিছু?

ইন্সিওরেন্সের একখানা পলিসি।

দেখে রেখে সামন্ত বললেন,

প্রীমিয়ম ক্লীয়ার? নমিতা

যাক্, কোন কথা নেই।

এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন।

নিতে গিয়ে নমিতা শুনল, সামন্তসাহেব ইতিমধ্যে আরও অনেক বন্দোবস্ত করেছেন। অফিস থেকে কিছু টাকা অগ্রিমেরও আনা আছে। সামন্ত নিজেই দেবেন এক শো, আর সামন্ত দিলে সবাই কিছু না কিছু দেবেই। মিসেস চক্রবর্তীর আপত্তি নেই তো, প্রেস্টিজের দিক থেকে?

তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালার লোক সকালেই এসে অকথ্য গালিগালাজ ক'রে গেছে। নমিতা বলল, প্রেস্টিজ?

শুধু এই নয়। আরো কিছু করলেন মিঃ সামন্ত। শুভ্রচেনা একটা স্বাস্থ্যাবাসে চিঠি দিয়েছেন জানালেন। যদি বেড খালি থাকে, তবে সত্যব্রতকে সেখানে রাখতে কোন অসুবিধেই হবে না। কৃতজ্ঞতায় নমিতার চোখ ছলছল হয়ে এল।

অফিস থেকে কম নয়, প্রায় শ' চারেক টাকা উঠলো। সেই টাকা আনতে আরো প্রায় সপ্তাহখানেক নমিতাকে অফিসে ঘোরাঘুরি করতে হ'ল। শেষ দিন যখন ফিরে এলো, তখন ওর চোখে মুখে, চলায় উত্তেজনা স্পষ্ট। আজ অপ্রত্যাশিত একটা অফার এসেছে মিঃ সামন্তর কাছ থেকে। টাকাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে সামন্ত বলেছেন, ইট্স্ নট্ মাচ্; সরি, উই কুড্ নট্ রেইজ মোর। এতে সাময়িক সুরাহা হবে, কিন্তু স্থায়ী কোন সমাধান তো হ'ল না।

নমিতা চুপ করেছিল। সামন্ত একটু থেমে বললেন, আমার একটা প্রস্তাব আছে, অব কোর্স ইফ্ মিসেস চাক্‌রাভার্টি এগ্রীজ্। তার আগে একটা প্রশ্ন আছে, যদি কেয়াদপি মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাস্য মিসেস চক্রবর্তি কতদূর পড়েছেন।

—আই, এ, পর্যন্ত। নমিতা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল।

—ব্যস ওতেই হবে। সামন্ত আস্তে আস্তে অভিপ্রায়টা ব্যক্ত করলেন। এই অফিসেই নমিতাকে একটা চাকরি তিনি দিতে পারেন। ঘরের বৌয়ের চাকরি করতে যদি কোন প্রেজুডিস না থাকে, তবে নমিতা অফারটা এ্যাকসেপ্ট করুক না। কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, সুস্থ হয়ে সত্যব্রত ফিরে এলেই নমিতা ফিরে যেতে পারবে তার নিজের ক্ষেত্রে, গৃহস্থঘরের অন্দরে।

—আমি রাজি। নমিতার সব উচ্ছ্বাস দু'টি মাত্র শব্দ হয়ে বেরিয়ে এল।

—বেশ, আপনার স্বামীর মত নিন, অন্যান্য অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শেষ সিদ্ধান্তটা আমাকে কালকে এসে জানিয়ে যাবেন।

নমিতা চাকরী করবে শুনে সত্যব্রত ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। নিত্য টিপ্পনী কাটলে। শাশুড়ি ফোস্ করে উঠলেন একবার, কিন্তু বাধা দিতে পারলেন না।

প্রথম দিন চাকরি করে ফিরে এসে নমিতা যখন ঘরে ঢুকলো, তখন শরীর অবসন্ন, তবু কোন ক্লান্তিকেই ক্লান্তি বলে মনে হ'ল না। পশ্চিমের জানালা দিয়ে আজ যেন হুহু করে হাওয়া আসছে। দেয়ালগুলো অনেকদিনই সরে গিয়েছিল, আজ চারধারে তাকাতে মনে হ'ল সেই দেয়াল যেন একেবারে মিলিয়ে গেছে, কোন প্রবরোধ নেই।

সেই থেকে নমিতার রূপান্তরের শুরু। একমাসের মধ্যেই সত্যব্রত স্বাস্থ্যাবাসে চলে গেল। প্রথম ক'দিন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগত, ক্রমে সহজ হয়ে এলো। আস্তে আস্তে হেঁসেলের ভার শাশুড়িই আবার নিলেন।

নমিতার ন'টায় অফিস। নিজে রান্না করে খেতে হ'লে সময়ে কুলোয়না। মাসের শেষে মাইনে পেলো। চাবিটা দিয়ে এলো নমিতার আঁচলে।

নিজেকে দেখে নিজেরই বিস্ময় লাগত নমিতার, একেবারে কুঁকড়ে নিজের মধ্যেই নিজে গুটিয়ে গিয়েছিল যে, সে যেন একটু একটু করে। অফিসে ওর কাজের সুখ্যাতি হয়েছে; প্রমাণ করেছে ও অনভ্যস্ত কিন্তু আনাড়ী নয়। এ শক্তি ওর ছিল কোথায়, গহন অহঙ্কে মুখ বুজে হাঁড়ি ঠেলেছে, গঞ্জনা শুনেছে শাশুড়ির, স্বামীর অবহেলা সয়েছে, আত্মরক্ষা করেছে দেওরের লোলুপ দৃষ্টি থেকে।

অফিসে ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকল নমিতার। সামন্তর একজন ষ্টেনোটাইপিষ্ট চাই। ওকে ডাকালেন সামন্ত। মাইনে বেশি, করবেন আপনি এ-কাজ?

—কিন্তু আমি যে, ইতস্তত করে নমিতা শর্টহ্যাণ্ড জানি না। টাইপও সামান্যই জানি, শিখে নেবো।

সিগারেটের বাকিটা শেষ করে সামন্ত কিছুক্ষণ কী চিন্তা করলেন। তারপর ছাই ঝেড়ে ফেলে বললেন, লাগবেনা শর্টহ্যাণ্ড। আমার ডিক্টেশানের স্পীড বেশি না, আপনি দ্রুত হাতে লিখে নিলেই চলবে। আসছে মাসের পয়লা থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট, আপনি এর মধ্যে টাইপটা শিখে নিন ভালো করে। পরে শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিতে পারেন ভালোই।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নমিতা টাইপরাইটিং আর শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশে ভর্তি হ'ল। বাড়ি ফিরতে রাত হ'ত। শাশুড়ি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন, কিছু বলতে সাহস পেতেন না।

প্রথম দিকে ওকে নিয়ে অফিসে চাপা হাসির অন্ত ছিলনা। সবাই চেয়ে থাকত মুখের দিকে, কেউ কেউ ওর জুতোর গোড়ালি কেমন খুট খুট করে পড়ে, তাই লক্ষ্য করত। নমিতা ভ্রূক্ষেপ করেনি। অম্বরের ছায়া এখানে কোথায় পাবে; সদরে একটু আধটু তাপ পোহাতেই হবে।

কারুর সঙ্গে মিশত না; টিফিনের সময় বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে খেতো। কিন্তু সুপ্রিয় যেদিন ওর খুপরিতে চড়াও হয়ে এলো, সেদিন নমিতা বিস্মিত না হয়ে পারে নি। চওড়া কাঁধ, ভারি কণ্ঠস্বর, হঠাৎ সুপ্রিয়কে দেখলে একটু ভয় হয়।

—আমরা এক ইউনিয়ন করছি অফিসে। আপনাকে যোগ দিতেই হবে। চাঁদার একটা খাতা ওর দিকে ফেলে দিয়েছিল সুপ্রিয়।

অস্বস্তিগ্রস্ত কণ্ঠে নমিতা বলেছে, ইউনিয়ন? কিসের ইউনিয়ন?

—অফিসের। এক টাকা প্রণামি, মাসে মাসে আট আনা।

ইউনিয়নের উদ্দেশ্য কী, আর কারা থাকবে এতে, নমিতা কিছুই জিজ্ঞাসা করল না, টাকাটা দিয়ে দিলে লোকটা বিদায় হলে বাঁচে। রসিদ লিখতে লিখতে সুপ্রিয় বলল, আসছে রবিবার ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ্ কমিটি হবে। আপনি আসবেন কিন্তু।

সুপ্রিয় চলে যাচ্ছিল, নমিতা ওকে ডাকল, শুনুন।

সুপ্রিয় ফিরে তাকালো। নমিতা একটু ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা, এই ইউনিয়নে মিঃ সামন্ত থাকবেন তো?

হেসে উঠল সুপ্রিয়, অনর্গল, একেবারে ছেলেমানুষের মতো।

—আপনি কিছুই বোঝেন না দেখছি, মিসেস চক্রবর্তী। রবিবারে সভায় আসবেন সব বুঝিয়ে দেবো।

রবিবারের সভায় সুপ্রিয় দীর্ঘ একটা উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলে; ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা, সংঘবদ্ধতার সুবিধা, মিলিত কণ্ঠের দাবীকে মালিকেরা কিছুতেই যে নাকচ করে রাখতে পারে না, বহু নজির তুলে সে এইসব প্রমাণ করতে চেষ্টা করল। শুনতে শুনতে কান লাল হয়ে উঠল নমিতার। এই ইউনিয়ন মিঃ সামন্তরই বিরুদ্ধে, আর আশ্চর্য, সে বিনা সামন্তকে এর সভ্য করার কথা ভেবেছিল!

বক্তৃতাশেষে সুপ্রিয় যখন মুষ্টি আস্ফালন করে বলল, "আমরা এই অফিসের সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ চাই",—অমনি কানে তালা লাগানো হাততালি পড়ল। এর পরে যখন সুপ্রিয়র নাম সেক্রেটারী হিসেবে প্রস্তাবিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত উঠল। নমিতা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সেই উত্থিত হাতের ভীড়ে তার হাত একখানি।

পরে অবশ্য সুপ্রিয় ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ওকে আরো প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছিল। একদিকে যেমন সংগ্রাম, অন্যদিকে সংগঠন। অফিসে একটা নামে মাত্র লাইব্রেরী আছে, খানদুই পত্রিকা আসে, আর আছে শ' খানেক বই, বেশির ভাগই গোয়েন্দা গল্প। ইউনিয়ন এই লাইব্রেরির ভার গ্রহণ করবে। আমূল সংস্কার করতে হবে, নতুন বই আনতে হবে। যাদের নিয়ে একটা বড়ো কাজ করতে চাইছে সুপ্রিয়, তাদের মনের খোরাক তো চাই। অবোধ অপরিণত মন কখনো অনন্যনীয় সংকল্পের আধার হয় না। সুপ্রিয় নমিতাকে বিশেষ করে লাইব্রেরির ভার নিতে অনুরোধ করলে। এ হ'ল সংস্কৃতির কাজ, শিল্পের কাজ, সুপ্রিয় অনেক ভেবে দেখেছে, এ কাজ মেয়েদের দিয়েই সবচেয়ে সুচারু ভাবে সম্পন্ন হবে।

—কিন্তু আমি, আমি কি পারবো? অনিশ্চিত কণ্ঠে নমিতা জিজ্ঞাসা করেছে।

—পারবেন। আর আমি তো আছি—সুপ্রিয়র সেই মন্ত্রস্বর, সেই গাঢ়কণ্ঠ আশ্বাস।

লাইব্রেরি গড়ে তোলার কাজে নমিতা বিলিয়ে দিল নিজেকে। সুপ্রিয়র সঙ্গে সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ বসে অবশ্য পঠিতব্য বইয়ের লিষ্টি তৈরি করল। এত কাজ আছে, এত বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অবকাশ আছে জীবনে, আর সে কিনা শ্রীধর মল্লিক লেনের নিরালোক কুঠুরিতে এতদিন শুকিয়ে, বুড়িয়ে, ঝুরিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল।

বোনাসের ব্যাপারটায় নমিতার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ন্যায্যতঃ বলা যায় সে বছর বোনাস বন্ধ থাকবে বলে গুজব শোনা গিয়েছিল। সারা অফিসে দিনকতক শুধু চাপা উত্তেজনা আর ফিস ফাস আলাপ। ইউনিয়নের জরুরি সভা ডাকা হ'ল। সেখানেও তুমুল হট্টগোল। শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে আলাপ চালাবার জন্যে সুপ্রিয় আর নমিতাকে ভার দেওয়া হ'ল।

ইউনিয়নের চিঠির জবাবে সামন্ত জানালেন তিনি একজন মাত্র প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। সুপ্রিয় বলল, আমি একলাই যাই। নমিতা বাধা দিয়ে বলল, না আমি। আপনি গিয়ে তো কেবল ঝগড়া করবেন। দেখুন না আমি কী করতে পারি।

সামন্ত নমিতাকে দেখে অবাক হবার ভাণ করলেন। —আপনিও এই ইউনিয়নের মধ্যে আছেন মিসেস চক্রবর্তী? বেশ, বেশ। এবারে আপনাদের দাবী বলুন।

—এক মাসের বোনাস।

—এক মাসের হবে না, দেখছেন তো কোম্পানীর অবস্থা।

গত বছরের আয় ব্যয়ের কনফিডেনসিয়্যাল ষ্টেটমেণ্টটা নমিতা টাইপ করেছিল। বললে, কেন, গত বছর তো কোম্পানীর নেট প্রফিট ছিল—

দোহাই আপনার, সামন্ত সাহেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, ষ্ট্যাটিসটিক্স্ আনবেন না। আমি রিজনেবল্ সব কথা শুনতেই রাজি আছি।

তারপর কী হ'ল, বেশি কথা না বাড়িয়েই মিঃ সামন্ত আধ মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

নমিতা সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো যখন তখন জয়ের সাফল্যে ওর মুখ উদ্ভাসিত। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে ইউনিয়নের কামরায় টেবিল চাপড়ানো আর থামে না। উত্তেজনা থেমে গেলে সুপ্রিয় নমিতাকে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, এতে আমাদের সংঘবদ্ধতার জয় হ'ল না সুন্দর মুখের, ঠিক বুঝতে পারছি না।

নমিতা আরক্ত হয়ে বলেছিল, আমার আর কী এমন

কৃতিত্ব। আপনি যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বলেছি।

সুপ্রিয় অল্প একটু হেসেছিল শুধু।

সুপ্রিয় আজ আসে নি? ঘড়িতে এখন তিনটে। শীতের সংক্ষিপ্ত দিন ফুরিয়ে এলো। আর এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা। তারপরই যবনিকা পড়ে যাবে নমিতার জীবনের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ওপর।

সত্যব্রত সুস্থ হয়ে ফিরেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন সে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম। মিঃ সামন্ত পূর্বব্যবস্থা মত পুরানো কর্মীকে ফের নিয়ে নিচ্ছেন কাজে। নমিতার আর প্রয়োজন নেই।

একটু পরে খাস্তগির নিজেই এসে হিসাব মিটিয়ে দিলেন। বললেন, আজই চললেন মা লক্ষ্মী? ভালো ভালো। নিজের স্বামী, নিজের সংসার, নিজের পরিজন, এ-ছাড়া মেয়েমানুষের আর কোন সুখ আছে নাকি? অফিসে যারা কাজ করে, তারা কি মেয়ে?

নমিতা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তারা তবে কী। কিন্তু খাস্তগিরবাবু অবসর দিলেন না। বললেন, আপনাকে আমি দেখেই বুঝেছি, আপনি সে দলের নন। আমাদের শাস্ত্রে বাঘের কল্যাণী বলেছে, আপনি তাই।

খাস্তগিরবাবু কারণও দেখালেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে সতী কে? সাবিত্রী। কেননা সে যমের কাছে মৃত স্বামীর আনুভিক্ষা করেছিল। আর কে? বেহুলা। সে দেবতাদের মনোরঞ্জন করে স্বামীকে পুনর্জীবন দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে নমিতা তুলনীয় কিসে না, সেও তো ঘর ত্যাগ স্বীকার করেনি স্বামীর জন্যে। গৃহকোণ ছেড়ে নেমে এসেছে কন্টকাস্তৃত পথে; স্বেদে শোণিতে গাঁথিয়ে রেখেছে স্বামীর পরিবার। সব তার যদি মাথায় নমিতা তুলে না নিতো, তবে হয়ত সত্যব্রত সুস্থ হয়ে ওঠার অবকাশই পেতো না।

একে একে এলেন আরো অনেকে। আজই নমিতার ঐ-অফিসে শেষ দিন, সকলেরই জানা। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই নমিতাকে কেয়ারওয়েল দেওয়া হয়েছিল। আজও দু'একজন কর্মী এলেন। সব চেয়ে শেষে এলেন ভুবনবাবু। প্রৌঢ় দিনিয়র ক্লার্ক, এই অফিসেই পঁচিশ বছর কাজ করে চুল পাকিয়েছেন। তিনি আমুলী সম্ভাষণাদির পর নীচু গলায় বললেন, তোমাকে একটা কথা আজ বলি মা-লক্ষ্মী। তুমি এই ইউনিয়ন টিউনিয়নে যোগ না দিলে ভালো করতে। সত্যব্রত আসছে, কিন্তু সেতো ষ্টেনোটাইপিষ্ট হবে না। সামন্তসাহেবের একজন ষ্টেনো চাই-ই। তোমাকে ওঁর রাখবার ইচ্ছেও ছিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই থাকতে পারতে। কিন্তু আমি সব বুঝিতো, ওর বাপের আমল থেকে এই কার্মে আছি। সেই যে বোনাসের ব্যাপার নিয়ে [illegible] গিয়েছিলে না? তারপর থেকেই ওর মন বিগড়েছে।

নমিতা কোন জবাব দিল না। ঢং ঢং চারটে বাজলো। নিজের আসনে বসেই নমিতা উসখুস করল সবাই এলো, শুধু সেই একজন বাদে, যার কথা নমিতা আজ অন্তত একশোবার ভেবেছে। আজই শেষ দিন, আর একটু পরেই ডাঙ্গায় উঠে পা দিয়ে নৌকা ঠেলে দেবার মতো অতীতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; আর হয়ত কোন দিন দেখাও হবে না জেনেও সুপ্রিয় এলোনা? চোখের পাতা দু'টি ভিজে উঠল, নমিতা মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইল। শেষে একসময় মাথাটা নুইয়ে দিল টেবিলের ওপর।

যখন ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি গুণে গুণে নেমে নমিতা রাস্তায় পা দিল, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। হাতে শুধু ছাতা আর সেই কবিতার বই। ফুটপাতে নেমে শেষবারের মতো বাড়িটাকে দেখবে বলে মুখ ফিরিয়েছিল, ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল সুপ্রিয়। একেবারে সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল নমিতা, সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। মুখের রক্ত শুকিয়ে গেছে নিমেষে, সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড কাটলো, একটিও কথা ফুটল না।

—এতক্ষণে, এতক্ষণে সময় হ'ল তোমার? সুপ্রিয়ই প্রথম কথা বলল, সবাই চলে গেছে, ছুটি হয়ে গেছে

কখন! আমি সেই চায়টে থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

তোমার বুঝি এতক্ষণে সময় হ'ল? আমি সেই দশটা থেকে বসে আছি, নমিতা বলবে ভেবেছিল, কিন্তু এ মুহূর্তে কোন নাটকীয়তা মানায় না। চোখের পাতার আবার ভিজে উঠেছিল, গোপন করতে মুখ ফেরালো।

হঠাৎ ওর হাত ধরে টানল সুপ্রিয়।—এসো। এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন কথা হয় না। ছোট্ট চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসেও কয়েকমিনিট স্তব্ধতায় কাটলো। শেষে, কোন কথা না বললে নয়, তাই নমিতা বলল, আজ অফিসে আসেন নি?

আজ? মাথা নীচু করে সুপ্রিয় আস্তে আস্তে বলল, আজ তো—বিজয়া—

বিজয়ার [illegible] না বুঝে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। বিজয়া—আজ তেমনি গম্ভীর কণ্ঠ সুপ্রিয়র, শুধু অস্বাভাবিক শান্ত। বলে গেল, আজও বিজয়া না হলে কবে বিজয়া, নমিতা? ভেবেছিলাম সারাদিন বাসাতেই থাকবো। তবুতো—তবুতো বিসর্জন দেখতে না বেরিয়ে পারলাম না।

—আই দেখা হবে না? নমিতা প্রশ্ন করল।

—না হওয়াই কি শোভন না?

নমিতা এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারলো না। সুপ্রিয়ই হঠাৎ জোর দিয়ে হেসে উঠে বলল, যাক; এ একরকম ভালোই হ'ল। তুমি ছিলেও গৃহিণী, হবেও গৃহিণী,—মাঝখানে শুধু কটা দিন বাজে কাজে—

নমিতা বলতে চাইল, বাজে নয়। এ আড়াই বছরে তার মনের দিগন্ত সুপ্রসর হয়েছে। মানুষকে চিনেছে। নিজেকে আবিষ্কার করেছে। সুপ্রিয়র সাহচর্য পেয়েছে।

কিন্তু এবারো একটা আর্দ্র অনুভূতি সত্তার গভীরতম প্রান্ত থেকে ঘূর্ণির মতো উঠে সব সাজানো কথা বিপর্যস্ত করে দিল। কিছু বলা হ'ল না।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, রাত্রিতে, নমিতার আর ঘুম ভাঙে নি। ভোরের দিকে সত্যব্রত ওকে জাগিয়ে দিল।

—এই, ওঠো, ওঠো। আমার ডিমটা সেদ্ধ করে দাও। রান্নাটাও তাড়াতাড়ি সেরো, আজ আমার অফিস, মনে নেই?

উঠতে গিয়ে নমিতার মনে হ'ল সমস্ত শরীর অসাড়। তবু উঠল। ডিম আধসেদ্ধ করে এনে দিল। গোটা ডিমটা এক সঙ্গে মুখে পুরে সত্যব্রত বলল, তারপর? কাল কী হ'ল আফিসে। সামন্তসাহেব কিছু বললেন?

নমিতা নিরুত্তরে চেকটা শুধু স্বামীর হাতে তুলে দিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সত্যব্রত বলল, বেশ তুমি সাহেবের নেকনজরেই ছিলে দেখছি। নইলে এক কথায় আড়াই মাসের মাইনে—

—এ তো অফিস দিয়েছে। নমিতা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল।

—অফিস দিয়েছে? কই, দেখি। সত্যব্রত চেকটা মেলে ধরল নমিতার চোখের সামনে। অফিস দিলে অফিসের একটা সীল থাকতো। তাতো নয়, এ তো শুধু সামন্তসাহেবের সই দেখছি। চোখ দুটো একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে অর্ধমুদিত করে সত্যব্রত বলল, এ টাকাটা সামন্ত তোমাকে নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন। গ্র্যাচুয়িটি ক্যাচুয়িটি নয়। ও তোমার মনের ভুল, বৌ বোঝার ভুল। কই, নিত্যকে বাজারের পয়সা দাও। একপো মাংস আনিস নিত্য। আমাকে অনেকদিন এখনো ডিউটি ডায়েটে থাকতে হবে।

নিত্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। পয়সা দিতে নমিতা বাইরে যেতেই ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, আজ সন্ধ্যেবেলা একটা জোর কিস্টি লাগাবো বৌঠান। দাদা এ্যাদ্দিন বাদে কাজে জয়েন করছে, একটু ফূর্তি চাই। আমার ওস্তাদকে ধরে নিয়ে আসবো, আজ সে এ্যায়সা গান, তুমি শুনে 'থ' মেরে যাবে। সেই সঙ্গে আমার তবলা। শুনে তোমাকে বলতেই হবে, হ্যাঁ ঠাকুরপো সত্যি শিখেছে বটে।

একটু পিছিয়ে এলো নমিতা। সত্যব্রতর সামনে কিছু বাড়াবাড়ি করতে নিত্য একবার সাহস পাবে না; কিন্তু

কুকুরের মতো ঘেঁসে ঘেঁসে আঁচল শুঁকতে চাইছে কেন নমিতার।

উনুনে আঁচ দিতে গিয়ে নমিতার চোখে জল এসে গেল। আবার ফিরে এসেছে সেই দেয়ালঘেরা জীবনে। সেই সন্দিগ্ধ স্বামী আর ক্ষুব্ধ দেওর। হাঁড়ি, হেঁসেল আর সংসার।

জুতো জোড়া পুরনো মাপেরই আছে। শুধু পা দু'খানা বড়ো হয়ে গেছে।

• •

ভাত চাপিয়ে ঘরে ফিরে এসে নমিতা সকালের কাগজখানা তুলে নিল। সত্যব্রত বলে উঠল, ইংরিজি রাখছিলে বুঝি? নমিতা উত্তর দিল না। সত্যব্রত বিরক্ত গলায় বলে উঠল, তোমার এ সব বড়ো বাড়াবাড়ি চাল-চলন বন্ধ করো তো বৌ, মেমসাহেবি ছাড়ো। এই তো দেখ, তুমি আমাকে গরম দুধটা এখন পর্যন্ত দাওনি। আঙুরের রস দিয়েছ? আরে মেয়েমানুষ হ'ল হেঁসেলের আবার ব্যাপারী—লণ্ডন স্টোকিওর জাহাজের খবরে কাজ কী।

সত্যব্রত নিজমনেই বলল, যাই চানের যোগাড় দেখিগে। শালার অফিস আবার ন'টায়। তুমি কিন্তু বেঁচে গেছো বৌ। হিংসে হয়। ন'টা—চারটের দাসত্ব তোমাকে আর করতে হবে না।

হঠাৎ বুঝি সত্যব্রতর খেয়াল হ'ল, নমিতা অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নি:—কী ব্যাপার, চুপচাপ যে?

নমিতার মুখ তখনো খবরের কাগজের আড়ালে ঢাকা ছিল। কাগজটা না সরিয়ে শ্রান্তকণ্ঠে বলল, কিছু না, এমনি। ন'টা চারটের দাসত্ব আর চব্বিশ ঘণ্টার দাসিত্ব। কোন্ বেড়িটা বেশি শক্ত ভাবছি।

পথচারী

সন্তোষ কুমার অধিকারী

বিচ্ছিন্ন রাত্রির স্বপ্ন, পথচারী পথে পথে ঘুরি,
ঘুরি আর দেখে যাই পৃথিবীর নিত্য রূপান্তর;
দিন আর রাত্রি যায়, সূর্য্য ক্রমে ম্লান হয়ে আসে,
ব্যথিত উদাস চিত্তে ভাবি শুধু—আয়ু শেষ হ'লো।
এইত দিনের প্রান্তে পৃথিবীরে দেখেছি নিবিড়
হৃদয়ের অনুভবে। দেখেছিত সূর্য্যোদয় ভরি'
আরক্ত হৃদয়ে প্রেম মানুষেরে করেছে মহৎ—;
রাত্রির আড়াল কভু টানে নাই কলঙ্ক উচ্ছ্বাসে
ধ্বনিকা; মানুষেত ভুলি নাই শান্তির সংগ্রামে।
পৃথিবীরে খুঁজিতেছি আজ। খুঁজিতেছি জীবনের
পরিপূর্ণ অনুভব। কোটি কোটি বর্ষ ভাঙ্গি কোথা
সুদূরের সুরলোকে প্রগতি বিশ্বের। যাযাবর
পথচারী তবু মোরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখে যাই,—
আমাদের অগ্রগতি সীমাহীন জটিল বৃত্তের
ছায়ালোকে। দিন আসে, সূর্য্য যেন তুহিন উত্তাপে
অনুক্ষণ কেঁদে যায় পৃথিবীর অস্থির শিয়রে।

নীরবে চলিয়া যাই—মৃত্যু যত কাছে কাছে আসে,
হৃদয়ে শোনাই—এই বাঁচিবার একমাত্র পথ।
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে স্তব্ধ হ'লো সত্যের শরণ,
হিংসার পঙ্কিল স্পর্শে ভুলে যাই আপন আত্মার;
মানুষের ধর্ম আজ ভিন্ন হ'লো উপাসনা ভেদে,
ধর্ম আর জাতীয়তা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রেরণাতে
জন্ম দিলো অবিমিশ্র প্রেমহীন চরম হিংস্রতা॥

ধর্ম কভু মানুষেরে টানে নাই অসতর্ক ক্ষণে
মানুষেরে বাঁধে নাই বিলাসের মহাসমারোহে;
ধর্মহীন বিজ্ঞানের বহু ভোগে পরিতৃপ্ত মন
অতর্কিতে চমকিলো—পথ নাই, মৃত্যুময় ধরা;
চরম জিঘাংসা শুধু বিজ্ঞানের পূর্ণ অবদান।

দর্শনের কূটভাষ্যে আপনারে ঢেকে রাখা ছাড়া,
পথ আর দেখিনাকো বিপন্ন বিজ্ঞানী পৃথিবীর।

ভ্রাম্যমান গৃহ

শ্রীপ্রমথনাথ শীল বি, কম: এ, এম, আই, টি, এ (লণ্ডন)

[প্রবন্ধ]

রূপকথায় আমরা অনেক চলন্ত বাড়ীর কথা শুনিয়াছি; কিন্তু উহার মধ্যে যে সত্যতা আছে তাহা বিশ্বাস করি নাই। আজ যদি আমাদের দেশে ইহার প্রচলন খুব থাকিত তাহা হইলে কলিকাতাবাসীর এমন দুর্দশা হইত না। বাস্তবিক এই চলন্ত বাড়ীর ব্যবস্থা থাকিলে, আজ কলিকাতাবাসী যে বিশেষ উপকৃত হইতেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের এখানে অনেকে বিশ্বাস করুন আর না করুন, বাস্তবিকপক্ষে আমেরিকায় এই ভ্রাম্যমান বাড়ীর বিশেষ প্রচলন আছে। এরূপ বাড়ী ব্যবহার করার ফলে জনসাধারণের কোনওরূপ অসুবিধা নাই। কারণ, সাধারণ ভাবে বাড়ীতে থাকিতে হইলে যে সব জিনিষের প্রয়োজন হয়, তাহার প্রায় সকল জিনিসই এই ভ্রাম্যমান বাড়ীতে থাকে।

ভ্রাম্যমান বাড়ীর অস্তিত্ব খুব বেশীদিনের নয়। ইণ্ডিয়ানায় প্রথম এই বাড়ীর সূত্রপাত হয়, তারপর অনেক জায়গায় ইহার প্রসারতা হইতে থাকে। অবশ্য যুদ্ধের দরুণ এই চলন্ত বাড়ীর বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা অবলম্বনের জন্য আমেরিকান সরকার অনেক ব্যবসায়ীকে এই বাড়ীর জন্য অর্ডার দেন এবং সেইজন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে এই বাড়ী প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ইহা আকৃতিতে অনেকটা গাড়ীর মত। বর্তমানে এই সকল চলন্ত বাড়ীর উপকারিতা এবং জনপ্রিয়তা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ইহা প্রায় সকল সাধারণের পক্ষে ক্রয়োপযোগী এবং বাস করিবার পক্ষে কষ্টকর নয়। কেন না, গাড়ীর মধ্যে প্রায় ২০০ বর্গ ফিট যায়গা থাকে। শুধু তাহা নয়, এই সকল গাড়ীর মধ্যে শুইবার ঘর, খাবার ঘর প্রভৃতি থাকিবার পরও ইহার মধ্যে আবার প্রসাধন কক্ষও থাকে। আবার রেডিও, টিউব আলো প্রভৃতি জিনিসেরও ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ ভ্রাম্যমান বাড়ী প্রায় ২৫ ফিট দৈর্ঘ্য ৮ ফিট প্রস্থ এবং ওজন প্রায় ৩০ হইতে ৩৫ মণ। গাড়ীর ওজনের এমন বিশেষত্ব যে রাস্তায় এই বিশেষ ধরণের গাড়ী চলাচল করিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

প্ল্যাষ্টিক, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি চাদরের ঢাকা দেওয়া যখন এই ভ্রাম্যমান বাড়ীগুলি আমেরিকার রাস্তা দিয়া চলিতে থাকে তখন ইহা এক সুন্দর জিনিস দেখায়। ভ্রমণরত বাড়ীর মধ্যে একটি পরিবার সকল সংসার লইয়া যখন একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইতে থাকে তখন কি আনন্দই না হয়। অনেক পরিবার আছেন যাঁহারা এই ভ্রাম্যমান গাড়ীগুলিকে স্থায়ী বাড়ীর মতন ব্যবহার করিতেছেন; আবার অনেক ধনী বা বিলাসী আছেন যাঁহারা এই গাড়ীগুলিকে বিদেশে অবস্থিত হোটেলের ন্যায় ব্যবহার করেন। কেন না, তাঁহারা মূল্যবান ভ্রাম্যমান বাড়ী করিয়া এক একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে দিনের পর দিন বেড়াইয়া থাকেন। শোনা যায়, খুব মূল্যবান চলন্ত বাড়ীগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৮ ফিট এবং ৪ খানি ঘর আছে। ইহা ব্যতীত, গরম এবং ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, 'এয়ার-কণ্ডিশন' করিবার জন্য সাজসরঞ্জাম অর্থাৎ একটি ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে যে সকল জিনিস থাকে তাহার সকল ব্যবস্থা মূল্যবান ভ্রাম্যমান বাড়ীর মধ্যে থাকে। তবে, এই বিরাট চলন্ত বাড়ীর ব্যবহার রাস্তার পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে না।

এই সকল বিশেষ বাড়ীর ব্যবহার হওয়ায় ফলে সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত তাহার পরিবারবর্গকে লইয়া 'change' এর সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, ট্রেণ বা বাসে করিয়া শত শত মাইল জিনিসপত্র লইয়া ভ্রমণ করা কিছু কষ্টকর। কেননা, এখনকার দিনে অতি সস্তায় ভ্রাম্যমান বাড়ীতে আলো, 'হিটার' প্রভৃতি সকল জিনিস দ্বারা স্থায়ী বাড়ীর সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে ভ্রাম্যমান বাড়ী হয়ত শীঘ্র দেখিতে পাইব না; কিন্তু মনে হয় যে কিছুকাল পরে হয়ত অবসর প্রাপ্ত বাস বা অন্যান্য গাড়ীগুলিকে ভ্রাম্যমান দোকান হিসাবে চলিতে দেখিব। কলিকাতায় বাড়ীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে আমরা যদি ভ্রাম্যমান বাড়ীর কথা চিন্তা করি তাহা হইলে আমাদের কি খুব অন্যায় হইবে?

চীনের নয়া গণতন্ত্র

শ্রীবাসুদেব দত্তরায়

চিয়াং কাইশেক তথা চীনের কুমিনতাঙ্গ দল আজ পরাজিত। কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনদেশে নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছে। শতাব্দীর দাসত্বের শেষে চীনের জনগণ নূতন জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে। এই নয়া গণতন্ত্রের বিজয়ের মূলমন্ত্র কি? মা সু তাং এর মতে—এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তিনটি অবস্থার যোগাযোগ।

(ক) সুসংবদ্ধ কম্যুনিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত রাজনৈতিক দল—যে দল আত্মসমালোচনা করে—আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ত করে থাকে এবং দেশের জনমনের সঙ্গে আত্মিক যোগ রাখে।

(খ) পার্টির গণফৌজ

(গ) এবং সমাজের সব স্তরের বৈপ্লবিক শক্তির যুক্ত সমাবেশ। কিন্তু বৈপ্লবিক শক্তি সমাবেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত হইতে হইবে। এই সমাবেশ কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত এবং জাতীয়তাপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক অংশ নিয়া গঠিত।

চল্লিশ বছর আগে সানিয়াৎ সেন চীনের গণজাগরণ শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের কথা বলিয়াছিলেন। সানিয়াৎ সেনের মতে এই গণজাগরণকে পরিচালিত করিবে মধ্যবিত্ত ও জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী। সানিয়াৎ সেন ব্যর্থ হইয়াছিলেন—চীনের দুঃখ ও দাসত্ব মোচন হয় নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টি জয়লাভ করিয়াছে। ওই বিজয়ের অভিজ্ঞতা হইল যে, জাতীয় বৈপ্লবিক সমাবেশকে পরিচালিত করিবে শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র বিপ্লবীদল।

চীনের কম্যুনিষ্টদের সাফল্যলাভের আর একটি দিক রহিয়াছে। সানিয়াৎ সেন বলিয়াছিলেন—জনগণকে জাগাইতে হইবে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের যাহারা চীনের জাতীয় সংগ্রামকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট দলের সাফল্যের গোড়ায় রহিয়াছে সোভিয়েট দুনিয়ার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ট সংযোগ, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগ ও মিত্রতা। চিয়াং কাইশেক বাছিয়া নিয়াছিলেন ধনতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগোষ্ঠি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান দুনিয়ায় যে কোন একটি গোষ্ঠি বাছিয়া নিতে হইবে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নিরপেক্ষতার অভিনয় চলিতে পারে না, নিরপেক্ষতার camouflage বা ধোকাবাজী মাত্র। আন্তর্জাতিক সাহায্য ভিন্ন বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জয়লাভ করা যায় না। সত্যিকারের গণবিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। সানিয়াৎ সেন বলিয়া গিয়াছেন "In firm belief to attain victory, we must awaken the masses of the people and unite in common struggle with those people of the world who treat us as an equal nation". ইহা সানিয়াৎ সেনের শেষ উপদেশ শিক্ষা। সানিয়াৎ সেন তাঁহার জীবনকালে অনেকবার আন্তর্জাতিক সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ভিন্ন কেহই সানিয়াৎ সেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ট সহযোগিতা চীনে নয়াগণতন্ত্রের বিজয়ের পথ সুগম করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের নয়াগণতন্ত্র বর্তমান সাফল্যকে স্থায়ী ও সবলভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। চীনে যে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে উহা সাম্যবাদ নহে—উহা নিতান্তই নয়াগণতন্ত্র। কিন্তু এই নয়াগণতন্ত্রের পিছনে রহিয়াছে চীনের শ্রমিকজনতার মুখপত্র কম্যুনিষ্ট দল। কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সবাই সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রেণীগত নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছে। পশ্চিমের পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রের সহিত এখানেই নয়াগণতন্ত্রের মূলপার্থক্য। চীনের নয়াগণতন্ত্রের বর্তমান নীতি হইল ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা। নয়া চীনের পক্ষে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী খুব প্রয়োজনীয়। আজ চীনের জনসাধারণকে শিল্পসম্ভার এবং প্রয়োজনীয় প্রায়

সমস্ত জিনিষের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। চীনের শিল্প উৎপাদনের মাত্র দশ ভাগ দেশীয় কলকারখানা হইতে আসে।

• • • •

নয়াগণতন্ত্র চায় আধুনিক উৎপাদন শক্তিতে চীনকে গড়িয়া তুলিতে—দেশের শিল্প আয়ত্ত করিতে। তাই চীনের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে বর্ত্তমানে নয়া চীনের প্রয়োজন। বৈদেশিক আমদানী হইতে নিজকে দ্রুত মুক্ত করিবার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে এই কাযে ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া হইবে না। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা রেখে জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিল্প পরিচালনার ও সংগঠনের আসল নেতৃত্ব তাহাদের হাতে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

সানিয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে প্রথম জাতীয় কুয়োমিংতান কংগ্রেস হইয়াছিল—উহাতে চীনের কম্যুনিষ্টগণও যোগদান করিয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছে—"The so-called democratic system of modern countries is often monopolised by the class of the bourgeoisie and turned into an instrument for oppressing the people. But the democracy of the Kuomintang is the common property of the people as a whole and not the personal property of a minority".

অর্থাৎ—

বর্ত্তমান জগতের তথাকথিত গণতন্ত্র অনেক সময়ই মধ্যবিত্ত ধনী বা বুর্জোয়া শ্রেণী গ্রাস করিয়া রাখে এবং গণতন্ত্রকে জনগণের অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু কুমিংটাঙ্গের গণতন্ত্র জনতার সাধারণ সম্পত্তি—মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সাধারণতঃ মোটামুটি ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে—ইহাকেও নয়াগণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই গণতন্ত্রের নেতৃত্ব করিবে শ্রমিক শ্রেণী। ইহাই চীনের নয়া বৈপ্লবিক একনায়কত্ব!

এই বৈপ্লবিক একনায়কত্বে—অর্থাৎ নয়াগণতন্ত্রে, সমস্ত শ্রেণীকে নূতন করিয়া রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বিজিত শ্রেণীকেও নূতন রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকেও জমি ও কাজ দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা ইহাদের জন্য করা হইয়াছে। যখন সমস্ত শিল্প-সম্পদ জাতীয় সম্পদ হইবে—তখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক নয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। অর্থাৎ তখনই বুর্জোয়া শ্রেণী লোপ পাইবে। কিন্তু আসল সমস্যা হইল কৃষক শ্রেণীকে লইয়া। চীন কৃষি প্রধান দেশ। সোভিয়েট দেশের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কৃষিকে সমাজের সম্পত্তি করিতে অর্থাৎ জাতীয়করণ করিতে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম করিতে হইবে। এবং ততদিন দেশের কৃষি উৎপাদনকে জাতীয় রাষ্ট্রের সম্পদ না করা যায়, ততদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষি উৎপাদনকে জাতীয়করণ করিবার জন্য আগে দরকার হইবে দেশে রাষ্ট্রমালিকানায় শক্তিশালী উৎপাদন শিল্প গড়িয়া তোলা।

ধীরে ধীরে চীনের জনগণ নিজদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। ১৮৪০ সালে আফিং-যুদ্ধে চীন হারিয়া যায়, তারপর প্রগতিবাদী যুবকগণ শক্তি ও প্রেরণার জন্য পশ্চিমের দিকে তাকাইয়াছিল। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্মের পূর্বে সংগ্রামশীল যুবকগণ বহু সংখ্যায় জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মাণী, ফরাসী প্রভৃতি দেশে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য গিয়াছিল। ইহার ফলে মধ্যযুগীয় ফিউড্যাল মনোভাবের বদলে পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্র চীনে প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু শোষিত জনতার সঙ্গে এই পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোন যোগ স্থাপিত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ভাবে চলিল। অনেক সংগ্রাম আগেও হইয়াছে।—১৯১১ সালের জাতীয় গণ-আন্দোলনও হইয়াছে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত জনগণ বিজয়ী হয় নাই। তারপর ঘটিল রুশদেশে অক্টোবর বিপ্লব। চীনের বিপ্লবী যুবক সোভিয়েট দেশ হইতে অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিল। ১৯২১ সালে চীনের মার্কসবাদী যুবকগণ কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করিল। সানিয়াৎ সেনও রুশ বিপ্লবকে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন এবং চীনের জনগণের সোভিয়েট দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় সানিয়াৎ সেনের আশীর্বাদ ছিল। সানিয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং চীনের ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্যর্থতা ও তাহার প্রতিক্রিয়ার দেশে হাহাকার রব উঠিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে—তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জার্মাণী, ইতালী ও জাপান-এর পতন হয়। ইংলণ্ডও কাবু হয়। আমেরিকা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। কিন্তু আমেরিকা প্রতিক্রীয়াশীল চিয়াং কাইসেককে সাহায্য করিয়া-গণ-বিরোধী হইয়াছে। চীনের জনগণ দীর্ঘদিন জাপানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে চীন ত্যাগ করাইয়াছে। তারপর প্রতিক্রীয়াশীল চিয়াংএর বিরুদ্ধে হইল বহু রক্তক্ষয়ী-গণযুদ্ধ। আমেরিকার শত সাহায্য সত্ত্বেও—চিয়াং দেশের জনগণের হাতে পরাজিত হইল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের আসল চেহারা হইল চিয়াং কাইসেক। চিয়াংএর পতনে চীন দেশে নয়াগণতন্ত্রের মধ্য দিয়া সাম্যবাদ ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হইল।*

*মা-সে-তাং এর লেখা Dictatorship of People's Democracy-র দ্রষ্টব্য।

কবচ মাহাত্ম্য

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

(গল্প)

ঘোষপুর তখন সন্ধ্যা সাতটাই হবে। বিকেল বেলায় সদ্য প্রকাশিত 'শেখশ্রাদ্ধ' গ্রন্থখানির পাঠ সমাপন করে অন্যদিনের মত রমেশ ঘোষালের সান্ধ্য বৈঠকে যাবার জন্যে পরেশ প্রস্তুত হচ্ছিল। ওর বৈঠকটি ঠিক যেন রয়টারের ঘাঁটি, বিশ্বের সব সংবাদই পাওয়া যায়। পরেশের সহধর্মীণী কাঞ্চনমালা এসে বল্‌লেন—'আড্ডায় না গেলেই নয়!—'

বিস্ময়ের সহিত পরেশ বল্‌লে—'কেন বলো তো?—'

শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—'তোমাকে নিয়ে কাশী মিত্তিরের ঘাটে যাবো ভাবছি—'

'—কাশী মিত্তিরের ঘাটে? কেন?—'

কাঞ্চনমালা তাঁর মিহি কাপড়ের আঁচলটা বুকে টেনে বল্‌লেন—'আজ শনিবার, তোমার কল্যাণে সারাদিন উপোস করে আছি—'

ওঁর কথায় পরেশ চমকে উঠলো। বিস্ময়াভিভূত হয়ে বল্‌লে—'ওখেনে নিয়ে গিয়ে আমার কি কল্যাণ করবে!—'

কাঞ্চনমালা মৃদু হেসে বল্‌লেন—'দেখলেই বুঝতে পারবে—'

কাঞ্চনমালার শুধু সৌন্দর্যের খ্যাতি নেই, সৌজন্যেরও খ্যাতি আছে, এজন্যে পরেশ যে কেবল ওঁর প্রেমমুগ্ধ তা নয়, গুণমুগ্ধও বটে। তাই বারে বারে ওঁর লুটিয়ে-পড়া আঁচল তুলে ধরে ওঁর মৃদু হাসিটা পরমানন্দে উপভোগ করে।

ঐ কথার পর পরেশের মনটা এ্যাভালাঞ্চের মত গুলে পড়লো। ও বল্‌লে—'ও বুঝেছি তুমি কেন আমাকে কাশী মিত্তিরের ঘাটে নিয়ে যেতে চাও—'

কাঞ্চনমালা ভুরু বেঁকিয়ে বল্‌লেন—'কি বুঝেছ শুনি?—'

পরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে দু'এক টান দিয়ে বললে, —'ওখেনে তো তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর হাসপাতাল এক একটি চালাঘরে, ঐ সব জায়গায় প্রণাম করতে করতে রেলের লাইনটা পেরোলেই পরপারে যাওয়ার

জেটি, আমাকে বুঝি মহাপ্রস্থানের জাহাজে বুক করতে চাও!—'

কাঞ্চনমালা একথায় খুশী হোতে পারলেন না; কোন বিবাহিতা নারীই তা পারে না। বাংলা পাঁচের মত মুখখানি পেঁচিয়ে শ্রীমতী বললেন—'আজ খরো বারে কি যে অলক্ষুণে কথা বলো ছাই—'

ওর সুডৌল পৃষ্ঠে হাতখানি রেখে পরেশ বললে—'আচ্ছা, আমি না হয় উইথড্র করে নিলাম, খুলেই বলো তো ওখেনে যাবার কারণটা কি!—'

কাঞ্চনমালা বললেন—'তোমার কল্যাণে একটা স্বপ্রাচ্য মাদুলী ধারণ করবো, তোমাকে ধারণের সময়ে থাকতে হবে

'—কি এমন মাদুলী আর কিসের জন্যেই বা—'

'—ইলেকসন আসছে না?—'

কথাটার পরেশ বুঝতে পারলো স্ত্রীর অন্তরের উদ্দেশ্য; কিন্তু কি এমন মাদুলী যা ধারণে শত্রুপক্ষ অবধারণ করতে পারবে তাদের অবস্থা-বিপর্যয় আর বিরাট পরাজয়।

বোধহয় কাঞ্চনমালা বলতে একটু ইতস্তত: করছিলেন, পরে স্বামীকে বলতে বাধ্য হলেন'—যম কবচ—'

কথাটি শুনে বোধহয় পরেশ আঁৎকে উঠলো।

—ও ভাবলো, যমজগতের কোন কল্যাণ করতে পারেন পুরাণে ইতিহাসে কোথাও তো লিপিবদ্ধ নেই। ও বললে—'অনেক রকম কবচের নাম শুনেছি কিন্তু—আর আমার হয়েছেই বা কি যে ওঁর শরণাপন্ন হতে হবে—'

শ্রীমতী পরেশের কথায় বাধা দিয়ে বললেন—'ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে রঙতামাসা কি ভালো?—'

ও বললে—'তুমি তো জানো কাঞ্চন, সংসারের এভিনিউ থেকে আরম্ভ করে বাই লেন, ব্লাইণ্ড লেন ঘুরে ঘুরে এমন একটা ঘুণী রোগে আক্রান্ত হয়েছি যে জীবনে কোন দিন রঙতামাসা করবারই সময় পেলাম না, তোমাকে নিয়েও নয়—'

কাঞ্চনমালা কি ভাবলেন তিনিই জানেন, তবে বাগ্‌-বিতণ্ডায় কোন লাভ নেই ভেবে তাঁর সঙ্গে পরেশের বেরোতে হোলো।

রাজবল্লভ পাড়া থেকে কতটুকুই বা কাশী মিত্তিরের ঘাট।

দু'জনে পথ হেঁটেই চললো। পথ চলতে চলতে শ্রীমতী হরু ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি যমদেবতার বিগ্রহ রচনা করে তাঁকে আরাধনা করতে করতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর কবচের এমনই শক্তি যে ধারণের পর তীরস্থ যাত্রী মহা-প্রস্থানের পথ থেকে বাড়ী ফিরে এসেছেন।

যমসিদ্ধ এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রীমতী অনেক কথাই বলতে লাগলেন। পরেশের মন অবশ্য তখন আউডার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল—চিত্রজগতের দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নাওাদি আর যেচুদা ইন্‌টেলেকচুয়েল থ্যারেজের পর কি করে সন্তান লাভ করলেন সে সম্বন্ধে ছিল আড্ডার আলোচ্য বিষয়—রমেশ ঘোষাল স্বয়ংই ছিলেন এ দিনের বক্তা। কাঞ্চনমালার জন্যে পরেশ ঘোষাল যেতে পারছিল না, মনে বড়ই অসোয়াস্তি বোধ করছিল।

কাশী মিত্তিরের ঘাটের কাছে বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার বাটি পেরিয়ে যেখানে পরেশ সস্ত্রীক এলো, সেখানে সাইনবোর্ড লেখা আছে—'সিদ্ধাশ্রম'। হাঁ, নামের মাহাত্ম্য বটে! বিচিত্র বর্ণ ও বয়স্ক মেয়ে-পুরুষের ভিড়াক্রান্ত আশ্রমে নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রেসার অনুভব করে পরেশ ভাবলো, সিদ্ধ হওয়া যায় সত্য। ও দেখলো জটাজুটধারী শুভ্র-গুম্ফলম্বিত সেই বিরাট পুরুষ হরুঠাকুর—সাক্ষাৎ যমাবতার। শালগ্রামশিলার মত গাত্রবর্ণ, মেদস্ফীত তৈলাক্ত পিচ্ছিল গাত্র চন্দনচর্চিত হয়ে ঠিক যেন চিতা বাঘের মত রূপায়িত।

হাঁকাটি হস্তে ধারণ করে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত আসনে বসে আছেন, চক্ষু দুটী জবাকুলের মত লাল টুকটুকে; হয় গাঁজা, না হয় সিদ্ধি বা কারণ, আবগারী বিভাগের যে কোন একটির সঙ্গে সহযোগ করে বেশ তুরীয় ভাব বর্তমান বলেই মনে হোলো।

কাঞ্চনমালা গলবস্ত্র হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কুল-কুণ্ডলিনীর মত এক কোণে বসে রইলেন, তাঁর তন্নিদারের মত দাঁড়িয়ে রইলো পরেশ। হরুঠাকুর তখন যমের মাহাত্ম্য কীর্তন করছিলেন। কীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে কবচের খুচরো রাখা হয়েছিল। কারণ তাঁর জগতে তাঁর প্রদত্ত কবচই সত্য আর সবই মিথ্যা, বাজে।

বলছিলেন—'কলিতে ধর্মরাজ শ্রীযমই একমাত্র জাতির গতি, পৃথিবীর হালচাল বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখে ইনি শিগ্‌গিরই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হয়ে নবরূপ ধারণ করবেন যাতে পৃথিবীর মুক্তি হয়। পৃথিবীর ওপর গ্রহ-উপগ্রহদের বেজায় পীড়ন হচ্ছে দেখে ইনি পৃথিবীকে রূপের ঘর থেকে অরূপের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে চান। কয়েকদিন আগে আমাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন; সম্প্রতি গদা ছেড়ে এ্যাটম বোম হাতে নিয়েছেন, মহিষের বদলে মানুষই হবে ওঁর বাহন। উনি বলেন, মোষের ওপর চড়ে মশা তাড়িয়ে কাজ চালানোর যুগ চলে গেছে। যারা কাঁকরমণি চাল পেয়ে চালিয়াৎ হয়ে উঠেছে তারাই হবে ওঁর পরলীলার প্রধান অবলম্বন। শ্রীখোলের বদলে তারা চাক বাজিয়ে তাঁর নাম শোনাবে—'

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে হরুঠাকুর বলতে সুরু করলেন —'আমার যম কবচ এ্যাটম শক্তিসম্পন্ন, তথাকথিত কবচের মত বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন নয়। এটা ধারণ করলে যমরাজের ধমকায় চোরাকারবার করে র‍্যাশন কন্ট্রোলের ভার পেয়ে, সরবরাহ বিভাগের পোর্টফলিও নিয়ে বা ক্যাবিনেট ফরম করে ভবঘুরে নিরক্ষরও মানুষের মত মানুষ হোতে পারবে। কামিনীকাঞ্চনের প্রাচুর্য সম্ভোগে আর মৃত্যুর পরে মোটর লরিতে চড়ে বৈতরণী পার হয়ে চিত্রগুপ্তের মাথায় গাঁট্টা মেরে যমরাজের ওপরওয়ালা হয়ে বসতে পারে—'

জনৈক মহিলা বললেন—'ওরতো গোদা পা, পৃথিবীতে লীলা করতে এসে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারেন তো?—'

কথায় বাধা দিয়ে হরুঠাকুর বললেন—'গত মহা-যুদ্ধের ফলে ওঁর সেই গোদে তারাক্রান্ত শ্রীচরণে গণিত শাস্ত্রের ক্রম নিয়পর্যায় অনুসারে প্রায় নর্যালে এসে দাঁড়িয়েছে—'

ভিড়ের ভেতর থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ হোতে ধ্বনিত হোলো—'কি করে সম্ভব!'

বিকট রব করে একটা হাই তুলে তুড়ি মারতে মারতে হরুঠাকুর বললেন—'সৌর-জগৎ থেকে একটা স্পিলিন্টার গিয়ে ছিটকে পড়েছিল ওঁর গোদা পায়ে—'সে কি আরাম! হাজার হাজার বছরের বদ্ রক্ত-পুঁজ বেরিয়ে গেল, আশীর্বাদ করলেন আণবিক শক্তির জয় হোক্, খুব আরাম পেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করতেই উত্তর পেলেন, পৃথিবীতে নারী পরের পেট মেরে নিজেদের পেট ভরায় তারাই এটি প্রয়োগ করেছে। যমরাজ শুনে খুব খুসী হলেন, বললেন ঠিক যেন মকরধ্বজ, অনুপান ভেদে প্রয়োগ হোলে ধন্বন্তরীর মত কাজ করে। চিত্রগুপ্ত বললেন, এতে প্রভু ত্রিতাপজ্বালা দূর হয়—'

কাঞ্চনমালা পরেশকে ইসারা করতেই সে তার কান তাঁর বুকের কাছে পৌঁছে দিল।

কাঞ্চনমালা বললেন—'কি বলছেন শুনছো তো? 'যমকবচের' এত মাহাত্ম্য, কবচটা নিচ্ছি কেন বুঝেছ? সামনের ইলেক্‌শনে জয়ী হয়ে কোন রকমে ক্যাবিনেট যদি ফর্ম করতে পারো—ব্যস, যমের মতই সবার সদ্গতি করে নিজেদের সকল রকমের নিঃসহায় দুর্গতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে, আর তিন পুরুষের পেট-ভাতার মত সব শুছিয়ে নেওয়া চলবে—'

স্ত্রীর ওপর পরেশের গভীর শ্রদ্ধা। ও বললে—'দেখো যদি কোন রকমে জীবনের ঘুঁটি ঘুরিয়ে ফেলতে পারো, কতকাল আর চোখের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে চলে বলো তো?—'

সেই সময়ে হরুঠাকুরকে জনৈক ভদ্রলোক বললেন '—আপনার এই যম-লোকের এজেন্সিতে কিভাবে ঐ লোক থেকে খবর আসে—'পরেশ ও কাঞ্চনমালার দৃষ্টি ভদ্রলোকটির উপর পড়লো। হুঁকোয় কয়েকবার জোরে টান দিয়ে হরুঠাকুর বললেন—'রেডিওতে জিরো মিটারে পাই যমলোকের ডেলি নিউজ; ক্রিষ্টাল

দিয়ে দেখি ধর্মরাজ আর চিত্রগুপ্তের একটিভিটিস, ইউ, এন, ও-তে মাঝে মাঝে দূত পাঠিয়ে ধর্মরাজ ধর্মচক্রের স্পীডটা বাড়িয়ে যেন সেও এখান থেকে দেখতে পাই, তাছাড়া স্বয়ং আমাকে স্বর্গে নানা এডভাইস দেন—'

সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—'জয় ধর্মরাজ যমরাজ—'

একজনকে তীরস্থ করবার জন্যে খটিয়ায় শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যমরাজের চাক-বাদ্য সমেত শ্রীকীর্তনের নাম মাধুর্যে বিভোর হয়ে গঙ্গাযাত্রী বললেন—'ওখানে যাবো, বাবার কাছে যাবো—'

ধর্মরাজের বৈতরণী ন্যাভিগেসন কোম্পানীর একটি জাহাজ বোধহয় সে সময়ে কাশী মিত্রের ঘাটের জেটিতে লেগেছিল। কারণ তখন গগণচুম্বী ফ্লাডলাইটে নিকষকৃষ্ণ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হরঠাকুর তীরস্থ যাত্রীকে আদর আপ্যায়ন করে একখানি যমকবচ গলায় পরিয়ে দিলেন, বিনিময়ে নিলেন একশো টাকার একখানি ক্রসচেক। বিগ্রহের পায়ে সেই চেক ছুইয়ে বললেন—'বাবা তোমার ইচ্ছের সব—'

তীরস্থ যাত্রী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন—'আপনার দয়ায় খুব বেঁচে গেছি, মরেও নিশ্চিন্ত হোতে পারতাম না। সামনের ইলেকসনে হয়তো আমার একটি ভোটের জন্যে কংগ্রেসকে বুদ্ধিলে পড়তে হোতো, কংগ্রেস হারবে একথা পরলোকে গিয়ে শুনলেও আমার আবার মৃত্যু হবে—'

চতুর্দিক থেকে আবার একটি ধ্বনি উঠলো—'জয় ধর্মরাজ যমরাজ—'

কিছুক্ষণ পরে কবচ নেবার জন্যে সকলে কিউ' করে দাঁড়ালেন। পরেশ ও তার স্ত্রী কাঞ্চনমালাকেও দাঁড়াতে হোলো। পরেশ কোঁচার সঙ্গে তার স্ত্রীর আঁচল বেঁধে নিল, কারণ কাঞ্চনমালা ওরই কল্যাণে কবচ নিচ্ছেন—এ রকম অবস্থায় অনেককেই দেখা গেল।

কবচ নিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল, পরেশের পক্ষে আড্ডায় আর যাওয়া হোলো না। এদিকে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো।

রমেশ ঘোষাল লোক পাঠিয়ে পরেশকে জানিয়েছে যে, আগামী ভোটযুদ্ধে চিত্রজগতের অন্যতম তারকা রাঙাদি পরেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ওর মনটা গাড়ুর মত বসে পড়লো। কাঞ্চনমালা শুনে স্থাণুর মত হয়ে পড়লেন। একে রাঙাদি পরমা সুন্দরী যুবতী, রূপ-যৌবনাঢ্যা, তার ওপর চিত্রজগতে যুগান্তর এনে দেওয়ায় শুধু টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্তই তাঁর ভক্তমণ্ডলীর অবস্থান দেখা যায় না, সারা ভারত জুড়েও তাঁর ভক্তসম্প্রদায় ভিড় করে রয়েছে—তাঁর জন্মতিথি উৎসবই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং এক্ষেত্রে 'যমকবচ' পরেশের ভাবী আশাকে কতখানি রূপ দিতে পারবে তাই হয়ে উঠলো ওর চিন্তার বিষয়।

সুদীর্ঘ কাল ধরে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করে পরেশ স্বাধীনতার তোরণ গেঁথেছে। সে কি আজকের কথা! বোমার যুগ থেকে আরম্ভ করে মহিষবাথানে নুন তৈরী করতে যাওয়া পর্যন্ত ওর পশ্চাতে একটা বিরাট আত্মত্যাগের ইতিহাস আছে। ওর আত্মকেন্দ্রিকতা আজ ওকে বহু উর্ধ্বে নিয়ে গেছে, রাজনৈতিক কুস্তির আখড়ায় কি দারুণ ভাবেই না পাঁয়তারা ভেঁজেছে। বাইরে অহিংসভাব অক্ষুণ্ণ রেখে ভেতরে সুযোগ মাফিক হিংসভাব দেখিয়ে মহাত্মার মত মহাপুরুষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাঁর ডাণ্ডী যাত্রার পথে ডাণ্ডা নিয়ে অযাত্রা হয়েই দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হয়ে জন-সাধারণকে কদলী প্রদর্শন করে পরেশ যেন বহাল-তবিয়তেই আছে।

এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে! ওরাই রাষ্ট্রের ভাগ্য-বিধাতা, কর্ণধারও বটে। পশ্চাতে উত্তরোত্তর যেরূপ স্যাশিয়ান টেকনিকে বিভিন্ন দল উপদল গড়ে উঠছে তাতে ওর ভয় হয়—সত্যি ভয় হয়, ডিগবাজি খেতে খেতে না ঘুরে ও ছিটকে পড়ে।

রমেশ ঘোষালকে পরেশ লিখে দিল, রাঙাদির সঙ্গে ওর যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাতে তাঁর মত চিত্র তারকার পক্ষে উচিত নয় রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে

তার সম্মুখান হওয়া।' তিনি যদি কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্রী বা কোন রাষ্ট্রে ভারতীয় দূতী হতে চান তো সে ব্যবস্থা হাইকম্যাণ্ডকে ধরে করে দেওয়া যাবে। তিনি অসম্মত হোলে তাঁকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, সে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছে তার ভেতর যারা আছে তারা আগামী নির্বাচন ক্ষেত্রে এক একটি ধনবৃত্তের মত শক্তি-সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌বে, আর ও হবে সাক্ষাৎ যম অবতার। শ্রীধর্মরাজের সমস্ত শক্তি ওরই মধ্যে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। উপসংহারে লিখলো—'আমাকে যেমন করেই হোক ক্যাবিনেট কর্ম করতে হবে। আশা করি রাঙাদি ভেবে চিন্তে কাজ করবেন'—বেচুদাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করতেও রমেশ ঘোষালকে পরেশ জানিয়ে দিল।

রাত্রে কাঞ্চনমালা যখন শয্যাসঙ্গিনীর পোর্টফলিও নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তখন পরেশ বল্‌লে—'কবচ তো পরলাম্, যেন গুড়ে না বালি পড়ে—'কাঞ্চনমালা বল্‌লেন—'এই জন্যেই তো আমি পূর্ব থেকে সতর্ক হয়েছি, কেবল ইয়াকি মেরে আর পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিনগুলো কাটিয়ে দিলে বড় তো নয়—'

কথা বলতে বলতে পরেশ ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে ও বোধ করলো রাঙাদিকে যমরাজ তাড়া করেছেন। সে কি বিরাট চীৎকার—হৈ হল্লা! আতঙ্কে বোধহয় ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ওকে হাঁপাতে দেখে কাঞ্চনমালা ওর বুক চেপে ধরে বল্‌লেন—'কি হয়েছে, কি হয়েছে?—'

ও বল্‌লে—'রাঙাদিকে যেন যমে তাড়া করেছে দেখ্‌লাম—'কাঞ্চনমালা হেসে স্বামীকে বল্‌লেন—'আর ভয় নেই, ওষুধ ঠিকই ধরেছে—'

শরতের আহ্বান

শ্রীমীরা মুখোপাধ্যায়।

শরতের আহ্বানে
হৃদয়ে পুলক বাণী জাগরণী গানে
জানালো যে আপনার প্রোজ্জ্বির সবুজে
তাহারে জানাই আমি,
আমার জীবন হোক্ তারই অনুগামী
চলে যেতে ধরণীর পথে
অরণ্যে প্রান্তরে মরুমাঝে
জীবন সৈকতে,
তারই মতো যেন বারে বারে
মিলনের শত মন্ত্র প্রাণে ভাষা দিতে পারে
দক্ষিণা-সমীর-দোলা প্রাণে
জীবনের অভ্যর্থনা-গানে।
তারই মতো,

আগমনী সুর যেন আসে
দিগন্তের কোল হ'তে আতপ্ত আকাশে
ব্যর্থতা ও হতাশার রক্ত কলিগুলি
সবুজের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে জয়ধ্বজা তুলি॥

রসভঙ্গ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ,

'ature and Nature's laws lay hid in night;
God said, 'Let Newton be,' and all was light.

উনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে গণিত
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, সেরূপ আর
এই দুই শতাব্দীতে অঙ্কশাস্ত্রের
আলোচনা প্রাচীন কালের মত কেবল একটি বা দুইটি
দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পূর্ব্ববর্তী কয়েক যুগে ফ্রান্সে ও
সুইটেন দেশেই গণিত শাস্ত্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল।
তাঁরা এই অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অধুনা গণিত
শাস্ত্রের আকৃষ্ট করে একত্র
সমবেত হয়েছেন। জার্মাণ তার জড়তা ভঙ্গ করে কে.
ফ্রি. গৌ. জেকবি, পি. জি. এল. ডিরিচলেট্ প্রমুখ অঙ্কশাস্ত্র বিশারদদের জন্ম দিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন,
রাশিয়া, নরওয়ে, ইটালী, হাঙ্গেরী, ইউ. এস. এ প্রভৃতি
দেশেও অনেক অঙ্কশাস্ত্রবিৎ জন্মে উঠলেন।

ফলে গণিত শাস্ত্র বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা
বেড়ে উঠল। অনেক গণিত সমাজ গড়ে উঠল এবং তারা
সাময়িক পত্রিকা প্রচার করে এর বহুল আলোচনা সুরু
করে দিলেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে অঙ্কশাস্ত্রের এত
দ্রুত অগ্রগতির মূলে এটা একটা উল্লেখযোগ্য কারণ।
আমাদের ভারতবর্ষেও এরকম আলোচনী সভার অভাব
দেখা যায়নি। ফেলিক্স মূলার হিসাব করে দেখেছেন,
১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার
সংখ্যা ছিল মাত্র সতের; ঐ সংখ্যা বেড়ে অষ্টাদশ
শতাব্দীতে দাঁড়িয়েছিল দুইশত দশ-এ এবং উনবিংশ
শতাব্দীতে নয়শত পঞ্চাশ-এ।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক গণিত
সভা ডাকা হয়েছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতেও অনুরূপ
একটি সভার আহ্বান করা হয়। তবে সাধারণ স্বীকৃতি
অনুসারে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিচে অনুষ্ঠিত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের
গণিত সভাটিকেই প্রথম আন্তর্জাতিক গণিত সভা বলে
নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তদনুসারে দ্বিতীয় সভা ডাকা
হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে, তৃতীয়টি ১৯০৪এ হেইডেল
বার্গে, চতুর্থটি ১৯০৮এ রোমে, পঞ্চমটি ১৯১২তে কেম্ব্রিজে।
অঙ্কশাস্ত্রের দ্রুত প্রগতির মূলে এই জাতীয় সভাগুলোর
অবদান অপরিহার্য। এরকম সম্মিলনের মধ্য দিয়ে
পারস্পরিক সৌহার্দের আদান প্রদানের সঙ্গে গণিত
শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার ক্রমপরিবর্তনের কথা সুষ্ঠু ভাবে
আলোচনা করা হ'ত।

আধুনিক গণিতের বিশদ আলোচনা বড় কঠিন কাজ।
গণিত শাস্ত্র বর্তমানে বিভিন্ন দিকে এতই প্রসার লাভ
করেছে। কোন অঙ্কশাস্ত্র বিশারদের এটাই চরম আনন্দ
যে গণিতে কিছুই জেনা যায় না। এ ক্ষেত্রে প্রতিযুগের
যে অবদান, তা শৃঙ্খলানুক্রমিক সঞ্চিত থাকে অনন্ত কালের
জন্য; অন্যান্য শাস্ত্রের মত নূতন আবিষ্কার পুরাতন
অবদানকে কখনো অস্বীকার করে না; যে সত্য একবার
উদ্ঘাটিত হয়, তা চিরকালের জন্যই তার সত্যতা নিয়ে বেঁচে
থাকে। পুরাতন তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন নূতনতর
তথ্যের সন্ধান পেলে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এর কি
প্রয়োজনীয়তা, তবে উত্তর এই হবে যে ঠিক এখনই বলতে
না পারলেও এ ভবিষ্যতে মানুষের সাধারণ এবং ব্যবহারিক
জীবন-বিজ্ঞানে প্রযোজ্য হতে পারে। কাজেই মানুষের
কি উপকারে লাগল, একথা বলতে পারলাম না বলেই যে
গণিত আলোচনা বাদ দেব, এ কোন কথার মত কথা হতে
পারে না। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এ জাতীয়
তথ্যানুসন্ধানের একটা অপরিহার্য মূল্য আছে।
ক্যালকুলাসের ব্যাপারটাই ধরা যাক। ক্যালকুলাসের
উদ্ভাবনে এষ্ট্রনমি আলোচনা যে কি পরিমাণ সুগম হয়েছে
একথা কে না জানে।

অন্যান্য শতাব্দীর মতন উনবিংশ শতাব্দীতেও
গণিতজ্ঞেরা কার্যত এর বাস্তব দিকটার প্রতি লক্ষ্য
স্থাপন করেই গণিত আলোচনায় মনোনিবেশ করেন:
গ্রীণ, এম্পিয়ার, গস্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এর বাস্তব দিকের

প্রতি মনোযোগ নিক্ষেপ করেন। ফলে পদার্থ বিজ্ঞানও এদের অন্যান্য সাধারণ অবদান দেখা যায়। বিদ্যুৎ শাস্ত্রের একটা বিশেষ সমীকরণ থেকে উদ্ভূত আলোচনার কাজে তড়িৎ বাড়। বিশেষ ভাবে ধরি। মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্যে গণিতের যে ব্যবহার, এটাই উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বুল তাঁর 'Laws of Thought' নামক গ্রন্থে এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যক্ষ গণিত শাস্ত্র ছাড়াও কি ভাবে আজ মানুষের বিভিন্ন চিন্তার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রতীক চিহ্ন এবং এর নানা প্রয়োগের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, সকলেরই জানা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—অর্থনীতি পড়তে গিয়ে আমরা যে গ্রাফের ব্যবহার করে থাকি, তা গণিতেরই দান। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রও গাণিতিক তথ্যাবলীর মধ্য দিয়েই ক্রমপ্রসার লাভ করছে।

আধুনিক গণিতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সব কিছুতেই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে চায়। গণিতের কোন অসংশ্লিষ্ট প্রতিজ্ঞার উপর বর্তমানে অল্প গুরুত্বই স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য অংশের মতন গণিতেও কোন বিষয়কে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে আলোচনা করা হয় না; কিন্তু একে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করেই দেখা হয়। গণিতের বিভিন্ন শাখাগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ—সাধারণ প্রাথমিক জ্যামিতিতে আমরা পড়ে থাকি, দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা কখনো মিশে না কিন্তু প্রজেক্টিভ জ্যামিতিতে পল্‌সেট্‌ কতকগুলো আদর্শ বিন্দুর অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে এই অসুবিধা দূর করেছেন। ফলে পূর্ববর্তী ধারণার সঙ্গে পরবর্তী ধারণার কোন বিচ্ছেদ ঘটলো না এবং জ্যামিতিক আলোচনার একটা ব্যাপক ভিত্তি তৈরী করে একের সঙ্গে অন্যের একটা যোগসেতু রচনা করা হল।

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ এই দুগসন্ধিক্ষণেই গণিতের ভিত্তির পুনর্গঠন করা হয়। এবং বিশেষ করে তখনই গণিতের প্রাথমিক তথ্যগুলোর পুনর্বিশ্লেষণ হয়। কোন ব্যবহৃত সত্যকে পুনর্বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান এটাকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করে। ইচ্ছাশক্তি, আশাবাদ ও আত্মদর্শন, বিশেষ গণিত আলোচনায় অত্যন্ত মূল্যবান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হোরেস্‌ ল্যাম্ব্‌ বলেছেন,—'A traveller who refuses to pass over a bridge until he has personally tested the soundness of every part of it is not likely to go very far; something must be risked even in Mathematics. It is notorious that even in this realm of 'exact' thought, discovery has often been in advance of strict logic'

ন্যাস্কিম্‌ বোচার বলেছেন,—'There is what may perhaps be called the method of optimism, which leads us either willfully or instinctively to shut our eyes to the possibility of evil'.

বীজগণিত কিংবা জ্যামিতির কোন অঙ্ক কষতে গিয়ে প্রতি ধাপেই যদি নিজের বিচার বুদ্ধির বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যে, আমি যা করলাম তা প্রযোজ্য কিনা, তবেতো বিপদ। ধরা যাক, কোন ধাপে একটি অজ্ঞাত রাশি পেলাম, যা দিয়ে আমাকে ভাগ করতে হচ্ছে। জানি শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না; কাজেই প্রশ্ন উঠে, যে অজ্ঞাত রাশিটি দিয়ে আমি ভাগ করছি, সেটি ত শূন্য নয়? আশাবাদী হলে আমি ভাবব যে না, তা শূন্য নয় শূন্য ছাড়া আরও কত মান এই রাশিটি ধারণ করতে পারে; কাজেই আমার ক্ষেত্রে এ দুর্ভাগ্য শূন্য হতে যাবে কেন? এই দৃঢ়তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কষে গেলাম, পরে বিশ্লেষণ করেও আমি দেখতে পাই যে হ্যাঁ, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক শুদ্ধ ধারাটিই অবলম্বন করেছিলাম। ইন্টিগ্রেশন অঙ্কের বেলাতেও তাই। ইন্টিগ্রেশনের মান সহজে পেতে গিয়ে আমরা স্বভাবতই কতকগুলো অনুকল্পের ব্যবহার করে থাকি। এই অনুকল্পগুলো বিশেষ বিশেষ সর্তাধীনে সিদ্ধ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই

আমাদের এই সমস্ত অনুকল্পগুলোর সিদ্ধাসিদ্ধের বিচার সাধারণ ক্ষেত্রে করতে হয় না। আমাদের আত্মদর্শনই আমাদিগকে শুদ্ধ পথে পরিচালিত করে। কোন্ যায়গায় কোন্ অনুকল্পটি সিদ্ধ হবে, আমাদের মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই তা আমাদের বলে দেয়। ফলে তৎক্ষণাৎ তার সাহায্য নিয়ে সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা অনায়াসেই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি পেয়ে থাকি।

বিভিন্ন যুগে গণিতের সংজ্ঞা অনেকেই অনেক ভাবে নির্দেশ করে এসেছেন। এরিষ্টটলের যুগে গণিতকে সংখ্যা-বিজ্ঞান বলে নির্দেশ করা হত। এই প্রাচীন সংজ্ঞাকে ফরাসী গণিতবিৎ আগষ্ট কম্‌টি পুনর্গঠিত করে বলেন,—'Mathematics is the science of indirect measurement.' কিন্তু পরবর্তীকালে গণিত শাস্ত্রে এমন কতকগুলো শাখার প্রবর্তন হলো যার সঙ্গে সংখ্যা কিংবা পরিমাপের কোন সম্পর্ক নেই। এজন্যে এই শেষোক্ত সংজ্ঞাটিকেও বাদ দিতে হল। ডেসার্গের উল্লেখযোগ্য ট্রেঞ্জল থিয়োরেমে পরিমাপ কিংবা সংখ্যার কোন ধারণাই কাজে লাগে না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন্ এর সংজ্ঞা দেন,—'Mathematics is the science which draws necessary conclusions.'

কিন্তু এটাও একটা খাঁটি সংজ্ঞা বলে গৃহীত হতে পারল না। এই সংজ্ঞাটির অর্থ খুব পরিস্ফুট নয়ে। এখানে 'necessary' কথাটি কতদূর ব্যাপক, এর কোন বিচার নেই। এইভাবে এক যুগ থেকে আর এক যুগে Mathematics এর সংজ্ঞা ক্রমপরিবর্তিত হয়ে চলল। এক যুগে লোকেরা সর্বসম্মতিক্রমে যে সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করে নিল, পরবর্তীরা এসে তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি ধরবে যার পরে সেটিকে বাধ্য হয়ে বিদায় নিতে হবে। তার ফলে সে যুগের মত নিজেরা এর একটা মনোমত সংজ্ঞা গঠন করে নেবে। গণিত শাস্ত্রকে যুক্তি দিয়ে স্থির করতে হয়। এর প্রতিপদে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল প্রমুখ গণিত তার্কিকেরা এর সত্যতা নির্দ্ধারণ করেছেন। এ. বি. কেম্প গণিতের সংজ্ঞা দেন এই :—

'Mathematics is the science by which we investigate those characteristics of any subject matter of thought which are due to the conception that it consists of a number of differing and non-differing individuals and pluralities.'

এর দশ বৎসর পরে ম্যাক্সিম্ ফোচার কেম্পের সংজ্ঞাকে পরিবর্তিত করে এই করেন :—'If we have a certain class of objects and a certain class of relations, and if the only questions which we investigate are whether ordered groups of those objects do or do not satisfy the relations, the results of the investigation are called Mathematics.' ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত 'Principels of Mathematics' গ্রন্থে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ গণিতের এক বড় হাস্যাস্পদ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। গণিতকে সম্পূর্ণ যুক্তি নীতির বিষয় বলে স্বীকার করেও তিনি ঐ গ্রন্থে বলেছেন,—'Mathematics is the subject in which we never know what we are talking about nor whether what we are saying is true.' এ সংজ্ঞাটিকে অদ্ভুত মনে হলেও আধুনিক গণিতের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শাখা সম্বন্ধে এ উক্তি খাটে। তা ছাড়াও নানা জনে নানা ভাবে গণিতের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

যা হোক, গণিতশাস্ত্রকে বাস্তব বিবেচনার দিক থেকে কি পরিমাণ কাজে লাগাতে পারি, আমাদের লক্ষ্যের কেন্দ্র সেটাই হওয়া উচিত। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রীকেরা এবং তারপর ভারতের আর্য ঋষিরা গণিত আলোচনায় বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। গণিতের কোন কোন অংশে খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই চীন ও মিশর বেশ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। অধুনা গণিত আলোচনায় এশিয়া মহাদেশ একদম পিছনে পড়ে আছে। আফ্রিকা

ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন উল্লেখযোগ্য অবদান কোন কালেই ছিল না। প্রাচীন ভারতের হিন্দু-গণিত আজ এক রকম লোপ পেয়েছে বললেই হয়। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ করে বীজগণিতে ভারতীয়দের খ্যাতি গ্রীকদের খ্যাতিকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ বরাহ-মিহির, আর্য ভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, পদ্মনাভ, ভাস্কর তাঁদের সম্বন্ধে অল্পই আমরা জানতে পারি। এর প্রধান কারণ হল, আমাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল। বিজ্ঞান আলোচনা দার্শনিক ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যার খুশি সেই ইচ্ছামত গণিত আলোচনা করতে পারত না। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আবিষ্কারের ফলাফলগুলো অন্য সকলের কাছ থেকে গোপন রেখে দুরূহ ভাষায় একান্তে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কাজেই সাধারণের মধ্যে গণিতের কোন প্রসার ঘটা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। গ্রীকেরা ব্রাহ্মণদের মতন এমন অনুদার ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁদের মধ্যে ভাষার কোন দুর্বোধ্যতা কিংবা গোপনীয়তাও ছিল না। গ্রীকদের অবদান এ অঙ্কেই এত মূল্যবান। গাণিতিক সভ্যতায়ও গ্রীসের নিকট সারা বিশ্ব ঋণী। আমাদের আধুনিক গণিত আলোচনায়ও গ্রীকদের প্রাথমিক সূত্রগুলোকে বাদ দিতে পারি না। গণিতশাস্ত্রের কোন কোন বিষয়ে অবশ্য গ্রীকদের সাথে প্রাচীন ভারতীয়দের কিছু পরিমাণ যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান ঘটেছিল। চীনদেশ থেকেও একদল গণিতজ্ঞ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রাচীন ভারতের নতুন নিয়মেও গণিতশাস্ত্রের আলোচনা শুধু পুরোহিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল নিজেদের স্বার্থের জন্যেই আমাদের ঐতিহ্য বিলুপ্ত। ভারতীয় গণিতের কোন কোন অংশ অবশ্য কতিপয় ইংরেজ মনীষী দ্বারা অনুদিত হয়েছিল; কিন্তু আজ বিজ্ঞান আলোচনায় ইংরাজী ভাষাকে বাদ দিতে পারি না। আজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গণিত চর্চায় মনোযোগী হতে পারলে অন্যের কাছ থেকে যা নেব, নিজেদের উদার একাগ্রতায় ফিরিয়ে দিতে পারব তার চাইতে বেশী।

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

সীমা দাস।

বয়স আমার বেশী হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই আমি আমার পিতার সহিত বঙ্গদেশে ও আসামের বিভিন্ন স্থানে গিয়াছি। দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা, নবান্ন প্রভৃতি উৎসব পার্বনে কিংবা স্বাধীনতা দিবস, নেতাজীর জন্মদিবস, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী প্রভৃতি উৎসবে অনেকবার যোগ দিয়াছি কিন্তু মনের মধ্যে তেমন একটি স্মরণীয় স্মৃতির চিহ্ন পড়ে নাই যেমন পড়িয়াছিল ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠের ২৭ তারিখে।

ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি :—

তখন ১৩৫০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস। আমি তখন প্রথম মানে পড়ি। মায়ের চক্ষুর অসুখ কিছুতেই কমিতেছে না দেখিয়া বাবা মাকে কলিকাতা লইয়া আসিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। আমাদের তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কাজেই আমিও তাঁহার সাথে কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতা আসিয়া আমরা একটি বড় মেসে উঠিলাম। বড় সহরে অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম কতকি দেখিব, কত বেড়াইব; কিন্তু যুদ্ধ এবং ও দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষের জন্য কিছুই হইয়া উঠিলনা। আত্মীয় স্বজনের বাসাতেও উঠিলাম না, কারণ ঐ প্রকার দুর্দিনে কাহারও বাসায় ওঠা বাবা পছন্দ করিতেন না। মেসটি বেশ বড়।

জানালার কাছেই সবসময় বসিয়া থাকিতাম। বাবা আমাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতএব জানালার কাছে বসিয়া কলিকাতার দৃশ্য যতটুকু

পারিতাম দেখিতাম, আর দেখিতাম দুর্ভিক্ষের জীবিত ছাপ দেওয়া নরকঙ্কালের মিছিল। তাহাদের কান্না, তাহাদের এতটুকু খ্যানের জন্য কাকুতি মিনতির শব্দ ক্ষীণভাবে আমার ঘরের জানালা পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিত। তখন আমি আর কতটুকু। কেন এই দুর্ভিক্ষ, কেন পথে মৃত্যুর প্রতিযোগিতা তার কারণ কিছুই বুঝিতাম

তবুও মন কাঁদিয়া উঠিত। ঐ সকল দৃশ্য দেখিয়া জানালা হইতে প্রায়ই খুচরা পয়সা, আনি, দুআনি নীচে ছুঁড়িয়া দিতাম। ভাবিতাম যদি উহাতে তাহাদের কিছু দুঃখ ঘোচে। ইহাতে আর এক জ্বালা হইল, প্রত্যহই দলে দলে ভিখারী আসিয়া ঠিক আমার জানালার নীচে ফুটপাতের উপর ভিড় জমাইত এবং বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাহিত। মায়ের চোখ বাঁধা, উহাদের গণ্ডগোলে তিনিও বিরক্ত হইতেন। সেদিন যখন চারখানা একআনি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলাম তখন তাহাদের ধস্তাধস্তিতে কয়েকজন অল্প বয়সের ভিখারী আহত হইল। ভিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া তাহারা মেসের ম্যানেজারের নিকট নালিশ করিলেন। এদিকে ম্যানেজার নালিশ করিলেন বাবার কাছে যে, আমি নাকি ভিখারীদের আস্কারা দেই এবং তাতে নাকি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। বাবা শুনিয়া কোন মন্দ বলিলেন না বরং বলিলেন যে, যদি ভিক্ষা দিবার আমার ইচ্ছা হয় তবে যেন কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাই এবং হাতে হাতে ভিক্ষা দেই। আমার ভয় কাটিয়া গেল এবং মনে মনে বাবাকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করিলাম।

পরদিন আবার ভিখারীরা আসিলে আমি উহাদের চিৎকারে কান দিলাম না। জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিলাম। সেদিন খুচরা পয়সা মোটেই ছিলনা। ভাবিতেছিলাম কি দেওয়া যায়। টেবিলের উপর একটি ছোট পাউরুটি ছিল। হঠাৎ ঐটি দিবার ইচ্ছা হইল। আমি ঐ রুটিটি লইয়া একাই নীচে নামিয়া আসিলাম। মেসের গেটের সামনে একটি অতি শীর্ণা স্ত্রীলোক ও তাহার সাথে পাঁচ বৎসরের একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলাম। এই কয়দিনে হয়ত তাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষুধার কথা জানাইতে লাগিল ও হাতের রুটির দিকে তাকাইতে লাগিল। আমি তাহা ভিখারিণীকে না দিয়া তাহার মেয়েটির হাতে দিলাম। মেয়েটি দুইহাত বাড়াইয়া যেমনই নিতে যাইবে অমনি তাহার মা কন্যার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেই খাইতে লাগিল। মেয়েটি জোড় করিয়া খাইতে গেলে উহার মা উহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় বোধকরি মেয়েটির মাথায় ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল, তাই নিকট স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মা কিন্তু নিরুদ্বেগে রুটি খাইতেই লাগিল। খাদ্য লইয়া মাতা ও সন্তানের মারামারি আর না দেখিতে পারিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। ভাবিলাম ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ পশু হইয়াছে।

পরদিন বাবা মাকে লইয়া সকালে ডাক্তার দেখাইতে যাইতেছিলেন, আমিও সাথে ছিলাম। দেখিলাম সেই ভিখারিণী একটি লোহার বাটী লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, মেয়েটি রকের উপর মরিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া ভিক্ষা চাহিল। আমি বলিলাম 'তোমার মেয়ে?' সে বলিল, 'আমার মেয়ে ঐ ঘরে আছে, কিছু খেতে দে।' মনে হইল, ভিখারিণীর বুকে যেন কোন জ্বালা নাই যত-খানি আছে তাহার পেটে। বাবা ডাকিলেন। গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। সমস্ত পথ শুধু ভিখারিণীর মেয়ের রুটির জন্য কান্নার আওয়াজ আমার মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই ১৩৫০ সালে আমি নেহাৎ ছোট ছিলাম। তখন বুঝিতাম না কেন দুর্ভিক্ষ, কেন এই অভাব অনটন; কিন্তু সেই দিনের স্মৃতিটুকু বোধহয় আমার হৃদয়ে যুগ যুগ সঞ্চিত থাকিবে।

ফ্রেনলজি

শ্রীপ্রশান্ত কুমার চৌধুরী

[গল্প]

হরিবিষ্ণুবাবু বসেছিলেন পার্কের একটা বেঞ্চিতে। গতকাল বেঙ্গল হেরে গেছে বোম্বাই-এর কাছে একটা টুর্নীর ক্রিকেট খেলায়। মনটা ভয়ানক খারাপ।

দূর দূর, একটা ভাল ক্রিকেটার জন্মালোনা আজ পর্যন্ত এই পোড়া বাংলা দেশে। খালি ফুটবল, আর ফুটবল!—সব কিছু খেলা ছেড়ে দিয়ে বাঙালীর এখন ক্রিকেট খেলায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

ভাবনাটা ভদ্রলোকের যখন প্রায় এই পর্যায় গড়িয়েছে, হঠাৎ কোথা থেকে কি একটা ধাঁই কোরে এসে হাঁটুতে লাগে। কোঁক কোরে উঠে ভাবনায় ছেদ ফেলতে হয়।

ওদিকে ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলতে খেলতে ঘণ্টে নিজের কব্জির জোর দেখে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে তখন।

ঘণ্টে আর ভ্যাবলা দুটি ভাই। বড়দিনের ছুটিতে এই প্রথম কলকাতায় মামার বাড়ীতে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে পার্কে ছেলেদের ড্যাংগুলি খেলা দেখে তার কোরে খেলতে সুরু কোরেছিল বেচারা। কে জানতো এমন ভাবে তার হস্তধৃত কাঠের ডাণ্ডার মারের চোটে গুলিটা সটান্ গিয়ে কোনো ভদ্রলোকের হাঁটুতে গিয়ে লাগতে পারে!

'আমরা কিছু জানি না মশাই। এই-এই-এই যে এই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।'—ছেলের দল ঘণ্টেকে ধোরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় হরিবিষ্ণুবাবুর সামনে।

কে তুমি? কি নাম তোমার?—ঘণ্টের হাতটাকে চেপে ধোরে প্রশ্ন করেন হরিবিষ্ণুবাবু।

চিনি না আমরা ওকে।—একদম না, একটুও না। দেখিইনি কোনোদিন। ওর নামই বা জানতে গেছে কে? কোথাকার উটকো ছেলে একটা, বাউণ্ডুলের মতন হাঁকড়ালে দেখুন না।—ছেলেরদল সবাই মিলে হিজিবিজি কোরে জবাব দেয়।

তোমাদের কৈফিয়ৎদারী করতে বলেছে কে?—ধমকানি দেন হরিবিষ্ণুবাবু।

বাপার সুবিধের নয় দেখে চম্পট দেয় দল। দাঁড়িয়ে থাকে কেবল ভ্যাবলা।

তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?—তেড়ে ওঠেন হরিবাবু। তাঁর হাতে তখনো ঘণ্টের হাতটা শক্ত কোরে ধরা রয়েছে।

আজ্ঞে ও' আমার ছোট ভাই। আমার আপন ভাই। ওর নাম ভ্যাবলা।—ঘণ্টে ভয়ে ভয়ে পরিচয় দেয় ভ্যাবলার।

ওঃ, তোমারই ভাই?—ভ্যাবলার হাতটাও চেপে ধরেন হরিবাবু।—কোথায় থাকো তোমরা?

সত্যি কথা বলার বিপদ অনেক। মামার কাছে টেনে নিয়ে গেলেই হয়েছে আর কি!—টাট্‌কা একটা বই-এ পড়া গল্পের কথা মনে পড়ে যায় ঘণ্টের। বলে, পালিয়ে এসেছি। সংসার বড় অত্যাচার। সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছি আমরা দুটি ভাই।—বেশ ভিজে ভিজে গলায় করুণ কোরে শুছিয়ে বলে তাহা মিথ্যে কথাটা।

লব-কুশের গান শুনে শ্রীরামচন্দ্রের সভাসদদের মতো অবস্থা হয় হরিবিষ্ণুবাবুর।

একটা বিয়ে করতেই ভরসা পেলুম না আমি এতদিন ধোরে, আর লোকটা কিনা দু-দুটো বিয়ে কোরে বসলো সটান? তার ওপর এমন দুটি চমৎকার ছেলে থাকতে? এমন একটা ভাবী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বাপ হবার পরেও আবার বিয়ে করবার শখ হয় মানুষের? আশ্চর্য!—রাস্তার দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করেন হরিবাবু। তারপর ওদের দিকে ফিরে বলেন,—এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

যে-দিকে দু-চক্ষু যায়!—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে সুরু সুরু একটা দীর্ঘশ্বাসও ছুড়ে দেয় ঘণ্টে।

তোমাদের চক্ষু দুটো তো যেখানে ফেলবে সেখানেই

গিয়ে পড়বে। এই নর্দমাটা, ঐ ছ'তালা বড় বাড়ীটা, ঐ পার্কের পুকুরের জলটা, ঐ ট্রামের লাইনটা, সবত্রই তো অবাধগতি তোমাদের চোখের; তাই বোলে ওসব জায়গায় কি আর তোমাদের আশ্রয় নেওয়া চলে?—লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাংলার এত বড়ো একটা ভাবী ক্রিকেটারকে এমনি ভাবে নষ্ট হতে দিতে পারি আমি, কিছুতেই নয়।—হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে হরিবাবু হাঁকেন, এই ট্যাক্সি।

তোমাকে কিন্তু প্রকাণ্ড বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে হবে। অমরনাথ, মানকাদ, হাজারী, মুস্তাক আলি, কার্তিক বোস—সবার চেয়ে বড়ো। বলতে নেই, এই বয়েসেই তোমার যা কব্জির জোর দেখলুম—তুমি তা পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। পারবে না?—গাড়ীতে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন হরিবিষ্ণুবাবু।

ক্রিকেট? মানে সেই ব্যাটবল্ খেলা তো? আমার খুব ইচ্ছে করে খেলতে।—ঘণ্টে জবাব দেয়।

ইচ্ছে করতেই হবে। ক্রিকেটার হবার জন্যেই যে জন্মেছ তুমি। জন্মেছ ক্রিকেটে বাংলার অসম্মান ঘোচাতে। একথা তোমার ক্যাব্‌লা বাপটা বোঝেনি। বুঝলে কি আর আবার একটা বিয়ে কোরে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়? তোমাদের সৎমা কোনোদিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন ভেবেছ? আরে দূর, ব্র্যাডম্যানের বৌ-ই ক্রিকেট খেলতে পারলোনা কোনদিন! তুমি হবে ব্যাট্‌সম্যান, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি হাঁকড়াবে। আর তোমার ঐ ভাই, ঐ ক্যাব্‌লা……

ক্যাব্‌লা নয়, ভ্যাব্‌লা।—সংশোধন করে দেয় ঘণ্টে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভ্যাব্‌লা।—ঐ ভ্যাব্‌লাকে বোলার তৈরী কোরে নিতে হবে চেষ্টাচরিত্তির কোরে।—ভদ্রলোক ভবিষ্যতের প্ল্যান্ এখন থেকেই এই মুহূর্তেই এঁকে রাপতে চেষ্টা করেন।

তোমরা দু'জনে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে, বুঝতে পেরেছ?—কেউ নেই আমাদের বাড়ীতে। শুধু আমি একা। আর কিছুনা, কেবল ক্রিকেট প্রাকটিস্ করবে তোমরা আমার বাগানে।

ভ্যাব্‌লা কানে কানে ঘণ্টেকে বলে,—সে কি রে!

ঘণ্টে বলে, চুপ করুন। ফাঁক বুঝে ঠিক ব্যবস্থা করবোখন্।

গাড়ী ছুটে চলে। তারপর হরিবিষ্ণুবাবুর নির্দেশে ঘ্যাঁচ্ কোরে থেমে যায় একটা বাড়ীর সামনে।

এই আপনার বাড়ী বুঝি?—ঘণ্টে আর ভ্যাব্‌লা জিজ্ঞেস করে।

না, এ বাড়ী আমার নয়। যাঁর বাড়ী, তিনি মস্ত বড়ো নামকাদা লোক। প্রকাণ্ড গণৎকার। কতো রাজা-মহারাজা নিজেদের ভবিষ্যৎ জেনে যান এঁর কাছ থেকে।

ভ্যাব্‌লা বলে,—আমাদের গ্রামেও একজন গণক-ঠাকুর আছেন, হাত দেখে আর কুষ্ঠি দেখে তিনিও বলতে পারেন অনেক কিছু। বাবা বলেন, তার মধ্যে বেশীরভাগই নাকি মেলে না। শুধু ছোড়দির বিয়ের সময় ওঁকে দিয়েই বাবা কুষ্ঠি মিলিয়েছিলেন।

আরে না, না। ইনি অমন পুরোনো ধাঁচের গণৎকার নন্। শুধু হাত কেন? হাত, পা, গলা, বুক কপাল, চোখ, কান, নাক, চুল, দাঁত, জিভ—সব কিছু দেখে বলে দিতে পারেন ভবিষ্যৎ। এঁদের ইংরিজিতে বলে ফ্রেনোলজিষ্ট। মানুষের কপালের উঁচুত্ব, নাকের খ্যাদাত্ব, দাঁতের ভ্যাড়াবেঁকাত্ব, চোখের ট্যারাত্ব, কানের চুলত্ব,—মানে এক কথায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন দেখে বলে দিতে পারেন, কে কি হবে; কার কি হবে।

আশ্চর্য!—এছাড়া আর কিছুই বেরোয় না ঘণ্টে ও ভ্যাব্‌লার মুখ থেকে। ততক্ষণে ওরা ভবিষ্যদ্বক্তার ঘরের মধ্যে ঢালা ফরাসের ওপর বোসে পড়েছে।

ক'জনের ভবিষ্যৎ গণনা করানো হবে?—একটি রোগাপানা ভদ্রলোক ইয়া মোটা একড় এক খাতা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন। গণকঠাকুরের নাইনে করা কেরাণী ইনি।

—একজনের, শুধু এই ছেলেটির।

—নাম?

—ঘণ্টে, বয়েস ধরুন তের।

টাউট্ খাতাখানা মুড়ে রেখে রোগাপানা লোকটি পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেন এঁদের।

বিশালকায় অবলম্বন গণকঠাকুরের দিকে ঘন্টেকে এগিয়ে দেন হরিবিষ্ণুবাবু।—ছেলেটার ভবিষ্যৎ জানা দরকার। সত্যি যদি ক্রিকেটার হবার আশা থাকে, তবেই না ওদের আশ্রয় দেবেন হরিবিষ্ণুবাবু। নৈলে কি দরকার অ-ক্রিকেটের দুটো ছেলেকে পুষে।

ফ্রেনোলজিষ্ট, গণকঠাকুরের পরীক্ষা শুরু হয়। শুরু হয় ঘন্টের চুলের ডগা থেকে, শেষ হয় পায়ের কড়ে আঙুলের নোখে এসে। টিপে, চিমটি কেটে, হাত বুলিয়ে, সুরসুরি দিয়ে, কাতুকুতু লাগিয়ে সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেন গণকঠাকুর। তারপর রায় দেন,—এর প্রকৃতিটা হবে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। ভবিষ্যতে মস্তবড়ো গাইয়ে হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গাইয়ে!!!—ফেটে পড়েন হরিবিষ্ণুবাবু। চাইনা, চাইনা, চাইনা আমি গাইয়ে। খালি গান আর গান, খালি ছিঁচকাদুনের মতো।—গাইয়ে হবেন! দরকার নেই বাপু আমার তোমাদের দিয়ে। যেতে পারো তোমরা। সৎসার অত্যাচারই দরকার তোমাদের। চাইনা, চাইনা, চাইনা কাউকে।

হরিবিষ্ণুবাবু আশা ভঙ্গে ফেটে পড়েন একেবারে। তাল বুঝে ঘন্টে ও ভ্যাবলাও দৌড় মারে ফ্রেনোলজিষ্টের আস্তানা ছেড়ে।

রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অস্থির হয়ে হরিবিষ্ণুবাবু নিজেকেই শেষ অবধি এগিয়ে দেন গণকঠাকুরের সামনে।—দেখা যাক্, আমার বরাতেই বা কি আছে।

আপনি,—হরিবিষ্ণুবাবুর আপাদমস্তক পরীক্ষা করতে করতে গণকঠাকুর বলেন,—আপনি হবেন সাধারণ একটি মানুষ। ভালও নয়, খারাপও নয়, নেহাৎ মাঝামাঝি। মানে, কোনরকম বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আপনার কোথাও।

পরীক্ষা করতে করতে হরিবিষ্ণুবাবুর হাঁটুর কাছাকাছি হাত পড়ে গণকঠাকুরের। সেখানে উঁচু খানিকটা মাংসের অবস্থিতি অনুভব করেন তিনি। বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে ফুলে আছে জায়গাটা। সাধারণ মানুষের যা একেবারেই থাকে না। ঐ স্ফীতমাংস অনুভব করেই চমকে ওঠেন গণকঠাকুর। বিস্ফারিত লোচনে বলে ওঠেন,—আপনি, আপনি হবেন প্রকাণ্ড দুর্ধর্ষ এক ডাকাত। হ্যাঁ, হ্যাঁ নির্ঘাৎ হবেন,—এখনই হয়ে আছেন কিনা তাই বা কে জানে?

ডাকাত!—ডাকাত হবো আমি!—দায় পড়েছে আমার ডাকাত হতে। নিজের পয়সাই খায় কে তার ঠিক নেই। খরচ করতে করতে ব্যাঙ্কের সুদের টাকাই ফুরোতে পারিনা, বলেন কিনা আমি হবো ডাকাত!—প্রায় খিঁচিয়ে ওঠেন হরিবিষ্ণুবাবু।

হতেই হবে যে। আপনার হাঁটুর গড়নই যে বলছে একথা।—গণকঠাকুর নিজের উক্তি সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয়।—আপনার হাঁটুর ঠিক ওপরেই ঐ যে খানিকটা ফুলে রয়েছে, ঠিক ওমনি ফুলো হাঁটুর গড়ন ছিল রবীন্ হুডের, আর ছিল আমাদের বাংলার বিখ্যে ডাকাতের,—এ সব আমাদের ফ্রেনোলজি শাস্ত্রে লেখা আছে যে। ঠিক তাদেরই মতো হাঁটুর গড়ন আপনার। কাজেই আপনি ডাকাত না হয়ে যাবেন কোথায়?

হাঁটুর গড়ন?—হাঁটুর গড়ন আমি তোমাকে ভাল কোরেই মালুম পাওয়াচ্ছি, ইডিয়েট্ কোথাকার। স্বগতোক্তি করেন হরিবিষ্ণুবাবু।—মন্ মেজাজ্! মিছিমিছি অমন একটা ছেলে হাতছাড়া কোরে দিলে লোকটা। ছেলেটা নিশ্চয়ই বড় ক্রিকেটার হোত।—আক্ষেপে ভরে যায় হরিবিষ্ণুবাবুর মন।

ভারী ফ্রেনোলজিষ্ট্ রে! তুবড়ির মতন ফেটে পড়েন হরিবিষ্ণুবাবু। রীতিমতো অবৈজ্ঞবোচিত কাজ করে ফেলেন তিনি। গণকঠাকুরের মাথাটা পেছনের দেয়ালে আচম্কা ঠুকে দেন ধাঁই কোরে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার পেছন দিকটা ফুলে ওঠে তাঁর। ভয়ে ভিরমি যাবার অবস্থা তখন গণকঠাকুরের।

গণকঠাকুরের সেই আলু মাথায় হাত দিয়ে হরি-

বিকুবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন এবার,—আমাদের পাড়ার নবকুল নামে গাইকাটার মাথার পেছন দিকেও ঠিক এমনি একটা আলু আছে : সুতরাং আপনিও গাইকাটা হবেন বৈকি। বুঝেছেন? কিংবা এখনই তা' হয়ে আছেন কিনা কে জানে!

কের
তখন

রেগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে যেতে যেতে দূরে দাঁড়িয়ে গণকঠাকুরের দিকে চেয়ে হরিবিকুবাবু

—শুনুন, আমার হাঁটুর ওপরে মাংসপেশীর ঐ পার্মানেন্ট্ নয়, বুঝেছেন? আপনার মাথার পেছনের ঐ আলুর মতোই ওটাও টেম্পোরারি। আমার আগেই যে ছেলেটিকে গাইয়ে হবে বোলে হাতছাড়া কোরে দিলেন, জেনে রাখুন, সে হবে মস্তবড়ো ক্রিকেটার।—আমার হাঁটুর ঐ দুলোটি ওরই সৃষ্টি; যেমন আপনার মাথার ঐ আলুটি আমার। বুঝলেন? কাড়ু মারি আপনার ফ্রেনোলজির মাথায়।

ঝড়ের মতন কথাগুলো বলেই হরিবিকুবাবু ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ঘন্টে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখে তিনি তখন মুহ্যমান।

হরিবিকুবাবু নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই গণকঠাকুর ঐ বিশাল বপু নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে চিঁ চিঁ কোরে বোলে ওঠেন, একটু জ-অ-অ-ল!

ফেলে আসা দিন

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

বয়েই তার বিয়ে হয়েছিল সরোজকুমারের সঙ্গে। কোষ্ঠী মিলিয়ে, দিনক্ষণ দেখে শুভ সময়েই শুভমিলন হ'য়েছিল সরোজ ও শীলার। অনেকের মতে সরোজ পরগাছা, রক্তশোষক, দেশের শত্রু। অপরাধ তার—নিজে সে কিছু করেনা, প্রয়োজনও নেই। কারণ পিতৃপুরুষ যা রেখে গেছেন তা-ই তার—তার কেন সরোজেরও পরে কয়েক পুরুষ পায়ের ওপর পা রেখে নিশ্চিন্তে চলতে পারবে। লোকে যতই গালাগালি দিক, মেয়ের বাবার পক্ষে এ হেন পাত্র লাভ অদৃষ্টেরই কথা। ধার দেনা করেও শীলার বাবা সরোজকে জামাই করে। বেশ ধুমধামের সঙ্গেই শীলা ও সরোজের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়ে যায়। এসব বহুদিন আগেকার ঘটনা……

অনেকদিন পরে সরোজ বেনারস থেকে ফিরছে। ট্রেণে তিলধারণের জায়গা নেই। গাড়ীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারদুইতিন ছোটাছুটী করে একটী প্রথম শ্রেণীর কামরার কোন রকমে উঠে পড়ে সে।

ট্রেণ ছেড়ে যায় যথানিয়মে, তবে যথাসময়ে বোধ-হয় নয়। ব্রীজের ওপর গাড়ী উঠতেই যাত্রীরা সকলে সমস্বরে জয় বাবা বিশ্বনাথ বলে চীৎকার করে ওঠে। সরোজও প্রণাম ক'রে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে কাশীর দৃশ্য, গঙ্গার দৃশ্য।

ট্রেণ ছুটে চলেছে তার গতিপথে……

হঠাৎ সরোজ চমকে ওঠে কামরার ভিতরের এক কোণে একটী মহিলাকে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারে, মনে মনে বলে, "সে তো অনেকদিন গত হ'য়েছে।"

অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টিতে মহিলা অস্বস্তি বোধকরে কিছুই বলেনা, কিন্তু চেয়ে থাকে বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে—।

কয়েকটা ষ্টেশনে গাড়ী থামে, আবার চলে। কত লোক নামে ওঠে। মহিলাটী চুপচাপ বসে থাকে। কি একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই, ভদ্রমহিলা চঞ্চল

হ'য়ে ওঠে। অল্পসময়ের মধ্যেই লোকজন এসে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলাও নেমে যায় গাড়ী থেকে। ট্রেণ ছাড়বার আগে সরোজ শেষবারের মত দেখে নেয় মহিলাটিকে, মহিলাও দেখে সরোজকে। চোখে চোখ পড়তেই মহিলা মাথার ওড়নাটা টেনে দেয় সলজ্জভাবে।

ট্রেণ আবার ছুটে চলে।···

গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীর নিকটে সরোজ পরিচয় পায় ভদ্রমহিলার। ইনিই বিখ্যাত নায়িকা হীরাবাঈ।—

* * *

এসব ঘটনাও অনেকদিন ঘটে গেছে সরোজের জীবনে। সরোজ আজ প্রৌঢ়। শেষ জীবন কাশীতে গঙ্গাতীরে কাটাবার জন্যে ছোট্ট একটী বাসা বেঁধেছে। সংসারে সে একা, সাথী তার একজন ঠাকুর ও চাকর। নিঃসঙ্গ শেষ জীবন শান্তিতে কাটাবার জন্যে এই স্থানই সে বেছে নিয়েছে।

হঠাৎ একদিন পাশের বাড়ীতে কীর্তন শুনে, সরোজ গিয়ে হাজির হয়। গান শেষে প্রশ্ন করে সে, "এমন সুন্দর বাংলা কীর্তন কি ক'রে শিখলে মা ?"

"মায়ের কাছে শিখেছি" গায়িকা উত্তর দেয়।

"মায়ের কাছে ? তোমার মা কি বাঙালী ? কি নাম তোমার মায়ের" ?—প্রশ্ন করে সরোজকুমার।

"মায়ের নাম হীরাবাঈ"—উত্তর দেয় মৃদুলাবাঈ।

·····সরোজের মন ফিরে চলে যায় পিছনে, ট্রেণের কামরায়, সেখান হ'তে আরও অতীতে·····

প্রশ্ন করে সে, "হীরাবাঈ, হীরাবাঈ কি বাঙালী ?"

"হ্যাঁ"—উত্তর দেয় মৃদুলা।

"হীরাবাঈ বাঙালী ! বলো মা কে সে, কি তার পরিচয় ?"—প্রশ্ন করে সরোজ আকুলভাবে।

"কেন বলুনতো ?"—মৃদুলা বলে।

"প্রয়োজন আছে মা, প্রয়োজন আছে—বলো, বলো তার পরিচয়।"

"শুনেছি মাকে কাশীতে অসহায় অবস্থায় বাবা দেখে বিয়ে আবার বিয়ে করেন।"

অস্ফুটস্বরে কণ্ঠে সরোজ সুধায়, "তারপর ?"

"তারপর, মায়ের জীবনসংগ্রাম সুরু হয়। মায়ের গলা ভালই ছিল, ওস্তাদ রেখে গান শিখে মা গান গাইতে সুরু করলেন মায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে।"

সরোজ শুনে যায় হীরা বাঈয়ের জীবনী। চোখের জল কোনরকমে আটকিয়ে প্রশ্ন করে সে, "মায়ের আসল নামটাই কি হীরা... ?"

—"না"।

—"তবে ?"

ইতস্ততঃ করে মৃদুলা। সরোজ বলে ওঠে "বলো মা বলো, তোমার মায়ের আসল নাম"—

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মৃদুলা। বুঝতে পারেনা ভদ্রলোকের এই ব্যাকুল অস্থিরতা কেন তবুও একটু ভেবে বলে, "তাঁর নাম ছিল শীলা।"

সরোজকুমারের চোখ ফেটে জল গড়িয়ে সে মৃদুলার দু'হাত চেপে ধ'রে ঝাকানি দিয়ে ব'লে ওঠে,—"আর, আর, তোমার বাবার নাম—না, না—থাক, থাক.....

সরোজকুমার চেয়ে থাকে মৃদুলার দিকে, চোখে তার জলের ধারা।.....

মৃদুলাও কিছু বলতে পারেনা, শুধু দৃষ্টিতে থাকে—পথের দিকে।

···রাস্তা দিয়ে একদল লোক মরা নিয়ে চলেছে, কণ্ঠস্বর তাদের ভেসে আসে—

"রাম নাম সত্য হ্যায়"·····

সিন্ধুর ডাক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূজার ছুটী শেষ হয়ে গেছে। সূর্য এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। সঙ্গে থাকে পূর্ণ। সেখানে নানারকম ছেলের সঙ্গে মেশে; নানারকম কথা শোনে। একদিন মাঠে ছেলেরা জটলা ক'রে খুব হৈহৈ করছে। কাল সুভাষবাবু এই ময়দানে বক্তৃতা করবেন। ভালো ক'রে মঞ্চ তৈরী করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক হ'তে হবে সব ছেলেদের। সকলকার একটা ক'রে গান্ধী-ক্যাপ চাই। সূর্য এক সময় প্রশ্ন করলে "সুভাষবাবু কে ভাই"? বড় ছেলেরা হো হো ক'রে হেসে উঠল। "এ রামঃ, সুভাষবাবু কে তাও জানিসনা? অত বড় লোক, দেশের কাজ করেন"—

সূর্য বললে, তোমরা এত হৈ হৈ করছ কেন"?

"বারে, হৈ হৈ করবনা? আমাদের কতবড় সৌভাগ্য তিনি আমাদের স্কুলে আসবেন"।

১৯৩৯ সাল চলছে তখন। বিস্ময়ে আর মর্মবেদনায়, বাংলা দেশের অন্তর্লোক তখন বিক্ষুব্ধ। তারই মধ্য থেকে সুভাষচন্দ্র তৈরী করলেন এক শক্তিশালী অগ্রগামী রাজনৈতিক দল। তার নাম হোল "ফরওয়ার্ড ব্লক"। দেশের যুবকদের মধ্যে জেগে উঠল নূতন প্রেরণা। তারা ঘোষণা করল কথায় আর কাজে কোনও পার্থক্য রাখবে না তারা। ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল অতি দ্রুতগতিতে। বাঙ্গালী ভুলতে পারল না, ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের একটি রাজনৈতিক ক্ষতচিহ্ন। ভুলতে পারল না ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভাকে। ভুলতে পারল না বাঙ্গালী আর একটি স্বনামধন্যা যশস্বিনী মহিলার প্রকাশ্য জনসভায় বিরুদ্ধ-মনোভাবের কথা। দেশের বহু ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং সেই আদর্শ সর্বত্র প্রচার করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতে লাগল। গ্রামে গ্রামে তারা তৈরী ক'রতে লাগল আদর্শ স্বেচ্ছাসেবক, যুবক সঙ্ঘ। খোলা মাঠ-ময়দানে জনসভা আহ্বান ক'রে তারা দেশের লোককে বোঝাতে লাগল তাঁর আদর্শ আর অভিমত। সহরের লোকেরা তো অনেক কিছুই জানে; কিন্তু অন্ধ পল্লীগ্রামের হিন্দু, মুসলমান কি জানে? তারা শুধু জানে, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ। তাদের বিশ্বাস, দেশের এরাই আনবে স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হলে সুখে থাকবে; কিন্তু তাদের বর্তমানের দুঃখটা যে কি রকম, সে সম্বন্ধে তারা মোটেই সচেতন নয়। এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে, কোন্ পথে চলতে হবে, তাও তারা জানে না। তারা পরম নিশ্চিন্ত; কংগ্রেস আছে, মুসলিম লীগ আছে—তাদের ভাবনা কি? আজ দেশের জনসাধারণের মনের যখন এই অবস্থা, সেই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা সেখানে এসে দাঁড়াল দলবদ্ধ হয়ে; দেশবাসীকে শোনাতে লাগল নূতন কথা; জীবন সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতার কথা। দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ আত্মকলহ ভুলে, সংঘবদ্ধ হয়ে শুনলো সেই সব উপদেশ কথা। সেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সূর্যর মতো বহু অল্প বালক ও যুবক দেশ সম্বন্ধে মনে জাগিয়ে তুলতে লাগল গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম। সেই সুভাষচন্দ্র আসছেন পূর্ববঙ্গের একটী মফস্বল সহরে গ্রাম পরিদর্শন করতে। ছেলেদের গর্বের আর সীমা নেই। তাঁকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করার উৎসাহে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সূর্য থাকে বৃহৎ চৌধুরী বাড়ীর অসংখ্য অনুশাসনের অন্তরালে। সে বাইরের খবর জানবে কি ক'রে? চৌধুরী বাড়ী সংবাদ পত্র আসে প্রত্যহ চারখানা ক'রে; কিন্তু তা বাহির মহল ত্যাগ ক'রে অন্দরে কোনও দিন প্রবেশ করে না। দেশ স্বাধীন কি পরাধীন; দেশের শাসক, স্বদেশী, বিদেশী, পল্লীগ্রামের মেয়েদের সে সম্বন্ধে জানারও কোনও আগ্রহ নেই। নিজ নিজ পরিবারস্থ পুরুষদের সুসংবদ্ধ শাসনশৃঙ্খল তাদের সমস্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার মর্মমূলে কঠিন সীমারেখা রচনা ক'রে

রেখেছে। বাঙ্গালী অন্তঃপুরিকারা তাইতেই সন্তুষ্ট। সূর্যও সেই অন্তঃপুরে বসবাস করে, কাজেই যুগোপযোগী ছেলেরা ওকে নিয়ত পরিহাস করবেই।

সূর্য আবার বোকার মত প্রশ্ন করলে, "সুভাষচন্দ্র কে ভাই"?

ছেলেরা আবার উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল। সেই সময় সেখানে দিয়ে একজন শিক্ষক যাচ্ছিলেন। তিনি সহাস্যে জিগ্যেস করলেন, "কি হয়েছে তোমাদের"?

ছেলেরা বললে, "দেখুন স্যার, ও সুভাষচন্দ্রের নামও জানেনা। কি অদ্ভুত"!—চৌধুরী বাড়ীর ছেলে ব'লে সূর্যকে সকলেই চিনতো। তার অবস্থা উপলব্ধি ক'রে শিক্ষক ছেলেদের কোনও কথা না বলে, সূর্যকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর অধ্যয়ন কক্ষে। ছেলেরা আবার মাঠ সাজানোর উৎসাহে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বড়লোকের আদুরে ছেলে ব'লে সূর্যর প্রতি ওদের কোনও আকর্ষণ ছিল না।

সূর্য বাংলার মাষ্টার মশাইর কাছ থেকে কি শুনল? কি মন্ত্রের দীক্ষা তিনি দিলেন ওকে?—কোন্ জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিলেন ওর মনে? সূর্যর মেয়েলি মনে চলেছে তারই তুমুল আলোড়ন। সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ করল বোকা সূর্য আজ অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেছে। কি যেন সে ভাবছে অন্যমনস্ক হয়ে।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সূর্য আজ আর কাকীমার পাশে বসে তাঁর চুল বাঁধার কাঁটা চিরুণী নিয়ে বিরক্ত করতে বসল না। লক্ষ্মীদিকে গল্প বলার জন্য জ্বালাতন করল না; কিংবা জুডো খেলার জন্য তাপ্তীকে ডাকতে পাঠাল না ফুল মাসীমার বাড়ী। সে সোজা চলে গেল কৃষ্ণশরণের খাস্ কামরায়। কৃষ্ণশরণ তখন সংবাদপত্র পড়ছিলেন—আর রূপার গড়গড়ার সুগন্ধি তাম্বুল সেবন করছিলেন। এমন সময় সূর্য ডাকল, "কাকাবাবু"? চোখ তুলে তিনি সূর্যর দিকে তাকালেন। স্নেহে বললেন, "কি রে"?

সূর্য নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'লে ফেলল, আমি স্বেচ্ছাসেবক হবো। আমাদের স্কুলের ছেলেরা সবাই হচ্ছে"—

কৃষ্ণশরণ সূর্যর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সূর্য কি বলছে? তিনি লক্ষ্য করলেন সূর্যর মনের ভাব আজ অন্য রকম। সে তার বালক বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে এই চৌধুরী বাড়ী ছাড়াও বাইরে এক বিশাল পৃথিবী আছে। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। আরও বুঝেছে পৃথিবীতে ভারতীয় নামে যে বিরাট জাতি আছে, তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। কেননা তারা পরাধীন। এই পরাধীনতা মোচনের জন্য দেশের বড় বড় লোকেরা কত নিগ্রহই না ভোগ করছেন, জীবন দান করছেন; বিদেশী শাসনের কূট চক্রান্তে সমস্তই নিষ্পেষিত হ'য়ে যাচ্ছে তবুও তাঁরা অটল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশকে স্বাধীন তাঁরা করবেনই এই তাদের পণ। সূর্যও তাঁদেরই দেশের ছেলে। এই বৃহৎ যজ্ঞের কিছু অংশ গ্রহণের দায়িত্ব তারও রয়েছে, একথা সূর্য আজ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছে। তাই তার মনে কোনও কুণ্ঠা আজ নেই। সে কৃষ্ণশরণের মুখের দিকে চেয়ে বললে "কাকাবাবু, আমাদের স্কুলে সুভাষচন্দ্র আসবেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁকে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসবে।"

কৃষ্ণশরণের এতক্ষণে তার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হোল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সে কথা আমি শুনেছি"

সূর্য বললে, "আমায় কিছু টাকা দেবেন, আমি ইউনিফর্ম কিনে দোব"—

কৃষ্ণশরণের গলায় যেন কথা আটকে আসে। এই সেদিনের সূর্য এসব বলে কি? কিন্তু সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি অভ্যস্ত। তিনি বললেন, "টাকা না হয় দেওয়া যাবে; কিন্তু তুমি এসব হুজুকে মেতে পড়াশুনা নষ্ট কর এ আমার ইচ্ছা নয় সূর্য"—নির্ভীক কণ্ঠে সূর্য বললে, "হুজুক নয় কাকাবাবু, এ তো আমাদের কর্তব্য।"

"কি করতে চা

কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। চোখ নীচু করে অবিচলিত কণ্ঠে সূর্য বললে, "প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখাতে হবে। তারপর নেতারা যা বলবেন তাই করতে হবে সব ছেলেরাই নাম লিখিয়েছে কাকাবাবু"।

কৃষ্ণশরণ তার নির্ভীকতায় আশ্চার্য হয়ে গেলেন। রাতারাতি এ ছেলে মনের এই দৃঢ়তা সংগ্রহ করল কোথা থেকে? এ রক্তাক্ত পথের সন্ধান দিলই বা কে তাকে? তিনি বললেন, "তোমাদের নেতার নাম কি"?

"আমাদের বাংলার স্যার," সূর্য উত্তর করলে।

"ওঃ সেই ছোকড়াই ছেলেদের মাথাগুলো অসময়ে জাহান্নামে দিতে বসেছে"—না, কাকাবাবু, আমরাই তাঁকে আমাদের দলে ডেকেছি। তিনি প্রথমে আসতে চাননি। তাঁর অনেক কাজ। তারপর আবার পড়াশুনাও করেন"—আশ্চর্য, একেই বলে যুগের স্পর্শ; কাকার চোখে চোখ রেখে সত্য কথা বলতে সূর্যর কণ্ঠ একটুও কাঁপল না। চোখের পাতা একবারও নেবে গেল না।

কৃষ্ণশরণ বুঝতে পারলেন, তেরো বৎসরের বালকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাঁকে অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। ওই ভয়ঙ্কর পথে কিছুতেই তিনি সূর্যকে যেতে দিতে পারেন না। মুখে বললেন, "আচ্ছা কাল স্কুলে যাবার সময় মনিবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও"।

আনন্দে ভরে উঠল সূর্যর বুক। ঠিকই বলেছিলেন স্যার, সত্য কাজের পথে বিপদ এলেও তা স্থায়ী হতে পারেনা। আনন্দের আতিশয্যে ও বললে," কাকাবাবু, এবার বড়দিনে আমি কোলকাতায় বেড়াতে যাবো। আমার অনেক লোককে জানতে ইচ্ছা করে, অনেক জিনিষ দেখতে ইচ্ছে করে"—

কৃষ্ণশরণ বললেন, "বেশ, তাই হবে। এখন তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া কর—"

কমলাকে এই সুখবরটী দিয়ে সূর্য পড়ার ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসল।

সূর্যর আশা সফল হয়েছে। সে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছে। রোজ ভোর বেলা সঙ্কেতধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকল ছেলের সঙ্গে মিলে সূর্য যায় স্কুলের ময়দানে কুচকাওয়াজ করতে। সেখানে শেখে নিয়মানুবর্তিতা আর সংঘবদ্ধতা। ওরাই ত হবে ভবিষ্যতে জাতীয় সৈন্য। রক্ষা করবে স্বাধীন দেশ। তারপর সুভাষচন্দ্র যেদিন ওদের স্কুলে এলেন সেদিন ছাত্রদের যে কি তুমুল উদ্দীপনা, কি হর্ষদীপ্ত মুখশ্রী! দূরে সড়কে যখন তাঁর ঘোড়ার গাড়ী এসে থামল, তখন পথের জনতা উন্মাদে চিৎকার ক'রে উঠল, "বন্দেমাতরম সুভাষচন্দ্র কি জয়, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক"।

স্বেচ্ছাসেবকেরা কিন্তু নীরব। সুসজ্জিত তোরণ দ্বারের দুই পাশে তারা নির্ভীক ভাবে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর স্কুলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে এলেন তোরণ-দ্বারে। স্বেচ্ছাসেবকরা সসম্ভ্রমে তাঁকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানালে। সেই পরম সুন্দর সৈন্যকান্তি জনপ্রিয় নেতা সহাস্যবদনে ছাত্রদের শ্রদ্ধা গ্রহণ ক'রে ভীড়ের মধ্য দিয়ে সভা প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরাও গিয়ে সভার একাংশে উপবেশন করল। যে ছোট্ট মেয়েটী সুভাষচন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত করল, সূর্যর মনে হোল সে মেয়েটী যেন ওর চেনা—কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে ও মনে করতে পারলনা সে কে। এমন সময় সুভাষচন্দ্র মঞ্চোপরি উঠে দাঁড়ালেন, নবোদিত সূর্য কিরণে তাঁর বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাস-দীপ্ত বীর-মূর্তি শাণিত তরবারির মত ঝলমল করে উঠল। সমবেত জনমণ্ডলীর মুখে ধ্বনিত হ'ল:—

"বন্দেমাতরম্—
বন্দেমাতরম্
সুভাষচন্দ্র কি জয়—
সুভাষচন্দ্র কি জয়
ইনকিলাব জিন্দাবাদ—
ইনকিলাব জিন্দাবাদ"

সুভাষচন্দ্র যুক্তকরে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,—"সমবেত বন্ধুগণ, জনমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ

আমি আজ আপনাদের মধ্যে এসে আপনাদের দেখে অন্তরে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। আপনারা হয়ত জানেন না, দেশের সম্মুখে আজ কি দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। তার জন্য সমগ্র জাতির প্রস্তুত হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু দেহের প্রস্তুতিই সব নয়—মনের প্রস্তুতিও চাই। কারণ বিপদ এলে তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে আপনাদেরই। আপনারা মনে রাখবেন, আমরা যা কোরবো শুধু নিজের দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য। তাছাড়া বিদেশীকে সামান্যতম সাহায্যও করব না আমরা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে আমাদের দেশ কত পিছিয়ে রয়েছে। আজও বিদেশী শাসক আমাদের শাসন করছে, আমাদের শোষণ করছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা আমাদের আর কি আছে? সাম্রাজ্য লোভী ধূর্ত ব্রিটীশের সম্মুখে আজ ঘোর দুর্দিন আসন্ন। এই অবসরে আমাদের দেশ থেকে ওদের চলে যেতে বাধ্য করতে হবেই হবে। আপনারা প্রস্তুত হোন। যুবকেরা ও বালকেরা দলে দলে জাতীয়-বাহিনী গঠন করুন; সেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দিন সকলে। অস্ত্র-শস্ত্রের এখন প্রয়োজন নেই। শুধু আপনারা তৈরী হোন। জাতীয়-বাহিনীকে শক্তিশালী ক'রে তুলুন। দেশের জনসাধারণকে ডেকে বুঝিয়ে দিন আমাদের অবস্থা। এই সব ছোট ছোট পল্লী, সহরের সমস্ত নরনারী যেদিন জেগে উঠবে, নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারবে, ব্রিটীশকে সেদিন ভারত ছাড়তেই হবে। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমরা স্বাধীন হবোই। বন্দেমাতরম্।"

জনতা উত্তাল হয়ে উঠল, "সুভাষচন্দ্র কি জয়—বন্দেমাতরম্"—সভা শেষ হোল। যুবকেরা অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তাড়াহুড়া করতে লাগল।—সূর্য ভীড়ের মধ্যে থেকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মালীর ঘরের সামনে আম গাছটির নীচে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। ওর মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করতে লাগল সুভাষচন্দ্রের দৈববাণীর মত কথাগুলি। ও ভাবছে, সত্যিই কি আমাদের দেশে যুদ্ধ হবে? সে কি রকম যুদ্ধ? মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যে রকম হয়েছিল, সেই রকম? তাই যদি হয় তবে অত সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র কই? কিন্তু শত্রুরা যদি সত্যিকারে যুদ্ধ করতেই চায়; যেমন পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্যোধন ইচ্ছা করে যুদ্ধ বাধাল, সেই রকম—তাহলে আমাদেরও ত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।—বেটাছেলেরাই ত যুদ্ধ করে, মেয়েমানুষ কি আর করে? কাজেই সব ছেলেকেই সৈন্য হতে হবে। কাকাবাবু একথা শুনলে ত ভীষণ রাগ করবেন, কিন্তু না শুনেও ত উপায় নেই। দেশ আমাদের; তার বিপদে আমরা যদি সাহায্য না করি তবে আর কে করবে? সূর্য ভাবে, ভাবতে ভাবতে ওর রক্তের মধ্যে শিহরণ খেলে যায়। সে-ও সামরিক পোষাক পরে বন্দুক হাতে নিয়ে, পিঠে জলের ব্যাগ ঝুলিয়ে যুদ্ধ করবে। পলাশী যুদ্ধের কাহিনী সূর্য সমস্তটা পড়ে ফেলেছে। উঃ! ইংরাজেরা কি বিশ্বাস-ঘাতক—কি কূট-বুদ্ধি ওদের! সূর্য যদি নবাব সিরাজদ্দৌলা হোত, তাহলে সে কখনও মীরজাফর উমিচাঁদকে বিশ্বাস করত না এবং ইংরাজও কিছুতেই এদেশের সিংহাসন দখল করতে পারত না। সূর্য এতদিনে বুঝেছে সেই দুষ্ট ইংরেজরাই ওদের শাসক, যাদের ওরা রাজা বলে। ওদের বার মহলে প্রকাণ্ড যে দুখানা ছবি টাঙানো আছে রাজা রাণীর, সেই তারাই হোল এই বিদেশী জাত। আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে। আরও অনেক সম্ভব অসম্ভব কল্পনা সূর্যর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। একসময় ওর চোখের সামনে দিয়ে সীতাপুরগড়ের সেই ছোট মেয়েটি চলে গেল, ও তবুও চুপ করে বসে রইল।

কৃষ্ণশরণ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন সূর্যর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। তিনি বেশ বুঝতে পরছেন: তাঁর সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে সে অন্য পথে চলতে সুরু করেছে। সে পথকে তিনি ভয় করেন; তাঁর বাপ পিতামহরা কোনও দিন সে পথের সংস্রবে যায় নি। উপরন্তু তাঁরা রাজাকে রাজার তুল্য সম্মানই দিয়ে এসেছেন। এর

এক উপায় আছে, ছেলেকে এখান থেকে সরাতে হবে। কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজদের কোনও বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলেই ঠিক সায়েস্তা হয়ে যাবে। বাস্তবিকই ওরা শাসন করতে জানে। কমলার কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই মনঃপুত হোল না। একে ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে হবে, তারপর ম্লেচ্ছদের স্কুলে পড়া, তাও না হয় ছেলের শুভ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সহ্য করে নেওয়া যায়; কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকা অসম্ভব: একেবারে অসম্ভব। সেকি রে বাপু, দেশে কি পাকার জায়গা নেই? কমলা বেঁকে বসলেন; তিনি বুকে ক'রে ছেলে মানুষ করেছেন—তাঁর জোর আছে বৈকি? উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে কৃষ্ণশরণকে কমলার যুক্তিকে মেনে নিতে হোল। আয়োজন সুরু হয়ে গেল বিদেশে চিঠি পত্র লেখালেখি চলতে লাগল। ঠিক হোল, কৃষ্ণশরণের এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকবে সূর্য। পড়বে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে। তাঁর আত্মীয় বন্ধু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, এই ব্যবস্থাই উত্তম। ইংরেজের শত্রুতা করে, কেউ কোনওদিন সুখের জীবন যাপন করতে পেরেছে? কেউনা। এ পথের পরিণাম জীবনে জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর না হয় পুলিশের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বেড়ানো—অশেষ দুর্গতি, অশেষ কষ্ট। এই ত দেশ-সেবার পুরস্কার। সূর্য যদি ওই পথে যায়, কৃষ্ণশরণের এই অগাধ বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে? তাঁর ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবে কে? আর যেই হোক, চৌধুরী বাড়ীর ছেলে ও পথে যেতে পারে না।

যার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, সে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে বইয়ের স্তূপের মধ্যে আত্মসমাহিত। সূর্য এখন কেবল পড়াশুনা করে। কোলকাতার বড় বড় দোকান থেকে ভি, পি,-তে বই আনায়। ওর ইচ্ছা ও আগে বই পড়ে জানবে, পৃথিবীর কথা, মানুষের কথা, তারপর স্থির কোরবে বড় হ'য়ে কি কোরবে। সেদিন ছিল রবিবার, নিজের ঘরে বসে সূর্য পড়ছিল। এমন সময় বারো বছরের মেয়ে কিশোরী তাপ্তী তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চিবুকের নীচে বুড়ো আঙ্গুল ছুঁইয়ে কপাট ধরে বেঁকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "ইস্ ভারী ত পড়া? তারপর সুর ক'রে বললে:—

"আড়ি, আড়ি, আড়ি
কাল যাবো, বাড়ী,
পরশু যাবো ঘর,
কি করবি কর"?

সূর্যর পড়ার বিঘ্ন ঘটলেও তার বড় হাসি পেল। সে বই থেকে চোখ তুলে বললে, "কি হয়েছে রে তাপ্তী? হঠাৎ আড়ি কেন"?

তাপ্তী মুখ ভেংচে বললে, "আড়ি করবে না ত কি? আমার অনেক নতুন বন্ধু হবে। থাকো তুমি তোমার পড়া নিয়ে"।

"বুঝিস না কেন তাপ্তী, পড়াশুনা করলে কত কি জানা যায়। তোর জানতে ইচ্ছে করে না"? তাপ্তী মুখ ভার করে বললে, "কেই বা আমায় শেখাচ্ছে? আগে যা-ও স্কুলে যেতুম, এখন মা তা-ও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন"।

সূর্য বললে, "কেন আমার কাছে এলেই হয়। আমি তোকে বেশ পড়াতে পারি"।

তাপ্তী ঠোঁট উলটে বললে, "হুঁ!। তুমি আবার আমায় পড়াবে! চোখ তুলে যে কথা পর্যন্ত কয় না একটা"।—

অভিমানে তার গলা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা সূর্য এতক্ষণে বুঝতে পারল। তাপ্তী তার উপর রাগ করে আড়ি দিতে এসেছে।

সূর্য সস্নেহে হেসে বললেন, "এখানে আয় তাপ্তী, আমার কাছে এসে বোস্। আয়, তাড়াতাড়ি আয়"।—

তাপ্তী এসে চৌকীর একাংশে ব'সল। সূর্য ব'ললে, "এই ত লক্ষ্মী মেয়ে। এখন বলতো তোর কি হয়েছে। এত কান্নাকাটি কেন"?

সূর্যর হাতে চিমটী কেটে তাপ্তী বলে, "যাও, কাঁদতে দেখলে কখন আমায়"?

সূর্য বললে, "আমার লাগেনা বুঝি?—আচ্ছা স্বীকার করলুম তুই কাঁদিসনি; কিন্তু সকাল বেলা আড়ি দিলি কেন বল দিকি"?

তাপ্তী একটা ঢোক গিলে নিয়ে, একটু থেমে বললে, "কাল আমরা যে মামারবাড়ী, যাচ্ছি"—

সে তো ভালো কথা—সূর্য উৎসাহের সঙ্গে বললে।—

'হাঁ।' ভালো কথাই ত, তোমার কাছে ভালো ত লাগবেই"—তাপ্তী বললে। সূর্য কিছু বুঝতে পারেনা—তাপ্তীর কথাবার্তার সুর যেন আজ অন্য রকম। সে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাপ্তী মুখ নীচু করে বসে আছে, ওর মুখ স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছেনা। তবুও চেয়ে থাকতে থাকতে সূর্যর এক সময় মনে হোল তাপ্তী যেন ওর কাছে কি একটা গোপন করতে চাইছে—ওর মনে হোল, তাপ্তী যেন আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছে। এই নতুন করে জানা-শোনার মুহূর্তে সূর্যর যেন আজ নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করতে লাগল তাপ্তীকে। ও তাপ্তীর হাত দুখানি নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, "তাপ্তী তোর কি হয়েছে আমায় খুলে বল। মামারবাড়ী যাবি, এ তো আনন্দের কথা, এতে কারার কি আছে"?—

তাপ্তী মুখ তুলে তাকাল সূর্যর দিকে। বললে, "সেখানে ত তুমি থাকবে না সূর্যদা তোমার সঙ্গে ত আর খেলা হবেনা আমার"!

"কেন রে, আবার ত মামারবাড়ী থেকে ফিরে আসবি, তখন আবার আমরা একসঙ্গে খেলবো"—

"আমি আর ফিরে আসবোনা"—বলে সূর্যর মুঠোর মধ্যে থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক ছুটে তাপ্তী ঘর ছেড়ে চলে গেল। সূর্যর মন চাইল ওকে ডেকে আনে; তারপর ভাবল, এখন থাক দরকার নেই। বিকেলে ওদের বাড়ী গিয়ে ফুলমাসীমার কাছ থেকে জেনে আসাই ভালো, কি হয়েছে ওর। সূর্য বই খুলে নিয়ে আবার পড়ায় মন দিতে চাইলে; কিন্তু মন বসল না। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে তাপ্তীর জলভরা দুটি চোখের কথা। ওর কি হয়েছে?—অমন করছে কেন? আহা বেচারী।

কিছুক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর সূর্য উঠে পড়ল। বই চাই কিছুই ভাল লাগে না। ও বিরক্ত হয়ে ভিতরে গেল কমলার সন্ধানে। কিন্তু কমলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সূর্য লক্ষ্মীর সন্ধানে ঘুরতে লাগল এখানে ওখানে। এক সময় দেখতে পেল,—চৌকী-ঘরের বারান্দায় বসে লক্ষ্মী মুগ কলাই রোদে দিচ্ছে। সূর্যকে দেখে লক্ষ্মী তার পাতা খাওয়া কাল দাঁতের পাটি বার করে বললে, "এই যে দাদা, এমন সময়ে কি মনে করে"?

সূর্য প্রশ্ন করল, "কাকীমা কোথায় লক্ষ্মীদি"?

লক্ষ্মী বললে, "তোমার ফুল মাসীমার বাড়ীতে গো"।

সূর্য চেঁচিয়ে উঠল; "এখন যাবার কি দরকার ছিল, আমার বুঝি খিদে পায়না? সেই কোন সকালে খেয়েছি"—

লক্ষ্মী উঠে এসে তার হাত ধরে বললে, করছ কেন ছোট কর্তা?

"কাকীমা কি এমনি গেছে? তোমাদের তাপ্তীর যে বিয়ে; ওরা কামিখ্যে বাড়ী গেল মায়ের পুজো দিতে, তাই তোমার কাকীকে ডেকে নিয়ে গেল। একটা শুভ কাজে ত না করতে নেই? তুমি পড়ছিলে বলে কাকীমা তোমায় ডাকেনি—বলে গেছে আজ তোমার লক্ষ্মীছেলের মত বামন দিদির কাছে ভাত খেয়ে নিতে। বুঝেছ ত?"

"তাপ্তীর বিয়ে" এই কথাটী ছাড়া লক্ষ্মীর আর কোনও কথা সূর্যর কানে প্রবেশ করল না। কথাটা শুনে মনে মনে কেমন যেন একটা কৌতুক অনুভব করতে লাগল সূর্য। বললে, "তাপ্তীর বিয়ে? সত্যি লক্ষ্মীদি? অতটুকু মেয়ের আবার বিয়ে কি?" হি, হি, হি করে সে হাসতে লাগল। লক্ষ্মী বললে,

"ছোট বয়সেই ত বিয়ে দিতে হয়। বড় হলে কি আর পরের ঘরে যাগ মানে বউয়া? এইবার তোমারও একটা ছোট্ট বউর খোঁজ করতে বলব বউমাকে"—

লক্ষ্মীর পিঠে দমাদম কিল আর ঘুঁসি মারতে লাগল সূর্য। বললে, "আমার তেল মাখিয়ে দেবে না? কাকীমা এলে আমি ঠিক বলে দোব"—লক্ষ্মী তার পিঠের কাপড় তুলে বললে, "আমিও বলে দোব বৌমাকে, যে দেখ তোমার সুষি ঠাকুর আমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন চল নাইবে"—

খেতে বসে এক সময় সূর্য জিগ্যেস করল, "আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তবে যে তাপ্তী বললে কাল মামার বাড়ী যাচ্ছে?"

লক্ষ্মী বললে, "তাইত, মামাবাড়ী আনন্দ নগর গিয়েই ওর বিয়ে হবে। বাপ নেই, মামারাই ত সব ব্যবস্থা করছে। আর সেখানে সহর বাজার জায়গা, বরেদেরও ইচ্ছা মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ওইখানে বিয়ে দেওয়া তাইত ওরা যাচ্ছে"—

সূর্য আবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তাপ্তী বলেছে যে আর এখানে আসবেনা—কেন?"

"পাগল ছেলে।" লক্ষ্মীদি মৃদু হেসে বললে, "আসবেনা কেন? আসবে বৈকি। তবে দূর দেশে বিয়ে দিচ্ছে কিনা, তাই অত খরচ পত্র করে ঘন ঘন কি আর মেয়ে আনতে পারবে তোমার মামী? সত্যি মেয়েটা বড্ড ভাল ছিল, সব সময় আসতো যেতো, চলে যাবে শুনে মনটা যেন কেমন করছে—নারে সূর্য"? লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে সূর্য ম্লানবদনে বললে "হ্যাঁ, লক্ষ্মীদিদি।" লক্ষ্মী জানত তাপ্তী ছিল সূর্যর অন্তরঙ্গ খেলার সাথী। সেই জন্যই তার মনোভাব বুঝতে ওর মোটেই দেরী হোল না। সস্নেহে সে বললে, "তাত করবেই দাদা, তাপ্তী যে বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে ছিল। এমন মেয়ে যার ঘরে যাবে সেই তাকে ভালো বাসবে—কি বল দাদা?"

সূর্য তখন থালার উপর ঝুঁকে পড়ে খাচ্ছিল, কোনও কথার জবাব দিল না। লক্ষ্মী আবার বললে, "খেয়ে নিয়ে আজ আমার কাছে শুয়ো দাদা, বুঝলে? গল্প বলবোখন"—

সূর্য এবারেও কোনও কথা বললে না। এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, তিন লাফে গিয়ে লক্ষ্মীদির বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। লক্ষ্মী তার এঁটো পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে সূর্যর পাশে বসল। সূর্য বললে, "তুমি খাবে না লক্ষ্মীদিদি"?

লক্ষ্মী তার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "না দাদা আজ আমার একাদশী"—

সূর্য এতক্ষণে মুখ তুলে লক্ষ্মীর দিকে তাকাল। নিষ্পাপ-চিত্তে ওর দুরন্ত বিস্ময়? একটা মানুষ সমস্ত দিন-রাত্রি একটু জল পর্যন্ত না খেয়ে কি করে থাকে? প্রতি পোনেরো দিন পর পর এই কথা ও লক্ষ্মীকে জিগ্যেস করছে; কিন্তু তাতে যা উত্তর পেয়েছে, তাতে করে ওর মনের তৃষ্ণা মেটেনি। তাই এখন ও শুধু লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়েই জানতে চেষ্টা করে এর মূল তাৎপর্য কি। লক্ষ্মীও চালাক মেয়ে। ও সুরু করল আজ অর্ধ-সিদ্ধ মানুষ ও পিশাচের গল্প। মানুষই ইচ্ছামত মানুষকে মারে, আবার বাঁচায়। একি কম আশ্চর্যের কথা! ধীরে ধীরে তার যখন চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে, তখন লক্ষ্মীও অতি সন্তর্পনে বিছানার থেকে নেবে পড়ে। আবার নিজের কাজ নিয়ে বসে।

তারপর এক সময় যাঁতার ঘড় ঘড় শব্দে সূর্যর ঘুম যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সে উঠে বসে দেখে যে রোদ্দুর আর নেই। ছবিবিবি ঘরের পিছনে পেপে আর কলা বাগানের মাথায় যেখানে পড়ন্ত বেলায় খানিকটা রোদ্দুর বাঁকাভাবে অনেকক্ষণ পড়ে থাকতো, এখন সেখানে রোদ্দুরের নাম মাত্রও নেই। ছাইগাদার পাশে বুনো ডুমুরের গাছটায়, মাথায় লালঝুঁটি বাঁধা কাল কুচকুচে দুটো যে ছোট্ট বুলবুলি শাখায় শাখায় লাফালাফি করে খেলা করতো তারাও এখন আর খেলা করছে না। নিশ্চয়ই অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে

পণ্ডিত মশাই এসে বসে আছেন? অন্ত দই একটুও পড়া হবে না—সূর্যর মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্মীদিদি সকালের রৌদ্রে দেওয়া মুগ কলাইগুলি বসে বসে বাতায় ভাঙছে। কাকীমা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফিরেছেন, তাপ্তীও ফিরেছে। না, না, এখন ওসব কথা ভাববার সময় নেই। সূর্য জামা গায়ে দিতে দিতে বাইরের বাড়ীর দিকে ছুটল। নিজের ঘরের থেকে কাকীমা ডাকলেন, "এখানে আয় সূর্য, একটু পেসাদ মুখে দিয়ে যা"—

কমলা তখন নিজের ঘরে বসে তাপ্তীকে আশীর্বাদী দেওয়ার বাক্স গোছাচ্ছিলেন; সূর্যর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। পণ্ডিতমশাই আজ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পর্ব শেষ করে পড়িয়ে চলে গেছেন। হেমন্তের বেলা, সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। পূর্ণ এসে বেড়াতে যাবার জন্ত ডেকে ফিরে গেছে। সূর্যর কিন্তু সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই। সে চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মন তার চলে গেছে সেই সুদূর অতীতের গৌরবময় যুগে; যেখানে পম্পানদী পার হয়ে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে সুগ্রীব, জাম্ববান প্রভৃতি একশত বীর-বানর-সৈন্ত নিয়ে রাম লক্ষ্মণ এসে দাঁড়িয়েছেন বিশাল সমুদ্রের সামনে। এই সমুদ্রের ওপারে, সোনার লঙ্কা। সেই দেশের রাজা দুষ্ট রাবণ রামের সীতাকে চুরী করে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করে রেখেছে অশোক বনে। এখন এই রাবণকে বধ না করলেতো সীতাকে ফিরে পাওয়া যাবে না!—যেমনি অদ্বিতীয় বীর রামচন্দ্র, তেমনি বীর দুষ্ট রাবণ। এখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। সেই যুদ্ধ, তীর, ধনুক, কামান, বন্দুক, সৈন্তসামন্ত; কি এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! সেই প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পৌরাণিক যুগের মানুষ যে যুদ্ধ করেছিল,—আজকের মানুষও সেই যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে। এবারও যুদ্ধ হবে, সেই সাগর পারের অধিবাসীদের সঙ্গে। সূর্যর ভাবনা সীমা হারা হয়ে যায়। ওর সমস্ত রক্তস্রোত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওকে কানে কানে বলে, "সূর্য, তুমি যুদ্ধ করবে?—শত্রুর সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করবে? ভয় কি? রামলক্ষ্মণের সঙ্গে বানরেরাও যদি যুদ্ধ করতে পেরে থাকে, তবে তুমিই বা পারবে না কেন?—রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছিলেন বন্দিনী সীতার জন্ত; আর সূর্য যুদ্ধ করবে তার বন্দিনী দেশ, ভারত মাতার জন্ত।"

অগ্রহায়ণের শেষ বেলা। মুক্ত প্রকৃতির চারিদিকে কুয়াশার আস্তরণ। পূর্ববাংলার বালু-মাটী এই সময় শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে থাকে। মনে হয় পথে প্রান্তরে কে যেন চূর্ণ চন্দন ছড়িয়ে রেখেছে। দূরে সরষের ক্ষেতে ফুটন্ত হলদে ফুলগুলি আবছা অন্ধকারে কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছে। সূর্যদের বৈঠকখানার সামনের মাঠে একটা হরিতকী গাছ আছে। এই সময় হরিতকী ফল পাকে। সেই পাকা হরিতকী, গাছের নীচে শুকনো পাতার উপর টুপটুপ করে করে পড়ছে। সেই গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে একটা হলদে পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকছে, "বৌ কথা কও, বৌ কথা কও"। ভবানী মন্দিরের পিছনে বুড়ো জামুনে আম গাছটায় বহুদিন থেকে একজোড়া বাজপাখী বাস করে। শেমেশ্বরীর চরভূমি থেকে ক্লান্ত পাখা ধূসর আকাশে কাপটাতে কাপটাতে ফিরে এসে বাজ-দম্পতি আমের শাখায় বসল। তাদের প্রহর ঘোষণা করার সময় হয়ে এল। একটু জিরিয়ে নিয়েই এখনি ডেকে উঠবে, "ক্ অ অ অ, ক্যাক, ক্যাক, ক্যাক, কি কর্কশ কণ্ঠস্বর রাত্রির শেষ প্রহরে ওদের ডাক শুনে ঘুমন্ত সূর্যর বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে কতদিন। এমন সময় আত্মসমাহিত সূর্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর "সূর্য"—

সূর্য ধরমর করে উঠে দাঁড়াল। দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিহিত, হাতে স্বর্ণ-প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণশরণ। ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালতে যেতে হবে।—মুহূর্তের মধ্যে সূর্যর চোখের সামনে থেকে সেই বিশাল সমুদ্রসৈকতে, সহস্র বানর সেনানীসহ শ্রীরামলক্ষ্মণের ছবি মুছে গিয়ে—সেখানে জেগে উঠল তাদের বংশ দেবতার জাগ্রত শিলামূর্তি। সূর্য মন্দিরের চাবি হাতে নিয়ে কৃষ্ণশরণের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

[ক্রমশঃ]

বিজয়ার পর—

শুভ বিজয়ার পর আমরা মন্দিরার পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আমাদের আন্তরিক বিজয়ার সম্ভাষণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলার দুর্গাপূজা কেবল সাধারণ একটা ধর্ম অনুষ্ঠান নয়। এর সঙ্গে বহু ঐতিহ্য ও সংস্কার জড়িত আছে। যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সব ঐতিহ্য ও সংস্কার পূর্বের গৌরব ও উপযোগিতা অনেকটা হারিয়েছে। হয়ত ও সব আজ দুর্বহ বোঝা বা তার স্বরূপ সমাজকে পিষ্ট করছে সমাজ আবেষ্টনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তেমন সহজ নয়। হয়ত এর মধ্যে কিছু সুন্দর ও শিব-ও আছে—যা শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যে-ও সমাজকে স্নিগ্ধ ও মঙ্গলময় করে। দু'চার দিনের জন্য-ও হয়ত জনসাধারণ একটা আনন্দের স্পর্শ পায়। তাই ঐতিহ্য ও সংস্কারের নিকট সমাজের নতি স্বীকারকে আমরা মেনে নিয়ে—সবাইকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কোরিয়া—

কোরিয়ার ব্যাপার নিয়ে কয়মাস যাবৎ সবাই চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিল। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী হটিয়ে দিয়ে যুক্ত জাতি সংঘের সৈন্য উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করেছে। যুক্ত জাতি সংঘ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—তার মর্মার্থ দাঁড়ায় যে, উত্তর কোরিয়াতে যুক্ত জাতি সংঘের সৈন্য কিছুকালের জন্য স্থায়ী থাকবে। ভারত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল;—কারণ এর ফলে কম্যুনিষ্ট চীন কোরিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। ভারতের সে আশঙ্কা সত্য বলে আজ প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় একলক্ষ চীনা সৈন্য উত্তর কোরিয়াতে আছে। চীনের জনবল সর্বজন স্বীকৃত। কোরিয়া যুদ্ধে যদি চীন প্রত্যক্ষভাবে এবং সর্বতোভাবে অংশ গ্রহণ করে, তবে এই যুদ্ধের সমাপ্তি কবে হ'বে এবং কত লোকক্ষয় হ'বে—তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। অবশ্য একথা-ও স্বীকার্য যে দক্ষিণ কোরিয়া অল্প ক'রেই যুক্ত জাতিসংঘ ক্ষান্ত হতে পারে না। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মিলিত রাষ্ট্র স্থাপন ভিন্ন কোরিয়া সমস্যার মীমাংসা সম্ভব নয়।

তাই বলা চলে ১৯৩৪-৩৭ সনের স্পেন যুদ্ধের বৃহত্তর সংস্করণ হ'ল কোরিয়ার যুদ্ধ। হয়ত কয়েক বছর ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকবে। বিশ্বের জাতিসমূহ পরস্পরের আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার অছিলায় প্রায় যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত থাকবে। আগামী বিশ্ব-যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব এখন হ'তেই সুরু হ'বে। ভারতের অবস্থা দেখে মোটামুটি বলা চলে যে, গত বিশ্ব-যুদ্ধের পর দু'একটি দেশ ভিন্ন প্রায় কোন দেশই প্রকৃতভাবে পুনর্গঠন কার্য শেষ করতে পারেনি। এর মধ্যেই যদি তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব সুরু হয়—তাহ'লে এসিয়ার নব-স্বাধীনতালব্ধ জাতিসমূহের পক্ষে তাদের সামাজিক ও আর্থিক পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা কঠিন হবে।

কোরিয়ার সমস্যা যখন জটিল হচ্ছে—তখনই সুরু হ'ল তিব্বতে চীনাদের আক্রমণ। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর হ'তেই, তিব্বতের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়েছে। তিব্বতে বহু বছর যাবৎ নামমাত্র চৈনিক কর্তৃত্ব ছিল; কিন্তু কার্যত তিব্বত বরাবরই স্বাধীন ছিল। ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভূটান, কোরিয়া, ইন্দোচীন

প্রভৃতি দেশের উপর চীনের এমনি আধিপত্যের দাবী ছিল। ব্রহ্মদেশ, নেপাল এবং তিব্বত প্রতি পাঁচবছর দশ বছর পর চীনে নিজেদের দূত পাঠিয়ে নামমাত্র একটা কর দিয়ে আসত। ইংরেজরা যখন ব্রহ্মদেশ অধিকার করে তখন দশ বছর অন্তর এই কর চীনকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—কিন্তু কখনও তা দেয়নি। ফরাসী ইন্দোচীন, বিশেষ ক'রে—তার টনকিং অংশ, ফরাসীরা দখল করেছে বহু বৎসর হ'ল। কিন্তু, চীনের সার্বভৌম অধিকারের দাবী এর মধ্যে কখনও ওঠেনি। কোরিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী জাপানের অধিকারে ছিল; এখনও চীনের সার্বভৌমত্বের দাবী ওঠেনি। নেপাল ও তিব্বত আজ প্রায় ৪০ বছর যাবৎ চীনকে সেই নামমাত্র করও দেয়নি। তাছাড়া, ১৯০৪ অব্দের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে তিব্বতের বৈদেশিক রাজনীতির ওপর ভারতের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯০৬ খৃঃ অঃ চীন এই চুক্তিপত্র মেনে নেয়। ১৯১৪ খৃঃ অঃ পুনরায় আর এক চুক্তিপত্র হয়। তাতেও চীনের সার্বভৌম অধিকার নিতান্তই প্রতীক (Symbolic) রূপে স্বীকার করা হয়। অধিকন্তু ভারতের কতক অধিকার ও দাবী ঐ চুক্তিপত্রে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

কাজেই আজ কম্যুনিষ্ট অধিকৃত চীনের তিব্বতের ওপর সার্বভৌম অধিকারের দাবী একান্তই উদ্দেশ্যমূলক ব'লে অনুমান করা চলে।—এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রুশ বিপ্লবের সময় লেনিন জারীয়সাম্রাজ্যের রুশ-ইতর অংশগুলিকে পৃথক হয়ে যাবার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। লেনিনের সেই নীতি অনুযায়ী মধ্য-এসিয়া, ককেশিয় ও বল্টিক অঞ্চল এবং ফিনল্যাণ্ড রুশিয়া হ'তে পৃথক হয়ে যায়। আজকার কম্যুনিষ্ট চীন মৃত মাঞ্চু-সাম্রাজ্যের দাবীতে তিব্বতের উপর তার সার্বভৌম অধিকার স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে।

ভাষায়, কৃষ্টিতে ও জাতি-বিজ্ঞানে তিব্বত চীন হ'তে স্বতন্ত্র। মঙ্গোলীয়া জাতি-গোষ্ঠির অন্তর্গত এই জাতির মধ্যে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশের মত তিব্বত একটি স্বতন্ত্র জাতির দেশ। তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষা হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরং তিব্বতের বর্ণমালা ও লিপি ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপির বিস্তার মাত্র। তিব্বতের সংস্কৃতি চীনের সংস্কৃতি হতে বহুলাংশে পৃথক; একই বৌদ্ধ-ধর্মের অন্তর্গত হলেও তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। চীন মূলত ধর্মনিরপেক্ষ; তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশী ধর্ম-অনুশাসিত। তিব্বতের সংস্কৃতিতে চীনের চাইতে ভারতের অবদান বেশী। এ-সব সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট চীন লেনিনের পন্থা অনুসরণকারী ব'লে দাবী করেও শান্তিপ্রিয় ধর্মশাসিত তিব্বতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সুরু করল।

কোরিয়ার সমস্যা ভারতের পক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নয়। কিন্তু, তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী এবং তিব্বতের সমস্যা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চিন্তার ব্যাপার। তিব্বত ও ভারতের মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই। ১৯১৪ খৃঃ অঃ চুক্তিপত্রে ম্যাক্‌মোহান লাইন নামে যে সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছিল চীন তা মেনে নেয়নি। কাজেই তিব্বত কম্যুনিষ্ট চীনের অধিকারে গেলে এই সীমানা নিয়েই একটা সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংঘে তিব্বত চীনের এই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সংঘের বিবেচনা করা উচিত—মাঞ্চু অধিকারের বলে দুই শতাব্দী পূর্বে তিব্বতের ওপর চীনের একটা নামমাত্র প্রতীক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। তার ঐতিহাসিক মূল্য যতই থাক, আজকার দিনে সব চেয়ে বড় কথা তিব্বতের জনগণের অধিকার ও দাবী। কোন-এককালীন সামরিক জয়ের দাবী যদি চিরকাল স্বীকার করেই নিতে হয় তাহ'লে আজও ইংল্যাণ্ড রোমের অধীন থাকত এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও ইংল্যাণ্ডের অধীন থাকত। তাই আমরা মনে করি তিব্বতের সমস্যা ঐতিহাসিক পন্থের মীমাংসা নয়, তিব্বতের জনগণের দাবী ও অধিকারের সমস্যা। সেদিক থেকে চীনের এই সামরিক অভিযান নীতি বিগর্হিত ও অন্যায়।

নেপাল

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে নেপাল নিয়ে। যদিও আন্তর্জাতিক বিধানে নেপাল একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কিন্তু কার্যত নেপাল ভারতের অন্তর্গত ও অঙ্গ। আজ নেপালে রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ চলছে এবং যার ফলে নেপাল এক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার প্রতি ভারত উদাসীন থাকতে পারে না।

নেপালের প্রধানমন্ত্রিত্ব রাণাবংশের বংশগত অধিকার। নেপালের রাজা কার্যত তাদের হাতে বন্দী সমস্ত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই। এই ব্যবস্থা কায়েমী করা ও চালু রাখার পক্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ অনেকখানি দায়ী কার্যত নেপালের বন-সম্পদ, জমি-জমা, রাজকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই রাণা বংশের একচেটিয়া। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমনি প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকা নিতান্তই যুগ-বিরোধী।

কিছুদিন যাবতই শোনা যাচ্ছিল নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন নিয়ে রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতান্তর হয়েছে। তারপর একদিন হঠাৎ নেপাল রাজধানী কাটামুণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে নেপালের রাজা আশ্রয় নেন। রাজপ্রাসাদ হ'তে তিনি সপরিবারে পালিয়ে আসেন। নেপালের রাজা নিজ রাজ্য ত্যাগ করে ভারত-সরকারের অতিথিরূপে বর্তমানে দিল্লীতে আছেন।

রাজার পলায়নের পরই নেপাল-কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু হয়। বিদ্রোহীদের সম্বল হ'ল প্রধানতঃ জনসাধারণের সহানুভূতি; অস্ত্রবলে নেপাল-রাষ্ট্রের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের কোনক্রমেই তুলনা হ'তে পারে না। তাই বলা চলে এটা নিতান্তই অসম-যুদ্ধ।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের সহানুভূতি জনসাধারণের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের পক্ষে। ভারতীয় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন অনুসারে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু নেপালের এই গৃহ-যুদ্ধে যে প্রশ্ন নিহিত আছে তা মানুষের ও জাতির মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সেখানে গৌণ। ভারতের নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন ছাড়াও ঐ মৌলিক প্রশ্নের দিক থেকে বিচার করেও এই বিদ্রোহীদের সাফল্য আমরা কামনা করি এবং আমরা ইহাও দাবী করব যে যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত সরকারেরও উচিত বিদ্রোহীদের সাহায্য করা। রাণা বংশের শাসন আজ যুগ-বিরোধী। বহুদিন যাবৎ স্পেন রাষ্ট্রকে যেমন অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল, নেপালের রাণা সরকারকেও অপাংক্তেয় করে রাখা উচিত। আজ নেপালের জনগণের যে দাবী এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে তা যদি সফল না হয়, তাহ'লে চীন বা তিব্বত থেকে নেপালে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের অনুপ্রবেশ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে—ভারত সরকারের তা-ও মনে রাখা উচিত। আন্তর্জাতিক লেনদেনে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে কুশাসিত প্রতিবেশীর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য অপর রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। স্পেনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশসমূহ যখন বিদ্রোহ করেছিল, তখন আমেরিকা মনরো নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা ক'রে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্পেনের কুশাসনের বিরুদ্ধে ফিলিপাইন, গুয়াটেমিকো প্রভৃতি দেশে আমেরিকা দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করেছিল। কাজেই দরকার হ'লে প্রগতিমুখী এই বিদ্রোহের সমর্থনে ভারত সরকারেরও হস্তক্ষেপ করা উচিত।

কংগ্রেসের ভাঙ্গন

বহুদিন যাবৎই কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা যাচ্ছিল। প্রকাশ্যত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাইয়ের মধ্যে মিল মিশের ভাব বজায় রেখে নেতারা চলছেন এবং শাসনকার্য চালাচ্ছেন। কিন্তু এ কথা আজ প্রায় সকলেরই জানা আছে যে ঐ দুই নেতার মধ্যে বিরাট মতান্তর আছে। এই মতান্তর বিশেষভাবে দেখা দেয় বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের নির্বাচন নিয়ে।

নাসিক কংগ্রেসের পূর্বে নেহেরুজী এক বিবৃতি দিয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেন এবং নাসিক কংগ্রেসে তাঁর মতানুসারে কিছু প্রস্তাবও পাশ করা হয়। কিন্তু এতেও পণ্ডিতজীর দাবী পূরণ করা হ'ল না। বহুদিন পর্যন্ত তিনি ট্যাণ্ডনজীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর এই আপত্তির জন্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির গঠন অনেক দিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। তারপর হঠাৎ তিনি সম্মত হন এবং কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তাঁকে নিয়েই গঠিত হয়।

কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটল না। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের নামে যে শাসন চলছে—তার অপটুতা ও অক্ষমতার ফলে কংগ্রেস সর্বত্র তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। নীচের দিকে তাই কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা তীব্র মনোভাব গড়ে উঠেছে। শীর্ষে পণ্ডিতজী ও সর্দারজীর মধ্যে একটা বিরোধ অনেক দিন যাবৎ-ই চলছিল। ট্যাণ্ডনজীর সভাপতি নির্বাচন নিয়ে তা প্রকাশ্য মতানৈক্যে পরিণত হয়েছে। অনেক কংগ্রেসকর্মী মনে করে—উক্ত ট্যাণ্ডনজীর সভাপতি নির্বাচন কংগ্রেসের একটা বিশেষ গতি বা মনোভাবের নির্দেশক এবং তা হ'ল আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব-বিরোধী। তাই আজ কংগ্রেসে ভাঙ্গন সুরু হয়েছে।

দিল্লীতে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের ভিতরে ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা গণতান্ত্রিক সংগঠন নামে একটি আলাদা দল বা উপদল গঠন করেছেন। বাংলার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাতে যোগ দেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ডাঃ ঘোষ বাংলা দেশে গিয়ে নূতন দল গঠন করলেন। তাঁদের কৃষক-প্রজা-মজদুর দল কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের ভিতর স্বতন্ত্র উপদল গঠন করার চেয়ে কংগ্রেসের বাইরে আলাদা দল গঠন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং বর্তমান অবস্থায় কার্যকরী। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের দিক থেকে তার ভিতর উপদল থাকা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন বাদ দিয়েও দেশের শাসনকার্যে লিপ্ত কংগ্রেসের মধ্যে উপদল থাকার কার্যকারিতা বিশেষ আছে ব'লে মনে হয় না। বিলাতে শ্রমিকদলের মধ্যে স্বাধীন শ্রমিক দল (Independent Labour Party) একটি উপদল হিসাবে থেকে কাজ করতে পারেনি; এখানেও গণতান্ত্রিক সংগঠন কংগ্রেসের ভিতরে একটী উপদল হিসাবে কাজ করতে পারবে এই ভরসা আমাদের নেই।

ডাঃ ঘোষের সঙ্গে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদা চৌধুরী, নৃপেন বোস, কুমার জানা, দাশরথি তা, প্রমথ ব্যানার্জি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী একযোগে কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। বাংলা দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এমনিই খুব জনপ্রিয় বা শক্তিশালী নয়। কংগ্রেসের নামে বাংলার যে মন্ত্রীসভা কাজ করছে তাকে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বলা নিতান্তই কথার কথা, কার্যত তা কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা নয়। তার ওপর গত প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষদের কারসাজি ও ষড়যন্ত্রের ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আজ সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদলের হস্তগত। এই অবস্থায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীদের কংগ্রেস ত্যাগের ফলে বাংলার কংগ্রেস আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্গত আর একদল কংগ্রেসকর্মী, যাঁরা সাধারণতঃ যুগান্তর দল ব'লে পরিচিত, তাঁরাও কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। বাংলা কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থায় এবং সমস্ত ভারতব্যাপী কংগ্রেসের ভেতর যে ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তাতে তাদের পক্ষেও দীর্ঘকাল কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, তার পরিণতি কি হ'বে তা কতকটা অনুমান করা যায়। আজ কংগ্রেসের ভিতর দুইটী শক্তি ক্রিয়মান; তার মধ্যে প্রবল হ'ল ধনপতিদের পোষণের অনুকূল। সমস্ত কংগ্রেস-শাসন গত তিন বছর যাবৎ কার্যত সেই পথেই চলেছে। কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের আদর্শ কংগ্রেস এতকাল

প্রচার করেছে তা আজ প্রায় বিস্মৃত। যে শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজের কথা জয়পুর কংগ্রেসে বলা হয়েছিল তা আজ শিকায় তুলে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে অপর এক শক্তি কতকটা অসহায় ভাবে ঐ সব বিস্মৃত-প্রায় আদর্শের জন্য চেষ্টা করছে। এর ভিতর ক্ষমতার কলহ ও কাড়াকাড়ি একেবারে যে নেই একথা বলতে চাই না; বরং তা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ শাসন-ক্ষমতা দিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কাজেই কোন্ পন্থা লোকদের হাতে শাসন-ক্ষমতা যায় তা বিশেষভাবে বিচার্য।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এক ইস্তাহার দিয়ে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে ডাঃ ঘোষের উদ্দেশ্য দেশসেবা নয়, নিছক ক্ষমতা লাভ। মনের অগোচর পাপ নাই। তাই সাধারণ সম্পাদক জানেন যে ডাঃ ঘোষের ও তাঁর সহ-কর্মীদের কংগ্রেস ত্যাগের জন্য তাঁর ও তাঁর সহ কর্মীদের অপকর্ম কতটা দায়ী। এক জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী, বিশেষ ক'রে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কংগ্রেস পরিত্যাগ করলেন; সে উপলক্ষ্যে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের মনে কোন আত্ম-অনুসন্ধানস্পৃহা জাগল না, জাগল কেবল মক্ষিকাবৃত্তি।

এরপর কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হ'বার কারণ আর কি থাকতে পারে!

খাদ্য-সমস্যা :—

ভারতের খাদ্য-সমস্যা দিনের পর দিন ক্রমেই যেন জটিল হ'য়ে উঠছে। প্রতি বছর পোয়াশ' কোটি, দেড়শ' কোটি টাকার খাদ্য-শস্য আমাদের আমদানি করতে হয়। ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা এমন নয় যে, প্রতি বছর এই পরিমাণ টাকা খাদ্যের জন্য আমরা বিদেশকে দিতে পারি। অথচ, দেশবাসীদের খাদ্য জোগাবার দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। ১৯৪৭ সালে যখন কংগ্রেসের হাতে শাসনভার হস্তান্তরিত হয় তখন দেশের খাদ্যাবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক ছিল। অনেকে আশঙ্কা করেছিল যে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের ন্যায় সমগ্র ভারতে এক বিরাট দুর্ভিক্ষ আসন্ন। কিন্তু কংগ্রেস-শাসন বিদেশ হ'তে, খাদ্য আমদানি ক'রে, সেই দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করেছে। যুদ্ধের সময় ইংরেজকে যুদ্ধের মালপত্র সরবরাহ করার দরুণ যে টাকা ইংল্যাণ্ডে মজুত ছিল, প্রধানতঃ তারই বলে আমরা এতদিন বিদেশ হ'তে খাদ্য আমদানি করতে পেরেছি। কিন্তু সে অর্থ-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কাজেই বিদেশ হ'তে খাদ্য আমদানি করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

তাই কংগ্রেস সরকার সংকল্প করেছিল দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশ হ'তে আমদানির পরিমাণ ক্রমে কমান হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত বছরের উদ্বৃত্ত খাদ্য এবং এ বছরের সম্ভাবিত খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব ক'রে সরকার ঠিক করেছিল ১৪ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য এ-বছরে আমদানি করা হবে। কিন্তু বছরের শেষভাগে দেখা গেল, যে-পরিমাণ খাদ্য-শস্য এ-বছরে উৎপন্ন হওয়ার আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। অথচ খাদ্যের আমদানিও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই ভারতের বহু অংশে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে।

গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু, কর্মপদ্ধতির ভিতর ও হিসাবে প্রায় প্রতি পদেই তাদের ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। এ কথা গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করে যে, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের (statistics) পদ্ধতি মোটেই সঠিক নয়; বহুলাংশে এটা আন্দাজী হিসাবও। এবং সে আন্দাজী হিসাবও কৃষি-কার্যে নিয়োজিত জমির শতকরা ৮০ ভাগের; ঐ জমির শতকরা ২০ ভাগ সরকারী হিসাবের আওতায় আসে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভারতবর্ষের পক্ষে খুব বিরল নয়; প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন অংশে কোন না কোন প্রকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে ফসল নষ্ট করে দেয়। আমাদের কৃষি-কার্য এ বিংশ শতাব্দীতেও দৈব-নাতৃক; কাজেই প্রকৃতির খেয়াল-খুশী অনুযায়ী এ বিরাট দেশের কোন না কোন অঞ্চলের ফসল হানি ঘটে। সে হিসাব কর্তৃপক্ষের রাখা উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ, বহুদিন যাবৎ সরকারের

একটা নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যে, খাদ্য-শস্যের একটা মজুত ভাণ্ডার তৈরী করা দরকার। দেশে দেশে খাদ্যের অবস্থা বরাবরই অনেকটা সঙ্কীর্ণ রকমের সে দেশে এমনি একটা খাদ্য ভাণ্ডার রাখা রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য। অথচ এ বছর যখন খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা প্রায় অর্দ্ধেক ব'লে দাবী করা হয়েছিল তখনই এমনি একটি খাদ্য-ভাণ্ডার তৈরীর সুযোগ সরকারের পক্ষে এসেছিল। সরকার যদি সে উদ্যোগ তখন খাদ্য-শস্য আমদানি করত, তা'হলে আজ দেশের বহু লোককে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকতে হ'ত না। যুদ্ধের সময় বিদেশ হ'তে যে মূল্যে চাল বা গম পাওয়া যেত আজ ঠেকার পড়ে বহু বেশী মূল্য দিয়ে চাল ও অন্য প্রকারের খাদ্য-শস্য কিনতে হচ্ছে। আমাদের সরকারের এটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, খাদ্য নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় যাওয়া চলে না। সরকারের এও জানা আছে যে তাদের হিসাব খুব সঠিক নয়।

তাছাড়া আরও একটা বিষয় এখানে বিবেচনা করার আছে। অখণ্ডিত ভারত-ও খাদ্য শস্যের ব্যাপারে স্ব-পর্যাপ্ত ছিল না। ব্রহ্মদেশ ভারত হ'তে হ'বার পর হতে বরাবর ভারতবর্ষ খাদ্য ব্যাপারে ঘাটতি। ১৯৩৯ সালে ১৫ লক্ষ টন চাল ব্রহ্মদেশ হ'তে ভারত আমদানি করেছিল; আরও প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঐ বছর আমদানি হয়েছিল। মোট প্রায় ৩১ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য ঐ বছর বিদেশ হ'তে আমদানি করতে হয়েছিল। বর্তমান ভারতবর্ষ খণ্ডিত হ'য়েছে; খাদ্য-শস্য ব্যাপারে উদ্বৃত্ত অংশগুলি প্রায় সবই পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে এবং ভারতে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ টন পূর্বের চেয়ে কমে গিয়েছে, অথচ লোক সংখ্যা বিভাগের পরও ১৯৩৯ সালের লোক সংখ্যার প্রায় সমানই রয়েছে। এ অবস্থায় খাদ্য-শস্য ব্যাপারে স্ব-পর্যাপ্ত হওয়ার কল্পনা কতটা বাস্তবভাবমূলক তা ভেবে দেখা দরকার।

পাকিস্তান স্বতন্ত্র হওয়ার পর পাট ও তুলার ব্যাপারে ভারতবর্ষ ঘাটতি দেশে পরিণত হয়েছে। পাট ও তুলা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়, কারণ ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য প্রধানত এই দুইটি দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে। সেই খাদ্য উৎপাদনের বহু জমি পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। কাজেই আমাদের মনে হয় খাদ্য-শস্যের ব্যাপারে স্বপর্যাপ্ত হওয়া সুদূরপরাহত। তার চেয়ে বরং ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উৎপন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং মাল, বিশেষ ক'রে কাপড়, ছোটখাট কল-কব্জা প্রভৃতি রপ্তানি ক'রে ঐসব দেশ হ'তে খাদ্য শস্য আমদানি করা ভারতের পক্ষে অনেক সহজ। আমরা যতদূর জানি, ব্রহ্মদেশ এমনি কোন চুক্তিতে ভারতবর্ষের সঙ্গেই লেন দেনে রাজী; হয়ত শ্যাম এবং ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের সঙ্গে-ও এমনি ব্যবস্থা কঠিন হবে না।

এই সব বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হয় ভারতীয় পার্লামেণ্টে সভাপতির ভাষণে খাদ্যের স্বপর্যাপ্ত হ'বার দিন নূতন ক'রে নির্ধারণ না করাই উচিত ছিল। পার্লামেণ্টে আলোচনার জবাবে খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী বারবার জোর করে বলেছেন, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের ভিতর ভারতবর্ষ স্ব-পর্যাপ্ত হ'বেই। তাঁর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এতদিনে এটুকু বুঝা উচিত ছিল যে, তাদের কর্মচারীবর্গ হিসাবের ব্যাপারে মোটেই পটু নয়। হয় অক্ষমতার জন্য, নয় দেশবাসীকে ধোকা দেবার জন্য তাঁরা এমনি হিসাব বহুবার দিয়েছেন; কিন্তু তার প্রায় কোনটাই সফল হয়নি। আমাদের বিশ্বাস স্ব-পর্যাপ্তি সম্বন্ধেও তাঁদের হিসাব সঠিক নয়। এ মিথ্যা মোহ কাটিয়ে আজ সরকারের স্বীকার করা উচিত যে, তাদের অধিক-ফসল-ফলাও-আন্দোলন, তাদের বন-মহোৎসব এবং আরও বহু পরিকল্পনা সঠিক হয়নি। ভারতবর্ষের খাদ্যে স্ব-পর্যাপ্তি ১৯৫১ বছরের ভিতর বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে এ মিথ্যা মোহ ত্যাগ ক'রে বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বাঁচা সমস্যা দেখা উচিত।

কালীপূজায় বাজী পোড়ান

পুরান-সংস্কার সহজে মানুষের মন হ'তে লোপ পায় না। বিদেশী শাসনে এবং মুসলিম লীগের মন্ত্রীত্ব-কালীন সামাজিক অবস্থার চাপে আমাদের কতকগুলি সামাজিক লোকাচার একটু সংযত ছিল। বিদেশী শাসন হ'তে মুক্ত হওয়ায় এবং ভারত খণ্ডিত হওয়ার পর মুসলমান প্রতিবেশীর আবেষ্টন হ'তে মুক্ত হওয়ায় আমাদের প্রাচীন সব লোকাচার আরও যেন জোর ক'রে গজিয়ে উঠছে। মুসলিম লীগের আমলে মুসলমান-গণ অহরহ ও অন্যান্য পরবে যেমন একটা উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় দিত, হিন্দুগণ আজ তেমনি অসংযত পরিচয় দিচ্ছে তাদের নানা পূজা-পার্বণ উপলক্ষে। ৫ বছর পূর্বে দোলের সময় কলকাতার রাস্তায় রঙের নামে কাদা অভদ্রতার চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। গত বছর পুলিস বিশেষ কড়া ব্যবস্থা করার ফলে তা কতকটা সংযত ছিল।

কালীপূজার সময় বাজী পোড়ান ব্যাপারে নিয়ে তেমনি অভদ্রতা ও অসংযত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কলকাতা সহরে এবার বাজী পোড়ানের ফলে দুইটি লোক নিহত হয়েছে, ষাট জন লোক আহত হয়েছে এবং ষাট স্থানে দমকলের আগুন নিভাতে হয়েছে। যারা নিহত হয়েছে, তার মধ্যে একটী কলেজের ছাত্র বাসে করে যাচ্ছিল; রাস্তার আশেপাশে যে বাজী পোড়ান হয়েছিল তারই ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যারা আহত হয়েছে তাদের হয়ত অনেকের চিরকালের জন্য অঙ্গহানি হবে। সামরিক প্রয়োজনের জন্য এমনিক'রে মানুষের জীবন, কর্মশক্তি ও সম্পত্তির হানি হ'তে পারে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

সরকার তরফ এ সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে ও দিচ্ছে আমরা বিশেষভাবে তার নিন্দা করি। হয়ত তাদের আশঙ্কা আছে জনসাধারণের উৎসবে হস্তক্ষেপ করলে তাদের জনপ্রিয়তার হানি হবে। যে বস্তু নেই তা রক্ষার জন্য এমন ব্যস্ত হওয়ার কিছু দরকার ছিল না। বাংলা সরকার জনসাধারণের নিকট যে বিশেষ প্রিয় তা বোধহয় তাঁরাও মনে করেন না। দেশবাসীরও বিবেচনা করা উচিত—উৎসব যেন প্রতিবেশীর বিপদের কারণ না হয়ে পড়ে। উৎসব যা কিছু করার তা নিজের গৃহের অভ্যন্তরে বা সীমানার মধ্যেই করা উচিত। রাস্তায় এসে অপরের অসুবিধা বা বিপদ সৃষ্টি করার অধিকার কারুর নেই। তাছাড়া, আর্থিক দিক থেকেও বিবেচনা করার আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী আর্থিক হিসাবে আজ অত্যন্ত বিপন্ন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সভ্যতার বহু দাবী তার ব্যয় বৃদ্ধিই করছে; আয় বা সঞ্চয়ের পথ ক্রমেই তার সংকীর্ণ হচ্ছে। এ অবস্থায় পরিহার্য ব্যয়বিলাস্তব বর্জন করা তার পক্ষে উচিত, যা'তে তার অবশ্য বহনীয় ব্যয় কতকটা সহজভাবে সে বহন করতে পারে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅরুণনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পরিচয়

ত্রয়োদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৫৭ | অষ্টম সংখ্যা

ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং দু'জনেরই কবিতায় জীবনের জয়ধ্বনি। 'এ জীবন নিশার স্বপন' ব'লে রবীন্দ্রনাথও কাঁদেন নি, ব্রাউনিংও কাঁদেন নি। Rabbi Ben Ezra কবিতাটিতে ব্রাউনিং মানুষ হ'য়ে জ'ন্মেছেন ব'লে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেছেন।

Perfect I call Thy plan
Thanks that I was a man!
Maker, remake, complete—I trust what
Thou shalt do.

রবীন্দ্রনাথও ব্রাউনিং-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়েছেন :

ফিরেচি সেই স্বর্গে খুঁজে খুঁজে
ফাঁকির ফাঁকা ফাঙ্গুস্।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেচি আজ মাটির পরে ধূলা মাটির মানুষ।
(বলাকা)

ব্রাউনিং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন, আমরা প্রত্যেকে পৃথিবীতে এসেছি ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ বাণীকে বহন ক'রে। ব্রাউনিং-এর মতে আমাদের কারও জীবনই অর্থহীন প্রহসন নয়। জীবনে যত ব্যর্থতাই আসুক, আচরণ যত উচ্ছৃঙ্খলই হোক—সমস্ত ব্যর্থতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও বিশ্বাস করা চাই : জীবনের একটা পরম সার্থকতা আছেই আর পৃথিবীকে আমি যা দিতে পারি তুমি তা দিতে পারোনা, তুমি যা দিতে পারো আমি অথবা আর কেউ তা দিতে পারে না। ব্রাউনিং গাইলেন :

Earth changes, but thy soul and God
stand sure

ঠিক এই সুরে রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছো, আমি নিত্য সে তোমার।
(নৈবেদ্য)

যোগাযোগের মধ্যে বিপ্রদাস বলেছে মোতির মাকে :

"আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গ'ড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।"

মানুষের জীবনের প্রতি এই যে শ্রদ্ধা—এই শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের এবং ব্রাউনিং-এর চিন্তাধারাকে এমন একটী বৈশিষ্ট্য দান করেছে বিশ্বসাহিত্যে যার জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাউনিং-এর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ মনীষী চেস্টারটন এক জায়গায় লিখেছেন :

The crimes of the devil who thinks himself of immeasurable value are as nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value.

দুর্বিনীত অহঙ্কারে যে মানুষ উদ্ধত তার ক্ষমা আছে। ক্ষমা নেই সেই মানুষের যার মনে নেই কোন আত্মসম্মান বোধ। রবীন্দ্রনাথের এবং ব্রাউনিং-এর কবিতার পর কবিতায় মানুষের আত্মমর্যাদাবোধকে বারম্বার মূল্য দেওয়া হয়েছে। ব্রাউনিং-এর মতে জীবন ঈশ্বরের হাতের পান পাত্র। কালচক্র ঘুরছে আর এই ঘূর্ণ্যমান কালচক্রের স্পর্শে গড়ে উঠছে আমাদের জীবন-পাত্র স্রষ্টার অমৃতের পিপাসা মেটাবার জন্য। কুম্ভকারেও নিত্য, পানপাত্রও নিত্য। ব্রাউনিং-এর ভাষায় :

Time's wheel runs back or stops; Potter and clay endure.

ব্রাউনিং মানুষকে বলেছেন heaven's consummate cup. জীবন তো ঈশ্বরের হাতের পেয়ালা। এ পেয়ালা তাঁরই হাতের সৃষ্টি, দুঃখ সুখের মধ্য দিয়ে মানুষকে তিনিই গড়ে তুলছেন।

But I need, now and then.
Thee, God, who mouldest men.

আমাদের জীবনপাত্রে ঈশ্বরের যেমন প্রয়োজন আছে ঈশ্বরকেও তেমনি আমাদের প্রয়োজন আছে। পেয়ালার প্রয়োজন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ব্রাউনিং লিখেছেন :

Look not thou down but up!
To uses of a cup,
The festal board, Lamps flash and
trumpet's peal,
The new wine's foaming flow,
The Master's lips aglow!
Thou, heaven's consummate cup, what
need'st thou with earth's
wheel?

তিনি পূর্ণ—তবুও মানুষকে তাঁর প্রয়োজন আছে। মানুষের দেহপ্রাণ ভ'রে তিনি অমৃত পানের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। অধর তাঁর উৎসুক হয়ে আছে রসের আস্বাদনের জন্য যে রসে তিনি পূর্ণ করে তুলছেন মানুষের দেহ প্রাণের পেয়ালাটীকে। আর ব্রাউনিং বলছেন, পৃথিবীতে মানুষের জীবনের শুধু একটী মাত্রই উদ্দেশ্য থাকতে পারে আর সে উদ্দেশ্যটী হোলো যিনি জীবনের স্রষ্টা তাঁর পিপাসা মেটানো, 'to slake Thy thirst.'

রবীন্দ্রনাথও জীবনকে ঈশ্বরের হাতের পানপাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গীতাঞ্জলিতে আছে :

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহো আপনার গান।

(গীতাঞ্জলি)

মানুষের জীবন একটা অর্থহীন প্রলাপ নয়—মানুষকে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে ব'লেই আমাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর যেহেতু আমাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে দিয়ে তাঁর অমৃতের পিপাসা মেটানোর জন্য সেইহেতু জীবনের একটী মূল্য আছে, মর্যাদা আছে, সুষমা আছে। এই মর্যাদায় যে আঘাত দেয় তাকে দেবদ্রোহী বলে দণ্ড দেবার কথাই রবীন্দ্রনাথ বারে বারে উচ্চারণ করেছেন :

আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।

(নৈবেদ্য)

মানুষের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে—একথা রবীন্দ্রনাথ নানা কবিতায় বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন।

থাকনা তোমার লক্ষ গ্রহ তারা
তাদের মাঝে আছ আমার-হারা।
সইবে না সে, সইবে না সে,
টানতে আমায় হবে পাশে,
একলা তুমি, আমি একলা হ'লে।
(গীতালি)

আমাকে ছাড়া ঈশ্বরের চলে না। মানুষকে ঈশ্বরের চাই।

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল॥
(বলাকা)

মানুষ ছাড়া আর সব প্রাণীকে ঈশ্বর দেন। মানুষ শুধু নিয়ে পরিতৃপ্ত নয়, দিয়ে তার তৃপ্তি। নতুনকে সৃষ্টি করতে না পারলে তার আনন্দ নেই। ব্রাউনিং গাইলেন,

Rejoice we are allied
To That which doth provide
And not partake, effect and not
receive!

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তা'র বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তা'র বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

শুধু স্বর নিয়ে মানুষ খুসী নয়। তার ভিতরে রয়েছে সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণা। এই প্রেরণা তাকে করেছে সুরশিল্পী। স্বরকে সুরে পরিণত ক'রে সে গীতাঞ্জলি উপহার দেয় স্রষ্টার চরণ পদ্মে।

A spark disturbs our clod;
Nearer we hold of God
Who gives, than of His tribes that take,
I must believe.

মানুষের গৌরব কোথায়? কেবল নিয়ে তো তার সুখ নেই। কেবল জৈব-প্রয়োজন পরিতৃপ্ত ক'রে সে আনন্দ পায় না। ঈশ্বর তাকে স্রষ্টা ক'রে তৈরী করেছেন। সৃষ্টি ক'রেই তার আনন্দ।

তুমি তো গড়েচ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেপা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েচ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটী রচিবার। (বলাকা)

Poor vaunt of life indeed,
Were man but formed to feed
On joy, to solely seek and find and feast.
(Browning)

রবীন্দ্রনাথে আছে :

দুঃখ দিয়ে জানাও, রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নইত ক্ষুদ্র,
তাই দিয়েছ ভার করিনে তা'রে।

ব্রাউনিং বলছেন মানুষকে ঈশ্বর যদি তৈরী করতেন শুধু আনন্দের মধ্যে নেচে গেয়ে দিন কাটানোর জন্য তবে জীবনে গৌরব করবার কি থাকতো? পূর্ণিমাকে তিনি হাসি দিয়েছেন, মানুষকে অসহায় উলঙ্গ ক'রে, দুঃখ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন। সেই দুঃখকে মানুষ আনন্দে রূপান্তরিত করে।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখ স্বপ্ন রস রাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে পুঞ্জে,
অশ্রুজলে তা'রে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তা'রে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন শেষে মিলনের হাতে। (বলাকা)

মানুষের এই দেবার ক্ষমতার মধ্যেই তার গৌরব আর এই গৌরব ঈশ্বর দান করেছেন কেবল মানুষকে।

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
(বলাকা)

ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে চান ব'লেই তার মধ্যে

এসেছে সৃষ্টি করবার প্রেরণা আর এই প্রেরণা আরামের মধ্যে তাকে কোথাও ঘুমাতে দিচ্ছে না।

আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব—এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না ব'লেই এই বেদনা জেগে উঠেছে যে হয় নি, হয় নি—দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এসংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব।

(শান্তি নিকেতন)

পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত হ'তে না পারার জন্য যে একটা বেদনা-বোধ রয়েছে মানুষের মনে ব্রাউনিং এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কবিতায় বারম্বার এই বেদনাবোধের জয়গান। ব্রাউনিং গেয়েছেন :

Then welcome each rebuff
That turns earth's smoothness rough,
Each sting that bids nor sit nor stand
but go !

রবীন্দ্রনাথও গেয়েছেন :

"না রে তোদের ফিরতে দেব' নারে—
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথের ও ব্রাউনিং-এর—উভয়েরই কবিতায় আরামের বিরুদ্ধে অভিযানের সংগ্রাম-গান।

চলতে হবে আমার গানে
প্রভাত-আলোর উদয় পানে ;
নিমেষ তরে পাবিনেকো
বসতে পথের ধারে। (গীতালি)

নারে নারে হবে না তোর স্বর্গসাধন
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন। (গীতালি)

সুখকে রবীন্দ্রনাথ মূল্য দেন নি। ব্রাউনিংও দেন নি।

"সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে
মরিস্ নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ আঘাত খেতেই হবে।" (গীতালি)

সুখের বিরুদ্ধে আরামের বিরুদ্ধে এই অভিযানের তূর্যধ্বনি আর একজন কবির কাব্যে আমরা শুনতে পাই। এই কবি আমেরিকার ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যান। হুইট্‌ম্যান, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ এঁরা সগোত্র। এঁদের সকলেরই গানের সুরো হ'চ্ছে :

নারে নারে হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যা তারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা। (গীতালি)

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রবো,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।

ব্রাউনিং গাইলেন :

Be our joys three-parts pain !
Strive, and hold cheap the strain ;
Learn, nor account the pang ; dare,
Never grudge the throe !

মানুষের ললাটে ভগবান দুঃখের রাজটিকা পরিয়ে-ছেন, তার চলার পথকে তিনি করেছেন কণ্টকাকীর্ণ—কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

'কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। এই সংসারকেই তোমাকে স্বর্গ করতে হবে।'

সৃষ্টি তপস্যার মধ্য দিয়েই শুধু সম্ভব আর স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার গৌরব প্রাণীজগতে শুধু মানুষেরই। তাই শুধু খাওয়া-পরার ও সঞ্চয়ের মধ্যে মানুষের সুখ নেই।

মানুষের জীবন অকিঞ্চিৎকর নয়—এই জীবনের পান-পাত্র রচনা করছেন যিনি আপনার অমৃতের পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার প্রয়োজন তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে

কোথাও অপূর্ণতা নেই—আমাদের জীবনে যা-কিছু ঘটছে প্রয়োজন আছে বলেই ঘটছে—এই কথাই ব্রাউনিং-এর কথা।

All I could never be,
All men ignored in me,
This, I was worth to God, whose wheel
the pitcher shaped.

রবীন্দ্রনাথের বাণী :

"যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যেমনি চলিল যে ব্যথা বিধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদেরও যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।" (গীতালি)

ব্রাউনিং আর রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, দু'জনেই আশাবাদী, দু'জনের কণ্ঠেই ঘাতঃ বাণী। ব্রাউনিং বলেছেন,

Trust God : see all, nor be afraid.

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে থেকো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুক নাকো গহন রাত্রি,
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে আছি আছে
করবে তরী পার।

ব্রাউনিং আর রবীন্দ্রনাথ দু'জনেরই মূলমন্ত্র trust God.

'I trust what thou shalt do' এই বাণী যাঁদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁদের শেষ কথা হোলো আত্মসমর্পণের কথা। তাই ব্রাউনিং বলেছেন, Maker, remake, complete, I trust what Thou shalt do' আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তুমি আমায় সৃষ্টি কর"
আজ তোমারে ডাকি।—
ভাঙ আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
করুক এ জীবন। (গীতালী)

রবীন্দ্রনাথ একবার একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"পৃথিবীর যে-কোন একজন বড়ো কবিকে ভালো ক'রে জানলে অন্যান্য কবিকে জানার পথ প্রশস্ত হয়।"

রবীন্দ্রনাথকে ভালো ক'রে জানবার চেষ্টা করলে ব্রাউনিংকে বুঝতে পারা অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের আকাশস্পর্শ প্রতিভার গৌরব সম্পর্কে আমরা কি এখনও সচেতন হয়েছি?

পল্লী বধূ

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

হাঁ লা বড় বৌ, দোক্তা খেয়েছিস আবার ?

বজ্র কঠোর কণ্ঠে নিস্তারিণী হেঁকে বললেন। ভয়ে উৎকণ্ঠায় কমলার মুখ শুকিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে উত্তর দিল—

না, মা, খাইনি !

ফের মিথ্যা কথা ! পান দোক্তায় তোর ঠোঁট লাল হয়ে গেছে আর তুই বলছিস, খাইনি ? দেখি তোর গাল, আয়, এগিয়ে আয়।

কমলা এ বাড়ীর বড় বৌ। বয়স পনের ষোল। কিশলয়ের মত তার ঠোঁট দুটি তাম্বুলরাগরঞ্জিত। সে বার বার আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে। ধরা পড়ার ভয়ে ভাল করে মুছলেও পোড়া ঠোঁটে রঙের দাগ থেকে গেছে। নিস্তারিণীর শ্যেন চক্ষুর দৃষ্টি তা এড়াতে পারেনি। তিনি এগিয়ে এসে তার কোমল গাল দুটো আঙুল দিয়ে ফাঁক করে পান-দোক্তার ছিবড়ে বের করে আনলেন। তারপর চোখ পাকিয়ে বললেন, এত বড় মিথ্যা কথা ! বলে কমলাকে বেশ জোরে ঠেলে দিলেন। সে ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মাটির উপর পড়ে গেল।

—পান-দোক্তা কোথায় পেয়েছিস বল ? নইলে ভাল হবে না বলছি।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে কমলা বলল—মাসীমা দিয়েছেন। ছোট বউ-এর মাকে সে মাসীমা বলত। এ বাড়ির ছোট বউ লতিকার মা চন্দ্রা। মুখরা ডাকসাইটে মেয়ে। সব সময় যে ভালবাসার দরুণ সে কমলাকে লুকিয়ে পান-দোক্তা দিয়ে যেত তা নয়, এই নিষিদ্ধ-লতার পত্র চর্বণের ফলে কমলার উপর যে নির্যাতন, লাঞ্ছনার বই চলবে তা দেখে তার আনন্দ আর বউ খাঁটকী বলে নিস্তারিণীর যে নিন্দা রটবে তাতে তার সুখ। এই এক ঢিলে দু'টি পাখি মারার প্রলোভন তার নীচ মনে স্থান পেয়েছিল।

ছোট বউ লতিকার ডাক নাম লতি। গ্রামের মেয়ে কমলার সমবয়সী। বাপের বাড়ীর সমৃদ্ধ অবস্থায় গর্বিতা। বাপমার একমাত্র আদুরে মেয়ে। এ বাড়ীর সকলে তাকে ভয় করত। সে যখন এখানে থাকত তখন নিস্তারিণী মুখ বুজে থাকতেন। কি জানি কখন কোন্ কথা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে। সে তিলকে তাল করত। একটা সামান্য কথাকে সাতখানা করে বলে আসত তার মাকে।

মেয়ের কথাকে বেদবাক্য মনে করে চন্দ্রা এসে বলল—হাঁ বেয়ান, তুমি ছুট করতে মেয়েকে বাপের বাড়ীর খোঁটা দাও কেন ?

অপরাধিনীর মত নিস্তারিণী বললেন—কই আমি তো তোমার মেয়েকে কিছু বলিনি !

—বলনি ? আলবাৎ বলেছ। এক্ষুণি বলেছ ; ছোট বউএর মা লুকিয়ে পান-দোক্তা বড় বউকে দিয়ে যায় ? ও চেয়ে পাঠায় কেন ? আর চাইবে না কেন ? খাঁটকীপনা করলে বউরা চেয়েচিন্তে খাবে না তো কি ?

পান-দোক্তা চেয়ে পাঠিয়েছে শুনে কমলা ভয়ে ও লজ্জায় নিরুত্তর। পৃথিবীতে সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, চুপ করে থাকে, সে বড় আসামী হয়।

চন্দ্রার কথা শুনে নিস্তারিণী বললেন—আমার বউদের খেতে দেই না দেই, তাতে পাড়ার লোকের অত মাথাব্যথা কেন ? ইচ্ছে করলে তোমার মেয়েকে এখানে না পাঠাতে পার। বাড়ীতে এসে বউদের সামনে আমাকে অপমান করছ কেন ?

—বেশ করেছি। হাজার বার করব। মনে নেই, আমার ভাসুরের ন্যান খাইয়ে দু'দুটো ছেলেকে মানুষ করে নিয়েছ ! ভুলে গেছ তোমাদের বাড়ীতে মেয়ে দিয়ে সমাজে তোমাদের তুলে দিয়েছি ? নইলে তোমাদের পুছতো কে ?

তারপর নিজের মেয়েকে ডেকে বললেন- আয় রে লতি, চলে আয়। থাকতে হবে না এখানে।

চন্দ্রার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে নিস্তারিণী ভীত, সন্ত্রস্ত। কমলা সশঙ্ক। দু' কানের দু' গোছা মাকড়ি দুলিয়ে নথ নেড়ে দুম্ দুম্ করে কালবৈশাখীর মত চন্দ্রা চরণ পদে চলে গেল। ছোট বউ শাশুড়ির আদেশের অপেক্ষা না রেখে মায়ের অনুবর্তিনী হল। বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের

মতো মুখখানাকে কালো করে নিস্তারিণী বসে রইলেন বড় ঘরের দাওয়ার উপর। কমলা নিঃশব্দে রান্নায় মন দিল।

একটু পরেই হরনাথ গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর এক হাতে দু'টি তেলের বোতল, গামছার দু'অংশে আনাজের পুঁটলি তাঁর বুক ও পিঠের উপর ঝুলছিল। বৈশাখের তপ্তনিশ্বাস ও রৌদ্রদগ্ধ পথের ধূলি তাঁর ক্লান্ত দেহের উপর ছাপ রেখে গেছে। স্ত্রীকে মুখ গম্ভীর ক'রে বসে থাকতে দেখে তাঁর বুকখানা সন্দেহে তোলপাড় করতে লাগল।

অন্যদিন হাট থেকে ফিরে এলে তিনি দেখতেন, একখানি ছোট জলচকি পাতা থাকত, হাত মুখ ধোবার জল। একখানি হাত-পাখা প্রস্তুত থাকত। নিস্তারিণী নিজের হাতে বাতাস করতেন আর সাগ্রহে পুঁটলি খুলে জিনিষপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। আজ এর ব্যতিক্রম হয়েছে দেখে তিনি গামছার পুঁটলি ও তেলের বোতল দু'টি মেজের উপর রেখে একখানা মাদুর টেনে নিয়ে বসলেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে পুকুর-ঘাটে গেলেন। হাত-পা-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিস্তারিণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে? তুমি অমন-ভাবে বসে আছ কেন? কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে নিস্তারিণী বললেন—যা হবার তা হয়েছে; তা নইলে ঐ মাগী আমার বাড়িতে এসে আমাকেই দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে যায়?

কী হয়েছে অনুমান করে নিয়ে শান্ত ধীর সংযত স্বরে হরনাথ বললেন—তা কী করবে বল? আমাদের যেমন ভাগ্য! তা নইলে কী মেয়ের দেওরের মেয়েকে ঘরের বউ করে আনতে হয়? এক গ্রামে এক বাড়িতে দু'বার কুটুম্বিতা করতে নেই জানি, তবু করতে হ'ল। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের উপর মানুষের হাত নেই। কর্মফল ভোগ করতেই হয়। আর দেখ ছেলেদের মানুষ করতে হলে গরীব বাপমাকে সব অপমান সহ্য করতে হয়। আমরা না হয় একটু কষ্ট সহ্য করলাম, আমাদের ছেলে তো সুখী হবে।

—এ তো একটা অশান্তি!

—অশান্তি বলে করছি কী? অশান্তির ভিতরই শান্তি আছে জেনো।

—তা বলে কী মেয়ের মা ছেলের মা'কে এমন ভাবে খোঁটা দিয়ে যাবে? লোক-হাসানি করবে?

—ইতরামো করা যাদের প্রবৃত্তি তারা মেয়ের মা হলেও করে। মলেও স্বভাব বদলায় না।

—এযে পায়ের উপর পা তুলে ঝগড়া করা!

—ঝগড়া করা যাদের স্বভাব তারা যে-কোন অছিলায় ঝগড়া করে। নিজেকে ছোট করতে না পারলে ঝগড়া করা যায় না। মানুষ যা করে করুক, যেন ছোট না হয়।

হরনাথের প্রসন্ন-গম্ভীর মনের উপর সংসারের এই রকমের ক্ষুদ্র ঘটনা রেখাপাত করতে পারত না। তাঁর শুভ্র সংযত চিত্তে নীচতা বা ক্ষুদ্রতা কোন দিন স্থান পায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংসারে মানুষ ভাগ্যদেবীর খেলার পুতুল। যা হবার তা হয়, তা ঘটে। এর উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু নিস্তারিণীর নারী-হৃদয় আহত সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করছিল। তিনি আজিকার অপমানকারিণীকে ক্ষমা করতে পারেননি। মেয়ের মায়ের ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক কথাগুলি কাঁটার মত তাঁর হৃদয়কে খর খর করে বিঁধতে লাগল।

২

লতি বাপের বাড়ি চলে গেছে ক'দিন হল সে আর আসেনি। কমলা একা ঘরে থাকে। তার মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। দু'টি বোনের মত তারা গল্প করত, দুপুরে সকলে ঘুমুলে নোনা আতা জামরুল কাঁচা আম পেড়ে খেত। লতি বড় দজ্জাল মেয়ে। সে কমলার মত অত ভাল মানুষ ছিল না। গাছ-কোমর বেঁধে সে জামরুল গাছে উঠত, ফল পেড়ে নিজে খেত আর কমলাকে দিত। দু'জনে কত হাসি, কত গল্প, কত খেলা করত। কমলা ঘোড়া সেজে দামাগুড়ি দিত। লতি তার মাংসল পিঠের উপর চড়ত আর চাবুক মেরে ঘোড়া চালাত। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ অলস বেলায় তারা খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ত নিঃশঙ্কচিত্তে। বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে

বেড়া গলে প্রতিবেশিনী মকর মার রান্না ঘরের বাঁশের আগড় খুলে তার মাছের তরকারি ও পান্তা ভাতের হাঁড়ি উকোড় করে আসত। বাড়ি বেড়িয়ে ফিরে এসে শূন্য ভাতের হাঁড়ি আর তরকারি শূন্য কড়া দেখে মাথায় হাত দিয়ে 'হায়, হায়' করত। মনে ভাবত হয়তো বা নেউলে খেয়ে গেছে।

দুপুরে হরনাথ বিশ্রাম করতেন নিজের শোবার ঘরে। নিস্তা রণী একখানা মাদুর পেতে শুতেন দক্ষিণ দিকে দাওয়ার উপর যেখণ ক্ষেতের সামনে। কমলা তাঁর পাশে বসে মাথার পাকা চুল তুলত। আরামে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। কমলা পা টিপে টিপে উঠে এসে বসত আনারস বাগানের সামনে কাঁঠাল গাছের তলায়। বড় পুকুরের পাড়ে বুড়ো জটপাকানো আমগাছটার ডালে বসে কোকিল ডাকত। অলস চৈতী বেলায় তপ্ত বাতাসে ভেসে আসত তার প্রাণঘাতানো কুহুস্বর। কমলার মন ছুটে যেত যেন কোন অদীমের রাজ্যে। মনে পড়ত তার ক্ষুদ্র জীবনের ছোট ক'টা বছরের ঘটনা একটার পর একটা। মনে পড়ত তার মা বাবাকে, তাদের দেশে পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটের পাশে পুরাতন ছেলে-পড়া শিব মন্দিরটাকে, কলকাতার বাসায় ছোট্ট সংসারটির সুখশান্তিময় দিনগুলি—তাদের সেই ছোট ঝিনারি স্কুলটা—আর মনে পড়ত তার সখী সোনাকে। সে ভাবত কত ছোট খুঁটিনাটি ঘটনা, ভুলে-যাওয়া, আধ-ভোলা, না-ভোলা কত কথা ভেসে উঠত জল্ জল্ করে তার মনের পর্দার উপর স্মৃতির শত শত সহস্র ছিদ্র দিয়ে। তখন অজ্ঞাতে ভেসে যেত তার বড় বড় দু'টি চোখ বর্ষার দুকূল-প্লাবী নদী স্রোতের মত। কত কথা মনে আসত তার। সে গুমরে মরত। সংসারে কেউ তো তাকে ভালবাসে না। তার বর? সেও তো তাকে ভালবাসে না! কলেজের ছুটি হলে সে যখন বাড়ী আসে তাকে সে খেতে দেয় মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে, তাকে সে দেখে চুরি করে হেঁসেল ঘরের ছিটেবেড়ার ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে। নিঃশব্দ হয়ে তো তাকে দেখবারও উপায় ছিল না। নিস্তারিণীর কড়া পাহারা ছিল তার উপর। বউ-এর দৃষ্টিতে ছেলের চেহারা কালি হয়ে যাবে যে। তার সঙ্গে কথা বলা? অসম্ভব। আর কথা বলা হবে কী করে? তার সঙ্গে তো আলাপ নেই! পরিচয় না থাকলে কী কথা বলা চলে? নিস্তারিণীকে সে বলতে শুনেছে—বউ কী তার বরের সঙ্গে কথা বলবে? এক বিছানায় শোওয়া! তাও কী হয়? ছেলে এখন লেখা-পড়া করে। বউ-এর কাছে তাকে যেতে দিলে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পড়াশুনার ক্ষতি হবে। বউ-এর নিশ্বাসের গরম বাতাস ছেলের গায়ে লাগলে তার অকল্যাণ হবে, তার পরমায়ু কমে যাবে! একছত্র বিপ্রপদ শুত তার মায়ের কাছে রাতের পর রাত, যখন সে বাড়ী আসত বড় দিনের বন্ধে, গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটিতে।

কমলার বাপের বাড়ী ছিল না। কোথাও গিয়ে দু'দিন জুড়োবার স্থান ছিল না তার। কেউ ছিল না তার সারা পৃথিবীতে আপনার বলতে। সে তো ছিল সর্বক্ষণ ঘোমটা টানা বউ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। সে শুধু হুকুম তালিম করত। কথা বলতে হত না তাকে। কথা বলবার লোকও ছিল না, দরকারও ছিল না। শক্তি যখন থাকত তার সঙ্গে কথা বলা হত। নইলে সে বোবা হয়ে যেত। সংসারে সকলে কথা বলছে, চেঁচামেচি করছে, হাসছে, আমোদ করছে, আর সে-ই শুধু নির্বাক নিস্তব্ধ বোবা।

কৈশোরের দিনগুলি পার হয়ে সে এখন এসেছে যৌবনের প্রদোষে। যৌবনের চিহ্ন দেহে পরিস্ফুট হয়েছে। অঙ্গের লাবণ্য ভরা-নদীর জলের মতো উপচে প'ড়ছে। পরণে তার আধ-ময়লা মোটা অল্প পরিসর কাপড়ের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারত তার রূপের আলো, আনিতম্ব কেশধামের ভিতর দিয়ে ঝিলিক মারত সৌন্দর্যের বিজলী। নবোদ্গত যৌবনের ছন্দ মধুর নীরবতা মুখর হতে চেয়েছিল আত্মনিবেদনের ভাষা সাজিয়ে দিতে যেন কার চরণে। রক্তের নৃত্য-দোলা ঘিরেছিল তার ঈষদুন্নত পয়োধরতলে। ফাগুনের মর্মর মুখরিত আম্র-বকুল, বসন্তের গন্ধমদির মলয়-বায়ু, বৈশাখের তপ্ত মধ্যাহ্নের অলস সমীরণ, সায়াহ্নে অস্তগামী সূর্যের

সোনালি কিরণচ্ছটা বিশ্বের অন্তরে যে চেতনা, যে আনন্দ-হিল্লোল জাগিয়ে তোলে তারই ছোঁয়াচ লেগে তার প্রাণের বেদনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। যেন কোন সুদূর সমুদ্র থেকে জোয়ারের স্রোত এসে তার অন্তরে অনির্বচনীয় চেতনাশক্তি সঞ্চার করেছিল। সে যেন কার প্রতীক্ষায় বসে ছিল তার যৌবনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে। সে আপনাকে আপনি দেখে, ভাবে, অনুভব করে, প্রশ্ন করে কিন্তু বুঝতে পারে না।

নিস্তরঙ্গ আবদ্ধ জলাশয়ের মতো গ্রাম্য জীবন প্রবাহিত হত মন্থর গতিতে। কর্ম-কারাগারে আবদ্ধ কমলার দেহ মন অবসাদ-তিক্ত। বছরে মাত্র দু'একবার আলোড়ন আসে দুর্গাপূজা ও গাজনের সময় আশ্বিন ও চৈত্র মাসে।

পূজার সময় গাঁয়ের বউ-ঝিদের যাতায়াতের মরশুম পড়ে যেত। নাকে নথ, হাতে রূপার বাজু ও চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা, কানে গোছা গোছা মাকড়ি দুলিয়ে চুলে খোপা বেঁধে বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে, কেউ বা অবগুণ্ঠন খুলে আসত গ্রামে শ্বশুর বা বাপের বাড়ী। চারদিকে উঠত আনন্দ কলরব। ঢাক-ঢোলের ড্যাং ড্যাং শব্দ, কাঁসির খন্‌খন্ আওয়াজ পল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলত। সত্য বাউলের একতারায় আগমনী গান যখন পল্লী মায়ের প্রাণের তারে ঝঙ্কার তুলত তখন কমলার প্রাণে ঘনিয়ে উঠত অমাবস্যার অন্ধকার। শুত লোক আসত, যেত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নতুন কাপড় পরে বাড়ি বাড়ি প্রতিমা দেখে বেড়াত; কিন্তু কমলার আসা-যাওয়া ছিল না।

চৈত্র মাসে যখন শিবের গাজনের সময় চাষাভুষো সন্ন্যাসী হয়ে গলায় উত্তরীয় ধারণ করে উপর দিকে পা ও নীচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দোল খেত, যখন ঢাকের ড্যাং-ড্যাং বাদ্যের তালে তালে তারা অধীর হয়ে নাচত, শিবের গান বা তরজা গাইত, দেহে কালিঝুলি মেখে বানর বা বাঘের মুখোস পরে লাফালাফি করত, নানা রকমের সঙ সেজে গাঁয়ের সরল অল্প-নরনারীর নির্দোষ অথচ স্থূল ধরণের আমোদ উৎপাদন করত, তখন কমলা গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকত, তার অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে চৈতী-হাওয়া যেন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

আবার যখন সানাই-এর প্রাণমাতানো সুর, গগন-বিদারী উলুধ্বনি, অসংখ্য শঙ্খের মাঙ্গলিকধ্বনি পাড়ার কারুর বাড়িতে নব-বধূর আগমন বার্তা প্রচার করত, তখন কমলা থাকত খাঁচার পাখির মতো আবদ্ধ গৃহ-কোণে। তাঁতের সরু লাল-পেড়ে ছোটখাটো কাপড় পরিয়ে কী বাড়ির বউকে নিয়ে যাওয়া চলে দশ জনের ভেতর? অপর বাড়ির মেয়েরা আসবে ভাল ভাল কাপড় ও গহনা গায়ে সেজেগুজে, আর কমলা সেখানে যাবে দু'হাতে দু'খানা সোনার পাতমোড়া চুড়ি পরে? তার বিয়ের সোনার গহনা সকল তার বাপই তো বাঁধা দিয়ে খেয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। একী দুঃসহ একাকীত্ব! এ যে মরুভূমির ভিতর দিয়ে পথ চলা।

৩

সে বছর গ্রীষ্মের ছুটীতে বিপ্রপদ বাড়ি এসেছে। মুসলমান পাড়ায় বসন্ত আরম্ভ হয়েছে দেখে কালীতলায় শীতলার গানের আসর বসেছে। বাড়ির অন্য সকলের মতো বিপ্রপদ গান শুনতে গিয়েছিল। এই ধরণের লোকসঙ্গীত সে শুনতে ভালবাসত। পশ্চিম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শিব-শিতলার গান বিষহরির ও চণ্ডীর গান নামে পরিচিত। যে সকল লোকসঙ্গীত স্থানে অস্থানে হীরার টুকরোর মতো ছড়িয়ে আছে, বিপ্রপদ তাদের সংগ্রহ করে প্রকাশ করবে মনে করেছিল। ধর্ম ও দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করে প্রাকৃত মন কেমন সহজ সরল অকৃত্রিম ভাষায় ও ছন্দে তার অনুভূতি প্রকাশ করেছে, এই যে এক বিরাট লোক-সাহিত্য অনাদৃত ও অনাস্বাদিত অবস্থায় আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করে আছে, তাকে সে চেয়েছিল লোক-লোচনের সামনে আনতে।

বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতির দেশ-প্রাণতার যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার ছোঁয়াচ লেগে-

ছিল তার মনে। আগুনে পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল সে—কিন্তু সে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে বুঝে নিয়েছিল যে, অগ্নিময়ী বক্তৃতা, আগুন-ঝরানো গান, গোটাকয়েক রিভলভার ছুঁড়ে আর বোমা মেরে দু'দশটা ইংরেজকে হত্যা ক'রে ফাঁসির দড়িকে ফুলের মালার মতো কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে হাসি মুখে মৃত্যু বরণ বিদেশী শাসন উচ্ছেদের প্রশ্ন সমাধান করতে পারবে না। উদ্দীপনা অনুভূতি চাই; কিন্তু শুধু উদ্দীপনার জোরেই ইংরেজের মতো দুশমনকে দূর করা যায় না। দেশকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি চাই। কয়েকবছর ধরে সে ভেবেছে, চিন্তা করেছে, কোথায় দেশের প্রাণকেন্দ্র; দেখেছে সে দেশের অন্তরাত্মা লুকিয়ে আছে তার ভাষায়, সাহিত্যে, তার সামাজিক অনুষ্ঠানে, তার ভাবে ধর্মে ও চিন্তায়। দেশের মুক্তি শুধু মরতে বা মারতে পারার নেশায় নেই। স্বাধীনতার তাৎপর্য বাঁচা—বাঁচার ও বাড়ার পূর্ণ আয়োজন করা। মারা বা মরা তো সহজ। যে কুম্ভকর্ণ যুগযুগান্ত ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগ্রত না করলে মুক্তি উপকথার মতো চমকপ্রদ কিন্তু অলীক।

বাড়ির সকলে এসেছে গান শুনতে, কেবলমাত্র কমলা আসেনি। আসেনি নয়, তাকে আনা হয়নি। তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া অনাবশ্যক। দিনে কাজ করা আর প্রয়োজন হলে রাত্রে ঘরজাগা,—এর জন্যই তো তার জীবন।

পালা গান শেষ হওয়ার কিছু আগে বিপ্রপদ কালীতলা থেকে চলে এসেছিল। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। সে এমন চাঁদের আলো যেন জীবনে কখন দেখেনি। চাঁদের আলো এমন করে তার হৃদয়কে কখন স্পর্শ করেনি। আম জাম নিম পিটুলি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের রুপালি ধারা সবুজ ঘাসে মোড়া ধপ্‌ধপে সাদা রাস্তার উপর পড়ে ঝক্ ঝক্ করছিল। মৃদু বাতাসে ছায়া কাঁপছিল। ধুতুরা ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছিল কাঠমল্লিকার সৌরভ। বাড়ীর সামনে রাস্তাধারের জট-পাকানো আম গাছটার নীচের দিকটা জ্যোৎস্নার আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সোনার রাত। রুপার চাঁদ। আকাশ থেকে রুপালি ধারা ঝরে পড়ছিল। বিপ্রপদর মন কী যেন এক রঙীন নেশার আবেগে আচ্ছন্ন।

বাইরের দরজায় বিপ্রপদ ধাক্কা দিল। দ্বিতীয়বার ধাক্কার পর তার আওয়াজ শুনে কে যেন খিল খুলে দিল। দরজা বন্ধ করে বিপ্রপদ উঠানে নেমে দেখল, সামনের দাওয়ায় একটা দড়ির দোলায় কমলা বসে আছে। সে দোলার সামনে এগিয়ে এল। বিয়ের পর নির্জনে কমলার সঙ্গে এই হল তার প্রথম সাক্ষাৎ। তার রক্ত চন্ চন্ করে উঠছিল। সে ডাকল কমলা! শঙ্কা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর এল তুমি এস না। মা এখুনি এসে পড়বেন। ঠারকুড়ি এল বলে। বাবার আসারও দেরি নেই। তুমি শোও গে যাও।

এই কথাগুলি বলে সে দড়ির দোলায় ধীরে ধীরে দোল খেতে লাগল। দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল সে আকাশে। বিহ্বল ভাব, অপূর্ব করুণতা ভরা। চঞ্চলতা নেই, অস্থিরতা নেই। কমলা যেন কী ভাবছিল—কী ভাবছিল সেই জানে। বোধহয় নতুন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচ, স্বাভাবিক অস্বস্তি তাকে যেন আনমনা করে তুলছিল। বিপ্রপদর ইচ্ছা হয়েছিল তার পিঠের রাশি রাশি চুলগুলি একবার হাতে তুলে নিতে। তাকিয়ে রইল সে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে—ডুবে গেল সে যেন কোন অতলে।

তুমি শোও গে, যাও মা এসে পড়বেন এখুনি। কী বলবেন তিনি? সঙ্কুচিত মৃদু স্বরে কমলা আবার বলছিল। এত ধীরে, যেন তার স্বর বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। বিপ্রপদর রক্তে রক্তে যেন জোয়ারের জলের মত আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আবেগে সে আবার ডাকল, কমলা।

কমলা সাড়া দিল না। তার দিকে একবার চোখের কিশলয় কোমল পাপড়িগুলি তুলে পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। কিন্তু সে দৃষ্টির কটাক্ষ চকিত করে দিল বিপ্রপদকে। এতদিন সে কমলাকে যত ছোট ভেবেছে সে

তা নয়। কিশোরীর মন তার ভিতর অনেক দিন আগেই জেগেছে, যেমন ভাবে জাগে ঘুম, চৈতী হাওয়ার আগুনে, কাঁচা ডালিমের প্রাণতন্ত্রে। সে বুঝতে পারেনি ঐ ডাকের ভিতর নরনারীর শাশ্বত প্রেমের যে আবেগ নিত্যকাল ধরে জীবন ও মৃত্যু, কর্ম ও বিশ্রামের ভিতর দিয়ে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে—সে আবেগ সন্ধ্যাতারার মতো শান্তসুন্দর, তার সুনিশ্চয় নির্ভুল শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল কমলার মুখের উপর। বিপ্রপদ দেখল, সরু হাসির একটী ক্ষীণ রেখা তার বিম্বাধরের উপর দিয়ে মুহূর্তের জন্য খেলা করে গেল।

এতদিন বিপ্রপদ ভাবেনি কমলার কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির কথা। ছুটীর সময় সে বাড়ী এসেছে। কমলার সত্য মিথ্যা কল্পিত অনুমিত অপরাধের কথা ফিরিস্তি দাখিল হয়েছে তার কাছে বিচার ও শাস্তির জন্য। সে কিছু বিচার করেনি, শুধু শাস্তিই দিয়েছে—একতরফা বিচার হয়েছে সে। গুরুজন এক পক্ষ, আর এক পক্ষ একটি মূক বালিকা। ইংরেজি পড়া ভেড়ো-ছেলে হওয়ার অখ্যাতি অর্জন করতে সে চায়নি। এই দুর্বলতা তার মন আচ্ছন্ন করত। সে শুধু ভেবেছে, কেন ভগবান এই বালিকার ক্ষীণ দেহ থেকে জীবনীশক্তির স্পন্দনটুকু কেড়ে নেননি? দুঃখের গ্লানি, নির্যাতনের কঠোরতা, নিন্দার কালিমা সত্ত্বেও কেন তার এই রিক্ত জীবনের লীলা চলেছে অব্যাহতভাবে? তার অনভিজ্ঞ মন এর নিগূঢ় কারণ ধরতে পারেনি বলে কী পৃথিবীর মানুষ চাইবে জীবনের মায়া বিসর্জন দিতে? সে ভুলে গিয়েছিল, যারা জীবনকে স্বীকার করে নিতে পারে, স্বীকার করে নেবার শক্তি আছে যাদের, তাদের এই স্বীকৃতিতেই তারা মনে বল, হৃদয়ে শক্তি, প্রাণে আনন্দ অনুভব করে। কমলা নিজেও বুঝতে পারেনি জীবনের প্রতি কেন তার এই মায়া? দুঃখ-কষ্টের জগদ্দল পাথর যতই তার বুকের উপর চেপে বসেছে, ততই তার জীবনের উপর আসক্তি বেড়ে উঠেছে তার অজ্ঞাতে।

পালা গান শেষ হয়ে এল। সত্যই সকলে এসে পড়বে। এখনই চলে যেতে হবে তাকে। পা কাঁপতে লাগল তার। এগিয়ে এল সে। চাঁদের আলোয় কমলার মুখ অপূর্ব সুন্দর দেখছিল সে। বিপ্রপদ আরও এগিয়ে এল। কমলার কোমল হাত দু'খানি ধ'রে বলল—কমলা, আমি অনেক অবিচার করেছি তোমার উপর; কিন্তু উপায় ছিল না আমার। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

দু'জনেই নিস্তব্ধ নির্বাক। চোখের চাউনিতে দু'জনের মধ্যে গোপন কথা হয়েছিল। শোনা গেল রাস্তায় কালীতলা থেকে ফিরে আসার সময় লোকজনের কথা-বার্তার কলরব।

কি মূল্য সে জীবনের

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ।

কি মূল্য সে জীবনের যদি নাহি থাকে অবসর
দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিবারে চাহি লোভাতুর,
দুঃখভার মলিন ধরার ক্ষণিক আনন্দচ্ছবি দুর্লভ, মধুর?
দেখিবারে চাহি মুগ্ধ চোখে শরতের মধ্যাহ্ন বেলায়
গোঠে চরে গাভীদল শান্ত, তৃপ্ত অলস হেলায়;—
দেখিবারে চাহি আঁখি মেলি বসন্তের শ্যামল অঞ্চল
অশান্ত সমীরে কাঁপে ব্রীড়াভরে আকুল চঞ্চল;
নয়ন ভরিয়া দেখিবারে স্বচ্ছতোয়া তটিনীর গতি,
বুকে যবে দোলে তার আলোকের হার শুভ্রমোতি;
আবেশ বিহ্বল চোখে দেখিবারে চাহি সমুৎসুক
তরুণীর কালোচোখে গোপন ইঙ্গিত সম প্রচ্ছন্ন কৌতুক।
ব্যর্থ সেই কর্মান্ত জীবন, যদি নাহি থাকে অধিকার
ক্ষণিক আলস ভরে করিবারে ভোগ
আনন্দের সংকীর্ণ সম্ভার।

ক্ষুধিত মাতৃত্ব

সোম দত্ত

(গল্প)

যখন বিনয়ের বুক ফেটে মার জন্য কান্না বেরুচ্ছিল, নিজের দুঃখ চেপেও সে প্রভাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। এই ছোট নিঃসহায় বোনটী যে একান্তই তার উপর আজ নির্ভর করছে। শেষ সময় মা তাকে দুটী আদেশ দিয়ে গিয়েছেন—ভাল দেখে বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে হবে এবং প্রভাকে দেখতে হবে। মার বড় সাধ ছিল, বিনয়ের একটী টুকটুকে বউ এনে তার হাতে সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিবেন এবং প্রভাকে একটী সৎপাত্রে অর্পণ করবেন। এ দুটী কাজ হ'লেই তার ইহ জীবনের সব সাধ পূর্ণ হবে এমন কথা তিনি কতবার বলেছেন। একের মামুষ করতে হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি বৈধব্য ও দারিদ্র্যের অশেষ দুঃখ উপেক্ষা ক'রে চলেছিলেন। মরবার সময় মা প্রভার হাতখানা বিনয়ের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলেছিলেন—বিনয়, এ হতভাগীর ত আর কোন আশ্রয়-ই রইল না। বিনয় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাকে আশ্বাস দিয়েছে—জীবনে প্রভার চেয়ে বেশী স্নেহের ও আদরের আর কেউ নাই তার।

তাই নিজের কান্নার বেগ সম্বরণ ক'রে বিনয় প্রভাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল;—তাকে যে শক্ত হতে হবে যেন প্রভা তার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করতে পারে। প্রভার বয়স তখন ১৪।১৫ বছর। দাদার মনের অবস্থা তার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। মার শেষ সময়ের দৃশ্যও সে ভুলে নি। তার জন্য দাদার এই ত্যাগ ও সংযম তার মনে একটা গভীর ছায়া রেখে গেল। মার অভাবে দাদা যে কত দুঃখী, এটা সে অনুভব করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন বিনয় টের পেল—প্রভা আজ আর কেবল তার ছোট বোন নয়, সে তার দিদি, মা ও বান্ধবী। নিভৃত সন্ধ্যার মুক্ত আকাশের তলে ব'সে দুই ভাই-বোন পরস্পরের দুঃখ বুঝতে ও হ্রাস করতে যে সমবেদনায় আলাপ করত, তাতে, তাদের ভিতর সম্পর্কের গণ্ডী কখন লোপ পেয়েছে—তারা কেউ জানতে পারেনি। দিনের কর্ম-কোলাহলের পর ঐ সময়টা ছিল তাদের নিভৃত আলাপের জন্য।

পূর্বে যেমন মা তার খাওয়া-দাওয়া থেকে সুরু ক'রে তার কাপড়-চোপড় গুছানো পর্যন্ত সব করত, আজ সেই সবই করছে প্রভা। খেতে বসলে, প্রভা সামনে বসে মিনতি ক'রে, আদর ক'রে, ধমক দিয়ে বিনয়ের খাওয়া তদারক করত। বিনয় হয়ত বলছে—আজ তার দুধ খাবার মোটেই ইচ্ছা নেই, প্রভা তার আপত্তি মানছে না; সে বলল "লক্ষ্মী ত', দাদা, দুধটুকু খেয়ে নেও—সমস্ত দিন যে খাটুনী যাচ্ছে।" তবুও বিনয় মানছে না, তার আজ মোটেই ক্ষুধা নেই। প্রভাও ছাড়ছে না—"ভাল হবে না ও দুধ ফেলে যদি তুমি ওঠ।" তার শাসনে বিনয় হেসে দিত, মনে পড়ত মার কথা—ঠিক এমনি হেসে বলতেন—"ভারি দুরুন্তি হয়েছিস" কিন্তু দুধটুকু খেয়েই উঠত। প্রভার হাতের এই আদর ও শাসন সে উপভোগ করত। নিজের অজ্ঞাতে মনের কোণে নিভৃত গুহায় একটী শাশ্বত ভিখারী আছে—এমনি আদর, এমনি সস্নেহ শাসন পেয়ে সে কৃতার্থ হয়। আজ মা নেই;—তাই ছোট বোনের কাছেও এটুকু পেয়ে ক্ষুধার্ত মন তার খোরাক পায়।

বিনয়ের বিবাহ—মেয়ে বেছে আনবে প্রভা। বিনয় বলল—"বাঃ, বিয়ে করব আমি, সারা জীবন বিশেষভাবে তার বহন করতে হবে আমার, আর পছন্দ করে আনবি তুই! আমার কি কোন পছন্দ নেই?"

প্রভা বলত "হাঁ, তোমাদের আবার পছন্দ! পছন্দ ক'রে এক একজন যা সব মেয়ে বেছে বেছে নিচ্ছে, দেখছি ত'। হয়ত দেখবে উঁচু heel-এর জুতো পরে কি রকম ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, বা vanity bag থেকে আয়না বের করে "to look nice" হওয়ার বারম্বার চেষ্টা করতে সঙ্কোচ বোধ করে কিনা, বা দুটো সিনেমার গান করতে পারে কিনা—খুব হয়ত বড় জোর করটা পাশ করেছে এই দেখে মেয়ে বেছে আনবে এবং সারা জীবন নাকের জলে চোখের জলে একাকার করবে। সে ভাবনা

তোমার ভাবতে হবে না—আমি ঠিকমত বউ এনে দেব।"

বিনয় বলত "আমিও তোমার জন্য এমন একটী বর আন....."

কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রভা পালিয়ে যেত—যেতে যেতে বলত "এখন আর দুষ্টামী করতে হবে না, চুপ ক'রে শুয়ে পড়।"

কোন মেয়েই আর প্রভার পছন্দ হয় না। বিনয়ের সব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা বলতে সুরু করল—'প্রভার হাতে মেয়ে পছন্দর ভার থাকলে বুঝতে হবে সে মেয়ে এখনও ব্রহ্মার মনেই আছে। তার পর একটি মেয়ে প্রভার পছন্দ হ'ল—খুব কিছু অবাক সুন্দরী নয়—কিন্তু তবুও এর মুখে একটা মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ ছিল। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা কেউ বলল—পর্বতের মূষিক প্রসব দেখা গেল। কেউ বা বলল—নূতন তিলোত্তমার জন্ম হ'ল.....। প্রভা শুনেও জবাব দেয় না। সে বিনয়কে বলল—"দাদা, এবার হাসি-তামাসার কথা নয়; কথা বলতে এলেই কেবল হাসি ঠাট্টা কর। এখনও ত' পাকা কথা দিইনি—সত্যি বল ত' মীরাকে তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।"

বিনয়—"এতদিন ত' আমার পছন্দর উপর কোন আস্থাই তোর ছিল না, হঠাৎ আমার মত চাচ্ছিস যে।"

প্রভা—"বা, তাই ব'লে বুঝি তোমার মত না নিয়েই মেয়ে ঠিক করব, বেশ কথা ত!"

বিনয়ের হঠাৎ দুষ্টামী বুদ্ধি ঘাড়ে চাপল। সে বলল "তাই ত' high heel-এর জুতো পরে ঘোড়ার মত দৌড়তে পারবে কিনা....."

প্রভা—"আবার দুষ্টামী সুরু করলে! না সত্যি ক'রে বল।"

বিনয় "আচ্ছা, vanity bag-এ lip stick আছে কিনা। সে খোঁজ নিয়েছিস?"

প্রভা এবার প্রায় কেঁদে ফেলল, কান্নার সুরেই সে বলল—"আমার জবাব দেবে না? তবে বুঝলাম এই মেয়ে তোমার পছন্দ হয় নি।" বিনয় এবার হেসে ফেলল; সে বলল "হয়েছে, হয়েছে—খুব পছন্দ হয়েছে। পাগলী কোথাকার"—বোনের মুক্ত চুলের গোছা ধ'রে তার মাথাটা নত ক'রে ধরে ব'লল "সত্যিই বলছি পছন্দ হয়েছে। আমার নিজের উপর এ সব বিষয়ে খুব আস্থা নেই; love at first sight হবার মতো দুর্দশাও হয় নাই। তবে নিজের কাছেও মন্দ লাগে নাই—কিন্তু তোর ও শান্তির মতের উপর আস্থা আছে। তুই নির্ভয়ে পাকা কথা দিতে পারিস।" শান্তি বিনয়ের এক বন্ধু।

প্রভা দাদার পাশে বসে একটু চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—দাদার হাতখানা তার হাতের মধ্যেই ছিল। বিনয় বলল—"প্রভা, যে-ই আসুক, যতদিন এ বাড়িতে তুই আছিস, ততদিন এখানে তোর চেয়ে বড় কেউ হবে না।"

প্রভা—"সে আশ্বাস আমাকে দিতে হবে না। বৌদি আসছে—আজ না নেই"—সে কেঁদে ফেলল—বিনয় কোন সান্ত্বনার বাকাই খুঁজে পেল না; নীরবে বোনের মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

বিনয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল—মীরা বুদ্ধিমতী মেয়ে। ভাই-বোনের এতদিনকার একান্ত সম্পর্কের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, সে তা টের পেল। বিনয়ই তাকে অনেক কথা বলেছে।—"মীরা, ওর কোন অধিকারে তুমি হাত দিও না—কয়দিনই বা আছে। জন্মের দুই এক বছরের মধ্যে বাবা মারা যান এবং যৌবনের প্রারম্ভেই মাকেও হারায়। ওর ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা—সবই আমাকে অবলম্বন ক'রে। হয়ত তোমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে—সেটুকু সয়ে যেতে হবে।"

মীরা বলল—"প্রভা আমার বন্ধু, আমি ওকে চিনি। এর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।"

কিন্তু তবু-ও মীরা যখন দেখত, স্বামীর কোন কাজই প্রভার ছোঁয়া না লাগলে শুদ্ধ হয় না, তখন সে মনে মনে তাকে একটু হিংসা করত। কিন্তু সেটা যেন ছিল তার নিজের মনের অজ্ঞাতে; টের পেলেই সে লজ্জিত হ'ত।

সেই প্রভাবে একদিন মাতৃগৃহ ছেড়ে যেতে হ'ল তারও একদিন বিয়ে হ'ল। এবার পছন্দ করার ভার নিল বিনয় এবং এর জন্য বেশী ঘাটতে হ'ল না। তারই সহপাঠী এবং বন্ধু শান্তির সঙ্গে প্রভার বিয়ে হ'ল। দাদার কখন কি দরকার হয়, কি খাবার সে পছন্দ করে, কোনটা তার সহ্য হয় না—ঐ সব এত খুঁটিনাটি সে বৌদিকে বুঝাতে লাগল, যে মীরা একটু বিরক্ত হয়েও হাসিমুখে বলল—"তার চেয়ে কাজ নাই তোমার স্বামী গৃহে গিয়ে—বাপরে বাপ, এমন দাদাগত প্রাণ আর দেখি নি, ভাই। শকুন্তলার পিতৃগৃহ ত্যাগের দৃশ্য মনে পড়ে।

বিবাহিত জীবনের কয়েকবছর পর, সেই প্রভা, দাদা, স্বামী ও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে কোন অদৃশ্য জগতে চ'লে গিয়েছে। এবারও বিনয় নিজের দুঃখ চেপে রাখল শান্তি ও খোকা-খুকীর মুখ চেয়ে। তারপর এক বছর চলে গেল। সন্তু ও গোপাকে নিয়ে শান্তি প্রভার দুঃখ ভুলছে। একদিন ওদের বাড়ী গিয়ে দেখে গোপার কয়দিন যাবৎ জ্বর হচ্ছে—কিন্তু তার উপযুক্ত শুশ্রূষা হয় না—ঔষধ পথ্য ঠিকমত চলে না। বাবা তাদের আদর দেয়, তাদের জন্য পয়সা খরচ করে; কিন্তু মা'র হাতের সেই নিপুণ সস্নেহ সেবা ত' দিতে পারে না।

বিনয় বলল—শান্তি আবার বিয়ে করুক, মীরা সহজেই সম্মতি দিল; এতদিন স্বামীর ভয়ে সে এই প্রস্তাব করে নি। শান্তি কিছুতেই রাজী না; কিন্তু সকলের চাপে কিছুদিন পরে তাকে রাজী হ'তে হ'ল। এবার মেয়ে পছন্দ করল মীরা। সর্বশেষ অনুমোদন দিল বিনয়; শান্তিও আপত্তি করল না। উমা গরীবের মেয়ে, বয়স একটু হয়েছে—অর্থের অভাবেই বিয়ে হয় নি। অর্থের অভাবেই তার বাপ-মা উমাকে সোজবরের হাতে দিতে রাজী হলেন। বিয়ের পরদিনই বিনয় উমাকে বলল—"আমার ছোটবোনের জায়গায় তুমি এলে, বোনের মতই তোমাকে দেখব। সন্তু ও গোপা বড় দুর্ভাগ্য—এ বয়সে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া! ওদের মার অভাবটা তুমি দূর করতে পারবে এই আমি আশা করি।

উমা নত হ'য়ে বিনয়কে প্রণাম করল এবং বলল "দাদা, আশীর্বাদ করবেন যেন আপনাদের সকলকে সুখী করতে পারি। সন্তু ও গোপার জন্য আপনি ভাববেন না।"

বিনয় একটু ইতস্তত করে বলল—"উমা, আর একটা কথা বলব—সন্তুর বয়স প্রায় ৪ বছর হল—মার' কথা ওর মনে আছে। হয়ত তোমাকে মা বলে ডাকতে প্রথমটা.....

তাকে বাধা দিয়ে উমা বলল—"সে জন্য ভাববেন না—সে আমি ঠিক ক'রে নেব।"

একটা নির্ভরশীলতার ভাব নিয়ে বিনয় বাসায় ফিরে এল। সে স্বস্তি বোধকরল তার বড় আদরের ভাগনে ভাগনীর শিশু-মন মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়ে মুষড়ে যাবে না।

উমা শিক্ষিতা বয়স্থ মেয়ে। তার নারী-হৃদয়ের স্বভাবজাত মাতৃ-স্নেহ আজ এই দুটি মাতৃহীন শিশুর দিকে নিজের থেকেই আকৃষ্ট হ'ল। গোপা খুব শান্ত—কিন্তু সন্তু বেজায় দুষ্টু। মনে বা মুখে কিছুতেই সে উমাকে মা ব'লে স্বীকার করছে না। একদিন ঘরের মধ্যে দুষ্টামী করতে গিয়ে, সন্তু একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলল। গোপা বলল—"দাঁড়াও, মা তোমাকে মজা দেখাবে।" সন্তু বলল—"ইঃ, তারি মা, তুই তাকে মা বলিস কেনরে? আমার বাবার গ্লাস ভেঙ্গেছি—বেশ করেছি।"

গোপা—"মা ত'—মা বলব না ত' কি বলব?"

সন্তু—"মা ত' মরে গিয়েছে।"

গোপা—"মা'রে আবার ফিরে এসেছে।"

সন্তু—"তোকে বলেছে! বোকা কোথাকার....."

এমনি সময় উমা ঘরে ঢুকল। ভাঙ্গা কাচের টুকরা দেখে বলল—এটা ভাঙ্গল কি ক'রে? গোপা বলল, আমরা খেলছিলাম তা ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে।

সে জানত সন্তু এই নূতন মাকে পছন্দ করে না। তার শিশু-হৃদয়ও বুঝে নিয়েছিল সন্তুর সঙ্গে এই মার

সম্পর্কের মধ্যে একটা গোলমাল আছে। তাই দাদার দোষটা ঢেকেই সে বলল।

উমা হেসে বলল—"কিন্তু, কারুর হাত-পা ত' কাটে নি। সন্তু, ওদিকে যায় না—পা কেটে যাবে। এদিকে এস ত' বাবা—ঝাঁট দিয়ে ভাঙ্গা কাচের টুকরাগুলো ফেলে দিচ্ছি।" সন্তুর মুখের উপর অপরাধের একটা ছায়া ছিল—সেটা গোপার মুখে ছিল না। সে বুঝল সন্তু তাকে ভয় করছে। সে সন্তুর হাত ধ'রে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল—"কি হয়েছে একটা গ্লাস ভেঙ্গেছে ত'? এখন চল—খাবার সময় হয়েছে।" সন্তু তখন সাহস করে বলল—"হাতের দড়িটা লেগে উপর থেকে পড়ে গেছে— আমি আগে দেখিনি।"

উমা সন্তুকে বুকের কাছে টেনে ধরে বলল—"কি হয়েছে এতে! আজই আবার ছটা গ্লাস আনতে ব'লে দেব।"

উমা দুজনকে খাওয়াচ্ছে—সন্তু কখনও উমার হাতে খায় নি—আজও খেল না। কিন্তু উমা খাবারটা মেখে দিতে সে অন্যদিনের মতো আপত্তি করল না।

গোপা বলল—"আচ্ছা মানুষ ম'রে আবার ফিরে আসে না?"

উমা—"হাঁ, আসে বৈকি।"

গোপা—"দাদা বলে তা আর আসতে পারে না—কেমন, দাদা, বলছিলাম না।"

একদিন বিনয় বেড়াতে এল—সে প্রায়ই আসত। উমা তার জন্য চা আনতে গিয়েছে। সন্তু ও গোপা মামার কোলে-পিঠে চেপে আছে। বিনয় বলল সন্তু, তোর মাকে ডাক ত'; আমার আবার তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সন্তু বলল—'মা ত' মরে গেছে।' তার বিদ্রোহ তখনও কাটেনি। বিনয় বলল—"ছিঃ, ও কথা বলে না। ঐ ত তোদের মা ও ঘরে চা করছে।"

সন্তু—"মামা, মানুষ মরে কি আবার ফিরে আসে?"

মিথ্যা বলা ছাড়া বিনয়ের কোন উপায় রইল না—সে বলল—"আসে বৈকি! তোদের মা-ই ত ফিরে এসেছে।"

সন্তু বলল—"ঐ ত' মার ফটো। ঐ রকম ত' দেখায় না।"

বিনয়—"তোদের মা যে নূতন হ'য়ে এসেছে। তাই চেহারাও বদল হয়েছে।"

চা খাওয়ার পর সে শান্তিকে বলল—"প্রভার ফটো-খানা আমি নিয়ে যেতে চাই—আমি একটা enlargement করাব।"

শান্তি—"নিয়ে যাও, ওদের মন থেকেও প্রভাকে মুছে ফেলতে চাচ্ছ ত'! যাকে কোন রকমেই ধরে রাখতে পারলাম না, তাকে ছবির মধ্যে আটকে রেখে লাভ কি?"

বিনয় কোন জবাব দিল না। ছবিখানা নিয়ে চলে গেল।

রাত্রে উমা শান্তিকে জিজ্ঞাসা করল—"দিদির ফটোখানা কি হ'ল?"

শান্তি ঘুমের ভান ক'রে প্রথমবার জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলল—"বিনয় নিয়ে গিয়েছে, তার কাছে ফটো নেই—সে বড় ক'রে ছবি আঁকাবে....."

আরও কিছুদিন চ'লে গিয়েছে;—হঠাৎ সন্তুর জ্বর হ'ল। জ্বরের ঘোরে সে বলছে—মা, মাগো···। প্রতি বারই উমার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ জবাব দিচ্ছে—"কি চাই, বাবা লক্ষ্মী আমার, খুব কষ্ট হচ্ছে...?" হয়ত মাথায় জল পট্টি দিচ্ছে, না হয় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, না হয় মাথায় বাতাস দিচ্ছে। শারীরিক যন্ত্রণার আবেগে নিজের অজ্ঞাতে সে উমাকে মা ব'লে মেনে নিচ্ছে। মন যখন তার অনেকটা তৈরি হয়েছিল, মুখের লজ্জায় তখনও বাধ ছিল—তাই সে এতদিন কিছুতেই উমার সামনে তাকে মা বলে ডাকতে পারছিল না। আজ ব্যাধির ব্যথায় তার সেই লজ্জা কেটে গেল।

তার শিশু-হৃদয় বহুকাল বঞ্চিত থেকে আবার আজ মাতৃ-স্নেহের আস্বাদ পেল। রোগশয্যায় শুয়ে উমার উপর কত আবদার সে করছিল, কত কুপথ্য খাবার দাবী জানাচ্ছিল। কিলিয়ে, খামচে, নানা জুলুম ক'রে সে

উমার উপর তার দাবী প্রতিষ্ঠা করছিল। যেন এতকাল তাকে বঞ্চিত রাখার দণ্ড সে উমাকে দিচ্ছিল।

সে দিন দুপুরে সন্তু ঘুমাচ্ছে। উমা তার পাশে একটু শুয়ে নিয়ে, উঠে চিঠি লিখতে বসল। তার সহপাঠিনী অমলার চিঠি অনেক দিন হয় পেয়েছে। সন্তুর অসুখের জন্য এতদিন জবাব দিতে পারে নি। আজ সে জবাব দিতে বসল :—

"প্রিয় অমলা, অনেকদিন হয় তোর চিঠি পেয়েছি, খোকার অসুখের জন্য এতদিন জবাব দিতে পারি নি। তুই বরাবরই অভিযোগ করিস, আমার চিঠির মধ্যে যেন কোন প্রাণের স্পর্শ থাকে না—কেমন যেন নীরস। তোর অভিযোগ আমি কোনদিনই অস্বীকার করিনি; কিন্তু তার কোন জবাবও দেই নাই। আজ কিছু জবাব দেব।"

"তুই আমার সহপাঠী ও বাল্য সখী এবং সমবয়সী। আমার বিয়ের চার বছর আগে তোর বিয়ে হয়েছে এবং তাও খুব গৌরীদানের বয়সে হয় নি। আরও সমবয়সী বান্ধবীদেরও বিয়ে হয়েছে তোর আগেও কারুর হয়েছে। তোদের কাছে তোদের বিবাহিত জীবনের রঙীন কাহিনী কত শুনেছি সে সব কথা কারুর কাছে বলার জন্য তোদের বুকের মধ্যে তুফান বইত; আমার কাছে ব'লে তোরা আনন্দ পেতি। আমিও তোদের আনন্দে যোগ দিয়ে একটা প্রতিবিম্বিত আনন্দ—ছবি দেখার বা উপন্যাস পড়ার আনন্দের সমতুল্য আনন্দ পেতাম। কিন্তু আমার মনের গভীর অন্তস্তলে যে কি ঝড় ব'য়ে যেত, তার খোঁজ রাখবার তোদের অবসরও হ'ত না। যতদিন বিদ্যা অর্জনের জন্য বা কোন আদর্শের জন্য নিজেরই বিয়েতে আপত্তি ছিল, ততদিন এ ব্যথা তেমন লাগত না; তখন সত্যই সরল ভাবে তোদের আনন্দের অংশ নিতে পারতাম।"

"কিন্তু যখন বর জুটছেনা ব'লে বিয়ে হচ্ছে না—অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে আছি, তাই আমার যৌবন, আমার নারীত্ব সব ব্যর্থ হচ্ছিল—তখন যে বেদনা বুকের মধ্যে বোধ করতাম; তা তোকে বুঝাতে পারব না।

"তার পর বিয়ে হল। খুব সুন্দরী বলে খ্যাতি আমার কোন কালে ছিল না। কিন্তু একেবারে অখাদ্য কুৎসিৎও আমি নই। যে সব বান্ধবীদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী আমার বুকে ব্যথার তরঙ্গ তুলত, তারা যে সবাই আমার চেয়ে সুন্দরী ছিল, তা-ও নয়। কাজেই আমিও একটা রঙীন স্বপ্ন নিয়েই স্বামী-গৃহে আসতে পারি—আমার দৈহিক গঠন তার পক্ষে বাধা হবে না—এ ভরসা নিয়েই বিবাহিত জীবন সুরু করেছিলাম।"

"কিন্তু কোথায়? তোদের কাহিনীর মধ্যে যে বন্যার কথা শুনেছি, যে রুদ্ধ উৎসর মুক্তিলাভের থাপা উচ্ছ্বাসের কথা শুনেছি, তা কোথায়? শান্ত, সমাহিত—কোন আবেগ নেই—বিরাগও নেই। স্বামী অনাদর করে, ভালবাসেনা—একথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে—কিন্তু একটা তীব্র কামনা আমার জন্য আছে, বন্যার আবেগে তিনি আমার বেলাভূমিতে এসে ভেঙ্গে পড়েন, আমাকে বন্যাপ্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যান—তাও ত' দেখছি না।"

"নিজের অন্তরের সঙ্কোচ ঢেকে বাইরের আচরণে তিনি সহৃদয়, বিবেচক এবং প্রায় নিখুঁত। সমস্ত সংসারে আমি সর্বময় কর্ত্রী এবং হয়তো তারও কর্ত্রী। এতেই নারী-হৃদয় তৃপ্ত হয়না। তিনি এমন নির্দিকার যে আমার কাছ থেকে কোন সেবা নিতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন। তার ভবা শিক্ষিত মন নিজের ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ। আমার প্রাপ্য আমাকে দিতে পারেন নি—তাই আমার কাছ থেকে নিতে লজ্জিত।"

"কিছু দিনের মধ্যেই বুঝে নিলাম—নারী-জীবনের এক ধাপ পেরিয়ে আমাকে যেতে হবে—নারী প্রথমে থাকে কন্যা, তারপর সে হয় পত্নী এবং এরপর আসে মাতৃত্ব। এ সংসারে আমার প্রয়োজন হয়েছিল পত্নী হিসাবে নয়—মাতৃত্ব হিসাবে।"

"হয়তো নারী-জীবনের ইহা একটা বিড়ম্বনা। কিন্তু জানিস অমলা—আমার আজ মনে হচ্ছে—নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ও গৌরব তার পত্নীত্ব নয়, তার মাতৃত্ব। নারী,—যতই তার বয়স কম হ'ক না, যে-কোন

সম্পর্কেই সে দাঁড়াক না—সে চায় তার অন্তর দিয়ে সেবা করতে, স্নেহ ও আদর দিতে। বোধহয় স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কেও তার এই মাতৃত্বই প্রবল হ'য়ে ওঠে। কত সখীদের কাছে তাদের দাম্পত্যজীবনের যে সব বিষাদের কাহিনী শুনেছি তারও মূলে দেখেছি, তাদের পত্নীভাবের গুরুতা নয়—সে দিকে হয়ত অপরিমিত পরিমাণেই তারা পেয়েছে; কিন্তু তাদের মাতৃভাবের দাবী যখন মিটে নাই, তখন তাদের পত্নীভাবের পাওনা তাদের পক্ষে হ'য়ে উঠেছে অপমানের। শুধু পত্নীভাবে নারী এমন পর্যায় গিয়ে দাঁড়ায়, যা কোন নারীই সম্মানের বা মর্যাদাজনক মনে করে না।"

"হয়তো ঈশপের গল্পের শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের কাহিনী স্মরণ করতে বলবি; কিন্তু আমিও বলছি একবার ভেবে দেখিস। যদি অবসর পাস একবার নিজের মনটা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিস।"

"তোদের কাছে যখন তোদের খোকা-খুকীদের কথা শুনতাম, যখন তোদের কোলে তাদের দেখতাম, তখন সত্যই আমার ক্ষুধার্ত মন কেঁদে উঠত। এখানে এসে দু'টি নিঃসহায় মাতৃহীন শিশুকে পেলাম। আমার মন তাদের বুকে নিল। তারপর আমার পত্নীত্বের দাবী যখন প্রত্যাখ্যাত হ'ল, তখন আমার মাতৃত্বের বুভুক্ষিত-ভাও আরও ভ'রে উঠল।"

"খুকীটা সহজেই বশ মানল—সে আমাকে মা ব'লে স্বীকার করল। তার মুখের মা ডাক, তার আবদার আমার জীবন-উদ্যানের একমাত্র কমল—আর সবই পড়ে রইল উষর। কিন্তু খোকাটা বিদ্রোহী হ'য়েই রইল। এতদিন এই বিদ্রোহীকে জয় করবার সাধনায় আমার কেটেছে। এই ক্ষুদ্র বালক যখন আমার মাতৃত্বকে অস্বীকার ক'রে চলে যেত, কি ব্যথা যে বুকে বাজত। এক একদিন কেঁদে ফেলেছি। নিজের অজ্ঞাতে কত সময় মনে হয়েছে, ওর খুব একটা শক্ত অসুখ করলে...অমনি মন সজাগ হ'য়ে শিউরে উঠত। শত ধিক্কারে নিজেকে ধিক্কৃত করতাম।"

"তারপর সত্যই ওর অসুখ করল—অনেকদিন ভুগলো। এই অসুখের মধ্যে আমি আমার খোকাকে পেয়েছি। আমার খোকা...শুনে হয়ত তুই হাসছিস। হয়ত বলবি দুধের সাধ ঘোলে মিটাচ্ছি। কি আসে যায় তাতে—সাধ ত' মিটছে—কোনোদিন যে দুধের স্বাদ পায় নাই, তার পক্ষে ঘোল দিয়ে সাধ মিটানোতে দুঃখের ত কোন কারণ নেই।"

"খোকা আমার কক্ষ শয্যায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে—কিন্তু মুঠোর মধ্যে আমার আঁচল ধরা আছে—পাছে চ'লে যাই।"

"আজ আমি সত্যই বিজয়িনী। কার উপর জয়ী হয়েছি...এক বিদ্রোহী শিশুর উপর। এর আনন্দ তোরা বুঝবি না। তোদের গর্ভ যন্ত্রণা ও প্রসবযন্ত্রণার চেয়ে আমার এতদিনের যন্ত্রণা কিছু কম নয়। যে শিশু আমার আঁচল আশ্রয় ক'রে নির্ভয়ে ঘুমাচ্ছে, আমার দেহের কামনা, হৃদয়ের বাসনা দিয়ে তাকে গ'ড়ে তুলেছি। এ আমার সৃষ্টি... ..."

"কিন্তু একটা ব্যথা এতেও বাজে। যে অভাগিনী একে জন্ম দিয়েছিল—আজ শিশু-হৃদয় থেকে তার স্মৃতিটুকু মুছে ফেলেছি। ভয় হয় দিদি হয়ত শিশুর অকৃতজ্ঞতায় ও আমার পরাপহরণে অভিশাপ দেবেন। কিন্তু আবার ভাবি—মাতৃ-হৃদয়ের মধ্যে ত' একটা অখণ্ড সংযোগ আছে। যে আদি জননী—যিনি সমস্ত সৃষ্টির আদ্যাশক্তি—আদিম যুগ থেকে উপকথায়, ধর্মকথায়, দর্শনে, সাহিত্যে যে মাতৃরূপের কল্পনা মানুষ ক'রে এসেছে, তা ত' একটা অচ্ছেদ্য সম্ভূতি। শিশু-হৃদয়ের মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মিটিয়ে ত' আমি মাতৃধর্মই পালন করেছি....."

"একটা কথা মনে পড়ল—দিদির একখানা ফটো ঘরে ছিল। তার দাদা সেখানা নিয়ে গিয়েছেন। হয়ত এ সংসার থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করার সহায়তায় ওজুই। স্বামীর সঙ্গে দিদির সম্বন্ধে কোন আলাপ কোন দিনই করতে পারি নি। কথা তুললেই ঘুম বা কাজের ভাণ করেন বা অন্য কথা পেড়ে ও-প্রসঙ্গ বন্ধ করে দেন। হয়ত তাঁর অন্তরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারা আছে

এবং থাকবেও। একমাত্র এই খোকা তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাও আজ মুছে গেল.....মানুষ এমনি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে সংসার থেকে মুছে যায়—আর অপর সব মানুষ তাতে সাহায্য করে। কি নিষ্ঠুর পরিণতি.....”

“আর না, আমার খোকন উঠেছে—আর লিখতে সে দেবেনা। তার আধো-জাগা চোখ মুখ দেখতে কেমন একটা আবেশ এনে দেয় আমার মনে। এখনই তার পাশে শুয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমার সমস্ত স্নেহের কামনা দিয়ে তার সর্বাঙ্গ চুমিয়ে দিতে হবে। নইলে তারও তৃপ্তি নেই—আমারও নেই।”

“আজ আসি। ভালবাসা জানিস। তোদের সব খবর দিস।” ইতি।

তোর—

উমা

সন্তুর অসুখ সেরে যাবার কিছুদিন পর বিনয় এদের বাড়ী এসেছে। গোপা ছুটে এল—'মামা এসেছে রে দাদা, মামা এসেছে।” সন্তুও এসে মামার হাত ধরল। বিনয় কতকগুলি মৌসুমি ফল নিয়ে এসেছে। কলিকাতায় এ-ফল তখন সবে মাত্র আসতে সুরু করেছে। ঘরে বসে বিনয় একটা ফল ছিঁড়ে ওদের খেতে দিল। সন্তু ইতস্তত করছে দেখে বিনয় বলল, খেয়ে দেখ, বেশ ভাল। সন্তু বলল—মাকে জিজ্ঞাসা করে নি, মা যে বলেছে তাকে না ব'লে যেন কিছু না খাই।” বিনয় কি বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় উমা এসে উপস্থিত হ'ল।

বিনয় বলল—“এই দেখ তোমার ছেলের কীর্তি;—ঐ মৌসুমি নেবুটা খুলে দিয়েছি, মার কাছে না ব'লে খাচ্ছে না।” উমা একটু লজ্জিত হ'য়ে বলল—“হাতে করে রেখেছিস কেন, খা।”

সন্তু—“তুমি না তোমাকে না বলে কিছু খেতে বারণ করেছিলে।”

উমা—“খোকা কোথাকার, তার জন্ত বুঝি মামা বললেও খেতে নেই।”.....তারপর বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল—“আপনি এদের নিয়ে বসুন, আমি চা ও খাবার নিয়ে আসি।”

বিনয় বলল—সে ভয়েই ত' বাসা থেকে খেয়ে আসি নি; তুমি ছাড়বে না। তোমার বৌদি কি বলছিল, উমা, জান?”

উমা—“কি বলছিল, বৌদি?”

বিনয়—“আমি যখন বললাম, আজ কেবল এক পেয়ালা চা খাব—আর কিছু খাব না, উমার ওখানে গেলে ত' না খাইয়ে ছাড়বে না। তোমার বৌদি বলছিলেন—পেটুক কোথাকার, বোনের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাবার সখ দেখ—আচ্ছা, যদি উমা তোমাকে শুধু এক পেয়ালা চা-ই দেয়, তবে কি করবে?”

উমা—“বৌদি একথা বলতে পারে না। বলে থাকলেও আপনাকে খ্যাপাবার জন্ত বলেছেন। আপনি কি জবাব দিলেন?”

বিনয়—“তা আর শুনে কি হবে—যখন আমাতেই বিশ্বাস করলে না, তখন আর আমার জবাব শুনে কি করবে। যাও, তার চেয়ে খাবারই নিয়ে এসো, একজন বলছেন পেটুক, একজন মিথ্যাবাদী.....বেশ!”

উমা একটু হেসে বলল—“আচ্ছা বসুন, খাবার ও চা নিয়ে আসি তারপর দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই আপনার বন্ধুও হয়ত এসে পড়বেন।”

উমা চ'লে গেল। সন্তু ও গোপা মামাকে নিয়ে পড়ল। সন্তুর গায় একটা Jumper—সগৌরবে সে বলল—“মা বানিয়ে দিয়েছে।”

গোপা বলল—“শুনছ মামা, দাদা এখন মাকে মা বলে।”

বিনয়—বিস্ময়ের ভান করে বলল—“তাই নাকি? তারপর, আর মা সম্বন্ধে কি বলে?”

সন্তু—“যা, গোপা দেখ, ফের যদি ফাজলামি করিস।”

গোপা তার ছোট কালো চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলল—“মা দাদাকে বলে বাবা, বাবাধন, আর দাদা যখন ঘুমায় তখন কেমন ক'রে তাকিয়ে দেখে, দেখে

আস্তে ওর কপালে একটা চুমো দেয়।"

বিনয়—"আর তোমার বুঝি হিংসা হয়?"

সন্তু—"তোকেও ত' দেয়, আর মা ওকে বলে মা, মামণি।"

তারপর সুরু হ'ল তাদের নূতন মামার কথা—উমার ছোট ভাই। সে খু-উ-ব ভাল এবং ওদের খু-উ-ব ভালবাসে। অনেক ছবির বই এনে দেয়.....

উমা খাবার নিয়ে এল। বিনয় বলল—"মহা ঝগড়া লেগে গিয়েছিল—মা কাকে বেশী ভালবাসে, উভয়েরই দাবী—উভয়কে বেশী ভালবাসে। আবার শঙ্কা ও হিংসাও আছে, হয়ত বা অপরকেই বেশী ভালবাসে।"

উমা ছেলেমেয়েদের কোলের কাছে নিয়ে একটু হাসল। বিনয় খেতে বসে গোপাকে সাথে ডেকে নিল—সন্তুর ভাগে বাছাই করা কিছু মিলল। বিনয় বলল—"সন্তুর Jumper-টা কি ওর রায় সাহেবী খেতাব?"

উমা—"কেন?"

বিনয়—"বিদ্রোহী ঠিকমত বশ মেনেছে, তাই খুশী হ'য়ে বখসিস্ দিয়েছ?"

উমা—"আপনি বড্ড দুষ্টু।"

* * *

অনেকদিন বিনয় এ-বাড়ী আসে না। ডেকে পাঠালে আসে—কিন্তু সে যেন অন্য মানুষ। অথচ উমার প্রতি বা ভাগনে-ভাগনীর প্রতি তার কর্তব্য ও স্নেহের এতটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে মনে হয় না। নিজে যেমন আসে না, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে উমাকে তার বাসায় যেতে হয়।

সেদিন উমা এসেছে। বিনয় তখনও কাজ থেকে ফেরে নি। সে মীরার সঙ্গে গল্প করছে। সন্তু ও গোপা বিনয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাইরে ছুটাছুটী করছে উমা বলছে—"বৌদি, দাদা এখন আমাদের ওখানে যান না কেন?"

মীরা—"বোধহয় সময় পান না। তোমাদের পাড়ার সেই বৌটীর শেষে কি হ'ল?"

উমা বুঝল মীরা ঐ প্রসঙ্গের আলোচনা এড়াবার জন্য অন্য কথা পাড়ছে। সে বলল—"জানিনা, ও কথা ছেড়ে দিন। দাদা আমার উপর কেন রাগ করেছেন তাই বলুন।"

মীরা—"দাদা-বোনের ব্যাপার—আমি কি জানি ভাই।"

উমা—"আচ্ছা, জানেন আপনারা সবাই। আপনিও জানেন, অথচ চেপে গেলেন; বাসার কর্তাটিও জানেন—তিনি চেপে যান। আজ দাদার সঙ্গেই বোঝা-পড়া করব—কি অপরাধ আমি করেছি?"

মীরা সস্নেহে বলল—"উমা, এটুকু বলতে পারি, তোমার উপর তিনি রাগ করেন নি, বরং অন্তরের সহিত তিনি তোমাকে স্নেহ করেন।"

বিনয় এলে তার কাছে উমা আবদারের সুরেই বলল—"কেন রাগ করেছেন দাদা, বলুন কি আমার অপরাধ?" উমার দুই চোখ বেয়ে ব্যথার ধারা বইতে লাগল।

বিনয় কতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যার আকাশ চারিদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে, ধূর্তার কুণ্ডলী প্রত্যেক বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। ঘরের মধ্যে ওদেরও চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে। বিনয় এগিয়ে উমার মাথায় হাত রেখে বলল—"উমা, আমার উপর জুলুম করো না—আমাকে দণ্ডও দিও না। ওদের নিয়ে সপ্তাহে একবার ক'রে এসো আমার সমস্ত অন্তরের স্নেহ দিয়ে তোমার শুভ-কামনা করি তোমার উপর এতটুকু রাগ করি নি বোন। আমার নিজের অন্তরের সঙ্কীর্ণতার জন্য লজ্জিত।"

একটু থেমে সে বলল—"উমা, সন্তু ও গোপার মাতৃ-অভাব দূর করেছ, এটা যে আমার কত বড় সান্ত্বনা তা হয়ত তুমিও বুঝবে না। জীবনে তুমি সুখী হও—আর ওদেরও সুখী করো—এটা আমি খুব অন্তরের সহিত কামনা করি। তোমার নিজের দাদা থাকলে তোমার যতটা মঙ্গল কামনা করতেন, আমি তার চেয়ে কম করি না। সত্যই তুমি আমার ছোট বোন। আর কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করো না বা অনুরোধ করো না।"

একটি ক্ষীণ হাসির রেখা দিয়ে তার মুখের মেঘ-ভারকে আলিয়ে তুলে উমা বলল—"বেশ তাই হবে, দাদা। অন্যায় ক'রে আমায় শাস্তি দিবেন না—এ-ই আমি কেবল দাবী করব।....."

উমা চলে যাবার পর বিনয় ব'সে ভাবছিল কোন্‌টা ভাল—সেই আগের দিনের নিষ্ঠুরা ক্রূরা সৎমা না এখনকার স্নেহপরায়ণা শিক্ষিতা সৎমা। তারা অত্যাচার করত শিশুর দেহের উপর, আর এরা জুলুম করছে শিশুর মনের উপর। শিশুর মন থেকে মায়ের স্মৃতি মুছে ফেলা—এটাই বেশী নিষ্ঠুর না তার দেহকে লাঞ্ছিত করে ও তার মাতৃ-স্মৃতিকে সজাগ থাকতে দেওয়াই বেশী নিষ্ঠুর।

তার আদরের বোন প্রভা দু'বছর হ'ল মরেছে। এরই মধ্যে তার সমস্ত চিহ্ন ঐ মেয়েটি এসে মুছে দিয়েছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত যে গৃহ গড়ে তুলতে তার সমস্ত যৌবন-শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল, দু'বছরের মধ্যে সেখানে আজ সে নিশ্চিহ্ন। স্বামী আজ তার নয়, তার পুত্রকন্যা পর্যন্ত তার নয়। অথচ সে নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে উমাকে ও-গৃহে এনেছিল। সে-ই উমাকে বলেছিল, ও-দুটি মাতৃহারা শিশুর মাতৃস্নেহ-তৃষ্ণা যেন উমা মেটাতে পারে। উমা পরিপূর্ণভাবে সে তা করেছে—কি নিষ্ঠুর সে! তার দু'চোখ বেয়ে প্রভার জন্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল—তার মাতৃহারা ছোট বোনটি কোথায় কোন বিস্মৃতির গর্ভে ডুব দিয়েছে। উমার প্রতি সন্দেহ ব্যবহার করলে যেন প্রভার স্মৃতির প্রতি অন্যায় করা হয়। অথচ বেচারী উমা—কি তার অপরাধ, যে এমনি ক'রে তাকে সে শাস্তি দিচ্ছে।.....

.....না, এও তার পক্ষে অন্যায়। মৃতের স্মৃতির জন্য জীবিতের হৃদয়ের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া অন্যায়।..... যে মুছে গেছে, একটি ক্ষীণ বুদ্বুদ ক'রে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? মৃতের চেয়ে জীবিতের দাবী বড়। মৃত মিশে যায় জীবিতের মধ্যে—সার্থক হয় নবাগতের মধ্যে। এই ত' জীবনের ধর্ম। আজ উমাকে অসম্মান ক'রে, প্রভাকে মর্যাদা দেওয়া যায় না।

সিন্দুর ডাক

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বানুবৃত্তি

হেমন্তের প্রভাত।

নতুন আমন ধানের মত তার স্নিগ্ধ স্বর্ণ বিভা। মাঠে মাঠে কাস্তে হাতে কৃষকেরা মহা ব্যস্ত। ধান কাটার সময় হয়েছে। আশে-পাশের ধান ক্ষেত থেকে উল্লসিত চাষী যুবকের গ্রাম্য-গীতি শোনা যায়!

"ওরে ভাইরে;
শাওণ মাসে বুইনলাম ধান;
ভাদর মাসের জলো।—
অঘ্রাণ মাসে সেই ধান্য
ঘরে লইলাম তুলো"—

হেমন্তের সেই সোণার ফসল ফলা, রূপার শিশির ঝরা আতপ্ত সকালে তাণ্ডী এল তার মায়ের সঙ্গে চৌধুরী বাড়ী থেকে বিদায় নিতে। কমলা তাণ্ডীকে বললেন, "যা ত' মা সূর্যকে ডেকে নিয়ে আয়"? তাণ্ডী আজ পরেছে জরীর বুটীদার দেওয়া একখানা রক্ত বর্ণের চাকাই শাড়ী। মাথার কোঁকড়া চুলগুলি কপালের উপর পাতা কেটে পিছনে টান করে খোঁপা বাঁধা। গায়ে পড়েছে তার মায়ের সমস্ত অলঙ্কারের গহনা। কমলা তার পাতা কেটে আঁচড়ানো চুলের উপর পরিয়ে দিলেন একটী মুক্তোর টিক্‌লি। তাণ্ডীর শ্বেত শুভ্র কপালে মুক্তো দিয়ে বাঁধানো অপরূপ হীরের টিকলিটী ঠিক মহাদেবের ত্রিনেত্রের মত ঝক ঝক করে জলতে লাগল। তাণ্ডীর মা মৃদু অনুযোগ করে বললেন, "তোমার দেওয়ার কি আর শেষ নেই দিদি? ও মেয়ে ত' চৌধুরী বাড়ীর খেয়েপরেই মানুষ"—

কমলা বাধা দিয়ে বললেন, 'ওকথা বোলনা ফুল। বাপহারা মেয়ে; আজ এমন দিনে যদি ঠাকুরপো বেঁচে থাকতেন, তাহলে এমন করে মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কি তুমি বিয়ে দিতে পারতে? কত সাধ আহ্লাদ ছিল আমাদের মনে।" দুই সখীর চোখের জলে মুখ ভিজে উঠল। সন্তান যে কি জিনিষ সে এক মাত্র মা ভিন্ন আর কে বোঝে? তার মধ্যে কন্যা সন্তান ত আরও। অধিক দিন ঘরে রাখাও যায় না, আবার পরের ঘরে দিতেও বুক ভেঙ্গে যায়। সেই একমাস থেকে, দশমাস পর্যন্ত পেটে রেখে; তারপর ভূমিষ্ট হলে তিল তিল করে প্রতিদিন মানুষ করা—তারপর তাকে চিরদিনের মত সমস্ত সত্ব ত্যাগ করে তুলে দিতে হবে পরের হাতে। সন্তান বড় হয় ঠিকই; কিন্তু মা'দের কাছে সে চিরদিন শিশুই থেকে যায়। তাই মায়ের মনে এত উৎকণ্ঠা—ভিন্ন পরিবারে গিয়ে তাঁর শিশুটী সব সময় সব জিনিষ পাবে ত? হায়রে অবোধ মা, সন্তানের মায়ায় তিনি ভুলে যান্ যে তিনিও একদিন আপনজন সকলকে ছেড়ে এই পরের ঘরে এসেছিলেন; তাঁকে বিদায় দিতে তাঁর মায়ের মনেও এই রকম কঠিন দুঃখ বেজেছিল। কিন্তু আজ? সেদিনের সেই পরের ঘর তাঁর, নিজের চির জনমের ভিটা, চির আপনার তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। এমনিই হয়। আঁচলে নিজের চোখ মুছে ফুলরাণীরও মুছে দিয়ে কমলা বললেন, "দুঃখ কোরনা ফুল, মেয়ে তুমি ভালো ঘরে দিচ্ছ; দেখো ও ঠিক সুখী হবে"।

"তোমাদের আশীর্বাদই ওর জীবনের পাথেয় দিদি"—মেয়েটা গেল কোথায়? এখনও আসছেনা কেন? সূর্য কি তোমার বাড়ী নেই দিদি"?

"ঠিক বলতে পারছিনে ফুল; চল ত ওর ঘরে গিয়ে দেখে আসি একবার।" দুই সখীতে সূর্যর পড়ার ঘরে আসার সময় দূর থেকে দেখতে পেলেন, ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তাণ্ডী। সুন্দর মুখখানি তার চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। তা সত্বেও সে থুতনির নীচে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলছে, "আড়ি, আড়ি, আড়ি, সূর্য দা তোমার সঙ্গে আড়ি। সে দৃশ্য দেখে দুই মায়ের চোখের কোলে ফুটে উঠল বিচিত্র এক হাসি। কমলা ছুটে গিয়ে, ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, সূর্য ঝগড়া করেছে, নারে তাণ্ডী?"

তাপ্তী কোনও উত্তর দিতে পারল না। শুধু তাঁর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অজস্র ধারায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কমলা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন, "সূর্য"—

কিন্তু ঘরে কেউ নেই। তাঁর ডাক শুনে ভৃত্য এসে বললে, "ছোটবাবু ইস্কুলের মাঠে প্যারেড করতে গিয়েছেন।"

ফুলরাণী এগিয়ে এসে কমলার হাত চেপে ধরে বললেন, "সূর্যর সঙ্গে এখন আর দেখা হোলনা দিদি। সে এলে বোল আমার কথা, তাপ্তীর কথা—এবার তাহলে আসি দিদি, দেরী হলে আবার ট্রেণ ধরতে পারবোনা।" কমলা বললেন," "এস বোন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, শুভকাজ নির্বিঘ্নে হয়ে যাক"—তারপর তাপ্তীর মুখ তুলে ধরে বললেন, "পাগলী মেয়ে আজকের দিনে কাঁদে নাকি? সেজেগুজে আজ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, বোকা সূর্যটা একবার দেখতেও পেলনা। ফিরে এসে তুই আচ্ছা করে বকে দিস ওকে"—

ফুলরাণী ডাকলেন, "মাসীমাকে প্রণাম করে এস মা? দেরী হয়ে গেলে পথে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে"—

তাপ্তী কমলাকে প্রণাম করে মুখ নীচু করে মায়ের সঙ্গে চলে গেল। শুধু রেখে গেল কমলার পায়ের উপর কয়েক ফোঁটা তার দুঃখের অশ্রুজল। তাপ্তীর এই ক্রন্দনের হেতু কমলা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, খেলার সাথী সূর্যকে এবং আবাল্য পরিচিত এই চৌধুরী বাড়ীকে ছেড়ে যেতে বালিকার ক্ষুদ্র মন বেদনায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের এই কাহিনী মুখে সে কিছু প্রকাশ করতে পারছে না—কেননা সে সম্বন্ধে ওর মনে এখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা জন্মায়নি। মাত্র দ্বাদশী বালিকা। ফুলরাণীদের পাল্‌কী ধানক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কমলা বললেন, "তুই যদি আমাদের জাতও হতিস, তাহলে সূর্যর পাশ থেকে আর আমার বুক থেকে কেউ তোকে কেড়ে নিতে পারত না—তোর যে অন্য জাত মা! জানিস না ত, চৌধুরীদের বংশ মর্য্যাদা জীবনের চেয়েও মূল্যবান"।

প্যারেড করে মহদান থেকে ফিরে আসার পথে সূর্যর হঠাৎ মনে হোল, তাপ্তীর কথা। কাল বিকেলেই একবার যাওয়া উচিৎ ছিল। আহা বেচারী, এইটুকু বয়েসেই ত বিধে ঘরে চলে যাচ্ছে। কার সঙ্গেই বা খেলবে? সূর্য এপথ ওপথ ঘুরে ফুলরাণীদের বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। বাড়ীর সব ঘরে তালা বন্ধ। উঠানে বসে শুধু একটী রাখাল গরু কাটছিল। সূর্য তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো "গোপী মাসীমারা কোথায় রে?"

গোপী সূর্যকে দেখে সসম্ভ্রমে দীর্ঘ এক নমস্কার করে বললে, "তাঁরা এইমাত্র চলে গেলেন। কাল দুপুরে আনন্দ নগরে পৌছাবেন"।

সূর্য আর কোনও কথা না বলে মেহেদী বেড়ার পাশের পথ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। যাক্, বাঁচা গেছে। সত্যি তাহলে ওরা চলে গেছে—একবার দেখাও করে গেলনা মেয়েটা। শুধু ঝগড়া করার বেলাতেই আছে—নানা প্রবোধবাক্যে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সূর্য বাড়ী পৌছালো।—

তাকে দেখে কাকীমা বললেন, "ছুটীর দিনেও তুই বাড়ী থাকিস না সূর্য? সাত সকালে গিয়েছিলি কোথায়"?

সূর্য বললে, "ইস্কুলে গিয়েছিলুম প্যারেড করতে। কেন কি হয়েছে কাকীমা"? কমলা বললেন, "তোর ফুল মাসীমা তাপ্তীকে নিয়ে এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার জন্য। অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তাপ্তীর যে বিয়ে রে"! সূর্যর মনের ধারণা এতক্ষণে নিশ্চয়তা লাভ করল। তার সমস্ত মন একবাক্যে সায় দিয়ে বললে, সত্যিই তাপ্তী এ-গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে; আর ফিরে আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটাও কেমন যেন খালি খালি মনে হতে লাগল। ওর কেবলই মনে হতে লাগল তাপ্তীর সঙ্গে আর ও খেলতে পাবেনা। তাপ্তীকে গল্প শুনিয়ে তার পরিবর্তে ওর কাছে মিষ্টি আমসত্ত্বও আর লুকিয়ে চেয়ে চেয়ে খাওয়া হবেনা। হায়, ওর যদি

একটা ওই রকম নিজের বোন থাকত? বোনের অভাব মনে হতেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একখানি সুন্দর মুখ আর সঙ্গীতমুখর মধুর কণ্ঠস্বর। সূর্য অন্যমনস্ক হয়ে কমলার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে স্নান করতে চলে গেল।

এমনিই হয়। সংসারে কোনও কিছুই অপূর্ণ থাকে না। আর মানুষের মন, সে তো সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। সে সকল সময়েই পূর্ণ। আঘাত পেয়ে যারা বিলাপ করে—আমার মন শূন্য; ব্যর্থ আমার জীবন; আমার মনে কোনও দিনই শান্তি ফিরে আসবে না; ইত্যাদি—তাদের সে উক্তির কোনও যথার্থতা নেই। তারা মন বলতে বোঝে শুধু নিজের কামনাকেই। কোনও অবস্থাতেই মানুষ মনের কোনও ক্ষতি করতে পারেনা। কারণ মনে যে স্বয়ং পরম ব্রহ্মের অবস্থান। সূর্যের মনের তাল্তীর আসনও বেশীক্ষণ শূন্য রইল না। সে আসন সসম্মানে পূর্ণ করল এসে সীতাপুর গড়ের মেজো কুমারের মেয়ে শিউলী রাণী। নাচে, গানে, ব্যবহারে ও রূপে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সে অদ্বিতীয়া। কিশোর সূর্য, অধ্যয়নের মধ্যে আবার নিমগ্ন হোল।

এবারে খুব শীত পড়েছে। সকাল বেলা সেই আটটা পর্যন্ত কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বনে প্রান্তরে সর্বত্র রুক্ষ পাতা ঝরার গান। মাঠের ঘাসগুলোর পদস্থ কোনও শ্রী নেই। হলদে বিবর্ণ হয়ে কোনও রকমে যেন বেঁচে আছে। ন্যাড়া আমড়া গাছটার দিকে চোখ পড়লেই সূর্যর এককোপে ওটাকে কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে। দাঁতে নিমের কাঠি লাগিয়ে পাট ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য রোজ আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নদীর উত্তর পাড়ে গাড়ো পর্বত শ্রেণীর দিকে। ওর ভারী ভালো লাগে ওই পাহাড়ে উঠতে। ওখানে নাকি খুব বড় বড় হাতী পাওয়া যায়। সূর্যদেরও আগে হাতী ছিল। প্রতি বছর শীতের সময় ওর বাপ ঠাকুর্দারা হাতীর পিঠে হাওদা দিয়ে, ওই গাড়ো পাহাড়ে শিকার করতে যেতেন। সে-সব গল্প সূর্য শুনেছে তার কাকীমার কাছ থেকে। তারপর যে বছর ওর বাবা মারা গেলেন সেই বছরই বড় হাতীটা গেল পাগল হয়ে। একদিন সে নাকি তার প্রিয় মাহুত রতনকে শুঁড়ে তুলে ধরে আছাড় মেরেছিল। রতনের অনেক চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু সে বাঁচেনি। তারপর একদিন হাতীটাও মরে গেল। সূর্যর বড় ক্ষোভ, কৃষ্ণশরণ কেন আর একটা হাতী কেনেন নি? ও বড় হয়ে আসামে থেকে হাতী আনাবে। তারপর সেই হাতীর পিঠে চড়ে যাবে গাড়ো পাহাড়ে শিকার করতে। বড় বড় কামান বন্দুক ওর সমস্ত থাকবেই ত। কেননা ও ত বড় হয়ে সৈন্য হবে। দেশের জন্য যুদ্ধ করবে। ও অনেক দূরদেশে যাবে; অনেক দেশ দেখবে, মানুষ দেখবে। আর একটা কথা, একথা সূর্য গোপনে তার কাকীমার কাছে বলেছে। ও বড় হয়ে কৃষ্ণশরণের মত বাড়ীতে বসে থাকতে পারবে না। তিনি যা কাজ করেন সূর্য ওসব কাজ করতে পারবে না। কিন্তু ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা দীপ জ্বালার কি হবে? তাইত, মেয়ে মানুষ প্রদীপ দিলে কি হয়? সূর্য বুঝতে পারেনা, একি অদ্ভুত নিয়ম! কেননা মা ভবানীও ত মেয়ে-মানুষ। তবে তাঁর মন্দিরে মেয়ে মানুষে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালালে দোষ কি? ওসব কাজ মেয়ে মানুষেরই; হায়, সূর্যর যদি একটা ছোট বোন থাকতো, তাহলে সে তার উপর এই মন্দিরের দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে থাকতে পারতো। যাহোক এখনত ওর কোনও ভাবনা নেই। কাকা, কাকীমা, লক্ষ্মীদিদি সকলেই আছে। এখন ওদের ভাবনা ওরাই ভাবুক। সূর্যর এখন আরও অনেক-গুলি বই চাই। ফরাসী দেশের কথা ওর এখনও সমস্ত জানা হয়নি; আজই কোলকাতায় চিঠি লিখতে হবে। সূর্য ব্যস্ত হয়ে নিমকাঠী পাটক্ষেতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ধুতে যায়। রোজই এই ব্যাপার ঘটে। সকালে এই পাট ক্ষেতের ধারে এসে দাঁড়ালেই সূর্যর মাথায় সব অসম্ভব খেয়াল এসে বাসা বাঁধে। এদিকে বাড়ীতেও হয়েছে সূর্যর মহা মুস্কীল। বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো তার নিষেধ। অরুণের সঙ্গে তার বহুদিন হোল দেখা হয়নি। বেচারা ইস্কুলেও

আসে না। কি হয়েছে তার কে জানে? তাস্বীটাও নেই, যে তার সঙ্গে একটু গল্প করা যায়। এখন শুধু শুয়ে পড়া ছাড়া আর কোন কাজই নেই। ইস্কুলেও পড়া, বাড়ীতেও পড়া। সূর্য বিরক্ত হয়ে সেচ্ছাসেবক দলের থেকে নিজের নাম কাটিয়ে নিয়েছে। কেননা, ওরা দল নিয়ে বড় কলহ করে। একদিন সূর্যদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কয়েকটি কংগ্রেসের অহিংস স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে লেগেছে তুমুল তর্ক। দুইজনের দুই মত। একজন বলে, "ওঃ, বন্দুক ছোঁড়া শিখে কি কোরবে? দেশের লোকের গুলী-বারুদের কারখানা আছে? একটা বন্দুক রাখতে হলে ইংরেজের কাছে লাইসেন্স নিয়ে তবে রাখতে পারবে। এ অবস্থায় যুদ্ধ করতে শিখে লাভ কি?" অপর পক্ষ বলে, "নিশ্চয়ই লাভ আছে। আমরা আগে গুলী চালাতে শিখে তারপর দেশে গুলী-বারুদ তৈরী কোরবো। বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তোমাদের কোনও ধারণা নেই"—

কংগ্রেসীরা উপেক্ষা ভরে বলে "তার জন্য আমরা মোটেই দুঃখীত নই। আমাদের দুঃখ—তোমাদের অপরিণামদর্শীতা দেখে। তোমরা ভাবছ, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা খুবই সোজা; কিন্তু মোটেই সোজা নয়। ওরা স্বাধীন শক্তিশালী জাতি। আরও কত স্বাধীন দেশ ওদের বন্ধু। ওদের সেই অসংখ্য গোলা-গুলীর সামনে তোমরা কতক্ষণ টিকতে পারবে ভাই? তার চেয়ে অহিংস ভাবে সত্যাগ্রহ করা অনেক ভালো। তার ফল হাতে হাতে না পেলেও, দেরীতে পাওয়া যায় ঠিকই"—

একটী বড় ছেলে বললে, "তোমাদের অহিংস নীতিতে স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু তার বহু দেরী। আমাদের কাজ হাতে হাতে। অহিংস মানে, হিংসা কোর না, অত্যাচারের প্রতিবাদ সরবে না ক'রে নীরবে কর। কিন্তু ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী যারা জানে, তারা ওদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। মহারাজ নন্দকুমার, বীর ক্ষুদিরাম বোস, রাজেন লাহিড়ী, সূর্য সেন এদের ফাঁসী দিয়েছে ইংরেজ। জালিওয়ানাবাগে আর হিজলী জেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ক'রে ইংরেজ চেয়েছে আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখতে। কিন্তু তা হবার নয়; তাদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী আমাদের রক্তে রক্তে লেখা আছে। আমরা জানি ওরা কত বড় ধূর্ত। ওদের শায়েস্তা করতে হলে, ওদের মতই শক্তিশালী হতে হবে"।

একজন সত্যাগ্রহী ছেলে বললে, "হ্যাঁ, তোমাদের শক্তি কত জানা আছে। একটা সাহেবকে মেরে; চির জীবন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো"—

সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবক উত্তর করল; "হ্যাঁ, তোমাদের মত সত্যাগ্রহ করে, আমরা মাটীতে পড়ে ইংরেজের বুটের লাথি খাই না"—

সত্যাগ্রহীরা রেগে উঠল। "কি, এতবড় আস্পর্দ্ধা; মহাত্মা গান্ধীকে তুমি অপমান করলে?"

বামপন্থীরাও রুখে উঠল। "মহাত্মা গান্ধী চির নমস্য। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তাঁর নীতিতে আমাদের শ্রদ্ধা নেই"—

দক্ষিণপন্থীরা অহিংস থেকে উত্তর করলে, "বেশ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের আজ থেকে আর কোনও সম্বন্ধ নেই। আমরা সম্পূর্ণ আলাদা"—

বামপন্থীরা বললে, "বেশ আমরাও তাহলে এখানে প্যারেড করব না। ফুটবল গ্রাউণ্ডে ব্যবস্থা করে নোব"—

এমনি ভাবে ছাত্রদের মধ্যে দুইটী দল গঠন হয়ে গেল। ফলে কাজের থেকে তারা অকাজেই সময় কাটাতে লাগল বেশী। অর্থাৎ কে বড়, কে ছোট; সেই নিয়ে আড়ালে, সম্মুখে চলতে লাগল তুমুল প্রতিযোগীতা। অহিংসরা ভুলেও মারামারি করেনা, মুখেই নিদারুণ সংগ্রাম করে। আর হিংস্রেরা তাইতে অধৈর্য হয়ে প্রতিমুহূর্তে সুযোগ খুঁজে বেড়ায় হাতাহাতি মারামারি করে এর একটা মীমাংসা করে নিতে। কিন্তু কোনও পক্ষই আদর্শচ্যুত হয়না—ফলে মীমাংসাও হয়না। কলহের আগুন দুইদলের মনে দুখের আগুন জ্বেলে দিল। এসব দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে সূর্য স্বেচ্ছাসেবকের

দল থেকে নাম কাটিয়ে দিল। রোজ সকালে প্যারেড করতে সে স্কুলের ময়দানেও যায়না, ফুটবল গ্রাউণ্ডেও যায় না। পূর্ণকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের কাঁড়ীর পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো। সেখানে নানা জাতির সিপাহীরা রোজ সকালে উঠে মার্চ করত, নানা রকম শরীর চর্চা করত, সূর্য বিস্মিত হয়ে দেখত; তারপর বাড়ী ফিরে নিজে নিজে সেগুলি অভ্যাস করতো। এতেই সে মনে শক্তি ও আনন্দ পেতে লাগল প্রচুর।

এই সময় একদিন কমলা তাকে ডেকে বললেন, "ওরে সূর্য, তুই যে কোলকাতায় পড়তে যাবি"—

সূর্য প্রথমে বিশ্বাস করলনা। বললে, "ধ্যেৎ, মিথ্যে কথা, আমি বুঝি জানিনা"? কমলা বললেন, "নারে, সত্যি বলছি; তোর কাকী কাল আমায় বললেন"—সূর্যর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। কাকীমার কোল ঘেঁসে বসে সে বললে, "সত্যি কাকীমা, বল না গো"?

"হ্যাঁ রে পাগলা সত্যি; আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তোর কাকাকে গিয়ে জিগ্যেস করে আয়"—

"আচ্ছা তাই করে আসি" বলে সূর্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারল বাহির মহলের দিকে। কমলার মনের থেকে একটা পাষাণ ভার নেবে গেল। তাঁর ভয় ছিল, কোলকাতায় যাবার নাম শুনে ছেলে হয়ত কান্নাকাটি লাগিয়ে দেবে। একেই ত ওকে দূরে পাঠাবার কথা মনে হলেই কমলার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়; তার উপর ছেলেও যদি অনুরূপনা করে তাহলে তিনি মনে শক্তি সংগ্রহ কোরবেন কোত্থেকে? ওকে বুকে নিয়ে যে কমলা তাঁর বন্ধ্যা জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলে আছেন। ওকে দূরে পাঠাবেন তিনি কোন্ প্রাণে? কিন্তু উপায় নেই, পাঠাতেই হবে। ওর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁর সমস্ত দুঃখ মুখ বন্ধ করে সহ্য করতেই হবে। হায়রে, অবুঝ মাতৃ-হৃদয়!

কৃষ্ণশরণ, ফরাসে বসে কি সব চিঠিপত্রে সই করছিলেন। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন নায়েব ভুবন সরকার। সূর্য পা টিপে টিপে গিয়ে তাঁর চৌকীর পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণশরণ মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে, একটা ধমকা বাতাসের মত ও বলে ফেলল, "কাকাবাবু, আমি নাকি কলকাতায় পড়তে যাবো"?

কৃষ্ণশরণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সস্নেহে ওর মুখের পানে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ সেখানে তুমি বড় স্কুলে পড়বে, ভালো করে লেখাপড়া শিখবে। জানোত তোমার বাবা কতবড় পণ্ডিত ছিলেন? তুমি সেই পণ্ডিত জ্ঞানশরণের ছেলে; তোমাকেও সেই রকমটি বিদ্বান হতে হবে; বুঝেছ সূর্যশরণ"? সূর্যশরণ, এটা হোল কৃষ্ণশরণের ভাইপোকে আদরের সম্বোধন। সূর্য স্মিত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি বাবার চেয়েও বড় পণ্ডিত হ'বো"—

সে ঝড়ের মত বেগে ঘরের থেকে বেরিয়ে গেল। তার গতিপথের দিকে চেয়ে কৃষ্ণশরণ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, তাঁর আশা তাহলে ব্যর্থ হবে না। বিদেশে যাবার নামে সূর্য কান্নাকাটী করার বদলে আনন্দিতই হয়েছে; এটা শুভ লক্ষণ বৈকি। ওর রক্তে যে রয়েছে বিদেশীর বীজ কাজেই বিদেশকে ও ভয় কোরবে কেন? বিদেশকে ওই ছেলেই ত পারবে আপন করতে। সূর্যকে এখন আর পায় কে। সমস্ত দিন ও পাখীর মত লঘু পক্ষে ঘুরে বেড়ায়। কোলকাতা যাবার মাত্র আর দুদিন বাকী। ওর বাক্স বই সমস্ত গোছানো, বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে। পূর্ণও তার সমস্ত গোছ গাছ করে তৈরী হয়ে আছে। এখন শুধু বাকী যাত্রার। সূর্য সবিস্ময়ে লক্ষ করে, লক্ষ্মীদিদির মুখে আর হাসি নেই। কাকীমা হাসেন বটে; কিন্তু সে হাসি কেমন যেন খাপছাড়া। কাকীমাকে এমন ক'রে হাসতে সূর্য কোনওদিন দেখেনি। একদিন রাত্রে শোবার সময় সূর্য কমলার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা কাকীমা, তোমার কি হয়েছে বলত?—সারাদিন কি যেন ভাবো মনে হয়"? অন্ধকারে কমলার মুখ দেখা গেলনা। তিনি সূর্যর মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "আমার বাপের চোখে, কিছু লুকোবার উপায় নেই"—

সূর্য বললে, "ওসব বাজে কথা বললে আমি আর শুনছিনা, না তোমায় বলতেই হবে কি হয়েছে"?

কমলা রহস্য করে বললেন, "বাপ হয়ে ছেলের মনের কথা বুঝতে পারেনা, এমন ত আমি কখনও দেখিনি বাপু"—

সূর্য আর চঞ্চলতা করল না। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। কি যেন ভাবতে লাগল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে—হঠাৎ ওর মনে হোল, সে কোলকাতা চলে যাচ্ছে তাই বোধহয় কাকীমার দুঃখ হয়েছে। যেমন তাণ্ডী চলে গেলে ওর হয়েছিল, ঠিক সেই রকম আর কি! সূর্য কিছু বুঝতে পারছে না; তার কারণ যে যায় তার আনন্দই হয়, আর যারা প'ড়ে থাকে তাদেরই হয় কষ্ট। উঃ, তাণ্ডী চলে যাবার পর সূর্য দুইরাত্রি ঘুমাতে পারেনি। কেবল কান্না পেতো, বুকের মধ্যে কেমন যেন কোরতো। সূর্য এবার বুঝতে পেরেছে তার কাকীমার অবস্থাও হয়েছে ঠিক সেই রকম। আহা, সে ছাড়া কাকীমার আর কেই বা আছে? সূর্যর এতক্ষণে মনে হোল, কাকীমাকে ছেড়ে থাকতে ওরও খুব কষ্ট হবে। সূর্যর চোখ ছলছলিয়ে এল। ও বললে, "আমি বুঝেছি, কাকীমা তোমার কষ্ট হচ্ছে। আমারও খুব কষ্ট হবে কাকীমা তোমায় ছেড়ে থাকতে। সত্যি বলছি"—হঠাৎ সূর্য কাকীমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। কমলা চমৎকৃত হলেন সূর্যর বুদ্ধি দেখে, মনে শক্তি দেখে। হবে না, কি রকম বাপ-মায়ের ছেলে? অন্ধকারে তিনি বার বার চোখ মুছলেন। অযোধ্যা অশ্রু কিছুতে বাধা মানেনা। কমলা সূর্যর মাথাটী বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, "এ, ছিঃ ছিঃ ব্যাটা-ছেলে কাঁদে নাকি! ব্যাটা-ছেলে যে তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে। মেয়ে মানুষই কাঁদে। সূর্য আমার বিদেশে গিয়ে কত বড় মানুষ হয়ে ফিরে আসবে"? হ্যাঁ রে সূর্য, তুই যে সমুদ্রর স্বপ্ন দেখেছিলি; বড় হয়ে আমায় সেই সমুদ্র দেখিয়ে আনবি ত"? সূর্যকে ভোলাবার মন্ত্র কমলার হাতের মুঠায়। তাঁর ঔষধে ফল হোল। সূর্য মাথা তুলে বললে, "নিশ্চয় কাকীমা, সমুদ্র আমাদের দেখতেই হবে। তুমি দু'দিন একটু কষ্ট করে থাকো; আমি বড় হয়েই তোমায় সব দেশ দেখিয়ে আনবো। তবে লোকের সামনে গিয়ে তুমি আমায় বাবা বলে ডেকোনা যেন, বুঝলে? আমার ওতে বড্ড লজ্জা করে"—

কাকীমা হেসে বললেন, "নারে আমি কি এতই বোকা? লোকের সামনে তোকে ডাকবো "সূর্যশরণ" বলে। কেমন, তাহলে ত আর লজ্জা কোরবেনা"? সূর্যর ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। সে অস্পষ্ট স্বরে বললে, "থ্যোৎ আমি বুঝি তাই বলেছি"—

কমলার বাহুতে মাথা দিয়ে সূর্য ঘুমিয়ে পড়ল। আর কমলার বেদনা-বিনিদ্র মন অন্ধকারের দিকে চেয়ে প্রভাতের প্রত্যাশা করতে লাগল।

আজ বিকালের গাড়ীতে সূর্য কোলকাতায় যাবে। সূর্য নতুন পোষাক পরে, উজ্জ্বল মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাড়ার সকলেই আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সূর্য হেসে সকলের কাছে বিদায় নিচ্ছে। এক সময় সে চুপি চুপি পূর্ণকে বললে, "পূর্ণদা, অরুণকে তুমি চেনো? জাকরাদের ছেলে, নদীর পূর্ব পাড়ে থাকে"।

পূর্ণ বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকে খুব চিনি, তোমার তার সঙ্গে কি দরকার"?

সূর্য আমতা আমতা করে বললে, "অরুণ আমার অনেক দিনের বন্ধু কিনা—চলে যাবো, তার সঙ্গে একবার দেখা হবেনা"?

পূর্ণ গম্ভীর স্বরে বললে "তার কথা ভুলে যাও, সে আর তোমার বন্ধু নয়"।

"কেন বলনা পূর্ণদা"? সূর্যর কণ্ঠে কাকুতি ঝরে পড়ল।

পূর্ণ বললে, "সে বাপ মাকে না বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে একটা যাত্রাদলের সঙ্গে। তার বাপের গঞ্জের অনেকগুলো সোণার জিনিষও চুরী করে নিয়ে পালিয়েছে। কুলাঙ্গার। তুমি তার নাম আর মুখে এনো না। কর্তাবাবু শুনলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না।

সূর্যর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। তার বন্ধু অরুণ চোর! সে বাড়ী থেকে না বলে করে পালিয়ে গেল? যাক্, সূর্যর বন্ধু বলে গ্রামে আর কেউ রইল না। তাদের শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পর্যন্ত একটাও চিঠি দেয়নি। সূর্য অকারণে তাদীদের বাড়ী বার দুই গিয়ে ঘুরে এল। দুলরাণী এলেন দুপুর বেলা। সঙ্গে নিয়ে এলেন, ক্ষীর আর নারকেলের নানারকম খাবার, আমসত্ত্ব, আর টক আচার। কমলার হাতে দিয়ে বললেন, সূর্যর বাক্সে ভরে দিতে। কমলা সব গুছিয়ে দিয়েছেন। বড় বড় খাবারের হাঁড়ি, বইর বাক্স সবই আলাদা যাচ্ছে; তবুও ওঁর মনে হয় কি যেন দেওয়া হয়নি, কি যেন ভুল হয়েছে। তিনি আবার বাক্স খোলেন, জিনিষ পত্র মিলিয়ে দেখেন। ক্রমে যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল। সূর্য তার কাকাবাবুর সঙ্গে গেল ভবানী মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে। কৃষ্ণশরণ নির্মাল্য নিয়ে সূর্যর মাথায় দিলেন, হাতে দিলেন। তাঁর মনে পড়ল, বহুদিন আগে একদিন এই মন্দিরের চত্বরে এসে বসত, কুমারী হিমানী, সূর্যর মাতা; জ্ঞানশরণও এমনি করে তার হাতে দিতেন পূজার নির্মাল্য। কিন্তু সে মেয়ে কোনওদিন ভবানীর মন্দিরে মাথা নত করেনি; অথচ তারই সন্তান সূর্য, কি রকম ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করছে। কোরবে না? ওরে বংশধর; ও-ই যে একদিন এই মন্দিরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাবে—আনন্দে গৌরবে কৃষ্ণশরণের মন ভরে ওঠে। সূর্যর হাত ধরে তিনি মন্দির থেকে ফিরে আসেন। সূর্য একে একে সকলের কাছে বিদায় নেয়। কাকীমা তার কপালে দইর ফোঁটা দিয়ে মুখচুম্বন করেন। লক্ষ্মীদিদি কোনও কথা বলেনা, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সূর্য পালকীর থেকে মুখ বার ক'রে সকলের দিকে তাকায়। হঠাৎ কমলার চোখে চোখ পড়তেই তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে,—সে চীৎকার ক'রে ওঠে,—কাকীমা, আমি যাবোনা, আমি যাবো না।"

কৃষ্ণশরণ গম্ভীর মুখে এগিয়ে আসেন। নিজের কোঁচার খুঁটে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন, "ছিঃ সূর্যশরণ অমন করেনা। এই ত দুমাস পরেই আবার তুমি এখানে ফিরে আসবে। গিয়ে আমাদের চিঠি লিখো"।

কৃষ্ণশরণের ইঙ্গিতে বেহারা তখন পাল্কী বাইতে সুরু করে দিয়েছে। ঠাকুর বিলের পুল পর্যন্ত পাল্কীর থেকে সূর্যর সুন্দর মুখটী দেখা গেল; কিন্তু যখন পুল থেকে নেবে পাল্কী ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকের পথ ধরল, তখন আর কেউ কাউকে দেখতে পেলনা। সূর্যর গ্রাম্য-জীবনের অবসান ঘটল শীতের এক কুহেলী-ঘন ধূসর সন্ধ্যায়।

ষ্টেশনে পৌছে সূর্য যেন কেমন থতমত খেয়ে গেল। একসঙ্গে এত লোক, এত কোলাহল, এত শব্দ সে জীবনে কখনও শোনেনি বা দেখেনি। নায়েব ভুবন সরকার এসে ওদের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ কামরায় তুলে দিয়ে পূর্ণকে নানা রকম উপদেশ দিয়ে, মিষ্টি কথা বলে নেবে গেলেন। সূর্য জীবনে এই প্রথম রেলগাড়ী দেখল। তার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। উঃ, কত বড় গাড়ী; সারি সারি এতগুলি ঘর একটা ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাবে কি করে? জানলা দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে শুধু গাড়ী দেখে। পূর্ণ বললে, "অত ঝুঁকোনা সূর্য, পড়ে যাবে"—

এক সময় হুইসিল্ দিয়ে গাড়ী খুব জোরে দুলে উঠল। ভয়ে সূর্যর বুক শুকিয়ে গেল। এ্যাকসিডেন্ট হোলনা ত? যে খবর প্রায়ই কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যর ভীতভাব দেখে পূর্ণ হেসে বললে, "ভয় পেওনা সূর্য, গাড়ী ছাড়ল"। গাড়ী ছাড়ল; তার মানে গাড়ী যে চলছে প্রথমটা সূর্য কিছুই ঠাহর করতে পারলনা। কিন্তু মুক্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল, গাড়ী চলছে। এই একটা তালগাছ দেখা যায় তখনি সেটা মিলিয়ে যায়। সূর্যর প্রতীতি দৃঢ় হোল; গাড়ী চলছে এবং সত্যই সে কোলকাতা যাচ্ছে। ক্রমে অন্ধকারের পটভূমিকায় প্রান্তরের দৃশ্য মিলিয়ে গেল। বাইরে শুধু অন্ধকার। তার মধ্যে জোনাকী জ্বলছে আর নিবছে। মাথার উপর তারায় ভরা নির্বাক আকাশ। গাড়ীর ভিতরে ছুটী মারোয়াড়ী যাত্রীর অবোধ্য ভাষার অনর্গল বাক্যালাপ। সূর্যর এসব আর ভালো লাগল না।

বালিশে মুখ গুঁজে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখের জলে বালিস ভিজে উঠল, ওর তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ওর মনের মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কেবল ইচ্ছা করছে সেই মস্ত দেউড়ীআলা চৌধুরী বাড়ীতে এখনি আবার ফিরে যেতে। ওর মনে হোল কাকীমা যেন এখনও তেমনি ভাবে দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—চোখ দুটী তাঁর জলে ভরা। বিছানার উপর লাফ মেরে উঠে বসে সূর্য বললো, "পূর্ণদা, আমি বাড়ী যাবো। তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও"—

পূর্ণ তার খাবার নিয়ে এসে পাশে বসল। পূর্ণ ষ্টেশনের চায়ের দোকান থেকে কিছু কেক্ কিনে রেখেছিল। সূর্যর চোখের সামনে সেই কেক্ তুলে ধ'রে বললে, "সূর্য কেক্ খাও। খুব ভালো খেতে"।

কেক, সূর্য এ নাম বইয়ে পড়েছে; কিন্তু চোখে দেখল এই প্রথম। অবাক হয়ে ও চেয়ে রইল হলদে রংয়ের খাদ্য-দ্রব্যটীর পানে। পূর্ণ এই সুযোগে বলতে লাগল নানারকম আজগুবী গল্প। সূর্য তাই শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। পূর্ণ তার পাশে জেগে বসে রইল। পূর্ব বাংলার এক নিভৃত পল্লীর আছুরে ছেলে ঘুমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ পশ্চিম বাংলার দিকে।

ক্রমশঃ

পাখতুনীস্থানের পরিচয়

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম, এ

কয়েক বছর আগে শ্রীনেহরু একবার অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তখন এক জির্গার বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই মর্মে একটা মন্তব্য করেছিলেন যে, উপজাতিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তিনি তাঁর মেয়েকে পাঠাতে অতটুকু দ্বিধাবোধ করবেন না। শোনা যায়, শ্রীনেহরুর এই মন্তব্য শ্রবণ করেই তাঁর মেয়ে কখন আসবেন সেটা জানবার জন্য একজন উপজাতীয় নেতা নেহেরুজীকে প্রশ্ন করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেহেরুজী তাঁর মন্তব্যের ভিতর দিয়ে আসলে কি বলতে চেয়েছেন সেটা উপজাতীয় নেতাটি বুঝতে পারেননি—তাই তিনি এই রকম প্রশ্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি নেহেরুজীকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সত্যিই যদি তাঁর মেয়ে আসেন, তাহলে কোন লোক যা'তে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং উপজাতিদের নিজেদের মেয়ের মত তাঁকে ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হচ্ছে এই যে, পাঠানরা সত্যিই অকপট এবং স্পষ্টবাদী। এদের মধ্যে কোন প্রকার জাতিগত বৈষম্য নেই বল্লেই চলে এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। তবে এদের মধ্যে শিষ্টতার অভাব দেখা যায়। তাছাড়া পাঠানরা সাধারণতঃ প্রতিহিংসাপরায়ণ, লোভী এবং একগুঁয়ে। এরা কোন প্রকার অধীনতা কিম্বা জবরদস্তি সহ্য করতে পারে না। তবে জাতি হিসাবে পাঠানরা খুব বিশ্বস্ত, সাহসী, আতিথেয় এবং আশ্রিতের প্রতি দয়ালু।

সাধারণ ভাষায় যে স্থানটিকে পাখতুনদের দেশ বলা হয়, সে-স্থানটির পশ্চিমে হচ্ছে ইরাণ ও আফগানিস্থান, উত্তরে রয়েছে রাশিয়া, উত্তর-পূর্বে হল চীন ও কাশ্মীর এবং দক্ষিণে রয়েছে পাকিস্তান। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—সে বিষয়টি হচ্ছে, এই স্থানটি আজ পাকিস্তানের অংশ হিসাবে গণ্য; যদিও এখানকার জনসাধারণ স্বাধীন পাখতুনীস্থান গঠন করবার স্বপ্নে বিভোর। পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্থানের কাছ

থেকে এই এলাকার জনসাধারণ সর্বদা উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন; কারণ পাঠান জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আফগানিস্তান খুব আগ্রহশীল। তবে পাকিস্তান যে স্বেচ্ছায় পাঠানদের এই অধিকার দিবেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

আমরা যদি ভূগোল আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, যে-এলাকাকে উপজাতীয় বেষ্টনী (tribal belt) বলা হয়, একটা সীমারেখা সে এলাকা থেকে পাকিস্তান-শাসিত এলাকাকে পৃথক করে দিয়েছে। পাকিস্তান সীমারেখা থেকে ডুরাণ্ড লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত এই চাল্লিশ হাজার বর্গমাইল এলাকার চারটি প্রধান উপজাতি বসবাস করে। এই উপজাতিগুলোর নাম হচ্ছে মাসুদ, ওয়াজির, আফ্রিদি এবং মামন্দ। এছাড়া ভিট্টানিস, বাজাউরিস, বুনে-রিস ইত্যাদি আরো বহু উপজাতি রয়েছে।

মাসুদ উপজাতি প্রকৃতপক্ষে ওয়াজির উপজাতিরই একটা শাখা। মাসুদরা যে এলাকায় বসবাস করেন সে এলাকার পশ্চিমে হল আমেদজাই অধ্যুষিত এলাকা, পূর্বে হচ্ছে ভিট্টানিস অধ্যুষিত অঞ্চল, দক্ষিণে হল সিরানি অধ্যুষিত এলাকা এবং উত্তরে হচ্ছে ওয়াজির অধ্যুষিত অঞ্চল। শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মাসুদরা গভীর এবং সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথগুলোতে রক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, মাসুদ অধ্যুষিত এলাকার পাহাড়গুলোতে যথেষ্ট লৌহ রয়েছে। মাসুদরা এই লৌহ বিক্রী ক'রে জীবিকার্জন করে থাকেন। যদিও মাসুদরা রণনীতিতে পারদর্শী নন্ তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁরা খুব সাহসী। এঁদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিগত ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত প্রোইন-দার মোল্লা সাহেব মাসুদ উপজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শুধু তাই নয়। মোল্লা সাহেবের নেতৃত্বে মাসুদরা একটী সঙ্ঘবদ্ধ উপজাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। বলা হয়েছে, বর্তমানে মাসুদদের মোট সংখ্যা হবে প্রায় দু'লক্ষ। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এঁদের মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। তবে সামরিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে এরা প্রায় বিশ হাজার সৈন্য তৈরী করতে সক্ষম।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সমস্ত উপজাতির মধ্যে ওয়াজির উপজাতি স্বাধীনতার জন্য সর্বদা লড়াই করে এসেছেন। যে এলাকাটি ওয়াজিরী-স্থান নামে পরিচিত সে এলাকায় প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক বসবাস করছেন। প্রয়োজন হলে এরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য তৈরী করতে পারেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, ওয়াজির উপজাতি আমেদজাই এবং উৎমাজাই এই দুটো প্রধান শাখায় বিভক্ত। বলা হয়েছে, ওয়াজিররা ইপীর ফকিরের অনুগামী। এরা কখনো কাবুলের রাজা কিম্বা সিন্ধুনদীর এপারের কোন সার্বভৌম শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। এরা অত্যন্ত সাহসী। শোনা যায়, বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াজিরদের সাহায্যে রাজা নাদির খাঁ বাচ্চা সাকোকে পরাজিত করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াজিরদের প্রবল সংগ্রাম সুরু হয়। ভূগোল আলোচনা করলে দেখা যাবে, মিরানজাই উপত্যকার অবস্থিত স্থলের পশ্চিমাংশ থেকে গোমল গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত যে সব পাহাড় রয়েছে সে-সব পাহাড়ে ওয়াজিররা বসবাস করেন। এদের আদি নিবাস ছিল কাশ্মির-গোরাম। যখনিই এরা মনে করেছেন, এদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই এরা এমন সব পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন যেগুলো আক্রমণ করা শত্রুর পক্ষে অসম্ভব। হাজী মির্জা আলি খাঁর নেতৃত্বে ওয়াজির উপজাতি বিগত ১৯৩৬ সাল থেকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। হাজী মির্জা আলি খাঁ সকলের কাছে ইপীর ফকির নামে পরিচিত। ইনি সর্বদা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ক'রে এসেছেন। এমন কি বর্তমানেও তিনি পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করছেন।

আফ্রিদিদের মোট সংখ্যা হবে প্রায় চার লক্ষ।

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে এঁরা প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই আন্দোলনের সময়ে আফ্রিদি অধ্যুষিত এলাকায় কতকগুলো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। অহিংস যোদ্ধাদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন। ফলে আফ্রিদিরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামরিক ঘাঁটী আক্রমণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বৃটিশ সরকার এবং আফ্রিদি উপজাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সম্মেলনে আফ্রিদিরা এই মর্মে একটা দাবী জানিয়েছিলেন যে, আব্দুল গফুর খাঁ এবং মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিতে হবে।

আমরা যদি উপজাতীয় এলাকার ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব প্রায় ১৮৪৪ সাল থেকে মামন্দরা বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমে কাবুল এবং সোয়াৎ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়গুলোতে মামন্দরা বসবাস করছেন। তুরঙ্গজাই-এর হাজী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বিগত ১৯১৮ সালে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। শোনা যায়, ওয়াহেদ সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত মামন্দদের উপর তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিগত ১৯৩০ সালের আন্দোলনে মামন্দরা একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, মামন্দরা নাকি আটটি শাখায় বিভক্ত। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল আলামজাই উপজাতি। বৈজী উপজাতি হচ্ছে মামন্দদের অন্যতম প্রধান শাখা। বৈজীরা রণকৌশল এবং সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ। মামন্দ অধ্যুষিত এলাকার সীমা হবে প্রায় বার শত বর্গমাইল এবং মামন্দদের মোট সংখ্যা হবে সওয়া চার লক্ষ। প্রয়োজন হলে এঁরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ। স্মরণ থাকতে পারে, তুরাণ-চুক্তি অনুসারে আফগানিস্থান থেকে এদের অধ্যুষিত এলাকাকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যা

শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গে আমার ক্লান্তি আসিছে নামি'
পশ্চিমাকাশে সূর্য পড়েছে ঢলি,
গোধূলি গগন মগন হতেছে সুরে,
অভিসারে ধীরে রজনী আসিছে বলে।

নিদাঘ-দীপ্তি শূন্যে গিয়াছে মিশি'
ক্লান্ত পাখার বলাকা চলিছে ভাসি,'
আমলকী বনে বিদায়ের ছায়া নামে,
অদেখা-সমীর সকরুণ ওঠে শ্বাসি।

সন্ধ্যারতির শংখ পবনে শুনি
তুলসীর মূলে প্রদীপ উঠিছে জ্বলি'
রাতের প্রহরী নিশাচর ওঠে জাগি'
শান্ত সমীরে নদী ওঠে ছলছলি'।

নিশীথ গগনে বিদায়ী মালা শোভে
শশী-তারকার মালা ওঠে ঝলমলি'
সহসা বিশ্বে অঘটন গেছে ঘটি'
দিনের সূর্য অভিমানে গেছে চলি'।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার সংখ্যা অল্প নহে। অশ্লীল অংশ সমূহ বাদ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যে কবিতাগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা এই মন্তব্য করিতেছি, কবি নানা আকারের, বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা লিখিয়াছেন। তাহার সবগুলিই যে নিখুঁত, সবগুলিই রসিক-জনচিত্তের নিকট সমপরিমাণে আবেদনশীল তাহা অবশ্য আমরা স্বীকার করিনা। তাঁহার প্রতিভা কাব্যের নির্মাণ-কুশলতার ততটা নহে, যতটা বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও একেবারে তুচ্ছ বিষয়কেও কাব্যের বিষয়ীভূত ক'রবার সফলতায়। 'পাঁটা' 'তপসে মাছ' প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। সমসাময়িক সমাজ আন্দোলন প্রভৃতির উপর লিখিত কবিতাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কবিতার কাহিনী নাই—আর থাকিলেও তাহা এতই ক্ষীণ, এতই তুচ্ছ যে না-থাকারই সামিল—ইহা একটা বড় কথা। তাঁহার কবিতা পড়িলেই হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় যে, বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক যুগ অতিক্রম করিয়াছে। তাহা ক্রমশঃ কাল্পনিক দেবতাগণকে লইয়া অনাবশ্যক মাতামাতি পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে সচেতন হইতেছে। ভারতচন্দ্রের শিব-দুর্গার অবশ্য ইহার আভাস রহিয়াছে; তবু তাহা মনুষ্যভাব প্রাধান্যকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মনকে সেই কৈলাসমুখীই করিয়া তোলে এবং শিব-দুর্গার মানবোচিত কার্যকলাপ লীলা বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। অবশ্য এই ক্ষীণ মানবিকতা আমাদের লাভ সন্দেহ নাই; কিন্তু মানবিকতা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলীতেই বেশী পরিস্ফুট, অতএব অধিকতর লাভের। ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন নাই, ঈশ্বরের সঙ্গে একেবারে আপনার সম্পর্ক পাতাইবার সাহস দেখাইয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রচলিত ছন্দ ছিল পয়ার এবং ত্রিপদী। বহু বৎসরের পরীক্ষার ইহার স্বীকৃত সর্বশেষ রূপটি আমরা তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাইতেছি। এখানে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁহার কবিতার প্রধান অলঙ্কার যমক আর অনুপ্রাস—তাহার ভারসাম্য সব সময়ই রক্ষা করা হয় নাই। অথচ আঙ্গিকগত এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁহার কবিতার মধ্যে একটা সাবলীলতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার যমকানুপ্রাসের প্রতি মমতার তদানীন্তন কবি, টপ্পা, খেউড়, তরজা প্রভাবিত বাংলা সমাজের একদিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসমূহকে আমরা মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ ঈশ্বর বিষয়ক বা আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন। বলা বাহুল্য এই কবিতা-গুলিতেই তাঁহার আন্তরিকতা বেশী করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখা নহে, বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় সাধনার অঙ্গও ইহারা নহে। ঈশ্বর তাঁহার জনক, কবি তাঁহার সন্তান ও সেবক। পুত্র পিতার নিকট আপনার বেদনা জানাইয়াছেন, মনোবাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন, আব্দার করিয়াছেন, ঝগড়া করিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে কবির নিবিড় এক যোগসূত্র আছে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাস বা উপলব্ধিই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন কবিতাসমূহের পটভূমিকায় সর্বদা ক্রিয়াশীল।

কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান॥

'নির্গুণ ঈশ্বর' শীর্ষক কবিতার এই প্রথম চারি পংক্তির মধ্যেই উল্লিখিত মন্তব্যের প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার 'প্রার্থনা (১)' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত চারি পংক্তি ঈশ্বরের উপর তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। যথা;—

এতদিন বেঁচে আছি তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি ভবের সভায়॥
যে-পথে চালাও তুমি সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি সেইরূপ বলি॥

তাঁহার 'মায়া' 'স্বয়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন', 'সংসার জাঁতা' 'সংসার সমুদ্র' প্রভৃতি কবিতায় জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা প্রকাশিত হইয়াছে। জগৎ এবং জীবন রহস্যময়, তাহা অতলান্তিক; এবং তাহার পশ্চাতে নিয়ন্তা, প্রভু, অধীশ্বর রূপে ঈশ্বর রহিয়াছেন যাহাকে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, অথচ তাঁহার শরণ না লইলে নিস্তার নাই। বলা বাহুল্য তাঁহার এই ধারণা ভারতীয় দর্শন হইতে নূতন কিছুই নহে এবং তৎকালীন সাধারণ পাঠকের চিন্তাধারার সঙ্গে অসমঞ্জস নহে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি। এই কবিতাগুলিই তখনকার বাংলা সাহিত্যের আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। ব্যঙ্গ কবিতাই তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার সর্বোচ্চ পরিচয় রহিয়াছে। এই কবিতাগুলির শিল্প-কৌশল অবশ্য খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিমানস প্রতিবিম্বিত, তাঁহার বেদনার্ত সংবেদনশীল মন, তাঁহার নির্ভীক ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রতিফলিত।

বাস্তবজগৎ বড় নির্মম। কবির আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, পরিকল্পনা সব কিছুকেই তাহা বার বার ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার প্রতি বাস্তবজগতের স্নেহ নাই, মায়া নাই। অথচ কবির কোমল অন্তর তাহার নিকট চাহিয়াছে অনেক কিছু; কিন্তু সে চাওয়ার পরিবর্তে তিনি পাইয়াছেন বেদনা, লাঞ্ছনা। তাহারই প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ রহিয়াছে তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে।

কবিতাগুলির বিষয়ের বিভিন্নতা নিঃসন্দেহে কবির স্পর্শ-কাতরতার সাক্ষ্য বহন করে। ক্ষুদ্র 'পাঁটা' 'তপসা মাছ' হইতে আরম্ভ করিয়া বিধবা-বিবাহ, নীলকর, দুর্ভিক্ষ, মার্শম্যান, কেহই বাদ যায় নাই। সমাজের আচার কৌলীন্য প্রভৃতিও তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সব কিছুকেই তিনি আক্রমণ করিয়াছেন ব্যঙ্গচ্ছলে। যারা কিছু মেকী তাহারই উপর তাঁহার ক্রোধ সর্বাপেক্ষা বেশী। তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর মনে সাহেবিয়ানার নেশা চাপিয়াছিল। ইহারা যে সকল সাহেবের অনুকরণ করিতেন, তাহা কবি বরদাস্ত করিতে পারে নাই। "তেঁতুলে বাঙ্গী যেন ফিরিঙ্গির ঝাঁক বাঁচিনেক দেখিয়া তাদের ফোতো ঝাঁক।" ইহাদের সঙ্গে আমাদের 'নীলু, বুলু, কালু, লালুরা যে হাত মিলাইয়া—

"শক্তিসহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হয়ে প্রীত নৃত্যগীত বিপরীত ভাবে॥"

ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। 'হুজ মিশনরী'-কেও গালাগালি করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। নীলকরদিগের অত্যাচারে অশ্রুমুখী বাংলার যে মূর্তিখানি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা বাঙালীর হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না। করুণ স্বরে ক্রন্দন করিবার সময়ও তিনি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষাগরু,
শিপিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে খামলা
গামলা ভাঙেনা,
আমরা তুসি পেলেই খুসী হব
ঘুসি খেলেই বাঁচব না।"

মার্শম্যানকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাহার চরিত্র তিনি নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করি,—

"কালো তুমি সাদা কর, সাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকার, অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর, আকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর, অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুটো, ঝুটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালীর দুঃখদাতা বাঙ্গালীর যম।
বম্ বম্ বম্ বম্ বম বম বম্॥
কি সে তুমি কম?"

বাঙালীর ঘরের কথাও তিনি বেদনামিশ্রিত রঙ্গের সঙ্গে বলিয়াছেন। 'পৌষ পার্বণ' কবিতায় বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের উৎসবের দিনেও অভাবের বেদনা অন্তরকে পীড়া দেয়, স্বামীর ঔদাসীন্যে এবং ননদ শাশুড়ীর তীক্ষ্ণ কথায় জর্জরিত হৃদয়া বধূর চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পাকুল হয়, তাহা কবি দেখাইয়াছেন। জীবনের যেদিকে সুখ সে দিকেই ক্রন্দন—ইহাই কবির কথা।

আবার নিছক হাসির জন্য, আনন্দের জন্যও তিনি সামান্য বিষয় লইয়া ছড়া কাটিয়াছেন। আমরা 'পাঁটা' 'আনারস,' 'এণ্ডাওয়ালা' 'তপসে মাছ' প্রভৃতি কবিতার প্রসঙ্গে বলিতেছি। 'রসভরা রসময় রসের' ছাগলের জন্য পাগল হইয়া তিনি তাহার 'স্বর্ণকুঁকী, রত্নগর্ভা জননীর' 'ধন্য ধন্য' করিয়া আমাদিগকে খুবই হাসাইয়াছেন। 'নানারস শ্রেষ্ঠ তুমি তোমারে প্রণাম।'

নানারস হয়ে গেলে আনারস নাম। এর মধ্যেও সেই লঘুতালি। অবশ্য এই সমস্ত কবিতার অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য প্রায়শঃই বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের হাস্যোদ্রেক করিবার গুটিকয়েক প্রণালী আছে। বাংলা ও ইংরাজী শব্দের একই সঙ্গে ব্যবহার তাহার অন্যতম। "বিশী রক্ষ খানিকের খুবি কুক্ষ কচ্। মেরি দাতা মেরি পুত বেরি গুড বয়।" অথবা "সাড়ী পরা এলোচুল আমাদের মেম। বেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম॥" এর মধ্যেই ইহার উদাহরণ রহিয়াছে। আর একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—ইহাতে বাংলা ক্রিয়াতে সংস্কৃতের বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। যথা,

"ঘরে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনাস্তি,
মশা মাছি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কনকনাস্তি,
একটু কাপড় নাই পিটে।
ঘরে পুত্র চলচলাস্তি,
অস্তি-নাস্তি না জানাস্তি,
দিবা রাত্রি খেতে চাস্তি
আমি খেটা মরি খেটে।

কবির নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিকে আমরা তৃতীয় পর্যায়ে ফেলিতে পারি। নিসর্গ বলিতে প্রেম এবং প্রকৃতি উভয়কেই বুঝিতেছি। এই কবিতাগুলির দৈর্ঘ্য এবং গতানুগতিকতা আমাদের ধৈর্যকে চ্যালেঞ্জ করে। কবির কল্পনা এখানে যাহাকে আমরা কবি-কল্পনা বলি তাহা নহে। তাঁহার প্রণয় সম্বন্ধীয় কবিতায় তিনি হৃদয়ের স্পর্শ দিতে পারেন নাই—কেবল শব্দের উপরই ঐকান্তিকরূপে নির্ভর করিয়াছেন। অবশ্য কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার উক্তির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার একাবলী ছন্দ মনকে একটু চপল করে। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতেও তাঁহার কবিত্বের চিহ্ন এতদাতিরিক্ত নহে। ভীষণ গ্রীষ্ম, আকাশে বর্ষা, অথবা এইটি বসন্তকাল—ইহাই যেন সমস্ত কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্ণনার মধ্যেও অবশ্য শিল্প-চাতুর্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই তিন পর্যায়ে যাহারা পড়িল না সেই কবিতাগুলিকে আমরা বিবিধের পর্যায়ে ফেলিতে পারি। কবির যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি, শকুন্তলা, সারদা মঙ্গল ও অন্যান্য কবিতা এই পর্যায়ে পড়ে। ইংরাজদের সঙ্গে এদেশবাসী শিখদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল প্রধানতঃ সেই যুদ্ধাবলম্বনে তাঁহার যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি রচিত। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার দেশবাসীগণের প্রতি মমতা এবং ইংরাজদের প্রতি কটাক্ষপাত ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। 'শকুন্তলা' কালিদাসকৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রথমাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি বহুলাংশে কবিজনোচিত। আশ্রম বর্ণনায়, শকুন্তলার বর্ণনায় তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অথচ সে বর্ণনায় অশ্লীলতার পরিপাটি নাই।

"শকুন্তলা পরে পুলক অন্তরে
আরম্ভিল দিতে জল।
কক্ষেতে কলস যৌবন অলস
তনু কটি সুবিমল।

মাহেশী সভায় আড়ম্বর যথায়
চলিল তথায় বালা
রূপের নিধান বলকল পিধান
গলে বনফুল মালা।"

বুকে জল সেচিকা শকুন্তলার সে প্রগলভ মূর্তি তিনি চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা বহুলাংশে সফল হইয়াছে, অবশ্য কাহিনীর সূত্র এখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। 'সারদা মঙ্গলে' গিরিরাজ ভবনে উমা ও শিবের পুত্রসহ আগমনের বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত। এ-কাব্যখানিরও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা—তা সে ব্যাকুলিতা মাতা ও কন্যার হৃদয়েরই হোক, আর ভাঙড়খোর ভোলা শিবেরই হোক। বাঙালী হৃদয়ও ইহার মধ্যে বহুলাংশেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশভক্ত; কিন্তু তাহার জন্য সভার হাততালি বা চমৎকার বাগভঙ্গির উপর নির্ভর করিতে চাহেন নাই। সোজাসুজি ব্যর্থহীন ভাষায় সমাজের যাহা ত্রুটি-বিচ্যুতি, আধুনিকতার যাহা গলদ তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া, চাবুক লাগাইয়া আঘাত করিতেন আর দেশবাসীগণকে ডাকিয়া বলিতেন, "ভ্রাতৃ ভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে।" তাঁহার কথাই ছিল, আমরা যেন 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকেই গ্রহণ করি।' দেশের প্রতি তাঁহার এই দরদের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভা মিলিত হইয়া সাধনার পথ ধরে নাই। তাঁহার প্রতিভা ইয়ারকিতেই নিঃশেষিত হইল এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে ক্ষোভ করিয়াছেন তাহা যথার্থই হইয়াছে। তথাপি তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রবর্তক সেকথা ভুলিলে চলিবেনা।

ঘর ?

—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ঘর দিতে পারো; ভাঙ্গা ঘর হোক, একখানি শুধু ঘর?
আলো ঢোকেনাকো' অন্ধকারের চিরায়ত অধিকারে,
ভাঙ্গা বাতায়নে গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
নাই যদি আসে পূর্ণিমা রাত কভু,
স্বপ্ন দেখার প্রয়োজনে নয়, মাথা রাখবার ঠাঁই,
শুধু শুতে পারা—একখানি ছাদে
চারটি দেয়াল দেওয়া,
একখানি ঘর,—ঘর দিতে পারো কেউ?

বিরাট পৃথিবী—সহর বিলাসী অজস্র মানুষের
কত প্রয়োজন কত যে লালসলীলা;
পার্ক ষ্ট্রীট আর বালিগঞ্জের কার্নিশ ঘেরা
অর্কিড রাখা ছাদ,
পীচের রাস্তা গলে গলে আসে দুপুরের রোদে জলে
আকাশের নীলে মাটির পৃথিবী স্বপ্নই শুধু দেখে,—
আর তার কোন ধূসর পথের ছাদ দেওয়া ফুটপাথে
হক্কে-কুকুর ভীড় করে দলে দলে।

স্তব্ধ রাতের বুকে ডাক শুনি—ঝিঁঝি পোকাদের ডাক
তেলে পোকা আর ইঁদুরের দল অভিযানে হ'লো বার
চামচিকাদের পাখা ঝাপটানি—শকুনির ছানা কাঁদে
মানুষের ভীড় ইঁদুরের দলে বিবর খুঁজিতে রত।
ধূসর পথের আবর্জনাতে আরশোলা এসে ঘোরে,
আসে লোমওঠা বেড়ালের ছানা.....
মরা ইঁদুরের শব।

আর তার পাশে কাদা আর পাঁকে
আসে অজস্র প্রাণী
অগণ্য মৃত জীবনের ছায়া, মানুষের কঙ্কাল,
যারা খোঁজে শুধু একটুকরা ভাত—একখানা ভাঙ্গা ঘর !!

রবীন্দ্রনাথের সুর কৌশল

শ্রীজয়দেব রায় এম. এ, বি, কম্

রবীন্দ্রনাথের গান কোন একটি বিশেষ সুরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, নানা বিচিত্র সুরভঙ্গিমার সমাবেশে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত'। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, তেলেনা, বাউল, সারিকীর্তন, মিশ্ররাগ, পাশ্চাত্য সুরভঙ্গি প্রভৃতি সকল প্রকার ভঙ্গিমার সূত্রে সমৃদ্ধ 'কবির গান'।

ধ্রুপদ গানের রীতি ভঙ্গিতেই কবির অধিকাংশ গানের সৃষ্টি—গম্ভীর ভগবত অনুভূতিকে প্রকাশ করাই ধ্রুপদের উদ্দেশ্য। প্রথম যুগের ধ্রুপদে তাঁহার সুরে বৈশিষ্ট্য ছিল না, প্রচলিত হিন্দী ধ্রুপদ গানে কথা বসাইয়া তাহারই সুরকে অনুকরণ করিয়াছিলেন; এই ভাবেই সৃষ্ট তাঁহার 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র। যেমন একটি গান এইখানে দেখা যাক—

মূল হিন্দী গানটি 'রঙ্গনাথে'র রচনা,—রাগিনী বহার, তাল-চৌতাল (১২ মাত্রা) লঘু দ্রুতগতি।

ঘুলি বন ঘন মোর আয় বসন্ত রি
অব বহত পবন মন্দ মন্দ সমীরণ ঘন ভাবে
অর মধুপবৃন্দ নিরত কর গুঞ্জার
নই নই কলিয়ন পর আয় চুম্বক (মধু) হরত।
কেতকী গুলাব ঔর চম্পা বকুল বেলা
অতি কোমল দল কুসুম সহিত প্রফুলিত ভই
নাথ নাথ নিরত করত নারী নিরখ নাথ॥

ঠিক এই গানটির সুরে, ছন্দে, লয়ে কবি অনুরূপ গানের সৃষ্টি করিলেন—

আজি মম মন চাহে জীবন বল্লভে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে,
সেই চির-আনন্দ, বিমল চিরসুহৃদ্,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরাশান্তি, পরম প্রেম,
পরা মুক্তি, পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু, চিত্ত সখা,
ধর্ম-অর্থ কাম তরণ রাজা হৃদয়-হরণ॥

এই গানে একমাত্র সুন্দর বাণী সংযোজন ব্যতীত কবির নিজের কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। পরের যুগে সৃষ্টি হইল তাঁহার নিজস্ব ধ্রুপদ ভঙ্গিমার গান—যেমন, রাগিণী ইমনকল্যাণ, তাল ঝম্পক (৫ মাত্রা) দ্রুত লয়ে—

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এনহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখে শোকে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥

'খেয়াল' গান কবির অল্প। খেয়াল গীতি-ভঙ্গিমার গানে অত্যধিক তান বিস্তার প্রভৃতি তিনি পছন্দ করিতেন না। কাব্য এবং ভাবপ্রকাশ খেয়ালের স্বল্প কথার মধ্যে সম্ভবও নয়। প্রথম যুগে তাঁহার 'খেয়াল' গান—স্বপন যদি ভাঙিলে, বিমল আনন্দে জাগোরে, নাথ হে প্রেমপথে, আজি মম জীবনে নাথিছে প্রভৃতি। এই যুগের 'খেয়াল'ও তাঁহার প্রচলিত ধারার হিন্দী গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত—'মনরঙ্গে'র এই শ্রেণীর একটি গান অনুরূপে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল 'আজি মম জীবনে নাথিছে'—আড়ানা—তেতালা—মধ্যগতি:—

অব মোরি পায়েলা বাজাহু সোঁ।
লালন ভিহারে ঘরন হম কৈসে আউঁ।
জাগত হৈঁ মোরি ননদী জেঠনিয়া
আবনকে সময় ন পাউঁ॥

কবির সৃষ্টি গানটি হইল—

আজি মম জীবনে নাথিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগো আজি জাগো, জাগোরে তাঁরে লয়ে
প্রেমঘন হৃদয় মন্দিরে॥

'টপ্পা' প্রেমসঙ্গীত; কবির প্রেমের গানে টপ্পারই আধিক্য। প্রথম যুগে শোরীর টপ্পার অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন 'মায়ার খেলা'র গানগুলি। পরের যুগে আসিলেন—'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে,' 'হৃদয় বাসনা মম পূর্ণ হ'লো', 'আমার আঁধার ভালো' প্রভৃতি টপ্পা ভঙ্গিমার গানে। এই গুলিতেও প্রচলিত হিন্দী গানের

ছায়াপাত হয়াছে ; এই শ্রেণীর টপ্পা কিঞ্চিৎ মধ্যমানে (১৬ মাত্রায়)—

হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল
শুন হে বিশ্ব জগত জনে।
কী হেরিনু শোভা, নিখিল ভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে ॥

সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিমার টপ্পা তাঁহার 'অরূপরতনে'র গানের যুগে—এই যুগেরই গান—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব ;
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

'ঠুংরি' রীতি-রীতির গানেও এইভাবেই প্রচলিত হিন্দী গানের অনুকরণ করিয়া শেষে নিজস্ব ভঙ্গিমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

রাগিণী মিশ্রণ ছিল কবির অতি প্রিয় ; নানা রাগিণীর মিশ্রণে তিনি নব নব সুরের সৃষ্টি করিয়াছেন চিরকাল, পাশ্চাত্য গীতিভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছেন বহু গানে। গ্রাম্য লোক-সঙ্গীতের প্রতিটি ধারায় তিনি সুর সৃষ্টি করিয়াছেন। বাউল, কীর্তন, সারি প্রভৃতির সুরে তাঁহার অসংখ্য গান আছে। এই নানা স্বতন্ত্র সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যে গাঁথা কবির নানা গানের যে মিলিত বিশিষ্ট গীতিভঙ্গিটি অনুসৃত হয় তাহারই নাম দেওয়া যায়– 'রবীন্দ্র সঙ্গীত পদ্ধতি'।

এই বিশাল সঙ্গীত মহাপারাবারের মধ্য হইতে কয়েকটি গান নিজস্ব সম্পদে অপর গানগুলি হইতে স্বতন্ত্র—এইগুলি রবীন্দ্র সঙ্গীতের কূলহারা সাগরের এমন কয়েকটি সবুজ তটরেখা যে, এইগুলিকে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্র সঙ্গীত নানা রাগ-রাগিণী অবলম্বনে বিভিন্ন গীতিভঙ্গিমায় রচিত হইলেও গায়কী পদ্ধতির বৈচিত্র্যের অভাবে অনেকটা Monotonous হইয়া যায়—এই গানগুলি সেই সময়ে কবির অনবদ্য সুর-প্রতিভার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমাদের বাংলা গানে সেই সঙ্গে তাঁহার নিজেরও গানের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে যাইয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন—"আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগ-রাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যে ভাবেই গান রচনা করি, এই রাগ-রাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন, যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়া নিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য দান করিতেছে। যে দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে সেখানে পার্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক না কেন, রাগ-রাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।"

সুরের ঐ 'বিশেষ নিত্য রসটি' রবীন্দ্রনাথের হাতে কাব্যের রসেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সকল গানের মূল ভাবটি কাব্যেরই উপযুক্ত, সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্যতা তাহাতে অল্পই আছে !

এই পনেরোটি গান রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে outstanding peculiarities দাবী করিতে পারে—

(১) কালী কালী কালী বলো রে আজ—বাল্মীকি প্রতিভার দস্যুদলের মাতলামির গান এইটি। Nancy Lee নামে একটি ইংরাজী গানের সুরকে অবলম্বন করা হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথের উল্লাসের রসের গানের মধ্যে এইটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইংরাজী Dance Music-এ অনেক অংশ রীতিমতো 'হৈ হৈ'র মধ্যেই প্রকাশ হয়—এই গানটিতে তাহাও রাখা হইয়াছে—

আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয়, জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়।

(২) "এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা।"

এই গানটিতে একটানে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গাহিবার রীতি, কোথাও কোন কলির পুনরাবৃত্তি নাই। ইমন-ভূপালি মিশ্রসুরে লঘুগতিতে গানটি কেবল রবীন্দ্র সঙ্গীতেই নয়, ভারতীয় সঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন ইঙ্গিত করিয়াছে। আমাদের গানে অনেক পুনরাবৃত্তি গতিকে মন্থর এবং সুরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—এই গানটি সেই পুনরাবৃত্তি বা 'ফিরে গাওয়া' হইতে মুক্ত থাকিয়া বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করিয়াছে; একটি মাত্র বাণী অংশ 'যদি কিছু মনে পড়ে' ভাবের গতিরে দ্বিতীয়বার গাওয়া হয়।

(৩) কৃষ্ণকলি, আমি তারেই বলি—

এই টপ্পা-ভঙ্গিমার গানে কবি বাংলার অতি পরিচিত 'কথকতা'র ভঙ্গিটি গ্রহণ করিয়াছেন। গাহিবার রীতিতে কথকঠাকুরের বলিবার ধরণে সুরকে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'কালো? তা সে যতই কালো হোক'—এইখানে প্রশ্ন করিয়াই তৃপ্তিসূচক আশ্বাসে কালোর মনোহারিতা প্রকাশ অপূর্ব। সুর, মিশ্র (কীর্তনাশ্রিত)

(৪) সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি—এই গানটিতেও Church Music-এর সুরপদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। সুরটি অবশ্য অন্যান্য ব্রহ্মসঙ্গীতের ন্যায় একটি হিন্দী গানের অনুরূপ—

দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী কৃপা কুরু শিউ শঙ্করী মা

(৫) পরবাসী চলে এলো ঘরে, অনুকূল সমীরণ ভরে—অনেক সময় খুব বড় গানে সুর দেবার সময় কবি একটি মাত্র রাগিণী গ্রহণ করিতে পারেন নাই—একই গানে একাধিক রাগিণীর দ্বারা ভাগ করিয়া ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রবাসী' আদি কবিতাটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন—'ইমন কল্যাণ এবং মিশ্র রামকেলি'তে

(৬) ওগো বধূ সুন্দরী—(এই গানটি-ই কবির শ্রেষ্ঠ অনুভূতির গান। কবিরও বোধহয় বিশেষ প্রিয় ছিল) গানটি নানা ভাবে ও ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন সুরটিকে। প্রথম রূপটি প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩১ সালে। গানের পরিচয়ে ছিল: "শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত "সাত ভাই চম্পা" নামক চিত্র সহযোগে পরিণয় উপহার রূপে রচিত বধূমঙ্গল।"—

ওগো বধূ সুন্দরী,
নব মধু-মঞ্জরী,
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন:—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন-রাত্রে
স্বর্ণের স্বর্ণের ছন্দের স্পন্দন।
এনেছি বসন্তের
অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন।
পারুলের হিল্লোল,
শিরীষের হিল্লোল,
মহুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ।
উল্লাস-উত্তরোল
বেণুবন-কল্লোল
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখি-পল্লবে
দিনু আঁখি-বল্লভ
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন (মিশ্র ভৈরোঁ)

তাহার পর প্রথম কলির অংশ রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক রূপটি গ্রহণ করে কোন এক বিবাহের বধূর অভিবন্দনায়—

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি নবু মঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন;—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মালোর বন্ধন।

১৯৩৪ সালে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য অভিনয়ের সময় গানটির ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া সুরে 'ইমন-কল্যাণ' গৃহীত হইল—কিন্তু মূল ঝঙ্কার এবং কাব্য-স্পন্দনটি বজায় আছে—

নমো নমো শচীচিত্ত রঞ্জন
সন্তাপ ভঞ্জন
নব জলধর কান্তি ঘন নীল অঞ্জন
নমো হে, নমো নমো।
নন্দন বীথির ছায়ে
তব পদ পাতে নব পারিজাতে
উঠে পরিমল মধুরাতে,
নমো হে, নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীর বন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকর গঞ্জন
নমো হে, নমো নমো॥ (ইমন কল্যাণ)

পর বৎসর 'বর্ষা মঙ্গল' উৎসবে সেই গানটির রূপ হইল বর্ষা বন্দনায়—

এসো নিখিলের পিপাসা ভঞ্জন
এসো গম্ভীর কান্তি
ঘন নীল অঞ্জন॥

পরে আরও সুন্দরতর করিলেন নৃত্যের ছন্দ গ্রহণ করিয়া—

তুমি সন্তাপে শান্তি
তুমি সুন্দর কান্তি
তুমি এলে নিখিলের পিপাসা ভঞ্জন।
এঁকে দিলে ধরাবক্ষে
দিক রমণীর চক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরস রঞ্জন॥

সর্বশেষ রূপটি আছে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে—বেহাগের সুরে সমবেত নৃত্যের ভঙ্গিতে—

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে, এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে রক্তের নৃত্যে
বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন।
উঠেল উতরোল যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণু বনে মর্মরের চুম্বন;
আনো নব পল্লবে নর্তন উল্লোল
অশোকের শাখা ঘেরি' বল্লরী বন্ধন॥

(৭) হে নিরুপমা—কণিকার এই বিখ্যাত কবিতাটি 'তাসের দেশে' নাটকে গানে পরিণত হইয়াছে। চারিটি স্তবকে পৃথক চারটি সুর ও ছন্দ ব্যবহার করিয়া গানটিকে অপূর্ব সুরমাধুর্যে রূপায়িত করিয়াছেন—

চপলতা আজ যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা—(সিন্ধু)
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা—(দেশ)
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা—(মিশ্র বসন্ত)

চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা
তোমার চখানি কালো.....(মিশ্র রামকেলি)

(৮) বন্ধে তোমার বাজে বাঁশি—এই গানটিতে কবি কীর্তন এবং বাউলকে একসঙ্গে মিশাইয়াছেন। বাংলার লোকসঙ্গীতের দুইটি বিভিন্ন সুরভঙ্গিমার সম্মিলিত প্রকাশ—এই 'বাউল কীর্তনে'; রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এই শ্রেণীর গম্ভীর ভঙ্গির বাউল কেহ রচনাও করেন নাই; কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার পরে 'বাউল কীর্তন' সৃষ্টি করিয়াছেন—'যদি তোর হৃদ যমুনা হলো রে উছল রে ভোলা'।

(৯) বঁধু, কোন আলো লাগল চোখে—ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ধ্রুপদ-ভঙ্গিমার গান, দ্রুত এবং বিলম্বিত দুইটি লয়ে ভাগ করিয়া গাওয়া হয়। কবি বৈচিত্র্যের জন্য তাঁহার কোন কোন গানে তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন; এই গানটিতে—

বিলম্বিত লয়ে—

বঁধু কোন আলো লাগল চোখে (প্রথমাংশে)

তাহার পর দ্রুতলয়ে—

বুঝি দীপ্তি রূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি'
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি',
ছিল মর্ম-বেদনা ঘন অন্ধকারে
জন্ম-জনম গেল বিরহ শোকে॥

আবার বিলম্বিত লয়ে—

অস্ফুট মঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীত-শূন্য বিষণ্ণ মনে, কুঞ্জ বনে।

তাহার পর আবার দ্রুতলয়ে—

অস্ফুট-মঞ্জরী কুঞ্জ বনে
সঙ্গীত-শূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গি রিক্ত চির দুঃখ রাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো ব'হে
অবগুণ্ঠন ছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।

শেষে অতি মন্থর লয়ে—

কোন আলো লাগল চোখে।

(১০) এসো শ্যামল সুন্দর—এই গানটির সুর সেতারের বাজনার একটি গৎ ভাঙিয়া সৃষ্ট। সেতারের দ্রুত—'দা,ধারা'-ছন্দের অনুরূপে বাণী সংযোজন করিয়াছিলেন।

(১১) নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন—এই গানটির সুর একটি তামিল ভজনের অনুকরণে রচিত। মূল গানটির রচয়িতা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাতা গায়িকা 'শ্রীমতী বীণাক্ষি দেবী'।

(১২) ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী—এই গানটি কবির নিজস্ব সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ রাগসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। সুরটি 'পরজ বসন্ত' (বাদী গান্ধার, সম্বাদী নিখাদ ; কোমল রে, দুই ধা) গম্ভীর কারুণ্যের ভাবটিই প্রকাশ করে।

(১৩) থামাও রিমিঝিমি ঝিমিঝিমি বরিষণ—অতি দ্রুত ছন্দের গান কবির অল্পই আছে ; তাহার মধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য, বর্ষার সজোর জলধারার শব্দ অনুকরণে সুরটির গতি।

(১৪) আজি তোমায় আবার চাহি শুনাবারে—এই গানটি বেহাগের সুরে রচিত। বর্ষার বর্ণনায় ঋতু অনুযায়ী রাগিণী গ্রহণ না করিয়া বসন্তের সুরকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(১৫) তোমার বীণা আমার মনোমাঝে—এই গানটি কবির রচনা, কিন্তু সুর শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের দেওয়া। তিলোক কামোদ ও বেহাগের মিশ্রণ ঝাঁপতাল। "গত ১২ই এপ্রিল তারিখে কবিবর শান্তি নিকেতনে আমাকে তাঁর এই গানটিতে সুর দিতে বলেন। তার পরদিন গানটিতে এই সুরটি সংযোজিত করে তানালাপ শুদ্ধ আমি তাঁকে শোনাই। কেবল এই কথা ব'লে রাখা দরকার মনে করছি যে, সেরূপ তানালাপ কবিবরের সুর-সংযোজন ভঙ্গির প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে, তাঁর যে-কোনও গানে অপরে স্বরচিত সুরসংযোজন করে গাওয়া সম্পর্কে তাঁর পূর্বমতের পরিবর্তন হয়েছে"।

এই ভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথের গান বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে! কেবলমাত্র কাব্যাশ্রিত গানগুলির কথা স্বতন্ত্র। সেইগুলি সুর-মর্যাদায় ম্লান, নিকৃষ্ট! কেবল সুরকৌশল প্রদর্শনের গানগুলিও সুন্দর নয়; বাণী ও সুরের সম্মিলনে সুন্দরতম হইয়া উঠিয়াছে যে গানগুলি, সেইগুলিই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন।

গায়কী কৌশলের গান তাঁহার অসংখ্য আছে—মধ্য জীবনে এইগুলির সৃষ্টিতে তিনি তানেরও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই গানগুলির বৈশিষ্ট্য গাহিবার কৌশলেই—(১) অশ্রুভরা বেদনায় (২) বেদনা কি ভাষায় রে (৩) বন্ধু রহো রহো সাথে (৪) কখন দিলে পরাতে (৫) কার বাঁশী নিশি ভোরে (৬) কোথা যে উধাও হল প্রভৃতি।

গন্ধদ্রব্য ও তাহার নিষ্কাশন প্রণালী

শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী

গন্ধদ্রব্য প্রচলনের ইতিহাস নব্য-সভ্যতার অনেক আগেই রচিত হয়েছে। গন্ধসামগ্রীর ব্যবহার অতি প্রাচীন আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য যুগে গন্ধদ্রব্যের প্রচলন ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। জীবন্ত বন্য ফলমূল হাতের কাছে যা মিলত তাইতেই উদর পূর্তি করা ছিল সে যুগের অধিবাসীদের একমাত্র কাজ এবং একমাত্র সমস্যা। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার ক্ষীণ রশ্মি আলোকসম্পাত করে যুগের অন্ধ বুকের উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠে গোষ্ঠি, সমাজ, সভ্যতার নিয়মকানুন। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে ক'রে নিয়েছে সুযোগ সুবিধার বশবর্তী। তখন নিত্য নূতনের আবিষ্কার করাই হ'ল তার কাজ। জীবনের অভাব-অনটনগুলো বুঝতে শেখা ও তার পূরণ করাই হ'ল তার একমাত্র সমস্যা। স্বভাবজাত সুগন্ধি বন্য ফুল, লতাপাতা ও কাষ্ঠ বন্য মানুষকে আকর্ষণ করেছে নিশ্চয়। শিকারের পিছনে ছুটতে ছুটতে হয়ত থমকে দাঁড়িয়েছে বন্য ফুলের মিষ্টি মধুর সুগন্ধ আকর্ষণে। হয়ত ক্ষণেকের জন্য সে ভুলেই গিয়েছিল তার শিকারের কথা—তার সারাদিনের উপাদেয় আহার্যের চিন্তা। সভ্যতার ঈষৎ আলোকিত যুগ থেকে সুগন্ধের অনুভূতি মানুষকে ঘিরেছে সাড়া দিয়েছে রোমাঞ্চ—ফলে গন্ধদ্রব্য হয়ে পড়লো তার মনোরঞ্জনের সামগ্রী।

গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। প্রাচীন-কালে মুনি ঋষিদের জীবনযাত্রায় সুগন্ধিদ্রব্যের বহুল প্রচলন ছিল। তাঁদের পূজা, হোম, সেবার্চনায় সুগন্ধসামগ্রী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার আমলেও গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ছিল। চীন দেশের অতি প্রাচীন গ্রন্থে এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ তিন হাজার বছরেরও আগে প্রাচীন মিশরে গন্ধদ্রব্যের প্রচলন ছিল। তাঁদের জীবনযাত্রার নানা লীলা-বিলাসে নিত্য নূতন উপকরণের মধ্যে গন্ধসামগ্রীর স্থান বেশ উর্ধ্বে ছিল। মিশরীয় রাজা টুটেন খামেনের কবরে গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২২ খৃঃ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ টুটেন খামেনের কবরের অভ্যন্তরে গন্ধদ্রব্যের আধার দেখতে পান এবং ঘ্রাণ নিয়ে তাঁরা দেখেন যে, সেই তিন হাজার বছরেরও আগেকার রক্ষিত আধারে সুগন্ধিদ্রব্যের মৃদুগন্ধ তখনও লেগে আছে।

গন্ধদ্রব্য প্রচলনের ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এর ব্যবহার এশিয়া থেকে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। এশিয়াই আদিম সভ্যতার জন্মভূমি। এই এশিয়াতেই গন্ধদ্রব্যের সর্বপ্রথম প্রচলন হয়—পাশ্চাত্যের গর্বিত সুধী সমাজ একথা স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন রোমক সভ্যতায় গন্ধদ্রব্যের প্রচলন ছিল। প্রাচীন রোমক-স্নানাগারে গন্ধ-বিলাসের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়, মিশরীয় ও চৈনিক সভ্যতার অনেক পরে রোমক সভ্যতার উন্মেষ হয়। এশিয়া থেকেই এর প্রচলন অন্যান্য স্থানে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। গন্ধদ্রব্যের প্রচলন ইউরোপে বহু পরে হয়েছিল। পার্শিক ও আরবীয়ানরা এই গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার জানত তার বহুল প্রমাণ আছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুরাই যে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারের প্রচলন করেছিলেন একথা সলজ্জে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন পশ্চিমের সমাজমণ্ডলী।

ভারতবর্ষ সুগন্ধদ্রব্যের আধারস্বরূপ। এ-দেশেরই মাটীর বুকে বিভিন্ন গাছের সুগন্ধযুক্ত মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ পাওয়া যায়। এইসব উপাদানই সুগন্ধ-সারের উৎস। এইসব সুগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ, মশলা ভারতের অঙ্গে মিশে আছে আর আছে ভারত মহাসাগরের দ্বীপ-সমূহে অপর্যাপ্ত পরিমাণে। এরই লোভে বিদেশী বণিকেরা ভারতে হানা দিয়েছে বার বার। দুস্তর দুরন্ত-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলরাশী অতিক্রম ক'রে জীবন-মরণের শঙ্কা না রেখে অবাধে তাদের আগমন ঘটেছে ভারতের কূলে উপকূলে। জাহাজ পূর্ণ হ'য়ে চলে গেছে রাশী রাশী সুগন্ধদ্রব্য, মশলা প্রভৃতি বিদেশের মাটীতে।

আমাদের দেশের বণিক এবং সদাগরেরাও তাঁদের নৌকা পূর্ণ ক'রে বিদেশে বাণিজ্য করতেন নানাপ্রকার সুগন্ধি-দ্রব্যের।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় এই গন্ধদ্রব্য শুধু পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞেই ব্যবহার হত না ; ঔষধ হিসাবেও এর বহুল ব্যবহার ছিল—তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক যুগের আলোকিত দিনে বহু গন্ধদ্রব্যের "জীবাণুনাশক" গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এন্টিসেপ্‌টিক বা প্রতিষেধক হিসাবে এর ব্যবহার প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সর্বৌষধি মেশান জলে স্নান করার আগে প্রথা ছিল। এই সর্বৌষধি প্রস্তুত হ'ত নানা সুগন্ধি উদ্ভিদের মূল, পাতা, ফল, ফুল প্রভৃতি হ'তে।

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন সুগন্ধি কাঠ, মূল, ফুল, ফল ইত্যাদি হ'তে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত হ'ত। মুসলমান আমলে গোলাপ ফুল হতে গোলাপের আতর এদেশে আসে। মৃগ-কস্তুরী আসে চীন দেশ হ'তে। চীন দেশই সর্বপ্রথম মৃগনাভি হতে সুগন্ধি কস্তুরী-নির্যাস প্রস্তুত করে। পরে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের সাহায্যে সুগন্ধদ্রব্য তৈরীর রীতি প্রচলিত হয়। তারপর স্বভাবজাত সুগন্ধিদ্রব্য ছাড়াও রসায়নের সাহায্যে প্রস্তুত আজকাল অনেক কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাশী রাশী সুগন্ধযুক্ত কাঠ, মূল, ফুল, ফল ইত্যাদি আমরা বিদেশে পাঠাই আর তাই নিয়া শত শত নানারূপ সুগন্ধি তেল, সেণ্ট, নির্যাস সুরমা আধারে পূর্ণ হয়ে এসে আমাদের মনোরঞ্জন করে। অবশ্য আমাদের দেশেও আজকাল যথেষ্ট পরিমাণ নিষ্কাশন কার্য হয়ে থাকে।

সুগন্ধি ফুল, পাতা, মূল, কাঠ হতে যে গন্ধ পাওয়া যায় সেটা সাধারণত আমরা পাই কতকগুলী উদ্বায়ণীয় জৈব রাসায়নিক দ্রব্য হ'তে। বিভিন্ন ফুল, ফল, পাতা, মূলে ঐ সুগন্ধ উদ্বায়ণীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলী বিভিন্ন মাত্রায় থাকে। এই দ্রব্যগুলিই হচ্ছে উদ্ভিজ্জ সুগন্ধি-তেল বা গন্ধদ্রব্য। আর এইগুলীকে বিভিন্ন তেল যেমন, নারিকেল, অলিভ, তিল মিশিয়ে হয় গন্ধ-তেল ; আর এ্যালকোহল, স্পিরিট ইত্যাদি দ্রাবকে ঐ দ্রব্যসকল গুলিয়ে বিভিন্ন আতর, সেণ্ট, নির্যাস, আরক প্রভৃতি পেয়ে থাকি এবং ব্যবহার করি।

বহু রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সম্মিলনে স্বভাবজাত উদ্ভিদের সুগন্ধ আমরা পাই। অর্থাৎ ফুল, ফল, মূল, কাঠ পাতার স্বভাবজাত গন্ধ ঐ অনেকগুলী রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র মিলনের ফলে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে ও কালের আবহাওয়ায় কিন্তু দ্রব্যগুলির পরিমাণের তারতম্য ঘটে। যেমন, ইউরোপ ও ভারতের গোলাপের মধ্যে গন্ধের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়—গোলাপের মধ্যে "জিরানিওল" নামে এক-প্রকার জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য থাকে, যাহা গোলাপ গন্ধের একটি বিশিষ্ট অংশ, তার পরিমাণের তারতম্য ঘটার দরুণই ঐরূপ হয়।

উদ্ভিদের সুগন্ধ অংশগুলীতে যে জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়, সেগুলীকে সাধারণতঃ কয়েকটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, হাইড্রোকারবন, ইথার, এ্যালকোহল, এলডিহাইড, কিটোন, ফিনল, জৈব এসিডের "এষ্টার" ইত্যাদি। এই বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যগুলীর মধ্যে আবার বিভিন্ন নামের অন্যান্য দ্রব্য আছে। যেমন হাইড্রোকারবণ জাতীয় দ্রব্যগুলী, যথা—সিবসিন, ওসিমিন, লিমোনীন, পাইনিন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। এ্যাল-কোহল জাতীয় দ্রব্যগুলী যেমন—জিরানিওল, বোর্ণিওল, টার্পিনল, বেনজিল ইত্যাদি আরও অনেক। ফেনল জাতীয়—থাইমল, ইউজেনল ইত্যাদি ইথার জাতীয়—ইউকেলিপ্‌টল, এনিথোল ইত্যাদি। এ্যালডিহাইড জাতীয়—এনিসালডিহাইড, বেনজ্যালডিহাইড ইত্যাদি। কিটোন জাতীয় দ্রব্যগুলী—ক্যামফর, কার্ভোন, পিপা-রিটোন ইত্যাদি। আর এষ্টার জাতীয় দ্রব্যগুলী হচ্ছে—এসিটিক, বেনজয়িক ব্যুটিরিক প্রভৃতি এসিডের 'এষ্টার'।

এখন উদ্ভিদ-দেহের ওই সমস্ত সুগন্ধদ্রব্যপূর্ণ অংশ-গুলী হতে কিরূপে গন্ধ-তেল ও গন্ধদ্রব্য বের করা হয়

তার কথা আলোচিত হবে। উদ্ভিদ দেহ হ'তে কিরূপে গন্ধ-তেল নিষ্কাশন করা হয়, তার জন্য কতকগুলী প্রণালী বা নিয়মকানুন আছে। নিষ্কাশন প্রণালীকে সাধারণতঃ চারটী ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে—জলীয় বাষ্পের সাহায্যে চোয়াইয়া; দ্বিতীয় প্রণালী—চাপ দিয়া; তৃতীয় হচ্ছে—উদ্বায়বীয় দ্রাবকের সাহায্য নিয়ে, আর চতুর্থ পন্থা—পাতলার চর্বিতে রেখে, পরে ঐ চর্বি হতে দ্রাবকের সাহায্যে।

উদ্ভিদ-দেহে এই সুগন্ধ তেলগুলী—এমন অবস্থায় থাকে যে, জলীয়-বাষ্প এবং চাপের সাহায্যে সহজে তা বেরিয়ে আসে। কখনো গ্লিসারাইড্ হিসাবে থাকে, তখন "এনজাইম এ্যাকশনের" সাহায্যে তাকে বার করা হয়।

গন্ধ-তেল নিষ্কাশনে সাধারণত এই কয়টি পন্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতি—: বক-যন্ত্র বা রিটর্ট (Retrot) বা অন্য এরকম কোন আধারে প্রথমত উদ্ভিদের সুগন্ধ অংশগুলী (যেমন—মূল, কাঠ, পাতা ফুল, রেণু ইত্যাদি) রেখে তাতে কিছুটা জল দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে গরম করতে হবে। যখন জল ফুটতে থাকবে তখন ঐ জলীয়-বাষ্পকে পৃথক একটী আধারে ধ'রে রাখতে হবে। এখন ওই জলীয়-বাষ্পের মধ্যেই আছে উদ্ভিদ-দেহের গন্ধবিশিষ্ট তেল অংশ। তারপর জল হতে অন্যপ্রকার প্রক্রিয়ায় তেলকে পৃথক করা হয়। আবার কখনও কখনও জলকে গরম করা হয় পৃথক একটী ফ্লাস্কে এবং ঐ জলীয়-বাষ্পকে পাঠান হয় ঐ উদ্ভিদের অংশপূর্ণ বক-যন্ত্রে। গন্ধপূর্ণ জলীয়-বাষ্পকে পরে অন্য একটী আধারে ধরে রাখা হয়। সময় সময় উদ্ভিদের সুগন্ধ অংশগুলী ভাল ক'রে চূর্ণ ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন হয়—তাতে উদ্ভিদ দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে তেল অংশ নিষ্কাশিত হয়। এই গন্ধ-তেলের পরিমাণ নির্ভর করে স্থান, কাল ও আবহাওয়ার উপর।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :—উদ্ভিদের দেহে এমন কতকগুলী সুগন্ধ অংশ আছে যেগুলী হ'তে গন্ধ-তেল আগের পদ্ধতি অনুসারে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা যায় না। ঐ প্রণালী অনুসরণ করলে গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অন্য উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। এই উপায়টী হচ্ছে চাপ দ্বারা নিষ্কাশন প্রণালী। অনেক ফলের ছালে বা খোসায় গন্ধ-তেল থাকে। যেমন লেবু। লেবুর ছাল হ'তে যদি জলীয়-বাষ্পের সাহায্যে তেল নিষ্কাশন করা হয় তা হ'লে তেলের গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য সেক্ষেত্রে চাপ দ্বারা তেল নিষ্কাশন করা হয়। যে সমস্ত ফলের ছালে এই তেল থাকে সেই ফলের ছাল ভাল ভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে স্পঞ্জের মধ্যে রেখে চাপ দিতে হয়। চাপের ফলে তেল ছাল থেকে বেরিয়ে আসে। আবার এই প্রণালী অন্য ভাবেও করা হয়। ফলের ছাল বের করে নিয়ে তাতে সোডিয়াম বাই কার্বনেট ছিটিয়ে দিয়ে এক প্রকার মেশিনে দিয়ে তেলকে বার করা হয়। এই যন্ত্রটীকে বলা হয় "সেন্ট্রিফুজ মেশিন"।

তৃতীয় পদ্ধতি :—এই পদ্ধতি উদ্বায়বীয় 'দ্রাবকের' (Solvent) সাহায্য নিয়ে করতে হয়। নানা প্রকার সুগন্ধি ফুল যেমন; গোলাপ, যুঁই, বকুল, চাঁপা ইত্যাদি থেকে দ্রাবকের সাহায্যে গন্ধ-তেল বার করা হয়। কেননা, জলীয়-বাষ্প বা চাপ দ্বারা ঐ সব ফুল থেকে গন্ধ-তেল বার করা সম্ভব হয়না। তাতে আসল গন্ধ বিকৃত হয়ে যায়—ফলে উপরিউক্ত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এর গুণ হচ্ছে ফুলের সুগন্ধযুক্ত তেলটুকু শুষে নেয়—জলীয় অংশ নেয় না। এখন ঐ গন্ধযুক্ত দ্রাবকটী সহজে উবে যায় ব'লে তাকে পাতন (Distillation) করা হয় অতি সহজে—ফলে তেলের অংশ সহজে পৃথক হ'য়ে পড়ে। এই ভাবে যে তেল পাওয়া যায় তা হচ্ছে একদম খাঁটী।

চতুর্থ পদ্ধতি :—এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ চর্বির মধ্যে সুগন্ধি উদ্ভিদের অংশগুলী কয়েকসপ্তাহ রাখতে হয়। চর্বির স্তরের উপর এক স্তর সুগন্ধি চূর্ণ রেখে তার পর আর এক স্তর চর্বি, এমনি ক'রে কয়েক স্তর সাজিয়ে কিছুদিন রেখে দিতে হয়। চর্বির গুণ হচ্ছে ঐ উদ্ভিদ-অংশের সুগন্ধকে নিজে টেনে নেয়। পরে ঐ গন্ধযুক্ত চর্বিকে ঠাণ্ডা এ্যালকোহলে দিয়ে নিষ্কাশন করা হয়।

ঠাণ্ডা এ্যালকোহল দেবার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে তাতে সুগন্ধটুকু নষ্ট হয় না। ঠিকই বজায় থাকে।

গন্ধ-তেল, গন্ধদ্রব্য ছাড়া ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার হয়। ঔষধ হিসাবে জোয়ানের আরক, কর্পূর, ধাক্কচিনি, লবঙ্গ, ইউকেলিপ্‌টাস, আদা, পাইন, চন্দন প্রভৃতির ব্যবহার অতি পরিচিত। আবার শিল্পকাজেও এই তেলের ব্যবহার আছে। বস্ত্র-শিল্পে, বার্ণিশে এবং সেলুলয়েড তৈরীর কাজে পাইন, ইউকেলিপ্‌টাস প্রভৃতি তেলের প্রয়োজন হয়।

অতি প্রাচীন কালে গন্ধ নিষ্কাশনের এই সব পদ্ধতি ও নিয়মকানুন ছিল না। টাট্‌কা ও শুকনো ফুল, গুঁড়া চন্দন আগুনের সাহায্যে সুগন্ধপূর্ণ ধোঁয়ার সৃষ্টি ক'রে তার গন্ধ উপভোগ করার প্রথা ছিল। সে যুগের অধিবাসীরা জানতোও না যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে এই গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। পরে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একে একে তার চোখে সবই ধরা পড়ে গেছে। এখন স্বভাবজাত গন্ধ-তেল ও যৌগিক উপায়ে প্রস্তুত কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্য সকলের ব্যবহারের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে।

আজকাল যৌগিক উপায়ে স্বভাবজাত গন্ধ-তেল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, স্বভাবজাত ফুলের বা অন্য কোন উদ্ভিদ্-দেহের সুগন্ধি অংশের গন্ধ কতকগুলী রাসায়নিক দ্রব্যের একত্রে মিলনের ফল। এখন সেই রাসায়নিক দ্রব্যগুলী একত্র মিশালে স্বভাবজাত গন্ধের অনুরূপ গন্ধ পাওয়া যাবে। তবে এগুলি করা সহজ সাধ্য নয়। গন্ধ-দ্রব্য মিশান একটী বিশিষ্ট শিল্প। সুন্দর, মৃদু মধুর দীর্ঘকাল স্থায়ী গন্ধই হচ্ছে গন্ধ-তেলের প্রধান গুণ। মিশ্রণ প্রণালী ঠিক হ'লেই তবে গন্ধ-তেল উৎকৃষ্ট হয়। বাজারে যে সব গন্ধ-তেল, সেণ্ট, আরক ইত্যাদি পাওয়া যায় সেগুলী এই গন্ধ-তেলের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত হয়। গন্ধ-তেল উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রব অবস্থায় নারিকেল, অলিভ, বাদাম ও তিল তেলের সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়। শুধু দ্রাবকে অর্থাৎ এ্যালকোহল, স্পিরিটে দ্রব অবস্থায় হয় সেণ্ট, আতর, নির্যাস ইত্যাদি। আর ভেসলিন, চর্বি, মোম, প্রভৃতির সহিত ঐ সুগন্ধ মিশিয়ে হয় স্নো, ক্রীম ইত্যাদি। সাবানের সাথে মিশিয়ে হয় সুগন্ধি সাবান। এই প্রসাধন সামগ্রীগুলীই গুণাগুণের তারতম্য ভেদে এবং প্রচার রীতির ফলে হয়ে পড়ে বিখ্যাত এবং সর্বজন প্রিয়।

পিতা

শ্রীকৃতান্ত নাথ বাগচী

(গল্প)

ছেলেদের ইস্কুল। টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। শিক্ষকগণ একে একে ক্লাস হ'তে বেরিয়ে গেলেন। ছাত্রদের সকলে কলরব তুলে এই সাময়িক অবকাশের আনন্দ যে যেভাবে পারে উপভোগ করতে লাগল।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষতলে একদল কিশোর জুটেছে তারা নিম্নশ্রেণীতে পড়ে। তারা যে সুদর্শন বালকটিকে ঘিরে ধরেছে—সে যেমন নিষ্পাপ তেমনি নিরীহ। একটা প্রাচীন প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে নরম মাটীতে না কি সকলেই কামড় দেয়। বালকটী শান্ত ও সুশীল স্বভাবের। তাই তার দুরন্ত সঙ্গীরা তাকে রীতিমত তাক্ত-বিরক্ত করে তুলেছে। আজই সে নতুন এই শিক্ষাসদনে ভর্তি হবার জন্য এসেছে। তাকে কেউ দেখেনি এর আগে।

ভাল মানুষী করে তাকে কেউ শুধাল—"তোমার নাম কি ভাই?"

সে মিষ্টস্বরে জবাব দিল—"অঞ্জন।"

"অঞ্জন! বেশ নাম তো। কে রেখেছে?"

"মা।"

"তোমার বাবা রাখেনি কেন? তোমার বাবার নাম কি?"

এইবার সে হেরে যায় যেন। কে তার বাবা—কবে কোথায় ছিলেন—কেনই বা আজ নাই—তাঁর নাম কি—সে তো জানে না।

"ওকি ভাই—চুপ করে রইলে কেন—বল? আমাদের সকলের বাবা আছে। নিজের নিজের বাবার নাম আমরা প্রত্যেকে জানি।"

অঞ্জনের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তার চারিদিকে উদ্‌খল বালকের দল করতালি দিয়ে চীৎকার করে বলে—"বাবা নাই—বাবা নাই। তার নাম নাই।" সে যতই কষ্ট পায়—তার সঙ্গীদের আনন্দ ততই বেড়ে ওঠে। টিফিন শেষের ঘণ্টাটি তাকে সে-যাত্রা নিষ্কৃতি দিল। সে যার মতন নিজের শ্রেণীতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

ছুটী চলে সে তার মায়ের কাছে চলে গেল—দৌড়ে। হেঁটে যাবার ধৈর্য তার হয়নি। তাকে জানতেই হবে তার বাবার নাম!

মা ছেলেকে দেখে অবাক। "এ কি! তোর কি কোন অসুখ করেছে বাছা? চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। আয় দেখি—কপালে হাত দিয়ে দেখি,গা তপ্ত কিনা। ওমা আমার কি হবে—কচি বুকখানি কেন এত ধড়ফড় করছে? যেন ছোটপাখীকে কে ঢিল মেরেছে, তাই সে মর্মান্তিক আঘাতে ধূলায় লুটিয়ে অত্যন্ত বেদনায় ডানা ঝটপট করছে। না, গা তো ঠিক আছে। তবে কি কেউ বকেছে?"

বিদ্যালয়ের জামা কাপড় খুলে নিয়ে—হাত পা ধুইয়ে—নতুন পোষাক পরিয়ে—মা তাকে আদর করে নিজের হাতে খাওয়ালেন। আজ অঞ্জনের সব বিস্বাদ লাগছে—মায়ের স্নেহ, আর যত্নে দেওয়া খাদ্য।

সে বলি বলি করে বলতেও পারছে না। তার মনে মনে কেমন ভয় ঘনিয়ে এসেছে, যদি মা না বলতে পারেন—তবে? সে তো দেখেনি তার বাবাকে—কোনদিন মা'র কাছে তার উল্লেখও শোনেনি। না সে বলবে না। মার কাছে সে মনের বেদনা লুকিয়ে রাখবে। তাই মা যখন শুধালেন "আজ বুঝি পড়া পারনি বলতে—তাই মাষ্টার মশাই বকেছেন....." সে তখন অনায়াসে এই গুরুতর অসত্য অভিযোগের বিরুদ্ধে একটী প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করল না, নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে মেনে নিল। মা স্মিত হেসে কইলেন—"ভাল করে পড়, তা হলেই তোমায় সাথে কেউ পারবে না। এ আমি জানি।"

সেদিনের মতন মেঘ যেন সেখানেই কাটল।

পরদিন বিদ্যালয়ে যেতে না যেতেই তার সমবয়সীর দল তাকে ঘিরে ধরে আবার সেই নিষ্ঠুর প্রাণহীন কৌতুকে মত্ত হ'ল।

"সেজেগুজে এসেছে—হেন কার্তিকটী।" কেউ কইল,

"আহা রে—বাপের নাম বলতে পারে না।"

"বাপ থাকলে তো বলবে?"

"দূর দূর—তাও কি হয়? কুকুর বেড়ালেরও তো বাপ থাকে"

"কুকুর বেড়ালের বাপ থাকে, কিন্তু তার ঠিক থাকে

তখন সবাই মিলে যেন খুব উঁচুদরের রসিকতা হয়েছে—এই ভাবে উচ্চকিত হেসে উঠল।

"ওকি, গাল যে সিঁদুর হয়ে গেল?"

"চোখ দুটী ছল ছল করছে।"

"কি আহ্লাদে ছেলে গো।"

"এক মা থেকেই এত—বাপ থাকলে না জানি কি হ'ত?"

ক্লাস বসার ঘণ্টা বাজল। ছেলেরা যে যার জায়গায় এসে বসল। তার সাথে কেউ এক বেঞ্চিতে বসতে চাইল না। যার পিতৃ পরিচয় নাই—বংশের পবিত্রতা নাই—সে সমাজের সবার সাথে বসবার যোগ্যতা এখনও তো অর্জন করেনি। পিছনের একখানি আধ-ভাঙ্গা ধূলি-ধূসর বেঞ্চির উপর সে ম্লানমুখে নিতান্ত অপরাধীর মতন বইখাতা নিয়ে বসে রইল।

ছুটীর পর সে মা'কে ধরে বসল—তার বাবার নাম বলবার জন্য। তার মা যেন চমকে উঠলেন। ছেলের এমন আকস্মিক কৌতূহল কেন? তাঁর বুক ভরে দুরু দুরু করতে লাগল, ঐ অতটুকু মানুষের কাছে তিনি আজ কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

অঞ্জনের সরল আয়তনীলাভ দুটী আঁখি হ'তে যেন অসংখ্য অগ্নিবাণ ছুটে এসে মা'র গহন মর্মের গভীরে আচম্বিতে বিঁধে তীব্র দাহে নিরন্তর দগ্ধ করতে লাগল।

"বলনা মা—বল না?" মার কাছে সে আব্দার করল। এ শুধু সন্তানের অনুযোগ নয়—এ যে তার দাবী—তার জন্মগত অধিকার ঘোষণা। পুলিশ যেন চোরের কাছে অপহৃত ধনসম্পদের গুপ্তস্থান সন্ধানের চেষ্টা করছে—এমনি তার মা'র মনের ভাবের কথা অঞ্জন জানতেও পারল না। মা শুধু তার দীর্ঘশ্বাস যেন অতিকষ্টে, অতি সাবধানে মনের কথা চেপে কইল—"বলব—সময় হলে বলব।"

গভীর রাতে সহসা অঞ্জনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শূন্য শয্যা। সে শুনতে পেল ঘরের অন্ধকারে কে যেন চুপি চুপি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে বুঝলে যে মা তাকে লুকিয়ে এই ভাবে নিদারুণ দুঃখভার সুপ্ত নিশীথে বিশ্ব জগতের লোক চক্ষুর আড়ালে চোখের জলধারায় গলিয়ে, ঝরিয়ে, বইয়ে আপন মুক্তির পথ পরিষ্কার করছে। সে কান পেতে শুনল। তার কেমন ভয় ভয় করে। কেন মা কাঁদছে? তার কান্নার জন্য দায়ী কে? সে কি! সঙ্কোচে তার শিশুপ্রাণ বিছানার সাথে মিশে যেতে চাইল। না না না—হে অন্ধকারের অন্তর্যামী দেবতা! তুমি সাক্ষী রও—সে আর মাকে এ প্রশ্ন করবেনা—করবে না—করবে না।

মানুষের যিনি বিধাতা পুরুষ, বোধ হয় তিনি নিষ্ঠুর পরিহাসপ্রিয়। গোলাপ কাঁটায় বিদ্ধ অসহায় প্রজাপতি যখন সকাতরে ছট ফট করে—তখন যে দুষ্ট বালক উল্লাসে করতালি দিয়ে এই শোকাবহ দৃশ্যটীকে আনন্দের উপলক্ষ করে তোলে—তিনিও তেমনি যেন। নইলে নির্দোষ অঞ্জনের যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন ব্যবস্থা তিনি কি ক'রে অদৃশ্য লেখনীতে ঐ সুকুমার কপালে লিখে দিলেন।

তার শ্রেণীর বালকরা পিতার প্রশ্ন নিয়ে তাকে বিব্রত, পীড়িত করে কি অদ্ভুত পরিতৃপ্তি যে পেতে লাগল। সে যতই অসমর্থ হয় তাদের উৎপীড়নের শক্তি ততই বেড়ে চলে। এই যানেই ঘটনাটীর পরিসমাপ্তি হ'লেও হ'ত।

বাড়ীতে বাড়ীতে অভিভাবকরা জানল—বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর অজ্ঞাত রইল না। এই ব্যাপার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হ'ল। সমাজের যাঁরা গুরু, পুরোহিত, কর্ণধার তাঁদের চিন্তাজগতে এই অজ্ঞাত কুলশীল বালকের আকস্মিক উপস্থিতি তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করল।

অঞ্জনের মা'র ইতিহাস কেউ জানত না। মেয়েটি অল্প বয়সে হ'ল এ অঞ্চলে এসে বসবাস করছে। নিশিগন্ধার শুভ্র শেফালীর মতন তার রূপ।

আপনার ক্ষুদ্র গৃহের সামান্য সংসারের মাঝেই তার নিভৃত জীবনের কয়রাত্ত দিন ও নিরালা নিঃসঙ্গ রাত্রির নিঃশব্দ আসা যাওয়ার বাইরের কারও কোন স্বার্থ ছিল না। সে সধবা—না বিধবা—না কুমারী—কেউ জানবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। আজ সহসা যখন এই পুত্রের পিতৃত্বের প্রশ্ন উঠল—তখন নানা লোকের কৌতূহলী চোখে ও সন্দিগ্ধ চিত্তে এই শান্ত অনাথা সুন্দরীর সম্বন্ধে বিবিধ কাল্পনিক চিত্র ও সম্ভব অসম্ভব কলঙ্কের কথা উঁকি মারতে লাগল।

শেষকালে বিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও সমাজের শুচিতা রক্ষার জন্য অপরিণত বুদ্ধি বালকসম্প্রদায় ও পরিণত বুদ্ধি শিক্ষকগণ ও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ—অভিভাবকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে—এই সহায়হীন, বলহীন কিশোরটীকে বিদ্যালয় হ'তে বিদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় অঞ্জনকে সবার সম্মুখে ডেকে প্রশ্ন করেন—

"তোমার অভিভাবক কে?"

অঞ্জন নতমুখে জবাব দিল—"মা।"

"তোমার বাবাকে দেখেছ?"

সজল কণ্ঠে উত্তর হ'ল—"না।"

"তোমার বাবার নাম কি বলতে পার?"

এবার দুটী সুন্দর তুলিটানে আঁকা চোখ দিয়ে শুধু অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল।

বিচারকের রায় ঘোষিত হ'ল—"এ বিদ্যালয়ে ভদ্র সন্তানদের সাথে একাসনে বসে শিক্ষালাভের যোগ্যতা তাদের নাই, যারা পিতৃ পরিচয় দিতে পারে না। তোমার এখানে স্থান হবে না। অন্যত্র দেখ।"

পণ্ডিত মশাই মন্তব্য করেন—"ওর মা'র সম্বন্ধেও বিধিব্যবস্থা করতে হয়। ঐ রকম নারী-চরিত্র সমাজে সকলের সম্মুখে যদি থাকে তবে সমাজ অধঃপাতে যাবে।"

সবাই তাঁর সাধুবাদ করলে।

সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ঐ চরিত্রের নারীর স্থান কোন একটী বিশিষ্ট পল্লীতে হ'তে পারে না।

অঞ্জনের সেদিন মনে হ'ল তার মরণ ভাল। জীবনের প্রতি তার আর বিন্দুমাত্র মায়ামমতা রইল না। ছি ছি ছি—মা'র উপর তার অত্যন্ত রাগ হ'ল। কেন তার বাবার কথা মা বলে না? মা'তো জানেন—তবে অকারণ এই নির্যাতন সহনের কি সার্থকতা আছে?

মা সব শুনলেন। তাঁকে কিছুতেই বিচলিত হ'তে দেখা যায় না। মা যেন মাটীর মতন সর্বংসহা। আদর করে ছেলেকে কাছে ডেকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিলেন—"ছি বাবা, তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার কি এত অধীর হতে হয়? তোমার বাবা আছেন। তাঁকে নাই বা পেলে কাছে—নাই বা জানলে তাঁর নাম। তুমি নিজে মানুষ হও। তবেই জগৎ বুঝবে যে তুমি মানুষের ছেলে—অমানুষের নও।"

অপমানিত নির্যাতিত নিষ্পাপ কিশোর-আত্মা স্নেহময়ী জননীর কোমল বক্ষের উপর মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত অভিমানের উদ্বেলিত আঁখি-জল মনের সকল ক্ষোভ মিটিয়ে অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল।

গভীর রাত্রি। মানুষের জগৎ সুপ্ত। নির্জন পথ, পথিকহীন। সেই নিঝুমঝিলি পথে যেন একটী প্রেতিনী চলেছে। সর্বাঙ্গ তার শুভ্রবসনে আবৃত। ধূসর ছায়া মূর্তিটী পথ অতিক্রম করে একটী বাড়ীর রুদ্ধদ্বারে আঘাত হানল। প্রহরারত কুকুরেরদল সজোরে ডেকে উঠল। গৃহস্বামীর ঘুম ভাঙল। কুকুরদের ধমক দিয়ে ধীরে ধীরে দুয়ার খুলে বিস্ময়ে তিনি শুধালেন—"কে তুমি এত রাত্রে?"

অবগুণ্ঠনবতী মৃদুস্বরে কহিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। ভিতরে চলুন বলছি।"

একটী আলোকিত কক্ষের দ্বারপ্রান্তে সে নারী অপেক্ষা করল। গৃহস্বামী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভিতরে চেয়ার টেনে

বসলেন। কোমল সজল কণ্ঠে রহস্যময়ী বললো—"আপনি এই অনাথার নিরপরাধ শিশুকে আজ বিদ্যালয় হ'তে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন।"

প্রধান-শিক্ষক মহাশয় এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন। গম্ভীর স্বরে কইলেন—"হ্যাঁ, যার পিতার পরিচয় নাই—তাকে আমরা শিক্ষা মন্দিরে স্থান দিয়ে বিদ্যাপীঠের পবিত্রতা কলুষিত করতে অক্ষম।" অঞ্জনের মা শান্ত মৃদুস্বরে কইল—"তার জন্মের জন্য সে তো দায়ী নয়। তবে কেন তাকে দণ্ড দেবেন আপনারা?"

প্রধান শিক্ষক মহাশয় গর্জে উঠলেন—"কোন স্রষ্টার কাছ হ'তে আমরা হিতোপদেশ শুনতে চাইনা, আমরা যা ভাল বুঝেচি তাই করেছি। তুমি দূর হও··· এত রাত্রে একাকিনী আমার ঘরে তোমাকে দেখলে লোকে আমাকেও মন্দ বলবে।"

এইবার নারী ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করে তার অবগুণ্ঠন ফেলে দিল। শরৎ শেষের কুমুদের মতন সুন্দর মুখখানি—দুটী প্রদীপ্ত অরুণ আঁখি, টলমল ঝলমল শুভ্র শিশির-বিন্দুর মতন অশ্রু।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। এতরাত্রে সে না এসে, নরকের সিংহদ্বার খুলে কোন প্রকৃত প্রেতিনী বেরিয়ে এলেও যেন অনেক ভাল ছিল।

স্রষ্টা দৃঢ়স্বরে শুধাল—"চিনতে পার?"

রোগার ঔষধের সম্মুখে হতবীর্য্য নতফণা ভুজঙ্গের মতন অবসন্নভাবে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বল্লেন—"পারি।"

"অঞ্জনের পিতার পরিচয় কি দিতে হবে? আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে কলঙ্ক স্পর্শ করতে দেব না—আমার ভাগ্যে—আমার সন্তানের ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন। কিন্তু তোমাদের জন্যই আমাকে সকলের সম্মুখে হয়তো সত্যপ্রকাশ করতে হবে।"

ধর্ষকাতা আজ মহা সমস্যার সম্মুখীন। বুমেরাং-এর মতন তার নিক্ষিপ্ত দণ্ড যে নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে অনন্ত প্রতিহিংসার প্রাণ ফিরে এসেছে! একে কি ক'রে প্রতিহত করা যাবে?

তাঁর প্রথম যৌবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন ইতিহাস ধীরে ধীরে অবচেতন মনের মাঝে উন্মোচিত হ'তে থাকে।

অঞ্জনের মা'র বাবার বাড়ী। তিনি ছিলেন কোন কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। প্রিয়তম ছাত্র নিরঞ্জন দরিদ্রের সন্তান বলে তাঁর বাড়ীতে থেকে কলেজের লেখাপড়া করবার অনুমতি পেল। অধ্যাপক কন্যা নন্দিনী মাঝে মাঝে নিরঞ্জনের কাছে কঠিন পাঠের দুরূহ সমস্যার সরল সমাধানের জন্য আসত।

নিরঞ্জন বি, এ পাশের পর চলে গেল কলকাতায় এম, এ পড়তে। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিয়ে গেল তার পরম উপকারী পালকের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক কুলে নিবিড় কালিমা লেপন ক'রে।

এর পরের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

অঞ্জন জেগে দেখে শয্যা শূন্য—ঘর শূন্য। তখন রাত্রি শেষের উজ্জ্বল তারাটি পূর্বাকাশে একখণ্ড হীরকের মতন ঝলমল করছে। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। মা—মা—মা কই? তারপর ভয়ার্তস্বরে ডাকল—মা-মাগো—মা! ভয় ও ভাবনায় তার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল—চোখের কোণায় জল। বাইরে এ-সময় মা উত্তর দিল—"এই যে সোনামণি এসেছি।"

"তুমি আমাকে ফেলে কোথায় গেছলে? আমার বুঝি ভয় করে না?"

"এই দেখ খোকা—তোমার বাবা এসেছেন।"

বাইরে যে মানুষটী দাঁড়িয়েছিল, সে অপরাধীর মতন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে অঞ্জনকে ব্যাকুল বাহুতে বুকে জড়িয়ে ধরল। অন্ধকারে অঞ্জন বুঝতেও পারল না যে তার পিতা সেই প্রধান শিক্ষক মহাশয়, যিনি তাকে পিতৃ-পরিচয়ের অভাবে সমাজ হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রচ্ছন্ন

শ্রীসমরেশ দাশগুপ্ত

(গল্প)

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণাল দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল একটা লেখার ওপর। "এ্যালকহলিক সিরোসিস অব দি লিভার"

লেখাটা নতুন কিছু নয়। তবু চোখ বুলিয়ে গেলাম। একবার নয়, বারবার। মনে হচ্ছে এই একটি লেখার পেছনে প্রচ্ছন্ন আছে যেন একজনের অস্পষ্ট মুখচ্ছবি। মিশে আছে ফেলে আসা দিনের পুঞ্জীভূত স্মৃতি।

স্মৃতির পর্দায় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে পর পর অনেকগুলো ছবি। অনেকদিনের পুরোনো ছবি—তবু কালের চাকার তলায় পড়ে পিষে যায়নি সে ছবি।—মিলিয়ে যায়নি মনের অন্তরাল থেকে।

...উত্তর বাংলার একটি সহর।

সহর জলপাইগুড়ি। মেডিকেল স্কুলের থার্ডইয়ার চলছে তখন আমার। ডাক্তারী পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু সাহিত্য চর্চাও করি। মনে আছে সন্ধ্যাটা কাটিয়েছি দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরের অসংখ্য বইএর মাঝে। লাইব্রেরীয়ান অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কতদিন করেছি বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা।

সেটা ছিল শ্রাবণেরই এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। রামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরে অক্ষয়বাবুর সংগে কথাবার্তা জমে উঠেছে বেশ। হঠাৎ দৃষ্টি আমার গিয়ে পড়ে জানলাতে। পাশের ঘরটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক কি যেন লিখে চলেছেন খুব মনযোগ দিয়ে। মাঝে মাঝে দৃষ্টি পড়ছে তাঁর সামনে খোলা মোটা মোটা বইগুলোর দিকে।

—'পাশের ঘরে ঐ ভদ্রলোকটি কে অক্ষয়বাবু'? আলাপের মাঝপথেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'কোনদিন দেখিনি তো 'একে এর আগে?'

চশমার লেন্স ডিঙিয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টি ছুটে যায় সেদিকে—'হাঁ। দেখেন নি বটে, তবে এখন হয়তো কিছুদিন এখানে এঁকে দেখবেন। ইনি হচ্ছেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। বর্ধমানে এঁর বিরাট জমিদারী আছে। শুধু জমিদারই এর আসল পরিচয় নয়—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান আছে যথেষ্ট। কেন, সর্বেশ্বর চৌধুরীর কোন বই আপনি পড়েন নি?' একটু থেমে অক্ষয়বাবু আবার বলেন,—'ও, তা আর পড়বেন কি করে! রাতদিন টেবেস্‌কোপ গলায় ঝুলিয়ে হসপিট্যাল আর স্কুল করলে কি পড়া চলে সে সব।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অক্ষয় বাবু বললেন,—'এর লেখা 'স্ত্রী', 'উদ্বোধন,' 'হিন্দু' এসব কাগজেই বেশী ওঠে, দেখেছেন।'

আমি শুধু তাকিয়ে থাকি সর্বেশ্বর চৌধুরীর শান্ত সৌম্য চেহারার দিকে।

'—অত্যধিক পড়াশুনো করেন ইনি। আর স্মরণশক্তিও তেমনি প্রখর। এইতো কিছুক্ষণ আগে তিনি ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক কথাই বলছিলেন। আর এ নিয়ে নাকি একটা বইও লিখছেন সর্বেশ্বর বাবু।'

—'উনি এখানে কোথায় উঠেছেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

—'রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেক্রেটারী সদানন্দ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে।'

—'তাই নাকি?...তাঁর সঙ্গেও জানাশুনা আছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করলাম।

—'জানাশুনা মানে? সদানন্দবাবুর খাঁটি শিষ্যই যে সর্বেশ্বরবাবু।'

সর্বেশ্বর চৌধুরীকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলে এগিয়ে। বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছে অশ্রান্ত ধারায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে ঘনায়মান দুর্যোগের বীভৎস রূপটা একটু পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছিল; এমন সময় চেয়ে দেখি সর্বেশ্বর চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে।

—'আসুন, আসুন, বসুন।' সামনের শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন অক্ষয়বাবু, 'এত শিগ্‌গিরই হ'য়ে গেল যে আজ?'

সর্বেশ্বর চৌধুরী বসলেন। আমি চেয়ে থাকি তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে। লম্বা-চওড়া চেহারা। মাথার ঢেউ-খেলান কালো কোঁকড়ান চুল। চোখে সোনার চশমা। খুঁটিয়ে নাটিয়ে সব দেখতে থাকি আমি। ভাল লাগছিল সর্বেশ্বর চৌধুরীর বাইরের রূপটা।

—'হ্যাঁ, আজ একটু শিগ্‌গিরই যেতে হচ্ছে। রাত্তিরের গাড়ীতে বেলুর যাচ্ছি।'

একটু থেমে আবার বললেন—'সদানন্দ বাবু আসেননি বুঝি?'

—'না, এখনও আসেন নি তো।'

—'আশ্রমথেকে তো বরাবর এখানে আসারই কথা ছিল। কি জানি, আবার কি কাজে আটকে গেলেন?' বলেই আমার মুখের দিকে তাকালেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। বললেন,—'আপনি কলেজে পড়েন বুঝি?'

পরিচয় করিয়ে দিলেন অক্ষয়বাবু। প্রথম পরিচয় যে এতটা জমাট হ'য়ে উঠবে ভাবতেই পারিনি আমি। মনে হ'ল যেন কতদিনের পরিচিত আমি তাঁর। কথার কোয়ারা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে যায়: রোঁমা রোঁলা, শ্রীঅরবিন্দ, ম্যাক্সমুলার থেকে সুরু ক'রে পুনর্জন্ম-বাদ, সাইকেল্ অব ইভল্যুসন ইত্যাদী আরো কত কী। সব কথার অর্থও সেদিন বুঝি নি। তবু কিন্তু মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। তাঁর দিকে চেয়ে মাথা আমার নুয়ে আসছিল শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে। সর্বেশ্বর চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।

—'কিন্তু...বৃষ্টি তো ধরেনি এখনও। আর একটু বসলে হ'ত না?' বললেন অক্ষয়বাবু।

—'দেখুন প্রয়োজন কোন বাধাই মানে না—আচ্ছা চলি...। আর হ্যাঁ, যে কয়খানা বই আজ নিয়েছিলাম না, এই যে তার লিষ্টটা, রাখুন।' আজানুলম্বিত গেরুয়া রংএর খদ্দরের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। আজ অনেক বছর পরেও কিন্তু সেই বইগুলোর নাম আবছা আবছা মনে পড়ে। তিনটেই ছিল ইংরেজী—'প্রব্‌লেম্ অব হিউম্যান্ লাইফ্-থ্রি ট্রায়ামফ্ অব গড, দি সাইজ অব লাইফ।' সবগুলোই উচ্চস্তরের সন্দেহ নেই। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ'ও ছিল সেই সঙ্গে। আর ছিল একখানা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা।

তারপরও অনেকদিন সর্বেশ্বর চৌধুরীর সাথে দেখা হ'য়েছে—সেই রামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরেই। কোনদিন হয়তো বা সংগে ক'রে নিয়ে আসতেন সদানন্দ ভট্টাচাজকে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেক্রেটারী সদানন্দ ভট্টাচাজ। আবার মাঝে মাঝে দেখা যেতো সদানন্দ বাবুর মেয়ে স্কুল শিক্ষয়িত্রী প্রমীলা দেবীকে।

তারও কিছুদিন পরের ছবিটা এখনও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে স্মৃতির পটে।

কবিগুরুর অমর সৃষ্টি শান্তিনিকেতনে গেছি। সেটা বোধহয় পৌষ মাসই হবে।

লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে নির্জন তপোবন। হঠাৎ পাশে একটা নীল রং-এর ট্যাক্সি ব্রেক কষে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে প্রথম যিনি নামলেন তিনি সর্বেশ্বর চৌধুরী। তাঁর ঠিক সংগে সংগেই নামলেন প্রমীলা দেবী। ওরা দুজনে মিশে যায় ভীড়ের মাঝে।

উৎসবের সমস্ত অংশই প্রায় দেখলাম ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। যায়গাটি আশ্রম থেকে খানিকটা দূরে। খাঁ খাঁ করছে—সাঁওতাল পরগণার রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর। সামনেই সারি সারি কয়েকটা তাল গাছ। তারই তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর চৌধুরী আর প্রমীলা দেবী। তাদের ঘিরে কয়েকটি সাঁওতাল মেয়ে, পুরুষ ও ছেলে।

কান পেতে থাকি। সর্বেশ্বর চৌধুরীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'শরীর তোমাদের কষ্টিপাথরের মতো কালো। কিন্তু কালো তো নয় তোমাদের মন? তোমরা সরল...নিষ্পাপ...জাতির মেরুদণ্ড তোমরাই। তোমরাই সমাজের আশা ভরসা। আচ্ছা, তোমরা কোনদিন নাম শোননি স্বামী বিবেকানন্দের? যিনি তোমাদের অসহায় মুখে ভাষা তুলে দিয়েছিলেন?' আরও অনেক বাক্যোচ্ছ্বাস, অনেক উদ্ধৃতি। সেদিন

হাসিনি—বরং বিস্মিত হ'য়েছিলাম, বিমুগ্ধ করেছিল সর্বেশ্বর চৌধুরীর সেন্টিমেন্ট সেই সামান্য কথা কয়টি।

আর আজ? ভাবছি কত বিচিত্রই না হ'তে পারে মানুষ? মানুষের মন? এর পর সর্বেশ্বর চৌধুরীর সাথে দেখা হয়নি আর রামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরেও আর তাঁকে দেখা যায়নি লাইব্রেরীয়ান অক্ষয়বাবু শুধু বলেছিলেন—'এঁদের মতো মানুষ কি আর এক জায়গায় বেশীদিন থাকেন? শুনলাম সর্বেশ্বরবাবু নাকি তীর্থে বেরুচ্ছেন। পদব্রজে ঘুরে বেড়াবেন দেশ-দেশান্তর। হয়তো সেদিন তাঁর নাম আর সর্বেশ্বর চৌধুরীই থাকবে না। হয়তো হবে স্বামী সর্বানন্দ, কিম্বা সুন্দরানন্দ। কি বলেন?' মনে পড়ে সেদিন মাথা নেড়ে শুধু বলেছিলাম—'চলেও হতে পারে।'

তারপর পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে পর পর অনেকগুলো বছর। তখনও কিন্তু ভুলতে পারিনি সর্বেশ্বর চৌধুরীকে। তার মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর, তার অপূর্ব বাচনভঙ্গী আর শান্ত-সৌম্য চেহারা আমার সমস্ত অন্তরকে যেন আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তা নয় তো অনেক বছর পরেও সন্ধ্যার আকাশ যেদিন মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠতো···অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি ঝরতে থাকতো বাইরে—কেন যেন মনটা খচ্ করে উঠতো। কেন চোখের সামনে ভেসে উঠতো আর একটি তেমনি বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ সন্ধ্যা।

এর প্রায় বছর দশেক পরে কিন্তু সর্বেশ্বর চৌধুরীর সাথে দেখা হ'য়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে—কিছুক্ষণের জন্যে। তবু সেই 'কিছুক্ষণ' যেন জীবনের চলার পথে অনেক বড় একটা কালো দাগ রেখে গেছে।

ডাক্তারী পড়ার জন্যে গেছি বাংলা দেশ ছাড়িয়ে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে সুদূর উত্তর আমেরিকার চিকাগো সহরের বুকে। চিকাগো সহরের একপ্রান্তে সেদিন 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটি'র পক্ষ থেকে নববর্ষ উপলক্ষ্য ক'রে এক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল।

অডিটরিয়ামের ভেতরে এবং বাইরে অসংখ্য দর্শকের মৃদুগুঞ্জন বাতাস ভারী ক'রে তুলেছে। ঢুকতে যাচ্ছি; থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরাচ্ছেন সর্বেশ্বর চৌধুরী? মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি না তো?...না স্বপ্ন নয়। ভুল নয়। সর্বেশ্বর চৌধুরীই বটে। চোখে সেই সোনার চশমা—লম্বা-চওড়া চেহারা, এগিয়ে গেলাম। বললাম—দেখুন কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনার নাম সর্বেশ্বর চৌধুরী নয় কি?'

যেন আকাশ থেকে পড়লেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছিনা?'

খুলে বললাম সব। সেই কোথায় হাজার হাজার মাইল দূরের উত্তর বাংলার একটি সহর—কোথায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির।' যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সর্বেশ্বর চৌধুরী দেখতে পেলেন আলোর ক্ষীণ একটা রেখা। সাহেবী কায়দায় কাঁধ দুটো একটু 'ঝাঁগ' করে দু'চোখ কপালে তুলে বললেন—'ও, আই সি। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, স্পষ্ট মনে পড়েছে।' বলতে বলতে একটু চুপ ক'রে কতক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার বললেন—'তারপর আপনি এখানে যে? বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

—"বেড়াতে নয়, ডাক্তারী পড়তে এসেছি। আপনি বুঝি বেড়াতেই এসেছেন?"

—'এ্যাবসলিউটলি নট।' মাথা নেড়ে জবাব দেন সর্বেশ্বর চৌধুরী—'পড়তে এসেছি আমিও। য়ুইয়র্কের য়ুনিয়ন থিয়োলজীক্যাল সেমিনারীতে আজ বছরখানেক হাঁড়ি করছি। আর বছর দুই বাদেই কোর্স ফিনিশ হবে। তারপর, একটু থামলেন সর্বেশ্বর চৌধুরী,—'তারপর যদি ভাগ্যে থাকে নামের শেষে টি-এইচ-ডি; আই মীন, ডক্টর অব থিয়োলজী ডিগ্রীটা বসাতে পারবো।

কানের কাছে এই অপরিচিত বিদেশী পরিবেশের

যাকেও শুনতে পাচ্ছি অনেকদিনের পুরোনো একটা কথা—'পদব্রজে উনি তীর্থে বেরুবেন, ঘুরে বেড়াবেন দেশ-দেশান্তর। সেদিন তার নাম হয়তো হবে সুন্দরানন্দ কিম্বা সর্বানন্দ?'

সর্বেশ্বর চৌধুরীর মাথার কালো ফেল্টের টুপী আর মুখের অর্ধদগ্ধ সিগ্রেটটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলাম। ভাবছিলাম তার এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের কথা। তবে কি···

আমার মুখের ভাব দেখে সর্বেশ্বর চৌধুরী কি বুঝলেন জানিনা, বললেন—'আপনি হয়তো আমার এই সাহেবী বেশ দেখে অবাক হচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, এরও একটা হিস্ট্রি আছে বৈকী! আমাদের কলেজের প্রফেসর ডক্টর ষ্টিফান্স আমাকে খুবই ভালবাসেন—আর ভালবাসেন ভারতবর্ষকে। গেল ইষ্টারে তিনি আমায় এই এক সুট প্রেজেন্ট করেছিলেন। আমার আবার এসব টাই-টুপী পরা মোটেই পছন্দ হয় না। এ্যাদ্দিন এগুলো আমার বাক্সেই পড়েছিল। ষ্টিফান্স সাহেব হঠাৎ কাল আমায় ধরলেন, বললেন—'নিজের দেশের পোষাক তো তুমি পরবে চিরকালই—তাই বলে একদিন কোট-প্যান্ট পরলে কি তোমার জাত যাবে? তাই আজ বাধ্য হ'য়ে পরতে হয়েছি এসব, নইলে'...অডিটরিয়ামের ভেতর থেকে ভেসে আসছে মধুর যন্ত্র-সংগীত। সর্বেশ্বর চৌধুরীর কথাও থেমে যায় সেই সংগে।

—'সময় হ'য়েছে, চলুন ঢোকা যাক', বললাম আমি।

—'এক্সকিউজ মি। দশ-বার মাইল পথ ভেংগে মুাইয়র্ক থেকে চিকাগো এসেছি শুধু কি এই নাচ-গানের জন্যে?'

'সার্টেনলি নট্, এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ আজ ইম্পরট্যান্ট একটা লেকচার দিতে এসেছেন। সেটা শুনতেই এসেছি চিকাগোতে। আর ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে এসেছি কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির ফিলসফীর প্রফেসরের মেয়ে ইসাবেলাকে নিয়ে যাবার জন্যে। মেয়েটি সত্যি লেখাপড়ায় চমৎকার। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে অদম্য ওর উৎসাহ। আমার কাছে ও বাংলা শিখছে।' থামলেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। —'আচ্ছা আসি। দেখা আবার নিশ্চয়ই হবে।'

নমস্কার জানিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। দৃশ্যের পর দৃশ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেকটির শেষেই পড়ছে অসংখ্য সম্মিলিত মৃদু করতালি। হঠাৎ একসময় চোখে পড়ে সামনের কয়েকটা চেয়ারের পরেই ব'সে আছেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। অবাক হলাম। তার পাশেই বসি একটি আমেরিকান তরুণী। আন্দাজে বুঝলাম ইসাবেলাই হয়তো হবে। হঠাৎ আমার পাশের সিটে উপবিষ্ট ভারতীয় বন্ধুটি সেদিকে দেখিয়ে বললে, 'চিনতে পারছো ঐ মেয়েটাকে, রয়?'

বুঝলাম ইসাবেলার কথাই বলছে বন্ধুটি। বললাম—'কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির প্রফেসরের মেয়ে ইসাবেলা?' —'কি বলছো তুমি?' বন্ধুবরের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর—'হলিউডের এ্যাক্ট্রেস ক্যাথরিণকে বলছো কিনা, ডটার অব এ প্রফেসর?···হোপলেস।' হঠাৎ মাথার ঝিম্ ধরে যায়। সর্বেশ্বর চৌধুরী তবে মিথ্যে বললেন? কিন্তু মিথ্যেই বা বলতে যাবেন কেন তিনি? তাছাড়া একজন চিত্রতারকার সংগই বা নেবেন কেন তিনি? মনের ভেতর সুরু হয় কত অসংলগ্ন প্রশ্নের অবিশ্রান্ত ধারা।

...তারপর কিন্তু সর্বেশ্বর চৌধুরীর সাথে দেখা হয়নি আর। মাসখানেক বাদে বোষ্টন থেকে শুধু তার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। সে চিঠি আজ হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যায়নি মনের অন্তরাল থেকে সে চিঠির ভাষা:

"প্রিয় ডাক্তারবাবু, বোষ্টনের সুইশবার্ণ হোটেলে বসে আপনার কাছে লিখছি এ চিঠি। শুনে হয়তো সুখী হবেন, বোষ্টনে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবো মনস্থ করছি। এখানকার জন-সাধারণের কাছ থেকে এ কাজে আমরা আশাতীত সহানুভূতি পাচ্ছি। আর ভারতীয়দের তরফ থেকেও পাচ্ছি প্রচুর সাহায্য। আশা করি আপনাকে আর কিছু এ সম্বন্ধে লিখবার প্রয়োজন হবে না।"

বেশ মনে আছে সে চিঠির তলায় সর্বেশ্বর চৌধুরীর স্বাক্ষরের একটু নীচেই পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলেন, 'যদি কিছু পাঠাবার মনস্থ করে থাকেন সেটা আমার ঠিকানায় মুইণ্ডবার্ণ হোটেলে পাঠালেই চলবে।' সে চিঠি পাওয়া মাত্র সেদিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কয়েক পাউণ্ড।

তারপর একটি একটি ক'রে কেটে যায় পর পর অনেকগুলো বছর পরিবর্তনশীল পৃথিবীর চাকা ঘুরে চলেছে। আর সেই সংগে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে আমার জীবনের চাকাটিও।

কে'লকাতায় আছি অনেক বছর ধরে। মেডিকেল কলেজের প্রোফেসরদের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়েও নিয়েছি বেশ। নামের শেষে কয়েকটি বিদেশী ডিগ্রী নিজের পড় গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে।

ঠিক এমনি সময় একদিন বর্ধমানের মেডিকেল স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলাম এক চিঠি। সেখানকার আসন্ন 'রাজ-লেকচারে' আমাকে উপস্থিত থেকে 'এ্যালকোহলিক সিরয়োসিস অব দি লিভার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন। অনেকদিন পর হঠাৎ বর্ধমানের নাম শুনে সর্বেশ্বর চৌধুরীর কথা মনে পড়ে গেল। স্মৃতির গভীরতম গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে তার শান্ত-সৌম্য মুখাবয়ব। সর্বেশ্বর চৌধুরী এখন কোথায় আছেন কে জানে। হয়তো আছেন বোম্বেতে। সেখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমের সংগে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এমনও হতে পারে, আমেরিকা ছেড়ে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে। ঘুরে বেড়াচ্ছেন হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন। আর বর্ধমানে যে নেই তা-ই বা কে জানে? রাজলেকচার দিতে গিয়ে তাঁর সংগে কি দেখা হ'তে পারে না?

দেখা কিন্তু সর্বেশ্বর চৌধুরীর সাথে সেবার হয়েছিল। আজ ভাবছি সে দেখা না হলেই যেন ছিল ভাল। উদ্ঘাটিত হ'তে পারতো না তার জীবনের কালো অধ্যায়টি।

বক্তৃতা শেষ হ'য়েছিল যথাসময়েই।

ব্যস্ততার মধ্যেও খোঁজ খবর নিয়ে সর্বেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীর সন্ধান মিললো। সহরের প্রায় শেষপ্রান্তে অনেক দিনের পুরোনো একটা বাড়ী। এককালে হয়তো বাড়ীটার সবকিছুই ছিল।—বার্ধক্যের শেষ সীমায় এসে হারিয়ে ফেলেছে সে তার সেই অতীত-গৌরব। মোটরের শব্দে আগেই কে এক বুড়ো ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন। নামতেই বললেন,—'কাকে চাই আপনার?'

—'সর্বেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতো এইটেই, না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো অনেকদিন ধরেই অসুস্থ—ঘুমিয়ে আছেন এখন।' চমকে উঠলাম। তবে কি তীর্থে তীর্থে ঘুরে ক্ষয় করে ফেলেছেন নিজের শরীর?'

—"তাঁর সংগে দেখা করবার জন্যে এসেছেন বুঝি?" কোত্থেকে এসেছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলে বুড়ো। পরিচয় দিতেই বুড়ো বললে—"ও আপনি কোলকাতা থেকে এসেছেন বুঝি?...নমস্কার, ঘরে এসে বসুন।"

—'বসবো আর কি? আপনাদের জমিদারবাবুর দেখাই যখন মিলল না...'

আমার কথা শেষ না হ'তেই বুড়ো বললে,—'জমিদার বাবু? জমিদার বাবুই বটে। দুনিয়ার সেরা জমিদার।' বলে হো হো করে হেসে ওঠে বুড়ো।

—'তার মানে?' সবিস্ময়ে বললাম।

—'তার মানে, জমিদারীর কি কিছু রেখেছেন উনি? সব ভেসে গেছে—সব ভাসিয়ে দিয়েছেন। আর ভাসবে না-ই বা কেন? দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা শুধু মদ নিয়ে পড়ে থাকলে কি আর থাকে ওসব জমিদারী?'

পায়ের নীচেকার মাটি যেন আমার টলে উঠল। মাথাটা ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু বললাম,—'কিন্তু আমি তো জানতাম সর্বেশ্বর বাবু এককালে ধর্ম নিয়ে খুব মেতেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, মেতেছিলেন বৈকী। এবং সেইজন্যেই তো তাঁর আজ এই দুরবস্থা। চলুন, এসেছেন যখন, দেখেই যান অবস্থাটা একবার। বুড়োর সংগে সংগে কোন রকমে গিয়ে উঠলাম দোতালায়। দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো। ভেতরের দিকে চাইতেই

চমকে উঠলাম আমি। মেঝেতে লম্বা হ'য়ে ঘুমিয়ে আছেন সর্বেশ্বর চৌধুরী। পরনের সিল্কের পাজামাটায় অসংখ্য ভাঁজ। সমস্ত শরীরের মাংস গেছে তার কুচকে। দু'চোখের নীচে পড়েছে কালশিরা। ফুলে হ'য়ে গেছে সমস্ত মুখ। মাথার চুল নেই বললেই চলে। বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম আমি। ভাবলাম, এই কি সেই সর্বেশ্বর চৌধুরী না তার কঙ্কাল? আমার কিছুক্ষণ আগে দেওয়া বক্তৃতাটার প্রতি ছত্রই বুঝি বা মিশে আছে ব্যাধিগ্রস্ত সর্বেশ্বর চৌধুরীর সমস্ত শরীরে?

—'দেখলেন তো?' করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় বুড়ো।

দেখছি সবই, বিশ্বাস করতে পারছি না কিছুই। রামকৃষ্ণ পাঠমন্দিরের সান্ধ্য পরিবেশটা মনে পড়ে গেল। সে ছবি কি মিথ্যা? মিথ্যা কি তার 'ডক্টর অব থিয়োলজী?' তার সুইপবার্ড হোটেলের চিঠি? তবে কি বোষ্টনের সকলই স্বপ্ন? বেশীক্ষণ আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হ'লনা। নেবে এলাম নীচে। দুজনে বসলাম মুখোমুখি।

—'ধর্মের কথা বলছিলেন আপনি'? বলতে শুরু করে বুড়ো,—'যৌবনের উন্মাদনায় ওরকম সখের ধর্ম অনেকেই করে। আর বইও খানকয়েক ছাপিয়ে ছিলেন বৈকি। নিজের লেখা হলেও না হয় বুঝতাম—'

—'কি বলছেন আপনি?'

—'হ্যাঁ, যা বলছি সত্যিই বলছি। চৌধুরী ষ্টেটের এই চল্লিস বছরের পুরোনো নায়েব রজনী বটব্যাল জীবনে কোনদিন মিথ্যে গল্প করেনি। এসব আমার নিজের চক্ষে দেখা, স্যার। বাইরের আর কেউ না জানলেও জানি আমি। যে সব বই তিনি নিজের নামে ছাপিয়েছিলেন, সেগুলো হচ্ছে স্বর্গীয় জমিদার প্রদ্যুম্নের প্রতাপেশ্বরচৌধুরী অর্থাৎ আমাদের এই কর্তাবাবুর বাবার লেখা। বুড়ো কর্তামশাই যা লিখতেন, শুধু নিজের আনন্দের জন্যই লিখতেন। বাইরের কাউকে তিনি সে-সব দেখান নি, ছাপাতেও দেননি। তিনি মারা যাবার পর আমাদের এই ছোট কর্তাবাবু সে-সব বই নিজের নামে ছাপিয়ে বেশ কিছুদিন বাহবা পেলেন। টাকাও পেলেন বৈকি কিছু।'

—'কিন্তু সর্বেশ্বর বাবুর তো আর টাকার অভাব ছিলনা? কেন তিনি সে-সব করতে গেলেন? এর অন্য কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—'ছিলই তো', বলে একটা ঢোক গিললো বুড়ো রজনী নায়েব, 'টাকা পাওয়ার লোভে তো তিনি সে-সব করেন নি—তার লোভ ছিল...বেশ; তবে খুলেই বলছি সব আপনাকে। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেক্রেটারী সদানন্দ ভট্টাচার্যের পরিবারের সংগে আমাদের কর্তাবাবুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব।'

সদানন্দ ভট্টাচার্য? অনেকদিনের পুরোনো এই নামের মাঝে মিশে আছে যেন ফেলে আসা দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি। রজনী নায়েব বলে চলে,—'সদানন্দবাবু ছিলেন অতিমাত্রায় ধার্মিক। দেশের অকালপক্ক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নাস্তিক যুবকদের তিনি দেখতে পারতেননা মোটেই। ঠিক সে সময় বারকয়েক আই-এ ফেল ক'রে, অবশেষে বুড়ো কর্তামশাই মারা যাবার পর পড়া ছেড়ে দিলেন ছোট কর্তাবাবু। বাইরের অনেকের কাছেই গোপন রাখা হ'ল ফেল-সংবাদ। এমনকি সদানন্দবাবুর কাছেও ছোট কর্তাবাবু নিজেকে এম-এ পাশ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যখনই জলপাইগুড়ি যেতেন, সদানন্দবাবুর বাড়ীতেই উঠতেন। তার জন্য একটা কারণও ছিল। সদানন্দবাবুর বিশ বছরের মেয়ে স্কুল-শিক্ষয়িত্রী প্রমীলাকে দেখা অবধি, তাকে বিয়ে করার বাসনা তাঁর মনে জেগে ওঠে। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে সদানন্দবাবু আবার নাস্তিক ছোকরাদের দেখতে পারতেন না মোটেই। তখন থেকেই কর্তাবাবুর পরিবর্তন শুরু হ'ল। শুরু হ'ল ধর্ম নিয়ে মাতামাতি, আর গেরুয়া পরে এ-আশ্রম থেকে ও-আশ্রমে ঘোরাঘুরি। সদানন্দ বাবুকে বশে আনবার জন্য অনেক কিছুই করলেন তিনি। বইও ছাপালেন খানকয়েক। সদানন্দবাবু গলে গেলেন তাই দেখে। বললেন,—ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বটে সব...। আমার কর্তাবাবুর মনে তখন কত

আশা-আনন্দ। কিন্তু সে আশা-আনন্দ এক নিমিষে উড়ে যায়, যখন শুনলেন, প্রমীলার বিয়ের কথা চলছে কোলকাতারই কোন এক কলেজের সংস্কৃত প্রফেসরের সাথে। ঠিক সেই সময়ই কর্তাবাবু প্রমীলাকে নিয়ে মথুরা, বৃন্দাবন বাওয়ার নাম করে বেড়াতে বেরুলেন। গেলেন শান্তিনিকেতন—নিজের মোটরে ক'রে। পথেই নাকি বিয়ের আলাপ ক'রে বসেন কর্তাবাবু।

...সাঁওতাল পরগণার একটি রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় আমার। বুঝলাম সে ছবির সার মর্ম।

—'সদানন্দবাবুর কানে কিন্তু সে কথা ঢুকতে দেরী লাগল না। শুনেই কর্তাবাবুকে খুব ক'রে শাসালেন তিনি। বাড়ী থেকে পর্যন্ত বের করে দিলেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে কর্তাবাবু এসে পড়েন এখানে। তখন থেকে কেমন যেন উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠলেন; অবশেষে একদিন সাগর-পারে যাত্রা করলেন। গেলেন আমেরিকা।

—'হাঁ, সে সময়ে চিকাগোতে ওর সংগে আমার দেখা হয়েছিল', বললাম, 'শুনেছিলাম নাকি কোন কলেজে থিয়োলজী পড়তে গিয়েছিলেন?'

আমার কথা শেষ না হতেই হো হো করে হেসে ওঠে বুড়ো। পান খাওয়া কয়েকটা ঘোলাটে দাঁত বেরিয়ে পড়ে সেই সংগে।—'বলেছিলেন বুঝি আপনাকে? মিথ্যে, মিথ্যে কথা। ওখানে ব্রেক্ বেড়াতে গিয়েছিলেন। পড়তে যাবেন না ছাই। পাঁচবারেও যে আই-এ পাশ করতে পারেনি সে আবার পড়বে আমেরিকার কলেজে? ব'লে একটু মুচকী হাসে রজনী নায়েব।'

—'অথচ বোষ্টনে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার নাম ক'রে তিনি আমার কাছে চাঁদা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন'

—'আপনিও বিশ্বাস ক'রে পাঠিয়েছিলেন বুঝি চাঁদা? নিজের বিলাসের জন্যই কর্তাবাবু সে সব খরচ করেছেন। আশ্রম-টাশ্রম সব মিথ্যে। ষ্টেট থেকেও তো মাসে হাজার টাকা পাঠান হ'য়েছে। দেখলেন কতদূর অমিতব্যয়ী হয়েছিলেন তিনি?'

সর্বেশ্বর চৌধুরী সম্বন্ধে যতই—ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি। এত নীচেও নামতে পারে মানুষের মন? এত হীন হ'তে পারে মানুষের মনোবৃত্তি?

একটু থেমে বললাম,—'সর্বেশ্বর বাবুও আমেরিকা থেকে বরাবর এখানেই এসে পড়েন, না?'

—'হাঁ, শুধু একাই এলেন না কিন্তু। সংগে নিয়ে আসেন একটি আমেরিকার মেয়ে। টিকলোনা কিন্তু মেয়েটা বেশীদিন। আর টিকবেই বা কেন? ওদের কি ভাল লাগবে এই শুকনো বাংলা দেশ? সে কোন এক সাহেবের সংগে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই আরো বেশী উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠলেন কর্তাবাবু। জুটল কয়েকটি চরিত্রহীন বন্ধু। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলল মদ আর বাইজী। তারপরেই ধরল দুরারোগ্য ব্যাধিতে। বন্ধু-বান্ধব যে কজন ছিল সব সটকে পড়েছে বিপদ দেখে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রজনী নায়েব আবার বললে—'এখন আমিই রয়েছি একমাত্র। একবছর দু'বছর তো নয়—জীবনের চল্লিশ বছরের স্মৃতি ছেড়ে যেতে যে মায়া লাগে তার।'

মধুর একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছিল সেদিন। রজনী নায়েবের সমস্ত কথা যেন আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিকল ক'রে দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম,—'আচ্ছা নায়েব মশাই, এখন ওঁর কোন চিকিৎসে হচ্ছে না? অসুখ কিছু পড়ছে কি?'

—'অসুখ?' জবাব দিয়েছিল রজনী নায়েব—'অসুখ যে খেতেই চাননা কর্তাবাবু। বলেন, জীবনভরে তো শুধু পাপই করেছি, করেছি মিথ্যের জঘন্য অভিনয়—অসুখ খাইয়ে আবার তাজা ক'রে তুলতে চাও সেই পুরোনো দিনের জমা পাপ?...তার চেয়ে একটু শান্তিতে মরতে দাও...।'

বেশ মনে আছে, সেদিন বর্ধমান থেকে ফিরতে ট্রেণে আপার ক্লাশ কামরায় নিজেকে কতখানি চিন্তাক্লিষ্ট ক'রে তুলেছিলাম। ট্রেণ ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে আর আমার মনের অসংখ্য অগণিত প্রশ্নগুলিরও ঠিক তেমনি দ্রুত গতি।

স্মৃতির পর্দা দূরে সরে যায়।

অতীত থেকে ফিরে আসি বর্তমানে। টেবিলের-ওপর পড়ে আছে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণাল। আমার দৃষ্টি জার্ণাল ছাড়িয়ে চলে গেছে দূরে—অনেক দূরে, চিকাগোর সেই ধূসর সন্ধ্যার রামকৃষ্ণ পাঠ-মন্দিরে। এত বছর পরেও ফেলে আসা সব যেন স্পষ্ট হ'য়ে চোখের সামনে ভাসছে। চোখের সামনে যেন-ভাসছে বোষ্টনের সেই চিঠিটা।

আজ ভাবছি, সর্বেশ্বর চৌধুরী সেদিন 'ম্যাক্সমূলার' আর 'সাইকল অব্ ইণ্ডলুসন' নিয়ে যে আলোচনায় মত্ত ছিলেন, সেটা তার স্বসংযম মনের অবিকৃত প্রকাশ? 'রামকৃষ্ণ পাঠ-মন্দিরে'র অলংখ্য 'জটিল' বই-এর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন—সে কি তবে প্রমীলার হৃদয় জয় করবার জন্যে অভিনয়? যে অভিনয়ের পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল চরিত্রহীনতার অদৃশ্য বীজ। যে বীজ গোপনে গোপনে খাস্ জুগিয়ে পরিণত হ'য়েছে আজ বিশাল মহীরুহে?

বাঙালীর দুর্ভোগ

[কবিতা]

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

[১]

মহা সমরেতে না মরি' বাঙালী
মারা গেল অপঘাতে,
স্বর্ণমরাল সাতনলা ধারে
মরিল ব্যাধের হাতে।
সুরথ রাজার লক্ষ বলিরে
হরে নিল মহামারী,
সহস্র এক পূজার কমল
ছাগলে খাইল কাড়ি'—
অযুত তারকা উল্কা হইয়া
ঝরে গেল একরাতে।

[২]

হোমের সমিধ হোমে লাগিল না
বলসিয়া গেল পুড়ি'—
মন্ত্র-লেখার ভূর্জ পত্র
হ'ল ঠোঙা ঠুঙি, ঘুড়ি।
জগন্নাথের মহাপ্রসাদ
হতে যা'র অধিকার,
প্রেত-শালায় সে পিণ্ড হইল
পরিহাস বিধাতার।

ফাঁসির 'রসি'ই হ'ল, বারাহত
রথ-যাত্রার "ডুরি"।

[৩]

'বিজয়ে'র সাথে যাইতে পারিত
যাহারা লঙ্কা জয়ে।
জলাতঙ্কের আতঙ্কে মলো
অশেষ যাতনা সয়ে'।
রাক্ষসে নিল অলকা কাড়িয়া
দেবতার যাহা প্রিয়,
হ'ল রাজসুয় স্ফটিক প্রাসাদ
পাপের অতুগৃহ।
মহালক্ষ্মীর সন্তান ফেরে
পথের ভিখারী হ'য়ে।

[৪]

উদ্বাহের পানে চেয়ে কেঁদে মরি
ভাবি হাত দিয়া গালে,
ইন্দ্র রহিল সহিস হইয়া
রাবণ অশ্বশালে।
অশোক কাননে গুমরি কাঁদিছে
বঙ্গের কত সীতা,
লক্ষ্মী জোনেতে ধান্য ফলে না
জ্বলিছে এখন চিতা।
লিখেছিলে 'কুল-তলার' বিধাতা
এই বাঙালীর ভালে?

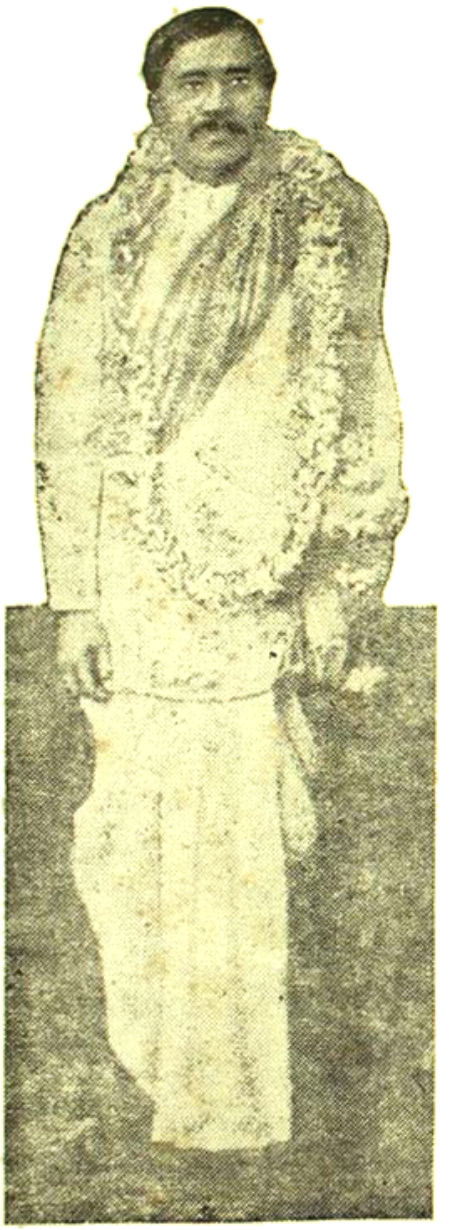

"স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি"

জন্ম—১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ মহাপ্রস্থান—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বিভূতি ভূষণের মৃত্যু যেমনি আকস্মিক তেমনি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর কোন পীড়ার সংবাদ তাঁর বন্ধু মহলেও রাষ্ট্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যখন বাংলার সাহিত্যিক জগতে দীপ্তিমান ছিলেন তখন নতুন রকমের সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক।

বিভূতি ভূষণ বাংলার প্রাচীনপন্থী সাধারণ দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। গ্রামদেশে থেকে স্কুলের মাষ্টারী ক'রে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন। সহরের বিলাসময় জীবন ও সহজ অর্থ উপার্জন তাঁকে প্রলোভিত করতে পারেনি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাংলার সাধারণ লোকের গ্রাম্য-জীবনকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রণীত "পথের পাঁচালী" সাহিত্যিক জগতে অমর হয়ে থাকবে। অথচ এই পুস্তকে আধুনিকতার স্পর্শ যথাসম্ভব তিনি এড়িয়ে চলেছেন। সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এ উপন্যাস খানির অনুরূপ আর কোন পুস্তক আমাদের মনে পড়ছে না। শরৎবাবুর 'পণ্ডিত-মশায়' 'রমা' প্রভৃতি গ্রাম্যজীবন নিয়ে লিখিত কাহিনীতে আধুনিকতার সংস্পর্শ যথেষ্ট পরিমানে প্রকাশ পেয়েছে এবং ঐ সব পুস্তক অনেকখানি সংস্কার ইচ্ছা প্রণোদিত। তারাশঙ্করের বহু পুস্তক গ্রাম্যজীবন নিয়ে লিখিত। কিন্তু ঐ সব পুস্তকের আখ্যান ভাগে পতনোন্মুখ জমিদারী প্রথার ও জমিদার বংশের কাহিনী প্রবল হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের 'অভিযান', 'হাঁসুলী বাঁকের কথা' প্রভৃতি পুস্তকে যদিও জমিদার বংশের কাহিনী তেমন নেই, কিন্তু আধুনিকতার আক্রমণের নিকট প্রাচীন ভেঙ্গে পড়ছে। 'পথের পাঁচালীতে' আমাদের গ্রামসমাজের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবতা-মূলক; অথচ সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এই পুস্তক অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।

বিভূতি ভূষণ আরও বহু পুস্তক লিখেছেন। "পথের পাঁচালী"র অনুবৃত্তি হিসাবে লিখিত "অপরাজিত" নামক পুস্তক তেমন খ্যাতি অর্জন করেনি। তবুও এই উভয় পুস্তক এক সঙ্গেই পাঠ্য। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে 'ইছামতি' নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাতে নীল চাষের যুগে মধ্য বাংলার সমাজ জীবন তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। "পথের পাঁচালী"র ন্যায় এই পুস্তকও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবার অধিকারীই হ'বে।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রীঅরবিন্দ—

শ্রীঅরবিন্দের হঠাৎ তিরোধানে সমগ্র ভারত ক্ষুব্ধ হয়েছে। আগামী বৎসর তাঁর জন্মদিনে তাঁর ৮০তম জন্ম উৎসব সমস্ত ভারতময় পালিত হ'বার ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে এমন আকস্মিক ভাবে শ্রীঅরবিন্দের জীবন অবসান হবে। সমগ্র বিশ্বের নিকট যে তিনটি মহাপুরুষ ভারতের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি ক'রে রাখছিলেন, গত এক দশকের মধ্যে পর পর তাঁরা তিন জনই—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও অরবিন্দ—এ জগৎ হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এ তিনজনের মৃত্যুর পর হৃদয়ের প্রসারতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বিশ্ব-সভ্যতার নতুন

উপাদান সংগ্রহের যোগ্যতায় ভারতে কোন বিরাট মহা-মানব আর রইলেন না। এমন আর কেউ আজ ভারতে নেই যাঁর পদপ্রান্তে শিক্ষার্থী হিসাবে সমস্ত বিশ্ব শ্রদ্ধাবনত মস্তকে উপনীত হ'তে পারে।

আধুনিক জগৎ অরবিন্দকে জানত দার্শনিক ও যোগী হিসাবে এবং কতকটা কবি হিসাবেও। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ রাজনীতি ও সর্বপ্রকার কর্ম কোলাহল হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি যোগীর মত কর্মনির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হ'ন রাজ-নৈতিক নেতা হিসাবে। ইউরোপে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে দেশে এসে বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সুরুতে সে কর্ম ত্যাগ ক'রে তিনি বাংলায় চ'লে আসেন। তখন তিনি বাংলা প্রায় জানতেন না। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা শিখে নেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে তিলক, লাজপত ও বিপিন চন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে অল্প দিনের মধ্যেই অরবিন্দ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম' ও 'কর্মযোগীন' রাজনৈতিক মহলে অসাধারণ সমাদর লাভ করে। স্বভাবত স্বল্পভাষী ও মৃদুপ্রকৃতির অরবিন্দের ভিতর যে তীব্র বিপ্লব বহ্নি জ্বলছিল তার তুলনা পাওয়া যায় মার্ক্স, ক্রপট্‌কিন, লেনিন ও গান্ধীর মধ্যে।

বাংলার বিপ্লবী যুবকদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব অরবিন্দ গ্রহণ করেন। যুগান্তর দল তিনিই স্থাপন করেন, যদিও তাঁর কনিষ্ঠ কর্মচঞ্চল ভ্রাতা বারীন্দ্র এই দলের কর্ম নেতৃত্ব করার খ্যাতি অর্জন করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার 'নবশক্তি', যুগান্তর দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' কাগজ সবই অরবিন্দের সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম' কাগজের সঙ্গে গ্রথিত ছিল। অরবিন্দই ছিলেন এদের সকলের প্রেরণাদাতা, অবশ্য, বয়োজ্যেষ্ঠ, তীক্ষ্ণধী ও আবেগবান উপাধ্যায় মহাশয়কে অরবিন্দ যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আলিপুরের বোমার মামলায় বৎসরাধিককাল হাজত বাসের সময় তাঁর জীবনে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয়। বাংলার জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের প্রভাবে যে ধর্মের প্লাবন আসে অরবিন্দ তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। জেলের নির্জন খোপে ধর্ম-সাধনার দিকে তিনি আকৃষ্ট হ'ন। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর এই নতুন অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনও রাজনৈতিক প্রভাব হ'তে তিনি মুক্ত হননি। কিছুদিন পরে সরকার আবার তাঁকে ধরবার আয়োজন করে। তখন ধর্ম-সাধনার দিকে তিনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই রাজনীতি ত্যাগ ক'রে ধর্ম-সাধনাতেই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন। গোপনে তিনি কলকাতা হ'তে চন্দননগর এবং সেখান হ'তে পণ্ডিচেরী চলে যান।

সেই হ'তে ৪০ বৎসর নির্জন যোগ সাধনাতে তিনি যাপন করেছেন। প্রথম কয়েক বৎসর 'আর্য' নামক এক দার্শনিক মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি সম্পাদন করেন। তাঁর সাথে সহকারী ছিলেন পল রিবার। ক্রমে অরবিন্দ কর্ম ত্যাগ ক'রে জ্ঞান ও যোগাশ্রয়ী হলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি প্রায় লোকসঙ্গ এবং সর্বপ্রকার কর্মসঙ্গ বর্জন ক'রে চলেছিলেন। এমন কি এই সময় তিনি বিশেষ কিছু লেখেন-ও নি।

তাঁর প্রণীত "Life Divine" বিশ্বের সর্বত্র শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ ব'লে সমাদর লাভ করেছে। 'Essays on the Gita' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর প্রণীত বহু কাব্য-গ্রন্থ ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য Ahana, Sabitri, Bikramorvasi, Meghdut, Perseus, the Deliverer প্রভৃতি তাঁর প্রথম যুগের লেখা বার হয়েছিল বোম্বাই-এর K. G. Despande র সম্পাদনায় Indu Prakash এ। এ লেখাগুলোর নাম ছিল New Lamps for Old. Karmayogin এ প্রকাশ হয়েছিল Open

Letter to Countrymen যার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরওয়ানা বার হয়।

Arya তে যে সব লেখা বার হয় তার মধ্যে আছে,

Life Divine,

Secret of the Veda,

Essays on the Gita,

The Psychology of Social Development,

The Ideal of Human Unity

The Future of Poetry,

Defence of Indian Culture

Synthesis of Yoga

এছাড়া তিনি বহু সংস্কৃত ও বাংলা মহাজন পদাবলীরও ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন—এবং তাঁর অনুবাদও সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে—এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে। ভর্তৃহরির অনুবাদ :

Mount Malay,

The Rain Lark to the cloud

The script of Fate,

Flowers from Hidden root

Niti satak

কালিদাসের Meghduta ও Vikramorvasi র উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। চণ্ডীদাসেরও বহু পদ তিনি অনুবাদ করেছেন—আর করেছেন চিত্তরঞ্জনের সাগর সঙ্গীতের অনুবাদ Song of the Sea নাম দিয়ে।

জওহরলাল-লিয়াকৎ আলী পত্র বিনিময়—

প্রায় এক বৎসর পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ নিরোধক চুক্তি সম্পাদিত হোক। শ্রীজওহরলালের প্রস্তাব ছিল যে উভয় রাজ্য এই সর্তে রাজী হোক যে তাদের কোন পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এই প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় তার অল্প কয়েকদিন পূর্বে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কাশ্মীর সম্পর্কে যুদ্ধ নিবৃত্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধমান সৈন্য-বাহিনী পরস্পরকে আক্রমণ ও আঘাত করা হতে বিরত হয়। অবশ্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান তাতে হয়নি। তা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে কোন বিরোধের জন্যই অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করতে ভারত রাজী আছে। কিন্তু পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের এই সরল প্রস্তাবের কোন সরল জবাব এল না। প্রশ্ন ক্রমে জটিল হ'তে লাগল এবং দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে ১০।১১ মাস পর্যন্ত পত্র বিনিময় হ'ল। আসল প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয়নি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ চলছে তার মধ্যে কাশ্মীর, উদ্বাস্তু-সম্পত্তি এবং পাঞ্জাবের নদীর জল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বিষয়েই উভয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হ'তে দাবী ও পাল্টা দাবী, অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ বহু হয়েছে। এ ভিন্ন আর একটি বিরোধের ব্যাপার হ'ল পূর্ব বাংলার হিন্দু। উভয় প্রধানমন্ত্রীর পত্র বিনিময়ের মধ্যে তার কোন উল্লেখ নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ত আজ তৃপ্তিতে আছেন যে এপ্রিল মাসের দিল্লী চুক্তির পর পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টে তিনি বহুবার বলেছেন যে গত ২।৩ মাস যাবত গড়ে প্রত্যহ ১½ হাজার হিন্দু পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছে। কি অবস্থায় তারা ফিরে যাচ্ছে এবং কি কারণে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। মুদ্রা বিনিময়ের প্রশ্নও উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্কটি তিক্ত ক'রে রেখেছে।

এ সমস্যা বাদ দিয়েও যে তিনটি সমস্যা নিয়ে উভয় প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন তারও কোন মীমাংসা তাঁরা করতে পারেন নি। এর মধ্যে কোন পক্ষের কতটা দোষ তা আমরা অনুসন্ধান করতে চাই না; এখানে প্রধান বিচার্য, এই বিরোধের ফলে উভয় রাষ্ট্রের আর্থিক পুনর্গঠনে কতটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীর দুঃখ কষ্টের পরিমাণ কতটা

বেড়েছে। উভয় রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক সংস্থান এমনি যে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের ফলে উভয়ের শক্তি হানি হ'তে বাধ্য এবং উভয় রাষ্ট্রেরই জন-সাধারণ দুঃখগ্রস্ত হবে। বিশেষ ক'রে উভয় বাংলার জন-সাধারণের দিক থেকে এই বিরোধ অত্যন্ত ক্ষতিজনক হবে। যে সব সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আজ বিরোধ চলছে তার সঙ্গে উভয় বাংলার জন-সাধারণের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ দুঃখের অংশ তাদের ওপরই এসে পড়ছে সব চাইতে বেশী।

পূর্ব-বাংলার গণ-বিক্ষোভ—

পাকিস্তানের গণ-পরিষদে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ সুরু হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধান সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে পূর্ব-বাংলা কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হবে, পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের এই আশঙ্কা। এই প্রস্তাবের মূল মর্ম এইরূপ দাঁড়ায়: পাকিস্তান ব্যবস্থা-পরিষদে উচ্চ ও নিম্ন দু'টী সদন থাকবে। নিম্ন সদনে জন-সংখ্যার হিসাবে প্রতিনিধি থাকবে: উচ্চ সদনে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। অর্থাৎ বেলুচিস্তানের লাখ দুই অধিবাসী, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আট-দশ লাখ অধিবাসী, সিন্ধু প্রদেশের ২৫।৩০ লাখ অধিবাসী এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের দুনাধিক ২ কোটী অধিবাসী—এরা প্রত্যেকই পূর্ব-বাংলার ৪½ কোটী অধিবাসীর সমান সংখ্যক প্রতিনিধি পাবে। কাজেই উক্ত সদনে পাঁচ ভাগের এক ভাগ সদস্য আসবে পূর্ব-বাংলা হ'তে, যদিও পূর্ব-বাংলার জন-সংখ্যা অপর চারটী প্রদেশের সমবেত জন-সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তা ভিন্ন, আরও প্রস্তাব করা হয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্রের উচ্চ সদনের মত পাকিস্তানের উচ্চ সদন নিতান্ত ক্ষমতাহীন হবে না; এমন কি, অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং আইনেও উচ্চ সদনের নিম্নসদনের সমান অধিকার থাকবে।

ইতিমধ্যেই বিক্রয় কর প্রদেশের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নিজে গ্রহণ করেছে। তার ফলে পূর্ব-বাংলার যথেষ্ট অর্থহানি হয়েছে। তারপর, বাংলা বনাম উর্দু ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তাতেও পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মনে বিক্ষোভের যথেষ্ট কারণ আছে। এই সব নানা ব্যাপার নিয়ে পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনতা, এমনকি মুসলিম লীগেরও একটা বিশেষ অংশ, একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। নভেম্বর মাসে গণ-পরিষদের অধিবেশনে ঐ সব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কথা ছিল; কিন্তু পূর্ব-বাংলার এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ঐ আলোচনা এখনকার মত স্থগিত রেখেছেন। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেছেন; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎআলীও পূর্ব-বাংলার জেলায় জেলায় সংবিধানের মৌলিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছেন। এই উভয় নেতার পূর্ব-বাংলা পরিদর্শন একেবারেই আকস্মিক ও উদ্দেশ্য বিহীন নয়। পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের শান্ত করা এবং কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত ব্যবস্থা তাদের দিয়ে গলাধঃকরণ করান এই উভয় সফরের উদ্দেশ্য ব'লে লোকে সন্দেহ করছে। কিন্তু এই সফরের অন্য উদ্দেশ্যও ধরা যেতে পারে: পূর্ব-বাংলার জনতার কতখানি সমর্থন এই আন্দোলনের পেছনে আছে তার হিসাব নেয়াও হয়ত উভয় নেতার পূর্ব-বঙ্গ ভ্রমণের অন্যতম কারণ। পূর্ব-বাংলার জনতার মনে বিক্ষোভ যদি সত্যিকার হয়, তবে কোন স্তোক বাক্যে ওরা শান্ত হবে না; বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ এ কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আশা করি বাঙালী মুসলমানের দাবীর মর্যাদা রক্ষিত হ'বে।

বাংলা-ভাষা—

সাহিত্য সম্পদের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী। হয়ত শ্রুতি-মাধুর্য ও স্নিগ্ধতার দিক দিয়েও বাংলা ভাষার একটা বিশেষ দাবী আছে। ব্যাকরণের সরলতা ও বাক্য রচনা পদ্ধতির নমনীয়তা বাংলা ভাষার অন্যতম

বিশেষত্ব। অখণ্ডিত ভারতে বাংলা ভাষার সংখ্যা ৭ কোটির ওপরে ছিল; আসাম এবং বিহারে বহু লক্ষ বাংলা ভাষী আছে।

স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ ভারতের দু'টি প্রদেশ—পাঞ্জাব ও বাংলা খণ্ডিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লাঞ্ছনা বরণ ও ত্যাগ স্বীকারের ইতিহাসে বাংলা ও পাঞ্জাব ছিল সকলের অগ্রণী। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দিক থেকে অন্যান্য সব প্রদেশের তুলনায় বাংলা ও পাঞ্জাবের একটা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ছিল; অন্যান্য সব প্রদেশ ইংরেজের তৈরী—তাদের ভারত জয়ের সময়ের তালিকা হিসাবে গঠিত। বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে দু'টী সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলা ভাষা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আরও মুস্কিল এই যে এর কোন রাষ্ট্রেই বাংলা ভাষা মুখ্য বা রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়। কাজেই বাংলা ভাষার পক্ষে সমস্যা ও অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল। তার উপর দুই কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে বিরোধ ও মনোমালিন্য চলছে, উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলমান তুকোমর বেঁধে তাতে লাঠিয়ালের অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। উভয় বাংলার মধ্যে আর যত বিরোধই থাক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উভয় বাংলাই সমান দরদী ও উৎসাহী। কিন্তু আমাদের আশংকা হচ্ছে এই যে উভয় বাংলা নিজ নিজ খেয়াল ও খুসী মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এমন সব সুব্যবস্থা করতে থাকবে যার ফলে অনতিকালের মধ্যে হয়ত পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম বাংলার ভাষা দু'টী বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করবে। উভয় বাংলার সরকার, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বিদ্বজ্জনদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, ভাষা সম্বন্ধে কোন সংস্কার বা পরিবর্তন করতে হ'লে উভয় বাংলার প্রতিনিধি মিলে এক যোগে যেন করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকটও আমাদের নিবেদন এই যে, পরিষদ যেন মনে রাখেন যে ঐ পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল অখণ্ডিত বাংলার সাহিত্যের সেবার জন্য এবং অখণ্ডিত বাংলার সাহিত্যানুরাগীদের সেবা ও যত্নেই এই পরিষদ স্থাপিত ও বর্ধিত হয়েছে। আজও এই পরিষদের দায়িত্ব সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর। উভয় বাংলার সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত মিলনের যোগসূত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অতি সহজেই হ'তে পারে। আশা করি, উভয় বাংলার সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই বিষয়ে মনোযোগী হবেন।

উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার—

ভারতীয় গঠনতন্ত্র ও কিছুদিন পূর্বে প্রণীত আইনের বিধান অনুসারে যে সব উদ্বাস্তু পাকিস্তান হ'তে ১৯৪৯ সালের ২৬ শে জুলাইর পূর্বে ভারতে এসেছে কেবল মাত্র তারাই আগামী নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী হবে। পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে আগত উদ্বাস্তুগণ ঐ নির্দিষ্ট তারিখের বহু পূর্বেই ভারতে এসেছে। কাজেই এই বিধানে তাদের অসুবিধার কোন কারণ নেই। কিন্তু পূর্ব-বাংলা থেকে বেশী সংখ্যক উদ্বাস্তু এসেছে ঐ তারিখের পরে। তাদের সংখ্যা অনুন ৩০।৩৫ লক্ষ হবে।

উদ্বাস্তুগণ আজ আশ্রয়হীন, গৃহহীন—আমাদের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপে। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে যাদের মধ্যে তেমন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, বঙ্গ বিভাগের পর অবস্থার সংঘর্ষে তাদের অনেকেরই রাজনৈতিক চেতনা জেগেছে। এতগুলি রাজনৈতিকচেতনাসম্পন্ন নরনারীকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

ভারতীয় পার্লামেন্টের শতাধিক সভ্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট এই বিষয়ে এক নিবেদন পত্র দিয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ এবং কলেজের অধ্যক্ষগণ ও আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বিবৃতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট নিবেদন পত্র দিয়েছিলেন। নির্বাচন ৮।৯ মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে; এখনও নির্বাচন হ'তে এক বছর দেরী আছে। কাজেই এই উদ্বাস্তুদের ভোটার তালিকাভুক্ত করার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকতে পারে ব'লে আমাদের বিশ্বাস নয়। আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রী ও ইলেকসন্ কমিশনার অতি সত্বর এই বিষয়ে সুব্যবস্থা করবেন। ইলেকসন কমিশনার

নিজে বাঙালী ; এই ব্যাপারে সমগ্র বাংলার মনোভাব তাঁর অজানা থাকা উচিত নয়। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সম্প্রতি পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের নিকট এক পত্রে জানিয়েছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবানুযায়ী ঐ তারিখের পরে আগত উদ্বাস্তুদের ভোটের অধিকার দিতে গেলে তাঁদের নির্বাচনের সময় তালিকা ফুল হবে। এই ধরণের জবাব কোন সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে এলে দেশবাসী বিস্মিত হ'ত না কিন্তু গণতন্ত্র প্রীতির জন্য খ্যাত জহরলালের নিকট এরকম জবাব তাদের কাছে যতখানি অপ্রত্যাশিত তার চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক হবে বলে আমাদের আশংকা। সর্বদিকে উত্তেজনার বহু কারণ সঞ্চিত হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে শুভ লক্ষণ ব'লে মনে হয় না।

পাট ব্যবসায়—

বিশ্বের বাজারে এতদিন পাটের বিষয়ে ভারতের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের পর খণ্ডিত ভারতের সেই সুবিধা আর নেই। মোট যে পাট অখণ্ডিত ভারতে উৎপন্ন হ'ত তার দুই তৃতীয়াংশ হ'ত পাকিস্তানের অন্তর্গত অঞ্চলে। কেবল পরিমানে নয়, গুণগত হিসাবেও পাকিস্তানের তুলনায় পাটের বিষয়ে ভারত পিছনে আছে। কারণ, হেসিয়ান তৈয়ারীর জন্য যে উৎকৃষ্ট পাট প্রয়োজন হয় তা বেশীর ভাগই পূর্ব-বাংলায় উৎপন্ন হ'ত। কাজেই পাটের ইণ্ডাষ্ট্রিতে ভারতের অবস্থা স্বভাবই একটু শংকাজনক।

অপরদিকে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ভারতের সমগ্র রপ্তানির প্রায় এক তৃতীয়াংশ। রপ্তানি বাণিজ্য দ্বারা ভারত চলতি ডলার যতটা উপার্জন করে তার প্রায় অর্ধেক পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের রপ্তানি দ্বারা অর্জিত হয়। তাছাড়া, কয়েক লক্ষ শ্রমিক ভারতের বিভিন্ন পাটকলে তাদের জীবিকা অর্জন করে। কলিকাতা সহরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নির্ভর করে পাটের উপর। গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ কাঁচা পাটের অভাবে পাটকলগুলি সম্পূর্ণ উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী কাজ করে না। সপ্তাহে মাত্র ৪২॥ ঘণ্টা ক'রে কলগুলি কাজ করে এবং শতকরা ১০-১২॥ ভাগ চট বুনবার তাঁত বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে মোটের ওপর বলা চলে যে উৎপাদন শক্তির প্রায় ২০ ভাগ উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হয়না। উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্য যা স্বভাবত রপ্তানি হ'ত তার জন্য ৫৫ লক্ষ বেইল পাটের প্রয়োজন। কাঁচা পাট উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করা হয়। তাতে এবার ভারতের রপ্তানী ও আভ্যন্তরিণ ব্যবহারের জন্য ৩৯ লক্ষ বেইল পাটের প্রয়োজন হ'ত। মোটের ওপর ৬২৭ লক্ষ বেইল পাট আমাদের প্রয়োজন ছিল। ভারত বিভাগের পর পাট উৎপাদন ১০।১২ লক্ষ বেইল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় পাট ইণ্ডাষ্ট্রি এক শংকটের সম্মুখীন একথা সহজেই অনুমান করা চলে।

মুদ্রা বিনিময়ের গোলমাল নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ব্যবসায়ে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর পূর্ব বঙ্গের দ্বারার অব্যবহিত পরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময়ের ভিত্তিতে কিছু ব্যবসায়িক লেন-দেন হয়েছিল। সেই চুক্তির বলে পাকিস্তান হ'তে ভারত কিছু কাঁচা পাট পেয়েছিল। ঐ চুক্তির সময় এমন কতকগুলি রাজনৈতিক কারণ ছিল যাতে অনেকে ঐ চুক্তির বিরোধিতা করেছে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক কারণ বর্তমানে না থাকায় তেমনি কোন দ্রব্য বিনিময় মূলক বাণিজ্য চুক্তি করার পক্ষে বর্তমানে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। শোনা যায় গত বছরের চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট দেওয়ার পর পাকিস্তান আরও পাট দিতে রাজী ছিল। কিন্তু ভারত সরকার তখন সে পাট নিতে রাজী হয়নি। কারণ তাদের অভিজ্ঞ কর্মচারীগণ হিসাব ক'রে নির্ধারণ করেছিলেন যে পাকিস্তানের পাট ব্যতীতই এ বছর আমরা চালাতে পারব।

এই সব বেহিসাবী কাজের ফলে কলিকাতার পাটকলগুলি সময় মত পাট পাচ্ছে না। সরকার থেকে বরাদ্দ ক'রে দিয়েছে যে অনধিক ৩৫৲ টাকা দরে পাটকলগুলিকে পাট কিনতে হ'বে। কাঁচা পাট সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় পাট সরবরাহ সংঘ (Central Jute Disposal Committee) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ফলে উৎপন্ন হেসিয়ান বা চটের দর সরকার থেকে নির্ধারিত ক'রে দিয়েছে ৫৫৲ টাকা। এবং উৎপন্ন সমস্ত মাল সরকারের পক্ষ থেকে পাট নিয়ন্ত্রকের (Jute Controller) আয়ত্তে যায়। কাঁচা পাট সংগ্রহের যে কেন্দ্রীয় সংঘ তা ভারতীয় পাটকল সমিতির (Indian Jute Mills Association) অধীনস্থ। ভারত সরকারের পাট নিয়ন্ত্রক হ'লেন মিঃ ওয়াকার, ভারতীয় পাটকল সমিতির সভাপতি। কলের উৎপন্ন পাটজাত সমস্ত দ্রব্য তাঁরই আয়ত্তে যায় এবং তিনিই এ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ কাঁচা পাট সরবরাহ হ'তে সুরু ক'রে কলে উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্য বিক্রি করা পর্যন্ত কার্যত সবই ভারতীয় পাটকল সমিতির আয়ত্তে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে ভারতীয় পাটকল সমিতি কার্যত একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান। এর ভোটাধিকার নির্ধারিত হয় এর অন্তর্গত কলসমূহের তাঁতের সংখ্যা অনুসারে। প্রায় ৭৯০০০ তাঁতের ভিতর ইউরোপীয়দের একচ্ছত্রে আছে প্রায় ৬০০০০ তাঁত। এতেই প্রমাণিত হয় যে এই প্রতিষ্ঠানেই ইউরোপীয় প্রভাব কতখানি এবং তারই হাতে আমাদের বিরাট পাট ব্যবসায় গভর্ণমেণ্ট সমর্পণ ক'রে রেখেছেন।

পরিণামে যা দাঁড়িয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল। পাটকলগুলো চোরা বাজারে পাট কেনে নির্ধারিত ৩৫৲ টাকার অনেক বেশী মূল্যে। পাটজাত উৎপন্ন দ্রব্য কলগুলো নির্ধারিত ৫৫৲ টাকা দরেই ভারত সরকারের প্রতিনিধি পাট নিয়ন্ত্রক মিঃ ওয়াকারের হাতে সমর্পণ করে। সেখান থেকে ওয়াকার ও তাঁরই মত বিভিন্ন কলের মালিকগণ ঐ সব পাটজাত উৎপন্ন দ্রব্য আমেরিকার চালান দেন। সর্বসাকুল্যে তাঁদের সেখানে যা দর পড়ে আমেরিকার বাজারে তার চেয়ে প্রায় শতকরা ৪০৲ টাকা বেশী দরে সেই সব হেসিয়ান বা চট বিক্রি হয়। এই যে ফাউ মুনাফা তা ভারতে আসে না, ভারতের ডলারের তহবিলে জমা হয় না; ভারত সরকার তার ওপর কোন আয়কর আদায় করতে পারে না। শিরোভাগের বড় কর্তারাই এই টাকাটা নিজেদের হিসাবে আমেরিকাতে জমা রাখেন। নীচের দিকে খাদ্য-শস্য উৎপাদন না ক'রে যে কৃষক পাট উৎপাদন করছে, সে এই মুনাফার কোন অংশ তো পায়ই না, এমনকি তার শ্রমে উৎপন্ন পাটের কোন সর্বনিম্ন মূল্য পর্যন্ত ধার্য করা হয়নি। মাঝখানে রয়েছে পাটকলের অংশীদারগণ (Shareholders) যাদের বেশীর ভাগ ভারতীয় ও বাঙালী মধ্যবিত্ত। তারা তাদের ন্যস্ত অর্থের সাধারণ লভ্যাংশ থেকেও বঞ্চিত হয়। কারণ চটকলগুলো পাট কেনে নির্দিষ্ট মূল্যের চাইতে অতিরিক্ত মূল্যে, কিন্তু উৎপন্ন মাল বিক্রি করে নির্দিষ্ট মূল্যে। কাজেই কলগুলোর লাভের অংশ অনেক কমে যায়; অংশীদারগণ তাদের ন্যায্য অংশ হ'তে বঞ্চিত হয়। এদের আর একটু উপরে আছে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ যারা পাটের রপ্তানি ব্যবসায় সুরু করেছে। এই দাঁড়িয়েছে ভারত সরকারের সমস্ত ব্যবস্থার পরিণতি।

এর প্রতিকারের জন্য পাটের রপ্তানি শুল্ক গত এপ্রিল মাসে ১৮০৲ টাকা হ'তে ৩৫০৲ টাকা করা হয়। তারপর তাকে বাড়িয়ে ৭৫০৲ টাকা করা হয়েছিল; বর্তমানে তাকে বাড়িয়ে ১৪০০৲ টাকা করা হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য এখন থেকে রপ্তানি পাটের দর আমেরিকায় প্রচলিত দরের সমকক্ষ ক'রে রাখা। খুব মৃদু ভাষায় বলতে গেলে বলা চলে এ অত্যন্ত আনাড়ী ব্যবস্থা। এ রকম ভাবে রপ্তানি শুল্ক বাড়ালে ক্রেতার মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে। বিশেষ ক'রে সেই ক্রেতার কাছ থেকে খাদ্য এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাদের কিনতে হয়। তখন তার বাজারে মাল

পাঠাবার সময় এমন উচ্চহারে শুল্ক বসান বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সাধারণত লোকের ধারণা, পাট-ব্যবসায় ভারতের একচেটিয়া। কাজেই ভারত সরকার এখানে যথেচ্ছ ভাবে আচরণ করতে পারে। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। বহু বেশী পরিমাণে ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব-বাংলায় উৎপন্ন হয়। পাকিস্তান হ'তে কাঁচা পাট রপ্তানির যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা পূর্বে ছিল তা ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রতি খুলনার অন্তর্গত চালনাতে একটী বন্দর খোলা হয়েছে বিদেশে পাট রপ্তানি করার জন্য। ভারতের বাইরে, বিশেষ ক'রে স্কটল্যাণ্ডে প্রায় ৪৫০০০ পাটের তাঁত আছে। ঐ সব কলগুলো দিনে আজ ৩ ঘণ্টার কাজ করছে। অপর দিকে ভারতের পাট তাঁতগুলির এক সঙ্গে কাজ করার উৎপাদন শক্তির প্রায় ২০ ভাগ বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। কাজেই ৬ট বা হেসিয়ান ভারতের প্রায় সম পরিমাণ বিদেশেও উৎপন্ন হয়। তাছাড়া, কাগজ, তুলা বা অন্য প্রকার আঁশ পাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সুরু করেছে। কাজেই সময় থাকতে ভারত সরকারের সাবধান হওয়া দরকার।

কলিকাতার টেলিফোন :

ভারতীয় পার্লামেন্টে কলিকাতার টেলিফোন নিয়ে বহু আলোচনা ইদানিং হয়েছে। কলিকাতার টেলিফোন সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সকলেই জানেন কলিকাতার টেলিফোন কি পরিমাণ অসন্তোষ-জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। সাধারণ একটা টেলিফোন করতে দশ মিনিট থেকে আধঘণ্টা পর্যন্ত সময়ের দরকার হয়। টেলিফোন বালিকাদের বিরুদ্ধে কর্মে অপটুতা ব্যতীত সাধারণ শিষ্টাচারের অভাব সম্বন্ধেও বহু অভিযোগ আছে। শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত ও শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ এ সম্বন্ধে পার্লামেন্টে যে সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী শ্রীখুরসেদ লাল বেশ স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। অরুণ বাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীখুরসেদ লাল বলেন, "সরকার অবগত আছেন যে কলিকাতার টেলিফোন যতদূর খারাপ হওয়া সম্ভব ততদূর খারাপ ("as bad as it possibly can be")। এর দুটী কারণ তিনি বলেছেন—বিলাতী কোম্পানী যখন জানতে পেল যে সরকার কলিকাতার টেলিফোন প্রতিষ্ঠান নিজ হাতে নিয়ে নেবেন, তখন থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত যন্ত্রপাতির কোন পরিবর্তন ও মেরামত তো করেই নাই, সাধারণ যত্ন পর্যন্ত নেয় নি। তাই সরকার যখন ওটা গ্রহণ করেছেন তখন ওখানকার সমস্ত যন্ত্রপাতি একেবারে ঝরঝরে হ'য়ে ছিল। সাধারণ মত সংস্কার ও মেরামত ক'রে কাজ চালিয়ে স্বয়ংক্রিয় (automatic) প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা সরকার করছিলেন। এর মধ্যে আগুনে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুড়ে যায়। তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, ভারতীয় বা বাঙালী টেলিফোন-বালিকা-দের অপটুতা, অমনোযোগিতা ও কার্যে গাফিলতি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণ যে যত্ন ও দক্ষতার সহিত এ কাজ চালাত, ভারতীয় বালিকাগণ তা পারেনা এবং করেনা। এ-কথা সত্য হ'লে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। উভয়েরই প্রতিকার ব্যবস্থা সরকার করেছেন ব'লে শ্রীখুরসেদ লাল ভরসা দিয়েছেন। ১৪ কোটী টাকা ব্যয়ে ৪।৫ বছরের ভিতর স্বয়ংক্রিয় (automatic) টেলিফোন ব্যবস্থা কলিকাতায় প্রবর্তিত হবে। টেলিফোন বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সরকার করেছেন। এই দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থায় কলিকাতাবাসী ধৈর্য ধ'রে থাকবে কিনা জানিনা; আশু প্রতিকারের বিশেষ ভরসা দেখা যায় না।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও এবং 'মন্দিরা' কার্যালয়, ৩২নং আপার সার্কুলার-রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ — ১ম সংখ্যা — আষাঢ়

অগ্নিযুগ

ত্রয়োদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৫৭ | দশম সংখ্যা

কুটির উৎপাদন কেন?

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে তিনটি আপত্তি মার্কসের ভাষায় পাচ্ছি, এবং যে তিনটি আপত্তির উল্লেখ গান্ধী বার বার করেছেন, তার কোন সন্তোষজনক প্রতিকার আমরা বর্তমানে পাই নি শ্রমিকের শ্রমকে শোষণ করার প্রতিকার আজও হয় নি;—আজও সাম্যবাদী রুষিয়াতে সাধারণ ও দক্ষ শ্রমিকের পুরস্কারের (remuneration) পার্থক্য আছে—১ হ'তে ৮০। আজও বিরাট যন্ত্রদানবের সামনে সাধারণ মানুষ একটি নগণ্য পদার্থ—যার ফলে যন্ত্রদক্ষ যাদুকরদের নতুন অভিজাত শ্রেণীর আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হচ্ছে। সবশেষ—আজ ক্রমেই যন্ত্র মানুষের শ্রমকে অনাবশ্যক ক'রে মানুষকে বেকার দুর্গতের পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। মানব সভ্যতার ভবিষ্যতের পক্ষে, ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে, এই তিনটিই যন্ত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এবং আশংকার কারণ। প্রশ্ন হবে—তবে কি আমরা যন্ত্রকে একেবারে বর্জন ক'রে পুরাতন ধীর ও মন্থর উৎপাদনের ব্যবস্থায় ফিরে যাব? মানব সভ্যতার এতদিনের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের এই কষ্টলব্ধ দ্রুত উৎপাদন কি একেবারে ত্যাগ ক'রে, আবার ফিরে যাব—গরুর গাড়ী ও তাঁত চরকার যুগে? প্রাচীনে প্রত্যাবর্তন—এই কি ইতিহাসের শিক্ষা?

এমন আব্দার বা দাবী কেউ করছে না গান্ধীই বর্তমান যুগে যন্ত্রের উগ্রতম বিরোধী. পূর্বে তিনি সর্ব-প্রকার যন্ত্রকে বাদ দেবারই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০৮ অব্দে 'হিন্দ্-স্বরাজ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি লিখে-ছিলেন—"একথা মনে রেখো, যন্ত্র হ'ল 'অভিশাপ'—ক্রমে ক্রমে এর ধ্বংস সাধন করতে হবে।" ঐ গ্রন্থেই তিনি লিখেছিলেন—"যন্ত্রের দোষ সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় বই লিখতে পারি কিন্তু এর কোন গুণই দেখতে পাই না।" (*a*)

কিন্তু পরে তিনি এমনভাবে যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না এবং কংগ্রেসও তেমন বিরোধিতা অনুসরণ করে না। যন্ত্রের আধিক্য ও আধিপত্যকেই তিনি বাধা দিতে চান। তিনি বলেছেন—"আমি যন্ত্র হিসাবেই যন্ত্রের বিরোধী নই;—যন্ত্র যখন প্রভু হয়ে বসে, তখনই আমি এর পূর্ণ বিরোধী" (*b*)

(*a*) "Remember the basic point, machinery is an evil. we shall destroy it gradually." "I can't remember a single merit of the machine, whereas I can write a whole book on its demerits."

(*b*) "I am not against machine as such but I am totally opposed to it when it masters us."

নানা ভাবে ও নানা উপলক্ষে তিনি এই কথা বলেছেন—আমি যন্ত্রের উচ্ছেদ করতে চাই না'—আমি এর নিয়ন্ত্রণ চাই। (c)

গান্ধীর নিকট এই নিয়ন্ত্রণের মূল সূত্রই হ'ল—মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীন শ্রম-সত্তা বজায় রাখা। (d)

গান্ধীর আপত্তি হ'ল যন্ত্রের তেমন প্রয়োগ যা'তে বহুকে শোষণ ক'রে মুষ্টিমেয় ধনপতি সামাজিক ধন-দৌলত আত্মসাৎ করে এবং যা'তে বহু শ্রমিকের শ্রম-সুযোগ অপহরণ করে, তাদের বৃত্তিহীন ক'রে বেকার ভিখারীতে পরিণত করে (e)—

যার ফলে নারী তার দেহ বিক্রয় করতে প্রলুব্ধ হয়, পুরুষ তার আত্মমর্যাদা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। মানবের শ্রমকঠিনা লাঘব করার উপায় হিসাবে ছোট-বড় যন্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেছেন; কিন্তু মানবের শ্রমকে অনাবশ্যক পদার্থ ক'রে, তাকে বেকার করার উপায় হিসাবে তিনি যন্ত্রকে বর্জন করতে বলছেন। (f)

যন্ত্র ও কুটির উৎপাদনের কতকটা সামঞ্জস্য করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে গ্রামের কুটির উৎপাদিত দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষণ করছিল এবং সর্বপ্রকারে কুটির উৎপাদনকে সাহায্য করছে, অপরদিকে ভারতের বৃহৎ ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতির জন্য জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রির পরিকল্পনা পরিষদ স্থাপন ক'রে জাতীয় বৃহৎ ইণ্ডাষ্ট্রির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। এত সময় আমরা যান্ত্রিক উৎপাদনের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি আছে, তারই আলোচনা করেছি; এবার আমাদের দেখতে হবে কুটির উৎপাদনের সম্ভাবনাই possibility) বা কতটুকু; আরও দেখতে হবে মানব সভ্যতার এই সংকট সময়ে কুটির উৎপাদনের পিছনে যে মনোবৃত্তি ও অনুবৃত্তি (tendency) রয়েছে, তা মানব সভ্যতার পক্ষে কতটা উপযোগী হবে।

আজকালকার যন্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে সহজ প্রতিযোগিতায় কুটির উৎপাদন টিঁকে থাকতে পারে না। এই সোজা কথাটা সকলেই বুঝতে পারে, কিন্তু তেমন ব্যবস্থা করলে পর কুটিরের উৎপাদন যে টিঁকে থাকতে পারে, তাও প্রমাণিত হয়েছে। বিরাট ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ভারত সরকারের প্রতিকূলতা ও বিরোধিতা সত্ত্ব ক'রেও, কংগ্রেসের চেষ্টায় ও নিখিল ভারত চরকা-সংঘের ও নিখিল ভারত গ্রাম্য উৎপাদন সংঘের যত্নে, ভারতের গ্রাম্য হস্তচালিত উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ ও ঐ কারিগরী আবার প্রচলিত হচ্ছে। কেবল চরকা সংঘের মারফৎ খাদি উৎপাদনের জন্য প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা গরীব বৃত্তিহীন গ্রামবাসীরা পাচ্ছে। কংগ্রেস দু'বছরের জন্য (১৯৩৭-৩৯) ইংরেজের তাঁবেদারী মন্ত্রিত্ব করেছিল:—ঐ দু'বছরে গ্রাম্য কুটির উৎপাদন প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য কংগ্রেসের মারফৎ পেয়েছে। আজ কংগ্রেস পূর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েছে। আজ যদি কংগ্রেস তার পূর্ব মত বজায় রেখে চলত, তবে গ্রাম্য ও কুটির ইণ্ডাষ্ট্রি সরকারী সংরক্ষণ নীতির প্রত্যক্ষ সাহায্য পেতে পারত। ভারতীয় বহু যান্ত্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের যান্ত্রিক ইণ্ডাষ্ট্রির সঙ্গে সহজ প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারত না;—ভবিষ্যতেও তা পারবে কিনা সন্দেহ। ভারতের

(c) I am aiming not at eradication of all machinery but its limitation.

(d) The supreme consideration is man. The machine should not tend to make atrophied the limbs of man.

(e) I can have no consideration for machinery which is meant either to enrich the few at the expense of the many or without cause to displace the useful labour of many.

(f) I am against its (machinery) indiscriminate multiplication. I refuse to be dazzled by the seeming triumph of machinery. But simple tools and instruments and such machinery as saves the individual labour and lightens the burden of millions of cottages, I should welcome.

বিরাট লৌহ কারখানা টাটা পর্যন্ত এক সময় টলটলায়মান হয়েছিল : বস্ত্র ও চিনির কারখানাগুলির কাহিল অবস্থা খুব বেশী দিনের কথা নয়। সরকারী সংরক্ষণ নীতি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, এবং ভবিষ্যতেও হয়ত তাই করতে হবে। কুটির উৎপাদন সম্বন্ধেও সেই নীতি নিতে হবে ;—স্বদেশী ও বিদেশী মিলের (mill) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটিরকে বাঁচিয়ে রাখার দায় রাষ্ট্রের।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, কেন রাষ্ট্র এই দায় নেবে? এর জবাব পরে আসছে।

মিলের কতকগুলি দোষত্রুটির পরিপূরক হিসাবে, আমরা কুটির উৎপাদনের দিকে তাকাচ্ছি। এই কি কুটির উৎপাদনের পক্ষের শেষ কথা? না এর নিজস্ব কোন গুণ আছে? শুধু কি ঐ negative virtueর জন্যই গান্ধী ও কংগ্রেস একে নিয়েছিল ;—না, এর কোন positive virtue আছে? কুটির উৎপাদনের আলোচনার মুখে যে তিনটি প্রশ্ন তুলেছি, তার প্রথমটির আলোচনা আমরা উপরে করেছি। অপর দুইটি প্রশ্নের আলোচনা এখন করতে হবে ;—আমাদের বর্তমান অবস্থায় এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা কি এবং মানব সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে এর কোন বিশেষ উপযোগিতা আছে কিনা।

ভারতের গ্রামা জনতার নিকট সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল বৃত্তিহীন বেকার জীবন ও তজ্জাত দারিদ্র্য। সভ্য দেশ সমূহের মধ্যে ভারত বোধ হয় দরিদ্রতম। নিম্নে গড়ে জন প্রতি বাৎসরিক আয়ের হিসাব দেওয়া হল।* যুক্তরাষ্ট্র—১৪০৬৲, কানাডা—১০৩৮৲, যুক্তরাজ্য (বৃটেন) —৯৮০৲, রুশ—৬২১৲, জার্মানী—৬০৩, জাপান—২১৮৲ এবং ভারত ৬৫৲। এর মধ্যে সহরের লোকদের আয় আলাদা ক'রে ধরলে, গ্রামের লোকদের আয় বৎসরে ৫০৲ টাকার নীচেই থাকবে। এর মধ্যেও আবার গ্রামা জমিদার, মহাজন ও ভদ্রলোকদের আয় আলাদা ক'রে কেবল গ্রামা কায়িক শ্রমশীল ব্যক্তিদের আয়ের হিসাব ধরলে পড়ে জনপ্রতি আয় ৩০।৪০৲ টাকার বেশী হবে না। অথচ এই ৩০।৪০৲ টাকা যাদের মাথাপিছু বছরে আয়, তারাই হ'ল ভারতে প্রধান ধন-উৎপাদক এবং ২।১ দশক পূর্বে এরাই ছিল একমাত্র ধন-উৎপাদক। ভারতের প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং প্রায় শতকরা ৭২ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতের মোট আয়, যাকে ইংরেজীতে বলে national income বা জাতীয় আয়, ছিল ১৮০০ কোটি টাকার মতো। তার মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে ৩৭৪ কোটি, চাকুরী থেকে ৪৮৪ কোটি এবং কৃষি থেকে ১১৮৬ কোটি—অর্থাৎ ১৭ ভাগ ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে, ২৭ ভাগ চাকুরী থেকে, ৪৩ ভাগ কৃষি থেকে এবং ৮ ভাগ অন্যান্য উপায়ে। অথচ এই কৃষিজীবীদের জনপ্রতি আয় বছরে মাত্র ৩০।৪০৲ টাকার মতো।

এই অত্যল্প আয়ের একটা প্রধান কারণ কৃষির উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নির্ভর করছে। গ্রামের যতসব কারিগর—যারা হস্তচালিত নানা ইণ্ডাষ্ট্রি বা নানা উৎপাদন দিয়ে জীবিকা অর্জন করত, তারা আজ বহুল পরিমাণে বৃত্তিচ্যুত হয়ে কৃষির উপর নির্ভর করছে। গত ৩০ বছরে ভারতে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৪ কোটি। ভারতে কারখানা বেড়েছে ৪গুণ—১৯১১ সালের ২৭০০ হ'তে ৩৬ সালে ৯৩০০ হয়েছে। অথচ কারখানা বা কুটির উৎপাদনের ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৪½ জন হ'তে ক'মে ৪ জন হয়েছে—এবং শ্রমশীলদের অনুপাতে শতকরা ১১ জন হ'তে ক'মে ৯½ হয়েছে। এর অর্থ হ'ল বাকি সব লোক—কতক চাকুরীতে এবং বহুলাংশ কৃষিতে নির্ভরশীল হয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষির জমির অনুপাতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রতি দশকের লোক গণনায় কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মোটে ও অনুপাতে বেড়েই যাচ্ছে। কৃষি-উপজীবী লোকের আনুপাতিক সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৬১%, ১৯০১—৬৬%, ১৯১১—৭১%, ১৯২১—৭২·৮%. ১৯৩১ এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না—আনুমানিক ৭৩%। মনে রাখতে হবে ঐ ৪০ বছরে ভারতে লোকসংখ্যা প্রায় ১৮।২০ কোটি বেড়েছে—অর্থাৎ প্রায় ডবল

* এই হিসাব গত যুদ্ধের পূর্বের। এখনে অবস্থিত ভারতের হিসাব ধরা হয়েছে।

হয়েছে। কাজেই এই ৪০ বছরে মোট কৃষি-উপজীবী লোকের সংখ্যা প্রায় ডবল হয়েছে। অথচ কৃষির জমি সেই অনুপাতে বাড়েনি, এবং প্রায় একই রকম আছে। ১৯৩১ সালের হিসাবে ভারতে কৃষি-উপযোগী জমি আছে ৬০ কোটি একর (acre); ১০ কোটি লোক এই জমিতে কাজ করে। অন্য দেশের তুলনায় ৫ কোটির বেশী লোক এই জমির জন্য দরকার হয় না,—যান্ত্রিক কৃষি করলে আরও কম দরকার হয়। এ ছাড়া বেকার, অর্ধ বেকার, বন্ধ্যাশ্রমে নিয়োজিত এবং এই দশ বছরের (১৯৩১—৪১) বাড়তি জনতার প্রায় অর্ধেক (অর্থাৎ যারা কোন ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিয়োজিত হ'তে পারবে না)—এই সব নিয়ে আরও ৫ কোটি লোকের জন্য—অর্থাৎ দশ কোটির জন্য কোন উৎপাদনী শ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষির ক্ষেত্র প্রকৃতি কর্তৃক সীমাবদ্ধ কৃষি উপযোগী জমির পরিমাণ অনুসারে। কাজেই এই দশ কোটি লোকের অন্নকরী, সৃজনী শ্রমের ব্যবস্থা কৃষির বাইরে করতে হবে। কারখানা গৃহে এদের ব্যবস্থা হ'তে পারে না—এমন যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবও নয়। মনে রাখতে হবে—৩০ বছরে কারখানার (factory) সংখ্যা চারগুণ হলেও, ৩১ সালে ভারতের কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় কোটি। গত যুদ্ধের সময় হয়ত বেড়ে দুই কোটি হ'তেও পারে। এর উপর আরও দশ কোটি লোকের সংস্থান যান্ত্রিক উৎপাদনে করা স্বাধীন ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজেই কুটির-উৎপাদন ছাড়া ভারতের এই দশ কোটি বেকার ও অর্ধ বেকার লোকের অন্য কোন সংস্থান হ'তে পারে না। কৃষিতে যারা পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে, তাদেরও মাসিক জন প্রতি কিছু আয় বাড়াবার জন্য অন্য কোন সহকারী বা গৌণ অর্থকরী শ্রমের ব্যবস্থা করা দরকার। মানুষের মত থাকতে হ'লে তাদের বর্তমান মাসিক আয় দিয়ে চলে না। ছোট খাট কুটির উৎপাদন এদের পক্ষে একমাত্র সহায়ক। অথচ গ্রামের হস্ত উৎপাদন ও গৌণ আয়ের পথ আজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কলুর তেলের ঘানি, বিধবা দরিদ্র মেয়েদের ঢেঁকিতে ধান ভানা, জাঁতার ডাল বা গম পেষা। গ্রাম্য কুটির জাত ব্যবসা, জোলা-তাঁতীর তাঁত, দেশী কামারের কোদাল কাস্তে, ছুরি-কাঁচী প্রভৃতি তৈরি, কুমারের মসৃণ পালিশ করা বৈয়ম, মাটট ইত্যাদির কাজ—এ সবই ত আমাদের চোখের সামনে বন্ধ হ'য়ে গেল। আজ কলের চাউল, কলের আটা ময়দা, কলের তেল, সাহেব কোম্পানীর কারখানার তৈরী কোদাল, কাস্তে, শহরের তৈরী বৈয়ম, জার (Jar) প্রভৃতিতে গ্রাম পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। যে অনাথা বিধবা পাঁচ বাড়ীর ধান ভেনে দিন গুজরান করত, বা পাড়াপড়শীর মুড়ি-খৈ-চিড়ে ভেজে জীবিকা অর্জন করত, আজ তার পক্ষে খোলা আছে হয় ভিক্ষা না হয় নারীত্ব বিক্রির অপমান। গ্রামের কামার, কুঁইমালী, তেলী, কলু, কুমোর—সবাই আজ বৃত্তিচ্যুত।

(ক্রমশঃ)

"ভারতীয় সংবাদপত্রের এক অধ্যায়"

সুশীল ঘোষ

ভারতীয় সংগ্রামের মুক্তিব্রতী বীর সাধকদের কণ্টকাকীর্ণ চলার পথের সাথী সংবাদপত্র অযুত বাধা-বিপত্তি উত্তরণ ও অশেষ সরকারী লাঞ্ছনা ও নির্যাতন বরণ করিয়া যে দুঃসাহসিক যাত্রা সুরু করিয়াছিল, বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতে প্রায় দুই শতাব্দীর পর ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে আসিয়া সেই অবিশ্রাম পদক্ষেপের নূতন গতিপথ সূচিত হয়।... ১৯৪০ সালের শুমোট পরিস্থিতি। ভারতে তখন একদিকে বহির্ভারতীয় যুদ্ধের ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া—আর অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিদ্যুৎ ঝলকানি। গান্ধীজীর নির্দেশে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সুরু হইয়াছে। সরকারী অনুচরের দল তাহাদের দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যের নির্লজ্জ শাসানির দ্বারা সত্যাগ্রহীদের কণ্ঠরোধে তৎপর। দেশজোড়া ঘূর্ণায়িত অসন্তোষ পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যে বিরাট বারুদের স্তূপের মত প্রবলভাবে ফাটিয়া পড়িবে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদের দুর্জয় প্রতিবাদের মধ্যে তাহারই স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের কথা জনসাধারণের মর্মবাণী এবং সত্যাগ্রহীদের আদর্শ প্রচার করিয়া আসন্ন বিপ্লবের আগমনী গাহিবার যে নৈতিক দায়িত্ব সংবাদ-পত্রের উপর বর্তাইয়াছিল—নির্বিচার সরকারী নিগ্রহে সংবাদপত্র সমূহ সমগ্রভাবে সে দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। তদুপরি কোন কোন কাগজে জাতীয় স্বার্থের উপেক্ষা এবং সরকারী আচরণের সমর্থনের প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ কোন পত্রিকার এই জাতীয় মনোবৃত্তির পশ্চাতে দেশের ও দশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধি ছিল প্রবল। তাহা ছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে বোধ হয় উদার প্রধান কারণ ছিল সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে ফ্যাসী-বিরোধী মনোভাবের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। এই হেতুই সরকারের দমননীতির যেটুকু প্রতিবাদ করা সমীচীন ছিল সংবাদপত্র মহলের তরফ হইতে তাহাও উত্থিত হয় নাই। তবুও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আদর্শ ও মনোভাবগত বিরাট পরিবর্তন ক্রমশঃই অনিবার্য হইয়া ওঠে এবং ১৯৪০ সালের ২৬শে অক্টোবর সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় নূতন নির্দেশ জারী হইবার পর তাহাদের সম্বিত ফিরিয়া আসে। ১৯৪০ সালের ২৬শে অক্টোবরের সরকারী নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ :—

"In exercise of the powers by clause b) of sub-rule (1) of rule 41 of the Defence of India Rules, the central Govt. is pleased to prohibit the printing or publishing by any printer, publisher, or editor in British India of any matter calculated directly or indirectly, to foment opposition to the prosecution of the war to a successful conclusion or of any matter relating to the holding of meetings or the making of speeches for the purpose directly or indirectly, or fomenting such opposition as aforesaid".

উপরোক্ত নির্দেশের সারমর্ম এই যে, যুদ্ধায়োজনে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষে বাধা জন্মে, যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে যুদ্ধ বিরোধীতা—কোন সংবাদপত্র এইরূপ কিছু প্রকাশ করিতে পারিবে না। তদুপরি উক্ত নির্দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কোন সংবাদ বা কোন সত্যাগ্রহী বক্তৃতা বা তাহার অংশ-বিশেষ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা পূর্বে নিম্নলিখিত

সংবাদপত্র পরামর্শদাতাকে দেখাইতে ও অনুমতি লইতে হইবে এই অসম্মানজনক নির্দেশের প্রতিবাদেই মহাত্মা গান্ধী তৎকালে তাঁহার 'হরিজন' প্রকাশ বন্ধ রাখেন, এবং আরও দু'একটি কাগজ তাহাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেন। উহার ফলে সংবাদপত্র জগতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা বিবেচনার জন্য ভারতের প্রতিনিধিমূলক কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ১৯৪০ সালের ১০ই নভেম্বর দিল্লীতে একটী সম্মেলন আহ্বান করেন দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় আশীখানি পত্রিকার সম্পাদক এই সম্মেলনে সমবেত হন। সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ভারত শাসন আইনানুগ হুকুমগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং একটি যুক্তসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। মাদ্রাজের প্রভাবশালী "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী কে শ্রীনিবাসন সভাপতির অভিভাষণে ভারত সরকারের আলোচ্য নির্দেশের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের অজুহাতে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমন করার যে প্রচেষ্টায় সরকার নিযুক্ত—পত্রিকাসমূহ তাহাতে কোনক্রমেই সহযোগিতা করিতে পারেনা। কিন্তু তবুও সম্পাদকগণ সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেন তাহাকে কিছুতেই সম্মানজনক বলা চলে না। নিষ্পত্তিটির স্বরূপ ১৯৪০ সালের ১১ই নভেম্বর প্রচারিত নিম্নোদ্ধৃত সরকারী জ্ঞাপনীর কথাগুলি হইতে উপলব্ধি করা যাইবে :—

"As a result of friendly conversation in Delhi with representatives of leading newspapers, who have given the assurance that they have no intention of impeding the country's war effort and that any systematic attempt by newspapers to do so would be viewed with disapproval by the press as a whole, the Govt. now feel that the matter may well be left to the discretion of editors, in consultation with press Advisers in case of doubt".

"They are therefore pleased to withdraw the order in question.

They are further pleased to accept a sugestion that a small Advisory Committee of representative of the press, resident in Delhi, shall be set up to advise the Govt. on any matters affecting the press, and they will recommend to provincial Government, the constitution of similar Advisory Committees in the provinces."

উহা হইতেই বুঝা যায়, সংবাদপত্র সমূহের জয় মোটেই হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার ঘুচলেকা লইয়া সম্পাদকগণের বিবেচনার উপর ব্যাপারটা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভারতীয় দণ্ডবিধি রহিল, ভারতরক্ষা আইন রহিল, সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষগণ যাহা করেন নাই তাহা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল—তার উপর সরকারী প্রেস উপদেষ্টাগণের উপর বে-সরকারী সংবাদপত্র প্রতিনিধিরূপে "উপদেষ্টা" বাড়িল।

কিন্তু এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ না হইয়া প্রতিনিধিগণ যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন খবরাখবরই প্রকাশ করিবেন না তাহা হইলেই প্রকৃত সুবিবেচনার কাজ হইত। উহার ফলে তাহারা রাজপুরুষগণের অপ্রকাশ্য ও অপ্রকাশিত শ্রদ্ধা এবং সম্মানজনক নিষ্পত্তি পাইতে পারিতেন; কারণ কাগজগুলিতে বৃটেনের ক্রমাগত জয়ের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বৃটেনের সুবিধা হইতেছিল—যুদ্ধ সংবাদের অপ্রকাশ দ্বারা সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে সরকার কিছুতেই রাজী হইতেন না।

যাহা হউক, নবগঠিত উপদেষ্টা কমিটি যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে সরকারকে বশমতে আনা কখনই তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সরকারের দৃষ্টিতে যাহা ছিল অন্যায়, সংবাদপত্রের দৃষ্টিতে হয়ত তাহার মধ্যে কোন অন্যায় ছিল না। কিন্তু তবু সাংবাদিকগণের সচিত নিস্পত্তি সত্ত্বেও সরকার নিজের খেয়াল খুশী মত পত্রিকার কণ্ঠরোধ করিয়া বারংবার উল্লিখিত চুক্তির অসারতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাই উপদেষ্টা কমিটির বাহ্যিক অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইলেও আসলে উহার কোনই প্রভাব ছিল না।

অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে সংবাদপত্র মহল সরকারী অবিচার একেবারে নীরবে সহ্য করেন নাই। যুক্তপ্রাদেশিক সরকার এই সময় আগ্রার "সৈনিক" এবং লক্ষ্ণৌ এর "ন্যাশনাল হেরাল্ড" এর প্রত্যেকের নিকট হইতে ছয় হাজার টাকা জমানত দাবী করেন। যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের এইরূপ আচরণের প্রতিবাদে সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের স্থায়ী কমিটি সরকারের নিকট জমানত প্রত্যার্পণের দাবী জানান। ১৯৪১ সালের ১লা, ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস" এর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই দাবী জানান হয়। বৈঠকে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে কমিটি এই প্রথমবারের মত দেশের স্বাধীনতার জন্য সংবাদপত্রের সংগ্রামের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। (The standing committee reaffirms the determination of the Press of India to strive for the freedom of the country without fear or favour and consequently to give legitimate publicity to news about the political movement in the country)। ইতোমধ্যে সরকার আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাহা হইতেছে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি এবং সত্যাগ্রহ সংক্রান্ত খবরাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। কারণ উহা দ্বারা নাকি যুদ্ধোদ্যমকে ব্যাহত করার চেষ্টা করা হইতেছিল। সংবাদপত্র মহল এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি এই সম্পর্কে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের নিকট যে স্মারক পেশ করেন উহাতে সুস্পষ্টভাবে এইরূপ বলা হয়—"The Indian Press cannot be expected to accept Government interpretation that the Satyagraha Campaign is intended for the sole purpose of impeding the war effort.....In the situation which is developing, Nationalist papers feel entitled to regard Gandhiji's statements as exceptional and cannot fairly be expected to become willing parties to their suppression. It must be borne in mind that they are not bound to refer everything to Press Advisers, nor is there any obligation on their part to accept their advice. It is open to an editor to say "I have accepted the advice of Press Advisers in nine cases ont of ten; but in the tenth the advice tendered is unsound and therefore I shall take the risk of publication."

কিন্তু এই স্মারক সরকারী নীতিগত আচরণে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পরন্তু উহার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকারের তদানীন্তন প্রধান সংবাদপত্র উপদেষ্টা মিঃ ইয়ং ১৯৪১ সালের ২০ শে জানুয়ারী তারিখে যে লিপি প্রেরণ করেন তাহা হইতেই সরকারের অনমনীয় মনোভাব উপলব্ধি করা যাইবে। উক্ত লিপিতে দীর্ঘ এবং হীন ভাষায় বলা হইয়াছে, 'Neither the Govt. of India nor the Govt. of any country engaged in a life and death struggle with foreign power can permit anything which will prejudice the successful conduct of the war." অর্থাৎ "ভারত সরকার একটি বৈদেশিক শক্তির সহিত যে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, উহাতে যুদ্ধায়োজনের প্রতিবন্ধক কোন কার্যকলাপ সরকার অনুমোদন করিতে পারেন না।"

মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি সম্পর্কে মিঃ ইয়ং এর লিপিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল বিবৃতি যদি পূর্ব সঙ্কল্পানুযায়ী

যুদ্ধোদ্যোগে বিঘ্ন উৎপাদনে প্রয়াসী না হয় তাহা হইলে সরকার ঐ সকল বিবৃতি দমন করিবেন না "As regards statements by Mahatma Gandhi, Govt. have no desire to suppress them unless they are calculated to impede the prevention of war or to provide the enemy with propaganda material, and will certainly give them special consideration, in view of the respect in which Mahatma is held in India and the interest which attaches to anything he writes".

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন—১৯৪২ সালের চিরস্মরণীয় ৯ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক রূপান্তর গ্রহণ করে। সুদীর্ঘকালের পরবশতা হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভের জন্য এবং শাসকগোষ্ঠীর চণ্ডনীতির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য বহুকালের অত্যাচার-নিষ্পেষিত জাতি যে এমন মরিয়া হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইবে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। "ভারত ছাড়" দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন যেরূপ ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতে দাবাগ্নির মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল উক্ত মন্ত্রের উদ্গাতা মহাত্মা গান্ধীও প্রথমে উহার অনুরূপ পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন কিনা সন্দেহ; এবং ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় উত্তরকালে আন্দোলনের ভিন্নমুখী গতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, সংবাদপত্র সমূহও এই সময় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল যে, জাতির এই সংকট-সন্ধিক্ষণে তাহাদের দায়িত্ব অপরিসীম। তাই "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও এই দাবীর পশ্চাতে তাহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে, আন্দোলন যতই তীব্র হইয়া উঠিল, দমননীতির বাড়ও তত ব্যাপক, এবং তত ভয়াবহ আকারে সংবাদপত্র দলনে প্রকটিত হইতে লাগিল। মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যেমন অবরুদ্ধ হইলেন, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তেমনি অর্ডিনান্স জারী করিয়া কতগুলি কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর পড়িল নিত্য নূতন জামীন দাবী ও সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার অভিযান। তাহা ছাড়া উদ্ভট যত সব সরকারী নিয়ম যেমন সংবাদ-দাতাগণের নাম রেজেষ্ট্রী করা, ছাপাখানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংবাদপ্রকাশ করা, পুলিশি অবরদস্তি সম্পর্কীত হেডিংএর পরিমিতি ইত্যাদি এই সময়ই প্রচলিত হয়।

১৯৪২ সালের ২০শে আগষ্ট কলিকাতার দৈনিক 'ভারত'এর অফিসে হানা দিয়া পুলিশ 'ভারত'এর সব কপি হস্তগত করে। সেখানে যে সব কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকেই ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইতিপূর্বে '৪২ সালের ৮ই আগষ্ট ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি গোপনীয় ইস্তাহারে কতকগুলি বিশেষ সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য পত্রিকা সমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই ৫ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঃ সম্পাদক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক মিঃ বি, জি হর্ণম্যান উল্লিখিত সরকারী নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, নির্দেশটির ধরণ এমনই যে দুনিয়ার কোন পত্রিকাই উহা সহ্য করিতে পারে না: ("The order was of the kind which, I do not think, any press in any country in the world would tolerate and we certainly cannot tolerate .....we may as well shut our paper rather than submit to these restrictions") মিঃ হর্ণম্যান তেজোদীপ্ত ভাষায় সরকারকে সতর্কিত করেন যে, সরকার যদি সংবাদপত্রের স্বার্থবিরোধী কোন নির্দেশ জারী করেন, পত্রিকাসমূহ তাহা হইলে তাহাদের প্রতিশোধাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না। সরকার যদি নিজ স্বার্থবিরোধী সংবাদ প্রকাশ দমন করিতে চান, সংবাদপত্র সমূহও তবে সরকারী স্বার্থের অনুকূলে কোন সংবাদ প্রকাশ করিবেন না। ইহাতে

সরকার পক্ষই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন। মিঃ হার্শম্যানের মূল বক্তৃতার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "I want to say that we have our measure of retaliations, we have what are called sanctions, which we can implement on any stand we make in this matter, Suppression of news is a game played by two parties. If Govt. suppress news that are inconvenient to them we can also suppress news which are convenient to them.....If we are to take up that position, it will be very inconvenient to them. Unless we are prepared to keep our measure of retaliation in preparation and let it be known that we are prepared to retaliate, I do not think that we will get any satisfaction at all. Suppression of news, as I said, we can do more effectively. We have means to do it more than the Govt. of India or the provincial Governments. If they find all their propaganda, all their communiques and speeches on Indian political situation, whether from Delhi or from Whitehall, not published, I think they will take a very much more moderate attitude. We are capable of making a complete blackout of every Govt. propaganda or communiques."

কিন্তু সম্পাদকগণের শত আপত্তি ও প্রতিবাদেও সরকার এতটুকু কর্ণপাত কিংবা নীতির সামান্যতম পরিবর্তন করেন নাই। উহার ফলে উভয় পক্ষে তিক্ত বিরোধের অবসান তো হয়ই নাই—পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধ্যাপক ভাঁসালীর অনশন সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ লইয়া এই বিরোধ চরমে উপনীত হয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার সর্বপ্রথম নিজ প্রদেশস্থ পত্রিকা সমূহের উপর এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, অধ্যাপক ভাঁসালীর অনশন সম্পর্কে তাহারা কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। বম্বে প্রদেশের অনুসরণে অন্য প্রদেশও এইরূপ নির্দেশ জারী হইল। এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে সম্পাদক সম্মেলনের স্থায়ী কমিটি ১৯৪২ সালের ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারকে এই মর্মে হুসিয়ার করেন যে, ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে ভারত সরকার তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া উহার প্রতিকার না করিলে, ঐ তারিখ হইতে তাহারা বৃটিশ মন্ত্রী ও বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্যগণের বক্তৃতা, নববর্ষের খেতাবের তালিকা, লাট-বড়লাটের প্রাসাদের খবরাদি ইত্যাদি প্রকাশ করিবেন না। ঐ সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অধ্যাপক ভাঁসালী সম্পর্কে সরকারী অন্যায় হুকুমনামার প্রতিবাদে ওই জানুয়ারী ভারতের কোন পত্রিকাই প্রকাশিত হইবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ দিন সমগ্র ভারতের সংবাদপত্র সমূহ হরতাল পালন করে।

ফলে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার ১৯৪৩ সালের ১২ই জানুয়ারী হুকুমনামা প্রত্যাহার করেন এবং সংবাদপত্র সমূহও তাহাদের সংকল্প শিথিল করেন।

কিন্তু এই সব সত্ত্বেও ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ এই সময় যে অযোগ্যতার পরিচয় দেন উহার বিষময় ফল সংবাদপত্র সমূহকেই ভোগ করিতে হইত। তাহাছাড়া অযথা হরেকরকম কড়াকড়ি বলা, ১৯৪৩ সালের ৮ই মার্চ রাজাগোপাল আচারীর বক্তৃতা বেআইনী ঘোষণা, ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে স্থায়ী কমিটির বিকৃত ব্যাখ্যা, তদুপরি ভারত সম্পর্কে মিঃ লুই ফিশারের আমেরিকার রচনা অবৈধ ঘোষণা ইত্যাদির দ্বারা সরকারী প্রচার দপ্তর দেশীয় সংবাদপত্র ও ভারতের মনে নিরন্তর অসন্তোষের ইন্ধন যোগাইতেছিল।

শত্রুপক্ষের কাজে লাগিবে এই অজুহাতে কতগুলি সংবাদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিতে দেন নাই। যে সংবাদগুলির

প্রকাশ সম্বন্ধেই দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর তাহা প্রকাশ না করিতে সম্পাদকগণও সম্মত ছিলেন; কিন্তু সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আচরণে মনে হয় যে, ভারতীয় সম্পাদকগণ কি সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করেন বা না করেন, যেন প্রধানতঃ বা অনেকটা তাহার উপরেই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভরশীল ছিল। এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হইয়াই প্রচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সংবাদ নিয়ন্ত্রণের আদেশ কড়াকড়ি করার জন্য অধিকতর বদ্ধপরিকর হন।

বাস্তবিকপক্ষে, আলোচ্য বৎসরে প্রচার দপ্তরের কার্যকলাপ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে মিত্র-পক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কুৎসা রটান ছাড়া উহার যেন আর কোন কর্তব্য ছিলনা। রাজনৈতিক সংবাদের উপর কঠোর সেন্সর বসানো সুরু হইল। বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ লুই ফিশারের লেখা প্রকাশ নিষেধ করিয়া ঢালা হুকুমজারী উহার সর্বশেষ নিদর্শন। টিউনিসিয়ার জয় উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রগুলিতে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দিয়াও উক্ত বিভাগ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে ক্রোড়পত্র বাহির করিতে বলা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা এজন্য অতিরিক্ত কাগজের অনুমতি চাহিলে উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। শুধু তাহাই নয়, প্রচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষ্যে একদিন ছুটি দিয়া সেই কাগজ বাঁচাইয়া ক্রোড়পত্র ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন। ১৯৪৩ সালের ১৪ই ও ১৫ জুলাই বোম্বাই প্রদেশে সম্পাদক সম্মেলনের স্থায়ী কমিটির চতুর্দশ বৈঠকে সভাপতি শ্রী শ্রীনিবাসন সরকারী প্রচার দপ্তরের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, "এই বিভাগের কার্যে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

ভারতের সংবাদপত্রগুলির উপর কোন বন্ধন নাই বলিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে যে প্রচারকার্য চলিতেছিল তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রী শ্রীনিবাসন তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "সরকারের বক্তব্য যে, যুদ্ধের সময় যে-কোন দেশে যতখানি স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, ভারতবর্ষে তাহা আছে। আমরা যে এই মন্তব্য সমর্থন করিব প্রচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাহা আশা করেন না। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির উপর কোন বন্ধন নাই—ভারত সরকারের কর্মচারীগণ বহুদিন ইহা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। একদল তুকী সাংবাদিক এ দেশে সরকারের রক্ষণাধীনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তুরস্কে ফিরিয়া আমাদের স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা করিয়া ব্যাপারটি চরমে তুলিয়াছেন। আমাদের এই সকল বন্ধুদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, তুরস্কের সংবাদপত্র আমাদের আদর্শ নহে,—বৃটেন ও আমেরিকার সংবাদপত্র পরিচালনা-পদ্ধতি এ দেশে অনুসৃত হউক ইহাই আমরা চাই"

এই সময় পুনরায় তিনটি পত্রিকা যথা, নাগপুরের "হিতবাদ" পাটনার "পাটনা টাইমস" এবং কলিকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকা" সরকারী শাসন কবলিত হয়। "হিতবাদের" বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ঐ বৎসর ২১ শে আগষ্ট বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ জে, আর, ব্রেয়ারের পদত্যাগের সংবাদ প্রকাশ, "পাটনা টাইমস" এর বিরুদ্ধে অভিযোগও ঐ জাতীয় ছিল; কিন্তু "অমৃত বাজার পত্রিকার" উপর অভিযোগ ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। "অমৃত বাজার পত্রিকায়" দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ও খাদ্য সমস্যা লইয়া ১৯৪৩ সালের ২৮ শে ও ২৯ শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দুইটী সম্পাদকীয় লেখা হয়। তাহাতে অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে, রাশিয়ার কিংবা ফ্রান্সে বিদ্রোহের আগে যে অবস্থা হইয়াছিল, তখনকার অবস্থা তাহার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইহাতে বাংলা সরকার ক্রুদ্ধ হইলেন। বিষয়টি উপদেষ্টা কমিটিতে মতামতের জন্য পাঠানো হইল। তাঁহারা বলিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটা প্রসঙ্গের তুলনাকে বিদ্রোহে উত্তেজনা বলা চলে না—কিন্তু কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলেন, পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আগেই সেন্সর করিয়া লইতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, অন্যান্য সংবাদপত্রকেও এই মর্মে জানাইয়া দেওয়া হইল, সরকার যে পত্রিকার উপর

এই হুকুম দিয়াছেন, সেই হুকুম লইয়াও যেন মন্তব্য করা না হয়। 'পত্রিকা' কয়েকদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভ খালি রাখিয়াই কাগজ বাহির করেন।

১৯৪৪ সালের ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী মাদ্রাজে নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের অবলম্বিতমূলক নীতি পর্যালোচনা করিয়া বলেন, "বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহার জন্য নিছক সামরিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে সংবাদপত্রের উপর কঠোর বিধান বলবৎ রাখা সঙ্গত হইতে পারে। বরং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কীত বৈধ অভিযোগ প্রকাশ ও আলোচনা করার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্তব্য। সম্পাদক সম্মেলনের কার্য নির্বাহক সমিতির সহিত সরকারের যে চুক্তি হইয়াছিল, ভারতীয় পত্রিকা সমূহ ঘোটের উপর তাহা মানিয়া চলিয়াছেন।" সৈয়দ ব্রেলভী তাঁহার ভাষণে স্বার্থহীন ভাষায় বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারি; কিন্তু অপর পক্ষ কি বলিতে পারেন?" বস্তুতঃ সরকারের পক্ষে ঘোষণালনের কোন পথই তখন খোলা ছিল না। ১৯৪০ সালে "উপদেষ্টা কমিটি" নিয়োগের পূর্বে সরকার পক্ষ হইতে এই মর্মে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল যে, সংবাদপত্রের উপর কোনও হুকুমজারী করার পূর্বে "উপদেষ্টা কমিটি"র সহিত পরামর্শ করা হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গিয়াছে যে দুইএকটি ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির সহিত কোন কোন বিষয়ে আলোচনায় সরকারের আগ্রহ দেখা দিলেও প্রায়শঃই ঢালা হুকুমজারী করার পূর্বে উক্ত কমিটির সহিত কোনই পরামর্শ করা হয় নাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহীত পরামর্শ নানা অছিলায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটির মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, ভারত সরকার যে নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের অজুহাতে প্রাদেশিক সরকার সমূহকে সেই নীতি ভঙ্গ করিতে দেওয়া হইয়াছে। বৈধভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা সম্পর্কে দিল্লী-চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিধিনিষেধ জারী হইয়াছে। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে সংবাদ-পত্র সম্পর্কে ভারত সরকারের আচরণ ছিল সম্পূর্ণরূপে "ভদ্রলোকের চুক্তি" বিরোধী। তাহা ছাড়া দুই বিশ্বারের রাজনৈতিক বন্দুবা, গান্ধীজীর অনশন সংক্রান্ত সংবাদ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আজাদ মুসলীম বোর্ডের প্রস্তাব এবং শ্রীরাজাগোপাল আচারী ও স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর বিবৃতি যে-আইনী ঘোষণা করার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ভারত সরকার সীমাহীন অজুহাত প্রদর্শনের পারদর্শিতা হইতে কোনদিন বঞ্চিত হন নাই। প্রেস এ্যাডভাইসারি কমিটি গঠনের দ্বারা পত্রিকা মহলের কোনও লাভ হয় নাই ইহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। নিঃ ব্রেলভীর অভিভাষণেই এইরূপ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়াই "যুগান্তর" "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" এবং বোম্বাইয়ের "জন্মভূমি" প্রকাশ বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়। তা'ছাড়া, সংবাদপত্র দমনে সরকারী আগ্রহ বহুক্ষেত্রেই নগ্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন লেখা ভারতরক্ষা বিধানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে কি-না সে বিচারের ভার তাঁহারা নিজ হস্তেই রাখিয়াছেন; আদালতকে সাধারণতঃ তাঁহারা এড়াইয়া চলিয়াছেন। সংবাদপত্রের সহযোগিতা লাভে সরকারের মৌখিক আগ্রহে আন্তরিকতার অভাবও ধরা পড়িয়াছে বার বার।

সরকারী মহল সর্বাপেক্ষা গর্হিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রকাশের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া। ১৯৪৩ সালে সারা ভারতে যে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, বিশেষতঃ বাংলাদেশে সরকারী অব্যবস্থাজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে যে

লক্ষ লক্ষ নর-নারী মৃত্যুকবলিত হয়—বাংলাদেশের সেই পাইকারী মৃত্যুর সংবাদ ভারতবাসী তথা সারা দুনিয়াবাসীর নিকট অজ্ঞাত থাকে নাই। কিন্তু তথাপি যথাসময়ে বাংলাদেশের সংবাদ সম্বন্ধে দুনিয়াবাসীদের অবগতির যাবতীয় পথ বন্ধ করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা সরকারের কুৎসিততম মনোবৃত্তির পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে।

"বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ নূতন নয়। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতেই সুপরিকল্পিতভাবে উহা চলিয়া আসিতেছে। ১৮২৩ সালের এ্যাডাম রেগুলেশন এবং ১৯৩৯ সালের ভারতরক্ষা আইনে প্রদত্ত আদেশগুলির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। সাময়িক প্রয়োজনের নামে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যেক স্তরের সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান অহরহ ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ 'নিষেধাজ্ঞা' উল্লেখকরা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া এক অদ্ভুত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। অস্থায়ী বড়লাট এ্যাডাম এই ফন্দীটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অতীত ও বর্তমান কর্তাদের মধ্যে এই প্রভেদ।"—প্রবাসী, ১৩৪০ সাল, মাঘ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন যে ভাষণ দেন তাহাতেও বাংলাদেশে উপদেষ্টা কমিটির অসহায় অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষণে একথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, ষোলটি ঘটনায় তাঁহারা প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটির কোন পরামর্শ না লইয়াই সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ছয়টি ব্যাপারে কমিটির পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে চারিটিতে তাঁহাদের পরামর্শ মত কাজ হইয়াছে, দুইটিতে তাঁহাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। তিনটি ব্যাপারে সেন্সর করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, একখানি কাগজের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, একটি ক্ষেত্রে সম্পাদক, প্রিন্টার ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, এবং আর একটি ঘটনায় কাগজের জামিন বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশে পত্রিকার উপর রাজরোষের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহের পত্রিকাগোষ্ঠীও স্ব স্ব প্রদেশস্থ শাসকগণের কবল হইতে অব্যাহতি পান নাই। মধ্য প্রদেশ সরকার "নাগপুর টাইমস" ও "হিতবাদের প্রকাশ যে কেবলমাত্র বন্ধ করিয়া ছিলেন তাহা নহে, সহযোগী সম্পাদকগণও গ্রেপ্তার হইয়া ছিলেন। "নাগপুর টাইমস"এর বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ ছিল যে, রাজনৈতিক আটক বন্দীদের কয়েকজন কোথায় আছে তাহা নাগপুর টাইমস প্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক ও প্রিন্টারকে গ্রেপ্তার আর জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তাহাদের উপর আবার হুকুমও দেওয়া হইল যে নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে যে কোন খবর সেন্সর পাশ করাইয়া লইতে হইবে। অথচ, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্বে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটির সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই। দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস" এবং "ন্যাশনাল কলের" উপরও প্রাক নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী হয়। ১৯৪৪ সালে ২৫ শে জানুয়ারী দিল্লী সংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতি সরোজনী নাইডু যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশই ছিল পত্রিকা দুইখানির প্রতি সরকারী কোপের কারণ। সাংবাদিকদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও পাঞ্জাব সরকারের উদ্যম ও উৎসাহ নেহাৎ সামান্য ছিলনা। তথাকার "বীর ভারত" পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাতকড়ি বদ্ধ অবস্থায় হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। সিন্ধু ও বোম্বাই সরকারও জরুরী প্রেস আইনের বলে "সংসার সমাচার" "পিপলস ওয়ার", "জার্নালিষ্ট" ও "কোরাম" এর জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন জামানত দাবী করেন। সরকারের এই সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সবই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়।

পশ্চিম নিউগিনি ও ওলন্দাজ সরকারের মনোভাব

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

সম্প্রতি এই মর্মে একটা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যে পশ্চিম নিউগিনির মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশীয় মন্ত্রীদের একটা সম্মেলন ডাকা হবে। এই মর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে অবস্থা দূর করতে ইন্দোনেশীয় মন্ত্রীদের প্রস্তাবিত সম্মেলন সমর্থ হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এই মর্মে একটা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অচল অবস্থার সুযোগ নিয়ে হল্যাণ্ড হয়ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করবেন; কারণ হল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে কমিশন নিয়োগ করবেন সে কমিশন এমনভাবে পশ্চিম নিউগিনি সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করবেন যা'তে সে সমাধানের ফলে হল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

বর্তমানে ওলন্দাজ নিউগিনিতে প্রায় এক হাজার ওলন্দাজ সৈন্য, একটা ক্রুজার এবং দশটা যুদ্ধ জাহাজ আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানকার সমস্যা যতই জটিল হয়ে উঠবে, ওলন্দাজ সরকার ততই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠবেন।

পশ্চিম নিউগিনির অন্তর্গত অধিবাসীর সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ লক্ষ। তা ছাড়া পাঁচ হাজার ইন্দোনেশিয়াবাসী এবং দশ হাজার শ্বেতাঙ্গ এখানে বসবাস করছেন। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৫ লক্ষ অন্তর্জাত অধিবাসীর মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনলক্ষ অধিবাসীকে নিয়মিত শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছে। বাকী সাড়ে এগার লক্ষ অন্তর্জাত অধিবাসী প্রকৃতপক্ষে ওলন্দাজ কর্তৃত্বের বাইরে রয়েছে। সুতরাং ওলন্দাজ নিউগিনির বেশীর ভাগ অধিবাসী ওলন্দাজ সরকারকে পছন্দ করেন বলে ওলন্দাজ সরকারের পক্ষ হতে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সে বিবৃতি সমর্থন করা চলে না। বরঞ্চ পশ্চিম নিউগিনির উপর ওলন্দাজ সরকারের যে সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে সে কর্তৃত্বের যদি অবসান হয়ে যায় তা হলে বেশীর ভাগ অধিবাসী ইন্দোনেশিয়ার সাথে পশ্চিম নিউগিনির ভাগ্যকে জড়িত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে।

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত এপ্রিল মাসে ইউনিয়ন মন্ত্রীদের একটা সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। পশ্চিম নিউগিনির মর্যাদা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করাই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে সম্মেলনে ওলন্দাজ মন্ত্রী জে, এইচ, ভ্যান মার্তীন নাকি ইন্দোনেশীয় সরকারকে এই মর্মে একটা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পশ্চিম নিউগিনির উপর সার্বভৌম অধিকার যদি কোন রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় তা হ'লে একমাত্র ইন্দোনেশিয়াকে সে অধিকার দেওয়া হবে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে ইন্দোনেশীয় সরকার এই আশ্বাসের উপরই জোর দিচ্ছেন। অর্থাৎ ইন্দোনেশীয় সরকার যে কথাটি বলতে চাইছেন সে কথাটি হচ্ছে এই যে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পশ্চিম নিউগিনি সমস্যার সমাধান করা হবে বলে ওলন্দাজ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ ওলন্দাজ সরকার আজ অষ্ট্রেলীয় সরকারের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত আগষ্ট মাসের শেষের দিকে অষ্ট্রেলীয় সরকারের বৈদেশিক

হল্যাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ স্পেণ্ডার, হেগ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। যেত অষ্ট্রেলীয় নীতি অনুসরণ করে মিঃ স্পেণ্ডার পশ্চিম নিউগিনির উপর ইন্দোনেশীয় সরকারের দাবীর বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। সুতরাং তিনি কেন হেগ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন সেটা খুবই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পশ্চিম নিউগিনির উপর ইন্দোনেশীয় সরকারের দাবী যা'তে স্বীকৃত না হতে পারে সেজন্য ওলন্দাজ সরকারকে প্রতাবান্বিত করবার জন্য তিনি হেগে গিয়েছিলেন। হেগ থেকে প্রাপ্ত সংবাদগুলো আলোচনা করলে মনে হয়, মিঃ স্পেণ্ডারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কারণ ওলন্দাজ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে পশ্চিম নিউগিনি ইন্দোনেশীয় সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

শুধু তাই নয়, ওলন্দাজ সরকার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তৃতীয় পক্ষের মতামত না শুনে অথবা অগ্রাহ্য করে পশ্চিম নিউগিনির ভবিষ্যৎ মর্যাদা সম্বন্ধে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ওলন্দাজ সরকার এখানে যে তৃতীয় পক্ষের কথা বলছেন, সে তৃতীয় পক্ষ হ'ল অষ্ট্রেলীয় সরকার। সত্যিই যদি ওলন্দাজ সরকার পশ্চিম নিউগিনির মর্যাদা সম্বন্ধে অষ্ট্রেলীয় সরকারের মতামত এবং হস্তক্ষেপকে বাঞ্ছনীয় মনে করে থাকেন তাহলে ইন্দোনেশীয় সরকারের দাবী কখনও গৃহীত হবে না। এছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইন্দোনেশিয়া কমিশনের সাহায্যে অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিম নিউগিনির উপর নিজের দাবীকে শক্তিশালী করবার জন্য চেষ্টা করবেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে চাইবেন না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অষ্ট্রেলিয়া এদের সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। মোট কথা হল এই যে, পশ্চিম নিউগিনির উপর ইন্দোনেশিয়া যে দাবী জানিয়েছেন ওলন্দাজ সরকার সে দাবী এড়িয়ে যেতে চাইছেন এবং অষ্ট্রেলীয় সরকার সে দাবীর বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীঅরবিন্দ প্রয়াণে

—সন্তোষকুমার অধিকারী

রিক্ততায় পরিম্লান পৃথিবীর আকাশেতে চেয়ে
ঘন অন্ধকার মগ্ন দুর্ভাগ্য পৃথিবীটাকে
আজ শুধু মৃত মনে হ'লো ;
বরফের শীতল কাঠিন্যে তার অনুভূতি
যেন নিভে গেছে,
ফুরায়েছে বাতাসের স্পন্দন উত্তাপ।
একমাত্র দীপ ক'রে যে পথিক মানুষের সমাধি শ্মশানে
হেঁটে চলেছিলো কোন প্রত্যূষ আকাশ পানে চেয়ে
যার আত্মদৃঢ়তার উত্তাপ রক্তিম ছোঁওয়া
দিয়ে গেছে সূর্য সম্ভাবনা,
এই দৈন্য স্খলনের পতনের মাঝ থেকে
সুন্দর তপস্যা দিয়ে যে ঋষিসাধক
অতি মানসের মহা আবির্ভাব করেছে সম্ভব,
অকস্মাৎ যাত্রাপথে স্তব্ধ হ'লো
শেষ বাণী তার ;
নিভিলো প্রদীপ আর
গাঢ় অন্ধকার রাতে ঘুচে গেলো দিগন্ত আশ্বাস।
তবু বেঁচে থাকো।
অমৃত সন্ধান আজ মানুষের করায়ত্ত হ'লো ;
মহত্ত্বের সাধনায় সুন্দরের সন্ধানের এষা
দানবের করাঘাতে হবেনা বিলুপ্ত।
অন্তরের দীপ্রমান সূর্য্য অনুভূতি দিয়ে
আমরা সন্ধান পাবো অনন্ত প্রাণের।

মহীয়সী।

(গল্প)

শ্রীকৃতান্ত নাথ বাগচী।

এ বৎসরের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান অধ্যাপক ধ্রুব চক্রবর্তীর রচনা "মহীয়সী"। 'মহীয়সী' একটি নারী চরিত্র এবং সে নারী ধ্রুব চক্রবর্তীর জন্মভূমি...জননী। বইটীর প্রতিটি অক্ষরে মাতৃভক্তির প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুগে এই রকম মতি সন্তানদের মাঝে বিরল বৈকি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর শিক্ষা সার্থক, তাঁর লেখনী এবং সাহসও অদ্ভুত; কারণ মা'কে কেন্দ্র করে এযুগের রচনা অচল। এ-যুগ ছায়াচিত্রতারকা কি দেশবিদেশের নটীর জীবনী ভীম নাগের সন্দেশের মত উপভোগ্য। তবু "মহীয়সী" পাঠক মহলে সাড়া তুলেছে। ভাবের গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্যে, ঘটনার সংস্থাপনে এবং চরিত্র চিত্রণে "মহীয়সী" অপূর্ব। জীবনী যে কাব্য হতে পারে, উপন্যাসের বিস্ময়কর ব্যাপার যে তার উপাদান হতে পারে অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই রচনাটী পাঠ না করলে সম্যক বুঝা যায় না।

প্রবীণের দল ধন্য ধন্য করতে লাগলেন এবং যাঁরা পুঁথিখানি পাঠ করলেন তাঁরাই সেই মা'র জননীভাগ্যকে ঈর্ষা করলেন। আহা! কি সোনার চাঁদ ছেলেই না জন্মেছিল! কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। এমন মা ও এমন ছেলে পৃথিবীতে খুব কমই জন্মায়। বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁদের পৈতৃক মহিমা প্রচারেই ব্যস্ত। সাধারণতঃ তাঁরা তাঁদের মাদের সম্বন্ধে স্বল্পভাষী। তাই প্রাতঃস্মরণীয়দের মাতৃগণ ইতিহাসে বা পাঁচালীতে ছোট হয়েই থাকেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বৈকি! রাম-রাবণের যুদ্ধের খবরটাই আমরা বড় করে পাই...নিকষার কাহিনী কত সংক্ষিপ্ত।

অধ্যাপক ধ্রুব চক্রবর্তী রাতারাতি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট মাতৃভক্ত সন্তান বলে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হয়ে পড়লেন। আমিও সেই বইখানি পড়েছি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলা সাহিত্যের আমি একজন গবেষক ছাত্র। সুতরাং সাহিত্যের এই উজ্জ্বল মণিটীর খনির অন্ধকারের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমার ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিক একাগ্রতা স্বাভাবিক বৈকি!

আমি অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন ও বিস্তৃত আলাপের সুযোগ সন্ধানে রইলেম। ঠিকানা যোগাড় করে সাক্ষাৎ লাভের বাসনা জানিয়ে পত্র দিলাম; তিনি আমাকে একদিন প্রভাতে গৃহে দেখা করতে বল্লেন। আমি নোটবুক, ফাউন্টেন কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়েই গেলাম, যাতে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য আমার অনবধানতার পিছনে পড়ে হারিয়ে না যায়। বাড়ীর ভৃত্য আমাকে সমাদরভরে অভ্যর্থনা করে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসাল। আমি প্রায় দুটী ঘণ্টা অপেক্ষা করলেম, কিন্তু অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাথে সাক্ষাৎকার হল না। প্রশ্ন করে জানলেম যে তিনি এখন ঠাকুর ঘরে পূজায় ব্যস্ত আছেন। আমার তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম। বসে বসে কি আর করি? অধ্যাপকের বিষয় বিস্তারিত খবর নেওয়ার ঔৎসুক্য হল। কি ঠাকুর, কি মন্ত্র, পূজার কি পদ্ধতি সে সম্বন্ধে অবহিত হতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি; অল্প সময়ের মধ্যেই সুরাহা হয়েছে তাঁর ছোট মেয়ে স্বাতীর সৌজন্যে। স্বাতীর সাথে আলাপ করে জেনেছি যে তার বাবা একটী মহিলার ফটো পূজা করেন...ফুলের মালা ঝুলিয়ে, ধূপ পুড়িয়ে, প্রদীপ জেলে...চন্দন-চর্চিত করে।

সেই পূজার মন্ত্র কোন সংস্কৃত শ্লোক কি ছন্দোবদ্ধ বাণী নয়। দুটী করজোড়ে সেই ফটোর সম্মুখে নয়ন বুজে কেবল অস্ফুট কণ্ঠে "মা" "মা" বলা। তাঁর অঙ্কের নামাবলী বিশেষ অর্ডার দিয়ে প্রস্তুত···লেখা আছে লাল

অক্ষরে "ওঁমা ওঁমা"। পিতলের ছাপ তিনি তৈরী করিয়েছেন "মাতৃকপাদি কেবলম্"। তাঁর এই বালিগঞ্জের অট্টালিকার নামকরণ করেছেন "মাতৃমন্দির"। আমি যদিও অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাথে "মহীয়সী" সম্বন্ধে আলোচনা করতে পেলেমনা, তবুও চিত্তে এই সন্তোষ নিয়ে ফিরলেম যে, আধুনিক যুগে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ-পরমহংস দেবের সাথে একই পংক্তিতে আমাদের পরম-শ্রদ্ধেয় চক্রবর্তী মশাইয়ের আসন হতে পারেন, কারণ উঁরাও ছিলেন মাতৃপূজারী।

"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভ'রে" বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এঁর মতই কোন সন্তানকে দেখে লিখেছিলেন। ইংরাজের আইনে যেমন "স্ত্রী" ছিলেন অমোঘ ও অব্যর্থ কর্ম উদ্ধারের মন্ত্র, অধ্যাপক চক্রবর্তীর কাছে তেমন "মা"। কার মা'র অসুখ, দাও ওষুধের দাম। কার মা মরেছে...শ্রাদ্ধের খরচ যোগাও। কোন দরিদ্র ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের সামর্থ্য নাই... তার মা'র নাম করে একখানি আবেদনপত্র নিয়ে এলেই... নিশ্চয়ই সফলতা।

আমি আমার সাহিত্যিক অনুশীলন দিয়ে বুঝতে পারি যে "মহীয়সী" একটী সার্থক সৃষ্টি এবং এর প্রকৃত পটভূমিকা উদ্ধারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য আবিষ্কারে ডাক্তার-ডি-গামা কি কলম্বাসকেও তো চাই। বাংলার পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বৈষ্ণব সাহিত্যের রত্ন উদ্ঘাটন করেছেন কেউ, কোন মনীষী গেছেন সুদূর হিমালয়ের কোলে, দুর্গম নেপালে। তাই না বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আমিও "মহীয়সী"-র অলিখিত অঞ্চলে আলোকপাত করবার ব্রত নিয়ে পথে প্রবাসের সকল কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হলেম।

কৌতূহলই নাকি স্বর্গ হতে আদিম নর-নারীর বিদায়ের কারণ। যারা পথ দেখেই খুসী...তারাই সুখী। কিন্তু যারা তার পাঁপড়ি ধরে টান মারে, তলের কালো-পাকের মুখরীতা তাদের মতের মতন বাজে। আমারও হ'ল সেই অবস্থা। আগে যদি এ সত্য বুঝতেম তবে আর কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয়ে, রেলপথে, জলপথে, গরুর গাড়ীতে তেপান্তর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের এক সুদূর অখ্যাত পল্লীতে নিদারুণ যন্ত্রণা পেতে আসতেম না।

যখন গ্রামে পৌঁছলেম তখন সন্ধ্যা হয়েছে। হেমন্তের কুয়াসা নেমেছে বনে-বাদাড়ে। ঝিল্লির ঝঙ্কার উঠেছে অরণ্যের তমিস্রাপুঞ্জ হতে। আমি মনে মনে এই ক্ষুদ্র গ্রামটীকে প্রণাম জানালেম। এর প্রতিটি ধূলিকণা যে একটী মহীয়সী প্রাতঃস্মরণীয়ার পাদস্পর্শে পূত।

সে রাত্রি গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেম। পরদিন প্রভাত হতে আমার গবেষণার কাজ সুরু হবে। আমি আশায় ও আনন্দে অপরিচিত স্থানের অদ্ভুত রাত্রিটি কোন রকমে কাটালেম। কেমন করে জানিনা গ্রামে রটে গেছে যে, কলকাতা সহর হতে এক বাবু এসেছেন—তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কারও সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়। গ্রামের লোক তো সব অবাক, যে এমন অকাজ এক মূর্খ অথবা উন্মাদ ছাড়া আর কে করতে চায়! প্রবীণ বিচক্ষণ মহলে কানাকানি চলল যে, লোকটীর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় মৎলব আছে যা বর্তমানে বুঝা যাচ্ছে না।

আমার গবেষণা কাজের তথ্য-সংগ্রহ অভিযান সুরু হয়ে গেল...।

আমি কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শুধালেম "আচ্ছা, পুণ্যশ্লোকা অন্নদা দেবী সম্বন্ধে আপনারা যা জানেন অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। বাংগালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য আপনাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবে।"

সবাই বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে বৃদ্ধ তারিণী সান্যাল, দশখানা গ্রামের সর্বজনীন খুড়ো বল্লেন, "আপনি কি বলছেন আমরা ঠিক ধরতে পারছিনে। অন্নদা দেবী বলে কেউ যে এখানে ছিলেন তাতো জানিনে।"

আমি তখন তাদের ভালভাবে স্মরণ করিয়ে দিবার জন্য বল্লেম, "শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভব চক্রবর্তীর পরমারাধ্যা পূজনীয়া মাতৃদেবী"

বৃদ্ধ এইবার যেন অকূলে কূল পেলেন, "ওঃ, অনু ঠাকরুণের কথা বলছেন। আহা, সত্যই সে বড় ভাল মেয়ে ছিল। বছর বার বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সে এই গ্রামে তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী আসে তারপর রাঁধুনীগিরি করে নিজের ভরণপোষণ আর ছেলেটীকে লালনপালন করতে থাকে। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ীতে অবসর কালে সে দাসীবৃত্তিও করত; ছেলেটীর লেখাপড়ার যাতে সুবিধা হয় এই ছিল তার উদ্দেশ্য। সেই ছেলেটী লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। পণ্ডিত মশাই বলতেন...কালে সে পণ্ডিত হবে।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লেম "না, না, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীর জননী যে দানশীলা ছিলেন...জমিদার পরিবারের গৃহিনী। তাদের ঐশ্বর্যের তো অভাব ..।"

কথাটী অসমাপ্ত রয়েই গেল। বৃদ্ধ করুণার হাসি হেসে বল্লেন "কার কাছে শুনেছেন আপনারা? আমরা যে সব দেখেছি শুনেছি...সবই জানি। ছেলে ছেলে করেই সে গেল। অথচ সে ছেলে যখন মানুষ হল, তাকে ফিরেও দেখল না। যে দুঃখিনী ঘোরতর দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে, হাজার জনের কাছে মাথা নীচু করে, অসম্মানের বোঝা বয়ে একমাত্র সন্তানকে মানুষ করে তোলার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রইল...তারই সন্তান বড়লোক হয়ে আজ মায়ের খোঁজ করা দূরের কথা, মা বলে পরিচয় পর্যন্ত দেয় না সে ছেলে কি মানুষ?"

একটী বিশিষ্ট শিক্ষিত অভিজাত ব্যক্তির নিন্দায় আমার দেহের রক্ত গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমি অসহিষ্ণুভাবে সংশয় প্রকাশ করলেম "এও কি সম্ভব?"

বৃদ্ধের দুটী চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরতে লাগল; "ধিক সেই শিক্ষাকে যা মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। পেটের ছেলে হয়ে যদি মা'র পরিচয় দিতে মাথা হেঁট হয়...এর চেয়ে লজ্জার কিছু কি আছে? মা'র সাথে সেই যোগ্য সন্তানটী কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে নি। এমন কি বৎসরান্তে বিজয়ার প্রণামটীও তো চিঠিতে সে জানাতে পারত। উহু...তাও জানায় নি। অথচ শুনি সে এখন মস্ত মানুষ, বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছে...সহরে বিরাট বাড়ী...গাড়ী..."

আমি আর বেশীদূর সাহস করে এগিয়ে যেতে পারলেম না...ভয়ে ভয়ে শুধালেম "এখন তিনি কোথায়?"

বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে ভেংচি কেটে বলল, "কে অনু ঠাকরুণ? যেখানে বিশ্বের অনাথ নিরাশ্রয়দের একমাত্র আশ্রয়... সেই বৈতরিণীর ওপারে..."

বর্মার জেলে তিন বৎসর

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

(২)

ইন্‌সিন

ইন্‌সিনে যে সেল ব্লকটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, গোটাকতো আমকাঁটালের ছায়ায় সেটা ঢাকা—অনির্দিষ্ট জেল জীবনের নৈরাশ্যের মেঘলা ছায়ারই মতো। একদিকবার যে সব কয়েদিকে সাজা হয়েছে, শুধু তেমন কয়েদিই ইন্‌সিন জেলে রাখা হত। মস্ত বড়ো জেল—৩৩০০ কয়েদি থাকে, ২২ জন জেলার। আমাদের যে-সেল ব্লকে পুরলো তার সামনে ও পেছনে আরও অনেক গুলো সেল ব্লক। আমাদের ঠিক পেছনেই একটা বড়ো গোছের করিডর (corridor) সেল ব্লক (দুই দিকে মুখোমুখি কতকগুলি সেল, মাঝখানে একটিই মাত্র ঢাকা বারান্দা, অর্থাৎ সেলের ভিতর দিনরাত সমানই আঁধার)। এই করিডরে দশ থেকে পনের বিশজন পর্যন্ত ফাঁসির কয়েদি 'ডেথ' সর্বদাই থাকে—সকাল সন্ধ্যায় তাদের গান বা স্তোত্র-পাঠের করুণসুর মনের বিষাদের ছায়াকে আরও ম্লান, আরও গভীর ক'রে তোলে।

ইংরেজি crude কথাটাকে "অমার্জিত" বা "স্থূল" বললে সবটা বলা হয় না। বর্বরত্বের ভাবটা অনেকখানি তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার হয়। আমাদের দেশের জেলে সেল তৈরীর ব্যবস্থা যারা করেছে অমনি crude মনোভাবের পরিচয় তারা তো যতোখানি পেরেছে দিয়েছে। তার উপর ইন্‌সিনে তখন চীফ জেলার হয়ে এসেছে লেইট্‌মিওর সেই ফষ্টার, আর ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাদার্ল্যাণ্ড—জেলার থাকতে বর্মী কয়েদিরা এর নাম দিয়েছিল "কোয়ে ঠাকু" "কুত্তা জেলার।" বর্মী কয়েদিরা প্রায় সব জেলারেরই একএকটা নামকরণ করে। আমাদের সেল ইয়ার্ডের দুই পাশে যে দিক দিয়ে সেলের কয়েদিরা যাতায়াত করতো, এরা দুজনে মিলে আমি ওখানে পৌঁছাবার আগে, সেই দিকে কেবল দুখানা বাঁশের বাখারির বেড়া দিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই, ফষ্টার কাঁটাল গাছের গায়ে রশি বেঁধে দিয়েছে, যেন কয়েদিরা কেউ ঐ বেড়ার কাছাকাছি এসে আমাদের সাথে কথা না বলতে পারে।

দু'দিন একলা কাটাবার পর আমার সঙ্গ দেবার জন্য ম্যাণ্ডালে থেকে এলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)। ঐদিনই লেগে গেল ফষ্টারের সঙ্গে। এ দু'দিন তল্লাসী করতে আসে নাই। এই দিন সন্ধ্যায় বন্ধ হবার বেলায় এল।

জেলখানায় যে জিনিষগুলি বিরক্তি ও অপমানজনক লাগতো, তার মধ্যে সব চেয়ে সেরা এই তল্লাসী। অথচ সেকালের নিয়মের মধ্যে ছিল, রোজ সকাল বিকাল ষ্টেট প্রিজনারদের বাসগৃহ, জিনিষপত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুংখানুপুংখরূপে তল্লাসী করতে হবে ("shall be thoroughly searched")। একটু ভদ্রগোছের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার যে সব জায়গায় থাকতো, সে সব জায়গায় লিখিত নিয়ম কানুন সত্ত্বেও আমাদের মর্যাদাবোধটাকে আঘাত করতে চাইতো না। ইন্‌সিনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর ফিওলে অত্যন্ত ভদ্র, দার্শনিক প্রকৃতির লোক। কিন্তু নিজে বিশেষ কিছু দেখাশুনো করতেন না, কাজেই রাজত্ব ছিল সাদার্ল্যাণ্ডের আর ফষ্টারের। আর দায়িত্ব এদের, কাজেই মেজর ফিওলে ইচ্ছা সত্ত্বেও এদের কাজে বিশেষ কোনো বাধা দিতেও পারতেন না।

প্রথমেই ত্রৈলোক্য বাবুর সেল। ফষ্টার দলবল সহ সেখানে ঢুকলো। আমি বলি, কি তল্লাসী করবে তুমি? উনি যখন জেলে ঢোকেন, তখন সব দেখেশুনে দিয়েছ, তার পর যদি তার ভিতর কিছু ঢুকে থাকে, তা ঢুকতে

পারে কেবল তোমার কর্মচারীদের মারফত। তাদের দোষের জন্য তুমি আমাদের অপমান করবে?

ও বলে, আমার আইনে আছে, আইনমাফিক আমায় কাজ করতে হবে।

আমি বলি, তোমার আইনজ্ঞান আমি ভাল ক'রে জানি। আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব।

কথাটার একটু অর্থ আছে। পরে বলছি। জৈলোক্য বাবুর একটি গুণ ছিল, ঝগড়া বা কোনো কিছু লেগে গেলে তিনি সমান তালেই চলতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমার সঙ্গে সমানে চেঁচামিচি ক'রে গেলেন। ফলে তল্লাসী বিশেষ কিছু হ'ল না।

এল আমার ঘরে। আগে বলেছি, জেলখানার ঝগড়ার ঠ্যাটামি খানিকটা করতে হয়, বিশেষতঃ আইন যখন আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের চেঁচামিচির চোটে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে—সামনে ছিল টেবিলটা, আর সেই টেবিলে ছিল আমার রাতের খাবার সুদ্ধ টিফিন কেরিয়ার—ও সেই টেবিলে ভর দিয়ে একটু টাল সামলে নিচ্ছে, আমি হঠাৎ ভীষণ হিন্দু বনে গেলাম—টিফিন কেরিয়ারটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে হিন্দিতে—কারণ সঙ্গের জমাদার সিপাই সব গোড়া হিন্দুস্থানীর দল—চিৎকার সুরু করলাম, "তুমি খৃষ্টান, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছনা, আমার খাবার ছুঁয়েছ। মনে করেছ, সেই খাবার আমি খাব?"

জমাদার সিপাই আর কেউ আমার ঘরে ঢুকল না। ফস্টার ভয়ে তো-তো ক'রে বলতে লাগলো, আমি মদ খাইনি, আমি মদ ছুঁইনে, বলতে বলতে বেরিয়ে গেল, জমাদারকে বললো ঘর বন্ধ করতে।

আমি জমাদারকে বললাম, দাঁড়াও, চিঠি নিয়ে যাও। এই চিঠি এখনই বড়সাহেবকে দেবে। লিখলাম, তোমার জেলার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এসে তল্লাসীর নামে আমার রাতের খাবার নষ্ট করেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঃ কিওলের জবাব এল: আমি আই. জি.কে ফোন করেছি, কাল খুব ভোরে তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

ফস্টার সম্পর্কে আগে বলেছি, জ্যোতিষ বাবু ও সতীশদার সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলে খুব দুর্ব্যবহার করে। তাছাড়া ওর আরও সব কীর্তি ছিল।

কনওয়ে ব'লে একটি অ্যাংলোবার্মিজ জেলার ছিল ষ্টেইট্ মিওতে—আমাদের কাজকর্ম, হিসাবপত্র সব দেখা-শুনো করতো। সে আমায় বলে, মিঃ দত্ত, আমি তো হিসাবপত্র কিছু বুঝিনে, অথচ হিসাবনিকাশের সিসময় এসেছে, আপনি যদি এগুলোকে একটু দাঁড়ো ক'রে দেন তো আমার বড় উপকার হয়।

আটদশ মাসের হিসাব ওর সব টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজেই ছিল সেগুলো নিয়ে দেখি, ফস্টারের সট কবা কণ্ট্রাক্টরের সব রসিদ—তাতে আছে, জ্যোতিষ বাবু, সতীশদা ও আমার জন্য তিনটি মশারির দাম ৫১৲। অথচ ওঁরা মেদিনীপুরের মশারীই ব্যবহার করছেন, আমি ম্যাণ্ডালে থেকে এনেছি। ধুতি প্রতি মাসেই ওঁদের জন্য এক আধ জোড়া লেখা আছে, অথচ ওঁরা সেই মেদিনী-পুরের খদ্দরের ধুতিই গিরো দিয়ে চালাচ্ছেন,—এই রকম বহু জিনিষই আছে।

ইতিমধ্যে ফস্টার ইন্‌সিনে এসেও কিছু কিছু কীর্তি করেছে। জেল চালাবার পদ্ধতি ছিল তার সেই পুরোনো কালের জেলারদের পদ্ধতি। জেলারদের তখন কয়েদির মধ্যে একদল গুণ্ডচর ও গুণ্ডা থাকতো। এরা সত্যমিথ্যা সর্ব উপায়ে সাধারণ কয়েদির জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো; নিজেদের লাভের জন্য, ঈর্ষাবিদ্বেষের জন্য জেলারকে ব'লে কয়েদিদের অকারণ মারপিট করতো, শাস্তি দেওয়াত এবং জেলারদের জানাশুনোর মধ্যেই নিজেরা অবাধে অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ পর্যন্ত ক'রে যেত।

ইনসিন ছিল যেপরোয়া কয়েদির জায়গা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী একজন এরই এক গুণ্ডাকে মারবার জন্য জেল ফ্যাক্টরি থেকে একখানা ছোরা তৈরী করিয়ে আনে। সেটা ধরা প'ড়ে যায়। এই মামলার অনু-সন্ধানের জন্য জেলার আফিসের কাছে মাঠে টেবিলের সামনে বসেছে, একপাশে দাঁড়িয়ে আসামী, অপর পাশে

ওস্তাদ বলে, সিপাই জমাদাররা সামনে। ছোরাখানা টেবিলের উপর ধরা রয়েছে। এক সুযোগে ফস্ ক'রে ছোরাখানা তুলে নিয়েই লাফিয়ে প'ড়ে আসামী যে-ওস্তাদকে মারতে চেয়েছিল, তারই গলায় বসিয়ে দিয়েছে। সে তো সেখানেই শেষ।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে ঘণ্টা পড়লো। সিপাই জমাদার ভিড় জমালো, কিন্তু ও ছোরা ঘুরাতে ঘুরাতে এমন ঘুরতে সুরু করলো যে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার সিপাই কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না। ও বলতে লাগলো, বড়সাহেব ছাড়া আর যেন কেউ আমার কাছে না আসে যে আসবে তাকেই আমি খুন করবো। মেজর ফিণ্ড্লে এলে বললো, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব, কিন্তু কেউ যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। মেঃ ফিণ্ড্লে অভয় দিলেন, আমি নিজে সাথে গিয়ে তোমায় সেলে বন্ধ করব, কেউ তোমায় মারবে না।

ও তখন মেঃ ফিণ্ড্লের পায়ের কাছে ছোরা ফেলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লো। ওর গায়ে কেউ হাত দেয় নাই।

কিন্তু ফস্টারের অসৎ পদ্ধতি ও নির্বুদ্ধিতার জন্য জেলে একটা খুন হয়ে গেল। এই মামলা যখন আই. জি.র অনুসন্ধানসাপেক্ষ তখনই আমরা ইন্সিনে গেছি।

আমার খাওয়া নষ্ট করা থেকে সুরু ক'রে মশারির দামের হিসাব পর্যন্ত যখন মেজর তারাপোরের কানে তুললাম, তিনি একটু হেসে বল্লেন, "So the prejudice started from Thayetmyo!"

আমি বলি, "There is no question of any prejudice. You just hold an enquiry into the accounts at Thayetmyo Jail which you are bound to do."

আই. জি. বলেন, "That I'll do. But about the search, I can't ask the Superintendent to ignore or violate the rules."

আমাদের কাছে একটি অঙ্গীকার চাইলেন, জেল থেকে কোনো কাগজপত্র বাইরে যাবে না, তাহ'লে উনি ভেবে দেখবেন সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি অনুরোধ করতে পারেন।

আমি বলি, যা আমরা করেছি ব'লে কোনো প্রমাণ নেই, তা আমরা করব না—এমন অঙ্গীকার তিনি আমাদের কাছে চান কোন্ হিসাবে?

আই. জি. হেসে বলেন, যা-ই হোক্ আমি আশা করি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কই হবে এবং আইন যতো কম obnoxiously পালন করা যায়, তাই তিনি করবেন।

এই দিন থেকেই ফস্টারের অর্থাৎ চীফ জেলারের আমাদের ইয়ার্ডে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যেইট্রিগুর হিসাবের জন্য পরে ২০৲ টাকা জরিমানা হ'ল। করেছি খুনের মামলায় রেঙ্গুন জেলে বদলি হ'ল, কিন্তু ফার্ষ্ট গ্রেডের জেলার হয়েও সেখানে চীফ জেলার হতে পারলো না, একজন সেকণ্ড গ্রেডের জেলারের নীচে রইলো এবং ওস্তা ও গুপ্তচর দিয়ে শাসন চালাবার অপরাধে পরে সময়ের পূর্বেই তাকে পেন্সন নিতে হ'ল।

তল্লাসীর উৎপাত ইন্সিনে আর আমাদের ভুগতে হয় নাই। ডেসমণ্ড ব'লে একজন ইউরো-এশিয়ান জেলার আমাদের চার্জে ছিলেন, খুব ভদ্র প্রকৃতির। তাঁরই আমাদের তল্লাসী নেবার কথা। তিনি সেল খুলবার ও বন্ধ করবার সময় উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু খাতায় তাঁকে লিখতে হ'ত thoroughly search করেছেন।

এ উৎপাত যখন গেল, তখন আই. জি.কে বল্লাম, এ-সেলে থাকব না। আসল কথা, ম্যাণ্ডালেতে ঝাঁকের কই ঝাঁকের ভিতর যেতে চাই। মেঃ তারাপোর পুনরুক্তি ক'রে বললেন, সে আর সম্ভব নয়। ওখানে ঐ সেলই ভেঙেচুরে নতুন রকম ক'রে দেবেন। প্ল্যান তখনই হয়ে গেল, চারটে সেলের সামনের অ্যাণ্টিসেল ভেঙে বড় বারান্দা করা হবে, দুপাশে দুটো সেলে বাথ রুম আর খাবার ঘর হবে, সবগুলো সেলের পেছনে বড় বড় জানলা ক'রে দেওয়া হবে। আপাততঃ রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল একটু দূরে হাজতের ওয়ার্ডের দোতলার এক অংশে। ১৯০৮-৯ সালে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ

ঠাকুরতা সেখানে ছিলেন। ওয়ার্ডটিও ও বেসিনে যে-ছুটো নিভৃত প্রান্তের ঘরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও সতীশ চাটার্জি ছিলেন, সেই ঘর ছুটো এর আগে দেখে এসেছি। রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন মৌলমীনে।

কয়েক মাসের ভিতর সেলের চেহারা নতুন হ'ল। কিন্তু রাত্রি এবং মাঝে মাঝে দিনে বাসের জন্তও হাজতের ও-ঘরও ছাড়লাম না। আমি ছ'বছর ছিলাম, আমি চ'লে আসার পরও, অরুণদা, সুভাষচন্দ্র, সতীশদা, প্রফুল্ল বাবু প্রভৃতি একসঙ্গে বা পর-পর ঐ ব্যবস্থাতেই ওখানে কাটিয়ে এসেছেন

কিন্তু ইন্‌সিনের নিরানন্দের দিন কাটতে সময় লাগলো। ফষ্টার আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকতে পেত না, তবু সে চীফ জেলার, তারই সব দায়িত্ব। সে যখন তখন ইয়ার্ডের আশে পাশে ঘুরে দেখে যেত কাঁটাল গাছে বাঁধা তার রশির মর্যাদা ঠিক আছে কিনা। তেম্‌নি ঘুরতো ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাদার্ল্যাণ্ড। ইন্‌সিন্ জেলে পাঁচটি ডাক্তার। এঁদের সাথে ভাব করা যায় কিনা —যখন তখন ডেকে পাঠাতাম। কিন্তু শুরুগম্ভীর সব চেয়ে সিনিয়র মাদ্রাজী ডাক্তারটি ছাড়া আর কারও আমাদের ওখানে আসার হুকুম ছিল না। চট্টগ্রামবাসী বাঙালী কম্পাউণ্ডারটি ঔষধ খাওয়াবার নাম ক'রে ছুপুরে, যখন কেউ থাকতো না, তখন ছ'দিন এলেন। সাবধান ক'রে দিলাম, আর না আসেন। কিন্তু উনি লোভ সামলাতে পারেন নাই। তৃতীয় আর একদিন এসেছেন, পাঁচ মিনিটও কাটে নাই, সাদার্ল্যাণ্ড এসে উপস্থিত। অর্থাৎ, কোনো গুপ্তচর খবরটি দিয়েছে। সাদার্ল্যাণ্ড ভাল মানুষটির মতো—যেন আমাদের সাথেই গল্প করতে এসেছে—এসে ওঁকে জিজ্ঞেস করে, কিছু কাজ আছে?

উনি বলেন, ঔষধ খাওয়াতে এসেছি।

হয়ে গিয়ে থাকলে এখন যাও।

হুকুম হয়ে গেল কম্পাউণ্ডারের মৌলমীনে বদলির, ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় রওনা হ'তে হবে।

নিরপরাধ বেচারির কথা ভেবে মনে হ'তে লাগলো, আমাদের সংস্পর্শও এত বড় পাপের!

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমাদের সেই মেমোরিয়ালের জন্ত বেসিনের চীফ্ জেলার ভগবান সিং সাসপেণ্ড হয়েছেন। বর্মার জেলারদের তখন আটটি গ্রেড ছিল। তার ভিতর ফষ্টার ও রিচার্ড্‌স্ ফার্ষ্ট গ্রেডে। সেকেণ্ড গ্রেডের কয়েকজনের ভিতর ভগবান সিং একজন। ডেপুটি জেলার নাইকার তাঁর বিরুদ্ধে মালমশলা যতো পেরেছে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে। সাসপেণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর brain paralysis হয়ে গেছে। এখন সরকারের অনুমতি নিয়ে ইন্‌সিনে বাড়ী ভাড়া ক'রে আছেন, চিকিৎসা চলছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠছেন।

একদিন ভোর বেলা আফিসে ডাক পড়লো। গিয়ে দেখি আই. জি. বসে আছেন। বললেন, আমাদের সেই মেমোরিয়াল সম্পর্কে আমার ছু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চান।

প্রথম প্রবৃত্তি জাগলো, কোনো কিছু বলব না। সেই ভাবেই সুরু করলাম। তখন দেখি, মেঃ তারাপোর ভগবান সিংকে ডেকে পাঠালেন। তখনই ঠিক করলাম, একে বাঁচাবার মতো ক'রে যা কিছু বলবার বলব, যা কিছু দায়িত্ব আমার আর জীবনের ঘাড়েই নেব।

সব প্রশ্নের মধ্যে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো কাগজের প্রশ্ন। আমি বলি, কতো কাগজ নিয়েছি, তা আমার সঠিক মনে নেই, তবে ৮০।১০০ খানার কম নয়, কারণ জীবনের টাইপ করা কখনও অভ্যাস ছিল না, তিনি অনেক কাগজ নষ্ট করেছেন। তাছাড়া নকলও আমরা একটা রেখেছি।

ভগবান সিং বলেন, তিনি ২৪ খানার বেশী কাগজ দেন নাই। আমি বার বার ক'রে নানা কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই, যাতে তাঁর দায়িত্ব কমে যায়। কিন্তু বেচারী কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন, কোন কথাই যেন বুঝতে পারেন না।

মেঃ তারাপোর তখন যা বললেন, তার মর্ম এই: সমস্ত ভারতবর্ষের কাগজে মেমোরিয়ালটির নকল বেরিয়েছে। মেমোরিয়ালে কি আছে না আছে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তা কতোখানি ক্ষতিজনক, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট চায়, এ নিয়ে

এমন একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে যেন এই রকম ভাবে আর কোনো কাগজ জেল থেকে না বের হ'তে পারে এই পাঁচখানা ফাইল আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি। এত বড় বড় আরও ডজন দু'য়েক ফাইল জমেছে আমার আফিসে এই মেমোরিয়াল সম্পর্কে। আপনি যা বলেছেন, মিঃ চাটার্জিও অন্ত এক জেলে (জীবন তখন X-ray করাবার জন্ত রেঙ্গুন জেলে এসেছেন) আমার কাছে ঐ একই ধরণের সব কথা বলেছেন। আপনাদের দুজনের কথা মিলে যাচ্ছে। সেসিন জেলের রেকর্ডেও পাচ্ছি ৮০ খানা কাগজ আপনারা নিয়েছেন। অথচ উনি (ভগবান সিং) বার বারই বলছেন, উনি ২৪ খানার বেশী কাগজ দেন নাই।

আমি ভগবান সিংকে বলি, মনে ক'রে দেখুন, আমাদের বরখাস্তখানাই তো ছিল ১৪ পৃষ্ঠার।

মেঃ তারাপোরের কথার ভাবে স্পষ্ট বুঝলাম, খুব সহানুভূতির সাথেই তিনি ভগবান সিং-এর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছেন। আমি বললাম, কোনো কারণে ওঁর স্মৃতিভ্রম হচ্ছে।

অল্পদিনের ভিতরই মেঃ তারাপোর ওঁর সাসপেণ্ড অর্ডারটা কাটিয়ে দিলেন। ভগবান সিং ইন্‌সিনেই যোগ দিলেন। অল্প দিন ছিলেন। একদিন কি চ'দিন দেখা হয়েছিল। ওঁকে দেখলে কষ্ট হ'ত।

এর মধ্যে এক দিন দেখা মিঃ মজিদের সঙ্গে—হেইট্‌মিও জেলের চীফ জেলার। দ্বিতীয় মেমোরিয়াল সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্ত তাঁকে ওপানে বদলি ক'রে এনেছে। বিষণ্ণ ভাবে বললেন, চাকরী থাকবে না। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম, কি কি বলতে হবে ব'লে দিলাম—আমার ঘাড়ে যেন সব কিছু চাপিয়ে দেন, আমি সব স্বীকার ক'রে নেব।

এঁকেও ঝুলতে হ'ল। তবে মেঃ তারাপোরের চেষ্টায় চাকরিটি বজায় রইলো। ইনিও সেকেণ্ড গ্রেড জেলার।

মনের উপর বিষণ্ণতার চাপের এই একটি দিক। পড়াশুনোর সুযোগ কম। রেঙ্গুন পাবলিক লাইব্রেরী থেকে কিছু কিছু বই পাই—রেঙ্গুন সি. আই. ডি.র যেসব বই দিতে আপত্তি না থাকে। উপন্যাসের সঙ্গে আর যা পাই বেশীর ভাগ ভ্রমণবৃত্তান্ত। সোরেন হেডিনের বই গুলোতে এক এক সময় মেতে থাকি। এছাড়া, অপরাধতত্ত্ব ও অপরাধীদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কিছু বই পাঠান মেঃ তারাপোর।

সঙ্গী ত্রৈলোক্যবাবু। তাঁর সঙ্গ পাইনে। পড়াশুনো তিনি যা করেন, তার বিষয়বস্তু, আদর্শ, উদ্দেশ্য ভিন্ন। রাজনীতির দিকে দলগড়ার রাজনীতির বাইরে আর কোন কিছুর সন্ধান পাইনে। মানুষ হিসাবে, আমিও যখন ১৯১১-১২ সালে অনুশীলনের ভিতর ছিলাম, বড়োজোঠরা বঙ্কিমের ভবানী ঠাকুরের "দোকানদারী চাই" কথাটার উপর বেজায় বেশী জোর দিতেন। এমন কি, সেবাশুশ্রূষাটাও দোকানদারীর অঙ্গ! অথচ আর একজনকে স্বস্তি তৃপ্তি দেবার চেষ্টা ক'রে ক'রে যৌবনে নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবার এর চেয়ে সহজ পথ আর তো খুঁজে পাইনে! এই শিক্ষাতে অনেক মানুষের অনিষ্ট হয়েছে ব'লে আজও আমার ধারণা।

ইমার্সনের লেখায় পড়েছি "Every man's nature is a sufficient advertisement to him of the character of his fellows." এই বিজ্ঞাপনটিই হ'তে প্রস্তুত নই। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়েছি, তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝেছি—রবীন্দ্রনাথে তার সমর্থন মিলেছে—রক্তমাংসের মানুষ পশু, কিন্তু রক্তমাংস ছাড়া সে আর যেটুকু, সেটুকুতে সে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়, মানুষের সমাজকে পশুর সমাজের স্তর থেকে দেবসমাজের স্তরে তুলতে চায়।

যতীনদার স্বাধীনতার সাধনা ছিল এই সাধনারই অঙ্গ। ইদানীংকার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে খুবই দামাঞ্জ সময়ের আলাপ—তাতে যা বুঝলাম, তাঁরও সাধনা এথেকে পৃথক নয়। গান্ধীজির সঙ্গে নাগপুরে তিন দিন ধ'রে হিংসা অহিংসার যে আলোচনা, তারও ভিতর পেলাম, তাঁর অহিংস সমাজ আর অরবিন্দের দেবসমাজ লক্ষ্যে, আদর্শে এক, উপায়েই মাত্র পৃথক।

কিন্তু এই যে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা, এতো দোকানদারীর

ব্যাপার নয়—এ যে ভিতর থেকে মানুষের আমূল পরিবর্তন—মানুষের প্রতিটি কণাকে ধুয়ে মুছে শোধন ক'রে নেওয়া। রক্তমাংসে মানুষকে পশুত্বে ধ'রে রাখতে চায়, আবার এই রক্তমাংসই—অনুভূতিতে বুঝি, পুরাণে উপন্যাসে পড়ি—মানুষকে পশুত্বের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে যে প্রতি-মুহূর্তের সজাগ সাধনা। আর এখানে যদি "দোকান দারী"র কাঁথা মুড়ি দেবার অবসর থাকে, তা হ'লে তো এই সাধনার কঠোরতা থেকে অল্পেশ অব্যাহতি।

আদর্শের সংঘর্ষ অন্যদিকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অরবিন্দের লেখায় সাধনার উপায় হিসাবে, গীতা উপনিষদের শিক্ষার ধ্যানে, বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতেও পেয়েছি—আত্মসমর্পণ। জীবনের ঐ চৌদ্দপনের বছর ভিতরে ভিতরে নিজেকে মুছে ফেলবার কল্পনাই, যতো অক্ষম সংকল্পেই হোক্, মনের ভিতর স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ দেখি, এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে শক্তির সাধনার সামঞ্জস্য এক হয়তো যতীন্দ্রনাথের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।

সততার সঙ্গে যাঁরা সাধনা করেছেন, আমাদের সেদিনের এমন অনেকে হয়তো এই কারণেই পরবর্তী জীবনের রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের তেমন ক'রে খাপ খাওয়াতে পারেন নাই। অথচ যে-যুগে আমরা সবাই জানতাম, যাঁকে যাঁকে আমাদের মরতে হবে, তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে শুধু দেশকে জাগাবার লক্ষ্যেই, সে-যুগের পক্ষে বোধ হয় শ্রেষ্ঠতর পথই ছিল ঐ আত্মসমর্পণের পথ, নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলার পথ।

পাড়াগাঁ থেকে একদিন গরীবের ছেলে সহরে এসে-ছিলাম লেখাপড়া শিখতে। নিজেকে কোনো কিছুতে সামনে দাঁড় করাতে সংকোচে বাধতো। পনের বছর বয়সে রাজনীতির ক্ষেত্রে হাতে খড়ি হয়েও নানা শিক্ষার ভিতর যেটি নিজে দীক্ষার জন্যে বেছে নিলাম, সেটি ঐ আত্মসমর্পণের মন্ত্র। এর সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল শশীদার শিক্ষা—নিজেকে মুছে ফেলার শিক্ষা। এর ভিতরও শক্তির পরিচয় ফুটতে পারে, কিন্তু সে অন্য ধরণের শক্তি।

যতীনদা নেই। আজ যাঁদের পিছে, যাঁদের নীচে স্থান নিতে চাই, সে যোগ্যতা তাঁদের নেই, ইচ্ছার সংকল্পের দৃঢ়তাও নেই। অথচ পনের বছর আগ্রাণ নিজেকে একটা ধারায় ধ'রে রেখে আজ আবার নতুন ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনা, নিজেই বুঝি, প্রায় একটা স্বপ্নের মতো। ভাবি, সবাই মিলে চলবো, সবার বুদ্ধিতে, শক্তিতে যে গতিবেগ সৃষ্টি হবে, আমি তারই পেছনের বাহিনীতে স্থান ক'রে নেব। তবু যেন একটা ভবিষ্যতের ব্যর্থতার ছায়া মনে নেমে আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে যতোবার একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগে, যেন নিজেকে চেপে দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণের আকুলতাকে কুড়িয়ে এনে গান ধরি—কে শুনলো, শুনে কে হাসলো, কে কি ভাবলো, সেসব ভাবিনে—

"আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন সাঁঝের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে, মা,
তোমায় ক'রে সকল হরো।"

বিষাদের আরও কারণ ছিল বাইরের অবস্থার ভিতর। এটা জানা কথা, সুযোগ সুবিধা মিললেই ওরা আমাদের দলবল, সংঘশক্তি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সবই ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু তাতেও কিছু সান্ত্বনা মেলে না।

১৯২৩ সালের সেপ্টম্বর থেকে সুরু ক'রে ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ভিতর তিন ঝাঁকে আমরা সবাই ধরা পড়ি। তার ভিতর শেষ ঝাঁকে সুভাষ, সত্যেনদা, মধুদা, হরিদা, অমর প্রভৃতি যখন ধরা পড়েন, তখন আমাদের দিক থেকে কংগ্রেস দেখবার লোক একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন সুরেশ দাস। দেশবন্ধু অবশ্য যখন দেখলেন, বৃগান্তরের কর্মীদের ধ'রে পুলিশ তাঁর স্বরাজ্য-

দলের উত্থান রোধ করতে চায়, তখন তিনি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং দুগান্তরের লোক নিয়েই বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠন করলেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই তখন কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন। কাজেই দলের সাধারণ থাকলেও প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল না—যেটা পরে খানিকটা দিয়েছিল সুরেশবাবু যখন "কর্মীসংঘ" গড়ে তোলেন।

কিন্তু কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দলের সাধারণ প্রচার কাজ চাড়াও মঠ, আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ জাতীয় আমাদের কতকগুলি স্থায়ী কেন্দ্র ছিল। সেগুলির কথা আগে বলেছি। ঘরপাকড়, খানাতল্লাসী ক'রে, আশপাশের লোককে ভয় দেখিয়ে পুলিশ এগুলিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অমরদা (চাটার্জি) ধরা পড়াতে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ উঠে গেল। কুন্তল ও চারুর মৃত্যুতে এবং কিরণদা (মুখার্জি) ধরা পড়াতে দৌলৎপুর সত্যাশ্রম নির্জীব হয়ে পড়লো। দু'একজন কর্মী যাঁরা থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভিতর, পাশের গ্রামের লোকদের ভিতর যার কাছে যেমন সুবিধা, প্রচার চলে। ডায়মণ্ড হারবার (আবদালপুর) সত্যাশ্রম সম্পর্কে কারও কাছে বা বলে, ওটা বিদেশ থেকে আমদানী অস্ত্র তুলবার ঘাঁটি, কারও কাছে বা বলে, ওখানকার কর্মী রসিকলাল দাস প্রেত-সাধক।

বন্ধুবান্ধব সবাই ধরা প'ড়ে যাবার পর দলের দিক থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে কয়টি দায়িত্বশীল কর্মী অবশিষ্ট ছিলেন, তার ভিতর রসিকের উপর অনেকখানি নির্ভর করতাম। আবদালপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার সময় জানা গিয়েছিল, কর্মকেন্দ্র হিসাবে ওটা একটা বিশিষ্ট স্থান পাবে। প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস পর ওখানে গিয়ে দেখি, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। চমৎকার জায়গাটি, গঙ্গার ঠিক উপরেই, গঙ্গা ওখানে প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। আশ্রমটি গঙ্গার বাঁধের বাইরে—বর্ষার পরে জাহাজ থেকে জীবনকে, সতীশদাকে দেখালাম।

কিন্তু আশ্রম থেকে অন্ততঃ বিশ মিনিটের পথের ভিতর কোনো দিকে লোকালয় ব'লে কিছু নেই। আশ্রমের ভিতরেও অন্য কোনো লোক রাখবার সুযোগ নেই। আশ্রম এখানে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন, তাঁর বাবাও ও-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। দুপুরে এবং রাত্রে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে দিন ১টা ১৪টায় এবং রাত ১১টা ১১৪টায় মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো বেলায় দুটো চুনোমাছের ঝোল আর ভাত, কোনো বেলায় শ্রেফ খেসাড়ির ডাল আর ভাত ভদ্রলোক দিয়ে যেতেন। এর ভিতর সকালে বিকালে দুটো মুড়িও যদি দৈবাৎ মাসে দু'তিন দিন জুটে যেত তো ভাল। তার উপর কোনো লোকজনের গতায়াত প্রায় নেই বললে চলে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই জীবন কাটাচ্ছেন রসিক।

আমি আপত্তি তুললাম। একটি যুবক, কর্মের উদ্যমে লেখাপড়া ছেড়ে বেরিয়েছেন কাজের সুযোগ খুঁজে। তাঁর জীবনকে এইভাবে নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই। একজন বন্ধু এর ভিতর আমার সংকীর্ণ অভিসন্ধি খুঁজে পেলেন। তা সত্ত্বেও আমি রসিককে ওখান থেকে সরাতে কৃতসংকল্প হয়ে উঠি। কিন্তু ইতিমধ্যে ধরা প'ড়ে যাই। আরও দু'এক জনকে রসিকের সঙ্গে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কেউ টিঁকতে পারে নাই। ছয়টি বৎসর ঐভাবে রসিক ওখানে শুধু ক্যাসাবায়ানকার প্রকৃতির পরীক্ষা দেন। নিজের পরিবার বলতে যা ছিল তাকে নিঃস্ব ক'রে তোলেন। পরে তো তা একেবারে মুছেই যায়। জীবনও ওঁর নষ্ট হয় বলতে হবে। ওখানে আশ্রম করার চেষ্টা সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমরা সবাই ধরা প'ড়ে যাবার পর রসিক অন্যদিকে নিজের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করেন—যার অভিব্যক্তি পরবর্তীকালে অনুজা সেন আর দীনেশ মজুমদারের আত্মনিবেদনে।

আশা ক'রে থাকি, রসিক যতোদিন বাইরে আছেন, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না। কিন্তু কোনো খবর পাইনে। ইন্‌সিনে ব'লে আশ্রম মঠগুলোর উপর উৎপাতের খবরই কেবল পাই।

বাংলা দেশের জেলের খবর ত্রৈলোক্য বাবুর মারফত যা পেলাম, তা-ও আশাপ্রদ নয়। ১৯২৪ সালের অক্টোবরের ধরপাকড়ের পর দুই দলের নেতারা অনেকে মেদিনীপুর জেলে জোটেন। তাঁরা নাকি দুই দলের এক হয়ে যাবার কথা পাকা ক'রে ফেলেছেন। কি ভাবের মিলমিশ হবে যখন জানতে চাইলাম, ত্রৈলোক্য বাবু বললেন, আপনারা public কাজ নিয়ে থাকবেন, আমরা secret কাজ করব।

চমৎকার মিলমিশের ব্যবস্থা তো—আমি বলি।

অনেকবারের অভিজ্ঞতার পর অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের মিলমিশের আলোচনার নাম দিয়েছিলাম শেয়ালের যুক্তি। এই যে পাকা কথা হয়েছে ব'লে আমার মেদিনীপুর থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে, এর ভিতরও মনে হ'ল, হয় অনেকখানি ফাঁকি আছে, নয়তো বার্তাবাহক আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছেন।

সব দিকের আঁধারের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ আকাশের গায়ে আলোর সন্ধান খুঁজি। চারদিকের কপাট বন্ধ। এরই ভিতর কাছের জানলা একটি খুললো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

সেলের নতুন খোলা জানলার পেছন থেকে একদিন এক সিপাই এসে আত্ম-পরিচয় দিল। তার নাম জীবট উপাধ্যায়। রেঙ্গুনে একটি আড্ডায় পাঁচ সাতটি, দশ বারটি বাঙালী যুবক একত্র হন। ইন্‌সিনেও তাঁদের অড্ডা আছে। তাঁদের ভিতর একজন চিঠি লিখেছেন। একটি বিশেষ সময়ে জীবট আমার চিঠি দিয়ে যাবে।

চিঠিতে যাঁর নাম পেলাম, তিনি জিতেন ঘোষ, ঢাকার বাড়ী। তিনি আমার নাম জানেন, জীবনকে ও পূর্ণদাকে চেনেন। রেঙ্গুনে দল করতে সুরু করেছেন।

চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে লাগলো। কয়েক দিনেই বুঝলাম, জিতেন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। এরভিতরেই সারা বর্মার ভারতীয় ছাত্রদের একটি সংঘ গ'ড়ে তুলেছেন।

আমাদের বাজার করতো একটি মুসলমান সিপাই, গফুর। কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসী। ইতিমধ্যে তাকে দিয়ে আমি রেঙ্গুন থেকে Forward আনাতে সুরু করেছি। জীবটের আমার সঙ্গে কদাচিৎ কখনও দেখা করার সুযোগ মিলতো। কিন্তু গফুর তো ঘুরেফিরেই আসতো। হঠাৎ একদিন দেখি, জিতেন গফুরের সঙ্গেও ভাব ক'রে নিয়েছেন। তার মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন। এখন থেকে চিঠি চলে নিয়মিত। সন্তোষের রশি তখনও কাঁটালগাছে শক্ত ক'রে বাঁধা রয়েছে।

চিঠিতে এবং কাজে জিতেনের পরিচয় পেয়ে ক্রমে ভিলা মহম্মদের কাছে ও উ পীন নীরা জ্যাটার কাছে ওঁকে পরিচয় পত্র দিই। ভিলা মহম্মদ সানন্দে জিতেনদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে থাকেন। ভিক্ষু জ্যাটার সঙ্গে প্রোমে গিয়ে জিতেন পরিচয় করেন আরও পরে। আমিও বলি, জিতেনও বোঝেন, বর্মার বর্মীদের সাথে না মিশতে পারলে বিপ্লব চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। এদিকে এই ভিক্ষু অনেকখানি সহায় হন।

ইতিমধ্যে যে-সিপাই আমাদের দুধ আনতো, তার ট্যাঁক থেকে একদিন একখানা চিঠি আমার হাতে পৌঁছাল, সে-চিঠি লেখা চট্টগ্রামের নির্মল সেনের।

এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু আমি আশা করতে পারিনি। আমি ও চারু ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে "সাম্যাশ্রমে" সূর্য সেনের সঙ্গে যখন ছিলাম, তখন সেখানে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার ভিতর অন্তরঙ্গ ছিলেন সূর্য বাবুর পরেই নির্মল। নির্মল সত্য সত্যই নির্মল। এবং সূর্যবাবুর সঙ্গে আমাদের যতোগুলি কর্মী তখন জুটেছিলেন, তার অধিকাংশকে বোধ হয় নির্মলই টানেন। ক্রমে নির্মলের সঙ্গে চিঠিপত্রে জানতে পাই, চট্টগ্রাম এ. বি. রেলওয়ের টাকা লুঠের পর ওঁরা অনেকে বর্মায় গেছেন। এঁদের ভিতর লোকনাথ বল, মণি দে, উপেন ভট্টাচার্য (অবনী), রাখাল দে, গোবিন্দ বিশ্বাস এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমার চট্টগ্রামে পরিচয়, কেউ কেউ দৌলৎপুর সত্যাশ্রমের কর্মী হিসাবেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মাঝে মাঝে এঁরা বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইসারায় ইঙ্গিতে কথাবার্তা ব'লে যেতেন, আমি আমাদের দোতলার শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াতাম। এই ভাবে

সুযোগমতো দেয়ালের উপর দিয়ে কখনও কখনও জিতেনদার সঙ্গেও চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতো।

নির্মলদের সঙ্গে জিতেন ইতিমধ্যেই পরিচয় ক'রে নিয়েছেন এবং এক যোগে কাজ করছেন। প্রকাণ্ড একটা শক্তি গ'ড়ে উঠ্‌ছে।

জিতেনই আমার খবর পাঠিয়েছেন, অনুশীলনেরও জনকতক কর্মী আছেন রেঙ্গুনে! তাঁদের একজনের একটা বইয়ের দোকান আছে, সেইটিই তাঁদের কেন্দ্র। তাঁরাও আলাদাভাবে বাঙালী ছেলেদের ভিতর দল গড়ছেন। জিতেন লিখলেন, এর ভিতরই রেষারেষি লেগে গেছে। এর তো কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা দুজনায় জেল থেকে লিখে পাঠালে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

জিতেন ও নির্মলদের সব খবরই এপর্যন্ত ত্রৈলোক্য বাবুকে বলেছি। তিনিই খবর নিয়ে এসেছেন, বাংলার ছেলে আমাদের দুই দলের মিলমিশ হয়ে গেছে। এখন খেয়ে দেখতে চাইলাম পিঠে কেমন লাগে। ত্রৈলোক্য বাবু জ'লে উঠ্‌লেন, বললেন, আপনি ওদের কাছে লোকজন পাঠিয়ে ওদের সন্দেহভাজন ক'রে তুলবেন না।

আমি হেসে বল্‌লাম, আচ্ছা। কিন্তু বর্মার ব'সে তিনটে বাঙালী ছেলের দলাদলি পাকিয়ে কোন্ বিপ্লব করবে, মহারাজ?

জিতেনকে লিখলাম, তোমরা এবং নির্মলরাই একযোগে কাজ ক'রে যাও। ওঁদের বাদ দাও। বর্মীদের সঙ্গে মিশতেই বিশেষ ক'রে চেষ্টা কর।

সেটা লেখা বাহুল্য। নির্মল এবং জিতেন সে-চেষ্টা আগে থেকেই করছিলেন।

মরণের গান

—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

প্রতিদিন পেয়ে থাকি প্রভাতের প্রসন্ন পরশ
উদয় দিগন্ত হ'তে,
আমার ঘরের এই রন্ধ্রহীন বাতায়ন পথে,
চেয়ে চেয়ে দেখি—
উষার অরুণ আলো দিয়ে যায় লিখি
ধরণীর পত্রপরে আমন্ত্রণ বাণী
আলোর চুম্বন লাগে আঁধারের আবরণ টানি
নিশান্তের বনান্তরে,
জেগে ওঠে ধীরে ধীরে,—
কতদূর পথ পারে তরু শূন্য সরোবর তীরে
রাতের নিদ্রিত পাখী,
বিচিত্র ভাষায় তারা তাই ওঠে ডাকি,
তাই তারা গেয়ে ওঠে গান,
প্রভাতে পেল কি ফিরে দিগন্তের দীর্ঘপথে
আবার আহ্বান?
আলোর দেবতা তুমি ওগো জ্যোতির্ময়,
তোমার সঞ্চয়,
প্রথম পেয়েছি কবে জন্মের সে প্রথম ক্ষণে,
যখন এসেছি আমি অজানার অন্ধকার হ'তে
আলোকের নব অন্বেষণে,
মৃত্যুরে ফেলে রেখে পিছে,
প্রতিদিন চলিয়াছি সুখে দুঃখে চির নিঃসঙ্কোচে,
যখন জেনেছি আমি জীবনের এই মাত্র সার
আমার সাধনা শুধু আলোর মিলন লাগি
অতৃপ্ত অভিসার।
তখনি যে ভেঙ্গে গেছে মরণের অহেতুক ভয়,
হোক তাহা যত বড় বিভীষিকাময়,
অন্তরে জেনেছি এই চিরন্তন দৃপ্ত সত্যটাই
আমার মরণ নাই।
আজি তাই মনে হয় বিদায়ের বেলা যদি আসে,
আমার প্রাঙ্গণ পাশে,
নিঃশেষে হাসি মুখে ডেকে লব তারে
হৃদয়ের এক ধারে।
ব্যথা নাই অশ্রু নাই দুঃখ নাই নাই কোন খেদ,
আনন্দের আলিঙ্গনে মেনে নেব পৃথিবীর—
চরম বিচ্ছেদ,
আমার মরণে পাব জীবনের নূতন কল্পনা
আবার পৃথিবী দেবে আলোকের অভ্যর্থনা।

হরমোনের বিচিত্র কথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সভ্যতার আলোকিত স্বচ্ছ যুগের পটভূমিকা রচিত হয়েছে বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে। বিজ্ঞানের অসীম ও অফুরন্ত দানে সভ্যতার বেদীমূল হয়েছে নির্মিত। মানুষ যা কোনদিনই ভাবেনি, মানুষ যা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি, বিজ্ঞানের যাদুবলে আজ মানুষের কাছে সেই অভাবনীয় অকল্পনীয় তথ্যগুলো পেয়েছে সাফল্যের বাস্তব রূপ। কল্পনাতীত তথ্যাবলীর দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেছে আজ মানুষের কাছে, সে পেয়েছে তার চাবি-কাঠির সন্ধান। অসম্ভব বলে পূর্বে যা কিছু বিবেচিত হোত, বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ তা সম্ভাব্যের রূপে রূপায়িত হয়েছে। মানুষ আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ কীর্তি ও কৌশল দেখে, তার রোমাঞ্চকর সুপ্রকাশ দেখে।

সেদিনের হয়ত আর বেশী দেরী নেই—যেদিন মানুষ দেখবে, চাষী-সম্প্রদায় তাদের স্বহস্ত রোপিত গাছে ঔষধ জাতীয় কি এক প্রকার তরল পদার্থ অতি যত্নের সহিত ছিটিয়ে দিচ্ছে। বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে অভিভূত হয়ে প্রশ্ন করলে হয়ত যার উত্তরে তারা বলবে, গাছে ফুল ফুটাচ্ছি কিংবা ফল ধরাচ্ছি বা পাকাচ্ছি—তখন হয়ত শুনে নেহাৎ প্রলাপ বকছে ভেবে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া হবে বা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ভাবে কথাটা অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু তার পরে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে কথাটা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ বা অমূলক নয়। বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল যুগে বিস্ময়কর কোন কিছুকেই অহেতুক হাস্যকর পর্যায়ে ফেলা যায় না—ফেলবার পূর্বে কিছুটা চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নের উত্তরে চাষী সম্প্রদায় বলেছিল, "ঔষধ দিয়ে গাছে ফুল ফুটাচ্ছি বা ফল ধরাচ্ছি", কথাটা তারা ঠিকই বলেছিল, কেননা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ গাছে ইচ্ছামত ফল-ফুল প্রসব করাতে পারে এবং পারছেও। কথাটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেও, বিজ্ঞানের বলে কিন্তু সম্ভব হয়েছে। মানুষ আজ উদ্ভিদ দেহের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছামত সময়ে তার ফুল-ফলের জন্ম দিতে পারে এখন কিরূপে তা সংঘটিত হয় তাই-ই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এ তথ্য আজ অবিদিত নেই যে, জীব ও উদ্ভিদ দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে হরমোন বা গ্রন্থিরস উৎপন্ন হয়ে, পরে তা নানাস্থানে ছড়িয়ে প'ড়ে তাদের জীবনের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলোকিত সভ্য-যুগে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কয়েকটি কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রবণই এইসব বিস্ময়কর কাজগুলোকে সম্ভাব্যের রূপ দিয়েছে।

জীব ও উদ্ভিদ দেহে বর্তমান এই হরমোন যে কি বিরাট পরিবর্তনের মূলে দাঁড়িয়ে আছে তা চিন্তা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অদ্ভুত শক্তি এই হরমোনের। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে মানুষের দেহে ও মনে যে পরিবর্তনের রোমাঞ্চকর ঢেউ বয়ে যায়, তারই মূলে এই হরমোন। উদ্ভিদের বেলাতেও এই হরমোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

বীজ হতে যখন নতুন অঙ্কুর উদ্গত হয় তখন মাটীর সান্নিধ্যে সে আসে এবং পৃথিবীর সঙ্গে তার নতুন পরিচয় ঘটে। তারপর যখনই সেই ভ্রূণ-মুকুলটী সূর্য কিরণে ক্রমাগতই বেড়ে চলে তখন থেকেই তার মধ্যে হরমোনের ক্রিয়া সুরু হয়। ভ্রূণ-মুকুলের এই অগ্রগতিতে প্রেরণা দেয় এই হরমোন। চার্লস্ ডারউইন বলেছেন, ভ্রূণ-মুকুলের শীর্ষদেশই হরমোনের উৎপত্তি-স্থল। মুকুলের শীর্ষাংশে সূর্য কিরণ পড়লে সেই আলোর দিকে তা বেঁকে যায়। এর যে কি কারণ তার উত্তরে তিনি

বলেছেন যে, শীর্ষাংশটুকু অনাবৃত রেখে, মুকুলের বাকী অংশটুকু অন্য কিছু দিয়ে আবৃত রাখলে তা আলোর দিকে বেঁকে যায়; কিন্তু শীর্ষদেশ আবৃত রেখে মুকুলের বাকী অংশটুকু অনাবৃত রাখলে তা আলোর দিকে বেঁকে যায় না। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যখন মুকুলের শীর্ষদেশ হতে এক মিলিমিটার পরিমাণ অংশ কেটে নেওয়া হয় তখন সেই মুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন ঐ কাটা অংশটুকু মুকুলের সেই স্থানে সরিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তখন মুকুলটী বাড়তে থাকে, কিন্তু পাশের দিকে আস্তে আস্তে হেলে যায়। মুকুলের শীর্ষাংশ হতে এই হরমোন রস ক্রমাগতই মুকুলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ফলে ঐ পাশের বৃদ্ধি অপর পাশ অপেক্ষা বেশী হয়। এবং মুকুলের বেঁকে যাওয়ার কারণও এই। আবার মুকুলের এক পাশে আলো পড়লে সেই দিকে মুকুলের হেলে যাওয়ারও কারণ এই। মুকুলের যে পাশে আলো পড়ে সেই দিকে এই হরমোন-রস প্রবাহিত হয় না, কিন্তু বিপরীত দিকে ঠিকই প্রবাহিত হয়। তখন মুকুলের সেই দিকটা বেশী বৃদ্ধি পায় এবং আলোর দিকে এগিয়ে আসে। বীজ হতে অঙ্কুরোদ্গমের পর ভ্রূণ-মুকুলের মাঝে যে গতির প্রবাহ আসে সে গতির মাঝে প্রেরণা জোগায় এই হরমোন রস।

প্রাণী দেহে বিদ্যমান এই হরমোন রস বা জীবন-রসায়নকে সুধী বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাঁদের গবেষণাগারে বসে কৃত্রিমতার রূপ দিয়েছেন। তাঁরা এই রস উদ্ভিদ্ দেহের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করে উদ্ভিদ জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। খুব বেশী দিন নয়, মাত্র দশ বারো বৎসর আগেও এই পদার্থ নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশেষ ভাবে গবেষণায় রত ছিলেন না; আজ কিন্তু এই হরমোন নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেছে। হরমোন আজ আর উপেক্ষার বস্তু নয়। রীতিমত গবেষণাগারে তার গবেষণা চলেছে এবং নূতন নূতন রাসায়নিক হরমোন-রস প্রস্তুত হয়েছে এবং হচ্ছেও।

উদ্ভিদ্ জীবনে হরমোনের কাজ বহু প্রকার। তার জীবনের নানা পর্যায়ে এই হরমোন প্রয়োগ ক'রে সুধী সমাজ ঘটিয়েছেন তাদের ক্রিয়াকলাপে নানা পরিবর্তন। উদ্ভিদ্ জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ক'রেছেন নিয়ন্ত্রণ। কৃত্রিম রাসায়নিক হরমোন অনেক আছে, তাদের কাজও বহু এবং স্বতন্ত্র। কোন হরমোন গাছের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে ক'রে দেয় বন্ধ, কেউ বা করে বৃদ্ধি, কোনটার দ্বারা হয় বীজ-হীন ফলের উৎপত্তি, আবার কোনটার দ্বারা হয় অসময়ে গাছের ফল পড়া বন্ধ। এছাড়া আরও অনেক কাজ আছে হরমোনের। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে হরমোনের সাহায্যে উদ্ভিদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করা হয়েছে এবং হচ্ছেও।

ফলের বৃন্তভাগ গাছের যে অংশে সংযুক্ত থাকে, ফল আকারে বড় হ'লে এবং ভারী হ'লে সে অংশ থেকে পড়ে যায়। অনেক সময় ফল পরিপুষ্টি লাভের পূর্বে তার বৃন্তদেশে সেলুলোজ জাতীয় একটা স্তর জন্মায় এবং ফল পরিপুষ্ট হবার পূর্বে ঐ নরম অংশ থেকে পড়ে যায়। ফলে এই অসময়ে অপরিপুষ্ট ফল পড়ে যাওয়ার জন্য কৃষক সম্প্রদায় হয় ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃষক সম্প্রদায়কে আর ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয় না। বিজ্ঞানই দিয়েছে আজ তাদের অব্যাহতি। ন্যাপ্থলিন এ্যাসেটিক এসিড নামে এক-প্রকার হরমোন দ্রবণ যদি গাছের গায়ে গায়ে লাগান যায় তাহলে ফলের বৃন্তভাগ হয় অত্যন্ত শক্ত। নরম সেলুলোজ জাতীয় আস্তরণ আর জন্মাতে পারে না। ফলে, ফল পড়ার সংখ্যার হার যায় কমে। ফল পরিপুষ্টি লাভ ক'রে পাকবার পরে ইচ্ছামত সংগ্রহ করা চলে।

ওয়াশিংটনের একটী কমলালেবু বাগানে এই অসময়ে ফল পড়ে যাওয়ার হাত হতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিশেষ একটী হরমোনের ক্রিয়াকে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছিল। আশীটী ফলন্ত কমলালেবু গাছের অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশটী গাছে ঐ হরমোন দ্রবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল

আর বাকী চল্লিশটী গাছে ঐ দ্রবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। কিছুদিন পরে দেখা গেল, যে-চল্লিশটী গাছে হরমোন দ্রবণ দেওয়া হয়নি, সেই সব গাছ হতে বহু সংখ্যক ফল ঝরে পড়েছে। বাকী চল্লিশটী গাছে, যাতে ঐ দ্রবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সব গাছ হতে খুব কম সংখ্যক ফল ঝরে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত পৃথক ভাবে সমসংখ্যক গাছের ঝরে পড়া ফলের সংখ্যা গণনা ক'রে দেখা গেল যে, হরমোন দ্রবণ না দেওয়া গাছের ঝরে পড়া ফলের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও উপর, আর হরমোন দেওয়া গাছের ঝরে পড়া ফলের সংখ্যা এক শতেরও কম। এই পরীক্ষায় হরমোনের ক্রিয়া যে বেশ ভাল ভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

এইরূপ উপায় অবলম্বন ক'রে গাছেতে ফল যতদিন ইচ্ছা রেখে দেওয়া চলে। ফল ব্যবসায়ীরা এইরূপ উপায় অবলম্বন ক'রে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে থাকেন। ফলের বাজার যখন মন্দা থাকে অথবা ফলের যখন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না তখন ফল ব্যবসায়ী অনর্থক গাছ হতে ফল সংগ্রহ করে ঘরে না পাঠিয়ে গাছেতেই রেখে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনের সময় ফল সংগ্রহ ক'রে বাজারে দিয়ে লাভবান হতে পারেন। এই ভাবে বহুদিন পর্যন্ত হরমোনের সাহায্যে প্রকৃতির বুকে ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

পূর্বেই বলেছি, কৃত্রিম হরমোন বিভিন্ন প্রকার এবং তার কাজও বিভিন্ন। হরমোনের এই স্বতন্ত্র গুণাবলীকে নানা কাজে লাগান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে গাছে ফল হয়, কিন্তু আকারে বড় হয় না, কিংবা বাড়ে না। সেই সব ক্ষেত্রে এই হরমোনের কাজ খুব কার্যকরী হয়। অর্থাৎ ফলকে সু-আকারযুক্ত করতে কেবল হরমোনই পারে। দাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একবার এক কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে অব্যাহতি পায়। তার আনারস ক্ষেত্রে একবার বহু আনারস বৃষ্টির অভাবে মোটেই পরিপুষ্ট হতে পারেনি। অত্যন্ত ছোট ছোট ও বিকৃত ধরণের হয়েছিল। ফলের মালিক যদি সেই অবস্থায় ফলগুলি বাজারে বিক্রয় করতো তাহলে তার লাভ কিছুই হতো না। তাই সেই অবস্থায় বাগানের মালিক ফলগুলি বাজারে না দিয়ে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করলো। বিটা ন্যাপথক্সি এসেটিক এসিড নামক গাছে ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষায় রইল, ভবিষ্যতের সুফলের আশায়। রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ায় ফলের মধ্যে এল অদ্ভুত রূপান্তর। ক্ষুদ্র, বিকৃত ফলগুলো হ'ল নিটোল, রসপূর্ণ এবং পরিপুষ্ট। ফলের মালিক সেই অবস্থায় ফলগুলি বাজারে বিক্রয় ক'রে হয়েছিল বেশ লাভবান।

বর্তমান সময় বৈজ্ঞানিক মহল নানা হরমোনের সাহায্য নিয়ে এমন একটী রাসায়নিক দ্রবণ উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন, যার সাহায্যে ফুলের স্বাভাবিক প্রস্ফুটনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং দুর্ঘটনায় বহু ফুলের কুঁড়ি এবং ফুটন্ত ফুল ঝরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে কালবৈশাখীর কথা ধরুন, চৈত্র মাসে আম্র-মুকুলের অসম্ভব ক্ষতি হয়। তাছাড়া শিলাবৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে বহু ফুল ও ফলের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির হাত হতে অব্যাহতি পাবার জন্যে বৈজ্ঞানিক মহল খুবই সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাঁরা এমনই একটী হরমোন দ্রবণ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছেন যাতে তার দ্বারায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়টুকু অতিক্রম করবার পরই ফুলের আগমন ঘটবে উদ্ভিদের পল্লবে পল্লবে, শাখায় শাখায়। গাছের প্রতিটী শাখায়, প্রতিটী ফুলে এই হরমোন-দ্রবণ ছড়িয়ে মানুষ দেখতে পেয়েছে এক নূতন আলোকিত পথ—এক অজানা আস্বাদের সন্ধান। ফুল থেকে হয় ফল, ফল থেকে বীজ—আবার বীজ হতে হয় আগামী দিনের শিশু উদ্ভিদ্—উদ্ভিদ জীবনের এই চাক্রিক গতির মোড় ফিরিয়েছে হরমোন। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এনে দিয়েছে পরিবর্তনের ঢেউ। বীজহীন ফলের জন্ম দিয়ে হরমোন উদ্ভিদ-জীবনের চিরাচরিত প্রথাকে দিয়েছে ঘুরিয়ে। আর দিয়েছে এক অপূর্ব সৃষ্টির বিস্ময়কর পরিচয়।

হরমোনের সাহায্যে উদ্ভিদের কিরূপে বীজহীন ফল হয় তা জানতে গেলে, তার পূর্বে আমাদের জানা দরকার কিরূপে ফুল হতে ফল উৎপন্ন হয়। ফল জন্মানোর প্রথম অবস্থায় পুরুষ ফুলের পরাগ এসে পড়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরে সাধারণতঃ এই কাজটী সংঘটিত হয় বাতাস, জল আর মধুপ্রিয় কীট-পতঙ্গের দ্বারা। মধুপায়ী কীট-পতঙ্গেরা এক ফুল হতে অন্য ফুলে যায় মধু পানের জন্যে। মধুপানের সময় ফুলের পরাগ লেগে যায় পতঙ্গদের সারা দেহে ফলে সেই পতঙ্গ যখন পরাগ-মাখা দেহে অন্য ফুলে বসে তখন সেই পরাগ স্ত্রী-ফুলের গর্ভকেশরে লেগে যায় এই প্রথাকে বলা হয় পরাগ সংযোগ বা pollination। তারপর স্ত্রী-ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ঐ পরাগের পুংজনন কোষ আর স্ত্রীজনন কোষের মিলনে উৎপন্ন হয় বীজ। সেই বীজকে ঘিরে গড়ে উঠে ফলের শাঁসযুক্ত অংশ, যা এককালে হয়ে দাঁড়ায় মানুষের রসনার উপাদেয় সামগ্রী। গর্ভকোষের ফল সূচনাকালীন সময় এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত। এই মুহূর্ত সৃষ্টি করে বিশেষ এক উত্তেজক হরমোন। তার ক্রিয়ায় সমস্ত গর্ভকোষটী স্ফীত হয়ে ফলে পরিণত হয়। এই হরমোন বা গ্রন্থিরস পুংজনন ও স্ত্রীজনন কোষের মিলনের মুহূর্তক্ষণে বাহির হয়। কৃত্রিম উপায়ে এই হরমোন-রস আবিষ্কৃত হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগারে এবং তার নামকরণ হয়েছে ইনডোল বিউটরিক এসিড। যেদিনই এই কৃত্রিম রসায়নের সৃষ্টি হল সেদিন বৈজ্ঞানিক মহলে পড়ে গেল অপূর্ব সাড়া। বীজহীন ফলের জন্ম দেবে এবার বৈজ্ঞানিক সমাজ। নূতন তথ্যের উদ্ভাবন হ'ল, কিন্তু তার পরীক্ষার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকদের মাথায় দিনরাত্তি কেবলই চিন্তা; এই যে হরমোন-রস বা গর্ভসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত হচ্ছে—শুধু সেইটুকু যদি ফুলের গর্ভকোষে লাগান যায় তাহলে কি বীজহীন ফলের উৎপত্তি হয় না? অদ্ভুত প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে—কিন্তু তার যুক্তি সহ প্রমাণ ও পরীক্ষা চাই। বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রমাণ দিল। চিন্তাধারা তাদের সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল; পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, বৈজ্ঞানিকদের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ সত্য। স্ত্রী-ফুলের গর্ভ-কোষের পথ উন্মুক্ত ক'রে সেখানে দেওয়া হল এই কৃত্রিম হরমোন রস। তারই স্পর্শে ফুলের মধ্যে এল গর্ভচেতনা। একদিন হল ফল, ফল হল রসাল আর পরিপুষ্ট এবং ফলের ভিতর হল বীজ শূন্য। হরমোনের সাহায্যে এই ভাবে হল বীজহীন ফলের উৎপত্তি। বিজ্ঞান মানুষকে দিল এক অভিনবত্বের সন্ধান। হরমোন মানুষকে দিল এক অদ্ভুত শক্তির পরিচয়। যার বলে মানুষ আজ হয়ে উঠেছে উদ্ভিদ্‌জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে হরমোনের সাহায্যে ফসল ফলানর রীতি বেশ প্রচলিত হয়েছে। চাষী সমাজ আজ ইচ্ছামত গাছে ফুল ও ফল প্রসব করাচ্ছে। ফসল উৎ-পাদনে হরমোনের সহায়তা পেয়ে কৃষকগণ এক নূতন পথের সন্ধান পেয়ে গেছে। সে পথই গড়ে দেবে এবং দিচ্ছেও মানুষের সৌভাগ্যসোপান। মানুষ কৃতজ্ঞ এবং ঋণী থাকবে এই সক্রিয় হরমোন বা গ্রন্থিরসের কাছে।

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও একদিন ফসল উৎপাদনের কাজে হরমোনের ব্যবহার প্রচলিত হবে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও দুর্যোগরাশীকে মানুষ আর তখন ভয় করবেনা। ইচ্ছামত সময়ে গাছে ফসল উৎপাদন করবে। চাষী সমাজ তখন হবে ফসল উৎপাদনের যাদুকর। হর-মোনই এনে দেবে ফসল উৎপাদনে যুগান্তর।

অবসান

ডাঃ সত্যপদ রায় চৌধুরী

—তিন—

পূর্বানুবৃত্তি

অমরনাথের মনের অবস্থা দিনদিন মন্দের দিকেই চলেছে। আর কিছু ভাল লাগেনা। সংসার যেন তার কাছে একটা নাট্যশালা মনে হয়। ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে করতে ভাবভোলা মনে বলে, "অভিনয়, অভিনয়! যে দিকেই দেখি অভিনয়। শূন্যতা! ঘোর অন্ধকার চারিদিক ঘিরে আছে। আলো কি কোথাও নেই? কই? আলো দেখাও, একটু আলো।" দীননাথ, বাবুর জন্য বিশেষ চিন্তিত। সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কি ক'রে বাবুকে সুস্থ করবে তাই ভাবে। বাবুকে আপন মনে বকতে দেখে ধীরে ধীরে এল কাছে। খুব মিষ্টভাবে বলে, "আবার অমন করে কি সব বকছো বাবু? ওই দেখ বাবু বাইরে ছোট ছোট ছেলেরা তোমাকে ডাকছে—যাবেনা? তাদের পড়াবেনা? যাও বাবু তুমি সেই কাজই কর।" অমর "কাজ? কাজত' চিরকালই করলাম দীনু! কাজের ত' আর কামাই নেই। যেদিন থেকে এই কর্মক্ষেত্রে এসেছি সেই দিন থেকেই কাজের লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছি। রেহাই নেই। হ্যাঁরে, আমি কি পাগল হয়েছি?" দীননাথ "কৈ না, তোমাকে কে পাগল বলে? অত ভেবনা। ভেবে ভেবে তোমার শরীরটা কাহিল হয়ে গেল।"

অমর—"শরীর? আমার শরীর কাহিল হয়েগেছে?" এই বলে অমরনাথ খুব হাসলো। তারপর আবার দীননাথকে বললে "হ্যাঁরে দীনু, আমার শরীরের কি আর কোন দাম আছে? দীননাথ—"তুমি কি বলতে চাও, বাবু। তোমার শরীরের অনেক দাম। এ শরীর অনেকের উপকার করেছে—এখনও করছে। দশের জন্যই তোমার শরীর।"

অমরনাথ—"দশের জন্য আমার শরীর, না?" এবার অমর নাথ পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠল, "ঠিক বলেছিস্।" কিছুক্ষণ পরে দীননাথকে আবার বললে "কিছু শুনতে পাচ্ছিস্ দীনু, কে যেন আমাকে ডাকছেনা?"

দীনু—"কই বাবু? ও কিছু নয়, ওটা তোমার ভ্রম।"

অমর—"ভ্রম? না, না কে যেন আমাকে বলছে, ওরে পথ ভোলা পথিক একবার পথের দিকে চেয়ে ছাখ, চোখ মেলে চেয়ে ছাখ, অন্ধকারেও আলো পাবি। শুনছিস? ঐ ছাখ—।" সূর্যের দিকে চেয়ে অমরনাথ বললে "কে? কে তুমি?"

অমরনাথের অবস্থা দেখে দীননাথ ব্যস্ত হয়ে বললে "বাবু, ছেলেগুলি তোমায় ডাকতে এসেছিল যাবে না?" অমরনাথের কোন কথা কানে গিয়েও যেন গেল না। কিছুক্ষণ পরে বলল "যাব, কোথায় যাব?" তারপর একদৃষ্টে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকল। এমন সময় সমর বেরার সংগে এল ঘরের ভেতর। অমরনাথের ঐ অবস্থা দেখে দু'জনে একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর সমর অমরনাথের গায়ে হাত দিয়ে ডাকল "অমর অমর একি? তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বকছ? তোমাকে সেদিন এতকরে বুঝিয়ে গেলাম—তবু তুমি ভাব? কেন শরীরটাকে এমন করে নষ্ট করছ। কিসের দুঃখ তোমার? দেখ, কা'কে সঙ্গে এনেছি।" অমরনাথ বললে "কে? কে তুমি?" সমর—'অমর, অমর আমি সমর, চিনতে পারছনা?" এতক্ষণে অমরের জ্ঞান হলো। সমরকে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—"তুমি এসেছ? বন্ধু, তুমি এসেছ? বলতে পার ভাই আমার কি হয়েছে? কেন আমি এমন হয়ে যাই? আমি কি পাগল হয়ে যাব? ভাই, আমার বুকের উপর হাত রেখে দেখত হার্ট টা

চলছেতো? বন্ধ হয়ে যায় নি? ঠিক চলছে? কেন আমি তবে এমন হলাম? বলতে ভাই বলতে?" অমরনাথকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সমর বললে, অধীর হয়োনা ভাই। মনকে একটু স্থির কর। আমার একটী অনুরোধ, তুমি আর ভেবোনা। একটু স্থির কর মনকে।"

অমর—"মনকে স্থিরতো আমি করেই আছি ভাই; কিন্তু শূন্যতাকে কি করে পূর্ণ করি। যে দিকে চাই সেই দিকেই শূন্যতা, কেবলই শূন্যতা। চারিদিকে কেবল হাহাকার কেবলই যে মন কেঁদে কেঁদে ওঠে ভাই। কেন এমন হয় বলতে পার?"

সমর—"দেখ ভাই, আমার সঙ্গে কে এসেছেন। এঁর সঙ্গে একটু আলাপ কর, অনেক আনন্দ পাবে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বস। শোন।" অমর—"বল, কি বলবে বল। আমি বেশ আছি। বল?" সমর—"সেদিন যখন তোমার কাছ থেকে ফিরলাম, রাস্তায় হঠাৎ একটী গাড়ীর ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যাই। তারপর আর কিছু জানি না। যখন জ্ঞান হল তখন সামনে দেখি এই দেবীকে। এঁরই সেবায় এখনও আমি বেঁচে আছি।"

রেবা—"আপনার কেবল ঐ এক কথা। আমি দেবী টেবী নই।" অমরনাথের অবস্থা দেখে রেবার মনে খুবই দুঃখ হ'ল। যদিও অমরনাথের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়, তবু সে তার স্বভাবগত কোমল ভাবকে চাকতে পারলনা। সে অমর নাথকে বললে, "আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব কি? আপনি এমন করে আপনার শরীরটা নষ্ট করছেন কেন বলুনতো? সংসারে দুঃখ কষ্টতো সকলেরই আছে।"

অমরনাথের রেবার কথাগুলি খুবই ভাল লাগল, সে চাইল রেবার কাছে নিজের দুঃখের বোঝা একটু হালকা করতে। তাই সে বললে, "আপনার সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। আপনি আমার কথাগুলি কি ভাবে নেবেন তা জানি না—তবু শুনুন। আপনি কি বলতে পারেন আমার মত লোকের সুখ কোথায়? আমি যে আগুন জ্বালাল। জানেন, আজীবন একভাবে সংসার ক'রে গিয়েছি নিজের দিকে কখন দেখিনি—যেটাকে আমি সুখ বলে ধরতে গিয়েছি সেটার দ্বারাই আমার দুঃখের বেদী গড়া হয়েছে। মনে হয় কি জানেন?—বুকের পাঁজরাগুলি সব ভেঙ্গে গেছে। জানেন, এই বুকের ভেতর কিসের আগুন জ্বলছে? পারছিনা, আর এ শূন্যতা সহ্য করতে পারছি না। এর কিছু উপায় বলে দিতে পারেন?" রেবা অমর নাথের কথাগুলি শুনে খুবই ব্যথা পেল। সমর নাথকে চুপি চুপি বললে, "দেখুন দাদা, এরূপ ভাবে দিনকতক একা থাকলে ইনি একেবারে পাগল হয়ে যাবেন। এর একটু সেবা শুশ্রূষা দরকার। তাহলেই ইনি ভাল হয়ে উঠবেন।" সমর রেবার কথা শুনে খুব খুশী হয়ে বললে, "আমারও তাই বিশ্বাস। তুমি এর ভার নেবে? আমার এই বন্ধুটীকে ভাল করে তুলবে? এই জন্যই আমি তোমাকে এখানে এনেছি রেবা, পারবে? তুমি পরোপকারী, সেবাই তোমার ধর্ম্ম—পারবে রেবা? বড় ভাল লোক।" অমরনাথ আবার জ্ঞান হারিয়ে হাসতে লাগল "হাঃ, হাঃ হাঃ—বিরাট অন্ধকার। কই আলো আলো, আলো আলো। আর যে অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না।"

রেবা—"আপনি শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

অমরনাথ—"হ্যাঁ। শোব। আর যাতে আমাকে উঠতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন। আপনি গান জানেন? একখানি গান,—খুবই শান্তি পাব।"

সমর—"রেবা দেখছতো। গান সত্যিই বড় ভালবাসে। ওকে একখানি গান শুনাবে রেবা?"

রেবা—"না, না, এতে কোন দোষ নেই। ওঁকে একটু সুস্থ করতেই হবে। যা' জানি আমি গাইছি।"

রেবার গান

মনরে তুই বাঁধবি বাসা কোনখানে
এ পথের নেই ঠিকানা
কোথায় গেছে কে জানে॥

অন্ধকারে প্রদীপ হাতে
আসবেনা কেউ সাথে সাথে
ওঁরে তোর একা, একাই চলতে হবে
সেই অচেনা সন্ধানে।
বাঁধবি বাসা কোনখানে॥"

অমরনাথ—"বেশ গান। 'এ পথের নেই ঠিকানা, কোথায় গেছে কে জানে।' বাঃ বেশ। একাই চলতে হবে সেই অচেনা সন্ধানে। ঠিক বলেছেন।"

সমর—"শুয়ে পড়, ভাই। গানখানা তোমার খুবই ভালো লেগেছে, না?"

অমর—"চল মুক্ত বাতাসে। মুক্ত আলোতে চল। চল নিয়ে চল। প্রাণ গেল—প্রাণ—বাতাস—বাতাস—আলো—আলো!"

অমরনাথ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। রেবা, দীনু, সমর সকলে তার সেবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চার

সমরনাথ এখনও বাড়ি ফেরেনি। অমিয়া খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে; কিন্তু মুখে কোনও কথা প্রকাশ করছে না। ঘুরে ঘুরে এ ঘর ও ঘর করছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবে—"আর সহ্য হয় না। কত জ্বালাতন সহ্য করব জানি না। আমার মরণও হয়না।" দুঃখের অশ্রু তার গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। এমন সময় সবিতা এসে দাঁড়াল মা'র পিছনে—বললে, "মা, তুমি কাঁদছ? বাবা নিশ্চয়ই কোথায় আটকে গেছেন।"

অমিয়া মনের ভাব গোপন ক'রে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—"কাঁদতে আমার বয়ে গেছে। ওঁর জন্ত ভেবে ভেবে আমি মরে গেলাম আর কি? আর আমাকে জ্বালাস নে। একে জ্বলে মরছি, তার উপর তোর ঝোঁড়ন আর সহ্য হয় না।" অমিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সমর এলো ঘরের ভেতরে। অমিয়া দেখেও দেখলো না।

সবিতা—"মা—ওমা দেখ, বলতে না বলতেই বাবা এসে হাজির। তুমি অনেকদিন বাঁচবে বাবা।" সমরনাথ স্ত্রীর অবস্থা দেখে সবিতাকে জিজ্ঞাসা করল "হ্যাঁরে তোর মার কি হয়েছে? অসুখ করেছে বুঝি?"

অমিয়ার ভাবনা চিন্তা এখন রাগে পরিণত হয়েছে, বলে উঠল, "থাক, থাক। কি মনে ক'রে বাড়ীতে ঢুকলে বল দিকি। মুখ দেখাতে লজ্জা হ'ল না? যেখানে ছিলে এতদিন সেইখানেই যাও না।"

সমর—"আহাহা অত রাগ করছ কেন? আগে শোন আমার কথা তারপর যত পার রাগ করো।"

অমিয়া—"শোনা শুনির আর দরকার নেই। চের হয়েছে। যাও যেখানে ছিলে সেখানেই যাও আমার আর রাগ বাড়িও না। আর কত জ্বালাবে।" অমিয়া আর চাপতে পারলে না; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সমর খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল, মনে মনে ভাবে "এ আবার কি হ'ল! কি অদৃষ্ট আমার! কোথায় ছিলাম—কি হয়েছিল জানবে না নিজের রাগ নিয়েই ব্যস্ত। হায়রে সংসার! কেউ একে আঁকড়ে ধরতে চায়—আবার কেউ একে ছাড়বার জন্ত ব্যস্ত।"

সবিতা—"বাবা একি? তোমার পায়ে, হাতে, মাথায় এসব কিসের দাগ? কি হয়েছিল তোমার? মা, মা দেখ বাবার কি দশা।

অমিয়া—"যা, যা খুব হয়েছে। আর পারি না।"

সমর—"অত রাগ কেন বলত? আমি এলুম, একটু চা টা খেতে দেবে না?"

অমিয়া—"পারবনা আমাকে আর জ্বালিও না। তোমার দরদী মেয়ে আছে তাকে বল।" অমিয়া চলে গেল অন্ত ঘরে অপর দিক দিয়ে এলো নরেন। সমরকে দেখে বললে—"কতক্ষণ এসেছেন? আপনি কেমন আছেন? আপনার কপালে ওসব কিসের দাগ?" নরেন এলে সবিতা বললে তার বাবাকে "তোমরা গল্প কর, আমি ততক্ষণ তোমার খাবার জোগাড় করিগে।" সবিতা চলে গেলে সমর বললে, "বাবা, সে অনেক কথা। সেদিন অমরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিলেম। তাকে সুস্থ ক'রে যখন ফিরি তখন আমি খুবই

অন্যমনস্ক ছিলাম। একটি গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। তার পর একটী মহিলা তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমার সেবা শুশ্রূষা করে আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন।" নরেনের সব খবর পূর্বেই জানা ছিল, কিন্তু বলে শুধু সমরকে বললে "তাঁকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ।"

সমর—"শুধু ধন্যবাদে তাঁর ঋণ শেষ হবে না বাবা। তিনি একটী মূর্তিমতী দেবী। সংসারে এখনও এমন আছেন যাঁরা পরের জন্য প্রাণ-পাত করতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা সেবাকেই সকলের বড় ধর্ম বলে মনে করেন। তাঁরা পরের সুখের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে ধন্যা মনে করেন। এই-ই নারীত্ব, এই নারীর আসল বৃত্তী।"

তৃতীয় অধ্যায়

(এক)

নদীর ধারের একটী গ্রাম্য পথ। সূর্য অস্তগামী। রাখাল ছেলেরা ও কৃষকেরা নিজেদের কাজ সেরে চলেছে গ্রামের মেঠো রাস্তা দিয়ে। দিনান্তের কাজের পর মনের আনন্দে তা'রা গান ধরেছে। মাঝে মাঝে গরুগুলিকে তাড়না করতে করতে চলেছে।

অনিলও চলেছে সেই রাস্তা দিয়ে সমরের বাড়ীর দিকে। অমরনাথের অবস্থা খুব ভাল নয় তাই তাকে খবর দিতে। কোন দিকে বাড়ী সে জানেনা। রাখালদের পিছনে একটী কৃষক লাঙ্গল কাঁধে যাচ্ছিল আপন মনে। অনিল তার সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞেস করল "ওহে শুনছ, সমর বাবুর বাড়ীটা কোন দিকে বলতে পার?"

কৃষক—"কি বলছো বাবু?"

অনিল—"সমর বাবুর বাড়ীটা কোন দিকে?"

কৃষক—"তুমি বাইরের লোক বুঝি? তোমার বাসা ক'নে? মোরা খাই দাই গ্রামেই থাকি। বড় কষ্ট শুদের।"

অনিল—"তা কষ্ট বেশ বুঝতে পারছি। সমর বাবুর বাড়ীটা কোথায় বলতে পার?"

কৃষক—"গরুগুলো এদিকে ওদিকে যায় বড় হায়রাণ করে আমাকে, বুড়ো মানুষ সামলাতে পারতেছিনা।"

অনিল—"তুমি কানে শুনতে পাওনা বুঝি?"

কৃষক—"কি বললে? বুড়ো হলেও আমি গরুগুলো সাম্‌লাতে পারি। কারুর ক্ষেতে আমার গরু যায় না।"

অনিল—"ভাল মুস্কিলে পড়া গেল। কা'কে জিজ্ঞেস করি বুঝতে পারছিনা—এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে।"

কৃষক—"এ সময়ে ও সব আর ভাল লাগে না। যাও যাও, আর বকতি পারতিছিনা। গরুগুলো আগে গেছে। এখন ভাবনা দিতি হবে—সন্ধ্যা হয়ে আসতিছে।" কৃষক আর অপেক্ষা করল না।

অনিল—কোন দিকে যাই বুঝতে পারছিনা। অদূরে সমর নিজের বাড়ীর সামনের রাস্তাতে পায়চারী করছিলো. তাকে দেখে অনিল ডাকলে, "সমরদা।" সমর—"এই যে অনিল বাবু, হঠাৎ কোথা থেকে? এখানে কি মনে করে? অমর কেমন আছে? বেবার খবর কি?"

অনিল—"সেই সব খবর দিতেই এসেছি। আপনাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে।"

সমর—"কেন? কি হ'ল? অমর ভাল আছেত?"

অনিল—"যেদিন আপনি আসেন সেই দিন তিনি একটু সুস্থ ছিলেন; কিন্তু তার পর থেকে তাঁর অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। তাঁকে নিয়ে আমরা খুবই মুস্কিলে পড়েছি। বেবা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। মাঝে মাঝে একটু তাল হ'ন আবার যে কে সেই।"

সমর—"আমারও মহা মুস্কিল। এখন ঘর সামলাই কি বাইর দেখি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। চলুন ঘরে গিয়ে সব কথা হবে।" সমর অনিলকে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীর দিকে।* [ক্রমশঃ]

---

* এর গানখানি পিনাকিরঞ্জন কর্মকার আমার জন্য লিখিয়াদিয়াছেন, সে জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ— লেখক।

সিন্ধুর ডাক

কণপ্রভা ভাদুড়ী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পূর্বানুবৃত্তি)

উনিশশো তেতাল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী। আজ স্বাধীনতা দিবস। দূরে থেকে ভেসে আসে তুমুল কলরব। চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চরকা অংকিত জাতীয় পতাকা। রাজপথে দলে দলে মিছিল যাচ্ছে, ছাত্রেরা জয়ধ্বনি করছে—"বন্দেমাতরম" "মহাত্মা গান্ধীকি জয়" ইনকিলাব জিন্দাবাদ"

দমদম সেন্ট্রাল জেলের এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে সূর্য। ও ভাবছে গত দুই বৎসর আগের এক বেদনাময় ছাব্বিশে জানুয়ারীর কথা। ভারত সরকারের অতি ধূর্ত পুলিশবাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে বাংলার এক বিপ্লবী সন্তানের অতি রহস্যজনক ভাবে অন্তর্ধানের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যেদিন, সেদিনও ছিল এই ছাব্বিশে জানুয়ারী। সূর্য সেদিন দুঃখ করেনি; আর আনন্দিতও হয়নি। মনে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল তাঁর মঙ্গলের জন্য। সূর্য তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট সে সম্মানের সঙ্গে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করছে। তবুও কৃষ্ণশরণকে সে সুখী করতে পারেনি, কিন্তু কমলাকে সুখী করেছে। সে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে হঠাৎ একদিন তার নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট এসে হাজির। বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনে সে নাকি ট্রাম পোড়ানোর দলে ছিল। হিংসাত্মক কাজে সূর্য কোনও দিনই মনে উৎসাহ পায়না—সে চায় সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে, মারতে, হাসিমুখে মরতে, তবুও পুলিশের কথা বেদবাক্য। তার নড়চড় হবার উপায় নেই। নির্দোষী সূর্য বিনা বিচারে বন্দী হোল। উমারাণীর কাছে সে চোখের জলে বিদায় নিল। শিউলী শুধু তার হাতখানি চেপে ধরে বললে, "এস"—

আর সুদূর পূর্ব বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর প্রসিদ্ধ চৌধুরী বাড়ী যখন এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছালো, তখন কমলা আর ইহলোকে নাই। গত রাত্রে দুইদিনের কলেরায় তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। কাজেই তাঁকে এ অশুভ সংবাদ আর শুনতে হয়নি। সদ্য শোক-তপ্ত কৃষ্ণশরণ এ সংবাদে আরও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নায়েব ভুবন সরকারকে ডেকে কোলকাতায় গিয়ে তার খালাসের ব্যবস্থা করতে বললেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যুগের দাবীকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কৃষ্ণশরণের যে নেই, একথা তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নূতন করে উপলব্ধি করলেন। কৃষ্ণশরণের সেদিন নূতন ক'রে মনে পড়ল জ্ঞান-শরণকে আর তাঁর গর্বিতা নাস্তিক স্ত্রী হিমানীকে। তাদেরই ছেলে সূর্য; তাদেরই সেই উদ্ধত, অবিশ্বাসী, অপ্রতিহত রক্তস্রোত সূর্যর দেহের শিরা উপশিরায় নিত্য প্রবহমানা; তাকে বাধা দানের ক্ষমতা তার নেই। যেমন হিমানীকে তিনি চৌধুরী পরিবারে বন্দী করতে পারেন নি; তেমনি সূর্যকেও পারবেন না। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবে কে? আজ কমলাও নেই; কে তাঁর পাশে এসে বসবে; কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে? পাথর ফেটে যেমন নির্ঝরের ধারা ছোটে, তেমনি তাঁর শুষ্ক বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে আসে একটী শব্দ—"ভবানী, ভবানী"—

জেলে বসে সূর্য চৌধুরী বাড়ীর এ অবস্থার কথা বিন্দু-মাত্রও জানতে পারল না। শুধু ভুবন সরকারের কাছে শুনল কমলা নেই। সূর্য শয্যার উপর লাফিয়ে উঠে বলল। "কাকীমা নেই?" কাকীমাকে সে আর দেখতে পাবে না? আর একবারও না? একদিনও না? কেন এমন হোল? কেন, কেন, কেন? সূর্যর মাথার

মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল, ধীরে ধীরে চোখের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে এল। সূর্য জ্ঞান হারাল। হায়রে রাজার শাসন নিয়ম, শৃঙ্খলা, আইনের পরকাষ্ঠা। নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করার অপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করেছে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা। জেলার, সেই আইন এবং নিয়মের অছুহাতে ভুবন সরকারকে অচৈতন্য সূর্যর কাছ থেকে সরিয়ে জেলের ফটকের বাহির ক'রে দিল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য লাভ করল নূতন এক বলিষ্ঠ মন।

মাঘ মাসের হাড়-কাঁপানো পারুণ শীত। সূর্য সামান্য একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে বসে গীতা পড়ছিল। হঠাৎ রাজপথে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মুক্তির জন্য ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন সময় জেলার এসে তাকে জানিয়ে গেল কাল সকালে সে "মুক্তি পাবে"।

সূর্য আবার গীতার একাদশ অধ্যায়ে মন দিতে চাইল; কিন্তু চঞ্চল মন কিছুতে আর স্থির হোল না।—ছুটে যেতে চায় রাজপথে স্বাধীনতা উৎসবের মিছিলের অগ্রভাগে।

দীর্ঘ নয় মাস পর সূর্য আবার ফিরে এল বাগীগঞ্জ-প্লেসের সেই পরিচিত বাসভবনে। সূর্য যেমন যা দেখে গিয়েছিল সবই সেই রকম আছে, তবু যেন কি নেই, সূর্য তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা। উমারাণী তার মস্তক চুম্বন করে বললেন, "কি রোগা হয়ে গেছিস রে সূর্য; এই চেহারা নিয়ে কি ক'রে বাড়ী যাবি? কেষ্টদা দেখে কি বলবে?" মায়ের কাছ থেকে পলাশ তাকে ঠেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। প্রথমেই পলাশ বললে, "দেশের অবস্থা এখন অত্যন্ত সঙ্কটজনক সূর্য—আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। তোর প্রস্তুত হতে কি সময় লাগবে?"

ম্লান হেসে সূর্য বললে, "আমি ত সকল সময়ের জন্যই প্রস্তুত পলাশদা"। পলাশ বললে, "যার জন্য আমার অনেক সময় মিছামিছি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার হয়ত আবার শ্রীঘরে যেতে হতে পারে সূর্য। তোকে একবার বর্দ্ধমান যেতে হবে; আমাদের আফিসে কতকগুলো কাগজপত্র পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য"

অকম্পিত স্বরে সূর্য বললে, আমি প্রস্তুত পলাশদা; তুমি যখনই বলবে তখনই যাবো"।

পলাশ বললে, "আচ্ছা তবে আজ সন্ধ্যার সময়ই চলে যা"।

সূর্য দেখল কাজ ছাড়া পলাশের মনে অন্য কোনও চিন্তা নেই। সে বললে "শিউলী কোথায় পলাশদা? তাকে ত দেখতে পাচ্ছিনা?"

শিউলীর কথায় পলাশ কেমন যেন একটু চকিত হয়ে উঠল। সূর্য সেটা লক্ষ্য করলনা। "কি জানি সূর্য, সে সব সময় তার কলেজ আর পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। আমার সঙ্গে দেখাই তার হয়না। শুধু পড়া বোঝাবার সময় একআধ-বার রাত্রে আসে; তাও যেন ঝড়ের মত" সূর্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ও চিরদিনই ওই রকম প্রকৃতির পলাশদা। নিজে যা ভালো বুঝবে তাই ভালো, অন্যের কথা আমলেই আনতে চায়না—"পলাশ বললে, "কিন্তু ওরকম অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলা ত ভালো নয়। আমার মনে হয় সূর্য, ওর মতবাদের ভেতর কিছু ভ্রান্তি আছে"।

সূর্য বললে, "হয়ত আছে। ও হয়ত সেটাকে ভ্রান্ত বলে নাও মানতে পারে—"

পলাশ দৃঢ়স্বরে বললে, "কিন্তু আমাদের কি উচিত নয় ওর ভুল ভেঙ্গে দেওয়া?" সূর্য বুঝতে পারেনা, শিউলীর ব্যাপারে পলাশের এই অহেতুক উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? শিউলীর সঙ্গে কি ওর কোনও মনোমালিন্য ঘটেছে?

সূর্য কি বলবে বুঝতে না পেরে পলাশের মুখের দিকে তাকাল। দেখল, সে তখন অন্যমনস্ক ভাবে সংবাদ পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সূর্য আমতা আমতা ক'রে বললে, "শিউলী কি তোমার কথা অমান্য করেছে পলাশদা?"

পাতা ওলটাতে ওলটাতে পলাশ বললে, "তার সঙ্গে আমার দেখাই বা হচ্ছে কোথায়?" সূর্য বললে, "দাঁড়াও তাকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি এখুনি—"

পলাশ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "না সূর্য থাক—"একটু থেমে সে আবার বললে, আমি এখন একটু বেরোচ্ছি সূর্য; সন্ধ্যের সময় আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে—"

পলাশ বেরিয়ে গেল। সূর্য সেখানে আর অপেক্ষা না করে শিউলীর সন্ধানে গেল। কিন্তু শিউলী তখন বাড়ী ছিল না। ও ক্ষুণ্ণ মনে ভাবলে, "আমি এতদিন পরে বাড়ী এলুম, শিউলীর একবার দেখা করারও সময় হোলনা।"

খাওয়া দাওয়া সেরে সূর্য একবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল। শিউলী দুপুর বেলা বাড়ী ফিরে, উমারাণীকে জিগ্যেস করল, "মাসীমা সূর্যদা কোথায়?" উমারাণী বললেন, "তোকে সে কতক্ষণ খুঁজলো রে শিউলী; তারপর—ভাত খেয়ে এইত বেরিয়ে গেল—"

শিউলীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। আহা এতদিন পরে সূর্যদা বাড়ী ফিরল, আমার সঙ্গে একবার দেখাই হোলনা তার। সূর্যর সঙ্গে নাইবা হোল ওর মতের মিল; তাই বলে কি মানুষকে ভালোবাসতে নেই? শিউলীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতি শৈশবে দেখা তাদের দেশের বাড়ীতে নাট্যমঞ্চের নিকট দণ্ডায়মান একটী ভীরু বালকের সুন্দর মুখ। আহা একা একা নির্মমা হয়ে বসে বসে বেচারা এতদিন কত কষ্টই না পেয়েছে? উমারাণী তখন নিজের মনেই বলছেন, "ওদের কি একটু জিরোবার সময় আছে? এই আজ এল, আবার আজই সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানে যাবে—"

ওকে নিরুত্তর দেখে উমারাণী আবার বললেন, "তোরা যে সারাদিন কোথায় কি কাজে ঘুরে বেড়াস, আমি ত বুঝতে পারিনা বাপু—"

উমারাণীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে শিউলী বললে, "এই সহজ কথাটা তুমিও যে কেন বুঝতে পারছ না, আমিও ত বাপু জানিনা—"

উমারাণী গালে হাত দিয়ে বললেন, "সহজ কথা কোনটা রে? সেদিন শিবপুরের মাঠে, সেই হাজার হাজার লোকের সামনে টেবলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে যখন তুই বক্তৃতা দিলি, আমি তার এক বর্ণও কিছু বুঝতে পেরেছি? আমরা সেকালের হাবা গোবা মেয়ে, একালের মেয়েদের চাতুরী কিছুই বুঝিনা—"

তাঁর কথা বলার ভঙ্গী দেখে শিউলী হেসে ফেলল। কিছু না বলে ভালো করে তাঁর কোল ঘেঁসে শুয়ে রইল। উমারাণী তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, "না শিউলী হাসি নয়, ভেবে দেখ, এখন তুই আর সেই ছোটটি নেই। বড় হয়েছিস—তোর মা বাবা আমায় লিখেছেন, তোর বর খোঁজার জন্য। বর পেলেই তাঁরা বিয়ে দিয়ে দেবেন। কিন্তু এসময় সারাদিন পথে পথে ঘুরে বক্তৃতা করে বেড়ানো কি ভালো?"

শিউলী কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করল না। ঠোঁট উল্টে বললে, "হ্যাঁ বিয়ে দেব বললেই হোল; বিয়ে করছে কে শুনি?"

উমারাণী গম্ভীর হয়ে বললেন, "না শিউলী ঠাট্টা নয়; আমার কথা শোন্"। শিউলীর চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে এসেছে। সে ক্লান্ত স্বরে বললে, "ওসব বিয়ে টিয়ের কথা আমায় বোল না মাসীমা। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। উমারাণী তার নিদ্রিত শ্রান্ত করুণ মুখখানির পানে চেয়ে রইলেন। পরের বোঝা দামলাতে দামলাতেই তাঁর জীবন গেল। এ মেয়ের পাত্র সংগ্রহ করা কি মুখের কথা? তার বাপ মা ত তাঁর উপর তার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। তিনি এখুনি ওর পলাশের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু তাঁর যা সন্ন্যাসী ছেলে, বিয়ে করতে রাজী হবে কি? এক সূর্যর সঙ্গে দেওয়া যায়; তবে তাতে দুজনের বয়স বড় কাছাকাছি হয়ে যাবে। অথচ শিউলীর বিয়ে এখন না দিলেই নয়। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর যত খুশী সভা সমিতি, বক্তৃতা আর বিবৃতি প্রচার কর তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। ক্রমে বেলা গড়িয়ে আসে, কিন্তু উমারাণীর ভাবনার আর শেষ নেই। তাঁর এক একটী ছেলে মেয়ে এক এক রকম।

সমস্ত বিকেল বেলাটা শিউলী অধৈর্য হয়ে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু সূর্যর দেখা নেই। অবশেষে সন্ধ্যার

কিছু আগে সে কলঘরে গেল গা ধুতে। কোনও রকমে গা ধুয়ে বাইরে আসতেই খবর পেল, সুধ এসেছে। তিন-তলায় পলাশের ঘরে আছে।

ওর তখনও চুল বাঁধা হয়নি। না হোক, কোনও রকমে শাড়ীটা পরে নিয়ে পিঠে চুল এলিয়ে দিয়ে ও ছুটল তেতলায় পলাশের ঘরে। তখন ওরা সন্ধ্যা। উমারাণী ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা দিচ্ছেন; শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে কাদের মন্দিরে ঠাকুর আরতি হচ্ছে; শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দুইহাতে ভেজানো দরজা ঠেলে শিউলী ঘরে ঢুকল। কিন্তু সেখানে সুধ কই? শুধু পলাশ চৌকীতে বসে কি সব কাগজ পত্র দেখছে। শিউলী বললে, "পলাশদা, সুধ কই?"

পলাশ চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল। বললে "সুধ নেই, বর্দ্ধমান গিয়েছে? "শিউলী বললে, "কবে ফিরবে পলাশদা?"

পলাশ বললে, "কালই তোর বেলা ফিরবে। তোমার কি তার সঙ্গে খুব দরকার আছে শিউলী—?"

নতমুখে শিউলী বললে, "না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলুম—"

তাকে চলে যেতে দেখে পলাশ বললে, "যেওনা শিউলী বোসো—"

শিউলী ফিরে এসে চৌকীর একধারে বসল।

পলাশ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি আমার কাছে আর পড়তে আসোনা কেন শিউলী?"

শিউলী জানতো, তাকে এই রকমই কোনও অভিযোগ শুনতে হবে। তাই পলাশের কথায় সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "মোটে সময় পাইনা পলাশদা, পড়াশুনা আমার মোটেই এগোচ্ছে না—"

"কেন শিউলী," পলাশ বললে, "কি এমন তোমার কাজ পড়েছে?"

"কাজ তেমন কিছু বেশী করতে হয়না। সকলে যেমন করে, আমিও তেমনি করি।" শিউলী বললে, "অসীমদা, কতগুলো বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন আমার উপর, তাই পার্টি আফিসে আমায় অনেকক্ষণ করে থাকতে হয়"

পলাশ আত্মগত ভাবে বললে, "তোমার অসীমদা; মানে অসীম সোমকে সবাই চেনে। বাজারে তার তেমন সুনাম নেই—"

শিউলী মনে মনে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল, আজ আর পলাশের সঙ্গে কোনও মতবিরোধ নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করবে না। কারণ এই রাজনীতির মতবিরোধ নিয়ে পলাশের সঙ্গে ওর প্রায়ই বচসা হয় এবং সেই জন্যই ও পলাশের সান্নিধ্যে খুব কমই আসে। পলাশকে ও যথেষ্ট ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওর স্বভাবের উগ্রতাকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ও ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "তোমার ওই এক দোষ পলাশদা, সকলের নিন্দা করা"—

"শোন শিউলী, রাগ কোরোনা, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও"—পলাশ বললে।

শিউলী মনকে কঠিন করে নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

পলাশ বললে, "তুমি কি তোমার ওই অসীমদাকে ভালোবাসো শিউলী"?

শিউলী স্প্রীংএর মত ছিটকে উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে সে বলল, "মানুষের সন্দেহের একটা সীমা থাকে; কিন্তু আপনার তাও নেই পলাশদা। আপনারা মুখেই শুধু প্রগতিবাদের শ্রাদ্ধ করেন। কাজে কিছুই নয়। এখনও সেই একশো বছর আগেকার পুরানো রক্ষণশীল মন আপনার রয়েছে। তাই নারী পুরুষকে একত্র দেখলেই আপনার মনে আগেই জাগে হীন সন্দেহ। ছিঃ, এই জন্যই আমি আপনার কাছে আসিনা"—

পলাশ যা জানতে চেয়েছিল, জানা হয়ে গেল। না, শিউলী অসীমের প্রতি অনুরক্ত নয়। মন তার খুসীতে ভরে উঠল। কিন্তু এইবার সত্যই বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে। গমনোদ্যত শিউলীকে হাত ধরে ফিরিয়ে সে বললে, "শিউলী তুমি কি কাউকে ভালবাসো?"

পলাশের মুঠোর মধ্যে শিউলীর হাত কেঁপে উঠল। অনন্ত চোখে ও পলাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখের তারায় ঝক ঝক করছে মৃদু হাসির রেখা। ও কোনও কথা বলতে পারল না। রুদ্ধ আক্রোশে শুধু মনে মনে গর্জাতে লাগল। পলাশ বললে, "আচ্ছা বোঝা গেল, তুমি কাউকে ভালবাসো না। কিন্তু তোমায় কেউ ভালোবাসে বলে কি টের পেয়েছ শিউলী?"

রাগে শিউলী এবার বুঝি সত্যিই ফেটে পড়বে। অসভ্য ছেলেটা এমন শক্ত করে হাত ধরে আছে, শিউলীর সাধ্য কি সে বাঁধন খুলতে পারে? বেহায়ার একশেষ, এখনও হাসছে—মিছা ধ্বস্তাধ্বস্তি, শিউলীর হাত লাল হয়ে উঠল। ও চিৎকার করে বললে, "আমার হাতটা ছাড়বেন কি না বলুন?"

পলাশ ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ঠিক এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপরই সজোরে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, "শিউলী আমার দিকে তাকাও, তাকাও শিগ্‌গীর, আর সময় নেই"।

পলাশের প্রশস্ত বুকের মধ্যে শিউলীর তন্বী দেহলতা থর থর করে কাঁপতে লাগল। এই সময় ওর হঠাৎ মনে পড়ল, ইংরেজ সরকার যাদের স্বদেশী ডাকাত বলে, পলাশ নিশ্চয় সেই দলের লোক—ও ভয়ে ভয়ে পলাশের মুখের দিকে তাকাল। পলাশ তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে শিউলীকে বিদ্ধ করে বললে, "শোন শিউলী, আমি তোমায় ভালোবাসি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি। আমার যদি কোনদিন সময় হয়, তখনই আমি তোমায় বিয়ে কোরবো। বল, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরবে?"

"একি জুলুম?" প্রতিবাদের ব্যর্থ ইচ্ছা শিউলীর বুকের মধ্যে গুমরে মরতে লাগল। পলাশ কি যাদু জানে নাকি?—শিউলী তার বুকের মধ্যে থেকে সরে আসতে পারছে না কেন? শিউলী একজন নাম করা সোস্যালিষ্ট মেয়ে, ভয় কাকে বলে সে জানে না—তবে আজ তার সব শক্তি গেল কোথায়? এমন সময় ভীরু কণ্ঠে শিউলী বললে, "আমি সূর্যকে ভালোবাসি পলাশদা—"

পলাশ গর্জে উঠল। বললে, "না, তুমি আমাকে ভালোবাসো। তুমি আমার, তুমি সূর্যর নও। বুঝেছ শিউলী?" নত হয়ে শিউলীর ঠোঁটে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে পলাশ তাকে ছেড়ে দিল। তারপর টেবল থেকে একটি এ্যাটাচি কেস তুলে নিয়ে বললে, "চল্লুম শিউলী, যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে"—

কাঠের সিঁড়িতে পলাশের পদশব্দ মিলিয়ে গেল। শিউলী ধীরে ধীরে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াল। কয়েক মিনিট পর, সম্পূর্ণ অপরিচিত পোষাকে, দ্রুতপদে পলাশ জানলার নীচ দিয়ে চলে গেল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিউলী যেমন ধীর পায়ে জানলার ধারে গিয়েছিল, সেইভাবেই ফিরে এসে ঘরের আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে, নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ল। ওর অশান্ত মন কিছুতে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল? শুধু এক-একবার যেন মনে হচ্ছে, কে যেন ওর কি একটা জিনিষ কেড়ে নিয়ে গেল, আর তার বদলে একটা কি বস্তু দিয়ে গেল,—শিউলী সেটা কিছুতে বুঝতে পারছে না? কি, কি, সে কি জিনিষ? বলনা নিষ্ঠুর তুমি আমায় কি করে গেলে? আর করলেই যদি, আর একটু থাকলে কি ক্ষতি হোত? এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে কেন? শিউলী বালিশে মুখ চেপে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। দুরন্ত উত্তুরে হাওয়ায় ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ছে বাদাম গাছের শুকনো পাতা। তারা যেন বলছে, "কাঁদো শিউলী, কাঁদো, বসন্ত না আসা পর্যন্ত কাঁদতে ত হবেই।"

মন্বন্তরের বিভীষিকাময়ী রাত্রি মহানগরীর সর্বত্র ভেসে বেড়াচ্ছে একটা হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের অস্পষ্ট শব্দ। সার্কাস এ্যাভিনিউয়ে একটী ট্যাক্সী ষ্টাণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াল একটী শিখ যুবক। একটী শিখ ড্রাইভার ট্যাক্সীর দরজা খুলে দিয়ে বললে, "আইয়ে হুজুর"।

গাড়ীতে উঠে বসে যুবক বললে "দমদম বিমান ঘাঁটি"

"ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বললে, "জী হুজুর"

যুবকের হঠাৎ মনে হোল, তার পিছনে কে যেন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে। সে যেন বলছে, "এমনি

করে আমার সবস্ব যদি লুটেই নিলে, তবে আর একটু থাকলে ক্ষতি কি ছিল?—অধীর হয়ে যুবক বললে, ড্রাইভার জল্‌দি রোকো; গাড়ী রোকো"

এ্যাকসিডেন্ট ব্রেক কষে ড্রাইভার তখনি গাড়ী থামিয়ে ফেলল যুবক লাফ দিয়ে রাস্তায় নেবে পড়ল। ধাবমান নেত্রে পিছন দিকে চেয়ে দেখল, যে আসছে সে শিউলী নয়—সে একটী মধ্যবয়সের রাহুগ্রস্ত সবহারা নারী; সে কেঁদে কেঁদে বলছে, "বাবু দয়া করে কিছু দিয়ে যান, আপনি রাজা হবেন।"

পলাশ আন্দাজে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে ভিখারিণীর প্রসারিত হাতে দিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসল। একটী সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরল। হায়, কে বলে বিপ্লবীদের প্রাণে প্রেম নেই?—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পলাশ নেই, পলাশ পালিয়ে গেছে, পলাশ নিরুদ্দেশ; সকলেই এ কথা বিশ্বাস করল—কিন্তু মায়ের মন কিছুতে সান্ত্বনা মানে না। গঙ্গাসাগর থেকে অখণ্ড পুণ্য অর্জন করে ফিরে এসে এই সংবাদ শুনে ঈশ্বরাণী শয্যাগ্রহণ কোরলেন।—তাঁর কোনও সান্ত্বনা নেই, সহিষ্ণুতা নেই। দিবারাত্র শয্যায় পড়ে ছটফট করেন, আর প্রলাপ বকেন; "পলাশ কোথায়? হ্যাঁরে সূর্য, জেলে গেলে কি এতদিনে খবর পাওয়া যেতোনা? নিশ্চয় যেতো। আমার মন বলছে, সে জেলে যায়নি, অন্য কোথাও গেছে, ভালো কাজেই গেছে। কিন্তু আমি মরবার আগে একবার কি তাকে দেখতে পাবোনা? হায় ভগবান! এই কষ্ট পাবার জন্যই কি সন্তান গর্ভে ধরেছিলুম?" পলাশ ফিরে আয়, লক্ষ্মী বাবা আমার, কিরে আয়!'—তাঁর আকুল আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে যায়। সূর্য আর শিউলী তাঁর দুইপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শিউলীর চোখে সর্বদা ফুটে থাকে কেমন যেন একটা ত্রাস্ত দৃষ্টি। সব সময় সে যেন কি একটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে। কি একটা অজ্ঞাত বোঝা ক্লান্ত ভাবে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সূর্য শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, কিছু বুঝতে পারেনা। ওর সেবা করার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। শুধু স্নান আর আহারের সময় ছাড়া সে ঈশ্বরাণীর শয্যা ছেড়ে বড় একটা ওঠেইনা। তার বন্ধু সহকর্মীরা এসে ডেকে ডেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অসীম সোম একদিন মহা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি এই বসে রইলুম, শিউলীর সঙ্গে দেখা না করে ফেরার আমার উপায় নেই—"

বিব্রত হয়ে সূর্য শিউলীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ভদ্রলোক কি বলছেন একবার শুনে এস, শিউলী"

শিউলী একমুহূর্ত ইতস্তত: করল, তারপর বললে, "আচ্ছা তুমি একটু মাসীমার কাছে গিয়ে বোসো সূর্য; আমি এখনি আসছি—"

সূর্য বললে, "তুমি ধীর স্থির মনে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ করে এস। আমি আছি পিসিমার কাছে—"

নীচেকার বসার ঘরে গিয়ে, শিউলী নমস্কার করে গম্ভীর হয়ে বসল।

অসীমদা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "এই যে শিউলী, একেবারে যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ, বাড়ী এসে দেখাই পাওয়া যায়না। ব্যাপার কি বলত?"

শিউলী বললে, "মাসীমার বড্ড অসুখ অসীমদা—"

"সেত আজ অনেক দিন হয়ে গেল।"—অসীম বললে, "বাড়ীতে ত অন্য লোকও আছেন। তোমার মত মেয়ের এভাবে কাজ নষ্ট করে ঘরে বসে থাকার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাইনা।"

শিউলী শান্তস্বরে বললে, "মাসীমা ভালো না হওয়া পর্যন্ত, আমি কোনও কাজ করতে পারব না অসীমদা—"

"এতে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় শিউলী—"অসীমদা গর্জে উঠলেন।

শিউলী নিরুত্তরে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তার উত্তর দেবার আছেই বা কি? সত্যইত ও নিজেদের পার্টির প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করছে—কেননা, এ কয়মাস কাজ সে একেবারেই করেনি। এমন কি কেন্দ্রীয় অফিসে পর্যন্ত যায়নি একবার। অথচ কেন যে সে যায় না,

আর কারণ সে নিজেও জানে না। ও শুধু এইমাত্র জানে, ওর ইচ্ছে করেনা কোনও কাজ করতে। মানে, যে কাজের মধ্যে অসীমদার সংস্পর্শ থাকবে সে কাজও নয়ই।

সাম্যবাদী, প্রগতিপরায়ণা, দুঃসাহসী মেয়ে শিউলীর হঠাৎ হোল কি? "শিউলী তোমার কি হয়েছে?" অসীমের গম্ভীর হলো কণ্ঠস্বর। শিউলী তবুও নিরুত্তর।

অসীম আবার বললে, "শোন শিউলী, আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ, তোমার মত মেয়ের এরকম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কোনই মানে হয় না—"

শিউলী এবার মুখ তুলে বললে "মাসীমার অসুখের জন্য মনটা বড় খারাপ রয়েছে অসীমদা—"

শিউলী, লক্ষ্মীটী! পৃথিবীব্যাপী এই ঘোর দুর্দিনের সময়, তুমি ঘরের চিন্তায় সময় নষ্ট কোর না। অসীম কাতর কণ্ঠে বললে, "দেখ, যুদ্ধ আজ আমাদের দোর গোড়ায় এসে পড়েছে। জাপানীদের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। সকলেই চায় জাপানীরা আমাদের দেশে আসুক; বৃটিশের অধীন থেকে মুক্ত হোক ভারতবর্ষ; কিন্তু আমরা ত বুঝিনা, বৃটীশের অধীন-মুক্ত হয়ে, আবার জাপানের অধীন হওয়ার মধ্যে কি গৌরব থাকতে পারে? বৃটীশ এখন ইউরোপের আর এশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে মহা বিব্রত, তারা আমাদের সাহায্য চাইছে; কিন্তু এ সময় ভারতীয় কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাদের সাহায্য করতে রাজী নয়। আমরা বৃটীশকে সাহায্য কোরবো, জাপানকে রুখবো—"

একটা বিজাতীয় হাসির আভাসে শিউলীর চাপা ঠোঁট একটু খানি বেঁকে উঠল। এতক্ষণে সে মুখ তুলে চাইলো। বললো, "আবার সেই দু'শো বছরের নতুন পরাধীনতা?"

তুমি ভুল কোরছো শিউলী, অসীম ক্ষুব্ধ স্বরে বললে,—"অন্যের কথা কানে নিয়ে নিজের প্রতি অবিচার কোরনা—শোন আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। খবর পাওয়া গেছে, বাংলাদেশে যেখানে যেখানে আমেরিকান সৈন্যরা এসে ছাউনী ফেলে বিমান ঘাঁটী তৈরী করছে—সেখানকার দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুর্ভোগের আর সীমা নেই। রাতারাতি তাদের উপর আদেশ দেওয়া হচ্ছে ঘর বাড়ী, জোত-জমী, ফসল পুকুর ছেড়ে চলে যেতে। তারা যাচ্ছেও চলে। যারা না যাচ্ছে তাদের বাড়ী থেকে জোর করে বার করে দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু ভাবোত সেই সব সর্বহারার দল এখন কোথায় গিয়ে থাকবে, কি খাবে? আমাদের উপর নির্দেশ এসেছে, চব্বিশ-পরগণা যাওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে স্থানীয় জমীদারের সঙ্গে পরামর্শ করে ওই সব দুঃস্থ পরিবারদের জমি বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে, তাদের থাকবার এবং খাবার সংস্থান করে দিয়ে আসার জন্য। পরশু রবিবার, আমি এখান থেকে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে রওনা হবো। আমি আশা করি শিউলী, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে—"

শিউলী মৃদু কণ্ঠে বললে, "মাসীমা যদি ভালো থাকেন, আমি যাবো অসীমদা—" বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অসীমদা চলে গেলেন। শিউলী ছুটে গেল উমারাণীর ঘরে তাঁর মাথা ধোয়াতে হবে বলে। সূর্য বা আনাড়ী, এতক্ষণ যে কি করে বসে আছে কে জানে? হ্যাঁ, কাজের লোক ছিল একজন। শিউলী দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

উমারাণী অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেকটা ভালো আছেন। যদিও জ্বর এবং বুকের বেদনা কিছুমাত্র লাঘব হয়নি, তবুও তাঁর অস্থিরতা আজ একটু কম আছে। সূর্য কলেজ থেকে ফিরে খেয়ে নেয়ে, যখন তাঁর শয্যা পার্শ্বে এসে বসল, তিনি তার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁরে সূর্য, পলাশের কোনও খবর পেলি?"

সূর্য তাঁর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "পাওয়া যাবে পিসিমা, শীঘ্রই পাওয়া যাবে। সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। আপনার অসুখের খবর জানতে পারলে পলাশদা যেখানেই থাক না কেন ঠিক চলে আসবে?"

একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, উমারাণী পাশ ফিরে শুলেন। তাঁর বন্ধ চোখের কোণ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল অজস্র ধারায় বেদনাশ্রু। ধীরে ধীরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্যকে এখন একবার একজন অধ্যাপকের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে হবে। ওকে এখন একবার উঠতে হবে। কিন্তু শিউলী কই? সে না এলে সূর্য ওঠে কি করে? উমারাণীর এক বিধবা বোন তাঁকে দেখবার জন্য এসেছিলেন। অবস্থা খারাপ দেখে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। পর্দা সরিয়ে সেই সময় ঘরে ঢুকলেন তিনি। সূর্য বলল, "মাসীমা আপনি এখানে একটু বসুন, আমি গিয়ে শিউলীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

মাসীমা বললেন, তুমি এস বাবা; আমি এখন দিদির কাছে থাকবো, শিউলীর পরে এলেই চলবে"।

সম্মতি জানিয়ে সূর্য ঘরের থেকে বেরিয়ে এল।

শিউলী কোথায়? সূর্য সমস্ত বাড়ী খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বসে পড়ল—তিনতালার খোলা ছাদে। আবার সেই সন্ধ্যার মায়া, আকাশের হাত ছানি, সুদূরের স্বপ্ন, অলস স্মৃতি মন্থন; সূর্যকে অভিভূত করে ফেলল। সূর্যর মন ছুটে চলে যায়, বহু যোজন দূরে, পাট আর ধান ক্ষেতে ঘেরা এক নিভৃত পল্লীপ্রান্তে; একটী পরিচিত গৃহাভ্যন্তরে। কিন্তু হায়, সেখানে এখন তার যাওয়া সম্ভব নয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে যখন কৃষ্ণশরণকে একবার দেখতে যেতে চেয়েছিল, তখন তিনি তাকে নিষেধ করে বলে পাঠিয়েছিলেন; এখন বাড়ী না এসে পুনরায় তাকে কলেজে যোগদান করতে। গ্রীষ্মের বন্ধে দেখে এলে ভালো হবে। তাঁর আজ্ঞা সূর্যের কাছে শিরোধার্য। বাড়ী যাওয়ার সমস্ত আকুলতাকে মনের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে সূর্য আবার নতুন করে গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হোল। জেল থেকে ফিরে এসে সূর্য আর তার পুরানো সহকর্মীদের ফিরে পেলো না। নেতারাও তখন সব জেলে। সূর্যর মনটা ভীষণ দমে গেল। কোনও কাজে উৎসাহ পায়না। আশা করেছিল, কেউ না থাক পলাশ থাকবে ওর পাশে, তারই সঙ্গে ও আবার নতুন উদ্যমে কাজ করবে; কিন্তু পলাশও রইল না। অতি আশ্চর্যজনক ভাবে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেউই আজ পর্যন্ত সে কথা জানতে পারল না। এক আছে শিউলী। যার সহযোগীতা ও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু শিউলীর সঙ্গে মতবিরোধের জন্য শিউলীর সংস্রব সাধ্যমত বাঁচিয়ে চলে। কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শকে ও মনে মনে সত্যই ভালোবাসে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যতটা পারে, সেই আদর্শ অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু ওদের মতবাদের উপর ওর কোনও আস্থা নেই। তবে একটা কথা ও জেলে বসে উপলব্ধি করেছে, সেটা হোল এই যে, দেশের গণজাগরণের উপর নির্ভর করছে স্বাধীনতার অগ্রগতি। দেশের গণশক্তির অচৈতন্য অবস্থার জন্য দায়ী তাদের রাষ্ট্র। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনেতা বিদেশী, তাদের কাছে আমরা আর কতটুকু আশা করতে পারি? ও দেখেছে কমিউনিষ্ট কর্মীরা সত্যই দেশের জনগণের মধ্যে কাজ করে;—তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে। তবে ওদের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব ও মতবাদ ও পছন্দ করে না, কাজেই ও শিউলীকে আর সহকর্মীরূপে পেতে চায় না। কিন্তু শিউলীর আজকাল হয়েছে কি? সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন বেদনা বিহ্বল ভাব। পার্টির কাজ কর্ম সে কিছুই করেনা। কলেজে ও নামে মাত্র যায়। উমারাণীর অসুখের অজুহাতে সেই যে বাড়ীতে বন্দী হয়েছে, একমাসের মধ্যে আর কোথাও বেরোয়নি। কি হোল তার, অসীমদার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য ঘটেছে কি? হতে পারে হয়ত। অসীমদার কথা মনে হতেই সূর্যর বুকের মধ্যে খচ্ করে উঠল, ওর মনে হোল শিউলীকে সেই গ্রাস করেছে। তার মনের স্বাভাবিক আনন্দানুভূতির বিকাশ যেন সেই ভদ্রলোক অপহরণ করেছে। শিউলী তার কাছ হতে বহুদূরে সরে গেছে। ও সূর্যর কেউ নয়। ওর কথা নিভৃতে চিন্তা করাও সূর্যর উচিত নয়। সূর্যর মনে পড়ল, সেই সীতাপুর গড়ে দেখা বালিকা চঞ্চলা শিউলীর কথা, তারপর কোলকাতার নতুন আলা কিশোরী ভীরু শিউলীর কথা—সেই শিউলীর সঙ্গে, আজকের শিউলীর কত তফাৎ। সেদিনের শিউলী সূর্যকে কত ভালোবাসত, কত অনুগত ছিল তার; আর আজকের শিউলী সূর্যকে যেন সর্বক্ষণ উপেক্ষা করার সুযোগই খুঁজছে। সূর্যকে অনাদর করাই যেন ওর জীবনের পরম সার্থকতা।

অজান্তে সূর্যর বক্ষ ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। ও কিছুতে বুঝতে পারে না ও কি চায়? এক একবার মনে হয়, হায়, এসময় যদি তান্তী একবার কাছে আসতো! সে কখনওই শিউলীর মত তাকে অযথা অবজ্ঞা কোরত না—কিন্তু তা হবার নয়। তান্তী তার কাছে আর আসবে না একবারও আসবে না। সূর্যকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে ও একা, একেবারে একা। সূর্যর ব্যথাহত মনে এক অনন্ত অশান্তি সিন্ধু-ক্ষুব্ধ আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে গর্জন করে; কিন্তু তাকে শান্ত কোরবে কে? মহাসিন্ধুকে শান্ত করতে কে পারে? তার মর্মব্যথা কে উপলব্ধি করতে পারে?

সূর্য যদি একবার তেতালার ছাদে পলাশের বন্ধ ঘরটা অনুসন্ধান করত, তাহলে দেখতে পেতো, সেই অন্ধকার ঘরে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে শিউলী। একাগ্রচিত্তে রাজপথের লোক চলাচলের মধ্যে সে যেন কি খুঁজছে। যেন কার প্রতীক্ষা করছে, সময় গুণছে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হতে, বিরক্ত হয়ে শিউলী জানলা থেকে সরে এসে চৌকীর সামনে দাঁড়াল। এই সেই জায়গা; যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিন পলাশ তাকে—ও আর ভাবতে পারে না—গায়ের মধ্যে শির শির করে ওঠে, ঠোঁট দুটো কেমন যেন বার বার শুকিয়ে যায়। শিউলী মাদুরে মুখ লুকিয়ে চৌকীর উপর বসে পড়ে। না, আর সে পারে না—এমন করে পারে না—একি জুলুম না কি? পলাশকে ভালোবাসতে হবে; একথা শিউলী কোনও-দিন কল্পনাও করতে পারে না। ভালোবাসার কথা, বিবাহের কথা জীবনেও কোনোদিন ভাববার অবসর পায় নি। তবে একথাও সত্য যে, সূর্যকে ও সত্যই ভালোবাসে। ওর সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য শিউলী ওর সঙ্গে বেশী কথা বলে না। তবে ও মনে প্রাণে অপরিসীম চেষ্টা করে সূর্যকে তাদের দলে আনতে। ব্যবহারে অবজ্ঞার ভাব দেখালেও মনে মনে ও সূর্যকে অনুসরণ করে ছায়ার মত। বেদনা দিয়ে ও সূর্যের মনকে মতকে ভাঙাতে চেষ্টা করে। ওর বিশ্বাস সূর্যকে ও ফেরাতে পারবেই। সূর্য একদিন নিজে থেকেই হবে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। শিউলী মনে মনে সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে ছিল। কিন্তু হঠাৎ এ কি উপদ্রব? কোথা থেকে দস্যুর মত এল পলাশ? শিউলী কেন তাকে বাধা দিতে পারল না? আজও কেন শিউলী তাকে মনের থেকে অস্বীকার করতে পারছে না? কেন ওর অন্যায় জুলুমকে শিউলী ক্যাপার মত বুকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? নাঃ, শিউলী এত বোকা মেয়ে নয়। সামান্য একটা সেন্টিমেন্টের জন্য ও কিছুতেই নষ্ট কোরবে না ওর অমূল্য সময়, অমূল্য জীবন। পলাশ নামক সেই, উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী যুবককে ও কোনদিনই কোন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেনি এবং আজও দেখবে না। ও যেখানে গেছে যাক। দেশে ফিরে আসুক বা না আসুক তাতে শিউলীর কিছু আসে যায় না। ওর প্রতিশ্রুতি শিউলী কখনও রক্ষা কোরবে না; কখনও না। যদি জীবনে কোনও দিন সূর্য তাকে গ্রহণ করে তবেই সে বিয়ে কোরবে, নচেৎ নয়। এ জীবনে আর বিবাহই কোরবে না। কিন্তু কাজ? অমীমাংসার আর কোনও কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পার্টির প্রতি ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সত্যিই ওদের বর্তমানের মতবাদের উপর শিউলী কেমন যেন ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। কেননা, ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখন সুভাষচন্দ্রের নামে নানা রকম অপপ্রচার করতে সুরু করেছে। শিউলী এটা সহ্য কোরতে পারে না; কারণ তার জীবনে প্রথম রাজনৈতিক নেতা রূপে দেখা পেয়েছে সুভাষচন্দ্রের। তারপর থেকেই শিউলী দেশ এবং তাঁকে ভিন্ন চোখে একদিনও দেখেনি। ও জানে রাজনৈতিক নানা দলের নানা মত, কিন্তু পথ এক। সেই একলক্ষ্যে পৌছানই প্রত্যেকের কাম্য এর মধ্যে নানারকম প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয় সত্য, কিন্তু সেটা যখন কারো ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থকে গিয়ে স্পর্শ করে, তখন সে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে দল ত্যাগ করে। শিউলীরও হয়েছে অনুরূপ অবস্থা। ও কি কোরবে? কাজ ছেড়ে কি করে থাকবে? কিন্তু যেখানে মত মিলছে

না, সেখানে থাকাও তো চলে না। কিন্তু ও যদি পার্টির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে তাহলে হয়ত সুখ এবং পলাশ ফুলে হাসবে। অসীমদা ক্ষুব্ধ হবেন। প্রতিমা দি, শুভ্রা, বেবা, ওরা দুঃখ করবে। শিউলী কি করবে? ও কি পড়াশুনা, দেশের কাজ, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাবে? সে ত পরম শান্তির জায়গা। কিন্তু বয়স্থা মেয়েকে ত কেউই ঘরে বসিয়ে রাখবে না। তারা শিউলীর বিয়ের জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তারপর কোনও সন্ধ্যায় নতুন বেনারসী, নতুন গয়না, শাঁখা, সিঁদুর পরে এক অপরিচিত যুবকের হাত ধরে চলে যেতে হবে ওকে কোন এক অজানা দেশে, অচেনা পরিবারের মধ্যে। তারপর একদিন শিউলী হবে মা: সেই অপরিচিত পরিবেশ ওর একান্ত আপন, নিজস্ব বলে মনে হবে। সেই নিজস্ব ভাব রাখাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্ত শিউলীর মন সদা জাগ্রত। তখন কোথায় হারিয়ে যাবে আজকের এই সাম্যবাদী কর্মী মেয়ে শিউলী? সেখানে সকলে দেখতে পাবে এক মহীয়সী নারীকে—সে নারী প্রেমময়ী পত্নী; স্নেহবৎসলা মাতা।

না, না, সে জীবন শিউলী চায় না। কিন্তু তা না হলে এ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? এই বাড়ীতে শিউলী আর থাকতে পারে না। কারণ, সেই দুঃসাহসীক পলাতক যুবক পলাশকে বিশ্বাস নেই। যে কোনও মুহূর্তে হঠাৎ সে আবার ফিরে আসতে পারে। তারপর আবার, যে কোনও দিন, যে কোনও সন্ধ্যার নির্জন অবসরে সে আরও কিছু অসম্ভব কাণ্ড যে করবে না, তার বিশ্বাস কি? সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে, লজ্জায় শিউলীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। ঠোঁট দুটো জ্বালা করে। ইস্ কী আস্পর্দ্ধা! শিউলী দাঁত কড়মড় করে রাগ প্রকাশ করতে চায়; কিন্তু হায়; এ রাগ, না অনুরাগ—না পূর্বরাগ, সে বুঝতে পারেনা। মাঝের থেকে, উদ্ধত দাঁতের পাটী সজোরে এসে আক্রমণ করে নীচের পেলব ঠোঁট খানিকে। নিরুপায় শিউলী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদে।

সন্ধ্যার পর শিউলী যখন উমারাণীর ঘরে প্রবেশ করল, তখন দেখল, সেখানে বসে আছেন উমারাণীর ভগিনী জ্যোতির্ময়ী। উমারাণী অচৈতন্তের মত নিদ্রা যাচ্ছেন। এমন নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যেতে এই রোগের মধ্যে কেউ তাঁকে দেখেনি। সকলেই নিশ্চিন্ত: যাক, এবার তিনি আরোগ্যের পথে। অপরাহ্নে চিকিৎসক এসে তাঁকে নিদ্রিতা দেখে ফিরে গেছেন। শিউলী এসে অতি সন্তর্পণে তাঁর শিয়রে বসল। জ্যোতির্ময়ী তাকে নিকটে ডেকে, বললেন, "তোমার একখানা চিঠি আছে শিউলী। সুধা যাবার সময়, আমায় দিয়ে বলে গেল তোমায় দেওয়ার জন্ত। কিন্তু একি মা, তোমার মুখখানি এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? চোখ দুটী লাল? দেখি জ্বর-টর হয়নিত?" তিনি হাত বাড়িয়ে তার ললাট স্পর্শ করলেন। চিঠি খানি হাতে নিয়ে শিরোনামার হাতের লেখা দেখে শিউলী মনে মনে কেমন যেন চমকে উঠল। ও চঞ্চল কণ্ঠে বললে, "না মাসীমা না, আমার শরীরে কিছুই হয়নি। দেখি কে আবার চিঠি লিখলো। আমি এখনি আসছি মাসীমা, চিঠিটা দেখে।"

জ্যোতির্ময়ী বললেন, "এস মা, তুমি চিঠি পড়ে এস, আমি এখানে আছি।" চিঠিখানি হাতে নিয়ে শিউলী নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হোল। খাম ছিঁড়ে চিঠি খানা খুলতেই প্রথমে তার নীচের দিকের একটী স্বাক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়ল। শিউলী সে দিক থেকে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারে না—প্রথম তিনটি অক্ষর "পলাশ"। প্রতি পলকে শিউলীর বুকের মধ্যে ছুরি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তিনটী অক্ষর লেখা হয়ে যাচ্ছে। ওর সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে দেয় বিস্ময়ের একটা হিমস্রোত। শিউলী কি করবে, এ চিঠি পড়বে, না ছিঁড়ে ফেলে দেবে? কিন্তু এই খবরটী জানার জন্ত ওই ঘরে একটী মুমূর্ষু নারী প্রাণপনে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। একটী সংবাদ তাঁকে হয়ত ফিরিয়ে দেবে নতুন জীবন। হায়রে, সন্তানহারা মা! শিউলীও যে নারী; তার মধ্যেওত সুপ্ত রয়েছে এই বঞ্চিত মাতৃত্ব। সে কি মায়ের এই কাতর আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারে? নারী প্রিয়তমের উপর অভিমান করতে পারে;

কিন্তু সন্তানের উপর পারেনা—সন্তান সর্বদাই ক্ষমার পাত্র। একদিকে উমারাণীর মৃত্যু-মলিন মুখ; অপর দিকে পলাশের চঞ্চল হাসিমাখা প্রেম-বিভল মুখ; একদিকে মাতৃত্ব, অপর দিকে নারীত্ব, দুজনেই চায় দুজনকে পরাস্ত করতে; অবশেষে জয়ী হোল মাতৃত্ব। এক মিনিটেই তাঁর চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেল। মুখস্থ হয়ে গেল তার চিঠির কথাগুলি। আশ্চর্য, শিউলী এখন কি অস্বীকার করতে পারে, জোর গলায় কি বলতে পারে আমি এই পত্র লেখককে ঘৃণা করি? সে ধীরে ধীরে উঠে গেল জানালার ধারে। আবার সেই বহুদূর বিস্তৃত রাজপথ ওকে হাত ছানি দিয়ে ডাকল; শিউলীর ব্যথা-বিক্ষত অন্তর তাকে কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে রাজপথ, মহাপথ; সকল পথিকের বন্ধু, সকল পলাতকের আশ্রয়-স্থল; তুমি বল, সেই পলাতক বিপ্লবী অসীমসাহসী পথিক কোথায়? কোথা থেকে সে এই পত্র লিখেছে? সে কি আর ফিরে আসবে না? আমি কত কাল তারজন্য অপেক্ষা করবো? চুপ করে থেকনা, বল, উত্তর দাও; কোথায় সে? পিছনে টেবিলের উপর পড়ে রইল একখানি খোলা সংক্ষিপ্ত চিঠি। "শিউলী, আমার স্যুটকেসে কাপড়ের নীচে যে সব বই আছে, তুমি সেগুলি নিয়ে যত্ন করে তোমার কাছে রেখে দেবে। তারমধ্যে একখানি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আছে; একটী বই লিখতে লিখতে আমি ফেলে এসেছি। খুব তথ্যপূর্ণ বই। তুমি তোমার সমস্ত অধ্যবসায় দিয়ে সে বই শেষ কোরো। আমার সময় হলেই আমি তোমার কাছে ফিরে যাবো। মাকে বোলো আমি ভালো আছি। সূর্যকে আমার ভালোবাসা জানিও। ইতি তোমার পলাশ"।

তারিখ হীন, ঠিকানা হীন চিঠি। অনেক দেশের ছাপ বুকে নিয়ে ঘুরে এসেছে। শিউলীর সাধ্য নেই সেই ছাপ থেকে সন্ধান খুঁজে বার করবে। সেই সময় হঠাৎ উমারাণীর ঘরের দিক থেকে ভেসে এল একটা অস্পষ্ট কোলাহল, বহু লোকের দ্রুত পদশব্দ। শিউলীর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। হায়, সে কি ভুলই না করেছে? পলাশ যে বলেছে, মাকে তার ভালো খবর দিতে। চিঠি-খানি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল উমারাণীর ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখলে সকলেরই মুখ বিমর্ষ। চিকিৎসক উমারাণীকে অক্সিজেন গ্যাস দিচ্ছেন। উমারাণীর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে সূর্য। শিউলী ছুটে গিয়ে তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকতে লাগল, "মাসীমা ও মাসীমা—"

চিকিৎসক বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন মা, জ্ঞান ফিরে আসুক—" উমারাণীর মুখের দিকে চেয়ে শিউলীর বুকের মধ্যে যেন হিম হয়ে আসে। হায়, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? দেরী হলে জ্ঞান ফিরবেত? সে এই শুভ খবরটা তাঁকে দিতে পারবেত? দারুণ অস্বস্তিতে চিঠিখানা শিউলীর জামার মধ্যে অথথা মড় মড় করতে লাগল।

কিন্তু বৃথা; চিকিৎসকের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। প্রায় মধ্য রাত্রিতে সেই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই উমারাণীর প্রাণ-বায়ু পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল। সকলে হাহাকার করে কেঁদে উঠল। পলাশের উদ্দেশে গালি পাড়তে লাগল, "ছেলে নয়ত, সাত জন্মের শত্রু। মা'টাকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেললে গো?" সূর্য নীরব। তার স্নেহময়ী পিসিমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। আর শিউলী? তার অবস্থা অবর্ণনীয়। উমারাণীর মৃত্যুকে সে কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। ও অনবরত তাঁর মাথা ঝাকানি দিয়ে ডাকছে: "মাসীমা, ও মাসীমা; পলাশদা ভালো আছে; এইদেখ সে চিঠি লিখেছে—লিখেছে তোমার কথা—দেখ, একবার চোখ খুলে দেখ চিঠিখানা—"

ভোর রাত্রে আত্মীয় বন্ধুতে বাড়ী ভর্তি হয়ে গেল। জ্যোতির্ময়ী সূর্যকে সস্নেহে তুলে ধরে বললেন, "সূর্য ওঠো বাবা; এখন ত তোমাকেই তার ছেলের কাজ করতে হবে? পলাশ ত নেই? কাজেই তোমাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। ওঠো।" মাতৃ পিতৃহারা সূর্য চিরদিনই সংযত প্রকৃতির। জ্যোতির্ময়ীর আহ্বানে সে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। উমারাণীর মুখের দিকে একবার তাকাল। হায়, সন্ধ্যা বেলা যে মানুষ তার সঙ্গে কথা কয়েছেন, রাত্রে সে মানুষ আর নাই। কোথাও নাই। পৃথিবীর কোনও প্রান্তে আর তার সাক্ষাৎ মিলবে না। (ক্রমশঃ)

কিন্নাসিনী (গল্প)

শ্রীসুনীতি কুমার পাঠক

সেদিন শনিবার অন্য দিনের মত আফিস ছুটীর পর সটান বাড়ী যেতে মন চাইলো না, আনমনা ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেনের দিকে গেলাম।

ক্লান্ত হয়ে একটা দেওদার গাছের তলায় হাত পা ছড়িয়ে সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়লাম সামনে ঝিল। তখন রোদ পড়ে এসেছে। গাছের মাথায় সূর্যের শেষ আলো।

কত কী ভাবছিলাম, হঠাৎ কানে এল "জয় বাবা বিশ্বনাথ"

ফিরে দেখি, পাশেই এক কিন্নাসিনী, পরণে তামাটে রঙের কাপড়, হাতে সিঁদুরমাখানো এক ত্রিশূল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, উপর ও নিচের হাতে কড়ির তাগা, মাথায় জটা আর সারা কপাল রক্ত চন্দনে চাকা।

কপালে হাত ঠেকিয়ে 'মাপ করুন' বলতে যাচ্ছিলাম।

তার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "এখানে এভাবে?"

বুঝলাম, তিনি আমাকে চিনেন।

সরল ভাবেই জবাব দিলাম, "বাবা বিশ্বনাথের মর্জি।

"মর্জি নয়; বলুন, ইচ্ছে"—দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, তার সংগে একটা কুটিল ভ্রূকুটী।

এইবার চিনলাম। আমার অনুমান স্থির সিদ্ধান্তে এল যখন তাঁর গলার মালাটীর দিকে নজর পড়ল। এই মালাটী যে একটী মেয়েকে দিয়েছিলাম, তিনিই সেই; চেনা শক্ত হয় নি, মালার মাঝখানের সব চেয়ে বড় রুদ্রাক্ষটী রূপার বাঁধান ছিল।

তিনি যেন সব বুঝতে পেরেছিলেন। তাকে সসম্ভ্রমে বসতে অনুরোধ করার আগেই তিনি অদূরে বসে পড়লেন।

খানিকক্ষণ দুজনেই নির্বাক।

মনে পড়ল, তাঁর সংগে প্রথম দেখা হয় হিজলী জেলখানায়। আমি বছর চারেক সেখানে রাজবন্দী ছিলাম, তিনি মাত্র মাস ছয়েকের মত খুনী আসামী হয়ে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ থাকলেও পুরুষ মহলে যাতায়াতে ওর বড় একটা বাধানিষেধ ছিল না। সব মহলেই ছিল ওর অবাধ গতি এই মেয়েটীকে সবাই যেমন নিন্দা তেমনি ভয়ও করত। ওঁকে বলত "ডাকাতী"। সেখানে এমন কেউ ছিল না যার সংগে ওঁর ঝগড়া না হোত। যদি গলার জোরে হারতেন তবে গায়ের জোর চালাতেন। দু' একটা ওয়ার্ডেন ওঁর হাতের চড়ও নাকি খেয়েছে। তবে মেয়ে মানুষ বলেই পার পেয়ে যেতেন, না হলে কি হোত কে জানে। মাঝে মাঝে ওঁর সদম্ভ পদক্ষেপের চোটে জেলখানা যেন কেঁপে উঠত। এই ছিল তাঁর বিজয় ঘোষণা, ফলে পরাজিত আরও মুসড়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ত।

তিনি প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন, "কই, আপনি ত কিছুই শুধোলেন না।" বলেই হেসে উঠেন।

উদাস ভাবে বললাম, "যাঁর কোন কিছুই নেই তাঁকে কি বলব ভাবছি।"

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, এই ধরণের অবস্থা তাঁর খুব কমই দেখেছি। যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, তা প্রকাশ করতে না পেরে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

তাঁর এই দৃশ্য আমি আগ্রহের সংগেই অনুকম্পা নিয়ে দেখছিলাম।

তিনি বলে উঠলেন, "গিলে ফেলবেন নাকি? আপনার কিছু না বলার থাকতে পারে, আমার ত বলার আছে, শুনুন।" এটা তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মোটেই নয়, বুঝলাম, এতক্ষণে সামলাতে পেরেছেন।

আহত হয়েছিলাম, তবে প্রকাশ করিনি, গম্ভীর ভাবে

বললাম, "কানে শুনতে ত ট্যাক্স দিতে হয় না, বললেই শুনতে পাব।"

আগ্রহ ভরে বলে উঠলেন, "আপনি ত হিজলীতেই রইলেন, আমি বেরিয়ে এলাম। সেই থেকে আজও বাড়ীর মুখ দেখি নি।" বলেই একটু হাসলেন, যেন কত বড় বীরত্বের কাজ।

ধীর ভাবে বললাম, "তা ত মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

সে-কথা চাপা দিয়ে তিনি বললেন, "৪২ এর হাঙ্গামায় নৈনীতালে কতদিন অন্তরীণ ছিলেন?" অবাক হলাম, এ সংবাদ ত আমার অনেক নিকট আত্মীয়কেও বলিনি।

তিনি বলে চললেন, "আমি গেছলাম সেখানে, দেখা করতে পারিনি, তিন রাত ঘুরেছি।" বলেই চুপ করলেন। একটা ব্যর্থতার চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সযত্নে তিনি যেন তা গোপন করতে চেষ্টা করলেন।

এই ধরণের হাব-ভাব তাঁর নূতন নয়, তবুও যেন কেমন বোকা বনে গেলাম। তাঁকে তা টের পেতে না দিয়ে শুষ্কভাবে বললাম, "বেশ ত।"

আমার এভাবের উত্তরে তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়েন, আবেগ ভরে বললেন, "জানেন, তারপরে কি করেছি।"

তেমনি নীরসভাবে জবাব দিলাম, জানতাম।"

নিজেই বলতে সুরু করলেন, "অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক ভাষা শিখেছি, অনেক বই পড়েছি".....এই ভাবে তাঁর দীর্ঘ বার তের বছরের ইতিহাস চলল।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরণের কাণ্ড দেখে আমার সংগে তাঁর জেল-জীবনের কয়েকটা ঘটনা সিনেমার ছবির মত মনে ভেসে উঠল।

প্রায়ই বলতেন, "পুরুষ জাতটা স্বার্থপর, তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের বিয়ে করে অর্থাৎ ভোগ ক'রে, তারপরে নিজেদের আশা মিটলে যখন এদিকেও সব নিঃস্বের ঘরে যায় তখন সেই মেয়েটা হয় বাড়ীর বাঁদী, কি চাকরানীর সামিল, ঠিক যেমন মাটীর হাঁড়ী।

আমাদের পুরুষ সংগীরা চটে উঠতেন, ওঁকে কেউ মুখের উপরেও গালাগালি দিত, না হয় কেউ অশ্রাব্য কটু মন্তব্য শোনাতেন। ঐ মেয়েটীও তাঁদের সংগে সমানে চেঁচাতেন। আমি চুপ করে সব শুনতাম। কখনও ওর মতে মত দিয়েছি, কেন না, সত্যকে অস্বীকার করা মানে মিথ্যা কথা বলা। ঐ সকল কারণে কিনা জানিনে, আমার উপর খুব খুশী থাকতেন, তাই আমার নামে অনেকেই কানাঘুষা করতে ছাড়েন নি।

মেয়েরাও ওঁকে দেখতে পারতেন না ওঁর মতে মেয়েদের নিজের কোন রূপ নেই, কুশ্রী জানোয়ার, তাই না বাইরের রঙের মোহ এত বেশী, রঙীন জামা-কাপড়ের মধ্য দিয়ে গাধা পুরুষগুলোর কাছে নিজেদের দাম বাড়ায়। জেলখানায় বাকি মেয়েরা চটে আগুন হোত, আমরা তা শুনে মজা পেতাম।

একদিন আমায় কস্ করে প্রশ্ন করলেন, "পুরুষেরা মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখে বলুন ত?"

জবাব দিলাম, "মেয়েরা আড়চোখে পুরুষের যা দেখে তাই।"

নাক সিঁটকে বলে উঠলেন, "ছিঃ এতবড় বেটমান।" একটু চুপ করে আবার বললেন, "আমরা পুরুষের দেখি গুণের বহর, কিন্তু তুলি তার রূপে। মেয়েদের গুণ আছে, নেই রূপ, ওরা জয়লার জাত।"

অনেক সময় বলতেন, "এ দেশের প্রাচীন পুঁথিগুলো সব পুরুষের লেখা, তাই মেয়েদের বলেছে নরকের দ্বার। অথচ কতবড় বোকা তারা, পুরুষের কাছে মেয়েরা যদি নরকের বড় দরজা, তবে মেয়েদের কাছে পুরুষেরা খিড়কীঘাট।" বলেই খিল খিল করে হেসে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। "এভাবে কারুর নিন্দে করে কেউ ভাল কাজ করতে পারে, বলুন ত? তাই ওদের বই আজ পোকা আরশুলার পেটে আর মাটীর টিপির ভিতর।"

আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, "পুরুষকে মারতে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন কেন?" বলা প্রয়োজন, তাঁর কারাবাসের এই ছিল হেতু।

চট ক'রে বলে উঠলেন,
মরাই বুঝি গৌরব।"

"মানে?"

"মাথায় কি শুধু গোবর? এতো সাদা কথা, গাঁয়ের মেয়েদের বিয়ে না হলে জাত যায়, তাই গরু ভেড়া ঘোষ যাকে সামনে পায় তারি গলায় মেয়েদের ঝুলিয়ে দেওয়াই হোল বুড়োদের কাজ। তার পরে তাঁর খুবের জোর, আর মেয়ের বরাত।"

বাধা দিয়ে বলেছিলাম, "এর একটা ভাল দিক

"তা জানি, যেখানে ভালোর চেয়ে মন্দের অংশ বেশী সেখানেও কি ভালো ভালো করে গোল্লায় যেতে হবে, না উন্মাদ হয়ে মরব।"

ঠাট্টা ভাবে প্রশ্ন করেছিলাম তবে কি সতীত্বের দাম নেই?

হেসে উঠলেন, "এমন নিরেট একচোখা ত দেখিনি, এদেশে সীতার দাম বেশী, কিন্তু ওদের দেশে দ্রৌপদীর মান বেশী। এদেশে বরঞ্চ কোথা যে ধর্ষানী পুরুষে। তাইতো, হাঁ হাঁ করে প্যান প্যানে মেয়েগুলোর বাহাবা দেয়, ওরা ত আসলে মেয়েই নয়, ঠিক যেমন গাঁয়ের যাত্রা পার্টির বুক-উঁচু-করা, ঘাঘরা-চাকা ব্যাটা ছেলে।" সোদন আর ধৈর্য ধুলোয় নি। রেগে বলে উঠলাম, এ এক ধরণের দাম বাড়ানর কায়দা।

ধীর ভাবে বললেন, ভুলবেন না, আমাকে বাদ দিলে পৃথিবীর সকল মেয়ে হবে না, তাই সবার মধ্যে যে সাধারণ গুণ রয়েছে, আমিতার থেকে বাদ পড়িনি। এ মেকি কথা নয়।"

আমি তেমনিভাবে বললাম, "আর পাঁচ জনার যে দোষ আছে, তাও ত.....

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আমি কি পূর্ণ না নির্গুণ, যে দোষ গুণ থাকবে না? আমার যা আছে বেশ আছে, আপনাদের কথায় তা বদলান অসম্ভব।" মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে উঠল।

প্রায় দেখতাম খুব ভোরে উঠে নিরিবিলিতে চোখ বুজে কি সব ভাবতেন। এভাবে ঘণ্টা খানেক কাটত, বাকী সময় একাই ছুটাছুটি, লড়াই ঝগড়া আর তর্ক চলেছে। তবে এক ঘেঁয়ে মনে হোত না, নিত্য-নূতন।

আমার কৌতূহল একটু বেড়ে যায়। প্রশ্ন করেছিলাম, "এত সব শিখলে কোথা?"

সংগে সংগে উত্তর পাই নি। একটু হেসে ঐকা বাঁকা চোখ দুটো আমার মুখের উপর রেখে দূরে পড়েন। তারপর দিন তিনেক আর দেখা মিলে নি। একদিন দেখা হতে বললেন. "তুমি যা সব চেয়ে ভালবাস, তা আমাকে দিতে পারো?"

না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম, "হ্যাঁ"

ঠকাবার জন্যে দাও বলে হাত বাড়ালেন। আমার গলায় ছিল একটী রুদ্রাক্ষের মালা, সেইটী তাঁর হাতে তুলে দি। সত্যি বলছি, তখন এর চেয়ে প্রিয় আর আমার কিছু ছিল না। ছেলে আসার সময় মা নিজের হাতে গলায় পড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই মালাটী ছিল তাঁর আশীর্বাদী। তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছল।

চট করে সামলে নিয়ে বলেন, "মায়ের পেট থেকে কিছু শিখে আসিনি, সবই এখানের শেখা। বাবা আমাকে খোকা বলে ডাকতেন, তাই খুকী হইনি।"

অনেকবার ভেবেছি, কিন্তু সাহস পাইনি। আমার এক সংগী তাঁর কাছে সংসার-পাতার ইংগিত করতেই ঠাস করে তাঁর গালে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। তদুপরি মিঠে কড়া বুলি ত ছিলই।

উচ্ছ্বাসের মাথায় তাঁর সকল কথা না বলে থাকতে পারেন নি। তবে তাঁর অধিক কথাই আমার কানে ঢোকে নি। আমার অন্যমনস্কতায় যখন সচেতন হলাম তখন তিনি বলছিলেন, "আমি সব ছাড়তে পেরেছি, পারি নি কেবল এই মালা গাছটা"—বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

আমার আনমনা ভাব তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল; ঝাঁঝাল সুরে প্রশ্ন করলেন, "আপনি পাগোল হয়ে গেছেন?"

"কই, না ত!" থতমত খেয়ে বললাম।

"ওমা, অনেক গুণও বেড়েছে, মিছে কথাও বলতে সুরু করেছেন দেখছি।" আমি অপ্রতিভ হয়ে গেলাম। খানিকটা চুপ করে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনিই আবার বলে উঠলেন," মালাটা মাকে একবার ছিঁড়ে গেছল, নিজেই বেঁধেছি, অন্য কাউকে ছুঁতে দিইনি।"

তার মনের ভাব আঁচ করতে পারলেও মুখ ফুটে বলতে পারি নি। আমার এই নীরবতা তাঁকে উৎসুক করে তুলেছিল। জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার মুখের দিকে একবার দেখলেন মাত্র।

উপদেশের সুরে বললাম, "অভিনয় মানে নিজেকে বঞ্চনা করা, এতে কি লাভ হোল। এতকাল ধরে যে দুঃসহ বোঝার ভার বেড়েছে আজ তাকে ঘাড়ে নিতে কারুর শক্তি-সাহসে কুলোবে কিনা জানিনে। তবে তার একদিন সময় ছিল। এখন নিজের কর্মের ফল নিজেকেই মুখ বুজে সইতে হবে।"

একটুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপরে বললেন, "মিথ্যা কথা সহ্য করা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আজ আর প্রতিবাদের প্রবৃত্তি নেই। এতদিন ধরে যা পাইনি আজ কাদাখোঁচা থেকে ফেরার পথে তা পেয়েছি।" কথাগুলো যেন গলায় আটকে যেতে লাগল। ঢোক গিলে বললেন "একদিন আপনার মত পুরুষকে আমার পাওয়া খুবই সহজ ছিল, হয়ত তখন লাভও হোত, আজ তার প্রয়োজন নেই, তাতে ক্ষতিই বাড়বে। তাই সে লালসা নিয়ে আসিনি। শুধু জানলাম মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা কত বেশী স্বার্থপর আর বোকা।" গলাটা ভারী হয়ে গেল।

বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবতে পারিনি, এভাবে কল্যাণী.....

কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলেন, "জানবেন হেমন্তবাবু, সবার উপরে আমি মেয়ে মানুষ।" বলেই চট করে উঠে পড়লেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষিপ্র গতিতে চলে গেলেন। প্রায় পনের বছর আগেকার সেই চলা, সেই কথা বলা, আর সেই ব্যবহার।.....

ফিরতে দেরী হোল। বাসার দরজা খুলেই আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, "আজও এত দেরী।" তাঁর দুই চোখে সন্দেহের ভাব ফুটে উঠেছিল।

সাগর বলাকা

দ্বিতীয় অংক

অমলেন্দু চক্রবর্তী

[খাদে ঢাকা-আট। ডাইনে বেশ খানিকটা দূরে একটা বাড়ীর কিছুটা চোখে পড়ছে। বাঁয় লেক, লেকের জল সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করছে। পাশে কয়েকটা ছোট ছোট ফুলের গাছ।

সময়—দুপুর। একটা বড় গাছের ছায় বেঞ্চের উপর মীঁ একাজিন, ডরন ও মাসা বসে আছেন। একটা খোলা বই ডরনের হাটুর উপর পড়ে আছে।]

মী—(মাসাকে) দাঁড়াও তো। (উঠে দাঁড়াল) আমার পাশে দাঁড়াও তো। তোমার বয়েস হলো বাইশ, আর আমার প্রায় তোমার দ্বিগুণ। জেগুয়েনী সার ওয়েভিচ্, বলতো কার বয়েস কম মনে হচ্ছে।

ডরণ—কেন? তোমাকে!

মী—দেখ! কিন্তু...কেন? কারণ—আমি সব সময়ই একটা না একটা কিছু করছি—আর তুমি সব সময়ই চুপ-চাপ বসে থাক—বেঁচে আছ কী নাই বুঝা দায়।...,আমি জান ভবিষ্যতের জন্য পরোয়াই করি না। একদিন বুড়ো হয়ে যাবো বা মরে যাব সেই কথা মনেই আনি না। যা হবার তাই হবে—তার জন্য আগে থাকতে ভেবে মরি কেন?

মাসা—আমার মনে হয় কী জান? যেন কত যুগ আগে জন্ম নিয়েছি, অনেক সময় আর বেঁচে থাকার ইচ্ছেই হয় না। (বসে পড়ে) এ সব ভেবে কী লাভ বল তো?

মী—তাছাড়া, আমি সব সময় কাপড় চোপড় ফিট ফাট্ করে পরি, আর চুল তো—আচড়ান চাইই। কাপড় না বদলে, কী চুল না আচড়ে বাইরে তো দূরের কথা বাগনে বেরোনর কথাও কল্পনা করতে পারি না। (হাত পেছনে রেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল) জান আমি একজন পনেরো বছরের মেয়ের ভূমিকায়ও নামতে পারি।

ডরণ—বেশ! তাই না হয় হলো, আমি কিন্তু পড়তে সুরু করলুম (বইটী হাতে নিয়ে) আমি পেয়েছিলাম, ফসলের দোকানী আর ইঁদুরের জায়গাটিতে—

মী—হ্যাঁ, ওখানেই। পড়ে যাও। (বসে) আচ্ছা আমাকে দাও, আমি পড়ছি। (বইটি হাতে নিয়ে, পাতাটিতে আঙ্গুল দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে)...এই যে পেয়েছি (পড়তে লাগলো)—ঔপন্যাসিকের মন জয় করার চেষ্টা করা অনেকটা ফসলের দোকানীর পক্ষে ইঁদুর পোষার মত, কিন্তু তবু তারা এর পেছনে ছোটে। মহিলারা যখন কোন লেখকের মন জয় করতে চায়, তখন তাকে তোষামোদ, অভ্যর্থনা, আর কারণ অকারণে সম্মান—যত সব বাজে। এসব ফ্রান্সে হতে পারে, আমাদের মধ্যে এসব কিছু নেই। আমাদের মধ্যে, কোন মহিলা যখন কাউকে জয় করতে চায়, তার আগেই সে তার প্রেমে পড়ে। যেমন আমার আর টিগরিণের কথাই ধরনা।

[সোরিন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে ঢুকলো—তার পাশে পাশে নীনা। মিডভেডিনকো পেছন পেছন একটা চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো]

সোরিণ—(ছোটদের কাছে বলার মত সুরে) হ্যাঁ, তারপর একটা বেশ সুখবর আছে, ক'দিন বেশ ভালই কাটবে এই চলো ব্যাপার। (মী ঐকাজিনকে) খবরটা হলো, বাবা মা টেপ্তর চলে গেছেন আমরা এখন বেশ স্বাধীন, তিন দিনের জন্য।

নীনা (মীর পাশে বসে, বেশ খুসীর সুরে) আমার কী ভালই না লাগছে! এখন আমি তোমাদের।

মী—চমৎকার করে পোষাক পরেছ তো—এখন তোমাকে বেশ চালাক চালাক লাগছে। (নীনাকে চুমু খেয়ে) না; বেশী প্রশংসা করা ভাল না, শয়তানের চোখ পড়বে, আচ্ছা বোরিস এলিকসিভিচ কোথায়?

নীনা—মাছ ধরছেন।

মী—আশ্চর্য! বিরক্তিও আসে না।

নীনা—তোমরা কী পড়ছিলে?

মী—মোপাসাঁর একটি গল্প; মা, (কয়েক লাইন মনে মনে পড়ে) এরপর যা তা ভালও না, আর সত্য তো নয়ই। (বইটি বন্ধ করে) আমার কেমন যেন খারাপ লাগছে। ছেলেটির কী হয়েছে বলতো? ওকে এমন শ্রান্ত ও বিমর্ষ মনে হচ্ছে কেন? সারাদিন লেকের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার সামনেই আসে না।

মাসা—ওর কেন জানি মন খারাপ (নীনাকে) ঐ বইটা থেকে কয়েক লাইন পড় না?

নীনা—(ঘাড় নাড়তে নাড়তে) আমাকে বলছো কেন? খুব মজার নাকী?

মাসা—ট্রায়েপ যখন পড়ে, ওর চোখ জ্বলতে থাকে, মুখ কেমন যেন পাংশে হয়ে যায়, গম্ভীর গলার স্বর, ঠিক কবিদের মত।

ডরণ—আচ্ছা, আমি এখন চলি।

সোরিণ—এ্যা—

মী—তুমি কী ঘুমোচ্ছিলে না কী?

সোরিণ—না, তো। (চুপ চাপ)

মী—এ বড় অন্যায় হচ্ছে, তোমার ডাক্তার দেখান উচিত।

সোরিণ—দেখাতে পারলে আমি সুখী হতুম, কিন্তু এখানকার কোন ডাক্তারই আমাকে দেখতে চাইবে না।

মেডভেডিনকো—পেটার নেকোলেভিচের সিগরেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সোরিণ—খোকা কোথাকার।

ডরণ—না, এ হেসে উড়িয়ে দেবার কথা না। সিগেরেট আর মদ, তোমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দিচ্ছে। একটা সিগরেট বা এক গ্লাস ভডকার পর তুমি শুধু মাত্র পেটার নিকোলেভিচ থাক, পেটার নিকোলেভিচ ও আর একজন। তোমার 'আমিত্ব' তোমার মধ্যে ডুবে যায় আর বেরিয়ে আসে একজন স্বতন্ত্র তৃতীয় ব্যক্তি।

সোরিণ—(হাসতে হাসতে) তুমি বেশ সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পার তো। তুমি জীবন ভোর নিজেকে উপভোগ করেছ, আর আমি? আইন আদালতে কাটালাম আঠার বছর, এখন পর্যন্ত জীবনকেই জানলাম না, এই হলো ব্যাপার; আর তার জন্যই আমি বাঁচতে চাই। তোমরা তো বেশ মজাসে আছ কী না তাই বড় বড় কথা বলতে ভাল লাগে, আর আমি বাঁচতে চাই তার জন্যই খাবারের সময় সেরী নিয়ে বসি; সিগরেট ছাড়া চলে না। এই হলো ব্যাপার।

ডরণ—জীবনকে আরও গম্ভীর ভাবে দেখা উচিত। যৌবনে উপভোগ করতে পারোনি বলে এখন এসবের কোন মানেই হয় না। আমাকে ক্ষমা করবেন—ষাট বছর বয়সে এ সবকে ছেলে মানুষী ছাড়া আর আমি কিছুই বলতে পারি না।

মাসা—(উঠে দাঁড়িয়ে) এখন নিশ্চয়ই দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে (শ্রান্ত পাদক্ষেপে কয়েক পা এগিয়ে) পা যেন আর চলতে চায় না।

ডরণ—খাবার আগেই কয়েক গ্লাস গিলবেন তো?

সোরিণ—এ সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের প্রশ্নই আসে না।

ডরণ—আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু এসবের কোন মানেই হয় না।

সোরিণ—তুমি তো ডাক্তারের মত কথাই বলবে।

মী—এ সব বিরক্তিকর ব্যাপার ছাড়া তোমাদের বলার মত কিছুই নেই না কী? বাজে, বাজে, বড় বড় কথার ফুলঝুড়ি...এর চাইতে শহরের হোটেলে বসে বসে অনেক সুখে কাটান যায়।

নীনা—(খুব খুশী হয়ে) খুব মজা, তাই না?

সোরিণ—নিশ্চয়ই, সহর এর চাইতে অনেক ভাল।

সবাই যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কথা বলতে হয় টেলি-ফোন তুলে নাও...রাস্তায় সব সময়ই ঘর ঘর করে গাড়ী ঘোড়া চলছে...এই হলো ব্যাপার

[সেমরিয়েভ ও তার পেছন পেছন পলিম এলো]

সেমরিয়েভ—আরে এখানে দেখছি সবাই আছেন। (মীর ও পরে নীনার হাতে চুমু খেল) তোমাকে দেখে খুব খুসী হলুম। (মীকে) পলিন বলছিলো, আপনি নাকী তার সাথে আজ সহরে যাচ্ছেন ? সত্যি না কি ?

মী—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

সেমরিয়েভ—হুঁ—কিন্তু কথা হলো, আপনি যাবেন কী করে ? আজকে থেকে গম কাটা সুরু হলো, চাকর বাকর সবাই ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কী, কোন ঘোড়া আপনি নিচ্ছেন।

মী—কোন ঘোড়া মানে ? আমি কী করে জানবো কোনটা ?

সোরিণ—কিন্তু, আমাদের গাড়ীর ঘোড়াও তো আছে।

সেমরিয়েভ—(উত্তেজিত স্বরে) গাড়ীর ঘোড়া ? জিন পাবো কোথায় ? জিন দেবে কে ? আশ্চর্য্য ? ভাবতেও পারি না ? শুনুন, কিছু মনে করবেন না, আমি দশ বছর আপনার গোলাম হয়ে থাকতে রাজি আছি, কিন্তু আজকে কোন ঘোড়া দেওয়া সম্ভব হবে না।

মী—কিন্তু আমার যদি যেতেই হয় ? আশ্চর্য্য ?

সেমরিয়েভ—আপনি জানেন না, একটা ষ্টেটের কাজ চালান কী ঝামেলা।

মী—(মনে উঠে) একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ! বেশ তাই যদি হয়, আমি আজকেই মস্কো চলে যাচ্ছি। ওদের বলে দাও গ্রাম থেকে আমার জন্য ঘোড়া ভাড়া করে আনবে তাহলেই ষ্টেশনে যাবো।

সেমরিয়েভ—(রেগে মেগে) বেশ, আমি তা হলে পদত্যাগ করছি। অন্য সরকার খুঁজে নাও গে।

(বেরিয়ে গেল)

মী—সব যায়গাই এক রকম, আমি বার বার এখানে অপমানিত হচ্ছি। আর কোন দিন এ মাটিতে পা দিচ্ছি নে।

[বা'দিকে, মাছ ধরার পুকুরের দিকে বেড়িয়ে গেল, মিনিট খানিক বাদে তাকে আবার বাড়ীর দিকে ফিরতে দেখা গেল। তার পেছন পেছন ট্রীশফিন, হাতে একটা মাছ ধরার ছিপ।

সোরিণ—(রেগে উঠে) যত সব বাজে। এসব দেখতে দেখতে হন্তে হয়ে গেলাম। এই হলো ব্যাপার। একুনি সব ঘোড়া এখানে আনতে বলো।

নীনা—(পলিমকে) এ কী অদ্ভুত ? এতো বড় একজন অভিনেত্রী, আর তার চাইতে ষ্টেটের কাজই বড় হলো ?

পলিম—(শান্ত স্বরে) আমি কী করতে পারি বল ? তুমিই যদি আমার অবস্থায় পড়তে, তবে কী করতে বলতো ?

সোরিণ—(নীনাকে) এসো বোনের কাছে যাওয়া যাক্। আমরা সবাই মিনতি করে ওকে যেতে নিষেধ করবো। (সেমরিয়েভ যে দিক দিয়ে গেছে, ঐ দিকে তাকিয়ে) অসহ্য। স্বৈরাচারী কোথাকার।

নীনা—(টেনে বসিয়ে) বসো, উঠতে হবে না—আমরা তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

[নীনা ও মেডভেডিনকে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল। শুধু ডরণ ও পলিম রইলো]

ডরণ—জ্বালাতনের একশেষ। তোমার স্বামীকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিৎ। কিন্তু শেষটায় দেখো, পেটীর নিকোলেভিচ আর তার বোন ওর কাছেই ক্ষমা চাইতে আসবে। তুমি দেখে নিও।

পলিন—ও তো সবগুলো গাড়ীর ঘোড়াকেই খামারে পাঠিয়েছে। এমনি তর তুল বুঝা বুঝি রোজ হয়। শুধু, তুমিই জান, আমার এতে কতো বিশ্রী লাগে। আমি যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছি। (মিনতি করে) সাবগোরেভিচ্, প্রিয় আমার, আমাকে বাঁচাও, এসব থেকে দূরে নিয়ে চল।...আমাদের সময় চলে যাচ্ছে, যৌবন তো অনেক দিন আগেই ধুইয়ে এসেছি, আর ক' দিনই বা তুমি আমি এক সাথে থাকতে পারবো।

(চুপ চাপ)

ডরণ—আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ, এর পর নতুন ভাবে জীবন সুরু করা সম্ভব হবে না।

পলিন—আমি জানতাম, তুমি এভাবে আমাকে ফিরিয়ে দেবে। আমার চাইতে সুন্দরীও অনেক আছে তো? তোমাকে জ্বালাতন করলুম বলে ক্ষমা করো।

[নীনাকে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ফুল তুলতে দেখা গেল।]

ডরণ—ও-সব আবার কী?

পলিন—তুমি ডাক্তার, আমি জানি তুমি কোন সময়ই মেয়েদের এড়িয়ে চলতে পারবে না। যাক্, আমি সবই বুঝেছি...

ডরণ—(নীনাকে, সে এদিকেই আসছিলো) ওখানে কী ব্যাপার?

নীনা—ইরেন নিকোলেভনা কাঁদছেন, আর পেটীর নিকোলেভিচের আবার হাঁপানীটা বেড়েছে।

ডরণ—(উঠে দাঁড়িয়ে) আর কী, দুজনকে গিয়েই ওষুধ দেওয়া যাক্।

নীনা—(ফুলগুলো বাড়িয়ে) নিন্।

ডরণ—ধন্যবাদ! [বাড়ীর দিকে বেড়িয়ে গেল।]

পলিন—(ডরণের সাথে যেতে যেতে) কী চমৎকার ফুলগুলো। (বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ক্লান্ত স্বরে) ফুলগুলো আমাকে দাও! আমাকে দাও বলছি!

[ফুলগুলো হাতে নিয়ে, সেগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল, তারপর দুজন এক সাথেই বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো।]

নীনা—(একা একা) এখনি একজন নামকরা অভিনেত্রীকে, সাধারণ ব্যাপারে কাঁদতে দেখলে কী অদ্ভুত লাগে? আর কী আশ্চর্য্য? এখনি একজন নামকরা সাহিত্যিক, সাধারণের কত প্রিয়, সবগুলো পত্রিকাই তার আলোচনায় ব্যস্ত, দেশে যার লেখা অনুবাদ হচ্ছে, আর সে কিনা দিনভোর সুকুর ধারে বসে দুটো একটা মাছ ধরেই খুশী? অথচ আমি ভাবতুম, এরা নিজেরা ধরাই না গর্বীত, এরা যে সবার চাইতে এগিয়ে চলেছে, এ কথাটা কোন সময়েই ভুলতে পারে না। কিন্তু এরাও কাঁদে, মাছ ধরে, দশ জনের মত তাস খেলে, হেসে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে।

ট্রায়েপ—(মাথায় টুপী নেই হাতে একটা বন্দুক, ও একটা মরা 'সাগর বলাকা') তুমি এখানে একা যে?

নীনা—হাঁ।—(ট্রায়েপ নীনার পায়ের কাছে সাগর বলাকাটা রাখলো) কী ব্যাপার?

ট্রায়েপ—একটা সাগর বলাকা মারার সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলাম, আর তোমার পায় এনে তাই দিলুম।

নীনা—তোমার কী হয়েছে বল তো? (সাগর বলাকাটা তুলে নিয়ে, তাতে হাত বুলাতে লাগলো।)

ট্রায়েপ—(একটু চুপচাপ থেকে) কিছুদিনের মধ্যে আমি নিজেকেও খতম করে ফেলবো।

নীনা—তোমার কিছুই বুঝতে পারি না।

ট্রায়েপ—তোমাকে যখন থেকে বুঝতে পারছি না তখন থেকে আমাকেও পারছো না। তোমার মনের পরিবর্তন হয়েছে; তোমার চোখের শান্ত ভাব থেকেই বুঝতে পারছি আমার উপস্থিতি আনন্দ দিচ্ছে না।

নীনা—তুমি একটু যেন অস্থির হয়ে পড়েছ, সব সময়ই কেমন হেয়ালী হেয়ালী কথা বল। এই 'সাগর বলাকা'তেও কী যেন হেয়ালী আছে। আমাকে ক্ষমা করো, আমি এর কিছুই বুঝছি না। (সাগর বলাকাটা বেঞ্চিতে রাখলো)

ট্রায়েপ—সেদিন বিকেলে, আমার নাটকের অসমাপ্তির সাথে সাথেই এর সুরু। মেয়েরা অসমাপ্তিকে মেনে নিতে পারে না, শুধু তুমি যদি জানতে আমি কেন অসুখী? কিন্তু তোমার ঐ শান্তভাব আমার অসহ্য। এখন হঠাৎ এক সকালে উঠে দেখলুম, লেকের সমস্ত জল মাটিতে শুষে গেছে, শুকনো মাটির ফাটা গুলো আমাকে বিদ্রূপ করছে, তুমি এইমাত্র বললে, এর কিছুই বুঝতে পারছো না, বলো, এর মধ্যে যুক্তি দিয়ে বুঝাবার কী আছে? আমার নাটক কারো ভাল লাগেনি, তুমিও ভাবছো একটা মধ্য-যুগীয় নাট্যকার, বাজারের আর দশজন বাজে লেখকের মত... (পা ঘসতে ঘসতে) আমিই বা এ কী করে বুঝি? আমার

মাথার যেন হাজার পেরেক ফুটছে, আর এই দুর্বলতা সাপের মত পাকে পাকে আমার সমস্ত রক্ত শুষে নিচ্ছে... (ট্রীগরিনকে আসতে দেখে, ট্রীগরিন হাটতে হাটতে একটা বই পড়ছে দেখা গেল) ঐ আসছেন সত্যিকারের প্রতিভাবান, হ্যামলেটের মত বই পড়তে পড়তেই আগমন হলো, "কথা, আমার কথা দাও!"...সুখ এখনও তোমার হাতে আসেনি, তবে তার উজ্জ্বল আভায় তোমার শান্তমুখে হাসি ফুটছে, কোমলতা ফিরে আসছে। বিদায়, তোমার পথের বাধা হয়ে আমি দাঁড়াবো না।

(তাড়াতাড়ি পা ফেলে বেড়িয়ে গেল)

ট্রীগরিন (বই থেকে নোট নিতে নিতে) "নস্য নেয় আর ভডকা খায়,...সব সময়ই কালো পোষাক পরে। সেই ইস্কুল মাষ্টার তার প্রেমে পড়েছে।"...

নীনা—বেরিস এলিকসেভিচ্, আপনি কেমন আছেন?

ট্রীগরিন—আরে তুমি, কেমন আছ? কিন্তু ব্যাপারে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হলো আজকেই বোধ হয় তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে কী না কে জানে? তোমাদের বয়েসি মেয়েদের সংগে বড় একটা মিশি না, এই আঠার উনিশ বছরের মেয়েদের আশা আকাংখা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই, তাই আমার উপন্যাসে বা গল্পে এদের চরিত্রগুলো ঠিক ঠিক হয় না। আর ঘন্টাখানেক তোমাদের এখানে থাকবো, তাই শুনতে ইচ্ছে করছে কী তোমাদের আশা আকাংখা।

নীনা—আপনাদের ওখানে যেতে ইচ্ছে করে।

ট্রীগরিন—কেন?

নীনা—জানতে ইচ্ছে করে একজন নামকরা সাহিত্যিক কী করে জীবন কাটান। যশকে আপনারা কী করে গ্রহণ করেন।

ট্রীগরিন—কী করে? সত্যি তো কোন দিন তো এ কথা ভাবি নি। (চিন্তান্বিত)

নীনা—আপনি যখন পত্রিকাতে আপনার সমালোচনা পড়েন?

ট্রীগরিন—প্রশংসা থাকলে, বেশ ভালই লাগে আর গালাগাল থাকলে অল্প সময় দেখবার জন্য রেখে দিই।

নীনা—কী মজার? জানেন আপনাকে অনেক সময় আমার হিংসে হয়। জীবন ধারণের মধ্যে কত পার্থক্য। একদল শ্রান্ত, ক্লান্ত নিষ্কেপে একঘেয়ে জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে আর একদল, যেমন আপনি যেন এক লক্ষের মধ্যে একজন কত আনন্দ, সম্মান আর বৈচিত্র...সত্য কী সুখের...

ট্রীগরিন—আমার কথা বলছো (ঘাড় নাড়তে নাড়তে) আনন্দ, সম্মান আর বৈচিত্র ও সব আমার কাছে খিল্লী কা লাড্ডুর মত, কোন সময়ই খাবার ইচ্ছে হয় না। তুমি এখনও ছোট্টটি তাই এত ভাল লাগে।

নীনা—আপনার জীবনটা কিন্তু চমৎকার।

ট্রীগরিন—কিন্তু এতে নতুনত্ব কী আছে বলো (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আমাকে এক্ষুনি গিয়ে লিখতে হবে। মাপ করুন আমি বড় ব্যস্ত...(হাসতে হাসতে) তুমি যখন জানতেই চাইছ, বেশ তোমাকে আমার, 'চমৎকার' আর খ্যাতিমান জীবনের কথা বলছি, আমার তো এক্ষুনি রওনা হতে হবে। (একটু ভেবে) জান, এমন অনেক ভাব আছে যা রাত দিন মনের মাঝে দোলা দিয়ে বেড়ায়—রাত দিন আমার শুধু এক ভাবনা, আমাকে লিখতে হবে, লিখতে হবে, লিখতে হবে...আমি হয়ত কিছুক্ষণ আগেই একটা গল্প লিখে শেষ করেছি, অমনি নতুন আর একটা লেখার চিন্তা মাথায় এসে দাঁড়ালো, ঐটা শেষ করতে না করতেই আর একটা, আর একটা...আমি একটার পর একটা লিখেই যাচ্ছি, লিখেই যাচ্ছি। না লিখে যেন পারি না। তুমিই বলো এতে খ্যাতিই কী আর যশেরই বা মূল্য কতটুকু। পাগলের জীবন! এই তো এখন আমি তোমার সাথে বসে গল্প করছি, অথচ আমার মধ্যে অসমাপ্ত গল্প ঘুরে ঘুরে ফিরছে, ধর রাস্তায় চলতে চলতে দেখলুম, সূর্য্যাস্তের আভায় পশ্চিম আকাশে মেঘের গায় মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে, অথবা সকাল বেলাকার রোদে এক দল পায়রা পাক খেয়ে ঘুড়ছে; মনে হচ্ছে কে যেন এক মুঠো দাদা সরষে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার লেখার মধ্যে কোথায় এদের স্থান দেবো এই চিন্তা আমাকে পাগল করে দেয়। এই যে তুমি আমার প্রশংসা করছো,

এ সব আমার সাহিত্যের ঝুলি কোথায় জমা হয়ে থাকছে, সুযোগ এলেই কলমের মুখে বেড়িয়ে আসবে। লেখা শেষ হলেই, পিয়াটারে ছুটে যাই বা মাছ ধরতে বসি, এ সবের মধ্যেই বিশ্রামকে খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু বিশ্রাম কোথায় বল, আবার নতুন কোন গল্পের ভাব এসে মাথায় কামানের গোলার মত থেকে থেকে আঘাত করতে থাকে, বিশ্রাম আর হয়না আবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়। এর যেন শেষ নেই। আমি পাগলের মত মধুর সন্ধানে ঘুরে মরছি, আর ফুলে ফুলে সেই মধু কুড়িয়ে এনে ঢেলে দিচ্ছি সবার পাতে, বন্ধুবান্ধব দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে—'এখন কী লিখছ? নতুন করে কী বলছ?' এরা সব আমাকে ঠকাচ্ছে, পাগল যেমন অন্যের কথায় ওদের খুসী করার জন্য সব কিছুই করে বেড়ায়, আমিও যেন তাই। তুমিই বল আমি কী পাগল না? আমার ক'জন পাঠককেই বা জানি, তবু আমার কল্পনায় তারা ধরা দেয়। ওদের আমার বিশ্বাস নেই, বন্ধু বলে মনে করতে পারি না। পরিবেশকে আমার ভয় করে, নতুন কিছু লেখার পরই মনে হয়, আমার পরিচিত জগতের লোকেরা নিশ্চয়ই ভালভাবে একে গ্রহণ করবে না। কী সাংঘাতিক দেখ তো!

নীনা—কিন্তু প্রেরণা বা সৃষ্টির আনন্দ নিশ্চয়ই আপনার অনেক মুহূর্তকে মধুর করে তোলে।

ট্রাগরিণ—সত্যি, লেখার সময় বেশ ভালই লাগে। প্রুফ দেখতেও মন্দ লাগে না কিন্তু...কিন্তু ছাপা হয়ে বেড়িয়ে আসতেই কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়, চিনতে কষ্ট হয় সত্যি কী আমার সেই গল্প। আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না।...(হাসতে হাসতে) জনসাধারণ হয়ত পড়তে পড়তে বলবে—"বাঃ বেশ লিখেছে তো। ভাল কিন্তু টলষ্টয়ের কাছাকাছিও যেতে পারেনি। বা—"সুন্দর কিন্তু টুর্গেনিভের 'বাবা ও ছেলে' এর চাইতে অনেক ভাল।" এরা এমনি, আমার মৃত্যু পর্যন্ত বলবে "বাঃ, বেশ সুন্দর তো" কিন্তু এর বেশী কিছুই না। যখন আমি মরে যাবো, আমার কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হয়ত বলবে—"এটা ট্রাগরিণের কবর। চমৎকার লিখতেন কিন্তু টুর্গেনিভের মত না।"

নীনা—আমাকে মাপ করবেন, আপনাকে বুঝতে পারছি না। সাফল্যই আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

ট্রাগরিণ—সাফল্য? নিজেকে আমি সহ্য করতে পারি না, সাহিত্যিক হিসেবে নিজের প্রতি কোন দরদ বোধই নেই। আমি নিজেই বুঝতে পারি কী আমি লিখছি। এই মাটি, জল, আকাশ আমি ভালবাসি, প্রকৃতি আমার লেখার অদম্য ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই আমি আঁকি না, আমি একজন নাগরিক, আমার দেশকে আমি ভালবাসি, দেশের লোককে ভালবাসি। তাদের দুঃখ, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে লিখতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে আমি তাল রেখে চলতেই পারছি, মনে হচ্ছে জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুষ্ঠু রূপই আমি দিতে পারবো, কিন্তু শুধু মাত্র প্রাকৃতিক বর্ণনাতে কী হবে, আর সব জায়গায় আমার অসাফল্য।

নীনা—আপনাকে অনেক খাটতে হয় তাই নিজের প্রয়োজন ভাবার সময়ও আপনার নেই ইচ্ছাও হয়ত নেই। আপনি যাকে অসাফল্য ভাবছেন সাধারণের কাছে তাই অনেক যশমণ্ডিত। আপনার মত হলে, জীবন সাধারণের জন্য দান করে দিতাম, তাদেরকে আমার পর্য্যায়ে তুলে আনবার জন্য কাজ করে যেতাম।

মী—একাত্তিনের গলার স্বর শোনা গেল—(বাড়ী থেকে) বোরিস এলিকসেভিচ্।

ট্রাগরিণ—ঐ যাবার ডাক এলো।... জিনিষ পত্র গুছাতে হবে—যদিও যাবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। (লেকের দিকে তাকিয়ে) চমৎকার!

নীনা—ওধারে ঐ যে বাগানওয়ালা বাড়ীটা দেখছ না?

ট্রাগরিণ—হ্যাঁ।

নীনা—আমার মৃত মার বাড়ী। আমি ঐ খানেই জন্মেছি। আমি সারা জীবন, এই লেকের পাশে পাশেই

(শেষাংশ ৬৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

গগনে উদিল রবি—[মেয়েদের নৃত্যগীতি মুখর নাটিকা। স্বরলিপি সংযুক্ত] গীতি নাট্যখানি শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো) রচনা করেছেন। ১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা, সত্যব্রত লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে শ্রীতারকনাথ গুহ কর্তৃক প্রকাশিত। চল্লিশ পৃষ্ঠায় নাটিকাটি সমাপ্ত হয়েছে। মূল্য দশ আনা মাত্র। গীতি নাট্যখানি ছোট ছেলেমেয়ের দল যাতে ২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবণ নৃত্য গীতের মধ্য দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে চিরস্মরণীয় করতে পারে এই উদ্দেশ্যে রচিত। অভিনয়ের দিক থেকে মোট পনেরটি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্বের ছাপ আছে। "নৃত্য-গীত" মোট ছ' খানি। "ভোরের পাখির" নৃত্য-গীতের ভাষা ও ভাব ভালো হয়েছে, নিম্নে গানের শেষ স্তবকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

"আসবে কবি তাই মেদিনী নীরবে সব বাধা...
হৃদয়ে তার অসীম আশা, চোখে ব্যাকুলতা
সেই শোনাবে নতুন গীতি
সেই জাগাবে নতুন প্রীতি
তারি তরে গান গেয়ে তাই ঈশের আশীষ মাগি।"

কোকিলের নৃত্য-গীত খানিও বেশ লাগলো। চরিত্রের ভেতর অন্ধকার ও উষার চরিত্রটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। এখানে তারই খানিকটা পাঠক মহলে তুলে ধরলুম।

উষা—"ভোরের উষার কাপ মাখিয়ে তোমায় রঙীন করে রাখবো। তা'তে তোমার মনও রঙীন হয়ে উঠবে। যাদের শত্রু মনে করছো...তারা হয়ে উঠবে তোমার আপনার জন।"

অন্ধকার—"না—না—। তোমরা সব মায়াবীর দল। কথায় ভুলিয়ে আমায় বশ করতে চাও। তারপর সুযোগ বুঝে এই অন্ধকার পুরী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে! বেরোও সব—নইলে আমি একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো—হু!"

সংগীত প্রয়াসীদের সুবিধার্থে গীত-গুলির স্বরলিপি-ও নাটিকার সংগে যুক্ত করা আছে। গানের সুর ও স্বর সৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে শ্রীসুদীপ্ত ও শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য। নাটিকাখানি প্রথম অভিনয় হয়, "মাতৃ মন্দিরে"। আমরা আশা করি ছাত্র-ছাত্রী মহলে নৃত্য গীত মুখর গীতিনাট্যখানি খুবই সুনাম অর্জন করবে। নাটিকা খানির প্রচ্ছদপট ও ছাপা প্রশংসনীয়।

ছোটদের গল্পকথা—[চিত্রিত্রী শ্রীনীহারিকা রায়। পুস্তকখানি প্রকাশ করেছেন শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়। ১৪ বি হরদেব রোড, কলিকাতা—৩০। গল্প ক'টি লেখা শেষ হয়েছে তেইশের পাতায়। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। পুস্তক খানিতে মোট তেরটি গল্প আছে। এক একটী করে সব গুলিই পড়লুম—প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে উৎসর্গ পত্র। জীবনের অন্তরস্থলে সুখ-দুঃখ দুটী পাশাপাশি চলে। সুতরাং কেউ দুঃখকে দেখেন বড় করে, আবার কেউ সুখকে দেখেন বড় করে। সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত। নিজস্ব অভিমতকে সকল লেখকই চান এড়িয়ে যেতে। কিন্তু এই উৎসর্গ পত্রে লেখিকার ব্যথা বেদনার কাহিনীই ফুটে উঠেছে গভীর ভাবে। ব্যক্তিগত মত অন্তরের মধ্যে পোষণ করাই শ্রেয়।

গল্পগুলির ভেতর দু'একটি ভালই লেগেছে। যেমন একটি "জামাই ঠাকুর।" এতে পাঠকের "কুম্ভমেলা"র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাতে পারবে। বৃন্দাবনে কী করে রাধারাণীর নাম-করণ হলো, তা' গল্পের ছলে লেখিকা ভালোই আলোচনা করেছেন। আর একটি, "নৈতিক গল্প" ...রাত বারোটার সময় সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে ডাকতে সাহস পায় কী?

আর রঙ্গ-তামাসার ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে হাজির ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে...সেখে একই বেঞ্চে উপবেশন!...এধরণের এক প্রকার ভূত আছে তাকে "আলেয়া ভূত" বলে। পল্লী অঞ্চলেই সভায় রাত্রিতে এগুলিকে দেখা যায়। সুতরাং এ ব্যাপারটা সহরের রাজ-পথে ঘটা মানে নিছক কাল্পনিক নয় কী? এটা আমাদের খুব আনন্দ দিলো না। শেষ রচনাটি "কোজাগরী।" (কো-জাগরী) অর্থাৎ কে জেগে আছে? ঐ হুজোড়ের ভেতর দিয়ে লক্ষ্মীপূজা, আলপনা দেওয়া, কুবেরের ঝাঁপির উপু এই সব দিয়ে কোজাগরী নামের সংগে গল্পের অনেকটা সামঞ্জস্য বজায় রয়েছে। কিন্তু লেখিকা নতুন। তাই তাঁর গল্পের Environment atmosphere সঠিক জানা-শোনা না থাকায় গল্পের plot-গুলি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয় নি। লেখিকার নতুন গল্প গ্রন্থখানির প্রথমপ্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক উৎসাহ দিচ্ছি এবং পরবর্তী গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্তমান অপেক্ষা আরও কিছু নতুন প্রত্যাশা করবো।

লাল টিপের কাব্য— (কবিতা পুস্তক)

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায় রচনা করেছেন। প্রকাশ হয়েছে ৩৫৷১ আপার চিৎপুর রোড, রুম নম্বর কলকাতা থেকে। মোট সাতটি কবিতা, ভেইল পাতায়। মূল্য ছ' আনা মাত্র।

লাল টিপ দেওয়া কাব্যখানি দেখে বেশ কিছু আশা নিয়ে এক একটি করে পাতা খুলে পড়লাম। প্রচুর আশার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পদ্য কবিতায় ভাব ও ভাষা আরও উন্নত হওয়া দরকার ছিল।

"একটি দুপুরের স্বপ্ন" কবিতায় কবি লিখেছেন, তার খানিকটা নমুনা দিচ্ছি।

"তাই এই নির্জন নিরুম দুপুরে
তুমি পরে এসো একখানি ফিকে নীল রাঙা শাড়ী
তা' মিলে যাক্ তোমার দেহের প্রতিটি কুঞ্চনের সংগে
খুলে দাও তোমার কালো চুল তোমার পিঠের উপর,
সিগ্ধ গন্ধের তৃপ্তিতে ভরে উঠুক আমার প্রাণের উদর।"

কড়া রৌদ্রে দুপুর বেলায় এই ধরণের স্বপ্ন। এতো খোলাখুলি ভাষায় পাঠক সমক্ষে না প্রকাশ করলেই আমাদের মনে হয় কবি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। "গুচ্ছ" কবিতাটিতে তিনি নানা রকমের ছন্দের মূর্ছনা দেখিয়েছেন। তার গুটিকয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলুম।

"মধ্য দিবসে
উড়ে চলে যায়
যৌবন-রাঙা পাখি
ধাত্ত আশায়
গান গায় মন
আলপনা দেয় আঁকি
কল্পনা বীণা বাজে
রক্ত কণিকা নাচে।"

পরিশেষে—সমস্ত কবিতাগুলিকে পড়ে প্রাণখোলা প্রশংসা না করতে পারলেও ভবিষ্যতে নতুনের কিছুটা অপেক্ষা রাখে।

বিশ্ব-বৈতালিক—

কবিরত্ন বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী, রচিত। প্রকাশ করেছেন বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

বিশ্ব-বৈতালিক গীতি কবিতার বই। মোট একশ ত্রিশটি গীত কাব্যখানিতে স্থান পেয়েছে। পুস্তকের ভূমিকায় কবি নিজস্ব কয়েকটি মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি একটি জায়গায় লিখেছেন, "অতীতের সংগে সম্বন্ধ সামঞ্জস্য রেখে গীতাঞ্জলি' প্রবর্তিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভাবান্বিত বর্তমান যুগের উপাদান দিয়ে ভবিষ্যৎ

বহু কাব্য সাহিত্যের যে কি পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা তারই ইংগিত এই কাব্যগুলির মধ্যে সূচীত হয়েছে।" মূলতঃ পুস্তকখানিতে বিশেষ একটি লক্ষ্য করবার বিষয় রয়েছে—সেটি হচ্ছে যে—"আমার"—নিজস্ব সব কিছু নিয়ে রচনা ক'টি রচিত। সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে, বিরহে মিলনে, আশায় নিরাশায়, আলোকে অন্ধকারে সবার প্রাণে অনুভূতি জাগাবার জন্য কবি এই ছন্দ সুরের অবতারণা করেছেন তাঁর কাব্যের ভেতর। গীতি-কাব্য-গুলি পড়লে মাঝেমাঝে একটু রাবেন্দ্রীক ভাবের ছোঁয়া জানার অভাব পাঠক পাবেন। যদিও উপরোক্ত ভূমিকায় কবি নিজেও স্বীকার করেছেন—তবু নিজস্ব একটা ভাবধারা ও ভাষা থাকাই শ্রেয় বলে পাঠক আশা করেন। অবশ্য তাঁর সমস্ত রচনার ভেতরই যে এমন ত্রুটী তা নয়। কতকগুলি রচনা ভাবে ও ভাষাতেও যেন সমৃদ্ধ, যেমন সাবিত্রিদেবীর রচনায় আমরা পেলাম দেবতাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

"এস এস তুমি—এস তব কর্ম্মে
জাগ্রত ভুবন মানবের ধর্ম্মে,
তুলে দাও অর্ঘ তব দেবের চরণে;
লতায় পাতায় ফুলে ফলে আর,
জীবনের ধারা বহে অনিবার;
জীবন দেবতা নব জাগ্রত ভুবনে।"

কবির রচিত কাব্যের মধ্যে তিনি যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন তার সফলতা এবং ভবিষ্যতেও প্রচুর নতুনের সম্ভাবনাই আমরা কামনা করছি।

সাগর বলাকা

(৬৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কাটাচ্ছি, এর প্রতিটি অণুপরমাণু আমার পরিচিত।

ট্রীগরিণ—তাই নাকী? (সাগর-বলাকাটী লক্ষ্য করে) ওটা কী?

নীনা—সাগর-বলাকা। কনষ্টানটিন গেওরিলেভিচ শিকার করেছেনে।

ট্রীগরিণ—চমৎকার পাখীটা তো। সত্যি আমার চলে যেতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। এরিন নিকোলেভে-নাকে বলে দেখো না। (নোট বইয়ে কী যেন নোট নিল।)

নীনা—কী লিখছেন?

ট্রীগরিণ—একটা নোট নিলাম। নতুন একটা—গল্পের ভাব মনে এসেছে—(নোট বইটী সরিয়ে রেখে) একটা ছোট গল্পের ভাব, এক লেকের ধারে বাস করতো একটি সুন্দরী মেয়ে, যেমন তোমার মত, ছোট থেকেই সে ওখানে মানুষ, সে লেককে সাগর বলাকার মত গভীর ভাবে ভালবাসতো। আর সে এখানে সুখে ও নির্বিঘ্নেই দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ এলেন বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক, তিনি তাকে দেখলেন, তার জীবনে বিপর্যয় সুরু হলো তখন থেকেই। যেমন এই সাগর-বলাকাটি ধরে পড়ে আছে।

(জানালায় মী একাজিনকে দেখা গেল)

মী—বোরিস এলিকসেভিচ, কোথায় তুমি?

ট্রীগরিণ—এক মিনিট, এখুনি আসছি। (যেতে যেতে নীনার দিকে ফিরে ফিরে তাকাল।)

নীনা—(সামনের দিকে এগুতে এগুতে ভাবে) স্বপ্ন না সত্য।

পর্দা পড়লো।

যতীনদা :—বগুড়ার যতীন রায় রাজনৈতিক কর্মী মহলে যতীনদা ব'লেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরলোক গমণের সংবাদ যদিও আকস্মিক নয়, তবুও আমাদের নিকট নিতান্তই বেদনাদায়ক। বহুদিন যাবতই তিনি অসুস্থ ছিলেন; কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভের অঙ্গ স্বরূপ বঙ্গবিভাগের ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি ভেঙ্গে পড়ে। বঙ্গবিভাগের পরেও কিছুদিন তিনি বগুড়াতে ছিলেন; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে তাঁর ভাবপ্রবণ মন তা সহ্য করতে পারলনা।

যতীন্দ্র মোহন রায়

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে যতীনদার রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়। যদিও তাঁর পৈতৃক বাসস্থান যশোর জেলায়, তবুও কলেজে পড়বার উপলক্ষে রাজসাহী কলেজে ছাত্ররূপে সমস্ত উত্তর বঙ্গকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেন আজ পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের সাতটি জেলার মধ্যে এমন রাজনৈতিক কর্মী খুব কম পাওয়া যাবে যাঁরা যতীনদার শিক্ষায় ও দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। তাঁদের অনেকের কাছেই যতীনদা ছিলেন রাজনৈতিক গুরু।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর যে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হয় উত্তর বঙ্গে যতীনদা ছিলেন তার পুরোধা। অরবিন্দ, বারীন ও যতীন মুখার্জীর যুগান্তর আন্দোলনের উত্তর বঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন যতীন রায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের আবর্তকে যতীনদা রোধ করতে পারেন নি, উত্তর বঙ্গের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। যতীনদা ছিলেন স্বভাবতঃ অত্যন্ত শান্ত, মৃদুভাষী ও স্নেহপ্রবণ। শিক্ষকের কার্যই তাঁর প্রকৃতির অনুকূল ছিল। তাই বগুড়াতে শিক্ষকের কার্য অনেক বছর পর্যন্ত ক'রেছেন। চিরকুমার যতীন রায় যুবকদের চরিত্র গঠন ও জনসেবার কাজকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলেন; রাজনৈতিক কর্ম যদিও বাহ্যতঃ তাঁর জীবনের প্রায় সবক্ষণের কাজ ছিল কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও সেবাব্রতী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চার বৎসর অন্তরীণ আবদ্ধ থেকে যখন খালাস হলেন তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দামামা বেজে উঠেছে। যুগান্তর দলের অন্যান্য কর্মীদের মত তিনিও অসহযোগ আন্দোলনকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ক্রমে বাংলার নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীদের অন্যতম ব'লে যতীনদা বাংলায় পরিচিত হলেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও পরে '৩০ ও '৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যতীনদা বারবার কারারুদ্ধ হ'য়েছেন। এই চঞ্চল রাজনৈতিক জীবনের মধ্যেও তিনি গঠনমূলক কাজ ভোলেন নি। বগুড়ার গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠানই এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। '৩০ সালের আন্দোলনের সময়ে ইংরেজ সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করে ও বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করে। বহু চেষ্টার পরও গণমঙ্গলকে বে আইনী ঘোষণা ক'রে যে আদেশ তা রহিত করান যায়নি, যদিও কয়েক বৎসর পর জমি ও ঘর করবার যতীনদার অধিকারে সরকার ছেড়ে দিয়েছিল।

গণমঙ্গল হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; অনেক মুসলমান কর্মী ঐ আশ্রমে থেকে কাজ ক'রেছেন। যতীনদা নিজেও যুগান্তর দলের ঐতিহ্য অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভাবের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। বহু মুসলমান যুবক যতীনদার অনুরাগী ও অনুরক্ত ছিল।

গত দুই বা আড়াই বৎসর যাবৎ প্রায় অসুস্থ অবস্থাতে তিনি কলকাতা ছিলেন, হাঁটাচলা করতে বিশেষ অসুবিধাই বোধ করতেন। তাঁর প্রিয় কর্মভূমি বগুড়া থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থ সঞ্চয় তিনি কোনদিন করেন নি, কাজেই আর্থিক অসচ্ছলতাও তখন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। কয়েকজন রাজনৈতিক ভক্ত ও অনুরাগীদের সঙ্গেই অনেক সময় তিনি বাস করতেন। এই অবস্থায় কয়েকবার তাঁর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছি। মনে হ'ত, অতীতের একটা ভগ্নাবশেষ।

এর পর এল গুরুতর পীড়া। হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। কয়েক খণ্ড হাড়ের উপর চামড়ার ক্ষীণ আবরণ বিছানায় পড়ে আছে, কোন হুঁস নেই; নাকে নল দিয়ে খাওয়ান হয় অল্প অল্প ক'রে। তাই সর্বক্ষণের জন্যেই নাকের ভিতর দিয়ে নল চালিয়ে রাখা হয়েছে। মনে হয়েছে বগুড়ার যতীন রায়ের এমন ক'রে বেঁচে থাকার কোনই সার্থকতা নেই। হাসপাতালে তিন মাসের উপর প্রায় ঐ অবস্থাতেই তিনি ছিলেন এবং হাসপাতালেই তাঁর জীবন বারু নিঃশেষিত হয়েছে। শুনেছি, যখন তাঁর জ্ঞান ছিল হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে তিনি প্রতিবাদ ক'রেছেন, এমন করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসের বিরুদ্ধে। মুখ দিয়ে তিনি আহার্য গ্রহণ করতে অস্বীকার ক'রেছিলেন; কারণ তাঁর জীবনের আর কোন প্রয়োজন ছিল না ব'লেই তিনি মনে করতেন। তা থেকেই নাকে নল দিয়ে খাওয়ান শুরু হয়।

সমস্ত দেশকে তিনি আপনার ঘর ব'লে জানতেন এবং সমগ্র দেশবাসী ছিল তাঁর স্বজন। তাঁর মৃত্যু তাঁর এই সঙ্কল্পেরই প্রতিরূপ। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল দীর্ঘ দিনের ও অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁর মৃত্যু আমাদের নিকট স্বজনের মৃত্যুর তুল্য। সমস্ত জীবন দিয়ে যে আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন আজ তাঁর মৃত্যুর পর দেশের যুবকদিগকে সেই আদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন বা যে যুগে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তা ছিল একটা উন্মাদনার যুগ; সেই উন্মাদনার বশে যতীনদার সমগ্র জীবন চালিত হয়েছে; আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লাভ লোকসানের হিসাবের দিনে সে উন্মাদনার কথা ক'জন শুনবে জানিনা। তবু যতীনদার স্মৃতি আলোচনা করতে গিয়ে সেই সব কথাই মনে আসে।

সাধারণতন্ত্রের প্রথম বছর:—গত বছর ২৬শে জানুয়ারী আমাদের নতুন শাসন বিধান প্রবর্তন ক'রে ভারতবর্ষকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হ'য়েছে। সে থেকে এক বৎসর অতীত হ'ল। ১৯২৯ সাল হ'তে ২৬শে জানুয়ারী আমাদের স্বাধীনতা সংকল্প গ্রহণের দিন হিসাবে প্রতিবৎসর পালিত হ'য়েছে। সেই হিসাবে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন ব'লে ২৬শে জানুয়ারীকে ধার্য করা সমীচীন হ'য়েছে। তারপর এক বৎসর অতীত হ'ল; এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বাৎসরিক উৎসব ভারতের সর্বত্র পালিত হ'য়েছে।

গত এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমরা কতটা পালন করেছি সে হিসাব নিলে উৎসব করার বিশেষ

উৎসাহ লোকের থাকে না। ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছি আজ সাড়ে তিন বছর হল; সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক বছর হ'ল, এই সবই হ'ল রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা। যতদিন সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতাকে রূপ দিতে না পারি ততদিন জনসাধারণের পক্ষে এর কোনই মূল্য নাই। আজও দেশের জনসাধারণ আমাদের এই স্বাধীনতার কোন পরিচয় পায়নি। গ্রাম থেকে সুরু ক'রে প্রায় ওপর পর্যন্ত পূর্বের শাসন যন্ত্র এবং শাসন ব্যবস্থা এখনও চলছে; কোনদিকে কোন পরিবর্তন তারা দেখেনা। বরং পূর্বের চেয়ে তাদের ভাত কাপড়ের অভাব বেড়েছে; তারা দেখছে শাসন ব্যবস্থা পূর্বের চেয়েও অসহতার বেশী জড়িত হয়েছে। দেশের শাসন কার্যের সঙ্গে কোন যোগই তারা উপলব্ধি করছে না। শব্দের অর্থে সাধারণতন্ত্রের মানে জনসাধারণের শাসন এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই তা চালিত কিন্তু আজ জনসাধারণ এই তিনের কোনটারই কোন লক্ষণ দেখতে পায় না। কাজেই সাধারণতন্ত্রের নামে তাদের মনে কোন উৎসাহ বা আশার সঞ্চার হয় না। এ অবস্থায় সাধারণ তন্ত্রের বাৎসরিক উৎসব করার সার্থকতাও আমরা কিছু দেখি না। কোন একটা হৈ চৈ ব্যাপার ঘটলে লোকে ভীড় করে দেখতে আসে। জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় ইংরেজ সরকারের আমলেও তাদের বহু উৎসবে জনসাধারণ ভিড় ক'রে দেখতে গিয়েছে। সরকারী খরচায় সরকারের নির্দেশে ও সরকারী লোকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত উত্তেজনা মূলক উৎসবের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ কদাচিৎ থাকে। জাতীয় সরকারের প্রধানগণ দেশের জনসাধারণকে একদিন জানতেন। আজ যদি তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে যোগ হারিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মনের ভাষা যদি আজ বুঝতে না পারেন তবে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

আমরা আশা করি আগামী বছর এই উৎসবের পূর্বে দেশের শাসনকর্তাগণ তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যাতে দেশের জনসাধারণ এই সাধারণতন্ত্রকে নিজেদের জিনিষ বলে গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য বিশেষ প্রয়োজন দেশের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন—কার্য-ক্রম ও পদ্ধতি উভয় দিকে। আমাদের নতুন শাসন বিধানে বলা হয়েছে স্থানীয় গ্রাম্য ব্যাপারে অনেকটা স্বয়ং স্বাধীন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন করা হবে। আমরা মনে করি তেমনি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা ক'রে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন কার্যের সহিত সংযুক্ত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, লোকের অন্ন বস্ত্রের অভাব সাধ্যমত করা। দৈনিক ৩½ ছটাক, ৪ ছটাক বা ৪½ ছটাক চাল বা গম দিয়ে লোককে স্বাধীনভাবে কথা বলতে বলা তারা তা শুনতে চাইবে না। পেটের ভাতের এই অবস্থা বা পরবার সামান্য কাপড়ের জন্য জনসাধারণের দুর্গতির কথা কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। জনতার এই প্রকৃতি মৌলিক অভাব দূর করা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিৎ।

কোরিয়া ও চীন:—কোরিয়া ক্ষুদ্র দেশ: বলা চলে বিরাটকায় চীনের অঙ্গ থেকে একটা টুকরা যেন ঝুলে পড়েছে। আকারে ছোট হ'লেও কোরিয়া প্রাচীন দেশ; প্রায় ২৫০০ হাজার ৩০০০ বছর পূর্বেও এর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় কোরিয়া বরাবরই নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ছিল ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে গ্রাস করে; সেই থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত কোরিয়া জাপানের অধিকারেই ছিল। ঐ যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ৩৮° অক্ষরেখা পর্যন্ত আমেরিকার অধিকারে আসে এবং ৩৮° ডিগ্রীর উত্তরে কোরিয়ার অপর অংশ রুশিয়ার অধিকারে যায়। এই উভয় দেশই সাময়িক ভাবে ঐ সব অঞ্চল অধিকার করবে এবং যথাসম্ভব সত্বর সংযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্র স্থাপন করা হবে—এই ছিল যুদ্ধ অবসানের সময় সর্ত। যুদ্ধের সময় যারা ছিল মিত্র, যুদ্ধ অবসানের পর তারা আবার তাদের পূর্বের বৈরী ভাবে ফিরে যায়। তার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াতে দুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তির খেলা চলতে থাকে;

উত্তর কোরিয়াতে রুশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াতে আমেরিকা নিজ আদর্শ অনুযায়ী ও স্বার্থের অনুকূল মনোভাব ও প্রতিষ্ঠান দু'অঞ্চলে গ'ড়ে তুলতে লাগল।

উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমে অনিবার্য হ'য়ে উঠল। গত বৎসর জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়া হঠাৎ দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। এই কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে উত্তর কোরিয়ার এই অভিযানের পিছনে রুশিয়া ও চীনের প্ররোচনা ও উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। যুক্ত রাষ্ট্রসংঘ হ'তে এই সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে যুক্ত রাষ্ট্রসংঘের তরফ হ'তে কোরিয়াতে সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সামরিক অভিযানের দায়িত্ব প্রধানতঃ আমেরিকার ওপরেই পড়ে; অন্যান্য দেশ নামমাত্র কিছু সৈন্য পাঠিয়ে যুক্ত রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশকে মান্য ক'রেছে। এই ভাবে সামরিক অভিযান প্রেরণের প্রস্তাবে ভারত মত দেয়নি; তবুও যুক্ত রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হিসাবে ভারতকে ঐ প্রস্তাব মানতে হয়। সেই অনুসারে ভারতবর্ষ একদল ডাক্তার ও Ambulance corps কোরিয়াতে পাঠায়। রাষ্ট্রসংঘের নামে আমেরিকার যে সৈন্যবাহিনী কোরিয়াতে ছিল, তারা প্রথমটায় কোনই সুবিধা করতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ কোরিয়ার জনসাধারণ এই সামরিক অভিযানকে ভাল চোখে দেখতে পারেনি এবং জনসাধারণ বহু রকমে তাদের বিরোধিতা ক'রেছে। পরে সামরিক সম্ভার ও বিশেষ ক'রে হাওয়াই যুদ্ধ উপকরণের আধিক্যের ফলে তারা জয়লাভ করে। জয়ের উৎসাহে তারা যখন ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম ক'রছিল, তখন ভারত তাতে আপত্তি ক'রে জানিয়েছিল যে এর ফলে অবস্থা আরও জটিল হবে এবং হয়ত বা কম্যুনিষ্ট চীন প্রত্যক্ষ ভাবে কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে।

কার্যতঃ হ'য়েছিলও তাই। প্রায় দুই লক্ষ চীনা সৈন্য উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সংঘের সৈন্য বাহিনী আবার তাড়া খেয়ে দক্ষিণে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্র সংঘ হ'তে চীনকে আক্রমণকারী (aggressor) ব'লে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই সময় ভারত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে রুশিয়ার অনুগত রাষ্ট্রদের সঙ্গে ভোট দেয়। ইতিমধ্যে সামরিক অবস্থার আবার পরিবর্তন সুরু হ'য়েছে। কোরিয়ার প্রধান নগর ও বর্তমানের রাজধানী সিওল ইতিমধ্যে তিনবার হস্তান্তরিত হয়েছে। হয়ত শীঘ্রই চীনাবাহিনীর হাত হ'তে আমেরিকার অধিকার সিওলে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কোরিয়ার এই যুদ্ধ কার্যতঃ আমেরিকা ও রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। বিশ্ব রাজনীতিতে কোন্ রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও সামাজিক ও আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, এই হ'ল প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু। এই দুই বিরাটকায় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দরিদ্র ও নিরীহ কোরিয়াকে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হ'চ্ছে। কোরিয়ার অধিবাসীদের প্রতি সেই হেতু আমাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে। তাছাড়া আমরা চাই এশিয়ার প্রত্যেক জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালিত করে। গত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ রুশিয়া, জাপান ও চীনের মধ্যে কোরিয়ার আধিপত্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লছিল। তাতেও কোরিয়ার লাঞ্ছনা কম হয় নি। আজ জাপানের স্থলে আমেরিকা এসে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও জটিল ও সঙ্কটময় ক'রে তুলেছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে শীঘ্র যে কোরিয়ার ভাগ্যে শান্তি ও স্বোয়াস্তি মিলবে এমন আশা করা কঠিন। কোরিয়ার ব্যাপারে ভারতবর্ষ যে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চ'লেছে, এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র মোটামুটি তা সমর্থন ক'রেছে। যুক্তরাষ্ট্র সজ্ঞ সামরিক অভিযান দিয়ে কোরিয়া সমস্যার মীমাংসা করতে চাইবে, আমরা যদিও এর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান তবুও যদি তাড়াতাড়ি কোরিয়াবাসীদের দুর্গতির অবসান এতে হয় আমরা সুখী হব। সংযুক্ত কোরিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের ঘর গুছিয়ে চলবার শক্তি সঞ্চয় করুক এই আমাদের কামনা। আমেরিকা ও রুশিয়া কারুরই মাতব্বরি কোরিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা তার ঘোরতর বিরোধী।

উত্তর প্রদেশে জমিদারী প্রথা লোপ :— জমিদারী প্রথা লোপ করা সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বহু বছর পূর্বেই স্থির হয়ে আছে। ভারতের নূতন শাসন বিধানের ৩১ ধারা অনুসারে কোন সম্পত্তি সরকার কর্তৃক গ্রহণ করতে হ'লে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে জমিদারী প্রথা লোপ করা খুব সহজ সাধ্য নয়। শাসন বিধান তৈরীর সময় এই ধারা নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজে জমিদারী প্রথা লোপ করার উদ্যোগে আইনের খসড়া তার বহু পূর্বেই প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থিত করা হয়েছিল। তাই বিচার ও উত্তরপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বিশেষ করে চেষ্টা করেছিলেন, যে শাসন বিধানের ধারা যেন জমিদারী প্রথা লোপ সাধনের অন্তরায় না হয়। অনেকটা তাঁদেরই আগ্রহে ও শ্রীজহরলাল নেহেরুর চেষ্টায় শাসন বিধানের ৩১ ধারাটি কতকটা কার্যোপযোগী করা হয়েছে।

প্রায় দুই বছর চেষ্টার পর উত্তরপ্রদেশের জমিদারী প্রথা লোপ করার আইন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। শাসন বিধানের ধারা অনুসারে এই আইন ভারতীয় সাধারণ তন্ত্রের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর সাপেক্ষ এবং রাষ্ট্রপতি এই আইন অনুমোদন ক'রে তাঁর স্বাক্ষর দিয়েছেন। গত ২৬শে জানুয়ারী হ'তে এই আইন চালু হ'ল এবং ছোট বড় ২,০০,০০০ লক্ষ জমিদারী ও তালুকদারী এই আইনের বলে লোপ পাবে। অবশ্য জমিদার ও তালুকদারদের একটা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পন্থ বিশেষ ক'রে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এই আইন প্রচলিত করলেন। কারণ, গত ২০ বছর যাবৎ ২৬শে জানুয়ারী আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। আমরা পন্থজীর এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করছি এবং এর সাফল্য কামনা করছি।

উত্তরপ্রদেশের জমিদার ও তালুকদারগণ এই আইনের যথাসাধ্য বিরোধিতা করছে, তারা আদালতে নালিশ রুজু করেছে যে এই আইন শাসন বিধানের বিরোধী। আমরা আশা করি, তাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হবে। পন্থজী বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, শাসন বিধানের বিরোধী কোন আইন তিনি পাস করবেন ব'লে আমরা মনে করি না, অবশ্য আদালতের সিদ্ধান্ত কি হবে, তা নিয়ে আমাদের বলবার কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে পশ্চিম বাংলার কথা। সেখানে আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন খসড়া আইনও ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হয়নি। অন্যান্য প্রদেশেও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা হয়নি। অথচ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠিত ভূমি আইন তদন্ত কমিটি (Agrarian Inquiry Committee) সুপারিশ করেছে, জমিদারী প্রথা লোপ করতে হবে। তা সত্ত্বেও যে কংগ্রেস সরকার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়নি এটা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক বাণিজ্য— ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান একই ভৌগোলিক দেশকে কেটে জন্মলাভ করেছে। ইতিহাসের সৃষ্টি হ'তে এখনকার পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ একই দেশ ব'লে পরিচিত ছিল। এদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বরাবরই একই ছিল। ইংরেজ আমলে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য আরও বেশী দৃঢ় হয়েছিল। তারপর হঠাৎ ইংরেজের সাম্রাজ্যিক কূটবুদ্ধির চক্রান্তে দেশ বিভক্ত হ'ল। এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান দুটো দেশ গঠিত হ'ল।

রাজনৈতিক এই বিভাগের ফলে উভয় অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ আর্থিক ও সামাজিক যোগ ছিন্ন হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রেরণায় উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ উভয় রাষ্ট্রকে স্ব স্ব প্রধান ও স্বতন্ত্র ভাবে চালাতে মনস্থ করলেন। পশ্চিম দিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোকের অদল বদল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে; তাই তাদের নিত্যকার লেনদেনের যোগাযোগ বিশেষ থাকেনি। কিন্তু পূর্বদিকে পশ্চিম ও পূর্ববাংলার মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত নিত্যকার জীবনে উভয় বাংলা এখনও ঘনিষ্ঠ

ভাবে জড়িত। তাছাড়া জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পাকিস্তানের তুলা, পাট, কাঁচাচামড়া ও অন্যান্য কাঁচা মাল ভারতের বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অপরদিকে ভারতের কয়লা, কাপড়, সাবানের তেল ও অন্যান্য দ্রব্য পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব খাদ্য শস্যের দিকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল; বরাবরই ওখানকার গম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আসত। আজ রাজনৈতিক আড়াআড়ি এমন স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে যে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে। তার ফলে ভারতের পাট কল ও কাপড়ের কলগুলো পাট ও তুলার অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে; পাকিস্তানের ষ্টীমার, ট্রেণ কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; খাদ্য শস্যের জন্য ভারতকে দূর দূর দেশে ছুটতে হচ্ছে, আর, অপর দিকে পাকিস্তানের কৃষক তার গম ও পাটের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। উভয় দেশের জনসাধারণের যে কি কষ্ট হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া, উভয় দেশের আর্থিক স্বার্থের পক্ষে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত আত্মঘাতী।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বহু বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও বিবাদ আছে। সে সব বিবাদের মূল কারণ হ'ল ইংরাজ শাসনের কুফল হিসাবে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল তারই বিস্তার। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ হয়েছে। কিন্তু বিভাগের পরও সে বিদ্বেষের অবসান হয়নি। আজও উভয় দেশের শাসনকর্তারা, পুরান মনোভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেনি। অবশ্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের দাবী পাকিস্তানের তরফ হ'তেই এসেছিল; আজ যাঁরা ভারতের কর্মকর্তা তাঁরা কোনদিন সাম্প্রদায়িক দাবী তোলেন নি, কাজেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁদের মধ্যে তেমন প্রবল নয়। ভারতের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই সব কারণে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক প্রভাব কম থাকা স্বাভাবিক। তবুও স্বাধীনতা লাভ ও ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে ভারত তেমন উদার ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেনি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাদের কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা চলে না।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে আজ ঝগড়া চলছে তার কোন সহজ মীমাংসার সম্ভাবনা আমরা দেখিনা। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক আছে কিন্তু তাই ব'লে অবস্থাকে আরও জটিল করার মত এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্টকে বাড়িয়ে তোলার মত নতুন ঝগড়ার সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে আমরা মনে করিনা। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের নদীর জল নিয়ে যে বিতর্ক তার সঙ্গে উভয় বাংলার জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক নেই। অথচ তার জন্য মার খাচ্ছে উভয় বাংলার জনসাধারণ। পূর্ববাংলার পাটের দর কৃষকরা যা পায় তা'তে তাদের জীবনযাত্রা চলেনা; কয়লার অভাবে তাদের যাতায়াতের বাহন ট্রেন ও ষ্টীমার বন্ধ হয়। অপর দিকে কলকাতার পাটের কল বন্ধ হ'য়ে গেলে সেখানকার হাজার হাজার শ্রমিকদের জীবিকা বন্ধ হবে। কাশ্মীরের কি হ'ল বা পাঞ্জাবের নদীর জল কার খালে কতটা প্রবাহিত হ'ল তা'তে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের পেটের ভাত ও পরণের কাপড় জুটবে না। এ বিষয়ে উভয় বাংলার লোকদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ভারতের ব্যবসায় ও ইণ্ডাষ্ট্রি মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব সেদিন বলেছেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা হ'তে যদি উভয় রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মৌলিক পরিবর্তন হয় তা হ'লে আমরা সুখী হব। উভয় রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে দেশ বিভাগের সাথেই স্বাভাবিক ও নৈসর্গিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি।

খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস :—ভারতের প্রায় শতকরা ৩০ জন লোক এখন তাদের খাদ্য পায় সরকারী বরাদ্দ (Ration) অনুসারে। বহুদিন যাবৎই খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিলনা। আমাদের দেশের লোক সাধা-

প্রধানতঃ গরীব; তাদের প্রধান আহার্য হ'ল ভাত, রুটি। অন্য কোন সহায়কারী খাদ্য (Subsidiary food) তাদের জোটেনা। সেই হিসাবে একজন বয়স্ক লোকের দৈনিক প্রয়োজন হয় আধসের চাল বা আটা, কিন্তু সরকারী বরাদ্দ বহুদিন যাবৎই ছয় ছটাকের উপর ছিলনা। আমাদের দেশের বহু সংখ্যক লোক মাছ মাংস খায় না; অনেকের আর্থিক অবস্থায় তা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়না। দুধ, ঘি আজ দুর্ঘট ও দুর্মূল, তরি-তরকারীও সহজলভ্য নয়। বিলাতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে খাদ্য শস্যের বরাদ্দ যখন কম থাকে তখন মাংস, মাখন ইত্যাদি দিয়ে পুরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়; আমাদের দেশে তা সম্ভব না হওয়াতে খাদ্য শস্যের এই প্রকার ঘাটতি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। গত যুদ্ধের সময় বাংলা দেশ এবং পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ সমূহের লোকদের পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তারপর হ'তে এই সাত আট বছর প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের লোক অ-পর্যাপ্ত খাদ্যে দিন কাটিয়েছে।

সম্প্রতি খাদ্য বরাদ্দ আরও হ্রাস ক'রে সাড়ে চার ছটাক করা হয়েছে। জনসাধারণের এতে যে কেবল অসুবিধা হবে তা নয়, তাদের অনেককে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হবে। যে সব অঞ্চলে বরাদ্দ মত খাদ্য শস্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার সর্বত্রই চোরাবাজারে খাদ্য শস্য যথেষ্ট পাওয়া যায়, কাজেই খাদ্যের মৌলিক ঘাটতি দেশে আছে একথা অনেকে স্বীকার করতে চাননা। আমাদের বিশ্বাস, খাদ্য শস্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষ স্ব-পর্যাপ্ত নয়। বরাবরই ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হ'তে প্রায় দেড়শত লক্ষ মণ চাল আমদানি করত। তাছাড়া অন্যান্য দেশ হ'তেও কিছু খাদ্য শস্য ভারতে আসত। ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ব বাংলা আজ ভারতের বাইরে; এই তিনটিই খাদ্য শস্যের ব্যাপারে বাড়তি অঞ্চল ছিল। কাজেই খণ্ডিত ভারত—প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ ক'রে লোক যেখানে বাড়ছে,—তা আজ খাদ্য শস্যের ব্যাপারে স্ব-পর্যাপ্ত হ'তে পারে না। সরকারী হিসাবে ভারতবর্ষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের অর্থাৎ এগার বার কোটি লোকের খাদ্যের ঘাটতি আছে। কিন্তু চোরা বাজারে যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় ঘাটতির পরিমাণ এত বিপুল নয়।

সরকারী শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় এমন কিছু ত্রুটী আছে যার ফলে উপযুক্ত মত খাদ্য সংগ্রহ করা যায় না। যে মূল্যে গ্রামাঞ্চল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা হয় তা কৃষকদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাজারে যে মূল্যে চাল, গম, বিক্রী হয় তার সঙ্গেও এই সংগ্রহ মূল্যের (Procurement price) পার্থক্য অনেক বেশী। তার ফলে সরকারী গুদামে যথেষ্ট পরিমাণ চাল, ডাল আসে না। অথচ সরকার হিসাব করে সব সময় তাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দিয়ে। অবশ্য তাদের গুদামজাত শস্যের থেকেই যখন বরাদ্দের শস্য বন্টন করতে হবে তখন এছাড়া তাদের কোন উপায়ও নাই। তবে একটা কাজ অন্তত তারা করতে পারে—চোরা বা কালো বাজারের চাল খোলা বা সাদা বাজারে লোকে কিনতে পারে তেমন অনুমতি তাদের দেওয়া উচিত। চোরা কারবারকে যখন তারা বন্ধ করতে পারেনি এবং চোরা বাজারে যখন প্রাণ-ধারণের উপযোগী শস্য পাওয়া যায় তখন অন্তত সরকার ব'লে দিতে পারে যে বরাদ্দের অতিরিক্ত চাল খোলা বাজার হ'তে কিনতে পারবে। শস্য সংগ্রহের সময় এমনি খোলা অনুমতি সরকারের পক্ষে হানিকর হ'তে পারে কিন্তু অন্য সময়ে এতে কোন হানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখি না।

আমেরিকা হ'তে বিশ লক্ষ টন অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ কোটি মণ গম বিনামূল্যে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। আশা করা যায়, এই গম পাওয়া যাবে। ভারতীয় মুদ্রায় এর মূল্য প্রায় নব্বই কোটি টাকা। আর্থিক হিসাবেও আমেরিকার এ দান খুব নগণ্য নয়। কিন্তু তাছাড়া আজকার এই খাদ্য সঙ্কটের সময় সাড়ে পাঁচ কোটি মণ গম পাওয়া ভারতের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আশা করা যায়, এই শস্য পেলে আগামী বৎসরে আমাদের খাদ্যকষ্টের অনেকটা লাঘব হবে।

এইভাবে বিদেশী রাষ্ট্রসাহায্যের উপর ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশ নির্ভর করতে পারে না। আমেরিকা আজ গম দিচ্ছে বিনা সর্তে এবং অনেক বিষয়ে ভারত সরকার কর্তৃক তার মতের ও স্বার্থের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও। কিন্তু তবু একথা ভুললে চলবে না যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খাদ্য একটা গুরুতর অস্ত্র। আমেরিকা খাদ্য দিচ্ছে বিনা সর্তে কিন্তু বিনা আশায় নয়। সে আশা হ'ল—বিশ্ব রাজনীতিতে ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভারতের সমর্থন লাভ। আমেরিকা যদি দেখে সে সমর্থন ভারত থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন ভারতকে খাদ্য দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য সে লালায়িত হবে না। কাজেই খাদ্যের ব্যাপারে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা চলে না; ভারতকে খাদ্যের ব্যাপারে স্ব-পর্যাপ্ত হ'তেই হবে।

কংগ্রেসের ঐক্য প্রচেষ্টা :—আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের সংস্থার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিধানের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও মৌলানা আজাদ সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু একে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব কে নেবে তাই হ'ল সমস্যা। আজ যাদের হাতে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পড়েছে, তারা কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত নয়; তারা চায় কংগ্রেসের নাম ও খোলসকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে, সঙ্গে সঙ্গে চায় যাতে কংগ্রেসের বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী কার্যে পরিণত হ'তে না পারে। কংগ্রেস একটি বিদ্রোহী প্রতিষ্ঠান ব'লেই বরাবর প্রতিষ্ঠিত ছিল; আজ এমন একদল লোক কংগ্রেসের অধিনায়ক হয়েছে যারা কংগ্রেসের সেই নাম ঘুচাতেই ব্যস্ত। কংগ্রেস থেকে কে পদত্যাগ করল বা ক'জনকে কংগ্রেসের ভিতর ফিরিয়ে আনা গেল, তা দিয়ে কংগ্রেসের শক্তির পরিমাপ করা চলে না। অনেক শক্তিশালী ও প্রতাপশালী লোক এর পূর্বেও কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। তাতে কংগ্রেসের শক্তির হানি হয় নাই; বরং যাঁরা ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁরাই ঘটনার আবর্তে মানুষের মন ও দৃষ্টি থেকে দূরে স'রে গেছেন।

আজ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হ'লে এর বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে লোকের সামনে আনতে হবে এবং শাসনিক ব্যবস্থায় তাকে রূপ দিতে হবে। আজ কংগ্রেসের নামেই যাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে শাসন কার্য চালাচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টি ও মন বিপ্লবের দিকে নেই; তা আটকা পড়েছে স্থিত-স্বার্থের জালে। অপরদিকে যাঁরা আজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁরা বিপ্লব বিরোধী মন নিয়ে স্থিত-স্বার্থ লোকদের তাঁবেদারী করতেই ব্যস্ত।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরেও যে ভাবে চলছেন তাতে মনে হয়না যে এই প্রস্তাবের প্রতি তাঁরা কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা এখনও তাঁদের খুসীমত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে স্বৈরাচার চালাচ্ছেন। তাঁদের মতলব যেন তাঁদের প্রতিকূল মতাবলম্বী কোন লোক বাংলার কংগ্রেসে থাকতে না পারে। কংগ্রেসের বিধান ও নিয়মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা জেলা ও নিম্নস্থ কংগ্রেস কমিটি সমূহের নির্বাচন প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কর্তাগণ ও স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি তাঁদের মতাবলম্বী ও তাঁদের অপকর্মের সহায়ক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিসে শতাধিক চিঠি ও টেলিগ্রাম গিয়েছে; কিন্তু তার প্রাপ্তিস্বীকার করার সময়ও ঐ কর্মকর্তাদের হয়নি। সাধুতার আবরণে উপদলীয় অসৎ পন্থা ও মনোভাবের যে পরিচয় কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার দ্বিতীয় উদাহরণ বিরল। এরপর কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ ভরসার সঞ্চার হয় না।

যে ভাবে কংগ্রেস চলছে তাতে স্মশানের ঐক্য ও সংহতি এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা মানতে বাধা নেই। কিন্তু এর বিপ্লবী ভাব ফিরিয়ে আনতে হ'লে এর মৌলিক পরিবর্তন করা দরকার। সে পরিবর্তন সাধন করতে পারেন একমাত্র জওহরলাল। তা করতে হ'লে শাসন-ব্যবস্থায় ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যে পরিবর্তন ও সংস্কার আনা দরকার, তা করবার মতো সাহস ও ধৈর্য জওহর-লালজীর হবে কি না—সে বিষয়ে আমরা এখন-ও

নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; এর কোন অবনতি দেখলে আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু একথা-ও ভুলতে পারি না যে, কংগ্রেসের চেয়ে জাতি অনেক বড়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি :—দেড় বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ একটী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনি অভিযোগের কথা কানাঘুষা গুজব হিসাবে বহুবৎসর যাবৎ শুনা যাচ্ছিল। কিন্তু কোন প্রকাশ্য ও সঠিক অভিযোগ এর পূর্ব্বে বের হয়নি। ঐ অভিযোগের সংবাদ কাগজে বের হওয়ার পর পশ্চিম বাংলায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদত্যাগ করেন। অন্যান্য দুচারজন কর্মচারী, কর্মকর্তা সম্বন্ধেও কিছু অদল বদল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডাঃ কাটজু এক তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করেন, কমিটীর কাজ যখন চলছিল তখন একদিন সন্ধ্যার পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটী রুদ্ধ কক্ষে আগুন লেগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পত্র ও অন্যান্য বহু কাগজপত্র পুড়ে যায়; অথবা কোন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আগুন লাগিয়ে ঐ সব কাগজ পত্র পুড়িয়ে দেয়। এই অগ্নিকাণ্ডের সম্পর্কে জনসাধা-রণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; একথা মনে করা অস্বা-ভাবিক নয় যে কমিটির কাজে বাধা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

এই কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রলাল মিত্র। (B. L. Mitter) কমিটির কাজ আধাআধি হওয়ার পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। শুনা যায় তিনি রিপোর্টের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ক'রে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অনেক গুরুতর অভিযোগ নাকি তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রীযুত মিত্রের মৃত্যুর পর পশ্চিম বাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেলকে এই তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তদন্ত সমাপ্ত ক'রে কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে বহুদিন হ'ল।

এতদিন পর্যন্ত কমিটির রিপোর্ট সাধারণের নিকট প্রকাশ না করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কতখানি গুরুতর অবহেলা আমরা মনে করি। যে অনাচার ও দুর্নীতির অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে শুনা যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি কি বলেছে তা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি অভিযোগ সত্য ব'লে কমিটি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে তা হ'লে সাধারণের তা জানবার অধিকার আছে। আর কমিটির মতে যদি ঐ সব অভিযোগ মিথ্যা ব'লে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে তাও দেশবাসীকে জানান দরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি নয়; দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, জনসাধারণের দাবী ও অধিকার অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই অধিকার ও দাবী থেকেই আমরা বলছি যে ঐ কমিটীর রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশ করা দরকার।

শুনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট (Syndicate) সাব্যস্ত করেছে যে ঐ রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশ করা হবে না। তাদের এই সিদ্ধান্ত এখন সিনেটের (Senate) নিকট আসবে। জানি না—ঐ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ক'রে সিণ্ডিকেট কি সিদ্ধান্ত করেছে। যদি এই তাদের মত হয়ে থাকে যে ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে না—তা হ'লে আমরা বলব, সিণ্ডিকেট তার কর্তব্যের গুরুতর অপলাপ করেছে। সেই সঙ্গে সিনেটের নিকট আমরা আবেদন করব যেন তারা সিণ্ডিকেটের ঐ মত সমর্থন না করে ঐ রিপোর্ট সত্বর প্রকাশের ব্যবস্থা করে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি দুর্নীতি ও অসদা-চরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তবে যুবকদের চরিত্রে তা প্রতিফলিত হ'তে বাধ্য। পশ্চিম বাংলা সরকারের দায়িত্বও এ ব্যাপারে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার কর্তব্য না করে তবে সরকারকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

স্থাপিত ১৯১৯

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড

রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

হেড অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

১৮,০০,০০০৲ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালের ভ্যালুয়েশানে প্রশংসনীয় উদ্বৃত্ত

অমরকৃষ্ণ ঘোষ, এম্ এল্-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বি, ই, এম, বোস
সেক্রেটারী

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুইখানি কাব্যগ্রন্থ—

কুটীরের গান—মূল্য ১৷৷০

এই বইয়েরই কবিতা 'রাতভিখারী' রবীন্দ্রনাথ কৃত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে' স্থান পেয়েছে।

মোহিতলাল—"এই 'কয়টি কবিতা আমার ভাল লেগেছে—'মহাকাল', 'বেহুলা' 'আজ শরতে' 'গাঁয়ের স্বপনে ভুলি'।....'আজ শরতে' কবিতাটী সবচেয়ে ভাল লাগল।.....'মহাকাল' কবিতাটীতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য ফুটেছে।

নিশান নাও—মূল্য ১৸০

"গৃহে গৃহে আজ দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়াও,
হাঁক দিয়ে বলো
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।"

যে কবিতাগুলি একদিন জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে সেইগুলির সমষ্টি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ১বি, রসা রোড, ভবানীপুর।

—শনিবার—

ত্রয়োদশ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৫৭ | একাদশ সংখ্যা

কৃষির উৎপাদন কেন ?

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমাদের জাতির প্রাণশক্তি ছড়িয়ে আছে গ্রামে ; বৈদেশিক যন্ত্র-উৎপাদনের অভিযানে সেই গ্রাম প্রাণ উৎসন্নই গিয়েছে ; দেশী ধনকুবেরগণও এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জাতির প্রাণশক্তির কোষ এই ৬ লক্ষ গ্রামকে ধ্বংস ক'রে ভারতবর্ষ বাঁচতে পারে না। শহরের অর্থবিলাস দেখে আমরা হিসাব করি, ভারতের অর্থ সম্পদ কতটা বেড়েছে। এটা হ'ল নিতান্তই আমাদের শ্রেণী-স্বার্থের বুদ্ধি ইংল্যাণ্ড যেমন তার সাম্রাজ্যকে শোষণ করেছে, আমরা শহরবাসীরা ঠিক তেমনি গ্রামকে শোষণ করছি। শ্রেণী-স্বার্থের বলে অর্থনীতির খুব একটা সহজ কথা ভুলে যাই। কৃষি সম্পদই হ'ল ভারতের মৌলিক সম্পদ এবং গ্রামাঞ্চল হ'ল তার উৎপাদন ক্ষেত্র গ্রাম থেকে কাঁচা মাল নিয়ে যায় শহরে ; সেখানকার কলে তা দিয়ে ব্যবহারের মাল তৈরী হয় এবং এই তৈরী মাল আবার যায় গ্রামে। গ্রামের শ্রমিক তারই উৎপন্ন যে মাল বিক্রি করেছিল চার আনায়, তা দিয়েই তৈরি মাল সে আবার কিনে নেয় এক টাকায়। এই শোষণ গ্রামের পক্ষে যে কি প্রাণঘাতী তা আমরা ভুলে যাই—কারণ আমাদের শ্রেণী-স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। অথচ ঠিক এই অভিযোগই আমরা শত মুখে ভারতের তরফ হ'তে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক'রে থাকি। কারণ, আমাদের শ্রেণীর স্বার্থকে আঘাত করেছে ইংল্যাণ্ডের শাঁখের করাতের কারবার।

গ্রামকে স্বাবলম্বী না করতে পারলে, গ্রামের শোষণ বন্ধ করার উপায় নাই ; এবং এই শোষণ বন্ধ না করলে গ্রামকে বাঁচানো সম্ভব নয়। গ্রামের হতশ্রী মূর্তি দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে আসি এবং হয়ত ভিক্ষার দান স্বরূপ একটা পাঠশালা বা একটা দাতব্যাইখানা নির্মাণ ক'রে-ই মনে করি গ্রামের প্রতি সব কর্তব্য সম্পন্ন করা হ'ল বড় বড় কারখানা তৈরি ক'রে আমরা জাতকে গ'ড়ে তুলতে চাই। কিন্তু এটা হ'ল আমিত্বকে তুলিয়ে সমগ্র দেশের স্থানে আমিত্বকে বসাবার প্রয়াস ; এর সঙ্গে দেশের প্রাণ কোষের কোন সম্পর্ক নেই। বড় বড় কারখানায় ধন উৎপন্ন হয় ; তাতে ছিটেফোঁটা পায় শ্রমিকরা যা দিয়ে তাদের অস্থি চর্ম একসঙ্গে বজায় রাখাই হয় কঠিন ; আর সর্বস্ব গ্রাস ক'রে ধনপতি হয় মালিক। তাই

গান্ধী বলেছেন এইসব কারখানার উদ্দেশ্য হ'ল মালিকদের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করা, লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা নয়; চরকা সংঘ ও কুটির উৎপাদন সংঘের উদ্দেশ্য, কল ও কারখানাকে ধ্বংস করা বা উচ্ছেদ করা নয়; এদের উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের অর্ধ-উপবাসী, বেকার, বৃত্তিহীন লোকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা। (Cent Per Cent Swadesi-P. 47.)

গ্রাম কেবল যে জাতির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তা নয়; জাতির জন-শক্তির গোলাঘরও হ'ল গ্রাম। যুগে যুগে গ্রামেই জাতির জন-শক্তি যুগিয়েছে। শহরের বিলাসী ও কৃত্রিম জীবনযাত্রা যখন জাতির এক একটা স্তরের প্রাণ-শক্তি শোষণ ক'রে, তাদের করে তোলে সঙ্কীর্ণবুদ্ধি, ক্ষীণপ্রাণ, বীর্যহীন, তেজহীন, তখন গ্রামই জাতিকে প্রাণবান ও অগ্রণী লোকের যোগান দেয়। বর্তমান অর্থনীতি ও সমাজনীতির ফলে, জাতির জনশক্তির সেই গোলাঘর শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রামবাসীর আজ উদরে অন্ন নেই, দেহে শক্তি নেই, হৃদয়ে সাহস নেই, কর্মে উৎসাহ নেই; আজ তারা বুদ্ধি হারিয়েছে এমন কি, তাদের সহজ ধর্ম-ও হারিয়েছে। বাংলার গত দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার হিন্দু মুসলমান গ্রাম্য জনতার আচরণ এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একশ বছর পূর্বে এমন ক'রে তারা লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ, দৈন্য ও মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিত তারা মানুষের মতো একবার রুখে দাঁড়াত,—অন্তত জন্তু-ধর্মের বশে বাঁচবার জন্য প্রাণশক্তির পরিচয় দিত। অথচ বাংলার এই জনতাই তিনচার বছর পর সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে পরস্পরকে হনন করেছে। আজ এই গ্রামকে বাঁচিয়ে তোলা জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ এমন কি অস্তিত্বের জন্য-ও বিশেষ দরকার। ১৯১৯ সালে গান্ধী লিখেছিলেন—"Without cottage industry, the Indian peasant is doomed :—কুটির উৎপাদন ভিন্ন ভারতীয় কৃষকের বাঁচবার উপায় নেই। ৩১ বছর পূর্বে অসাধারণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে গান্ধী যে কথা বুঝেছিলেন—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ প্রভৃতি অবস্থায়, ভারত ব্যাপী অভাব ও দৈন্যের মাঝে—সর্বোপরি বাংলার দুর্ভিক্ষের ও দেশ বিভাগ জনিত দারুণ হাঙ্গামার লাঞ্ছনা ও অপমানজনক পটভূমিকায়, আজও যদি আমরা সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারি, তবে এই বুঝতে হবে যে শ্রেণী বুদ্ধির প্রভাবে আমরা জাতির স্বার্থ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি।

এখন আমাদের বর্তমান রাজনীতির দিক হ'তে এই কুটির উৎপাদনকে দেখতে হয়, বিচার করতে হয় ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার পক্ষে এ কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল। এক বিরাট শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ভারতের জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঐ বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে জড়িত ছিল বনেদি অভিজাত। নব্য অভিজাত পুঁজিপতি ধনীরা এবং শহুরে ভদ্রলোকগণ যারা চাকরী, ছোটখাটো ব্যবসায়, বাণিজ্য, তালুকদারী, তেজারতী প্রভৃতির সূত্রে বিদেশী সরকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। ঐ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব প্রচেষ্টায় অনুকূল ছিল কারা? শ্রেণী-বিচ্যুত ভদ্রশ্রেণী যাদের স্বার্থ আজ আর প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে এক সঙ্গে সাধিত হয় না,—যাদের উচ্চাভিলাষ যা খেয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাচ্ছে এবং তাই যাদের প্রতি ইংরাজ ছিল সন্দিগ্ধমন—তারাই ছিল এই বিপ্লবের পুরোধা; আর তার শক্তি নিহিত ছিল শ্রমশীল জনতার মাঝে। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি—নানা কারণে শহরে কারখানা ঘরের শ্রমিকদের বিপ্লবী-শক্তি তেমন সক্রিয় হ'তে পারে না। আমাদের মতে এই বিপ্লব প্রয়াসের প্রধান জনবল হ'ল—গ্রাম্য জনতা—গ্রামের কৃষক ও গ্রামের কুটির উৎপাদনের কারিগর—যারা আজ অনেকে বৃত্তিহীন হয়ে পড়েছে।

কথা আছে— ক্ষুধার্তের কাছে ভগবানকেও যেতে হয় অন্নের রূপ নিয়ে।* আজ গ্রাম্য জনতার কাছে

---

* To a people famishing and idle, the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages"
—Gandhi—Economics of Khadi.

আমাদের যেতে হ'লেও এক মুঠো অন্ন হাতে নিয়ে যেতে হবে। গত ৩০ বছর ধ'রে গান্ধী এই কথা বহুরকমে বহুবার বলেছেন। এই অন্নের ব্যবস্থা যে কেবল তাদের দেহে একটু শক্তি সঞ্চার করবার জন্য তা নয়,—এমন কি তাদের প্রাণে সাহস সঞ্চার করা-ও এর একটা উদ্দেশ্য। তাদের উদরের অন্নের সংস্থান করা আমাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ঠিকই; তার ফলে তাদের অন্তরে সাহস আসবে তা-ও ঠিক। কিন্তু তাদের বিশ্বাসভাজন হওয়া, তাদের সংঘবদ্ধ করা—এ-ও আমাদের কর্মতালিকার প্রধান বিষয়। আমরা শ্রেণী বুদ্ধিহীন বা শ্রেণীচ্যুত মধ্যশ্রেণী যারা বিপ্লবের দীক্ষা নিয়েছি—সেই আমরা সর্বপ্রকারে হয়েছি শহুরে; এবং ভারতের শহরগুলি ইংরাজদের একটি ছোট-খাটো উপনিবেশ। মনের গড়নে, দেহের পোষাকে, আচার ব্যবহারে আমরা গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ইংরেজের খাঁটি স্বর্গ ও ভারতীয় মতের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো বায়ুভূত নিরাশ্রয় হ'য়ে আছি। ইংরেজের স্বর্গ থেকে আমরা বিচ্যুত; ফিরে যেতে চাচ্ছি গ্রামের পৃথিবীতে; তারাও আমাদের বিশ্বাস ক'রে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ যে করে হ'ক—আমাদের আজ ফিরে যেতে হবে গ্রামের মর্তে। গান্ধী বলেছেন, (১৯১৯) "আমরা শিক্ষিত শ্রেণীরা সত্যিকার স্বদেশীর মর্ম (sprit) হ'তে দূরে সরে পড়েছি; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা পেয়েছি তার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই; কিন্তু পারিনা। ইংরাজ কর্মচারীর চেয়ে জনতা আমাদের বিশেষ আলাদা ক'রে দেখেনা।"

Economics of Khadi p. 6.

এই গ্রাম্য জনতার সামনে যাবার রাস্তা তৈরি করতে পারি—ঐ কুটির উৎপাদন মারফৎ। কেবল তাদের দুটি পয়সার সংস্থান ক'রে নয়—তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার ক'রে; তাদের মতো সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে আমরা তাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। খাদী পরিহিত কংগ্রেস কর্মী গ্রামবাসীদের অন্তর যত সহজে স্পর্শ করতে পারত, কোন বিদেশী মিহি পোষাক পরিহিত শহুরে ভদ্রলোক তা পারে না। শহরের বিলাস-দ্রব্য গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজ প্রাপ্য নয়—সহজ লভ্যও নয়। আজ বিপ্লব-প্রয়াসী কর্মীদের পক্ষে ঐ শহুরে বিলাস-দ্রব্য বর্জন ক'রে গ্রামে উৎপন্ন, গ্রামে প্রাপ্য ও গ্রামবাসীদের নিকট সহজে অধিগম্য কুটির উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করা বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এই আদর্শ সামনে রেখে যদি আমরা গান্ধীর সঙ্গে বলতে পারি—জনতার সঙ্গে ভাগ ক'রে যা ভোগ করতে না পারব, তা আমার পক্ষে অস্পৃশ্য।

"(Whatever cannot be shared with the masses is taboo to me. That is all." (Cent Per Cent—Swadeshi p. 106) গান্ধী ব'লেছেন—'গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোকের সংস্রাতেই কেবল আমি চিন্তা করতে পারি এবং আমার সমস্ত সুখ নির্ভর করুক এদের মধ্যে—যারা দরিদ্রতম, তাদের উপর এবং যদি তারা বাঁচতে পারে কেবল তবেই আমি বাঁচতে পারি।* গ্রাম্য জনতার সঙ্গে এই ভাবে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর এতটা প্রভাব হয়েছিল।

ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার সহিত কুটির উৎপাদনের আর গভীর সম্পর্কও আছে। আমাদের পরিকল্পনায় ভারতের বিপ্লবের রূপ দেশময় ছড়িয়ে পড়া জন-বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠবে; a determined desperate, wide-spread and long-drawn out struggle. কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তিকে ও সমাজশক্তিকে আঘাত দিতে হবে যেখানে তার শৃঙ্খল সব চেয়ে দুর্বল—where the chain is the weakest. ১৯৬২ সালে

*I can only think in terms of the millions of villagers and can only make my happiness dependent upon that of the poorest amongst them, and want to live only if they can live.

(Cent per cent Swadeshi p. 52.)

বিপ্লব প্রচেষ্টা যে রূপ ও যে পথ নিয়েছিল, তা ঠিক এই পথ—দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া জনবিক্ষোভ। আমরা ত কেবল ইংরাজ শাসনের পরিবর্তে দেশী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইনা; আমরা সমগ্র জাতীর জীবনকে নূতন করে গড়তে চাই। অর্থাৎ আমরা চাই বিপ্লবের প্লাবন দিয়ে সমাজের জঞ্জাল-স্তূপ ধুয়ে ফেলে জাতীর ক্ষেত্রে নূতন ফসলের ব্যবস্থা করতে। এরজন্য প্রয়োজন জাতির গভীরতম স্তরে ও দূরতম সীমায় বিপ্লবের ধারাকে প্রবাহিত করা। তাই গ্রামের জনতাকে এই বিপ্লবের আবর্তে আনতে হবে; নতুবা বিপ্লব তাদের স্পর্শ করবে না। এই প্রসঙ্গে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পন্থার কথা-ও আসছে।

প্রধানত অবস্থা গতিকে এবং আপাততঃ গান্ধীর নেতৃত্বের জন্য ভারত নিরস্ত্র বা অহিংস পন্থা অবলম্বন করেছে। যুগে যুগে বিপ্লবের ইতিহাস অনুধাবন করলে, বাস্তব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বিপ্লব সাধনের পক্ষে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র পন্থার প্রশ্ন মোটে-ই বড় বলে মনে হবে না।

বিপ্লবী জনতার প্রধান অবলম্বন বা অস্ত্র হ'ল, তাদের বিপ্লবী আগ্রহ। রাষ্ট্র-শক্তির অস্ত্রবলের অনুপাতে বিপ্লবী জনতার অস্ত্রের ব্যতিক্রম হয়েছে; কিন্তু মূলত তাদের অস্ত্র রয়েছে বিপ্লবী আগ্রহ এবং তাদের বাহু অস্ত্রবল বরাবরই রাষ্ট্রশক্তির অস্ত্রবলের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের ছিল; এবং তারা জয়ী হয়েছে তাদের বিপ্লবী আগ্রহের বলে,—সমবেত দেশবাসীর সমর্থনে, তাদের নিজেদের কষ্ট বরণের ক্ষমতায় এবং দুর্দমনীয় সাহসে তারা জয়ী হয়েছে। ফরাসী ও রুশ বিপ্লব সুরু করেছে নিরস্ত্র বা প্রায় নিরস্ত্র জনতা এবং বিপ্লব সফল হয়েছে বিরাট জনতার বিপ্লবের প্রতি আগ্রহের বলে। এর মধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ এসেছে; সেটা মুখ্য নয়, গৌণ। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তাই এখানে এই বিতর্কের মধ্যে যেতে চাইনা। কেবল প্রতিবাদকারীদের এই অনুরোধ করি, বিভিন্ন যুগের বিপ্লবের ইতিহাস যেন তারা একটু খোলা মন নিয়ে বিচার করেন।

নিরস্ত্র পন্থা নিয়েছি ব'লে আমাদের আপসোস করার কোন কারণ নেই। এর অপরিহার্য দায়িত্ব ও সম্ভাবনা যেন আমরা বুঝতে পারি। জন বিপ্লবের প্রচেষ্টাকে অস্ত্র দিয়ে যে ঠেকা বা পেলা দেওয়া হ'ত, তা আমাদের সাধন করতে হবে জন-বিক্ষোভের ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়ে। তাই গ্রামের নিম্নতম, দরিদ্রতম ও অজ্ঞতম জনতাকেও এই বিপ্লবের মধ্যে আনতে হবে। ক্ষমতা আহরণের পর বিপ্লবের সঙ্গে যে গৃহ যুদ্ধ সব দেশে আসে, তার তীব্রতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা আমরা অনেকখানি লাঘব করতে পারব এই নিরস্ত্র পন্থার ফলে। কারণ বিপ্লবোত্তর গৃহ-যুদ্ধের পাণ্ডা হয় মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী; কিন্তু তারা সমর্থন পায় অজ্ঞজনতার কাছে। কেবল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী অভিজাতরা গৃহ-যুদ্ধ সুরু করতে বা চালাতে পারে না। জনতার মধ্যে বিপ্লবের বার্তা যত সুপ্রচারিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্যাপক ও গভীর হবে, জনতার মধ্যে বিপ্লব-বিরোধীর প্রভাব ও সংখ্যা তত কমবে। তাই পরবর্তী গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনাও তত কমবে; বিপ্লব যত দ্রুত সফল হবে, তত সহজে সমাজকে নূতন করে গড়া সম্ভব হবে। নিরস্ত্র বিপ্লবের এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে, এর বর্তমান দায়িত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। এবং সেই দায়িত্ব হ'ল দেশের বিরাট জনতার গভীরতম স্তরে ও দূরতম প্রান্তে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যেতে হবে এবং বিপ্লবের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের প্রধান প্রস্তুতি হ'ল গ্রাম্য জনতাকে বিপ্লবের মধ্যে আনা এবং তার জন্য প্রয়োজন তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। প্রকৃত বিপ্লবীকে গান্ধীর মত বলতে হবে—গ্রাম্য জনতা যা উপভোগ করতে পায় না, তা আমার পক্ষে অস্পৃশ্য, তাদের দরিদ্রতমের সুখের সঙ্গে আমার সুখ জড়িত; তাদের দরিদ্রতম যদি বাঁচতে পারে, তবেই আমার বাঁচার অধিকার আছে। আমি জানি তোতা পাখীর মতো গান্ধীর বই থেকে মুখস্ত ক'রে এই কথা আওড়ালেই চলবে না; নিষ্ঠা ও সেবা দিয়ে এই উক্তির মর্ম উপলব্ধি

করতে হবে। পূর্বে বলেছি—কুটির উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া, কুটির উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করা—এই হ'ল গ্রাম্য জনতার সঙ্গে একাত্ম হবার প্রধান উপায়। তাদের আত্মাভাজন হবার প্রায় একমাত্র পন্থা।

তাছাড়া বিপ্লবী জনতার মনে কেবল বিপ্লবী আগ্রহ জন্মানোই ত পর্যাপ্ত নয়; বিপ্লবের ধাক্কা সামলাবার মতো শক্তিও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। দুর্ভিক্ষের এতটুকু ধাক্কায় যারা বেসামাল হ'য়ে দেহ ও মনের অপরিসীম দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে তাদের মধ্যেও বিপ্লবী ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ গ্রাম-কেন্দ্র-গুলিকে অশনে, বসনে ও নিত্য প্রয়োজনে সাবলম্বী করতে হবে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে আত্ম-পর্যাপ্তি ও আত্মরক্ষার (self sufficiency and self-protection) কর্ম-নীতি গ্রহণ করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল আগত-প্রায় বিপ্লব প্রয়াসের জন্য গ্রামকে প্রস্তুত করা। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে আমাদের বিপ্লব সাধিত হয়নি। রাষ্ট্রে ও সমাজে সেই পূর্ব ব্যবস্থা ও শক্তিই ক্রিয়মান আছে। তাকে সরিয়ে নূতন বিপ্লবী ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিপ্লবের ঘায়ে আহত হ'য়ে রাষ্ট্রশক্তি যখন ক্ষিপ্ত হবে—তখন দেশের এক অংশ অপর অংশের সহিত যোগ ছিন্ন হ'য়ে যাবে। আর তখন নিরস্ত্র বিপ্লবী জনতার প্রধান অস্ত্র হবে সরকারী শাসনতন্ত্র, যান-বাহন ও ব্যবস্থা বর্জন করে চলা। এই সময় যদি প্রতি অঞ্চল যথা সম্ভব স্বাবলম্বী না হ'তে পারে, তবে বিপ্লবের ধাক্কা গ্রাম্য জনতা সামলাতে পারবে না। তাই পূর্বাহ্নেই গ্রামকে অশনে, বসনে ও নিত্য প্রয়োজনে স্বাবলম্বী ক'রে গড়ে তোলা দরকার,—ঠিক যেমন দরকার সশস্ত্র যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর জন্য বসন ও অস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা। কংগ্রেসের আত্ম-পর্যাপ্তি ও আত্মরক্ষা কর্ম-নীতি দেখে যারা প্রথম হেসেছে, তারা ১৯৪২ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তারা বিপ্লব প্রয়াসের মর্ম কথা উপলব্ধি করতেও পারেনি। অতীতের সেই ভুল যাতে ভবিষ্যতে না হয়, সেদিকে প্রত্যেক কর্মীর দৃষ্টি রাখা উচিত

[ক্রমশঃ]

মাটীর খাদ্য উপাদান

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মাটীর খাদ্য দ্রব্য বা খাদ্য উপাদান কথাটা বিসদৃশ ঠেকলেও একটু চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যাবে যে কথাটা মোটেই বিসদৃশ বা ভ্রান্তিপূর্ণ নয়। পৃথিবীর এই যে বিশাল সবুজ প্রান্তর, যা শুধু মাটী দিয়েই গড়া সে মাটীর আবার আহার্যরাশি আছে। সে মাটীর ক্ষুধা আছে। ক্ষুধিত মাটীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয় তার খাদ্য উপাদান দিয়ে। নয়ত মাটীর জীবনীশক্তি লোপ পায়।

আমরা সকলে সারবান এবং সারহীন মাটীর সঙ্গে পরিচিত আছি যে মাটীর উৎপাদিকা শক্তি খুব বেশী সেই মাটীকে আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি সারবান আর যে মাটীর উৎপাদিকা শক্তি খুব কম বা নেই, সেই মাটীকে বলে থাকি সারহীন বা অসার। এখন এই সারবান এবং সারহীন মাটীর কথা চিন্তা করলে প্রথমেই আমাদের মস্তিষ্কে উদয় হবে এই দুই পৃথক মাটীর উৎপত্তি হল কিরূপে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে এই দুই পৃথক মাটীর উৎপত্তি হয়েছে খুব সহজে। ক্ষুধার্ত মাটী যেটুকু অংশ খাদ্যদ্রব্য পেয়ে ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম হয়েছে সেইটুকু অংশ হয়েছে সারবান, আর বাকী যেটুকু অংশ খাদ্যদ্রব্যের অভাবে ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম হয়নি, সেইটুকু অংশ হয়েছে সারহীন। সুতরাং মাটীর সরসতা ও অসরসতা নির্ভর করে মাটীর খাদ্য উপাদানের উপর।

উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে মাটী হয় সারবান—তার ফসল প্রসব করবার ক্ষমতা যায় বেড়ে,—সবুজ, শ্যামল, সরস বৃক্ষরাজীতে ভরে যায় তার বুক। আর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের অভাব ঘটলে মাটী তার সরসতাকে ফেলে হারিয়ে—ফসল প্রসব করার শক্তি তার হ্রাস পায়। মাটী হয় রুক্ষ, কর্কশ, পাষাণ, মরুময়। শ্যামলতার চিহ্ন থাকেনা তার বুকে।

মাটীর খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন এবং সে খাদ্যদ্রব্য কি কি এসব কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে বহুদিন আগে পর্যন্ত আগেকার লোকেদের মস্তিষ্কে উদয় হয় নি। তবে একথা না জানলেও তাঁরা মধ্যে মধ্যে মাটীতে সার দিতেন এবং মাটীর ফসল উৎপাদন শক্তি বাড়াতে গেলে যে মাটীকে উর্বর ও সরস করে তোলা দরকার সে কথাও জানতেন। যদিও তখন তাঁরা না ছিলেন বৈজ্ঞানিক—তাঁদের না ছিল গবেষণাগার, না ছিল তাঁদের বিদ্যার জৌলুস—না ছিল তাঁদের জোড়া জোড়া ডিগ্রি ও উপাধি।

মাটীর খাদ্য উপাদান যে কি কি তা আগেকার লোকদের চোখে ধরা পড়ে এক বিশেষ ভাবে। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখবার শক্তিই মানুষকে দেখিয়েছে অজানা অচেনার রূপচ্ছবি। কে প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন তা জানা যায়নি; একখণ্ড হাড় পড়ে থাকলে তার চারপাশের ঘাসগুলো হয়ে উঠে তেজালো। কিছুটা গোবর পড়ে থাকলে তার চারধারের গাছগুলো হয় বেশ সতেজ। পরে পরীক্ষামূলক ভাবে গাছের গোড়ায় হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে দেখা গেল, গাছ বেশ সতেজ-শ্যামল হয়েছে। চাষের ক্ষেতে দিয়ে দেখা গেল ফসল খুব উৎপন্ন হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখবার শক্তির গুণে মাটীতে হাড়ের গুড়ো, গোময়, খইল, ছাই ইত্যাদি যে দেওয়া প্রয়োজন তা তাঁরা জেনেছিলেন এবং তা দিয়ে মাটীর উর্বরতা বৃদ্ধি করতেন। এইসব কাজ তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখে শিখেছিলেন। ক্ষেতে কড়াই জাতীয় গাছ প্রথম বছর দিয়ে পরের বছর সেই ক্ষেতে অন্য ফসল ফলালে ফসল প্রচুর পরিমাণে যে পাওয়া যায় তাও তাঁরা ঐ ভাবে জেনেছিলেন। এতে ছোট কড়াই জাতীয় গাছের শিকড়ে অবস্থিত নাইট্রোজেন বন্ধীকারী বা নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার সহায়তায় জমির নাইট্রোজেন ক্ষয়পূরণ। আগেকার লোকেরা এসব কিছুই জানতেন না—কিন্তু

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক মহল জানিয়ে দিলেন এই সব রীতি-পদ্ধতি। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে আরও অনেক কিছু জানা গেছে। ছাইতে আছে পটাশ, গোবরে আছে নাইট্রোজেন আর ফসফেট্‌স আর হাড়েতে আছে ফস্‌ফেটাস্। ফসল মাটী থেকে এই উপাদান গ্রহণ করে। ফলে এক সময় মাটীতে ওই সব উপাদানের বিশেষ অভাব পড়ে। মাটী তখন হয় ক্ষুধার্ত। খাদ্য উপাদান দিয়ে মাটীর এই ক্ষুধাকে মিটাতে হয়। অর্থাৎ সারহীন মাটীকে সার দিয়ে সরস করে তোলা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—১ টন উৎকৃষ্ট গম উৎপাদন করতে ৪৭ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৮ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড্, এবং ১১ পাউণ্ড পটাসের দরকার হয়। গম উৎপাদনের পরই এই সব ক্ষয়িত উপাদানের পরিপূরণ করা দরকার। কেননা এইসব উপাদান উদ্ভিদের দেহে লাগে। উদ্ভিদ এই সব উপাদান মাটী থেকেই নেয় এবং এই সব উপাদান হচ্ছে মাটীর খাদ্যদ্রব্য।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল মাটী থেকে বহু উপাদান উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কি কি সেই সব উপাদান তা জানা গেল না। মাটীর রহস্য ভেদ করবার জন্য বৈজ্ঞানিক মহলে পড়ে গেল সাড়া। প্রথম প্রথম বৈজ্ঞানিকগণ হলেন বিফল মনোরথ; কিন্তু পরে তাঁরা মাটীর খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী আবিষ্কার করলেন। রহস্য উদ্ঘাটনে জানা গেল নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফস্‌ফরাস ছাড়া আরও অনেক মৌলিক দ্রব্য উদ্ভিদ দেহের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়োজন। সেগুলি অনুসন্ধানে জানা গেছে এবং তাদের সংখ্যা হচ্ছে আঠারোটী। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, তামা, দস্তা, পটাসিয়াম, ক্যাল-সিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়ম, বোরন, বেরিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম, আয়োডিন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস ও কার্বন। পরিমাণে কিন্তু সমস্ত উপাদানগুলি সমান নয়। কেউ বেশী কেউ কম, নির্দিষ্ট নয়। বর্ণ বিশ্লেষণ যন্ত্র ছাড়া এদের উপস্থিতি জানা সম্ভবপর নয়। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ এদের চেয়ে কিছু কম, আর বাকী সমস্ত উপাদানের পরিমাণ আরও কম।

এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে কতকগুলি বায়বীয়, কতকগুলি ধাতু বিশেষ, আর বাকীগুলি কঠিন পদার্থ। মাটীতে অবস্থিত এই সমস্ত উপাদানগুলি উদ্ভিদ গ্রহণ করে শিকড়ের 'রুট হেয়ারের' সাহায্যে। রুট হেয়ারের মধ্যে ছোট ছোট কোষ (cell) আছে। এই কোষগুলি ঐ খাদ্য উপাদানকে রসের সাহায্যে গলিয়ে 'অস্‌মসিস' প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে থাকে। কতক উপাদান উদ্ভিদ তার পাতার সবুজ অংশ ক্লোরোফিলের সাহায্যে গ্রহণ করে বায়বীয় অবস্থায়। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড্। সাধারণত মাটীতে নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি উপাদান ছাড়া অন্য উপাদানের পরিমাণ বেশী মাত্রায় থাকে, তাই এগুলির কৃত্রিম সারের প্রয়োজন হয় না। তবে উদ্ভিদ-দেহের পরিপুষ্টির জন্য প্রত্যেকটী উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

মাটীতে উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক উপাদান দিয়ে ফসল ফলানো সম্ভবপর হতে পারে একথা জানিয়েছিলেন জার্মান রসায়নজ্ঞ জন লিবিগ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। মাটীকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে এবং অনুপস্থিত রাসায়নিক উপাদানের ক্রমপূরণ করে সে মাটীতে বীজ রোপন করলে ভাল ফসল পাওয়া যাবে এইরূপ ঘোষিত হ'ল। বৈজ্ঞানিকদের কথা অনুযায়ী কাজ করা হ'ল। কিন্তু প্রথম বৃষ্টিপাতে যা সহজ বলে বিবেচিত হয়েছিল—পরে তা সহজ ভাবে সিদ্ধ হ'ল না—অর্থাৎ ভাল ফসল উৎপাদিত হ'ল না। তখন জন্ লিবিগ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক বলে লোক-সমাজে নিন্দিত হলেন। 'লিবিগ' কথাটা বানান করে লিখলে হয় 'লাইবিগ'। তাকে উল্টাভাবে লিখলে হয় 'বিগলাই' এবং এই বিগলাই কথার অর্থ হচ্ছে বিরাট একটা মিথ্যা কথা। জন্ লিবিগকে নিয়ে ভীষণ ভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলতে থাকে। এত ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস কিন্তু রসায়নজ্ঞকে টলাতে পারল না। মাটী নিয়ে আরও গভীর ভাবে গবেষণা চালালেন। অবশেষে মাটীর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন হয়ে

গেল। দেখা গেল এই যে মাটী, যা দিয়ে পৃথিবীর সমতল ভাগ গড়া সেটা একটা আলাদা জগৎ। সেখানে আছে নিম্ন প্রাণ জগতের লক্ষ লক্ষ ব্যাকটিরিয়া, জল, জলীয় বাষ্প, চটচটে একপ্রকার আঠাল পদার্থ ও ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক উপাদান। তাদের মধ্যে কতক কঠিন, কতক তরল, কতক অর্ধ তরল আবার কতক বায়বীয় অবস্থায় আছে।

মাটীর রহস্য ভেদ হবার পর থেকে বৈজ্ঞানিকদের চোখে মাটী আর অবহেলিত বস্তু হয়ে রইল না। মাটীকে নিয়ে চলেছে অবিরাম গবেষণা। মাটীর স্বরূপ আজ উদ্ঘাটিত। মাটী আজ সম্মানের বস্তু হয়ে পড়েছে। মাটীর অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী বৈজ্ঞানিকদের চোখে ধরা পড়ায় মাটী দাঁড়িয়েছে আজ মূল্যবান পর্যায়ে। ক্ষুধিত মাটীর ক্ষুধা নিবারিত হবার পর থেকে তার উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে গেছে। ফলে ফসল উৎপাদনও পূর্বেকার চেয়ে গেছে বেড়ে।

মাটীতে উদ্ভিদের কোন অংশ পড়ে থাকলে তার কি অবস্থা হয় তা জানা গেছে আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে। ফসল ফলার পর বাতাস, বৃষ্টির জল ও সূর্য কিরণ ও মাটীর উদ্বৃত্ত সার হতে ফসল ফলানো যে কিরূপে সম্ভব হতে পারে তাও জানা গেছে। মাটীতে ফসল ফলার পর নাইট্রেট, পটাস্ ও ফস্ফেট প্রভৃতি উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আগামী বারের ফসল বৃদ্ধি করার জন্য মাটীর সেই ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের যে পরিপূরণ হওয়া প্রয়োজন তাও জানা গেছে। আগেকার যুগের লোকেরা ফসল উৎপাদনের পর এই নাইট্রেট, ফস্ফেট ও পটাশের ক্ষয়পূরণ করতেন সাধারণত গোবর, ছাই ও হাড়ের গুড়ো দিয়ে। যদিও তাঁরা জানতেন না যে ওই সব উপাদানে মাটীর প্রধানতম খাদ্য উপাদান নাইট্রেট, ফস্ফেট ও পটাশ আছে।

মাটির প্রধানতম এবং প্রথম খাদ্য হচ্ছে নাইট্রোজেন। মাটী এই খাদ্য কয়েকটি উপায়ে পেতে সক্ষম হয়। উদ্ভিদের কোন অংশ যখনই মাটিতে পড়ে থাকে, তখন মাটীর অভ্যন্তরাস্থিত অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে পচিয়ে ফেলে। এই পচনের ফলে তাতে আঠালো এবং কালো এক প্রকার অম্লপদার্থ উৎপন্ন হয়। তাকে বলা হয় 'হিউমিক' এসিড। উদ্ভিদ দেহের 'প্রোটোপ্লাজমের' নাইট্রোজেনকে বন্দী হতে হয় এমোনিয়া বা এমোনীয়া জাতীয় দ্রব্যে। তারপর আবার অন্য আর এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া এসে আক্রমণ ক'রে এমোনিয়া থেকে নাইট্রাইট পর্যন্ত তৈরী করে দেয়। তারপর আরও আর এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ চালিয়ে নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। এই সব জীবাণু বা ব্যাকটিরিয়ার কাজ খুব ভাল ভাবেই হয় যখন এরা উপযুক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। জমির উপযুক্ত কারণ বা উপযুক্ত অম্লত্ব, জমিতে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানের উপযুক্ত পরিমাণে অবস্থিতি। জীবাণুর কার্যক্ষমতা নির্ভর করে মাটীর উপর বায়ু চলাচলের স্বাভাবিকতার উপর। এরা অতি সুন্দর ভাবে উদ্ভিদ দেহের 'প্রোটোডের' নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রেট তৈরী করে। এমন কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই নাইট্রেট প্রস্তুত করতে যা সময় লাগে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে তারা এই উপাদান তৈরী করতে পারে। মাটীর খাদ্য এই নাইট্রেট, মাটী উদ্ভিদের পতিত অংশ থেকে এই ভাবে প্রস্তুত করে নেয়। পাশ্চাত্য দেশে মাটীর সার হিসাবে এই নাইট্রেট দেওয়া হত চিলি প্রদেশের 'নাইট্রেট ডিপোজিট' থেকে। সেই নাইট্রেটকে সাধারণত বলা হয় চিলি সল্টপিটার (Chile Saltpetre)। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই নাইট্রেট নেওয়া হত এখানকার এই ডিপোজিট থেকে।

উদ্ভিদ দেহের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটীর সঙ্গে বিভিন্ন নাইট্রেট মিশিয়ে দেওয়া যায় খুব সুন্দর ভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরাজরা যখন জার্মান বন্দর আক্রমণ করে তখন জার্মানির বৈজ্ঞানিকবৃন্দ বাতাস থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরী করে নিয়েছিল বৈদ্যুতিক তাপ-শক্তির সাহায্য নিয়ে। এই ভাবে নাইট্রোজেনকে বন্দী করে

(শেষাংশ ৬৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিপিং

শ্রীনির্মলেন্দু মাস্তা

পিপিং কি শুধু সমাজতান্ত্রিক মহাচীনের অন্তর্গত উত্তর ভূভাগের একটা সহর মাত্র ? কেবল বাজার আর মানুষ ? যানবাহন আর হৈ হট্টগোল ? তা নয়। চীনের অভ্যুদয়ের যে বিচিত্র ইতিহাস, ইতিহাসের এক বিচিত্রতর পরিণতিতে, এক চরম পরিণামের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে তারই এক অধ্যায়ের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে পিপিংএ। এ সহরের বিশেষ বাণিজ্যিক মূল্য নেই। অর্থনৈতিক ভূগোলে এ সহরের নাম অনুল্লেখ্য। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ সম্রদ্ধ বিস্ময়ে যে কয়টি প্রাচীন ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন সহরের নাম মনে রেখেছে তার মধ্যে পিপিং একটি। তাই এ সহরকে চেনবার মূলে মানুষের কোন বিষয়গত দায় নেই, আছে কৌতূহল। নয়া গণতন্ত্রের ভাবভিত্তির ওপর যে গরিষ্ঠ প্রাচ্য ভূখণ্ড নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করবার জন্যে এ কৌতূহলের একান্ত প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে মহাচীনের রাজধানী হচ্ছে পিপিং। কিন্তু ঐ পরিচয়ই তার সব নয়। আসলে পিপিং একটি ঐতিহাসিক সহর। যত জীবিত মানুষ আজ সেখানে বসবাস করছে তাদের চেয়ে যারা এককালে এসেছিল এবং আজ অন্তর্হিত হয়েছে তাদের চিহ্নটাই সহরের সর্বাঙ্গে সু-পরিস্ফুট। তিন হাজার বছরের পুরানো যে সহর তার অতীত দিকের পাল্লা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী। এ নগরের প্রাচীর আর মন্দির ১৪২১ খৃষ্টাব্দে গড়া। পিপিং হচ্ছে সেই ধরণের শেষ সহর যা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্রাটের বিলাস-ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দিকে সর্বপ্রযত্নে দৃষ্টি রেখে নির্মাণ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সেই সব নিমিত্তি, রাষ্ট্রনৈতিক কড়াকাপটার আগেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গত যুদ্ধে প্যারিসের আর্ট গ্যালারীর মূল্যবান ছবি চুরি করেছে জার্মানী, জার্মানীর ন্যাশনাল মিউজিয়মের ছবি নষ্ট করেছে রাশিয়া, ইতালীর গির্জার গায়ে আঁকা ফ্রেস্কোর ছবি যোদ্ধার ঘায়ে গুঁড়িয়ে গেছে ; কিন্তু পিপিংএর ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলি আজো অক্ষয়, অব্যয়। জাপানীরা তাদের অধিকারে থাকাকালীন যেটুকু পরিবর্তন করেছিল সেটুকু গঠনমূলক। তাদের তৈরী অ্যাস্ফল্টের চওড়া রাস্তা এখনও ঝক্ ঝক্ করছে সহরের বুকে। তাদের তৈরী কৃষি গবেষণা মন্দির আর নতুন কলোনী আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা থাকতেই এসেছিল, চলে যেতে নয়। ওরা খুব বেশী দিন থাকতেও পারে নি—মাত্র আট বছর ওরা এই অঞ্চলটা শাসন করেছিল। পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে চীনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবাহিনীর মিলিত শক্তির কাছে ওদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। অবশ্য ওদের এই প্রচেষ্টায় মূল নগরের খুব কম পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিশটি শতাব্দী ধরে যে সহরের মূল পৃথিবীর গূঢ় গহ্বরে প্রোথিত হয়ে আছে, তাকে বদলে ফেলা কি এতই সহজ !

সত্যিই বদলানো যায় না। এ সহরে কত এলো, কত যে গেলো, তবু পিপিং পিপিংই আছে। ভ্রমণ-রস-রসিক মার্কোপোলো আসবারও আগে এলো চেঙ্গিস-খান্। পোলো যখন এলেন তখন চেঙ্গিস-এর নাতি কুবলা খান্ শাসনযন্ত্রের শুরুতাউসে। দেশ দেখে পোলো বিস্মিত হয়েছিলেন। তখন চীনে কয়লার ব্যবহার এবং কাগজী টাকার প্রচলন সুরু হয়েছে, ঘোড়ার সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা দেশ জুড়ে। এই মোগল রাজত্ব বিলুপ্ত হয় প্রথম মিং সম্রাট হুং এর আক্রমণে। সেই সময় পিপিং থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর তৃতীয় মিং সম্রাট য়ুংলো ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সহরে আজো যে বিরাট প্রাচীর আর শক্ত বাড়ী দেখা যায় সে সব তাঁরই তৈরী। এই

নগর গঠনে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর কিছু পরে যিনি এলেন তিনি হচ্ছেন মাঞ্চু বংশের চতুর্থ সম্রাট চিয়েন লুং। সুদীর্ঘ ১৭৩৬ থেকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরে তাঁর রাজ্য শাসন কালে তিনি শহরের আকার আয়তন নানা দিক দিয়ে ডিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

আজকের পিপিং যেটুকু বদলেছে সেটুকু বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচবার তাগিদে। অবশ্য তার নামটা সে কারণে বদলেছে কিনা বলা শক্ত। পূর্বনাম ছিল "পিকিং" যার অর্থ হলো "রাজধানী" আর বর্তমানের ব্যবহৃত নাম "পিপিং"এর মানে হচ্ছে "উত্তরের শান্তি।" ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নানকিংএ রাজধানী সরিয়ে আনবার সময় জাতীয়তাবাদী চীনাদল এ নামকরণ করেছিল। হয়তো ভেবেছিল উত্তরের তুষার ঢাকা শ্বেত দিগন্তের মত অবিচ্ছিন্ন শান্তির প্রবাহ নেমে আসবে ঐ দিক থেকেই। কিন্তু বিধাতাপুরুষের কি নির্মম পরিহাস! ঐ দিক দিয়েই প্রবেশ করেছে কম্যুনিষ্ট চীনাদল। মাঞ্চুরিয়া থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে পিপিং, মুচাও, নানকিং আর সাংহাই এর মত মূল স্থানগুলোকে দখল করবার জন্যে দ্রুতবেগে তারা দক্ষিণ দিকে চলে এসেছে।

তা আসুক, কিন্তু আমরা এতক্ষণ ধরে পিপিংকে একটি মাত্র সহর বলে বর্ণনা করছি কেন—পিপিং কি একটা সহর? তার বালীগঞ্জ আর বড়বাজারের মধ্যে কি কোন তফাৎও নেই? সে যে পাঁচ পাঁচটি সহরের সমষ্টি। যেমন প্রতিটি বিচ্ছিন্ন পেঁয়াজের খোসার মধ্যে সংযোগ এবং সামঞ্জস্য স্থাপন করে একটি আস্ত পেঁয়াজ তেমনি সহরের ভেতর সহর তার ভেতর সহর—এমনি করেই সমগ্র পিপিং-এর অস্তিত্ব। এই পাঁচটির মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুর সংযোগ নেই, প্রত্যেকটী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং সেই ঘেরাটোপের মধ্যে স্বকীয় বিশিষ্টতায় বিশেষত্ব-মণ্ডিত। এই প্রাচীরগুলি এতই পুরোন আর লোকেরাও এই প্রাচীরের আড়ালে বাস করতে এমনি অভ্যস্ত যে সভ্য-মানুষের পরিধেয় বসনের মতই এগুলো তাদের কাছে একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এক সহর থেকে অন্য সহরে যাবার জন্যে মোট নটী গেট রয়েছে। পরে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে প্রাচীরের গা থেকে আরো কয়েক মাইল জায়গা কেটে নেয়া হয়েছে। পাঁচশো বছর আগে যুংলো যে প্রাচীর ঘেরা শহর গড়ে ছিলেন তার আয়তন ছিল পনেরো মাইলের একটি বর্গ-ক্ষেত্র। এর পূর্বনাম ছিল তাতার সহর। পরে নাম হয় মাঞ্চুসহর। এর ভেতরে দেয়াল দিয়ে পৃথক আড়াল করা ইম্পিরিয়াল সহর। নামেই বোঝা যায় এখানে সপারিষদ সম্রাট সিংহাসনে আসীন হতেন। এর ভেতরে আবার "নিষিদ্ধ সহর"। এখানে কেবল মাত্র সেই ঈশ্বর প্রেরিত মহামহিমান্বিত সম্রাটের বাস ভবন। অন্য কারুর এখানে প্রবেশ নিষেধ একেবারে স্ট্রীক্টলি প্রহি-বিটেড। নিষিদ্ধ বলেই এই শহরটি কৌতূহলী জনসাধা-রণের কাছে সুদূর রহস্যময়তার পর্যবসিত হয়েছিল।

এরপর চতুর্থ শহরটি গড়ে উঠল তখন যখন দুর্বল মিংদের তাড়িয়ে মাঞ্চুরা সিংহাসন দখল কোরে চীনের যত শিল্পী আর বণিকদের পুরোনো শহর থেকে বার করে দিলে। তাদের নিয়ে আর একটা প্রাচীর ঘেরা শহর পাশাপাশি গড়ে উঠল।

পঞ্চম শহরটি তৈরী হয়েছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীতে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও এটিও প্রাচীর ঘেরা। নির্মাতাদের খেয়াল নেই যে, ঈশ্বর প্রেরিত সম্রাট অদৃশ্য হয়েছেন ঈশ্বরেরই মতো, তাঁর শাসনকাল হয়েছে গত, সভাসদরা প্রস্থান করেছেন পরলোকে, প্রাচীন রাষ্ট্র-নৈতিক প্রথার প্রাচীরের বাধা তোলবার প্রয়োজনটুকু বর্তমানে অবলুপ্ত। বস্তুতঃ মানুষ যে সব সময় ইতিহাসকে তৈরী করে তা নয়, ইতিহাসের ভাবধারাও অনেক সময় মানুষকে তার অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত করে।

এ প্রসঙ্গে চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে দু'এক কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে পীত নদী প্রচুর পলিমাটির সঙ্গে বয়ে আনে চীনের দুঃখ সেই হোয়াংহোর দানে সমৃদ্ধ উর্বর বিস্তৃত ভূমিকে আপন কোলের দিকে টেনে প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা প্রাচীরের ঘেরাজাল

তোলা হয়েছে পিপিংকে ঘিরে। ত্রিশ থেকে তিরিশ ফুট উঁচু এবং পনেরো থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া এই প্রাচীরটি মঙ্গোলিয় মালভূমি থেকে নেমে আসা যাযাবরের দলকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি তাতে এতটুকু রুদ্ধ হয়নি। শানহাইকোয়ানে সমুদ্র আর পর্বতের মাঝে যে পথ-ছিদ্রটুকু রয়ে গেছে তারই মধ্য দিয়ে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এসেছে তাতার—মাঞ্চুবিজয়ের সেই হ'ল সুরু।

তারপর থেকে ইতিহাসের যে সমস্ত বিক্ষিপ্ত পদচিহ্ন পড়েছে শহরের যেখা সেখা, তা জানতে খুব বেশী ঘোরা-ঘুরির প্রয়োজন নেই, একটা দুশো দশ ফুট উঁচু মানুষের হাতে গড়া পর্বতের ওপর দাঁড়ালেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, মি শান হচ্ছে মানুষের হাতে গড়া পাঁচ চূড়োর একটা পাহাড়। রাজ-প্রাসাদের চারপাশে খন্দ আর হ্রদ তৈরী করতে গিয়ে যে মাটি তুলতে হয়েছিল তাই জমিয়েই দিব্যি একটা পাহাড় দাঁড় করানো হয়েছে। এখান থেকে সোজা উত্তরে তাকান, আপনি বাদ্যিঘর আর ঘণ্টাঘর দেখতে পাবেন। কুবলা খাঁয়ের নির্দেশে তৈরী এদব (ইতিহাসে অসমন্বিত)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘণ্টাঘর থেকে সু-উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি আসন্ন বিদ্যুদ্বিধুর সন্ধ্যার কথা ঘোষণা করেছে আর বাদ্যিঘরের বিপুলায়তন জয়ঢাকের ওপর জাগ্রত প্রহরীর প্রবল মুষ্টিক্ষেপে রাত্রির প্রহর ঘোষিত হয়েছে। এখন সে জয়ঢাকে আর নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। জয়ঢাকেরা যুগে যুগে নষ্টই হয়, বিশেষ ক'রে নিজের ঢাক নিজের কাঁধে তুলতে না পারলে। ঘণ্টা এখনো আছে তবে না থাকারই মধ্যে। তার অস্তিত্বের কথা সে খুব কমই ঘোষণা করে। তার বদলে এখন প্রয়োজন মাফিক জাপানীদের বসানো সাইরেন বাজে। আশাকরি ওটির সঙ্গে আপনার পরিচয় নিবিড়।

এবার পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বড় বোতলের মত এক শ্বেত ড্যাগোবা *। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের দালাইলামা যখন এ স্থান পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তাঁর সম্মানে তৈরী হয় এই শ্বেত ড্যাগোবা। এর পাশ দিয়েই যে চওড়া চকচকে রাস্তাটি চলে গেছে সেইটে ধরে আপনার দৃষ্টি চালিত করুন, দেখবেন অল্পদূরেই রয়েছে "নিষিদ্ধ সহর"। তার এক-পাশে পি হাই হ্রদের জল টলটল করছে। হ্রদের মাঝখানে একটা দ্বীপ। দ্বীপের মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ ফুলের অজস্র সমারোহ। তারই একপাশে ওখানে পৌঁছবার জন্যে সেতুর গাঁটছড়া। আপনি যদি আর শ'পাঁচেক বছর আগে আসতেন তবে দেখতেন দিনে হ্রদের জলে নৌযুদ্ধের খেলা চলেছে, রাত্রিতে আতস বাজীর ফোয়ারা ছুটেছে। শীতকালে হ্রদের জল জমে গিয়ে সাদা-শক্ত জমি তৈরী হয়েছে আর তার ওপর রাজবংশধরগণ মহানন্দে স্কেটিং করছেন। সবই রাজরাজড়ার কাণ্ড!

এবার আর একটু অতীত ইতিহাসের গভীরেই প্রবেশ করা যাক। তাতে যদি বর্তমান কালের শহরটির পরিচয় লাভ সহজ হয়, ক্ষতি কি! ঐ দেখুন নিষিদ্ধ শহরের প্রধান ফটক দিয়ে সপারিষদ সম্রাট শোভাযাত্রা সহকারে বেরিয়ে-ছেন। চিয়েনমেনের আর একটা ফটক পেরিয়েই তিনি পড়েছেন উন্মুক্ত রাস্তায়। দেখুন, দেখুন, রাস্তার দুপাশ আগাগোড়া নীল বালু দিয়ে ঢাকা। কারণটা বুঝতে পারছেন? হতভাগা লোকগুলো যদি সম্রাটকে দেখেই ফেলে তবে তাঁর আর মানমর্যাদা রইল কোথায়! তাই এই ব্যবস্থা। শোভাযাত্রা চলেছে সোজা দক্ষিণে। শীঘ্রই সম্রাট প্রবেশ করবেন "স্বর্গের মন্দিরে।" এ মন্দির হলো প্রাচীর ঘেরা একটা বিরাট জায়গা। এর প্রবেশ পথের প্রথমেই রয়েছে বৃত্তাকার স্বর্গের বেদী। এখানে সম্রাট প্রার্থনা করবেন এবং প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করবেন। এ জায়গাটির গুরুত্ব সম্রাটের কাছে অসাধারণ, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এইটিই হচ্ছে বিশ্বজগতের কেন্দ্র-বিন্দু। পুরুষ পরম্পরায় পাওয়া এ বিশ্বাস তার বিনষ্ট হওয়া শক্ত—তাতে আপনি আমি এর অসম্ভাব্যতা নিয়ে যতই পরিহাস করি না কেন। এখান থেকে তিনি যে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন

* ড্যাগোবা—স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ।

তাকে আপনি বিরতি প্রাঙ্গণও বলতে পারেন; কারণ এখানে এসে তিনি সব কিছুতে সংযম অবলম্বনের চেষ্টা করবেন—এ বিরতি পানাহার, কামিনীসংসর্গ এবং মোহ থেকে। এরপর তিনি যাবেন পাইন গাছের মত তিনছাত-ওয়ালা গোলাকার প্রার্থনা মন্দিরে। ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দিরে বসে তিনি প্রার্থনা জানাবেন যাতে আগামী দিনে কৃষকরা ভালো ফসল তুলতে পারে।

কিন্তু না, এসব কথা বেশী শুনিয়ে লাভ নেই। মাঞ্চু রাজবংশের পতনের সাথে সাথে সব গেছে। আজ নিস্তব্ধ প্রাতঃরশ্মির সম্মুখে কেউ আর মশাল উঁচু করে ধরে না স্বর্গের বেদীতে। আর সেই কোমল বংশী-ধ্বনি আলোড়িত করে না প্রভাতের মন্দ মন্দ হাওয়া, নর্তকীদের সেই নৃত্যগীত আর নয়ন মনোহর হয়ে ওঠে না সকালের সোনালী রোদে। সব গেছে। সে সব গেছে কিন্তু সেকালের গল্পগাথাগুলি এখনো আছে। এখনো তারা তেমনি শ্রোতব্য বস্তু। ধরুন এই পর্বতের সঙ্গেই জড়ানো যে গল্পটি। সেকালে রাজার এক অনুগত শিল্পী আদেশ পাওয়া মাত্রই খুব দ্রুত এক প্যাভেলিয়নের নেয়াল সাজিয়ে ফেললে। রাজপুত্র তার কাজের প্রশংসা করে বললেন, শিল্পী, তুমি কি চাও বলো। বলো কাকে আদর্শরূপে পেলে তুমি অঙ্কন কার্যে তন্ময় হয়ে যেতে পারো, আমি তোমার যথাসাধ্য সাহায্য করবো। শিল্পী কিছু বললেন না শুধু প্যাভিলিয়নের বিরাট উঁচু প্রবেশ পথের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সেখান দিয়ে চলেছে অজস্র সাধারণ মানুষ আর গাড়ী ঘোড়া।

হুজুর, বলে উঠলেন শিল্পী, এরাই আমার আদর্শ।

ধুর, ধুর, ওকি একটা আঁকবার জিনিব, একঘেয়ে রাবিশ। সৌন্দর্য কোথায় ওর মধ্যে?

ক্ষমা করুন হুজুর, ঐখানেই যথার্থ জীবন, জীবনের যথার্থ রূপ।

পাহাড়ের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, আজও সেই জীবনের যথার্থ রূপের ধারা অব্যাহত অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছে। এটা একটা সাধারণ পার্ক। বিকেল হলেই মেয়েরা আসে বেড়াতে, ছেলেরা খেলতে, আর পুরুষেরা গল্প করতে। আলে-আড়ালে জোড়ের দেখাও পেতে পারেন। এরাই আজ চীনের সব কিছু। সম্রাট ঘুং লো, শহরের যিনি আসল সৃষ্টিকর্তা, তিনি যদি আজ হঠাৎ আবির্ভূত হন তবে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তাঁর সিংহাসন, বাসস্থান আর মন্দিরের চারপাশে যত রাজ্যের সাধারণ জনে ভিড় করছে। তাঁর রাজসভা এখন মিউ-জিয়ম মাত্র। সেখানে নিওলিথিক যুগের মৃৎপাত্র এবং ৩০০০ বছর পূর্বের ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিষের নিদর্শন মিলবে। হ্যান রাজত্ব কালের লেখা (২০৮ খৃঃ পূঃ—২২০ খৃষ্টাব্দ) কি ঘুং রাজত্ব কালের বই কিংবা ট্যাং রাজত্বকালের অয়েল পেন্টিং, সবই মিলবে। এই সব প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করবার জন্যে এককালে বিশ্বের ভ্রমণকারীদের ভীড় লেগেছিল এখানে।

এখানের হাটবাজারও কম আকর্ষণীয় নয়। সকাল হতে না হতেই সিপিংএর পূব দিকের বাজার জাঁকিয়ে ওঠে। কলকাতা সহরে যেমন ব্যবসায় একএকটি আড়ত এক একটি নামে চিহ্নিত, ধরুন, হুঁকোপট্টি, সুতোপট্টি, ওখানেও তেমনি রাস্তাগুলোর নাম সেইখানে বিক্রীত প্রধান পণ্যের নামে, যেমন লণ্ঠন রাস্তা, রূপো রাস্তা ইত্যাদি। (চীনে ভাষায় এগুলি মোটেই এত শ্রুতিকটু নয়!) হাতামেন ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখা যায়, আমাদের একান্ত পরিচিত সর্বত্র বিদ্যমান ফেরী-ওয়ালারা জিনিষ নিয়ে বসে গেছে। খুব একটা অসাধারণ কিছু না চাইলে আপনার সব কিছু জিনিষ ওখানে মিলবে আর ওজন করবারও বিশেষ হ্যাঙ্গামা নেই, সেই চির-কালের চেনা দাঁড়িপাল্লা!

ভীড়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা অসঙ্কোচে চলাফেরা করেন। আজ তাদের সমাজের বেড়ী ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ ঘুচেছে। এখন তারা সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবহমান।

মানুষের ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে যানবাহনের

ভীড়। যানবাহন বলতে রিক্সা, ঠেলাগাড়ী আর সাইকেলই বেশী। মোটর গাড়ী আর ট্রাকের প্রচলন অতি অল্প। পেট্রল আর রবারের তুলনায় মানুষের মজুরী অনেক সস্তা তাই মানুষটানা রিক্সার প্রাচুর্য। মাঝে মাঝে শুধু গৌদ্রমাখা মধ্যাহ্নে দেখা যায়, মঙ্গোলিয়া মরুভূমি পার হয়ে আসে পণ্যবাহী উটের দল—নীরবে তারা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলেছে।

যারা বাজারে আসবার মত সময় করে উঠতে পারেনা তাদের জন্যে রয়েছে ফেরীওয়ালা। পিঠে ঝুড়ির ভেতর জিনিষ পত্র নিয়ে তারা ঘরে ঘরে ফেরী করে। তাদের প্রত্যেকের মৃদু করুণ সুরে বলবার বিশেষ ধরণ থেকে প্রাচীর অন্তরালের গৃহস্থরা বুঝে নেয় কি জিনিষ বিক্রী করতে এসেছে।

পিপিংএর এই সদাব্যস্ত, অন্নের অনুসন্ধানে ক্লান্ত সাধারণ জন ইতিহাসের মৌন দর্শক হয়ে রয়েছে অনেক দিন ধরে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী পিপিং চিয়াং কাইশেকের হাতছাড়া হয়ে কম্যুনিষ্টদের হাতে চলে যায়। সেদিন বিজয়ী সেনাদের নগর প্রবেশ দেখবার জন্যে এরা রাস্তার দুপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে এদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে মঙ্গোলীয় টাট্টু ঘোড়ার চড়ে অফিসাররা সৈন্যচালনা করেছেন। তাদের পেছন পেছন এসেছে অনেক মার্কিণ ট্রাকের সারি, বিজিত দলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া, তার ওপর প্রচার-কার্যের বিপুল উদ্যম। চিত্র এবং বক্তৃতার সাহায্যে যে প্রচারের মূল সুর এক, "হে নাগরিক, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে এক সুস্থ এবং সমৃদ্ধ জীবনের বার্তা বহন করে। তোমরা প্রস্তুত হও আমাদের সুরে সুর মেলাবার জন্যে।"

এ নগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছে অনেক মানুষ, অনেক বীর আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালস্রোতে। ইতিহাস-পুরুষ একদিন তৈমুরলঙের অশ্বখুরধ্বনির মধ্য দিয়ে নগরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এসেছেন মোঙ্গল, মিং আর মাঞ্চু আক্রমণকারীদের পেছনে পেছনে, তিনি এসেছেন গণতন্ত্রী চীনাদল আর জাপানীদের মধ্য দিয়ে। এখন তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করছেন কমিউনিষ্ট চীনদলের ভেতর থেকে। তাঁরই মর্জিতে পিপিং রয়েছে কখনো শুধু নগররূপে, কখনো হয়েছে রাজধানী। সাইবেরিয়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে মস্কো মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত যখন মোঙ্গল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল তখন এই সহরই ছিল রাজধানী, আর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগেও ছিল তাই। মাঝে শুধু শক্তির কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখন পিপিং আবার স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নগরের সর্বত্র যেন একটা ছায়া, একটা যাদুমন্ত্রের প্রভাব, বশীকরণের একটা অলৌকিক আবির্ভাব ছড়ানো রয়েছে। চিয়েনমেনের সুড়ঙ্গাকৃতি প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে গেলে তাই মনে হয়। এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। পুরোনো দিল্লী দেখলে আমাদের কি মনে হয়? তা সত্ত্বেও আবার এ নগর যে রাজধানী হয়েছে, (পুরোনো দিল্লীর পাশে নতুন দিল্লী) তার কারণ চীনকে তার দৃষ্টি সর্বদাই রাখতে হবে উত্তরে আর পূর্বে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্ববাসী আজ তাকিয়ে আছে সমগ্র চীনের প্রতি, তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছে পিপিংএ। অদূরভবিষ্যতে বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে কোন অংশ গ্রহণ করবে, আদর্শে অটল ও উন্নত থেকে কোন নবতম নির্দেশ সেখান থেকে উৎসারিত হবে কে জানে!

সংবাদপত্রের মৌল অধিকার আন্দোলন

শ্রীসুনীল ঘোষ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ সংবাদ বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই সময় একটী সুস্থ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। মার্কিণ সাংবাদিকগণ এই দাবী তোলেন যে, দুনিয়ার সবত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল মৌখিক বাক্যে তাহাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শান্তিকালে সংবাদ আদান-প্রদানের উপর হইতে তাবৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বিধি-নিষেধ অপসারণ করিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি "নিউজ চার্টার" রচনা করার প্রস্তাব করেন এবং অবাধ সংবাদ বিনিময়ের স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মার্কিণ সংবাদপত্র সমিতির (American Society of Newspapers) একদল প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। বিশ্বে যদি প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার এবং একদেশ হইতে অন্যদেশে যথাযথভাবে আদান প্রদানের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন—ইহাই ছিল মার্কিণ সাংবাদিকগণের অভিমত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে জার্মানীর সমস্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, বেতার কেন্দ্র প্রভৃতি হিটলার-সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। বাহির বিশ্বের সমস্ত সংবাদ হইতে সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ক্রমাগত জার্মানীর আর্য-ঐতিহ্য ও যুদ্ধে বিজয়বার্তা পরিবেশন করিয়া তাহাদের যুদ্ধ-খুশী করিয়া তোলাই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে জার্মান সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "উল্‌ফ-বুরোর" কাজও ছিল ইহাই। সমরবাদী জাপানেও ঐ একই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু জার্মান-জাপানই যে এই দোষে একমাত্র দোষী ছিল, তাহা নয়—যুদ্ধকামী তাবৎ রাষ্ট্রই কম-বেশী এই নীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জার্মানী ও জাপানে কেবল ইহার চরম রূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকান এসোসিয়েটেড প্রেসের সর্বময় কর্তা মিঃ কেন্ট কুপারের একটী মন্তব্য প্রসঙ্গতঃ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মিঃ কুপার বলিয়াছেন, "What is not generally known and must be fully understood, if there is to be any success in purifying the flow and counterflow of international news and information is that what the Nazis did is only an external form of what has gone on steadily throughout most of the world, under our very noses." তাই, মার্কিণ সাংবাদিকগণের তরফ হইতে সমগ্র দুনিয়ার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য যে প্রচেষ্টা হয় ভারতীয় সাংবাদিকগণও তাহাতে পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন না করিয়া পারেন নাই। কারণ গণতান্ত্রিক-নীতিসম্মত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে কত বেশী প্রয়োজনীয় এবং বিশেষতঃ শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে এই স্বাধীনতা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা ভারতবাসী মাত্রেই উপলব্ধি করিত। কিন্তু সংবাদপত্রের এই মৌল অধিকার হইতে তাহারা চিরদিনই ছিল বঞ্চিত। তাই, মার্কিণ সাংবাদিকগণের প্রস্তাবানুযায়ী "নিউজ চার্টার" বাস্তবে পরিণত হইলে শুধুমাত্র সংবাদপত্রের স্বার্থই রক্ষিত হইবে না—ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গগনচুম্বী স্পর্ধাও অনেকাংশে শিথিল হইবে; এই আশাতেই ভারতীয় সাংবাদিকগণ উক্ত প্রস্তাবে মনে প্রাণে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই সম্মতির অর্থ ছিল সরাসরি ভারতস্থ বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা; অর্থাৎ একদিকে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিষ্ঠার দাবী—অপরদিকে ভারতের পরাধীনতার অবসান এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু বাঞ্ছিত অধিকার

অর্জনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল আমেরিকা ও বৃটেনের পর্যায়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। আমেরিকার ন্যায় বৃটীশ সংবাদপত্র শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি না পাইলেও স্বাধীনতা সমানই ভোগ করিত। কিন্তু ভারতে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি তো ছিলই না, বরং প্রতিপদে এই স্বাধীনতা ছিল খর্বিত।

১৯১০ সালের প্রেস আইন ১৯২২ সালে রদ করা হইয়াছিল সত্য—কিন্তু অনুমানিক বিধিনিষেধ তথা প্রিন্সেস প্রোটেক্‌শন এক্ট বা নৃপতি রক্ষা আইন, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৪এ, ১৫৩এ ধারা, ফৌজদারী কার্যবিধির ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড-এর ৯৯ এ হইতে ৯৯ জি, প্রেস এ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব বুকস এক্ট ১৮ডি ইত্যাদি দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বিজড়িত ছিল। তদুপরি, ভারতরক্ষা আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সরকারী নির্দেশের চাপ তো ছিলই। ভারতীয় সাংবাদিকগণ এই যাবতীয় নির্দেশের প্রত্যাহারের দাবী জানাইলেন—কারণ, একদিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে এই সকল বিধিনিষেধের আবশ্যকতা যেমন হ্রাস পাইতেছিল, তেমনি রাজনৈতিক বন্দীদের অভাব অভিযোগ এবং তাহাদের উপর পুলিশী জুলুম সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভারতীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সমূহকে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত করার দাবী জানাইয়া ১৯৪৫ সালের ২৭ শে জানুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ : "This conference demand that the Press Laws in India should be brought into line with those in Britain and the United States of America, and that with this end in view, the Press (Emergency Powers) Act and the Princes Protection Act should be immediately repealed and the provision of the Indian Penal Code and Indian Criminal Procedure Code and other legal enactments be suitably amended." কিন্তু তাঁহাদের এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। ভারত সরকার সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, ঐরূপ প্রস্তাব স্বীকার সরকারের পক্ষে অসম্ভব। শান্তিকালেও কিছু সংখ্যক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক, কাজেই তাহাদের ঐ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার কথা উঠিতে পারে না।

যাহা হউক, ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। যুদ্ধাবসানে শত্রু আক্রমণের ভয় দূরীভূত হইলেও সরকারী আক্রমণ হইতে সংবাদপত্র সমূহ একেবারে রেহাই পায় নাই। জরুরী সংবাদপত্র আইনের (Press Emergency Powers Act) বলে লক্ষ্ণৌ এর "ন্যাশনাল হেরাল্ড", কাশীর "সংসার" পাটনার "সার্চলাইট", বোম্বাইয়ের "ফ্রোরাম" এবং কলিকাতার "স্বাধীনতা" পত্রিকার বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। "নাগপুর টাইমস"-এর জামানত ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে বাজেয়াপ্ত করা হয়। "ফ্রোরামের" তো জামানত দিতেই হয়—উপরন্তু বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে সম্পাদক দণ্ডিত হন। যুদ্ধকালে সরকার যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া পত্রিকার কণ্ঠরোধে প্রয়াসী ছিলেন—যুদ্ধান্তেও তদ্রূপ কৌশল অবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। এমন কি সংবাদ সরবরাহ ব্যাপারও একেবারে নির্বাক ছিল না। বিভিন্ন স্থানে সংবাদ প্রেরণের উপর জিলা কর্তৃপক্ষ ও তার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের নজীরও অবিদিত ছিল না। কিন্তু যুদ্ধাবসানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এইরূপ অন্যায় অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না বলিয়া সমগ্র দুনিয়ায় ক্রমবর্দ্ধমান সংবাদপত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে পড়িয়াই হউক অথবা লোকনিন্দা বা মানসম্ভ্রমের খাতিরেই হউক, সরকার সবগুলি বিধিনিষেধ তুলিয়া লন। উহাদের মধ্যে প্রেস ইমারজেন্সী পাওয়ার্স (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) অর্ডিন্যান্সটি অন্যতম। কিন্তু উহাতেও খুব একটা উল্লসিত হইবার কারণ ছিল না। যেহেতু ঐ সকল আইনের বহিরাঙ্গের

কিঞ্চিত পরিবর্তন হইলেও পীড়নাত্মক অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনাহতই ছিল, ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য সংশোধন সাধিত হইয়াছিল এই মাত্র। তাহা ছাড়া, যে সকল সংবাদপত্র ইতিপূর্বেই রাজরোষে পতিত হইয়াছিল—তাহাদের স্বাধীনতা প্রদান সম্পর্কে কোনই বিবেচনা করা হয় নাই কেবলমাত্র এইটুকু নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, ভবিষ্যতে যাহাতে হুকুমের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং নূতন যে সকল হুকুম প্রবর্তিত হইবে তাহাতে আগেকার ন্যায় কোন বাড়াবাড়ি যাহাতে অবলম্বিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। এতৎসম্পর্কে ১৯৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ভাঃ সঃ সম্পাদক সম্মেলনে শ্রীযুক্ততুষারকান্তি ঘোষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত ঘোষ বলিয়াছেন, "When we see that war time control over the press has been withdrawn to a large extent we are tempted to feel that the irritating shackles on the Press have at least been removed. But a close examination of the clause of the repeating ordinance will reveal that it is not all gold even though it glitters. The fact is that in most cases the substantive ordinances have been allowed to remain intact, though with certain amendments. It validates all and every act done under the ordinance. And what is more, it does not propose to afford relief to the sufferers from the previous ordinances. It does not propose to heal but promises that further infliction will not be so numerous or deadly in their effects in the ordinance it has amended."

উপরি উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে নিম্নোদ্ধৃত সরকারী ভাষ্যই পরিপূর্ণ অর্থবোধক—"Nor shall the repeal by this ordinace by which text of any law was amended by the express omission, insertion or substitution of any such matter, affect the continuance of any such amendment in operation at the commencement of this ordinance, unless a different intention was expressly stated in the ordinance by which the amendment was made."

তাই, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ তাঁহার উপরোল্লিখিত ভাষণে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, এক হস্তে দান ও অপর হস্তে আত্মসাৎ করার যে চিরন্তন নীতি বৃটিশ সরকার চালিয়া আসিতেছিল, অর্ডিনান্স সমূহের তথাকথিত প্রত্যাহারের মধ্যে সেই ইতরতা লুপ্ত হয় নাই ("To take away with one hand what has been given with the other has been traditional policy of the powers that be in this country, we find some spirit of niggardliness in the so-called repealing ordinance.")

যুদ্ধাবসান ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি

ধীরে ধীরে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। দুনিয়াব্যাপী রণকোলাহল প্রত্যক্ষভাবে ভারত-ভূমি স্পর্শ না করিলেও পরোক্ষে যথেষ্ট উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাই যুদ্ধান্তে দেশের বুক হইতে এই উন্মাদনার নিবৃত্তি ঘটিবে—প্রতিষ্ঠিত হইবে শান্তি ও স্বাভাবিকতা, এই যাহারা ভাবিয়াছিল—তাহাদের সমস্ত আশা ও কল্পনা বিপর্যস্ত হইল সম্পূর্ণ এক অভাবিত সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন—অখণ্ড ভারতে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উড়ানই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অপরদিকে দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মুসলীম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন—ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনই যাহার লক্ষ, এই দুই বিরোধী আদর্শের পারস্পরিক সংঘাত সর্বোপরি মন্ত্রি-মিশন মাউন্টব্যাটেন চক্রের ইন্ধন প্রযুক্ত হইয়া ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করে। ইহারই চরম অভিব্যক্তি 'দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট

সর্বপ্রথম কলিকাতা সহরে। কলিকাতা হইতে এই বিষপ্রবাহ নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই হাঙ্গামা মূলতঃ মুসলীম লীগ পরিবেষ্টিত হইলেও কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ই ইহাতে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করে। আর ইহারই সুযোগে সমাজের দুষ্টব্রণ স্বরূপ যে সকল লোক শান্তিকালে অন্ধকার গহ্বরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা এইবার আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ভারত ইতিহাসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়ের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার প্রতিক্রীয়া সমগ্র দেশের সুস্থ জনমনে এক বিমূঢ়তার ভাব আনয়ন করিয়াছিল। আর সর্বাপেক্ষা গ্লানির কথা এই যে, যখন সেই দুর্দম উন্মাদনাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করা উচিত ছিল, সর্বপ্রথমে তখন বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলীয় স্বার্থ প্রণোদিত সংবাদপত্র ধর্মান্ধ নেতৃবৃন্দের সহিত সাম্প্রদায়িকতার দোহাই পাড়িয়া এবং পরস্পর কুৎসিত ও মিথ্যা প্রচারকার্যদ্বারা একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করিয়া যে শুধু দাঙ্গাজনিত বিষময় আবহাওয়া অধিকতর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়—সংবাদপত্রের আদর্শের মূলেও কালিমা লেপন করিয়াছে। সুতরাং এই উন্মত্ততার অবসানের জন্য তখন সরকার কর্তৃক যে সকল বিধি নিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে যুক্তিসঙ্গত বলা চলে। এই অশান্তি ও কলহ নিরোধের জন্য সরকার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র সমূহেরই সহযোগিতা আহ্বান করেন। ভারতের প্রায় সকল পত্রিকাই সাড়া দিল এই আহ্বানে। কিন্তু তবুও পরস্পর বিরোধী মতের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক পত্রিকা সমূহ পারস্পরিক বিদ্বেষোদ্গার হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় সাংবাদিকতাকে কলঙ্কমুক্ত রাখিবার জন্য বোম্বাইয়ের সম্পাদকগণ সর্বপ্রথম স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কোন পক্ষের পত্রিকাই দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কিত সংবাদে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী পক্ষের নামোল্লেখ করিবেন না। বোম্বাইয়ের সম্পাদকগণের এইরূপ প্রগতিশীল আদর্শের অনুসরণে কেন্দ্রিয় সংবাদপত্র উপদেষ্টা কমিটিও নিম্নরূপ আদেশ জারী করেন।

(১) দাঙ্গা হাঙ্গামা সংক্রান্ত সংবাদে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী পক্ষের নামোল্লেখ চলিবে না।

(২) উত্তেজনামূলক বিবৃতি, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রকাশ করা চলিবে না।

(৩) সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রবন্ধ এমন যত্নের সহিত লিখিতে হইবে যাহাতে কোথাও কখনও অনাবশ্যক হেতু হিংসাত্মক কার্যকলাপের সমর্থন সূচক বা সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক কোন ভাব প্রকাশিত না হয়।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক অশান্তি দিনের পর দিন এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, এই সকল বিধি-নিষেধেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। তাহা ছাড়া সম্পাদক সম্মেলনের বহির্ভূত সম্পাদকগণ কোনদিনই সম্পাদক সম্মেলনের নির্দেশ মানিতে রাজী ছিল না এবং তাহাদের অনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অধিকতর জটিল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার অগত্যা পত্রিকা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়াস পান। এইবার পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক সদস্য লইয়া একটি "এ্যাড হক" কমিটি গঠিত হয়। কমিটি কর্তৃক তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নীতি সমূহ অনুসৃত হয়:—

(ক) প্রত্যেকটি সংবাদ যেন বাস্তব ও সত্য হয়।

(খ) দাঙ্গা সংক্রান্ত কোন সংবাদে যেন আক্রান্ত ও আক্রমণকারী পক্ষের নাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে উল্লিখিত না হয়।

(গ) দাঙ্গার ফলে নিহত বা আহতের সংখ্যা যেন কোন হেডিংএ ব্যবহৃত না হয়।

(ঘ) প্রত্যেকটি ছবি অত্যন্ত সাবধানে ছাপিতে হইবে; আর এমন কোন ছবি ছাপান চলিবে না, যাহাতে

জনসাধারণের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উৎসাহিত করা হয়।

(৬) সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন বিবৃতি যতক্ষণ না কেন্দ্রিয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ততক্ষণ প্রকাশ করা চলিবে না।

বাংলায় লীগসরকারের বাড়াবাড়ি

সমগ্র ভারতে দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রসার রোধের জন্য দেশের সংবাদপত্র সমূহ যখন একই প্রকার নীতি অনুসরণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন বাংলাদেশের তদানীন্তন লীগ সরকার অতি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে নূতন অর্ডিনান্স প্রণয়ন করিয়া বাড়াবাড়ির পরিচয় দেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ছিল ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দিন। ঠিক উহার আগের দিন অর্থাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বর বাংলা সরকার সংবাদপত্রে দাঙ্গার সঠিক সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া এক হুকুমনামা জারী করেন। এই আদেশ বলে সংবাদপত্রে হতাহত ব্যক্তিগণ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, কোথায় কি ভাবে তাহারা নিহত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা চলিত না। বাংলা সরকারের আদেশের মর্ম ছিল মোটামুটি এইরূপ :

"বাঙ্গলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে এমন কোনও বিবৃতি, বিজ্ঞাপন, নোটিশ, সংবাদ, মন্তব্য বা অন্যান্য বিষয় মুদ্রণ, প্রকাশ বা বিলি করা চলিবে না—যাহার মধ্যে কোন বিশেষ জেলা বা মহকুমার কোন স্থানে কিছু ঘটিলে সেই স্থানের নাম থাকিবে; কোনও লোক নিহত বা আহত হইলে (কি ভাবে নিহত বা আহত হইল) তাহার উল্লেখ থাকিবে, আততায়ী বা আক্রান্ত কোন্ সম্প্রদায়ের লোক তাহার উল্লেখ থাকিবে; কোনও উপাসনালয় বা ধর্মস্থান অপবিত্র করা হইলে তাহার বিবরণ থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংক্রান্ত বা কোনও হতাহত সম্পর্কিত কোনও ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফের অনুলিপি ছবি, রেখাচিত্র বা কার্টুন স্বতন্ত্রভাবে বা কোনও সংবাদপত্রের বা বিজ্ঞাপনের মারফত মুদ্রণ প্রকাশ ও বিলি করা চলিবে না।"

বাংলা সরকারের আদেশের প্রতিবাদ

২৬শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিঃ শহীদ সুরাবর্দী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উপরোক্ত আদেশের অনুলিপি প্রদর্শন করেন। ঐ সম্মেলনে স্থির হয় যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্যন্ত সম্পাদকগণকে উহা বিবেচনা করিবার জন্য সময় দেওয়া হইবে এবং সোমবার সম্পাদকগণের অভিমত অবগত হইবার পরে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তদনুসারে সম্পাদকেরা ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সমবেত হন। দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক ইহা তাহারাও স্বীকার করেন এবং স্থির করেন যে, প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সকল কাগজের প্রতিনিধি স্টেটস্‌ম্যান অফিসে নিজ নিজ রিপোর্টসহ সমবেত হইবেন। সমস্ত রিপোর্ট একত্র করিয়া একটি রিপোর্ট প্রস্তুত হইবে এবং সমস্ত সংবাদপত্রে শুধু উহাই প্রকাশিত হইবে। সন্ধ্যা সাতটার পরবর্তী কোন ঘটনা পরদিন প্রকাশিত হইবে না, পরের সভায় ঐগুলি যথারীতি উপস্থিত করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইলে অর্ডিনান্স ছাড়াই সংবাদপত্রে সঠিক বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইত এবং ভুল ও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হইত। বোম্বাইয়ের সম্পাদকেরাও নিজেরা এই ভাবেই দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং সেখানে সরকার কোন অর্ডিনান্স জারীর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু স্বৈরাচারী বাংলা সরকার এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই; এমন কি সোমবার পর্যন্তও তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই। শনিবার দিনই অপরাহ্নে সম্পাদকদের পুনরায় আহ্বান করিয়া প্রধানমন্ত্রী জানাইয়া দেন, অর্ডিনান্স জারী হইবেই এবং রবিবার উহা ঘোষিত হয়।

এই অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, তুষারকান্তি ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ

ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সংবাদিকগণ এক বিবৃতিতে বলেন যে, তথ্যপূর্ণ বিবরণ ও সঙ্গত মন্তব্য বন্ধ করাই এই আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য। তাঁহারা বলেন, "২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন শেষ হইবার পরমুহূর্তেই উপরোক্ত অর্ডিনান্স জারী তাৎপর্যহীন নয়। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারকে লীগের আবদার মানিয়া লইতে বাধ্য করাই বর্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার মূল উদ্দেশ্য। কলিকাতার পুলিশের প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে লীগপন্থী মুসলমান কর্মচারী মোতায়েন করিয়া হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনাপূর্ণ আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গেও তাহাই করা হইয়াছে। পুলিশ হিন্দুদের রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা তো করেই নাই, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হিন্দুরাই পুলিশের গুলীতে আহত হয়, গ্রেপ্তার হয়। এবং হিন্দু গ্রেপ্তার হইলে তাহার পক্ষে জামীনে মুক্তিলাভ পর্যন্ত দুরূহ হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, লীগের গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অগ্রসর হয় নাই, মুসলমান জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলী চালায় নাই এবং লীগ গুণ্ডারা ধরা পড়িলেও জামিনে মুক্তি পায়। লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে হিন্দুদের বাঁচাইবার ব্যবস্থা তো নাই-ই, বরং বেপরোয়া গ্রেপ্তার করিয়া আত্মরক্ষায় হিন্দু যেটুকু চেষ্টা করিতে পারিত তাহাও ব্যর্থ করিয়া আনা হইতেছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যেখানে নিষ্ক্রিয়, সেখানে সংবাদপত্রই দেশবাসীর প্রধান ভরসা। ব্যবস্থা-পরিষদ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের অতিশয় যুক্তি-সঙ্গত পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া অর্ডিনান্সের বলে রাজ্যের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা আমরা কিছুতেই উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। পূর্ববঙ্গের সহরগুলিতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই হাজার হাজার হিন্দু নরনারীর আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আসিতেছে। বর্তমান অর্ডিনান্স চালু থাকিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

বস্তুতঃ ছয়মাসকাল এই অর্ডিনান্স বহাল ছিল; কিন্তু ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নাই। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ইহাতে কমে নাই বরং আক্রমণ স্থানের সঠিক বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় অনেক নিরীহ লোক বিপদজনক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানী বন্ধ করিবার নামে সংবাদপত্রের শিরোনামা এবং উহার হরফ ছোট করা হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে সাম্প্রদায়িক বিষের তেজ কমে নাই। এই সময় বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য যে চক্রান্ত চলে তাহাতে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজ মহলের পূর্ণ সমর্থন ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং ব্যবস্থাপক সভায় সংবাদ প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লওয়ার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারও প্রতিবাদকল্পে এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উভয় সভাতেই প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজ সদস্যের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের এই আদেশ বক্তৃতায় এবং ভোটের দ্বারা সমর্থন করেন। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তদানীন্তন লীগ সরকারের প্রধান অভিযোগ ছিল যে, উহারা মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে উস্কানী দেয়। ইংরেজ প্রতিনিধিরাও ইহা সমর্থন করিয়া লীগকেই তাহাদের ভোট দেন; কিন্তু এই অভিযোগ ছিল একান্ত অসত্য। সরকারের হাতে আইনে এবং অর্ডিনান্সে এত ক্ষমতা ছিল যে উহার ফলে মিথ্যা অতিরঞ্জিত অথবা উস্কানীদায়ক সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করা যাইত। এত ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করার চেষ্টা করার অর্থ ছিল যে, প্রকাশিত সংবাদ উক্ত তিন পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারা যাইতনা বলিয়াই তাঁহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন।

জামীন তলব

১৯৪৬ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রগুলির কত জামীনদাবী করা হইয়াছে তাহার বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—

অমৃতবাজার পত্রিকা		২৭-১১-৪৬
অমৃতবাজার পত্রিকা		৩০-১১-৪৬
অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেস		১৭-৪-৪৭
অমৃতবাজার পত্রিকা		৪-৫-৪৭
আনন্দবাজার পত্রিকা		২৯-৪-৪৭
আর্ট প্রেস		৭-৪-৪৭
আজাদ		৩০-১১-৪৬
আল ইসলাম		১৯-১১-৪৬
ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস		১৭-৪-৪৭
এডভান্স		২৭-১১-৪৬
ক্যালকাটা প্রিন্টিং প্রেস		৮-১২-৪৬
কৃষক	২০০০৲	৩-৫-৪৭
জাগৃতি	২০০০৲	১৬-১১-৪৬
জয় হিন্দ	৫০০০৲	৭-৫-৪৭
ন্যাশনালিষ্ট ও মডার্ণ প্রেস	৪০০০৲	১-১২-৪৬
ঐ	৫০০০৲	৯-৫-৪৭
প্রত্যহ	৪০০০৲	২৪-১১-৪৬
বসুমতী	৪০০০৲	১৩-২-৪৭
ভারত	৪০০০৲	১৯-১২-৪৬
ঐ	৫০০০৲	৮-৫-৪৭
বিশাল ভারত	৪০০০৲	১-১২-৪৬
মর্ণিং নিউজ	২০০০৲	২৯-১১-৪৬
মডার্ণ রিভিউ	২০০০৲	১৫-৪-৪৭
যুগান্তর	২০০০৲	২১-৪-৪৭
লোকমান্য	৪০০০৲	৯-১২-৪৬
ষ্টার অব ইণ্ডিয়া	৪০০০৲	২১-১১-৪৬
সরস্বতী প্রেস	১০০০৲	৩০-১১-৪৬
স্বাধীনতা	৬০০০৲	২১-৪-৪৭
হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড	২০০০৲	৯-১২-৪৬
ঐ	৫০০০৲	২৯-৪-৪৭
হিন্দুস্থানে	২০০০৲	৮-১২-৪৬
হিন্দু বাংলা সাপ্তাহিক	২০০০৲	১০-১-৪৭

১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা

জামীন বাজেয়াপ্ত

অমৃতবাজার পত্রিকা	
অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেস	
অমৃতবাজার পত্রিকা	
আনন্দবাজার	
ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস	
কৃষক	
জয় হিন্দ	
ন্যাশনালিষ্ট	২০০০৲
বসুমতী	৩০০০৲
ভারত	২০০০৲
স্বাধীনতা	৪০০০৲
হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড	১০০০৲

মোট ২৯ হাজার ৫০০৲

উপসংহার

পরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সংবাদপত্রের যে মুক্তি আন্দোলন সুরু হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ হইতে—বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া সেই অবিরাম আন্দোলনের একটি গৌরবোজ্জ্বল পর্ব শেষ হইল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। যুগে যুগে অদ্ভুত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্র তাহার জয়যাত্রার পথ করিয়া লইয়াছে। দেশের দিকে দিকে শান্তি, ন্যায়, ও সাম্য-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া নব-অভ্যুদিত ভারতের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের মূক জনতার মনে নূতন আশা ও বলের সঞ্চার করিয়াছে। ভারতীয় সংবাদ-পত্রের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যশালী ইতিহাসের একটি পর্বের স্বাক্ষর মাত্র রাখিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

সিন্ধুর ডাক

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

(পূর্বানুবৃত্তি)

সূর্যের মনে পড়ল কমলার কথা। এমনি করে তিনিও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। সূর্য তাঁর অন্তিম সাধ পূর্ণ করতে পারেনি। তিনি চেয়েছিলেন, সূর্যর কোলে মাথা রেখে মরতে; সূর্যর হাতে তিনি শুতে চেয়েছিলেন চিতায়; অক্ষম সন্তান সূর্য, তাঁর সে আশা মেটাতে পারেনি। আজ আবার উমারাণীর আত্মা, তার কাছে চাইছে আগুন, চাইছে জল; সূর্যকে তারজন্য প্রস্তুত হতে হবে। এতো শুধু কর্তব্য নয়, প্রায়শ্চিত্ত। কমলার অতৃপ্তির অনন্ত অবসান।

সূর্যকে পাঠিয়ে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী শিউলীকে তুলে নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে বসলেন। শিউলী মাথা তুলে দেখল, উমারাণীকে সকলে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। কি প্রশান্ত তাঁর মুখ! হায়, মৃত্যুর মাধুরী তাহলে সত্যই অপূর্ব। তা না হলে, সেই সন্তানহারা জননীর বেদনা-মলিন মুখ এমন শান্ত স্নিগ্ধ হল কি করে? শিউলী আবার চোখ বন্ধ করল। তার বুকের মধ্যে সেই চিঠিখানি একবার মড়মড় করে উঠল। রাজপথ থেকে তখন ভেসে আসছে উচ্চকণ্ঠের—"বল হরি, হরি বল"।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিউলী আর সূর্য।

শোকতপ্ত দুটী তরুণ চিত্ত এসে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখী। তারা আজ ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ দেশে, প্রিয় পরিবেশের মধ্যে। দুজনেরই ভবিষ্যৎ কুয়াসাচ্ছন্ন; অতীত সুদূর-পরাহত, আর তাদের বর্তমান ঔদাসীন্যময়। সূর্য দুপুরে নিজের ঘরে বসে পড়ছিল, সেই সময় শিউলী এসে বসল তার পাশে। ধীরে ধীরে বললে, "কাল চলে যাচ্ছি সূর্য; একটু থেমে আবার বললে, আর হয়ত দেখা হবেনা আমাদের"—সূর্য ওর দিকে তাকাল; বললে; "আমিও যাচ্ছি শিউলী; কাকাবাবু ডেকেছেন"। শিউলী বললে, "আবার আমাদের কবে দেখা হবে সূর্য"? সূর্য বললে, "তা কি করে বলি শিউলী? ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা কি কেউ বলতে পারে"?

"আমি বলতে পারি—"শিউলী সহসা বলে উঠল। তুমি ভাবছ শিউলীটা চোখের সামনে থেকে বিদায় হলে বাঁচি। আমি একটু মন দিয়ে পড়া শুনা করি"—সূর্য আহত স্বরে বললে, "ছিঃ শিউলী, ওকি কথা? তুমি কি কিছুই বোঝোনা"? শিউলী চঞ্চল ভাবে মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি কিছু বুঝিনা; শুধু এইটুকু বুঝি যে; তুমি আমায় আগের মত আর ভালোবাসো না?" রুদ্ধ-কণ্ঠে সূর্য বললে, "নিশ্চয়ই বাসি শিউলী। আগের থেকে আরও বেশ ভালোবাসি। এইজন্য ভালবাসি যে, পলাশদা তোমায় ভালোবাসেন, তুমি পলাশদার, সেইজন্য"—

শিউলীর মাথার উপর যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়ল। তার দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে শিউলী বললে, "এ, কথা বলার অর্থ কি সূর্য?"—

"অর্থ, আবার কি? যা সত্য তাই বললুম। সত্যি করে বলতো শিউলী, পলাশদা কি তোমায় ভালবাসেন না"? সূর্য শিউলীর দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের আশায়। বিপদের সময়ে ভগবানই মানুষকে সাহায্য করেন। নির্দোষ মানুষের মাথার উপর যখন অন্যায়ের তরবারি উদ্যত হয়ে ওঠে; তখনও সে ভয় ভুলে যায় এই একটু কারণে।— শিউলীর মনও ধীরে ধীরে সমস্ত ভয় সংকোচ লজ্জা মুক্ত হয়ে উঠতে লাগল। সত্যিই ত, শিউলীর এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? ও অন্যায় ত কিছু করেনি?

পলাশই জোর করে ওর উপর নিজের অতৃপ্ত ভালোবাসার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তার এই অন্যায় দুঃসাহসিক পীড়নে শিউলীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত। ও আর পারে না এই ক্লান্তি বহন করে বেড়াতে। ও স্থির দৃষ্টিতে সূর্যর মুখপানে চেয়ে বললে, "তা হলে, শোন সূর্য, তোমায় সত্য কথা বলি"—

সূর্য বললে, "তোমার বলতে যদি কষ্ট হয়, তা হলে নাই বা বললে, শিউলী"। সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শিউলী বললে, "শোন সূর্য; একদিন সন্ধ্যেবেলা, পলাশদা আমায় তাঁর তেতালার ঘরে বসে বললেন, 'তিনি, আমায় নাকি ভালোবাসেন। আমি বললুম, 'আমি সূর্যকে ভালোবাসি পলাশদা'। পলাশদা কোনও কথা শুনলেন না জোর করে আমায়—"

সহসা শিউলী দুইহাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সূর্য তার নিকট গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বললে, "তোমার কষ্ট হচ্ছে শিউলী এবার থাম। আমার এরপর শোনার আর কিছু নেই।"

সূর্যর কণ্ঠে ক্লান্তি সুস্পষ্ট। সত্যি এরপর তার শোনার আর কিছু থাকতে পারে না। পলাশ যখন ওকে ভালো-বাসে তখন ও পলাশেরই। সূর্য শিউলীর কেউ নয়। তার কাছে সূর্যর ভালোবাসার কোনও মূল্য নেই। এ জীবনে সূর্যর প্রেম চির-অতৃপ্ত থেকে যাবে। ওর তৃষ্ণা কোনওদিন নিবারণ হবে না। হাতের কাছে জল থাকা সত্ত্বেও সে জল ও স্পর্শ করতে পারবে না। কেন না, সে বস্তু পলাশের। জোর করে অথবা নির্দয় ভাবে হউক, যে করেই হউক না কেন; স্পর্শময় আত্মনিবেদনে পলাশ শিউলীকে বন্দী করে রেখে গেছে তার প্রণয়ের শৃঙ্খলে। শিউলী অস্বীকার করলে কি হয়, এ থেকে ওর কোনও দিন মুক্তি নেই। সূর্যর সমস্ত স্বপ্ন নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ও ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তাকাল শিউলীর দিকে। শিউলী তখনও কাঁদছে। কাঁদুক, ও কেঁদে কেঁদে শান্ত হোক। ওর বেদনার অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা সূর্যর নেই। সূর্য অক্ষম, সূর্য কাপুরুষ। ক্ষিপ্তের মত সূর্য ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তার পদশব্দে চমকিত হয়ে মুখ তুলতেই শিউলী দেখল, সূর্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। সে দিনও ঠিক এমনি সন্ধ্যায়; এমনি উত্তেজিত ভাবে; আর একজন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে আজও ফেরেনি; কোনও দিন ফিরবে কিনা তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তারজন্য শিউলীর কোনও ব্যাকু-লতাও নেই। কিন্তু সূর্য? সেও যদি এমনি ভাবে চলে গিয়ে আর ফিরে না আসে? শিউলী ছুটে গিয়ে পিছন থেকে সূর্যর হাত চেপে ধরল। বললে, "ফিরে এস সূর্য; যেও না"।

পিছন দিকে না তাকিয়ে সূর্য বললে, "আমায় ছেড়ে দাও শিউলী, ছাড় আমার হাত"—

"ছাড়বোনা"—শিউলী অকম্পিত কণ্ঠে বললে, "আমার সমস্ত কথা না শুনে, তুমি যেতে পারবে না"—

সূর্য ফিরে এসে অবসন্ন ভাবে চৌকীতে বসে পড়ল। আজ ওর নূতন করে মনে হোল যে, সত্যিই ওর জীবন বড় দুঃখময়। জীবনে ও যাকে আপন ভেবে কাছে ধরে রাখতে চায়, সে-ই ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে যায়। এমনি দুর্ভাগ্য ওর যে, জীবনে ও কোনও দিন পিতামাতাকে পর্যন্ত দেখেনি। মায়ের মত আপন করে পেয়েছিল কমলাকে, তিনিও ওকে ফেলে চলে গেলেন। তারপর গিরিবন্ধু অরুণও ওকে ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে গেল। আর, আর পালিয়ে গেল তাপ্তী। যাকে ও শৈশবে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসতো। সব শেষে ওর মনকে ঘিরে রেখেছিল শিউলীর মধুর সাহচর্য। ওর অবচেতন মনে আশা ছিল, শিউলীকে একদিন হয়ত ও পাবে; ওর লুণ্ঠিত ভালো-বাসা হয়ত সুন্দর হয়ে উঠবে শিউলীর অকপট সারল্যে; কিন্তু তা হবার নয়।—ওর ভালোবাসা সর্বত্র বঞ্চিত। জন্মান্তরের অভিশাপে অভিশপ্ত ওর আত্মনিবেদনের সর্ব সফলতা। এ জীবন ওর ব্যর্থ প্রেমশূন্য মহাশ্মশানে। কারো আহ্বানে ওর এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নেই।

"কি এত ভাবছ, সূর্য? শোন, আমার দিকে তাকাও" সূর্যর পিঠে হাত দিয়ে শিউলী বললে। সূর্য ওর দিকে তাকাল, কিছু বললে না। শিউলী বললে, "শোন সূর্য, আমায় তুমি বিশ্বাস কর। আমি তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনে। তা পারবও না; তুমি আমায় গ্রহণ কর সূর্য, গ্রহণ কর"। এতক্ষণ পর সূর্য কথা কইল, "তুমি ত অগ্রহণীয় নয়।" শিউলী বললে, "তবে তুমি এত দ্বিধা করছো কেন?—তোমার কাকাবাবুকে কোনও রকমে কোনও বন্ধুকে দিয়ে না হয় চিঠি লিখে একথা জানাতে চেষ্টা কর। তিনি একথা জানতে পারলেই আমাদের বিয়ে হওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এদিক থেকে আমিও আমার মাকে বোলবো। যে কথা কেউ জানে না; সে কথা সকলকে জানাতে হলে, একটু কষ্ট করতে হবে বৈ কি"?

সূর্যর স্তিমিত দৃষ্টিতে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল যেন ক্ষণিকের তরে। সেই সামান্য ক্ষণের মধ্যেই ওর মনের পটে বহু সুখ-দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল। সেই লোভনীয় আত্ম-সুখ উপলব্ধিতে সূর্যর মাথার মধ্যে যেন কিম, কিম করতে লাগল। সুবর্ণের কুসুমপুরের চৌধুরী বাড়ীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে একটী সিমন্তিনী নারী। সন্ধ্যায় সূর্য যখন ভবানী মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাতে যাচ্ছে তার পিছু পিছু হাতে স্বর্ণ প্রদীপ নিয়ে আসছে সেই নারী। গভীর রাতে কর্ম ক্লান্ত সূর্য যখন অন্ধকার শয্যায় শয়ন করতে যাবে, তখন তার পাশে এসে বসবে সেই নারী, সে সূর্যর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবে। তারপর তার নিশ্চিন্ত বুকে শান্ত মুখখানি ঢেকে সে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবে সেই নারী। ভোর বেলা কৃষ্ণশয়নের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য যখন আশীর্বাদ প্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার সামনে; তখন তার পিছু পিছু নত মস্তকে এসে দাঁড়াবে সেই নারী। সেই নারী কে? আমায় চিনতে পারছোনা? আমি তোমার শিউলী। তুমি ত তোমারই প্রয়োজনে আমায় ছুটিয়েছ তোমার মনে? আজ পূর্ণ-ছুটী। আমায় ছিঁড়ে ফেললেও, তোমারই পদপ্রান্তে আমি ধূলি-লুণ্ঠিত হবো। বাতাস আমায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু নিষ্ঠুর, নিতান্তই যদি হেলাভরে আমায় ফেলে দাও; তাহলে হয়ত রাত্রি শেষের অন্ধ-বায়ু আমার জীর্ণ পত্র-কোরকগুলি উড়িয়ে নিয়ে যাবে; কিন্তু আমায় স্থানচ্যুত করতে পারবে না। আমি তোমারই পদপ্রান্তে পড়ে থাকবো দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন। মৃত্তিকার তুহীন আশ্রয়ই হবে আমার পরম আশ্রয়। ধীরে ধীরে আমার মাটীর জীবন মাটীতেই মিশিয়ে যাবে। কিন্তু আমি শেষ হবো না। আমার প্রেমের বীজে মাটীতে আবার দেখা দেবে নূতন অঙ্কুর। আমি আবার জন্মাবো: তোমার আশ্রয় করে বড় হবো। তোমারই জীর্ণ অঙ্গ ভরে উঠবে আমার নবীন ফুলের প্রাচুর্যে। আমি তখন শুধু ফুল নয়, ফুলেভরা লতা হয়ে তোমায় বেষ্টন করে থাকবো। আর তুমি আমায় ত্যাগ করতে পারবে না। আমি জন্মজন্মান্তরের তোমার। তুমি নিজের প্রয়োজনে আমায় ছুটিয়েছ; আমি তোমার—

"তুমি কে? তুমি কে?" সূর্য চিৎকার করে উঠল। মনের প্রান্ত থেকে আবার সেই মিষ্ট কণ্ঠ ভেসে এল, "আমি শিউলী"—

"তুমি শিউলী? তুমি আমার?"

সূর্যের ভাবান্তর লক্ষ্য করে শিউলীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে ভীত হয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে বললে, "হ্যাঁ সূর্য, আমি শিউলী, আমি তোমার" সূর্যর সম্বিত ফিরে এল। সে শিউলীর মুখের দিকে তাকাল, বললে, "তুমিই এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছিলে?"

সূর্যর দৃষ্টিতে কি উন্মাদের লক্ষণ?—চোখের জল চেপে রেখে শিউলী বললে, "হ্যাঁ সূর্য আমি"?

সূর্য কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শিউলীর ব্যথা-ম্লান সুন্দর মুখটীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার হাতদুখানি ধীরে ধীরে নিজ কণ্ঠ হতে মুক্ত করে অতি সযতনে যথা-স্থানে রেখে গভীর স্নেহে ডাকলে, 'শিউলী"

এই সমবেদনার স্পর্শে শিউলীর এবার আর চোখের জল বাধা মানল না, নিরুত্তরে সে ক্ষুব্ধ চোখে সূর্যর পানে চাইল।

সূর্য বললে, "শিউলী কেঁদোনা এখন, আমার কথা মন দিয়ে শোন, অনেক সান্ত্বনা পাবে। শোন, আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমরা দুজনে, দুজনকে অতি গভীর ভাবে ভালোবাসি। এ ভালোবাসার বন্ধন থেকে আমাদের জন্ম জন্মান্তরেও বিচ্ছেদ নেই; কিন্তু এ জীবনে আমাদের এই ভালোবাসার মিলন নেই। এ জীবনে তুমি পলাশদার। পলাশদা অত্যন্ত অভিমানী, আর আন্তরিক প্রেমিক। তুমি তাঁর প্রেম প্রত্যাখান করলে, তিনি মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা পাবেন। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তাঁর জন্য অপেক্ষা কর"। একটু থেমে পকেট থেকে একখানি পত্র বার করে শিউলীর হাতে দিয়ে আবার বললে, "এই নাও তোমার চিঠি। তোমার অসুখের সময় তোমার জামার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল, মাসীমা আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন।"

শিউলী বিবর্ণ মুখে চেয়ে দেখল, তার সেই হারিয়ে যাওয়া পলাশের চিঠি। সূর্য তখন বলছে, "শিউলী, আমায় তুমি ভুলে যেও। ভুলে যেও আমার কথা। কখনও মনে কোরনা আমাকে—আর—আর যদি কখনও আমার কোনও অশুভ সংবাদ পাও, তাহলে আমার জন্য একটু কেঁদো। এখন কেঁদো না। শিউলী, লক্ষ্মী মেয়ে, তখন একবার আমায় মনে করে কেঁদো"।

সূর্য ঝড়ের বেগে, ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

হায় শিউলী, আজকের সন্ধ্যার তোমার চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তোমার এই নবস্ফুট স্পর্শ-কাতর সুন্দর মুখ-চন্দ্রিমা, নির্দয় তরু একবার মাত্র স্পর্শও করলনা। তুমি সাধ করে কণ্ঠে তার পরিয়ে দিলে পেলব বাহুলতা সে কুণ্ঠিত হয়ে কণ্ঠ থেকে খুলে রাখল সেই কোমল পুষ্প-আভরণ। তুমি চেয়েছিলে ফুটতে, সে তোমায় ঝরিয়ে দিয়ে গেল। হায় শেফালী, রাত্রি শেষ হবার আগেই এল তোমার ঝরে যাবার পালা। একটু কাঁদো শিউলী, একটু কাঁদো। অমন কঠিন হয়ে থেকোনা।

শিউলী কি সত্যই পাথর হয়ে গেল নাকি?

অপমানে, না অভিমানে? প্রত্যাখানে না স্পর্শ-যন্ত্রণায়? নিষ্ঠুর সূর্য না দুঃসাহসিক পলাশ—কে তাকে পাথর করল? না কেউ তাকে পাথর করেনি। মানুষের প্রেমই মানুষকে পাথর করে। তাই সম্রাট সাজাহানের প্রেম, মমতাজকে পাথর বানিয়ে রেখেছে। ভগবানকে আমরা ভালোবাসি, তাই তাঁকে আমরা পাথরের মন্দিরে বন্দী করে রাখি; প্রেম আর পাষাণ, এ দুইয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। শিউলী সত্যই ঝরে পড়ল। রাত্রি শেষ হবার আগেই সে ঝরে পড়ল।

রাত্রে আহারের সময়, শিউলীকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশেষে জ্যোতির্ময়ী আবিষ্কার করলেন তার মূর্চ্ছিত দেহলতা; সূর্যর ঘরের হিমশীতল হর্ম্যতলে। সূর্য বাড়ী নেই। তিনি একা কি করবেন? অবশেষে দাসীর সাহায্যে তাকে বিছানায় তুলে শুইয়ে তার পরিচর্যায় মন দিলেন। একসময় তিনি দেখতে পেলেন তার হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা একখানি চিঠি। এ সেই চিঠি। জ্যোতির্ময়ী জানেন এ চিঠি পলাশের লেখা। উমারাণীর মৃত্যুর পর শিউলী যখন এমনি ভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল, তখন ও ব্লাউজের মধ্যে থেকে পেয়েছিল এই চিঠি। তিনি সে চিঠি সূর্যকে দিয়ে বলেছিলেন, শিউলী ভালো হলে সে যেন এই চিঠি তাকে দিয়ে দেয়। খোলা চিঠি সূর্য প্রথমে পড়েনি। কিন্তু হস্তাক্ষর দেখে, সে কিছুতে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারেনি। জ্যোতির্ময়ীকে বলে সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই চিঠি পড়েছিল এবং সেই থেকেই জ্যোতির্ময়ী জানেন এ চিঠি পলাশের। আবার সেই চিঠি। উমারাণীর আকস্মিক মৃত্যুতে জ্যোতির্ময়ী বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি এসেছিলেন বোনকে দেখার জন্য; কিন্তু বোনকে দেখা দূর হয়ে তাঁর স্কন্ধে পড়েছে এক বিরাট সংসারের দায়িত্ব। তারচেয়েও বড় বিপদ হোল, এ বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলি যেন এক একটী প্রহেলিকা। তিনি এদের কিছুই বুঝতে পারেন না। উমারাণী মাঝে মাঝে ভাবতেন, সূর্যর পরীক্ষা হয়ে গেলে কৃষ্ণদার কাছে বলবো, শিউলীর সঙ্গে তার বিয়ে শীঘ্র দেবার জন্য। দুটীতে ভারী চমৎকার মানাবে। জ্যোতির্ময়ী জানতেনও তাই যে ওদের দুটীতে বিয়ে হবে; কিন্তু হঠাৎ

পলাশের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে বাড়ীর হাওয়া যেন বদলে গেছে। তিনি বেশ বুঝতে পারতেন, কোথায় কি একটা ছন্দ পতন ঘটেছে; কিন্তু সেটা যে কি, তা তিনি অনুমান করতে পারতেন না। আজ তাঁর মনে হোল এ চিঠিতে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। সূর্য এলে তাকে দিয়ে পড়িয়ে জানতে হবে। তা না হলে, এই তরা বয়সের মেয়ে এত ঘন ঘন জ্ঞান হারায় কেন? চিঠিখানি নিয়ে আঁচলে বেঁধে তিনি শিউলীর মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। আশ্চর্য মূর্চ্ছা যাহোক, একবার হোলে আর ভাঙতে চায়না। জ্যোতির্ময়ীর ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

এমন সময় সূর্য সেখানে এসে উপস্থিত হোল। তাকে দেখে জ্যোতির্ময়ী রাগত স্বরে বললেন, "তোমাদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের মন বোঝাই দায়; এই আছ এই নেই। ঘরে যে কি ঘটছে না ঘটছে দেখেও তোমরা দেখনা। এখন ডাক্তারবাবুকে একবার ডাক তো দেখি বাছা—"

সূর্য নত মুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে বললে, "দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তারবাবু আসছেন মাসীমা"। তারপর সে শিউলীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসে মৃদুস্বরে বললে, "আমি এক্ষণে এখানে বসছি মাসীমা, আপনি যান, আপনার জপ আহ্নিক সেরে আসুন"।

"মাথার থাক আমার জপ আহ্নিক" জ্যোতির্ময়ী অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "এখন তোমাদের সুস্থ রেখে এবাড়ী থেকে যেতে পারলে বাঁচি আমি"। সূর্যর মন তখন মোটেই ভাল ছিল না। সে চাইছিল একটু নির্জনে থাকতে এবং শিউলীর সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সে ইচ্ছাও ছিল সর্বপ্রধান। কিন্তু চাইলে কি হবে সব সময় ত যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায়না। কাজেই সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সূর্যর মেনে না নিয়ে উপায় নেই। বাড়ী ঢুকেই প্রথমে তার ব্যথা-বিদীর্ণ বুক হাহাকার করে উঠল শিউলীর পীড়িত রক্তহীন মুখ দেখে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল তার নিষ্ঠুরতার ফলেই শিউলীর এই অসুস্থ অবস্থা। কিন্তু নিষ্ঠুর না হয়েও ত এছাড়া উপায় নেই। জেনে শুনে কি প্রকারে সে পলাশদার আশার পথে কণ্টক বিছিয়ে দেবে। শিউলীর আজ খুব কষ্ট হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু একদিন সে এর জন্য সুখী হবেই হবে। কাজেই সূর্যর তুলনায় তার দুঃখ অনেক কম। এর জন্য সূর্যর হয়ত যাতনা থাকবেনা কিছুই। তা নাইবা রইল। অনুশোচনার জ্বালাও ত থাকবেনা—আজ সূর্যর মন মুক্ত। ও অন্যমনস্ক ভাবে শয্যার এক প্রান্তে বসে বললে, "মাসীমা আজ এত রেগেছেন কেন? শিউলীর জন্য আমি মিছে গাল খেয়েই বা মরছি কেন"?

"রাগ কি আর সাধে হয় বাছা? তোমার রকম-সকম দেখে হাত পা আমার হিম হয়ে যায়—" জ্যোতির্ময়ী বললেন।

সূর্য বললে, "ও, এতক্ষণে বুঝেছি; শিউলীর অসুখ দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু মাসীমা আপনি মোটেই ভাববেন না। ডাক্তারবাবু বললেন, ছয় ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে আসবে"।

আঁচল থেকে সেই পত্রখানি বার করে সূর্যর হাতে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী বললেন, "দেখ ত সূর্য এ চিঠিতে কি ছাই-ভস্ম লেখা আছে? আমার মনে হয় এই চিঠিই যত অনাসৃষ্টির মূল। এই চিঠি পড়েই মেয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছে"।

চিঠি হাতে নিয়ে সূর্যর গৌর মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। এ চিঠিতে পড়ার আর কি আছে? জ্যোতির্ময়ীর কথাই ঠিক। এই চিঠিই সমস্ত অশান্তির মূল। কিন্তু জ্যোতির্ময়ীকে এখন চিঠি পড়ে না শোনালে, তিনি হয়ত অন্য কিছু ভাবতে পারেন। কাজেই চিঠি তাকে পড়তেই হবে। সূর্য নতমুখে মৃদুস্বরে চিঠি পাঠ করল। জ্যোতির্ময়ী নীরস কণ্ঠে বললেন, "এসব কথার মানে কি সূর্য"?

হায় ভগবান! সূর্যকে নিয়ে তুমি কত খেলাই না খেলবে?

সূর্য জ্যোতির্ময়ীর মুখপানে চাইল। তারপরই নত-নেত্রে শিউলীর একখানি সুন্দর হাতের পানে চেয়ে

বললে, "মাসীমা পলাশদা শিউলীকে বিয়ে করতে চান। সেই কথাই ঘুরিয়ে লিখেছেন এই চিঠিতে—"

"এ্যাঁ সে কি কথা"! জ্যোতির্ময়ী আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

"কেন এতে চমকাবার কি আছে মাসীমা?" সূর্য প্রশ্ন করলে।

"তুই কি বলছিস রে সূর্য? চমকানো দূরে থাক, আমার মরণ কেন হয় না, তাই বল?" জ্যোতির্ময়ীর কণ্ঠে প্রাণহীন প্রলাপ।

"আপনি না বললে কি করে বুঝবো আপনার কি ক্ষতি হোল এতে"? কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে সূর্য বললে। কপালে করাঘাত করে তিনি বললেন, "হাঁ আমার কপাল, শিউলীর সঙ্গে যে তোর বিয়ের কথাবার্তা দিদি চালিয়েছিলেন। বিয়ে তোদের হবে বলেও আমি যেন শুনেছি তাঁর মুখে—"

সূর্যর মুখে আর কথা জোটে না। এ কি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে তার জীবনে? ও শুষ্ক কণ্ঠে বললে, "কেন মাসীমা, পলাশদার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে সেত আরও ভালো হবে—"

জ্যোতির্ময়ী চিন্তিত স্বরে বললেন, ভালোমন্দর কথা আমি জানিনা বাছা। তবে দিদি বলতেন শুনেছি; পলাশকে জোর করে বিয়ে দেওয়া মানে একটী মেয়ের সর্বনাশ করা তিনি তোকে বড্ড ভালোবাসতেন কিনা, তাই চেয়েছিলেন তোর বিয়ে দিয়ে নিজের কাছেই ঘর বেঁধে দিতে—কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন কে জানতো"!

"দুঃখ কোরনা মাসীমা, তাঁর আত্মা সেখানে নিশ্চয়ই শান্তিতে আছে," সূর্য বললে। "এখানে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইচ্ছারও অবসান ঘটেছে জেনো"—

"তা ঘটবার নয়; আমি জানি বাবা"—জ্যোতির্ময়ী বললেন।

এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিল ডাক্তার বাবু এসেছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মূর্চ্ছা ভাঙতে এবার আর শিউলীর বেশী বিলম্ব ঘটল না। শেষ রাত্রে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জ্যোতির্ময়ী তার শিয়র দেশ ছেড়ে উঠে গেলেন। স্নান সেরে জপের আসনে বসতেই হয়ত ভোর হয়ে যাবে। আহারের জন্য তিনি ভাবেন না; কিন্তু বিশ্রামের তাঁর এখন একটু অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁর মন অত্যন্ত অবসন্ন। হায় ভগবান, কার সংসার কে পরিচালনা করে! একদা জীবনের কৈশোরে তাঁর অগাধ সাধ ছিল, তিনি নিজ হাতে রচনা করবেন একটী সুন্দর সংসার; কিন্তু তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি। অকাল বৈধব্য তাঁকে জীবনের প্রথম অধ্যায়েই নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত করেছে সংসারের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শুভ আর কল্যাণের পথ থেকে। বাধাহত ধনীর দুলালী সেদিনের তরুণী জ্যোতির্ময়ী, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনে যে সুখ পেলেন না, ব্রহ্মচর্যের মধ্যে দিয়ে তাকে লাভ করবেনই; এই ছিল তাঁর সেদিনের অটল প্রতিজ্ঞা।—বৃন্দাবনে জ্যোতির্ময়ী তাঁর সাধনার ধন পেয়েছেন কিনা জানা নেই কারুর; তবে সংসারে তিনি আর ফিরে আসেননি। নিরলস জ্যোতির্ময়ীর বন্ধুর দুর্গম যাত্রাপথে তাঁর স্নেহময় পিতা মাতার করুন চোখের জল দুর্বার নির্ঝর রূপে ঝরে পড়েছে, শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের কাতর আহ্বান নিষ্ফল অনুরোধে মাথা কুটে মরেছে দুর্গম পর্বতের গায়ে। নির্ভীক সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসিনী, দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে গেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে। কাকে তিনি দেখতে চান; কার পদপ্রান্তে নিজেকে উৎসর্গ করতে চান; তা তিনিই জানেন—তবে বাইরের সকলেই জানল পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই; যাকে পরাজিত করার শক্তি, অকাল-বিধবা সর্বসুখ বঞ্চিতা সন্ন্যাসিনী জ্যোতির্ময়ীর নেই। সেই জ্যোতির্ময়ী আবার ফিরে এসেছেন তাঁর অবহেলার পরিত্যাগ করা পুরানো সংসার আশ্রমে। যদিও আত্মীয়তার বন্ধনকে তিনি অস্বীকার করেন; তথাপি ঘনিষ্ঠ আত্মী-

মের ভালোবাসাকে প্রত্যাখান করতে তাঁর অন্তর অসম্মত। কাজেই তিনি আজও এখানে রয়েছেন। যদিও অতি সত্বরই এ দেশ ত্যাগ করতে হবে তাঁকে চিরতরে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে তিনি বসে আছেন। তীর্থ-জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল তাঁর এইটী। কি শান্ত নির্জন পরিবেশ। নীলস্রোতা গঙ্গা মৃদু কলনাদে ছুটে চলেছে নিম্নদেশে পৃথিবীর বুকে। এই গঙ্গাই পুণ্যধাম কেদারনাথে অলকানন্দা—পবিত্র তীর্থ, বদরিকাশ্রমে স্বর্গনদী। কি অপার্থিব তার নীল নবঘন রূপ, বীচিভঙ্গের কি গম্ভীর স্বর, এ যেন ঠিক জ্যোতির্ময়ীর ইষ্টদেবতার প্রকাশ্য এক রূপ। জ্যোতির্ময়ী মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত। শুভ্র আননে দরবিগলিত অশ্রুধারায়; প্রাণের আকুল প্রার্থনা মূর্ত হয়ে ওঠে। হায় ভগবান আর কত দেরী? আর কত বাকী, তপস্যার সিদ্ধি লাভে? এবার চরণে স্থান দাও ঠাকুর। এমন সময় তাঁকে ডাকলেন তাঁর গুরু। "বেটী, তৈরী হয়ে নাও"—জ্যোতির্ময়ী এ আদেশে অভ্যস্ত। কাজেই বিনা প্রশ্নে তিনি গুরুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন আবার পথে। ক্রমশঃ বাংলাদেশের মধ্যে আসতেই তাঁর মনে সন্দেহ হোল, এখানে কেন? তিনি প্রশ্ন করলেন, "পিতা, এখানে কেন"? গুরুদেব মুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে বললেন, এখানে আমার দেশ বেটী, আমার সব তীর্থের বড় তীর্থ; আমার জননী জন্মভূমি। চিরদিনের জন্য বিদায় নেবার আগে, একবার মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছি। তোমারও তার প্রয়োজন আছে বেটী"—জ্যোতির্ময়ীর মনে সামান্য সংশয়। তিনি জানতে চাহিলেন, "আমরা কোথায় যাবো পিতা"?

গুরুদেব সস্নেহে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বললেন, "এবার আমাদের ডাক দিয়েছে তিব্বতের পথ। খুব সম্ভব সেখান থেকে আর ফিরবো না—" তিব্বত? সেই ভয়ঙ্কর দেশ? তুষারাচ্ছন্ন; অটল হিমাদ্রির মত লামাদের পরিস্থিতি—সেখান থেকে আর ফিরবো না? সেখানেই শেষ হয়ে যাবে জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, অটল সন্ন্যাসের পরিনির্বাণ!

কোথায় তিব্বত, আর কোথায় বাংলা দেশ? তপস্বিনী জ্যোতির্ময়ীর মনে সামান্য সংশয়।

মহানগরী কলিকাতায় এসে গুরুদেব গেলেন বেলুড় মঠে, তাঁর সঙ্গীদের কাছে। আর জ্যোতির্ময়ী? দেশের মাটীর এমনই আকর্ষণ; স্পর্শ করতে না করতে হেসে কেঁদে বললেন, "চিনতে পারো?" বিমূঢ় জ্যোতির্ময়ী বললেন, "মাগো, আমায় ডেকেছো কেন"? কিন্তু মা কই? হাওড়া ষ্টেশনের জনাকীর্ণ প্ল্যাটফরমে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একে?—উমা না?—"হ্যাঁ দিদি আমি, আমায় চিনতে পেরেছ? আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না যে, সত্যি তোমার আবার দেখা পাবো। আমি কাশী থেকে ফিরছি। চল একবার আমার বাড়ী", উমারাণী যেন ফিরে গেছেন আবার সেই শৈশবে। জ্যোতির্ময়ী গুরুর কাছে বিদায় চাইলেন। গুরু বললেন, ঠিক একমাস পূর্ণ হলে, তুমি যেও বেলুড় মঠে। সেখানেই গঙ্গাতীরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। দেরী কোরনা বেটী"—গুরুদেব চলে গেলেন।

জ্যোতির্ময়ী দীর্ঘদিন পরে আবার প্রবেশ করলেন, সংসার প্রাঙ্গণে। তাঁর পিতা মাতা আজ কেউই জীবিত নাই। ভাইদের কাছে দুদিন থেকে, তিনি আবার ফিরে এসেছেন উমারাণীর আশ্রয়ে। তাঁর যাত্রার ঠিক শুভ মুহূর্তে, এ বাড়ীতে ঘটে গেল এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। পলাশ হোল নিরুদ্দেশ। তারপরই শয্যা নিলেন উমারাণী। সবশেষে তাঁর মৃত্যু জ্যোতির্ময়ীর পায়ে পরিয়ে দিল কঠিন শৃঙ্খল। এই বিপদের কথা জানিয়ে তিনি গুরুদেবের কাছে আরও ছয়মাস সময় ভিক্ষা করলেন। গুরুদেব তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে ছয়মাসের জন্য কাশী গেছেন। তাঁর ফিরতে মাত্র আর একমাস বাকী। এরমধ্যেই জ্যোতির্ময়ীর সমস্ত গুছিয়ে ফেলতে হবে। এই অবোধ সন্তান দুটিকে নিজ নিজ পিত্রালয়ে পাঠিয়ে; এ বাড়ীর সমস্ত ভার পুরাতন ম্যানেজারের হাতে দিয়ে তাঁকে শেষ যাত্রা করতে হবে। আজ এই শেষ রাত্রির নির্জন অবসরে জ্যোতির্ময়ী মনে মনে ভাবলেন, আজ

বুঝেছি; এতদিন পর মা কেন ডেকেছিলেন। সেদিন উত্তর পাইনি, আজ পেয়েছি। উমা জীবন দিয়ে চেয়েছিল যে উত্তর দিতে; কিন্তু উত্তর দিল তার মৃত্যু। এইখানেই ছিল আমার শেষ প্রয়োজন। মাতৃভূমির কাছে সামান্য ঋণ। এ ঋণ শুধু সময় দিয়ে নয়; স্নেহ দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। "মাগো, মাতৃভূমি; আমায় শক্তি দাও" জ্যোতির্ময়ী জপের আসনে বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল উনাকোটীর সংসার। সেখানে ফুটে উঠল নীল সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তার। জ্যোতির্ময়ীর ইষ্টদেবতা তাঁর মনের পদ্মাসনে বসে হাসছেন। "তৎ কুরুষ মদর্পণম" তোমার সমস্ত কিছু আমাতে অর্পণ কর"।

আজ শিউলীর ভাই আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। জ্যোতির্ময়ীর ব্যস্ততার আর সীমা নেই। কাল সূর্য গেছে, আজ শিউলী গেলেই যেন তার এখানকার সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। তিনি নিশ্চিন্ত মনে গুরুদেবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। এই ছয় সাত মাস, তাঁর জীবনের যেন একটা চরম বিপর্যয়ের অধ্যায়। যাদের তিনি কখনও চোখে দেখেননি; যাদের কথা জীবনে কখনও ভাবেননি, তাদের জন্যই আজকে অশ্রু ফেলতে বাধা হয়েছে; তাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য তাঁর মনও ব্যাকুল। আশ্চর্য এই বাংলাদেশের মাটীর প্রভাব। জ্যোতির্ময়ী মনে মনে বার বার একে নমস্কার করলেন।

আজকের শিউলীকে দেখে কে বলবে; এই সেই আগেকার চঞ্চলা হাস্যময়ী শিউলী! এ যেন মেঘভরা শ্রাবণের একটী সজল সকাল। শিউলীর জিনিষপত্র যা কিছু গোছগাছ করার সমস্তই জ্যোতির্ময়ী করে দিচ্ছেন। ও শুধু সমস্ত বাড়ীখানি বার বার প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। কি যেন ও খুঁজে বেড়াচ্ছে; প্রতি মুহূর্ত ওর মন আশা করছে কার যেন সে দেখা পাবে; কিন্তু হায়, পলাশের তিনতলার ঘর তেমনি শূন্য; তার দক্ষিণের জানালা উন্মুক্ত হয়ে মহাশূন্যতার পানে চেয়ে চেয়ে তেমনি উদাস ভাবে আজও বলছে "নাই নাই সে পথিক নাই।

"প্রিয়া তারে রাখিল না; রুধিলনা সমুদ্র পর্বত" সত্যি কেউ তাকে ধরে রাখতে পারেনি। নিজের পথ নিজে তৈরী করে নিয়ে সে পথিক চলে গেছে। শিউলী তার জন্য কিছু ভাবে না—তার স্বপথের মূল্য দিতে সে অপারগ। শিউলী কোন দিন গভীর রাত্রে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্ধকারে বিছানায় চুপ করে বসে থাকে; তখন ওর আতপ্ত ওষ্ঠপ্রান্ত হঠাৎ কোনও সলজ্জ স্পর্শ স্মরণে থর থর করে শিউরে ওঠে। কম্পিত স্বরে বলে: শিউলী তোমার জীবনে কি এই সস্নেহ প্রেমস্পর্শের কোনও মূল্য নেই? এই স্পর্শ স্মরণ করে তোমার সর্বাঙ্গ কি একবারও থর থর করে কেঁপে ওঠে না? অন্ধকারে শিউলী অস্থির হয়ে ওঠে। সে নিজেকে সামলাতে পারে না। বিছানায় মুখ লুকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদে; অস্পষ্ট স্বরে বলে; আমার জীবন, আমার প্রেম, আমার সাধনা এ সমস্তই সূর্যর জন্য রেখেছি। তার অনুমতি ব্যতীত আমি আমার কোনও অস্তিত্বেই হস্তক্ষেপ করতে অসমর্থ। সূর্য ছাড়া আমার ভালোবাসার কোনও প্রকাশ নেই। পলাশদাকে শুধু শ্রদ্ধা ছাড়া আমি আর কিছু দিতে পারি না। পলাশকে জীবন থেকে অস্বীকার করার জন্য ও প্রোপণে সূর্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু হায়, সেই সূর্য, ওর স্বপ্নের সূর্য; ওর সাধনার সূর্য; ওর ভালোবাসার সূর্য; অবশেষে সেও তার উন্মুখ প্রেম প্রত্যাখান করল! শিউলীর দুঃখ, অন্তর্বেদনা আজ অপরিসীম। ওর কোথাও সান্ত্বনা নেই; কোথাও সফলতা নেই। আজকে ওর চলে যেতে হবে; এই প্রিয় পরিচিত আবাসভূমি ছেড়ে। আর ও কখনও এখানে আসবে না—আর কখনও দেখবে না এই তেতালার পলাশের ঘর; আর অতি পরিচিত সূর্যের ঘর। আর কখনও স্পর্শ করতে পারবে না তার বই। ব্যবহার করতে পারবে না তার কোনও জিনিষ। শুনতে পাবে না তার কথা, দেখতে পাবে না তার হাসিমাখা মুখ। সব চেয়ে তার বড় বেদনা যে আর কোনও দিন হয়ত চোখেও দেখতে পাবে না তার ভালোবাসার সূর্যকে।

ঈশ্বর ওর জীবন কোন পথে পরিচালিত করবেন কে জানে? শিউলী আর পারেনা—পলাশের ঘরে, তার নিত্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ, ঘরে ঘরে সাজানো রয়েছে। ঠিক যেন মনে হচ্ছে ঘরের অধিকারী কোথাও বেরিয়েছে এখনি ফিরে আসবে। শিউলী শ্রান্ত-মনত চিত্তে ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যুক্ত-কর ললাটে ঠেকিয়ে পলাশদার উদ্দেশে বললে, "তোমার অবাধ্য হয়েছি, তার জন্য আমায় ক্ষমা কোরো। আমি জানি ক্ষমা করার ক্ষমতা তোমার আছে"—

শিউলী ক্লান্ত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিধা-জড়িত চিত্তে সূর্যর ঘরে ঢুকল। ইস্, সে ঘরের কি দুরবস্থা! অতবড় খাটখানা বালিশ আর চাদরবিহীন অবস্থায় বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ঘরের অধিকারীর বিদায় নেওয়ার কথা। পড়ার টেবলের অবস্থা আরও করুণ। চতুর্দিকে পুরানো চিঠি, পুরানো খাতা, আর ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল। আল্‌নায় দুই একটা অব্যবহৃত জামা, তোয়ালে আর আছেনা। মেঝের উপর মশলার ডিবে আর কৌটো উল্টে পড়ে আছে, সকলেই যেন কাতর কণ্ঠে বলছে, "চলে গেছে চলে গেছে সে। সেই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে, কোথায় কোন আবর্জনা স্তূপের মধ্য থেকে যেন অস্পষ্ট স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে, "মোর লাগি করিও না শোক।"

"আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক"—সেই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শিউলী বেশীক্ষণ থাকতে পারল না—বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ধড়্ ধড়্ করতে লাগল। ও সূর্যর টেবলে মাথা ঠেকিয়ে বললে, "তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই; এ যোগাযোগকে নষ্ট করার কোনও ক্ষমতাই তোমার নেই"—"বীরহস্তে বর-মাল্য লব একদিন"।

সমস্ত বাড়ীখানা ঘুরতে ঘুরতে শিউলী একসময় গিয়ে ঢুকল জ্যোতির্ময়ীর পূজার ঘরে। জ্যোতির্ময়ী তখন হাঁড়িতে মিষ্টি ভরছিলেন শিউলীর সঙ্গে পাঠাবার জন্য। শিউলীর মুখের পানে চেয়ে তিনি তাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সন্ন্যাসিনী একদা বহুকষ্টে সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের দাবী জীবন থেকে ত্যাগ করেছিলেন, আজ সেই প্রয়োজনের সামান্য অংশ জটীলরূপে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই অবোধ বালিকার বেদনায় তিনি কোন্ সান্ত্বনা দিবেন। সূর্য, পলাশ আর শিউলী, এই তিনটী তরুণ জীবনের করুণতম কাহিনী তিনি সমস্তই জানেন এবং তিনি অনুভব করেন যে এর মধ্যে নিশ্চয় একজন ভুল করেছে। সে ভুল যে কে করেছে, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনও স্থির ধারণা নেই। তবে এ ভুলের সংশোধন একদিন হবেই এ আশা তিনি রাখেন। আর ভুল যখন হয়েছে তার দহন সহ্য না করলে চলবে কেন? তিনি শিউলীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কাতর হোয়না শিউলী, তোমার দেবতা তোমার মন্দিরেই আছেন। বাইরে তাঁকে খুঁজে মিছে কাতর হোয়না; সময় হলে তিনি নিজেই ডাক দেবেন"।

আঃ, এই সান্ত্বনায় শিউলীর দগ্ধ প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গ কি মধুর, আর কি শান্তিদায়ক! শিউলী বললে, "মাসীমা, আপনার সঙ্গে আমায় নিয়ে চলুন। অন্য কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবোনা"

জ্যোতির্ময়ীর মুখে ফুটে উঠল এক স্বর্গীয় হাসি। তিনি বললেন, "অস্থির হোয়োনা শিউলী যে সংসার আমাকে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে দুহাতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে তার প্রয়োজনের বাইরে; সেই সংসার দুই হাত বাড়িয়ে শত প্রলোভনে তোমায় ডাকছে তার নিজের কাছে। তার এই আবাহনকে উপেক্ষা করার শক্তি, তোমার নেই। এখন চল্ ত দেখি, তোর দাদার আসার সময় হয়ে এল বুঝি"।

শিউলীর হাত ধরে তিনি পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাইরের বারান্দায়।

সূর্য তার সঙ্গে দেখা না করে, একটী কথাও না বলে চলে গেছে বলে, শিউলী মনে সেই পুঞ্জিত অভিমান নিয়ে গিয়ে দার্জিলিং মেলে উঠে বসল সেই দিনই রাত্রি দশটার সময় জ্যোতির্ময়ীও গিয়ে পৌছলেন বেলুড় মঠে তাঁর গুরুদেবীর আশ্রমে। সেই বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে তবল তালা-চাবী লাগিয়ে ম্যানেজার বাবুও চলে গেলেন নিজের বাড়ীতে। একদিন যে বাড়ী প্রাণ-প্রাচুর্যে মুখর ছিল, আজ সেই বাড়ী অন্ধকারে মৃতের মত পড়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

ভাগ্যলিপি (গল্প)

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একবার চারিদিকে তাকায় বীরেন। শীতের দুপুর হলে কি হবে, ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ওপর রৌদ্র। রেশন ব্যাগটা হাত বদল করে দ্রুত পা চালায় সে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পথ চলতে শাস্ত্রকারের কথাটা মনে পড়ে বার বার, "বাপুহে, শাস্ত্রই আওড়াও আর যুক্তিই তোল, মানুষের পরিচয় মাটিতে। তাই তত্ত্বকথা আর আকাশ-স্বপ্ন বাদ দিয়ে বাস্তবে হেঁটে চল; পথ পাবে, দাম পাবে, শান্তি পাবে—নইলে সব ফাঁকা"।

কিন্তু পায় কৈ? সামান্য একটুখানি চাওয়া, তাওতো ভগবান পূরণ করলেন না! অনেক কিছু পাওয়ার মধ্যে এতটুকু ক্ষীণ চাওয়াও কি তার অন্যায়? সংসার নেই, ঘর নেই, শুধু ঘর সাজানোই হোলো সার। থাকার মধ্যে তো আছে মা। তাও আজ এখানে কাল ওখানে, বুড়ো বয়সে যাযাবর সেজেছে কর্মদোষে। ছেলের হাসি হাসতে গিয়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে তার। ঘাটি নোনা জল। সমুদ্রের স্বাদ কি চোখের জলে মেটে?

প্রায় পনের দিন বাদে সে চলেছে মা'র কাছে। সেই চাকুরে থেকে এই ডোমজুড় কি কমটা পথ? নইলে কি আর এত দেরী হোতো?

বাড়ী ঘরের দালালি করে যা পায়, সপ্তাহ শেষে তাই থেকে রেশনটা, সঙ্গে এটা ওটা দু'চারটে খুঁটিনাটি, এমনকি বাজারটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। পরের বাড়ী খাকা, না নিলে চলবেই বা কেন আর তারাই বা ভাববে কি! এই আক্রার বাজারে যে একটু থাকতে দিয়েছে এইতো ঢের। নিজের জন্য চিন্তা নেই, অন্তত বাউণ্ডুলে সাহিত্যিক বন্ধুটি থাকতে। কিন্তু···নাঃ এবার সত্যি দেরী হয়ে গেল। ধুমায়িত হয়ে ওঠে চিন্তাটা বীরেনের।

ব্যক্তিগত থেকে চিন্তাটা পরিব্যাপ্ত হয় পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিনে। কয়েকটা মুহূর্তের ব্যবধানে ছোটবেলা থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি কথা আর ঘটনা রূপ ধরে এসে দাঁড়ায় তার কল্পলোকের দৃষ্টির সামনে।

আপন ভোলা বাউণ্ডুলে মানা। কি বিচিত্র গাইয়ে বাজিয়ে লোকটা। মাসে কেন বছরে একটি দিনও সঠিক ভাবে বোন ভায়ের খোঁজ নেয় কি না সন্দেহ। তার নিজেরও নেই থাকার ঠিক। কোথায় বেনারস, কোথায় সাহাবাদপুর, কোথায় তারকেশ্বর মিহিজামে বাউল দোতারা নিয়ে বেড়ায়। এই করেই তো জীবনের অর্ধেকটা কেটে গেল। অতএব আর থাকা বৃথা। যার সাংসারিক চিন্তা বা বাস্তব অভিজ্ঞতার বালাই নেই, তার আবার ভাবনা কিসের?

এমন হেন মানুষটাও নাকি এককালে প্রেমে পড়েছিল। নতুন করে আবার আশ্চর্য বোধ হয় বীরেনের।

হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। কেটে গেল না তো? থাকগে, আরেকটু দ্রুত পা চালায় সে। বাড়ী পৌঁছে মা'কে না দেখতে পেলে শান্তি পাচ্ছেনা মনটা।

বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছে মা'র শরীরটা। কত অত্যাচারই বা সইবে ঐ দেহে। একেতো চিন্তার শেষ নেই এই বুড়ো বয়সে, তার ওপর এই তো সেদিন ব্রঙ্কাইটিসে ভুগে উঠলো। টাকা তো কম গেলনা; কিন্তু টিপলে কি একটু রক্ত ফুটে উঠবে শরীরের কোথাও?

ডাক্তার কতবার বলেছে সাবস্টেন্সিয়াল ফুড দিতে। ওঃ বড় জোর ফসকে পড়ে গেল কথাটা। ত্রস্তে পা চালিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় এক মিষ্টির দোকানে।

—ওহে ভালো কড়াপাকের সন্দেশ আছে?

—টাটকা সন্দেশ আছে বাবু। দোকানদার মুখটা বাড়িয়ে নিশ্চিন্তে মাথা নেড়ে ব্যবসায়ী বুদ্ধিটা জানায়।

—দেখো বাপু, মা খাবে। খারাপ হলে কিন্তু দিও না, দোহাই তোমার ধর্মের। মা আমার বড্ড ভালোবাসে কড়া পাকের সন্দেশ।

—সে বলতে হবে না বাবু, সন্দেশ তো নয় খাঁটি অমৃতভোগ। ক'টা দেবো? শাল পাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে বাদু দোকানি।

—ক' আনার দেবো বাবু, আট আনার দি?

—চার আনারই দাও বাবা, গরীব মানুষ। মা'র জন্যে নেওয়া নইলে—

—আপনাদের পেয়েই তো বেঁচে আছি হুজুর। বিনয়ের অবতার দোকানী।

—ঠাট্টা করছো? টাকাটা দিয়ে একটা সিগারেট ধরায় বীরেন। সে দামী সিগারেট সখ করে কিনেছে। একদিন বৈতো নয়!

শালপাতার ঠোঙাটা হাতে নিয়ে আবার এগোয় সে। সিগারেটে বার দুই টান মেরে খরচার হিসেবটা কোরে নেয় চলতে চলতেই: রেশন, এক পাউণ্ড টনের চা, এক কৌটা জমানো দুধ, এটা ওটা বাজার, একটা নতুন ওঠা ভুল কপি, দেখে আর সহ্য হয় কি, আহা আবার কবে কেনা হবে! সবারই তো সখ হয় একটু আধটু মুখ বদলাবার মা নিশ্চয় খুব খুসী হবে। পুলকিত হয়ে ওঠে বীরেন, মায়ের হাসিমুখ কল্পনা ক'রে। চোখে স্পষ্ট একবার মা'র মুখ দেখে তৃপ্তি অনুভব করে ও। আহা, দুখিনী মা আমার!

হঠাৎ কি মনে পড়তেই থমকে দাঁড়ায় ও। কিছু খাবার নেওয়া উচিৎ বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্যে। আহা বড্ড ভালোবাসে ওকে। গেলেই সবাই ছেঁকে ধরবে "আমাদের জন্য কি এনেছ দাদা"।

মনোহারী দোকান থেকে কিছু চকলেট আর পকেট নিয়ে আবার এগোয় বীরেন। বাড়ীর দোড় গোড়ায় এসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেশ জোরে ডাক দেয় "মা, আমি এসেছি। দোর খোলো।"

—কে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনাৎ করে দোর খুলে বেরিয়ে আসেন মাসশাশুড়ী অন্নদা সুন্দরী।

—আমি বীরু! এই যে—! হাতের জিনিষগুলি বুকে রাখতে রাখতে উত্তর দেয় বীরেন। মুখে একটু হাসির রেখা টানবারও চেষ্টা করে।

—নবাব পুত্তুরের এত দিনে আসা হোলো? আহা কি আমার মা'র তরে দরদ রে! ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন অন্নদা সুন্দরী সদম্ভে।

—কি হয়েছে বেয়াই মা? মা'র কিছু—ধড়াস করে উঠলো হঠাৎ বীরেনের বুকের ভেতর। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মুখের হাসি।

—হবে আবার কি! বলি তোর মা'র কি এটা কেনাকাটা সংসার যে ধান চাল না থেকেই নিশ্চিন্তে খাওয়া জুটবে?

—কি বলছেন বেয়াই মা

নিয়েই এসেছি।

—তা'তো দেখতেই পাচ্ছি। খুব কাজ করেছ, আমার মাথাটি কিনেছ আরকি। আরেক পর্দা গলার স্বর চড়িয়ে আবার সুরু করেন মাসশাশুড়ী।

"হ্যাঁরে ছোঁড়া, বলি তোর বাপের কাছে কি ধারী না নাকখৎ দিয়েছিলুম যে, এমন নটঘট পোরাতে যাবো? আসুক সুরো। আজ তোদেরই একদিন কি আমারই—

কাঁপতে কাঁপতে বীরেন বসে পড়ে দাওয়ায়। একটু আগের সমস্ত কল্পনা তার মুহূর্তে উবে গেল মন থেকে।

—কি আমার গুণধর ছেলেরে! মা'কে দু'মুঠো অন্নও সময় মত নেই যার দেবার সামর্থ্য, তার মার আবার এত সোহাগই বা কি আর গর্বই বা কিসের! এ্যাঃ ছেলে আমার একদিন নিশ্চয় বড় হবে, মস্ত বড় হবে। ছাই হবে! সে দিন তবে হাতীতে ডিম পাড়বে ভাত নেই তার যি খাবার মজুরা।

দূর থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছুটে আসে সুমতি। একবার ছেলের প্রতি গভীর স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে, "এই এলি বাবা"?

—হ্যাঁ, এলো তো তোমার গুণধর ছেলে। বীরেনের উত্তরটা নিয়ে বেশ ঘটা করে ব্যঙ্গ করলেন অন্নদা সুন্দরী, "যাও সোহাগ কর গে"।

—কি হয়েছে দিদি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তা'ছাড়া তোমার কথা আমার শুনে অত্যেস আছে, দোহাই দিদি ওকে আর গাল পেড়োনা।

—ওঃ, খুব যে দরদ দেখছি! তা' বাছা ও দরদটা এ বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখালে হোত না? কি আমার গুনধর ছেলেরে!

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, ওকে আর অভিশাপ দিও না। আমি এক্ষুণি তার হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছি। দীন দুঃখী বিধবার ঐ একটিই ছেলে, ওর কি দুঃখ তা'তো তুমি বুঝবেনা দিদি। চোখে আর বাধ মানে না সুমতির, হুহু ক'রে নেমে আসে শ্রাবণ ধারা।

—আ মরণ, যাবে তো যাও না। এই আকাট সন্ধ্যে বেলা গেরস্তর দোরে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেললে যে অমঙ্গল হয়, সেটাও কি বাপ মা শেখায়নি? যাবে তো যাওনা, তার আবার অত কথা কিসের! বোনের বাড়ীতে দিদি হয়ে এসেছিলে ধ্বংস করতে, আশা তো মিটলো, এবার যাবে তো বৌদি? তবু বলি কৃতজ্ঞতা বলেও একটা কথা আছে। তা' বাছা তোমারই বা দোষ কি, দেবতা তো আর ও বুদ্ধিটুকু দেননি। জ্ঞান-গম্যিই নেই তার আবার—হুঁঃ—ঘন ঘন হাঁপ ছাড়ে অন্নদা সুন্দরী। মুখে চোখে একটা তাচ্ছিল্য ভাব।

—মাথা নীচু করে সব কথাই শুনে যায় সুমতি। এক সময় চোখ মুছে বলে, "নে বাবা পেন্নাম কর তোর বেয়াই মাকে। আর—" ঠেলে ওঠা কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায় তার।

এতক্ষণ বিস্ময়ে মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বীরেন। হঠাৎ থতমত খেয়ে বেয়াই মাকে প্রণাম করতে যেতেই ত্রস্তে সরে দাঁড়ায় অন্নদা সুন্দরী। চোখ তুলতেই বীরেনের নজর যায় অদূরে দাঁড়ানো মাসির প্রতি। তারও চোখে জল। মুখে কাপড় দিয়ে কান্নার বেগ চাপছে আপ্রাণ শক্তিতে। সহ্য হোলোনা বীরেনের। দৌড়ে গিয়ে টিপ্ ক'রে একটা প্রণাম দিয়েই ফিরে এসে বললে "চল মা। চলি বেয়াই মা"। এক হাতে চোখ মুছে, আরেক হাতে থলেটা তুলে নেয় বীরেন।

—চলি দিদি। বেশ কাটলো ক'টা দিন, অনেক দিন মনে থাকবে তোমাদের কথা। প্রণাম করে উঠতেই সুমতির চোখ পড়লো শালপাতার ঠোঙাটার ওপর।

—সন্দেশ বুঝিরে বীরু? ওমা তাইতো। তা ভালোই করেছিস। টলটলে চোখ দু'টি তুলে এক নজর ছেলেকে দেখে নিয়ে ঠোঙাটা অন্নদা সুন্দরীর পায়ের কাছে রেখে বললো "বাচ্চুদের দিও, নিজেও একটা খেও। না খেলে কিন্তু ব্যথা যাবে দিদি। ছোট বোনের দেয়া জিনিষ, অবহেলা করলে দুঃখু পাবো"!

অন্নদা সুন্দরী কিন্তু মুখ ফিরিয়েও দেখলো না একবার। সুনীতির দিকে তাকিয়ে সুমতি বললে "সুমি, যাইরে। মাঝে মাঝে চিঠি-পত্তর দিস, গিয়েই ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো।...হ্যাঁ চল বাবা, সন্ধ্যে উত্তরে গেল"। মুখ নিচু করে চোখ দু'টো ভালো করে মুছে এগিয়ে গেল পথের দিকে। পেছনে বীরেন।

চোখটা ঘুরিয়ে পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দাঁতে দাঁতে শব্দ করে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো অন্নদা সুন্দরী "আঃ মর সন্দেশ খাওয়ানো হচ্ছে আমাকে। বাপের জন্মে যেন আর সন্দেশ খাইনি। দূর হ, যত সব আপদ! সজোরে এক লাথি মেরে ফেলে দিল ঠোঙাটা। ছিটকে পড়লো সন্দেশগুলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে দু'টো কাক এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল সন্দেশ দু'টো। অন্নদা সুন্দরী ঘোলাটে চোখে তা দেখলো একবার। তারপর 'থু থু' করে বারকয়েক 'থু থু' ফেলে বড় বড় পায় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সজোরে।

দূরে দাঁড়িয়ে সুনীতি সব দেখলো। পরে একটা অসহ্য তপ্তশ্বাস বুকে চেপে সজল চোখে চেয়ে রইলো সুদূর পথের দিকে। বীরেন আর তার মা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।—

মাকে নিয়ে বীরেন যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যে উত্তরে গেছে। 'ওয়েটিং রুমে' মাকে বসিয়ে দিতে দিতে ধরা গলায় প্রশ্ন করলো, "বিন্তু, এবার আমরা কোথায় যাবো মা"?

—পাগল ছেলে অসহায়ের মাথার ওপর ভগবান থাকেন। বরং এই-ই ভালো হোলো। কেন তুই আমায় দু'মুঠো খাওয়াতে পারবি না? চাসতে গিয়েও চোখে জল আসে সুমতির।

—ওকি কথা মা! ধড়াস করে ওঠে বীরেনের বুকটা।

পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে সুমতি "তোর মত একটা ছেলে থাকতে আমি কিচ্ছুটি চিন্তা করি না কুট তো আমার দব। তবে আর আমার ভাবনাটা কি?

—কিন্তু মা, মাগ: গুজরার ঠাই কৈ? যে পয়সা পাই, তাতে ভালো করে খেতেই···

—ও চিন্তা পরে হবে। তুই বরং চট করে কিছু মুখে দিয়ে আয় দোকান থেকে। সকাল থেকে তো কিছুই খোধহয় দাঁতে কাটিসনি। যা বাবা, মাথা খাস।

—চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় বীরেন। হ্যাঁ, খিদে তার পেয়েছে বৈকি! ঐ সঙ্গে ক'টার গাড়ী, তাও জেনে আসিস বাবা। পেছন থেকে একটু জোরে বললো সুমতি দেবী।

—সন্ধ্যের গাড়ীটা অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে। এর পর সেই ভোর স'পাঁচটায়। এ লাইনে ট্রেন বন্ধ কয়।

—তাহলে এখানে একটা যা হোক কিছু পেতে রাতটা কাটিয়ে দি, কি বলিস বীরু?

—এই ইষ্টিশানে?

—এতেই হবে। নে, শুয়ে পড়, কোলে মাথা দিয়ে।

—তোমাকে শেষে এই ষ্টেশনে শু'তে হবে মা? বীরেনের চোখের কোলে জল ভরে উঠলো দুঃখে।

—তোর আমার আবার অত চিন্তা কি! নে বাবা, রাত হোলো। আদর করে সুমতি দেবী কোলে টেনে নিল বীরেনের মাথাটা। অলক্ষ্যে চোখের কোন দু'টি আবার জলে ভরে উঠলো তার।

বারকয়েক মা'র মুখের পানে ছেলেমানুষের মত চেয়ে চোখ বুজলো বীরেন। ছেলের দিকে চেয়ে বাইরে চাইতেই সুমতি দেবীর চোখে পড়লো বাইরের খোলা জায়গাটায় গুটিকয়েক কুলি এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছে, কয়েকজন তোড়জোড় করছে খোবার ছেলের সঙ্গে এদের ভাগ্য মেলাতে গিয়ে আবার অশ্রু সজল হয়ে উঠলো পোড়া চোখ দু'টি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আদর করে আরও, আরও জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো বীরেনের মাথাটা। "বীরু, বাবা আমার, মাথার মণি, সাত রাজার ধন আমার।"

বীরুর ততক্ষণে নাকডাকা সুরু হয়ে গিয়েছে।

মাটির খাদ্য উপাদান

(৬৬৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রেখে দেওয়ার পদ্ধতি মানুষ শিখলো প্রথম। এর আগে এই কাজ করতো 'নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া'। ফুলের সময় এই নাইট্রেট, নাইট্রিক এসিডের হয় প্রচুর দরকার। নাইট্রো সেলুলোজ, নাইট্রো গ্লিসারিন, টি. এন. টি প্রভৃতি বিষ্ফোরক পদার্থ সকল তৈরী হয় এই সব নাইট্রেট থেকে। ফুলের একটি প্রধান রসদ এই নাইট্রোজেন আবার মাটির উত্তম খাবার এই নাইট্রোজেন।

এই নাইট্রোজেন কিছুটা পাওয়া যায় 'এমোনিয়ম সালফেট' রূপে 'কোক ওভেন' থেকে। 'কোক ওভেন' হচ্ছে কাঁচা পাথুরে কয়লা পোড়াবার চুল্লী। এমোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত হয় কয়লার গ্যাসের এমোনিয়ার সহিত সালফিউরিক এসিডের ক্রিয়ার ফলে। এমোনিয়ম সালফেট নাইট্রোজেন ক্ষয় পূরণ হিসাবে এবং মাটির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা মাটির উৎকৃষ্টতম একটী খাদ্য উপাদান। কৃত্রিম উপায়ে এই এমোনিয়ম সালফেট প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

মাটির দ্বিতীয় খাদ্য হচ্ছে পটাসিয়াম। ছাইয়েতে কিছু পটাস পাওয়া যায় আবার মাটিতে পড়ে থাকা উদ্ভিদের অংশ থেকেও কিছু পটাস পাওয়া যায়। জার্মানীতে পটাসের স্তর আছে। মাটীতে পটাসিয়াম ক্ষয় পূরণের জন্য খনিজ পটাস দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

মাটির তৃতীয় খাদ্য হচ্ছে ফসফেটস্। সাধারণত হাড়ের গুড়া থেকেই ইহা পাওয়া যায় এবং সার হিসাবে ব্যবহার করাও হয়। খনিজ ফসফেটস্ থেকে মাটির প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী ফসফেটস্ তৈরী করা হয়।

মাটির চতুর্থ খাদ্য হচ্ছে এই পূর্বোক্ত রাসায়নিক উপাদান সমূহের দ্রাবক অর্থাৎ জল। উপযুক্ত পরিমাণ জল মাটির খাদ্য উপাদানকে তরল অবস্থায় রেখে দেয়। এই তরল অবস্থায় থাকার জন্য শিকড়ের 'রুটহেয়ার-গুলি অতি সহজে ঐ সমস্ত খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে থাকে।

কৃষিপ্রধান আমাদের দেশ। কৃষিই আমাদের সম্বল। কৃষির উপযোগী সব কিছুই সুখ সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু ফসল উৎপাদনে আজ আমরা পাশ্চাত্য দেশের কাছে পরাজিত। যে পরিমাণ ফসল আমরা প্রথম বৎসর মাটী থেকে পাই, সেই পরিমাণ ফসল আমরা দ্বিতীয় বৎসর মাটী থেকে পাই না। কারণ প্রথম বৎসরের ফসল উৎপাদনে যে পরিমাণ মাটীর খাদ্য উপাদান বা সার ব্যয়িত হয়েছে, সে পরিমাণ খাদ্য উপাদান দিয়ে আমরা মাটিকে সরস এবং বলবান করি না, ফলে দ্বিতীয় বৎসরের ফসল আমরা আশানুরূপ পেতে সক্ষম হইনা। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ হওয়াতে মাটীর উর্বরতা কমে যায় এবং মাটীর উৎপাদিকা শক্তিও ক্রমাগত হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আজ সাগরপারের প্রতিটী দেশে ফসল উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সে দেশের লোক ফসল উৎপাদনে সচেষ্ট এবং তৎপর হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা হচ্ছে, উপযুক্ত পরিমাণে মাটীতে খাদ্য উপাদান দেওয়া হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও হচ্ছে আশাতিরিক্ত। আর আমাদের দেশ গরীব—রাসায়নিক সারের জন্য বিদেশের মুখের দিকে আমাদের চেয়ে থাকতে হয়—জল উপযুক্ত ভাবে পাওয়া না পাওয়ার জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়—মাটীর সবচেয়ে সস্তা খাবার গোবর আমরা জ্বালানী হিসাবে নিঃশেষ করে থাকি। ক্ষুধিত মাটীর ক্ষুধা আমরা মেটাতে পারি না—যাও মেটাই তাহাও পর্যাপ্ত নয়। তাই আজ দেশের মাটী শস্য উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়েছে—আজ দেশে দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আজকাল দেশের মাটীর চাষ কার্য কিছু কিছু হচ্ছে বা রাসায়নিক সার উৎপাদন করার জন্য কল কারখানা প্রস্তুত হচ্ছে—তবে তা ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠেনি। ফলে কৃষিকার্য খুব উন্নত হতে পারেনি। তবে আমরা এই আশা নিয়েই থাকবো যাতে দেশ ফলে ফুলে শোভিত হয়ে ওঠে স্বল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই।

কৈশোরের গান

শ্রীজয়দেব রায় এম. এ., বি. কম্।

প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ হয় প্রথম যৌবনেই। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সঙ্গীত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই নানাভাবে তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভানুসিংহ ঠাকুরের গান ও বাল্মীকি প্রতিভার পূর্বের যুগটি তাঁহার গানের preparatory stage বা উন্মেষের যুগ—এইটির কবি নামকরণ করিয়াছিলেন—"কৈশোরকের যুগ"। কবিরূপে তখনও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন নাই, রবীন্দ্র সঙ্গীতের তখনও সুর রূপলাভ হয় নাই।

ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গীত পরিবেশে একটি কিশোর তখন সবেমাত্র যোগ দিয়াছে; বাড়ীর সর্বত্র তখন সুরের হাওয়া বহিতেছে; দাদারা, দিদিরা আর আত্মীয়পরিজন সবাই সুরের চর্চায় রত, স্বতঃই 'প্রভাত রবি' তাহার মধ্যে স্থান পাইতে ব্যগ্র হইল। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাগ্রহে সযত্নে হাত ধরিয়া তাঁহাকে দলে টানিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতায় সুর সংযোজন করিয়া, রীতি বিশ্লেষণ করিয়া, সেই গান তাঁহাকে দিয়াই গাওয়াইয়া জ্যোতিরিন্দ্র কবির প্রথম যুগের লজ্জা, বাধা ভাঙাইয়া দিলেন, কবির সুপ্রকাশের পথ কাটিয়া দিলেন। সেদিনের গানের যদিও কোনই নিজস্ব রূপ নাই, অতি অপটু কাঁচা হাতের লেখা, ছেলেমানুষী কাব্য, সুরেরও দৈন্য সর্বত্রই; কবি পরিণত বয়সে নিজেই সেই গানগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে রবীন্দ্র সঙ্গীতে এইগুলির বিশেষ একটি মূল্য আছে—এই গানগুলিই তাঁহার সুরের ভিত্তি স্বরূপ! (জ্যোতিরিন্দ্র নাথের প্রভাব, তাঁহাদের পারিবারিক সংস্কৃতি এবং কবির প্রেরণা ও গানের উৎস সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি—দীপালী, দৈনিক বসুমতী ও রূপশ্রী পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

দুঃখ হয়, যে বয়সে কবি ভানুসিংহের পদাবলীতে সুর দিয়াছেন, সেই বয়সেই এত কাঁচা সুরও তাঁহার কি করিয়া রহিল? তবে ভানু পদাবলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই—মৈথিলি ভাষার ব্রজবুলী পদাবলীর অনুকরণ মাত্র।

গান যাহাকে শেখা বলে, গীতিচর্চা যাহাকে বলে কবির ভাগ্যে তাহা কিন্তু কোনদিনই জুটে নাই; বাড়ীর আদুরে ছোট ছেলে কোনদিনই বাধা বন্ধনের মধ্যে যা'ন নাই, সুরের দীক্ষাটা তাঁহার জন্মগতই—পরিবেশের যদিও প্রভাব যথেষ্ট। কবি বলিয়াছেন তিনি বাল্যকালে চুরি করিয়া গান শিখিয়াছেন। বাড়ীতে গীতিচর্চার জন্যে গুণীরা থাকিতেন—বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র; দেবেন্দ্রনাথেরও গানে উৎসাহ ছিল—দাদারা সবাই গান বাঁধিতেন, কবি এই পরিবেশটিই লাভ করিয়াছিলেন। শিখিবার মতো করিয়া গান তিনি কোনদিনই শিখিতে পারেন নাই, তাই কতকগুলি প্রাথমিক সুর ভ্রান্তি তাঁহার গানে চিরকালই রহিয়া গেলো।

জ্যোতিরিন্দ্র কবির কণ্ঠে বীণা বাদিনীর আসনখানি দেখিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়াই আয়োজন করিয়া কবির কণ্ঠে সুরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম যুগের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ তাঁহারই! কবি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছেন এই গীতি সাধীটিকে—"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তিনি বালক বলিয়া আমাকে

অবজ্ঞা করিতেন না।"

তথা রবীন্দ্রনাথের রচিত এবং সুর সম্পূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পরিকল্পিত এমন গানও আছে; মিশ্র বাগেশ্রী, খেমটাতে এই রকম একটি গান—

কে যেতেছিস্ আয়রে কেবা
হৃদয়খানি দানা দিয়ে
বিষাধরের হাসি দেব সুখ দেব মধু মাখা দুঃখ দেব,
হরণ আঁখির অশ্রু দেব অভিমানে মাখাইয়ে॥
চেতন ক'রব হিয়ে বিষে মাখা সুধা দিয়ে
নয়নের কাল আলো মরমে বরষিয়ে।
হাসির ধারে কাঁদাইব অশ্রু দিয়ে হাসাইব
মৃণাল বাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব
চোখে চোখে রেখে দেব দেখনা হৃদয় তবু
আর সকলি যা নামিয়ে॥

এই শ্রেণীর জ্যোতি-রবি সংযুক্ত সঙ্গীত এইগুলিও—(১) একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন (ভৈরবী, মধ্যমান) (২) নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনা (মিশ্র, মধ্যমান) (৩) সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ তাহা বুঝিলে না (গৌড় সারঙ্গ খেমটা) প্রভৃতি।

এই যুগে কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্ট গান—"মা আমার কেন তোরে ম্লান নেহারি"! হিন্দী গান হইতে ভাঙ্গিয়া দুই ভাই গান রচনা করিতেন—

মোতিরা বাজা দে—ম্লানমুখে কেন বল প্রিয়ে
(সুরট তেওট)

কেয়া কর সজনি—কি করি সজনী (লুব কিকিট ঠুংরি)

জয়জয়ন্তী রাগিনীতে কাওয়ালিতে "ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরপরি"—গানটিও তাঁহাদের সম্মিলিত রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মারফতে তিনি বিশ্বসুরের স্বাদও গ্রহণ করেন। কবি বলিতেছেন—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা, এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীত বিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

সঙ্গীত সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে অতি ভাবপ্রবণ ভাষায় তিনি বলিয়াছেন—"তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায় সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সঙ্গীত,—তখন আমি বুঝিলেম মনে এ আমার পক্ষে একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আমার হাজিরা বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম।" তাঁহার গান সৃষ্টির ইতিহাসে অনুসন্ধান করলে দেখিব বাহির হইতে তাগিদেই তিনি উৎসাহ পাইয়াছিলেন, বাড়ীতে গীতি অভিনয়ের জন্য, সঙ্গীত পত্রিকার জন্যে, দাদাদের নাটকের জন্যে তাঁহার ফরমাইস হইত—কথাগুলিই তিনি রচনা করিতেন এবং সুরটা কি ভাবে আসে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেন। ছেলেবেলা হইতেই কবির সুকণ্ঠের জন্য খ্যাতি ছিল, মহিলা মণ্ডলীর আসরে তাঁহার আমন্ত্রণ হইত "কৌতূহলীর দলে ঘর ভরতি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তাইতো, ভারি মিষ্ট গলা!"

ডোরাকিন কোম্পানীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাদের বারে 'বীণা বাদিনী' নামে একটি সঙ্গীত পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন, বাংলাদেশে তাহাই প্রথম সঙ্গীত পত্রিকা। তাঁহাদের প্রথম জীবনের অধিকাংশ গানই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই গানগুলিই ১৩০৪ সালে 'স্বরলিপি গীতি-মালা'য় সঙ্কলিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণ-কুমারী, অক্ষয় চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৮ গানের স্বরলিপি এইগুলিতে আছে; সব গানগুলির

স্বরলিপিই কবি-ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রই করিয়াছিলেন। কবির গান আছে ১১৪টি, তাহার মধ্যে ৮৩টি কথা ও সুর উভয়ই রবীন্দ্রনাথের, ১৯টি গানের কথা রবীন্দ্র ও সুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, ১২টি গান উভয় ভ্রাতার সম্মিলিত রচনা। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদ দুইটি লইয়া ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সব গানই এই স্বরলিপিতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের লৌকিক প্রেমাদি বিষয়ক ৬৮টি গানের অতি সহজ স্বরলিপি আছে।"

'বীণাবাদিনী'তে কেবলমাত্র তাঁদের বাড়ীর গানই বাহির হইত তাহা নয়, সেদিনের সকল প্রসিদ্ধ গানেরই স্বরলিপি তাঁহারা করিতেন; অতুল প্রসাদ সেনের "তুমি মধুর অঙ্গে, রচিত রঙ্গে, নূপুর ভঙ্গে ছন্দে" (গুজরাটী খাম্বাজ), এবং "এসো হে এসো হে, প্রাণে প্রাণ সখা" (মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি) গানের স্বরলিপি শ্রীমতী সরলা দেবী এই পত্রিকায় করিয়াছিলেন।

বাল্য বয়সে কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতি সুর-রসিকগণ সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহার গীতি উৎসাহকে; তাঁহাদের গান হয়ত উচ্চস্তরের হইত না, তবু সেইখান হইতেই কবির গানের উৎস। কিশোরী চাটুর্যের পাঁচালী গান হইতেই কবি প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার 'কালমৃগয়া'র, তাঁহার 'বাল্মীকি প্রতিভা'র। "আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত—আহা দাদাজি, তোমাকে যদি দলে পাইতাম তবে পাঁচালীর দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কি বলিব। শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালীর দলে ভিড়িয়া দেশ দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে কতকগুলি পাঁচালীর গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জনকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অস্ত হল আমার কমল আঁখি', 'রাঙ্গা জবায় কী শোভা পায় পায়, কাতরে রেখো রাঙ্গা পায় না অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে তবে'—এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি উচ্ছ্বাস বা শনির চক্রমন্থরতায় আলোচনায় হইত না।"

কবির স্মৃতির সেই পাঁচালী গানগুলির অধিকাংশই 'দাশরথী রায়ে'র রচনা; দাশু রায়ের অন্ত্যমুখ সুরের সঙ্গে বিশ্বকবির সম্বন্ধ সেইখানেই। এই রকম—

সুরট—কাওয়ালী

ওরে ভাই, জনকীরে দিয়ে এস বন।
যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ!
বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ!
অতি অগণ্য কাজে, ছি ছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্য মাঝে কেন কাঁদিলাম
অপার জলধি কেন বাঁধিলাম,
ছি ছি ধিক্ ধিক্ কার লাগিয়ে প্রাণাধিক!
শক্তিশেল হৃদে করেছ ধারণ॥

আলিয়া—একতালা

অস্ত হ'লো আজি আমার
কমল আঁখি।
একবার হৃদয় কমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্রজিতে হায় যোগাত অস্ত্রপালে কালকে রাখি
এই কাল পেয়ে কাল পাছে হ'রে,
ঐ ভয়ে রাম! তোমায় ডাকি॥
ঐহিকের ঐশ্বর্য করা,—আর কিছু মোর নাই
হে বাকী।
একবার স্মরণকালে বন্ধু হলে,
কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥
(রাবণ বধ পালা)

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের সাক্ষ্য অনুসারে (পৃঃ ১৪৭) 'জল্ জল্ চিতা'—রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম গান। ইহার সুরটি 'অহং একতালা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সংযোজিত 'সরোজিনী' নাটকের শেষ দৃশ্যে রাজপুত রমণীগণের

চিতা প্রবেশের উপলক্ষে গানটির রচনা—অতি কাঁচা 'যাত্রাই' গান !

(কোরাস)—জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোনরে যবন, শোনরে রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
সঁপিব চিতায় রাখিতে মান।
স্থাখরে যবন, স্থাখরে তোরা,
কেমনে এড়াই বলদ ফাঁসি ;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

(আর এক দিকে একজন)—
আয় আয় বোন ! আয় সখি আয় !
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ !

(আর একদিকে একজন)—
ওই যে সবাই পশিল চিতায়
একে একে একে অনল-শিখায়
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই ;
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয় লো সই !
জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোনরে যবন, শোনরে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

(আহত রাজপুত পুরুষগণ)—
স্থাখরে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
স্থাখরে চন্দ্রমা, স্থাখরে গগন !
স্বর্গ হ'তে সব স্থাখ দেবগণ
জ্বলন্ত-অক্ষরে রাখগো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও স্থাখরে,
সতীত্ব রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিচে পরাণ অনল-শিখে॥

'সরোজিনী' নাটকের রচনাকাল—৩০শে নভেম্বর ১৮৭৫ খৃঃ !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে 'পুরুবিক্রম' নাটকে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি আদি গান সংকলন করা হইয়াছিল, এইটিরও সুর সংযোজনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই (খাম্বাজ, একতালা)। পাঞ্জাবের পুরু রাজার সৈন্যগণের সমর গান—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কাযে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥
আমরা ডরাইব না, ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন॥
তা হ'লে আসুক বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

এইটি এবং প্রথম গানটির রচনাকৌশল একরকমই প্রায়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে কিছুদিন ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত গানের যুগের সূচনা হয়। "শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে, 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।" সেই গানটি—

বেহাগ—খেমটা

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোলো মু'খানি, তোলো মু'খানি
কুসুম-কুঞ্জ করো আলো।
বলি, কিসের সরম এত,
(সখী, কিসের সরম এত,)
সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত।

ছোট বেলায় কেন আমি 'গোলাপ ফুলটি কবির গানে বিশেষ আদর পাইয়াছে, পরে এই 'বিদেশিনী' অনাদরেই আছে।

(২) বল্, গোলাপ মোরে বল্
তুই ফুটিবি সখী ক'বে ?
(পিলু খেমটা)

(৩) গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্ নে।
(পিলু—যৎ)

"সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম—তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
ঘুম ঘোর ভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !

ইহার বাকি অংশ পরে ভগ্নহৃদয়ে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম—কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী তীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্ম রজনীর কিছুই ছিল না। বলি ও আমার গোলাপ বালা গানটা এমনি আর-এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি, আঁধার শাখা উজল করি' 'প্রবৃত্তি আমার ফেলে-ছেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।"

'নীরব রজনী দেখো' গানটির সুর (মিশ্র আড়াঠেকা) জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সংযোজিত বলি ও আমার গোলাপবালা'—রবীন্দ্র কথা ও সুর সংযোজিত প্রথম গান

গা গা মা	পা মা ৷	র্সা র্সা -র্সপা	মা গা -।	গা গা মা	পা মা	
লি, ও	আ মা র	গো লা • প	বা লা •	ব লি, ও	আ মা	
গা গা - গমা	সা সা -।	সা পা পা	পা পা -।	পা পা পা	পা পা -ধা	ধা র্সা
গো লা • প	বা লা •	তো লো, মু	খ নি •	তো লো, মু	খ নি	কু সু
পা -ধা পা	পা মা মা	গা -। -।	পা পা -।	মা মা -।	র্সা র্সা -মর্গা	র্সা সা -।
কু ম	ক র. আ	লো • •	কি সে র	স র ম	এ ত	ন খি •

"শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি" (ললিত খেমটা) সাধনার পরিণতি প্রভাত সঙ্গীতের কবিতার ধারায় রচিত—এইটি দিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের দীর্ঘ পথের শুভ যাত্রা।

শুন নলিনী খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখো, তোমারি দুয়ার-পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।

ঠিক এই সঙ্গীতেই রচনা তাঁহার একটি অপ্রচলিত গান 'সোহিনী' রাগিনী, কাওয়ালিতে—

আমি স্বপনে রয়েছি তোর,
সখি, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখী—
যারে, নয়নে নয়নে রাখি,
তারি, স্বপনে রয়েছি তোর;
আমার স্বপন ভাঙিয়ো না।
কাল, ফুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে কিরণ রাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী,
ধীরে, বসিবে আমার পাশ।
ধীরে, গাহিবে সুখের গান,
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া
হাসিবে সুখের হাস॥

আমার কপোল ভরে, শিশির পড়িবে ঝরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখনো আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখী
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটী ডাকি॥

এই সঙ্গীত গান—সোহিনী রাগিনীতে একতালায়—

ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর॥

'ছবি' যাত্রার 'খেমটা'ই ছিল কবির কৈশোরকের অতি প্রচলিত তাল; আরও একটি এই তালের 'কালাংড়া' রাগিনীর গান আজ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে—

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি, প্রাণে কেন বরষিল॥
দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল॥

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের কবি-গুরু! কবিও সে কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, Romantic গীতময় কাব্য সঙ্গীত-জগতের সৃষ্টি প্রথম এই দেশে বিহারীলালেরই হাতে। কবির কৈশোর সুরে তাঁহার অংশ আছে—"তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা তিনি গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে, কেরে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইয়া যাইতাম। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন, তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারও মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা নাই।

বিহারীলালের যে গানটির কথা কবি স্মরণ করিয়াছেন সেটি কালাংড়া,—খেমটা—

বালা, খেলা করে চাঁদের কিরণে,
ধরে না হাসিরাশি আননে।
ঝুরু ঝুরু মৃদু বায় কুন্তল উড়িয়ে যায়,
চাঁদা আয়, আয়, আয় চায়—গগনে।

ধরিয়ে মায়ের গলে, যেথায়ে চাঁদা সে মা বলে,
কাঁদো কাঁদো আধ আধ বচনে।
কাছে কাছে গাছে গাছে ফুল সব ফুটে আছে,
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে।
হেসে হেসে দুলে দুলে, চুমো খায় ফুলে ফুলে,
চুমো খায় মেয়ে মায়ের বদনে॥

কবি তখনও দেশবাসীর সুনাম অর্জন করেন নাই, বিশ্বকবির সিংহাসন তখন বহু দূরে, অতি ধীরে ধীরে তিনি পরিচিত হইতেছিলেন, গত শতাব্দীতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক একজন 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে একটি "গীতি সংগ্রহ" সম্পাদনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, আজ তাহা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—"এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি অধুনা বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বঙ্গ রবীন্দ্রনাথের লেখনী। কত যে সুন্দর জিনিষ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে, সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।"

(সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই যুগের কবির একজন শ্রোতা, অবশ্য আরও কিছু পরেই তিনি বলিতেছেন—"এদিকে রবিকাকাও গানে সুর বসিয়ে দিয়েই পরে ভুলে যান। অন্য কেউ সুরটি মনে ধরে রাখে। রবিকাকাকে বললুম, কী যেন সুরটি ছিল একটু একটু মনে আসছে। রবিকাকা বলবেন, বেশ করেছ, তুমিও ভুলেছ, আমিও ভুলেছি। আবার আমাকে নতুন করে খাটাবে দেখ'ছি।" এই সুর সৃষ্টি এবং রক্ষণের দায়িত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের। এই সব গানের সুরই সহজ, এইগুলি হইতে তাহার সুর প্রতিভার পরিচয় প্রত্যাশা করা বৃথা; তিনি তাহা জানিতেন—

"বাল্যকালে স্বভাব দোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান সবদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল। রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যারা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না; অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়েনি;—কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।"

কে জাগে

দিলীপ রায়গুপ্ত

ঝক-ঝক-ঝক-ঝিক-ঝিক-ঝিক।...

...বিরহের বুঝি অবসান হ'ল, এলো বুঝি মিলনের নিশি।

...গাড়ীটা থেমে গেছে ষ্টেসনে। রোজই থামে। হয়তো রোজ একই সময়ে থামতে পারে না, ব্যবধান হয়তো একটু হয়।

দিন রাতে সব মিলে ছ'খানি যাত্রীবাহী গাড়ী আসে। আপ-আর ডাউন। আর যা আসে তা মালগাড়ী।

রোজই বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে সিপ্রা। রোজ দাঁড়ায়; আজিও সে দাঁড়িয়েছে। গভীর রাতে যে গাড়ী দু'টী আসে তার শব্দ শুনতে পেলেই সিপ্রা চকমকিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তারপর সে এসে দাঁড়ায় ওদের ঐ ছোট্ট পাচীল ধ'রে। তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, ওই বুঝি এলো অনিমেষ; সত্যি বুঝি এলো।

ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্। কু-উ-উ-উ। গাড়ীটা চলে যাচ্ছে ষ্টেসন ছেড়ে।

ঘোড়ার গাড়ী আর রিক্সাগুলোও চলে যায় এক এক করে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। তবুও দাঁড়িয়ে থাকে সিপ্রা; বুঝি আজ আসবে অনিমেষ।

...কিন্তু কই? সে তো এলো না? হয়তো সে আসবে না। ভাবছে সিপ্রা, অনিমেষ হয়তো আসবে না কোনদিন।

...আশা! আশা! তবুও আশা করে দাঁড়িয়ে থাকে যদি সে আসে।...অনিমেষ এখন কোথায় তা জানে না সিপ্রা, জীবিত কি মৃত তাও জানে না।...তবুও সে আশা ক'রে থাকে।

এই বেড়ার পাশে দাঁড়িয়েই অনিমেষ বলেছিলো সিপ্রাকে তার নিভৃত মনের গোপন কথা। এই বেড়ার পাশে দাঁড়িয়েই কেঁদেছিলো অনিমেষ সিপ্রার হাত ধ'রে।...কই, সেদিন তো সিপ্রা বিচলিত হয়নি একটুও! সেদিন তো সে প্রত্যাখ্যানই করেছিলো অনিমেষকে। তবে আজ কেন সে আছে তার জন্তে অপেক্ষা করে?

সিপ্রা অনিমেষকে করেছিলো প্রত্যাখ্যান। সেইদিন, সেইদিন থেকে অনিমেষ আর আসেনি এ বাড়ীতে। আর আসবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

অনিমেষ থাকতো সিপ্রাদের বাড়ী, যেদিন সে এসেছিলো সেদিনকার কথা এখনও মনে আছে সিপ্রার।

...আজ থেকে চার বছর আগে এসেছিলো অনিমেষ। স্থানীয় স্কুলের মাষ্টারের চাকরী পেয়ে সে চলে আসে বাড়ী বিক্রী ক'রে দিয়ে। ওর কেউ নেই। তাই সে বোধহয় পেরেছিলো সব ছেড়ে আসতে চিরদিনের জন্ত।

স্থান পেলো সে এই সহরে। মাষ্টারীর আয়ে তার অন্নের সংস্থান হ'লেও অন্ত কিছু হোত না, তাই খুঁজতে লাগলো টিউসনি। মিললো তা, সিপ্রার ভাইকে পড়াবার জন্ত রাখা হোল তাকে। পরিবর্তে সে চাইলো দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন; আর চাইলো বাসপোযোগী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশী আর সে কিছু চায়নি, কি-ই বা আছে তার চাইবার?

এই মন্বন্তরের বাজারে একটা লোককে পোষা কি সহজ কথা? তাই সিপ্রার বাবা প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনলেন, অনিমেষ স্বজাতি, যখন শুনলেন অনিমেষের আপন বলতে কেউ নেই, তখন তাকে আর তাড়াতে পারেন নি।... অনিমেষ তখন বি, এ পাশ করবার খবর পেয়েছে। দু'বছর পরে এম, এ পরীক্ষা দেবার আশাও সে মনে মনে পোষণ করে।

অবশ্য এর অন্তরালে সিপ্রার বাবার আরো একটা গোপন ইচ্ছা ছিলো, যা সিপ্রা জানতে পারেনি, অনিমেষ যা কল্পনাও করতে পারেনি।

ধনীর আদরের দুলালী, একমাত্র মেয়ে-সন্তান ওই সিপ্রা। অনিমেষের সাধ্যে তাকে বিয়ে দিয়ে যদি এই ছেলেটিকে আপন করে নেওয়া যায়; সিপ্রা যদি চির-দিনই থাকতে পারে তার নিজের কাছে তবে কেন তিনি দেবেন না বিয়ে? অনিমেষ তো অশিক্ষিত নয়! বি. এ পাশ সে করেছে, এম, এ পড়বে।

...এতদিন সিপ্রার মুখ দেখবার সুযোগ পায়নি অনিমেষ। একদিন হঠাৎ সিপ্রা এলো তার কাছে পড়তে। অনিমেষ তাকে প্রথমে চিনতে পারেনি হয়তো, তাই প্রশ্ন করেছিলো,—আপনি?

—আপনার ছাত্রী হলাম আজ থেকে।...বাবা বুঝি আপনাকে বলেন নি?

—না তো? বলেন নি তাতে কিই বা হয়েছে?

অনিমেষ একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তার এই ছোট্ট খাটখানিতে সে আর বাদল কোন রকমে বসতে পারে। তিনজনের বসবার জায়গা তো হবে না। তবু বলে অনিমেষ, বসুন,—এই...এইখানে। তারপর বাদলকে তারই পাশে বসিয়ে তার জায়গায় বসতে দেয় সিপ্রাকে।

অনিমেষের ভাব দেখে হেসে ফেলে সিপ্রা। তারপর হাসি সামলে নিয়ে,—আপনি আমাদের শিক্ষক, আপনি বসবেন চেয়ারে, আর আমরা বসবো এই খাটে।

—বেশ, অনিমেষ উঠে এসে বসে চেয়ারে।

—আপনি এম. এ পড়বেন? হঠাৎ সিপ্রা প্রশ্ন করে।

—ইচ্ছা আছে। আপনি কলেজে পড়ছেন নিশ্চয়ই?

—না, কলেজে পড়বার আমার এখনও একবছর দেরী। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনি আমাকে 'তুমি' বলুন না। 'তুই' বললেও রাগ করবো না।

একটু হাসে অনিমেষ। তারপর বলে,—ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম।... এবার তাহলে শুরু করা যাক। অনিমেষ তুলে নেয় মোটা একটা বই।

...এমনি করেই চললো কয়েকদিন। কিন্তু পড়া কারুরই এগুচ্ছেনা, বাদলের না, সিপ্রার না, এমন কি অনিমেষেরও না। তাই সিপ্রা বাবাকে ব'লে ব্যবস্থা করলো, সকালে পড়বে বাদল, আর রাত্রি বেলায় পড়বে সে।

কেটে যায় কয়েকটি মাস।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে ওদের সাধনা। ইজি-চেয়ারে বসে অনিমেষ খোলা বইয়ের এক একটা পাতা থেকে উল্টে যায়। আর সিপ্রা পড়ে অনিমেষের লিখে দেওয়া 'ক্রিটিক্যাল' প্রশ্নের উত্তর।

—পড়া হয়েছে অনিমেষদা।

অনিমেষ আস্তে আস্তে বইখানা সরিয়ে নেয় নিজের চোখের সামনে থেকে। বলে,—বেশ তাহলে তুমি এবার ঘুমুতে যাও।

—যাচ্ছি। কালকে কিন্তু আমাকে এই 'এক্সপ্লানেশন'টা লিখে দিতে হবে।

—কোনটা? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—কোয়ান ইট্ড্ লাইক ডাব আউট্ সাইড্ সেডসিয়েন্।

—আমি লিখে দেবো না সিপ্রা। তুমি নিজে লিখবে, তা 'করেক্ট' করবো আমি।

—আচ্ছা।

...কোনদিন কাব্য নিয়ে আলোচনা হয়। 'সিলেক-সনের' 'মেঘনাদ ও বিভীষণ' বুঝিয়ে দিতে গিয়ে হয়তো অনিমেষ মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' বলতে শুরু করে দেয়। সিপ্রা খোকেনা ভালো করে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

দুজনেই তন্ময়...

এক একদিন লক্ষ্য করতো সিপ্রা, অনিমেষ বই বুঁজিয়ে রেখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সিপ্রার কাছে যেন কেমন লাগে এই দৃষ্টি। জড়-সড় হয়ে বসে সে, পড়তে থাকে আপন মনে।

তারপর হয়তো অনিমেষ আবার তুলে নেয় তার বই। খানিকক্ষণ বাদেই হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে তাকিয়ে থাকে সিপ্রার দিকে।

সিপ্রা বোধ করে খুব বিব্রত। ভাবে, আর মাত্র কয়েকটা দিন, পরীক্ষা হ'য়ে গেলেই সে বাঁচে।

...তারপর শিপ্রার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। ফলও বেরিয়ে গিয়েছে। সে পাশ করেছে প্রথম বিভাগে।

খবরটা অনিমেষকে জানালো বাদল। সে এসে বললো,—দিদি পাশ করেছে ফার্ষ্ট-ডিভিসনে।

—তাই নাকি? অনিমেষ হাসে।

—হ্যাঁ।

—তোমার দিদিকে পাঠিয়ে দাও না।

—দিদি তো বাড়ী নেই।

—কোথায়?

—অনিলদার সাথে বেড়াতে গেছে।

—অনিলদা কে? অনিমেষ কৌতূহলকে সামলাতে পারে না।

—আমাদের পাড়ারই ছেলে। এবার আই. এ পাশ করেছে।

আবার অনিমেষ তন্ময় হয়ে যায়। বই থেকে যায় তার হাতে। অপেক্ষা করে থাকে সে পরের দিনের।... কিন্তু কই, শিপ্রাতো এলো না? ব্যাকুল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

আজকাল যেন কেমন হয়ে পড়েছে ও। সারা দিনটা চিন্তা করে শিপ্রার কথা। সেই পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকে শিপ্রার সাথে দু'টি কথা কইতে পারে নি। মানসে সে চিন্তা করে শিপ্রার মুখ,—তার ভঙ্গিমা,—রংয়ের গভীরতা! ঘুমের ঘোরে দেখে সে শিপ্রার টোল পরা গালের হাসি।... বই থেকে যায় তার হাতে! গোটা সকালটা সে অমনি করে প'ড়ে থাকে ইজি-চেয়ারে। তারপর স্কুলের সময় হলে চলে যায়।

ওদিকে ওর পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। 'প্রিপারেশন' দিতে গিয়ে দেখে কিছুই পড়া হয়নি। বইএর পৃষ্ঠায় ফাঁকে ফাঁকে কতগুলো এলোমেলো দাগ, বা 'আণ্ডার লাইন' করতে গিয়ে লেখার উপরেই পড়েছে।...খাতা খুলে দেখে হিজি-বিজি অক্ষর। আর, ওরই মাঝে মাঝে দু' একটি ছেঁড়া-খোড়া কথা। জোয়ান অব্ আর্ক ডোমরেমীর প্রশ্নের উত্তর।

—একি? এতদিন বসে বসে কি করেছে! হঠাৎ অনিমেষের কান্না পায়। আর যে মাত্র দু' মাস বাকী পরীক্ষার!

আবার শুরু হয় একাগ্র সাধনা। দুই মাসের মধ্যে তাকে প্রায় সব সারতে হবে।

রাত্রে ঘুম নেই, চোখের কোলে পড়ছে কালি। রাতে ও ঘুমায় না। পাশ তাকে করতেই হবে, জাতির সেবা তাকে করতেই হবে। অশিক্ষিত মূর্খদের কাছে বিলাতে হবে জ্ঞান ও বিদ্যা। তবুও...তবুও ওর মনে আসে শিপ্রার মূর্তি।

কেন আসবে না তার মনে ওই মূর্তি? অনিমেষ ওকে পড়িয়েছে। তার নিজের যা কিছু ছিলো সবই তো ঢেলে দিয়ে পাশ করিয়েছে শিপ্রাকে। প্রাণ দিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর। সেই শিপ্রা দিয়েছে তাকে আঘাত। সত্যি...এ কি সত্যি,—না উত্তর দেয় ওর মন, তুমি ঠিকই করেছো। ছাত্রীকে পাশ করাতে পেরেছো সেই তো তোমার গৌরব! আনন্দ! তার সাথে তোমার আর কিছুর সম্পর্ক তো নেই। থাকতে পারেও না। শিপ্রা যে তোমার ছাত্রী। আঘাত সে ইচ্ছা করে দেয় নি,—নিজের—স্বার্থের হানি হতে পারে বলে তার এই প্রচেষ্টা। দুঃখ কেন তুমি পাও?

অনিমেষ? শিপ্রার বাবা গোপাল বাবু ডাকেন।

—কে, ও আপনি, আসুন।

—এর পরে কি করবে ভাবছো?

—যদি কোন কলেজে...।

—না, তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো,—আই. সি. এস্ পড়ো।

—আগে পরীক্ষা হয়ে যাক, পাশ করি।

—পাশ যে তুমি করবে তা পরীক্ষা আরম্ভ না হ'লেও বলতে পারি; তোমাকে বিলেতে যেতে হবে।

চুপ করে রইলো অনিমেষ।

—কথা বলছো না যে?

—না, উৎপীড়িত জনগণের উপর আমি আর উৎপীড়ন করতে পারবো না।

—মানে ?

—বিসদ ভাবে বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে ; তবে আমি যা ঠিক করেছি তাই চরম।

—আই. সি. এস্ পড়লেই কিন্তু ভালো করতে। আমি তোমার একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

—কি করবো বলুন। মন যা চায় না তা কি করে করা যায় ?

—তুমি যা ভালো বোঝ তাই করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর বুক থেকে।···তারপর চলে যান।

অনিমেষ বুঝতে পারে না এর কারণ। সে পড়বে কি না পড়বে তাতে ওঁর কি আসে যায় ? আপন মনে সে ভেবে চলে গোপাল বাবুর কথা। এর অন্তরালে কি থাকতে পারে ?···সমস্যার সমাধান হয়তো করতে পারে না অনিমেষ।

পরীক্ষার দিন ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে···

বাক্স খুলে অনিমেষ তার অনেকদিন ধ'রে সঞ্চিত টাকা-কড়ি যা ছিলো তাই বের করলো। এর হয়তো কোন প্রয়োজন ছিল না ; কেন না গোপালবাবু দিয়ে এসেছেন টাকাকড়ি, অনিমেষকে দিতে চাইছেন তার পরীক্ষার খরচ বাবদ।

এ-আমার তো দরকার নেই ?

—কেন, তোমার অনেক টাকাই তো লাগবে।

—যা লাগবে তা আমার আছে। আপনি কেন মিছিমিছি এতো টাকা খরচ করবেন ?

সেদিনও ফিরে যান গোপাল বাবু। অনিমেষ টাকা নিলো না। কেন সে নেবে ? টাকার তো কোন চুক্তি ছিলো না !

যাই যাই করেও যেতে পারে না অনিমেষ। আজ যাবে সব ঠিকঠাক, কিন্তু সে গেলো না। সিপ্রার সাথে তার একটি বার দেখা হয়নি। গোপাল বাবু জানেন না অনিমেষের এই দেরী করার কারণ ; বাদলও জানে না। তারা শুধু জিজ্ঞাসা করে কতদিন বাকী আর পরীক্ষার।

এমনি করেই কেটে গেলো চারটি দিন।

তারপর ?

অনিমেষ একদিন সন্ধ্যাবেলায় আসছিলো বেড়ানো শেষ করে। বাড়ীতে ঢুকেই সে দেখতে পেল, যার জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে চারদিন—বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে।

অনিমেষের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারে না। ভাবে,—সিপ্রা বোধ হয় তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

অনিমেষ আস্তে আস্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ডাকে,—সিপ্রা।

—কে, আপনি ? কিন্তু এখানে কেন ?

—আমি কাল যাচ্ছি।

—কেন, কালের আগে যাবার উপায় নেই ? আজ রাতেও তো একটা গাড়ী আছে !

—সিপ্রা !

—বলুন না ? চাপা গলায় সিপ্রা ধমক দেয় তাকে।

—আমি···আমি তোমাকে···কথা জড়িয়ে আসে।

—ভালবাসেন, তাই নয় ? কিন্তু আমি তো ভালবাসিনা আপনাকে ?

সিপ্রার প্রত্যাখ্যান চাবুক মারে অনিমেষকে সে মুহ্যমান হ'য়ে যায় তারপর এক সময় অবোধ শিশুর মত সিপ্রার হাত ধরে কেঁদে ফেলে। সিপ্রা নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে।

কাঁদতে কাঁদতে অনিমেষ এক সময় তাকাল তার দিকে। চমকে উঠলো সিপ্রার গম্ভীর আকৃতি দেখে। আস্তে আস্তে সে ছেড়ে দিলো সিপ্রার হাত। বললো,—তোমার জীবন থেকে আমি আজই স'রে যাবো সিপ্রা। আমার এই মুখ তোমাকে আর দেখাবো না কখনও।

—হ্যাঁ যান।

—যাচ্ছি। অনিমেষ পা বাড়ায়।

তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। সামনের ওই বড় বট-গাছটার মাথার উপরে উঠেছে চাঁদ। তারই আলোকে টলতে টলতে অনিমেষ চলে আসে নিজের ঘরে।

সেইদিন রাত বারোটায় অনিমেষ নিজের সর্বস্ব নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে ওদের বাড়ী থেকে।

...তারপর আর আসেনি অনিমেষ। খবরের কাগজ দেখছে সিপ্রা, অনিমেষ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া সে আর কোন খবরই পায় নি

হঠাৎ একদিন, কয়েকমাস পরে দেখলো খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় অনিমেষের ছুটি। ক্লাইং কমাণ্ডারের সাথে সে সেক-হ্যাণ্ড করছে। সাম্রাজ্য বাদীর পক্ষ নিয়ে সে নেমেছে যুদ্ধে। সে পাইলট। তার এরোপ্লেনকে পাঁচখানা শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন অবরোধ করেছিলো সেই ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়ে পাঁচখানা প্লেনকে ধরাশায়ী করে সে ফিরে এসেছে। তাই তার সাথে ক্লাইং-কমাণ্ডার সেক-হ্যাণ্ড করছেন। যে অনিমেষ পড়তে চেয়েছিলো না আই. সি. এস্, যে করতে চেয়েছিলো না সাম্রাজ্য-বাদীর নকড়ী, সেই অনিমেষ আজ পাইলট।

আজ সত্যি চল্-চল্ করে ওঠে সিপ্রার চোখ্। গুমরে গুমরে ফুলে ওঠে তার বুক। কাঁচকে কাঞ্চন ভেবে সে এতদিন ভুল ক'রে এসেছে। সত্যিকারের কাঞ্চনকে সে দিয়েছে ফিরিয়ে কাঁচের মোহে। আজ সব মোহ তার ভেঙ্গে গেছে। অনিলকে চিনেছে। যে অনিলকে বসিয়ে-ছিল তার মনের সবচেয়ে বড় জায়গায়, যার জন্যে সিপ্রা পেরেছিলো অনিমেষকে প্রত্যাখ্যান করতে, সেই অনিল করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। সে স'রে গেছে সিপ্রার কাছ থেকে। অন্য একজনকে বিয়ে করেছে সে।

আর অনিমেষ তো নিজেকে ঠেলেই দিয়েছে ধ্বংসের মুখে।...তবুও...তবুও সে ফিরে আসুক্। সিপ্রা তাকে আদর করে বরণ করে নেবে তাকে ব'লবে,—ওগো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পাশে আমায় নাও। সেদিন সিপ্রা সত্যি নিজের সব দোষ স্বীকার করবে অনিমেষের কাছে। কিন্তু হায়! সে ভুল ভাঙ্গার অবকাশ কই?

একদিন...দুই দিন···তিনদিন। কেটে গেছে কতো মাস। কিন্তু অনিমেষ এলো না। সে ফিরে আসবে কি? কে জানে! সিপ্রার মনে আশা, সে ফিরে আসবে, সিপ্রাকে সে বুকে টেনে নেবে। তাই রোজ সিঁড়ায়, দাঁড়িয়ে থাকে বেড়ার ধারে। আর গাড়ী চলে গেলে সে ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। ভগবানের কাছে জানায় প্রার্থনা।

কুউ-উ-উ। ঝক্-ঝক্-ঝক্।···

আজও এসে থামলো গাড়ী।

সিপ্রা এসে দাঁড়ালো ওই বেড়ার ধারে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। বুঝি আসবে অনিমেষ।

কুউ-উ-উ। ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্।...

ষ্টেশন ছাড়লো গাড়ী। "নাই নাই—সে পথিক নাই—"

আগামী বৈশাখ সংখ্যা থেকে

তারাশঙ্করের

"সাহিত্য জীবন কথা"

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

অবসান

ডাঃ সত্যপদ রায় চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

—দুই—

সবিতা তাদের বসবার ঘরখানি পরিষ্কার করছিল। আর আপন মনে গুণ গুণ ক'রে গান করছিল। এমন সময়ে নরেন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল তার পেছনে। কিছুক্ষণ পরে ডাকলে "সবি।" নরেন আসাতে সবিতা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ল, বল্লে, "কে? নরেনদা?"

নরেন—"তোমার গলা'ত বেশ মিষ্টি সবি! বেশ গান করত!"

সবিতা—"আচ্ছা নরেনদা" আপনি এমন ভাবে কেন আসেন বলুন দিকি? জানেন না মা ভালবাসেন না।"

নরেন—"কি জান সবি, আমি না এসে থাকতে পারি না। আমার এখানে আসতে কি দোষ হয় তা' আমি বুঝতে পারি না। আগে আমি কতদিন এ বাড়ীতে থেকেছি। আমরা দু'জনে কত খেলা করেছি—কত ঝগড়া করেছি। তখন তো কেউ কিছু বলে নি।"

সবিতা—"সে সব ভুলে যেতে হবে নরেনদা, এখন মা ভালবাসেন না। বড় বকাবকি করেন।"

নরেন—"আচ্ছা সবি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার কি ভাল লাগে না? চুপ ক'রে রইলে যে? যদি তোমার আমার আসা ভাল না লাগে আমি আর আসব না। সত্যি বলছি, আর আসব না। তবে এখন যাই।"

সবিতা—"আমি কি আপনাকে যেতে বলছি নাকি? মা বকেন সেটা আমার ভাল লাগে না।"

নরেন—"সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। কৈ? তোমার বাবারতো কোন আপত্তি হয় না। বরঞ্চ তিনিই আমাকে রোজ আসবার জন্য বলেন।"

সবিতা—"মার মতের কাছে বাবার মতামত কিছুই নয়।"

নরেন—"আচ্ছা সবি, ওসব থাক এখন। একটা গান শুনাবে?" এমন সময় অমিয়া পাশের বাড়ী থেকে এলেন ঐ ঘরের ভিতরে। নরেনকে ঘরে দেখে একদৃষ্টে দুই-জনকে দেখতে লাগলেন, কিছু না বলেই চলে গেলেন অন্য ঘরে। দু'জনে খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ল। সবিতা সভয়ে বল্লে, "এখন কি হবে নরেনদা? আজ মা আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

নরেন—একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, "খুব বকাবকি করবেন বুঝি?"

সমরনাথ খুব ব্যস্ত ভাবে এলেন ঘরের ভিতরে। এসে সবিতাকে জিজ্ঞেস করলেন "সবি তোমার কোথায়? এই যে নরেন, কখন এলে?" কথা শেষ হতে না হতেই অমিয়া পুনরায় ঘরের ভিতরে এসেই খুব ঝঙ্কার দিয়ে সমরকে বল্লেন, "তুমি আবার বাড়ীতে ঢুকলে?" "তোমার আবার কি হল?" সমর জিজ্ঞেস করলো।

অমিয়া খুবই বিরক্ত হয়ে বলল "আমার মাথা আর মুণ্ডু। "আর জ্বালাতন সহ্য হয় না। আমি পাগল হয়ে যাব কিনা জানিনা।"

সমর খুবই অনুযোগের সুরে বল্লে "এত চটছ কেন? কি হ'ল তোমার? বাইরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাও সব ঠিক করগে।"

অমিয়া—"আঃ, পোড়া কপাল আমার—আবার লোক ঢুকিয়েছ? আসবে কোথা থেকে? আর পারিনা বাপু।"

সমর একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে, "বাইরে লোক আছে, চেঁচামেচি ক'রে আর কেলেঙ্কারী কোরো না। দোহাই তোমার একটু চুপ কর।"

অমিয়া—"হাড় আর মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি!" এবার সবিতার দিকে চেয়ে খুব রুক্ষভাবে বল্লে, "সবি, ভিতরে যেলি?" সবিতা কিছু না ব'লে ভিতরে চলে গেল আর পেছনে গেল অমিয়া। তারপর সমর ডাকলে "অনিল বাবু, আসুন, ভিতরে আসুন।" "এই যাই" বলে অনিল এল ভিতরে। নরেনকে দেখেই বল্লে, "আরে নরেন যে—তুমি এখানে কি করছ?"

সমর—"নরেন আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। অনেক দিন থেকে আসা যাওয়া—ঘরের ছেলের মত। অনিল বাবুর সঙ্গে তোমার কি ক'রে আলাপ হল নরেন?"

নরেন—"অনিলদা, আমাদের কলেজেই পড়তেন। খুব ভাল ছেলে ছিলেন। দেশের ও দশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যখন আমি প্রথম কলেজে ঢুকি, ইনি তখন চতুর্থ শ্রেণী বি, এ তে পড়েন। সেই থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। খুব অমায়িক লোক।"

অনিল—"থাম, থাম, খুব হয়েছে। সে দিন যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সে দিন তুমি যে এঁর সঙ্গে পরিচিত তা'ত বল নি।"

নরেন—"আপনি যখন এঁর বিপদের কথা নিজেই ভুললেন তখন আমি সব চেপে গিয়েছিলাম।" সমর দু'জনের কথা খুবই আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল—বল্লে, "আচ্ছা তোমরা দুজনে গল্প কর আমি আসছি এক্ষুণি।"

সমর ভিতরে গেলে অনিল জিজ্ঞেস করলে "এঁদের স্বামী স্ত্রীতে বড় অশান্তি না? আমি বাইরে যখন ছিলাম কিছু আভাষ পেয়েছি।" নরেন কোন জবাব দিল না দেখে অনিল বল্লে, "তুমি এখন বি, এ, পড়ছ তো?" নরেন উত্তর দিল "হ্যাঁ, আচ্ছা অনিলদা' তুমি এখানে কি ক'রে এলে?" অনিল, এর সঙ্গে আমার পরিচয় যখন ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তা'ত তুমি জান। তারপর এর এক অসুস্থ বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হ'লো। তাঁর অসুখটা একটু বেড়েছে তাই একে নিতে এসেছি।"

নরেন—"কি হয়েছে তাঁর?"

অনিল—"পাগলের মত হয়ে যাচ্ছেন। বড় দুর্বল—তাই একে নিয়ে যেতে এসেছি। যেতে পারবেন কি?" সমরনাথ একটি ট্রেতে নিজেই কিছু খাবার ও চা নিয়ে এসে টেবিলে সাজিয়ে দিতে লাগল দেখে অনিল বল্লে, "আপনি অত কষ্ট করতে গেলেন কেন?" সমর "কষ্ট যার জীবনের সাথী তার কাছে এটাতো খুবই আনন্দের। তাছাড়া ঘরে আজ অতিথি—তার উপর আপনার মত স্বদেশ প্রেমিক লোক। আমার কম সৌভাগ্য!"

অনিল—"মিছে কেন লজ্জা দেন। আমি আপনার কত ছোট। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আর একটী কথা, আপনি আমার সঙ্গে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলে কথা কইবেন না। আপনি আমার বড় ভাই।"

সমর—"আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। এখন এই ডিনিস-গুলির সদ্ব্যবহার কর।" অনিল জলযোগ করতে করতে সমরকে বলল, "দেখুন দাদা, আমাকে এখুনি ফিরতে হবে আর আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। সমর—"সে কি? এখুনি? না খেয়েই?"

অনিল—"হ্যাঁ, তা নাইলে আপনার বন্ধুকে সামলাতে পারা যাবে না। সেখানে রেবা একা—আর ভরসা দীনু।"

সমর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

অনিল—"ভাবছেন কি দাদা? আপনি তাঁর জন্য ভাববেন না, যতক্ষণ আমরা আছি তাঁর সেবা যত্নের ত্রুটী হবে না।"

সমর—"আমি সেজন্য মোটেই ভাবিনা ভাই—আচ্ছা"—এমন সময় অমিয়া সেখানে এসে সমরনাথকে সকলের সম্মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাওয়া হবে? আড়াল থেকে সব শুনেছি। তোমার যাওয়া হবে না।' গায়ে মাথায় চোট লাগিয়ে সাতদিন পরে বাড়ী এলেন সেদিন। আজ যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।" সমর ক্ষোভে ও দুঃখে বল্লে, "দেখ, ছেলেমানুষি করা তোমার উচিত নয়। অমরের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে দেখবার জন্য আমাকে এখুনি যেতেই হবে।"

অমিয়া—"কিছুতেই যাওয়া হবে না। যাও দেখি কেমন করে যাবে।"

সমর—"কেন? তুমি এমন করছ কেন?"

অমিয়া—"আমি বলছি তোমার যাওয়া হবে না।" অনিল সমরনাথের এ প্রকার অবস্থা দেখে কি করা উচিত না ভাবতে পেরে বল্লে, "দেখুন সমরদা যদি অসুবিধা থাকে পরে আসবেন—আমি আগে যাই।" সমর খুবই বিরক্ত হয়েছে স্ত্রীর এই ব্যবহারে—অনিলকে উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "না, তা হতে পারে না। যে বন্ধু আমাকে টাকা দিয়ে বরাবর সাহায্য করে এসেছে তাকে এ অবস্থায় আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।" স্ত্রীকে বল্লে, "তুমি কি? তুমি তার উপকারের কথা এত শীঘ্রই ভুলে গেলে, 'না' বলতে তোমার বুক কেঁপে উঠল না? সে দিনের কথা ভুলে গেলে—যে দিন তুমি রোগের যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী? কে, কে তোমাকে সেই দিন বাঁচিয়েছিল? কে তখন অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল? কে তোমার মাথার কাছে পাখা নিয়ে সারারাত বসে থাকতো? সব ভুলে গেলে? তার দুর্দিনে তুমি ভুলতে পার, আমি পারব না। কখনই পারব না। আমাকে এখনই যেতেই হবে। চল নরেন, চল অনিল।" এই বলে সমরনাথ দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অমিয়া কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বল্লে, "চিরদিনই এমনি ভাবে আমি জ্বলে-পুড়ে ম'লাম। দূর হোকগে চাই আমিও যেদিকে দু'চোখ যায় সেইদিকে চলে যাব।"

—তিন—

রেবা আজকাল অমরনাথের সেবার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে। অমরনাথের সব কাজ সে নিজেই করে। পুরনো চাকর দীননাথকে আর কিছু দেখতে হয় না। অমরনাথও রেবার সেবায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছে; কিন্তু তার মনের অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নাই। রেবার কাজ ছাড়া আর কাহারও কাজ সে পছন্দ করে না।

রেবা এখনও অমরনাথকে চা দিয়ে যায় নাই, তাই অমরনাথ বিরক্ত হয়ে খাটের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছে, "আমাকে সব পাগল করে ছাড়বে। সংসার এখনও আমাকে টেনে ধরে আছে কিসের জন্য? শান্তি? শান্তি আছে? পাব কি?" এমন সময় দীননাথ চা নিয়ে অমরনাথের কাছে দাঁড়াল। বললে, "বাবু, এই নেও চা এনেছি। অমরনাথ বিরক্তির সহিত বল্লে, "কি, চা? যে।" চা একটু খেয়ে বল্লে, "ভাল নয়। কে তোকে চা দিল? না খাব না।" চায়ের কাপ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। দীননাথ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হল বাবু? ফেলে দিলে কেন? দিদিমণি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই আমি চা নিয়ে এলুম।"

অমর "বেশতো, কে তোর কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে? কাজ, কাজ কাজ। তোদের আর কিছু করতে হবে না—আমি নিজে সব কিছু করে নেবো।" দীননাথ বড় ব্যথিত হল। রেবাকে খবর দিতে যেতে যেতে ভাবতে লাগল "বাবু যে কবে ভাল হবে!" রেবা দীননাথের কাছে সব শুনে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে অমরনাথকে বল্লে, "কি হল আপনার? ওমা! চায়ের কাপ্ গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন? চা বুঝি ভাল হয় নাই। বুঝেছি—বোকা লোক কিনা তাই আজ খারাপ চা নিয়ে এসেছে। না, না আমি ভাল চা নিয়ে আসছি।" রেবা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিয়ে এলো অন্য পেয়ালাতে চা। বল্লে, "এই নিন। চা খান, কেমন চা হয়েছে?"

অমর—"বাঃ, বেশ চা।" অমরনাথ মনে মনে বলে—"আশ্চর্য তোমার স্পর্শ! সবই এই স্পর্শে বদলে যায়; কিন্তু আমারই কিছু হয় না। মাঝে মাঝে মন কোথায় চলে যায়। এখন আমার কোন অভাবই নেই।"

রেবা—"কি ভাবছেন?"

অমর—"কই, কিছুতো নয়? আচ্ছা রেবা, তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না? আমি তোমার তো কেউ নই, তবু তুমি আমার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কর কেন?"

রেবা—"কই, আমিত কিছুই করিছি না। যা' করি সেটাও আমার কর্তব্য—এই রাস্তাই যে আমি বেছে নিয়েছি। এটাই যে আমার ধর্ম। যে নারী সমাজ, ধর্ম

বিচার না করে লোক-সেবাতেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে সে ধন্য নয় কি? আমি ত আপনার জন্য বেশী কিছু করছি না।"

অমর—"আমি সমাজ বুঝি না, ধর্ম বুঝি না—আমি বুঝি কেবল মনের শান্তি। এতদিন কত কাজ করেছি। সংসারের কোলাহল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঘর ও পরের জন্য প্রাণপাত করেছি; কিন্তু সব বৃথা হয়ে গিয়েছে। প্রতিদানে কি পেয়েছি জান? আজ তাই আমি একা শূন্যের ভেতর দাঁড়িয়ে হাহাকার করছি। কেউ আসে নাই সান্ত্বনা দিতে। তাই আজ তোমার নিঃস্বার্থ সেবা আমাকে অধীর করে ফেলেছে। আবার মনে হচ্ছে—ধীরে ধীরে বাগান সাজাই। আগাছা-কুগাছাগুলি তুলে ফেলে আবার ফুলের বাগান বাঁচিয়ে তুলি। কিন্তু—"

রেবা—"কিন্তু কি?"

অমর—"আর হয় না।"

রেবা—"কেন হয় না? আপনি কেন এমন করেন? আপনিও কম মহৎ নন। আপনারও প্রাণ আছে। তবে কেন আপনি এমন করেন?"

অমর—"কেন? কেন করি? তুমি আর কি বুঝেছ এ কয়দিনের ভেতরে? জ্বালা, রেবা তীব্র জ্বালা। বুকের ভেতরে হাহাকার করছে। দেখ, দেখ, সামনে কি একটা ভেসে উঠ্‌ল। নিগন্ত অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ঐ দেখ, গাঢ় অন্ধকার। আর যে দেখতে পাচ্ছি না।" অমরনাথ অন্ধের মত চারিদিকে হাঁতড়াতে লাগল। রেবা ব্যস্ত হয়ে দীননাথকে ডাকলে "দীনু, দীনু, শীঘ্র দৌড়ে আয়। বাবুকে ধর শুইয়ে দেই।" দীনু দৌড়ে এলো, অমরনাথকে ধরে শুইয়ে দিল বিছানায়। রেবা দিনুকে বল্লে, "পাখাটা কৈ? অডিকোলোনের শিশিটা শীঘ্র আন।" দীননাথ ব্যস্ত হয়ে রেবার আদেশ নিঃশব্দে পালন করে গেল।

রেবা অমরনাথকে বল্লে, "আপনি স্থির হোন। আবার অমন করছেন কেন?"

অমর—"কই, আমিত কিছু করিনি। তোমরা এত ব্যস্ত কেন? আমার ত কিছু হয় নি? আচ্ছা রেবা, আমাকে তোমার ভাল লাগে না?" রেবা দীননাথকে বললো—"এই নিন, পাখা রেখে আয়।" দীনু চলে গেলে রেবা অমর নাথকে বলল—"কেন বলুনতো? সত্যিই আপনাকে আমার ভাল লাগে। আপনি এখন একটু সুস্থ হয়েছেন কি?"

অমর—"আমি ত সুস্থই আছি। আমার কি কিছু হয়েছে?"

রেবা—"আপনি এখন শুয়ে থাকুন। আমি একটু ওভালটিন নিয়ে আসছি।" ঠিক এমন সময়ে সমর ও অনীল এলো ঘরের ভিতরে। তাদের দেখে রেবা বল্লে, "এই যে দাদা, অনীলদা তোমরা দুজনেই এসেছো। ভালই হ'ল। তোমরা এঁর কাছে একটু বসো, আমি ওভালটীন নিয়ে আসছি।" রেবা চলে গেলে সমর অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করলে, "আজকাল কেমন আছ?" অমর সহজ ভাবেই বল্লে, "বেশ আছি। কত যত্ন আজকাল আমার। মুখের কথা পড়তে না পড়তেই সব জিনিস সামনে হাজির। আমিত এখন স্বর্গে বাস করছি, কোন জিনিসের অভাব নেই।"

সমর—"ভালইত। আমরা তো তাই চাই। তুমি শীঘ্র ভাল হয়ে যাও এইত আমরা চাই।"

অমর—"ভাল? আর ভাল। বৃথা আশা। তবে যে ক'টাদিন কাটে এই ভাবে। কোনদিন তো সুখের মুখ দেখি নাই তাই ভাই সুখটা কি রকম একবার দেখতে ইচ্ছা করে।"

সমর—"দেখবে, দেখবে একটু সেরে ওঠো, আমরা তোমার সুখের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" ওভালটীন নিয়ে রেবা এসে অমরনাথকে বল্লে, এই নিন। এইটুকু লক্ষ্মীর মত খেয়ে ফেলুনতো?

অমর—"এতখানি?"

রেবা—"এতখানি কোথায়? সামান্যই ত, খান!" অমরনাথ খেতে লাগল। "ভাখ, অনীলদা খেতেই চান না। আগে কিছুই খেতেন না এখন তবু অনেক কষ্টে একটু খাচ্ছেন।"

অনীল—"না খেয়েত এই অবস্থা হয়েছে। খান খান দাদা, খেয়ে নিন।"

অমর—"কি যত্ন! কি সেবা! এ ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব? যা কখন আশা করি নাই, যা কখন ভাবি নাই তাই এখন পেয়ে যাচ্ছি।"

রেবা—"কি আর পাচ্ছেন বলুনতো? আপনি হাঁসালেন। নিন সবটুকু খেয়ে নিন, একটী ভাল গান শোনাব।"

অমর—"গান শোনাবে? এই ভাখ, সব খেয়ে ফেলেছি, গাও একখানি গান গাও।"

রেবা—"আচ্ছা একটু পরে গাইব কেমন?"

অমর—"গান আমি কত ভালবাসি জান রেবা? গানে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। গানের স্রোতে ভেসে যাই কোন অজানা দেশে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি ঐ মহাশূন্যের মাঝে। বাইরে চেয়ে ভাখ ঐ মহাশূন্যের দিকে—ভাখ কত নির্মল। কোথাও কি কোন দাগ আছে?" সময় অমরনাথের মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে অন্য কথা পাড়ল, বল্লে "দ্যাখ অমর, আমরা আসবার পথে সারাদিন তোমার কথা ভাবতে ভাবতে এসেছি। কি ব্যবস্থা করলে তুমি ভাল থাক তা ভেবেছি।"

অমর- "কি ঠিক করলে?"

সময়—"এই ঠিক করেছি যে তোমার শরীরটা একটু সারলেই আমরা সকলে যাব কোথাও বেড়াতে বাইরে।"

অমর—"বেশত। আজকাল আমি তো বেশ ভালই আছি। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি বেশত আছি।"

রেবা—"আর কিছুদিন খেয়ে গায়ে জোর করে নিন, তারপর চলুন আমরা কোথাও যাই বেড়াতে।"

অমর—"তুমি যাবেনা রেবা?"

রেবা—নিশ্চয়ই, তা না হলে আপনাদের দেখবে কে? তাছাড়া আপনার জন্য তো আমাকে যেতেই হবে।"

অমর—"আমার জন্যে? যাবে?"

রেবা—"হ্যাঁ, হ্যাঁ যাব। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"

অমর—"না। ভাবছি আমার জন্য এতটা কষ্ট তুমি করবে? কেনই বা করবে। আমার এ ক্ষত বিক্ষত বুকে প্রলেপ লাগাতে কেন তুমি এসেছ?"

রেবা—"থাক, থাক আর বেশী কথা বলবেন না। এখন আপনাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করিগে কেমন?" এই বলে রেবা চলে গেল ভিতরে। অমরনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "ভাখ, আমার জীবনে এই প্রথম পরিবর্তন এসেছে; কিন্তু তাই বড় দেরীতে। এখন জীবনটাকে টেনে নদীর কিনারায় এনে ফেলেছি পারের অপেক্ষায়। আর পারি না সহ্য করতে; বুকের ভেতরে অব্যক্ত বেদনা। প্রাণটা হাহাকার করে কেঁদে উঠে। মাঝে মাঝে সব ভুলে যাই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি—তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি ঘোর অন্ধকারের মাঝে, আলোর জন্য চেঁচিয়ে উঠি। আমার চিৎকার হাহাকার করে ফিরে আসে। আমি জ্ঞান হারাই।"

সময় সভয়ে বল্লে, "থাক, থাক অন্য সময়ে আবার কথা হবে। এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।"

—চার—

আজকাল নবতারা একাই নিজের সংসার দেখেন, কারণ রেবা অমরনাথের বাড়ী থেকে আসতে সময় পায় না। তার সেবায় রেবা প্রাণপাত করছে, কেন করছে সে নিজেই জানে না। নবতারা বিরক্ত হয়েছেন খুবই কিন্তু উপায় নেই। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করেন আর আপন মনে বকতে থাকেন, "মেয়েটার আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে যাই! এতবড় মেয়ে হ'ল বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই হল না। আমি একা, বুড়ো মানুষ, আজ আছি কাল নেই, আমাকে ফেলে যে কোথায় ঘুরে বেড়ায় তার ঠিকানা নেই। করনা বাবা যত পার সেবা কর, সমিতি দেখ, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরও দেখ, তা' নয় দিন রাতই লোকের সেবার পিছনে লেগেই আছে। মেয়ে মানুষের এত কি ভাল? আর পারি না। বিয়ের ঠিক করব তা পয়সার অভাবে পেরে উঠছি না। কেউ নেইও তো

জোগাড় করে নেবে। বাড়ী ভাড়াটুকুর উপর সম্বল। তা মেয়ে কিছুতেই বুঝবে না।"

"পিসিমা, ও পিসিমা" বলে ডাকতে ডাকতে অমিয়া ঢুকলো ঘরের ভিতরে—পিছনে সবিতা। অমিয়া বল্লে, "চিন্‌তে পারছ?"

নবতারা—"কে তোমরা মা, ঠিক ঠাওর করতে পারছি না?"

অমিয়া—"চিন্‌তে পারছ না? না পারারই কথা। আজ ১৩।১৭ বৎসর আগে আমার তখন বিয়ে হয় নাই—আমার বাবা মা তখন বেঁচে। মা'র অসুখের জন্য একবার এসেছিলাম তোমার এখানে। তারপর আর দেখাশুনা হয় নি।"

নবতারা—"ওমা! তুই রমেনের মেয়ে না? বুড়ো হয়েছি ঠিক ঠাওর করতে পারি না। তাছাড়া তুই তখন কতটুকু। বস, মা বস। এটী কে?"

অমিয়া—"আমার মেয়ে সবিতা।" আমি যখন মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম তোমার কোলে একটি মেয়ে দেখে-ছিলাম। সে কোথায়? কত বড় হয়েছে?"

নবতারা—"তার কথা আর বলো না মা। সে মেয়ে মন্দ মা, এখন সে পুরুষের নাক কাটে। সে সব পরে হবে। আগে তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করে আসি।" নবতারা চলে গেলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে তার মাকে, "ইনি বুঝি আমার দিদিমা—এঁদের কথা ত কোন দিন তুমি বলনি। যে মেয়েটীর কথা তুমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি কে?"

অমিয়া—"হ্যাঁ ইনি তোমার দিদিমা আর মেয়েটী তোমার মাসীমা। আমরা বহুদিন এ বাড়ীতে আসি নি—সেই জন্য আগে কোনকথা তুমি শোন নি। ইনি আমার বাবার দূর সম্পর্কের বোন। খুব ভাল লোক। আমার বাবাকে খুবই ভালবাসতেন। সেই জন্যই সাহস করে এখানে আসতে পেরেছি। এখান থেকে একবার অমর বাবুর বাড়ী যাব। আর তোর একটা ব্যবস্থাও তো করতে হবে।"

নবতারা চা জলখাবার নিয়ে এসে বল্লেন "ঐ কোণের দিকে জল আছে, হাত মুখ ধুয়ে আগে তোমরা কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হও তারপর সব কথা হবে।" সবিতা ও অমিয়া হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলে নবতারা জলখাবার ও চা পরিবেশন করতে করতে বললেন, "তোর নাম অমি না? তখন তুই বোধহয় ১৩।১৪ বৎসরের ছিলি। এখন তোর সেই ছেলেবেলার মুখখানি মনে পড়ছে।"

অমিয়া—"হ্যাঁ পিসিমা তখন আমি ১৩।১৪ বৎসরেরই ছিলাম—এখান থেকে যাওয়ার পর মা জিদ্ ধরলেন আমার বিয়ের জন্য, তারপর আমার বিয়ে হল। তোমার একটী নাত্‌নীও হয়েছে।"

নয়নতারা—"তোমার মেয়েটীর কি নাম রেখেছ?"

অমিয়া—"নাম সবিতা, ডাকি সবি বলে।"

নবতারা—"বেশ মেয়েটী তোমার। তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায়? কবে বিয়ে হল জানতেও পারি নি।"

অমিয়া—আমার শ্বশুর বাড়ী এখান থেকে ৮।৯ মাইল দূরে একটু পাড়াগাঁয়ে।"

নয়নতারা—"পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে কিনা তাই তোমার মেয়েটী বেশ শান্ত হয়েছে।"

অমিয়া—"সহর, পাড়াগাঁ সব সমান পিসিমা সব সমান।"

নয়নতারা—"আর আমার মেয়ে সে ত ঘরের খবর কিছু রাখে না। দশের সেবা নিয়েই ব্যস্ত। কলেজে পড়া মেয়ে।"

অমিয়া অবাক হয়ে তার পিসিমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—"সেকি পিসিমা?"

নবতারা—"হ্যাঁগো। আজ দশদিন হ'ল কে একজন অসুখে পড়েছে—আমাকে জিজ্ঞাসা করলে 'যাব কিনা সেখানে।' আমার মত পেয়ে, তার সেবায় প্রাণ দিচ্ছে। সে লোকটী আমাদের কিন্তু কেউ নয়।"

অমিয়া—"বাড়ীতে থাকে না?"

নবতারা—"না গো না। বাড়ীতে থাকে না। তবে আর বলছি কেন?"

অমিয়া অবাক্ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে ভাবলে, তারপর পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, "বাড়ীতে থাকে না? কত বড় হয়েছে সে? ১৯।২০ বৎসর হবে না? আপনি একলা তাকে ছেড়ে দেন?"

নবতারা মনে মনে মেয়েকে যতই মন্দ বলুন না কেন—মেয়ের এই দেশ ও দশের সেবার কাজে খুবই গর্ব অনুভব করেন। তাই অমিয়ার কথাগুলি তাঁর ভাল লাগল না, বল্লেন, "তা আর কি করি বল। খুবই লক্ষ্মী, খুবই ভাল কাজ করছে। পরের উপকার করা, দেশের সেবা করা ভাল নয় কি?"

অমিয়ার ভাল লাগল না, বল্লে, "হ'ক বাপু ভাল কাজ? বয়স্থা মেয়েকে অমন ভাবে ঘুরতে দেওয়া আমার ভাল লাগে না।"

নবতারার অমিয়ার কথাগুলি ঠিক মনের মত হল না তাই বল্লেন, "আর কি সেকাল আছে মা। এখন ওসব করলে চলে না। যে খারাপ হবে সে ঘরে থাকলেও হবে। তাছাড়া রেবা আমার বেশ মেয়ে; পরের জন্য প্রাণ তার ফেটে যায়। মুখে আমি যাই বলি মনে মনে আমার খুবই আনন্দ হয়।"

অমিয়া—"যাই চল পিসিমা এরকম আমার বড় খারাপ লাগে।"

নবতারা—"আচ্ছা যাক্ ওসব কথা। সবি, তোর বাবার নামটা কি? জামাইএর নাম পর্যন্ত জানি না, কত লজ্জার কথা। কি করব বিয়েতে ত আমাকে আর খবর দেয় নি।"

অমিয়া—"হঠাৎ বিয়ে কিনা, তাই খবর পাও নি। তারপর মা মারা গেলেন, বাবা গেলেন—কে তোমাকে খবর দেবে বল?"

নবতারা—"রমেন যদিও আমার নিজের ভাই নয়, তবু কোন দিন সহোদর ভাই ছাড়া ছেলে বয়সে অন্য কিছু ভাবি নাই। আজ, আজ অদৃষ্টগুণে তোমরা যেন হয়ে গিয়েছ কত পর। হ্যাঁ, সবি, তোর বাবার নামটা কি রে?"

সবিতা—"বাবার নাম শ্রীসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।"

নবতারা—"কি? তোর বাবার নাম সময়?"

অমিয়া সভয়ে—"কেন পিসিমা? আপনি ওরকম করে উঠলেন কেন? তাঁর খবর জানেন নাকি? কিছু হয়েছে কি তাঁর?"

নবতারা—"এমন কিছু নয়, তবে একটা কথা বলতে পারিস্? কিছুদিন আগে তার কি কোন বিপদ ঘটেছিল? পড়ে টরে গিয়েছিল কি?"

সবিতা খুবই আগ্রহ সহকারে বল্লে, "হ্যাঁ দিদিমা। কিছুদিন আগে গায়ে কাটার দাগ ছিল, জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন 'গাড়ীর ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলেন একটী বাড়ীর কাছে। সেই বাড়ীর একটী লোক খুব সেবা যত্ন করে তাঁকে ভাল করেন। আর কিছু বলেন নি।"

নবতারা—চুপকরে থাকলেন দেখে অমিয়া ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "চুপকরে থাকলে কেন পিসিমা? কি হ'ল তোমার? তোমার ভাব দেখে আমার বড্ড ভয় হচ্ছে? তাঁর খবর কি কিছু জান?"

নবতারা—"ভাবছিলাম একটা কথা। কিছুদিন আগে একটী ছেলে এমনি ভাবে গাড়ীর ধাক্কায় আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে পড়েছিল। রেবা তাকে তুলিয়ে এনে কত সেবা, কত যত্ন করে ভাল করে। কিন্তু সেতো এ লোক নয়। রেবা কি পরিশ্রমটাই তার জন্য করেছিল? একদিন তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মুখ রেখেছিলেন। পরের ছেলে আমার খুবই ভাবনা হয়েছিল। মেয়ে আমার পাগলী কিনা—তাকে ভালকরে তুললে ঠিকই। তারও নাম ছিল সময়।"

অমিয়া মনে মনে খুবই রেবাকে প্রশংসা করলে, "ধন্য তুমি রেবা!" আর ভাবলে, "আমি এতদিন কি অন্যায় করেছি, কি অবিচারই করেছি।" খুব কৃতজ্ঞতার সহিত বল্লে, "পিসিমা, রেবা ও তুমি যাকে ভাল করেছিলে তিনিই তোমার জামাই। তোমরাই আমার জীবন রক্ষা করেছ।"

নবতারা খুবই আনন্দিত হলেন অমিয়ার কথা শুনে,

বল্লেন "এঁ্যা, সমর আমার জামাই ? যাক ভালই হয়েছে। ভগবান আমার পরিশ্রম স্বার্থক করেছেন।"

সবিতা—তার মাসীর গুণের কথা শুনে তাকে দেখার জন্য ব্যস্ত হল বল্লে, "মাসী কোথায় দিদিমা ?"

নবতারা—"সে আজ কয়েকদিন হল দিদি, একটী ভদ্রলোকের অসুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। বাড়ীতেও আসতে সময় পায় না লোক পাঠিয়ে আমায় খোঁজ খবর নেয়

অমিয়া—"পিসিমা, আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। আমি এখুনিই রেবার সঙ্গে দেখা করব। রেবা যেখানে আছে আমি সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করব।"

নবতারা—"বেশতো, যাওনা। দেখগে, রেবা কেমন কাজ করছে। আমি একদিন গিয়েছিলাম—দেখি, সে একটী পাকা গিন্নী হয়ে পড়েছে—সব কাজ করছে এক হাতে, কথা কইবার সময় পর্যন্ত পায় না।"

—"বল্লা রেবা তুমি ! এতদিন আমিই নারী-ধর্মকে অবহেলা করেছি।" অমিয়া নিজের মনে ভাবে।

নবতারা—"হ্যাঁরে অমি, তোর মেয়েটীকে বেশ লেখা পড়া শিখিয়েছিস ত ?"

অমিয়া—"কিছু শিখেছে—আমার ভুলের জন্যই ওর স্কুলে পড়া হয় নি, যা পড়েছে বাড়ীতেই উনি নিজে ওকে পড়াতেন—নিজে মাষ্টার কিনা।"

নবতারা—"গান শিখিয়েছ ? রেবা বেশ গাইতে পারে।"

অমিয়া—"মাষ্টার রেখে ত শেখান হয় নি তবে নিজের চেষ্টায় কিছু শিখেছে।"

নবতারা—"বেশ হয়েছে। খুব গান শুনবো।"

সবিতা—"আমার গান কি আপনার ভাল লাগবে দিদিমা ?"

নবতারা—"খুব ভালো লাগবে গো।"

সবিতা—"গান শোনালে কি দেবেন দিদিমা ?"

নবতারা—"দেবো ? দেবো তারি সুন্দর টুক্ টুকে একটী নাত জামাই।"

সবিতা—"যান্—তাহ'লে আমিও আর গান শুনাচ্ছিনা।" এমন ভাবে কথাগুলি বলল যাতে সবাই হাসতে লাগল। (ক্রমশঃ)

সাগর বলাকা

শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

[সোরিনের গ্রামের বাড়ীর খাবার ঘর। ডাইনে ও বাঁয়ে দুটো দরজা। পেছনে তাকে শুধু সাজান। মাঝখানে একটা খাবার টেবিল, পাশে একটা ছোট এটাচি-কেস ও বিছানা বাঁধা, মনে হচ্ছে কোথায়ও যাবার জন্য কেউ প্রস্তুত হচ্ছে। ট্রীগরিণ বেশ সকাল সকাল দুপুরের খাবার খেতে ব্যস্ত, মাসা টেবিলের এক পাশে দাঁড়ান।]

মাসা—আপনি একজন লেখক, তাই সব কথা খুলে বললুম। আপনার হয়ত কাজে লাগতে পারে। আমি ঠিক করে ফেলেছি, মন থেকে সমূলে এই ভালবাসা কেড়ে ফেলবো।

ট্রীগরিণ—তার মানে ?

মাসা—মেডভেডিনকোকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

ট্রীগরিণ—সেই ইস্কুল মাষ্টারটি না ?

মাসা—হ্যাঁ,

ট্রীগরিণ—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাসা—আর কীই বা করতে পারি ? এরকম নিস্বার্থ ভালবাসার কোন মূল্যই জীবনে নেই...বিয়ের পর এই

ভালবাসার কথা হয়ত মনেই আসবে না। নতুন ভাবে জীবন সুরু করে, তার মধ্যেই পুরনো দিনের স্মৃতিকে ভুলে যেতে চেষ্টা করবো।

ট্রীগরিণ—এ কেমন যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে না?

মাসা—কেন? (দুটি গ্লাসে ভড্‌কা ঢেলে নিয়ে) ও ভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি জানেন না অনেক মেয়েই আমার মত ভড্‌কা খেয়ে থাকে। (গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে) ঐ গ্লাসটা আপনার জন্য। সত্যি, আপনার মত ভাল মানুষ হয় না।

ট্রীগরিণ—আমার কেন জানি যেতে ইচ্ছে করছে না।

মাসা—বেশ তো থেকে যান না।

ট্রীগরিণ—সে হয় না, এরিন নিকোলেভিনা কিছুতেই থাকতে চাইবে না। তার ছেলে যা সুরু করছে। নিজেকে তো গুলিই ছুঁড়ে বসলো, আবার শুনছি আমাকে নাকি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে। কিন্তু, কেন বল তো? পুরনোর তো চিরদিনই নতুনের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে, এরজন্য ঠেলা ধাক্কা করে কী হবে?

মাসা—ঈর্ষা ছাড়া আর কী? যাকগে ওসব ব্যাপারে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না।

[জেকোভ একটা সুটকেস নিয়ে, ডান পাশ থেকে এসে বাঁ দিকে বেরিয়ে গেল। নীনা নিঃশব্দে ঢুকে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।]

মাসা—আমার সেই ইস্কুল মাষ্টারটি, খুব বুদ্ধিমান না হলেও বেশ ভাল মানুষ, আমাকে আন্তরিক ভাবে ভালও বাসেন। সত্যি তারজন্য আমার দুঃখ হয়, তার মাকেও আমার ভাল লাগে, যাকগে ওসব কথা, আপনার আবার যাবার সময় হয়ে এলো। (গভীর ভাবে হাত চেপে ধরে) আপনার বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ধন্য। আপনার বই আমাকে নিশ্চয়ই পাঠাবেন, তাতে আপনার নাম সই থাকা চাই কিন্তু—আর একটা অনুরোধ, "স্নেহাস্পদেষু" লিখবেন না যেন—লিখবেন, "এমন একজনকে, যার বেঁচে থাকার পেছনে কোন যুক্তিই নেই," আচ্ছা আমি তবে যাই।

[বেরিয়ে গেল]

নীনা—(তার সুঠাম হাতটা ছুঁয়ে করে ট্রীগরিণের সামনে তুলে ধরে) জোড় না বে-জোড়?

ট্রীগরিণ—জোড়।

নীনা—(হেসে) হলো না। একটী মাত্র বীচি আমার হাতে। আমি ভাবছিলাম, থেকে যাবো কী না? (কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে) আমরা এখনই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছি...আর কোনদিন দেখা হবে কী না কে জানে?... আমার অনুরোধ এই প্রতিমূর্তিটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করুন, এর একদিকে আপনার নাম, আর অন্যদিকে আপনার বইএর নাম 'দিবা ও রাত্রি'।

ট্রীগরিণ—কী চমৎকার? (মূর্তিটাকে চুমু খেল) সুন্দর উপহার।

মাসা—এটাই হয়ত আমাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবে।

ট্রীগরিণ—তোমাকে কোন দিনই ভুলতে পারবো না। সেই দিনটির কথা মনে পড়ে? ঘণ্টাখানেক আগে,... তুমি সুন্দর পোষাক প'রে ছিলে···আমরা কথা বলছিলাম আর সামনে একটা...সাগর বলাকা পড়েছিল।

নীনা—হ্যাঁ। (একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে কে যেন এদিকেই আসছে,...যাবার আগে যে করেই হোক আমার সাথে দেখা করবেন...

[বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর সাথে সাথেই ডান দিক দিয়ে মী একাদিন ও সোরিন এসে ঢুকলো, সোরিনের গায় তখনও রাত্রের পোষাক, তার পেছনে জেকোভ ব্যস্ত সমস্ত ভাব।]

মী—তুমি বাড়ীতেই থাক, তোমার কিন্তু রাত নিয়ে না যাওয়াই ভাল হবে। (ট্রীগরিণকে) এইমাত্র কে বেরিয়ে গেল? নীনা না?

ট্রীগরিণ—হ্যাঁ।

মী—তোমাদের অসুবিধা করলুম বলে দুঃখিত। (বসে) উঃ, আর পারছি না।

ট্রীগরিণ—(বইটার পেছন দিকটা পড়তে পড়তে) "দিবা ও রাত্রি' ১২১ পৃষ্ঠা, ১০ থেকে ১২ লাইন।"

জেকোভ—মাছ ধরার ছিপটাও তো সাথে নিচ্ছেন, না কর্তা ?

ট্রীগরিণ—হ্যাঁ, ঐটেতো নিতেই হবে, বইগুলো বরং রেখে যেতে পার। (কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে, নিজের মনে। "১২১ পৃষ্ঠার ১০ থেকে ১২ লাইন।" (মী একাদিনকে। আচ্ছা, আমার বইগুলো তোমাদের বাড়ীতে আছে না কী ?

মী—বাপার পড়ার ঘরে আছে বোধ হয়।

ট্রীগরিণ—১২১ পৃষ্ঠা··· (বেরিয়ে গেল)

মী—পেটার লক্ষীটি, তোমার কিন্তু বাড়ীতে থাকাই ঠিক হবে

সোরিন—তোমরা চলে যাচ্ছ, আমি একলাটি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

মী—সহরের আর কী বিশেষত্ব আছে।

সোরিন—বিশেষত্বের কথা তো হচ্ছে না, এখানকার এক ঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, কোথাও যাবার জন্ত মনটা হাপ্‌পাশ্‌ করছে। ন'টার সময় ঘোড়াগুলো তৈরী করে এখানে আনতে বলেছি, তার কিছুক্ষণ বাদেই আমরা রওনা হতে পারবো।

মী—(একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে) তুমি এখানেই থাক, যাতায়াতে তোমার আবার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ছেলেটার দিকে নজর রেখো, ওকে সব বুঝিয়ে বলো, তবেই ঠিক হয়ে যাবে। (একটু পরে) আজকেই চলে যেতে চাচ্ছে তাই কনষ্টান্টিন কেন হঠাৎ নিজেকে গুলি করে বসলো জানতে পারলুম না। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটার মূল কারণ ঈর্ষা, তাই ট্রীগরিণকে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবো ততই মঙ্গল।

সোরিন—এর আরও কারণ হয়ত আছে। এমনি একটি প্রতিভাবান যুবক, দেশের কোন এক প্রান্তে পড়ে আছে। অর্থ নেই, সম্মান নেই, ভবিষ্যত নেই। কীসের আশা নিয়ে সে জীবনকে গড়ে তুলবে। আমি ওকে খুব ভালবাসি, সেও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, তবু সে পরিষ্কার জানে অন্তের দয়ার উপর নির্ভর করে তাকে এখানে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

মী—আমি কী করতে পারি বল ? (চিন্তান্বিত ভাবে) ওর কোন চাকরি বাকরি করা উচিত···

সোরিন—(মীর কথার সুরে) আমার মনে হয় সব চাইতে ভাল হবে···তুমি যদি···ওকে কিছু টাকা দাও। প্রথমত ওর অন্তত ভদ্রলোকের মত কাপড় চোপড় তৈরী করতে হবে। দেখ তো, সেই তিন বছর থেকেই একই পোষাক গায় দিয়ে ঘুরছে, একটা ওভারকোট পর্যন্ত গায় নেই—(হেসে) ওকে এখন একটু বাইরে ঘুরে আসা উচিত। এতে আর তোমার তেমন কী খরচ হবে ?

মী—তবু···আচ্ছা, ওকে এখন নাহক্ একটা সুট গড়ে দেবো, কিন্তু বাইরে যাবার খরচ দেওয়া সম্ভব হবে না। ···না, এখন সুট গড়ার টাকাই বা দেবো কোথেকে ? (মন ঠিক করে) এখন আমার কাছে টাকা পয়সা একদম নেই। (সোরিন হাসতে লাগলো)

সোরিন—(মীর কথায় তাল দেবার ভান করে)··· সত্যি তাই !···তুমি আবার কিছু মনে করো না যেন।

মী—সত্যি আমার টাকা নেই।

সোরিন—আমার টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলে কোন কথাই ছিল না। (হেসে) আমার পেনসনের গুরো টাকাটাই সরকারের হাতে যাচ্ছে, সে খামারের কাছে তা খরচ করছে···এই হলো ব্যাপার।

মী—টাকা যে একেবারে নেই তা বলছি নে। ভেবে দেখতো আমি একজন অভিনেতা, শুধু মাত্র পোষাকের পেছনে আমার কত খরচ পড়ে !

সোরিন—তোমাকে আমি অবিশ্বাস করছি নে যেন··· আমার মাথাটা যেন ঘুরছে (টেবিলের পাশে ধরে) আমি কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছি।

মী—(সোরিনকে ধরে সামলাবার চেষ্টা করে)··· পেট্যা···(চীৎকার করে) কে আছ···এদিকে এসো। [ট্রীগরিণ এলো, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আর সাথে মিভভেডিনকো।]

মী—ও কেমন যেন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।

সোরিন—ও কিছু না...ও কিছু না...(মৃদু হেসে গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেল)...এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে।

মী—তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না, মা। এ তেমন কিছু সাংঘাতিক না। ওরকম মাঝে মাঝেই হয়। (সোরিনকে) তোমার কিন্তু এখন শুয়ে থাকা উচিত।

সোরিন—তাই যাচ্ছি।...না, না, আমি সহরে যাবই, ...একটুক্ষণ শুয়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...তারপর সহরে রওনা হবো।

[লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গেল, মেডভেডিনকো তাকে এক হাত দিয়ে ধরে ধরে নিয়ে গেল।]

ট্রায়েপ—তার পক্ষে এখন গ্রামে থাকা ঠিক হবে না। ওর সব সময়ই মন খারাপ থাকে। তুমি যদি ওকে পনেরো শ রুবল ধার দিতে তো, সে সারা বছরই সহরে থাকতে পারতো।

মী—এতো টাকা আমি পাবো কোথায়? আমি একজন অভিনেতা, ব্যাংকের মালিক না। [চুপচাপ]

ট্রায়েপ—মা, ব্যাণ্ডেজটা পালটে দাও। তুমি বললে দিলে সব চাইতে ভাল লাগে।

মী—(ওষুধের তাক থেকে, আয়ডিন, ব্যাণ্ডেজ নিল) ডাক্তারটা রোজই দেরী করছে।

ট্রায়েপ—সে দশটার মধ্যে আসবে বলেছিলো—আর এখন দুপুর গড়িয়ে চললো।

মী—এখানে বসো। (মাথা থেকে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে খুলতে) আমি চলে গেলে আবার ক্লিক্ ক্লিক্ করতে যেও না কিন্তু। (মাথায় চুমু খেল)

ট্রায়েপ—না, মা। সে ঐ দুর্বল মুহূর্তে হয়ে গেছে। পাগলামিতে পেয়ে বসেছিলো, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারিনি। (মার হাতটা টেনে নিয়ে) কী সুন্দর হাত! তুমি যখন কাজ কর তখন চমৎকার লাগে। জান মা তুমি ছাড়া এখন আমার কেউ নেই, তুমি কেন ঐ লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করো?

মী—তুমি জান না। ও সত্যি মহৎ লোক···

ট্রায়েপ—আমি যখন ওকে বন্ধে আহ্বান করেছি বলে ওরা জানালো, তখন তার মহত্ত্ব তো কাপুরুষতা থেকে বাঁচাতে পারেনি। সে পালিয়ে যাচ্ছে। হায়রে দুর্ভাগা।

মী—তুমি একটি বোকা। আমিই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

ট্রায়েপ—হায়রে সত্যিকার মহৎ প্রাণ! দেখ, তাকে নিয়ে আমরা এখানে ঝগড়া করছি, আর সে হয়ত বাগানে বসে আমাদের কথা ভেবে হাসছে...আর নীনাকে তার প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে বড় বড় কথার মারপ্যাচে।

মী- আমার সামনে ওসব বাজে কথা বলে কী আনন্দ পাও? আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, আমার সামনে তার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলো না।

ট্রায়েপ—কিন্তু আমি তো তাকে শ্রদ্ধা করি নে। তুমি চাও আমি যেন তাকে প্রতিভাবান ভেবে শ্রদ্ধা করি, আমাকে ক্ষমা করো সে আমি পারবো না। তার লেখা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।

মী—এ তোমার ঈর্ষা। ক্ষমতাহীন লোকেরা সত্যিকারের ক্ষমতাশালী লোকদের ব্যঙ্গ করতেই ভালবাসে।

ট্রায়েপ—(ব্যঙ্গসুরে) সত্যিকারের ক্ষমতাশালী! (রাগত ভাবে) তোমাদের সবার চাইতে আমার প্রতিভা অনেক বেশী! (মাথা থেকে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে) তোমরা ভাব, তোমরা যা করছ তাই সত্য, তাই শাশ্বত! আমি তোমাদের স্বীকার করি না—তোমাকেও না, তাকেও না।

মী—অশিক্ষিত কোথাকার!...

ট্রায়েপ—যাও, ফিরে যাও তোমার সেই মঞ্চে। আর যত সব বাজে বাজে নাটকে অভিনয় করে সুখে থাক গে।

মী—বাজে নাটকে আমি কখনও অভিনয় করি নে। আমায় একা থাকতে দাও! একটা নীরস কৌতুক-নাট্য লেখার ক্ষমতাও তোমার নেই। অমার্জিত, অশিক্ষিত কোথাকার!

ট্রায়েপ—কবুল যেন কোথাকার।

[ট্রায়েপ নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো]

মী—(চীৎকার করে) কেঁদো না বলছি...(ওর কপালে, মাথায় চুমু খেয়ে) তুমি কিছুতেই কাঁদতে পারবে না। বাবা আমার, সোনা আমার, তোমার অভাগা মাকে ক্ষমা করো।

ট্রায়েপ—(মাকে জড়িয়ে ধরে) শুধু তুমি জান, আমি সব হারিয়েছি। ও আমাকে এখন আর ভালবাসে না, আমি আর কোনদিনই হয়ত লিখতে পারবো না..... আমার সব আশা ওর সাথে সাথেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

মী—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেবো না। সে আমার সাথে চলে যাচ্ছে—ও আবার তোমাকে ভালবাসবে। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে।)

ট্রায়েপ—আমারও অনেক সময় তাই মনে হয়।... তুমি শুধু তার সামনে আমাকে যেতে বলো না, তাকে আমি সহ্য করতে পারি না.....

[ট্রীগরিণ ভেতরে এলো]

...এবার আমি যাই মা...ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে'খন।

[ব্যাণ্ডেজটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

ট্রীগরিণ—১২১ পৃষ্ঠার.....১৩ থেকে ১২ লাইন... (একটা বইয়ে খুঁজতে খুঁজতে)...এই তো (পড়ে) যদি কোনদিন আমার জীবনের প্রয়োজন হয়, গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না"।

মী—তোমার জিনিষ পত্র গোছান হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ?

ট্রীগরিণ—হ্যাঁ হয়েছে। (আপন মনে) একটা পবিত্র হৃদয় এমনি করে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে... অথচ আমার নিজের ভেতর এমনি দোটানা ভাব কেন ?..."যদি কোনদিন আমার জীবনের প্রয়োজন হয়, গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না।" (মী একাদিনকে) আর একটা দিন থেকে যাও না।

[মী একাদিন অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো]

ট্রীগরিণ—শুধু একদিন !

মী—প্রিয় আমার, আমি জানি কিসের আকর্ষণে তুমি এখানে থাকতে চাচ্ছ। মনটাকে আর একটু শক্ত কর।

ট্রীগরিণ—আমার বন্ধু হিসেবে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে চেষ্টা করো। (হাত ধরে) তুমি হয়ত আত্মত্যাগ করতে পারবে.....আমাকে ছেড়ে দাও।

মী—শেষ পর্যন্ত একটা গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়লে ?

ট্রীগরিণ—আমার মনে হচ্ছে, যা চাচ্ছিলাম তাই পেয়েছি। অনেক সময় মানুষ ঘুমের ঘোরে পথ চলে—এই যে আমি তোমার সাথে কথা বলছি, এও যেন ঠিক তেমনি, মানস চক্ষে সে ভাসছে আমাকে মুক্তি দাও।

মী—না, না,.. ...আমার সামনে ওভাবে কথা বলো না। আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলো না...উঃ অসহ্য।

ট্রীগরিণ—এমনিতর ভালবাসাই জীবনকে মাধুর্য-মণ্ডিত করে তুলে...যৌবনে সে সুযোগ আমার আসেনি, পত্রিকা অফিসে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়েছি...এতোদিনে তা আমার দ্বারে এসেছে...এবে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

মী—তোমাকে পাগলামিতে পেয়েছে।

ট্রীগরিণ—আমাকে তাই হতে দাও।

মী—উঃ তোমরা আমাকে মেরে ফেললে।

ট্রীগরিণ—আমি এতই কুৎসিৎ আর কদর্য যে, তুমি আমার সামনে অমন করে অন্য একটা মেয়ের কথা বলছো। (ট্রীগরিণকে চুমু খেতে খেতে) সুন্দর আমার প্রিয় আমার, আমার শেষ জীবনের সম্বল (হাঁটু গেড়ে বসে) তুমিই আমার আনন্দ, আমার গৌরব...(হাঁটু জড়িয়ে ধরে) তুমি ছেড়ে গেলে আমি একদিনের জন্যও সহ্য করতে পারবো না।

ট্রীগরিণ—কেউ এসে পড়বে। (হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করলো।)

মী—যাকে খুশী আসতে দাও—আমার ভালবাসার জন্য আমি একটুও লজ্জিত না, (হাতে চুমু খেয়ে) তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেবো না.....তুমি আমার...তুমি আমার...এই কপাল আমার, এই চোখ

আবার, এই সোনালী সুন্দর চুলগুলোও আর...তোমার সব কিছুই আমার...তুমি অথন অসুস্থ হয়ো না,...তুমিই তো বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক, রাশিয়ার একমাত্র ভরসা ...তুমি কলমের এক আঁচড়ে বিশেষত্ব পূর্ণ চরিত্রগুলোকে কেমন সুন্দর করে সৃষ্টি করে ফুটিয়ে তোলো, তোমার সবগুলো চরিত্রই জীবন্ত! তুমি ভাবছো এ তোমাকে শুধু মাত্র তোষামোদ করছি; আমার চোখের দিকে তাকাও তো,...আমি মিথ্যা বলছি, মনে হয়?...না না তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না...

ট্রীগরিণ—তোমাকে ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই...আমাকে নিয়ে চল, এসবের বাইরে নিয়ে চল, তোমার কাছ থেকে চলে যেতে দিও না...

মী—(আপন মনে) এখন সে আমার (সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে) তুমি ইচ্ছে করলে একদিন বেশীও থাকতে পার। আমি আজই চলে যাচ্ছি, তুমি পরে এসো...তেমন তাড়াতাড়ির কী-ই বা আছে? এক হপ্তার মধ্যে এলেই চলবে। [চুপ চাপ]

[ট্রীগরিণ তার নোট বইয়ে কী যেন লেখলো]

মী—ও কী লিখলে?

ট্রীগরিণ—আজ সকালে খুব সুন্দর একটা গল্পের ভাব মাথায় এসেছে।

সেমরিয়েড—(ঢুকে) অধীনের বিনিত নিবেদন এই যে, বাইরে ঘোড়া তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে। ষ্টেশনে রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। ট্রেণ দুটো পাঁচে পৌছয়। এরিণ নিকোলেভেনা, আপনার কাছে আর একটি নিবেদন, আপনি অনুগ্রহ করে যদি খোঁজ নেন, অভিনেতা সোজভালটুসেভ এখন কোথায় তবে বাধিত হবো...সে কী এখনও বেঁচে আছে? চমৎকার অভিনয় করে কিন্তু...আপনি কী বলেন? আপনার এতো ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এখনও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন...

[যখন তারা কথা বলছিল, তখন জেকোভকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা গেল। মী একাদিনকে বারে বারে এসে টুপি, কোট, দস্তানা আনিয়ে দিচ্ছিলো। সকলেই মী একাদিনকে পোষাক পরতে সাহায্য করতে লাগলো। পলিন এনড্রিয়েভনা তার পেছনে সোরিণ ও মেড-ভেডিনকো এসে ঢুকলো।]

পলিন—(একটি প্যাকেট হাতে দিয়ে) নিন আপনাদের পথে খাবার জন্য কেক্—খেতে কিন্তু চমৎকার! ইচ্ছে করলে এখনই খেয়ে দেখতে পারেন।

মী—সত্যি, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো!

পলিন—তবে বিদায়। যদি কোন অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। (কাঁদতে লাগলো)

মী—(তাকে আদর করে) সব ঠিক আছে। কোন ত্রুটি হয়নি—শুধু এখন তুমি কাঁদতে পারবে না।

পলিন—আমাদের সময় চলে যাচ্ছে।

মী—তুমি তার কী করতে পার বল?

সোরিণ—(গায় ওভার কোট, মাথায় টুপি, লাঠীতে ভর করে করে বাঁ দিক দিয়ে ঢুকলো) বোন, সময় হয়ে গেছে। তাই নইলে ট্রেণ পাবে না, এই হলো ব্যাপার। আমার গাড়ীতেই আমি যাচ্ছি। (বেরিয়ে গেল)

মী—তবে আসি, না?...বেঁচে থাকলে আবার সামনের গ্রীষ্মে দেখা হবে (জেকোভ এসে হাতে চুমু খেল) আমাকে ভুলে যাস্‌নে। (জেকোভকে একটা রুবল দিয়ে) তোদের সবার জন্য দিয়ে গেলাম।

জেকোভ—আমরা আপনার কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি। এবার ভালোয় ভালোয় গিয়ে পৌছন, তবেই হয়।

সেমরিয়েড—আপনার চিঠি পেলে আমরা আনন্দিতই হবো, বিদায়, বোরিস এলিকসেভিচ্।

মী—কনস্টানটিন কোথায়? তাকে বল আমি চলে যাচ্ছি।

[সকলেই বেরিয়ে গেল। মঞ্চ শূন্য। পেছন থেকে অনেকে এক সাথে যাবার শব্দ হচ্ছে]

ট্রীগরিণ—(ফিরে এসে) আমার ছড়িটা ফেলে গেছি। এদিকে কোথাও হয়ত আছে (বেরিয়ে যাবার

:—আপনার সাথে দেখা করার জন্যই পেছনে ছিলাম (উত্তেজিত ভাবে) বোরিস এলিকসেভিচ, আমি ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত করে ফেলেছি, মকে যোগ দেবো। আগামী কাল আমি আর এখানে থাকছি না, বাবাকে ছাড়ছি, সব কিছু ছেড়ে নতুন ভাবে জীবন সুরু করবো... মস্কোতেই যাবো ঠিক করেছি, ওখানেই আমাদের দেখা যাবে।

ট্রীগরিন—(চারদিকে সচকিত ভাবে সেলভিনেস্কি বাজারে গিয়ে উঠো...পৌঁছেই খবর দিও...গ্রোকলেসকির বাড়ী,...মনে থাকবে তো...আমার আবার একটু তাড়া আছে

নীনা—আর এক মিনিট...

ট্রীগরিন—(নীচু স্বরে) তুমি কী সুন্দর...আবার আমাদের হবে, ভেবে কী আনন্দই না হচ্ছে। (নীনা ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো) এই সুন্দর চোখ দুটো, এই মধুর হাসিটি, এই স্বর্গীয় পবিত্রতা, সবই আবার নতুন করে পাবো।...প্রিয় আমার। (প্রগাঢ়চুম্বন)

পর্দা পড়লো

(আগামী বারে সমাপ্য)

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুইখানি কাব্যগ্রন্থ—

কুটীরের গান—মূল্য ১৷৷০

এই বইয়েরই কবিতা 'রাতভিখারী' রবীন্দ্রনাথ কৃত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে' স্থান পেয়েছে।

মোহিতলাল—"এই 'কয়টি কবিতা আমার ভাল লেগেছে—'মহাকাল', 'বেহুলা' 'আজ শরতে' 'গাঁয়ের স্বপনে ভুলি'।...আজ শরতে' কবিতাটী সবচেয়ে ভাল লাগল।.....'মহাকাল' কবিতাটীতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য ফুটেছে।

নিশান নাও—মূল্য ১৸০

"গৃহে গৃহে আজ দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়াও,
হাঁক দিয়ে বলো
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।"

যে কবিতাগুলি একদিন জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে সেইগুলির সমষ্টি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ১বি, রসা রোড, ভবানীপুর।

বস্ত্র সঙ্কট :—ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই মিলের কাপড়ের অভাব দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে অন্ন ও বস্ত্র দুটোই হ'ল প্রধান। আজ দেশের সর্বত্র এই দুটোরই অভাব। ভারতবর্ষ কাপড়ের দিক থেকে প্রায় স্বাবলম্বী; এমন কি বহু কাপড় ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। কাজেই বর্তমান বস্ত্রসঙ্কট খুব স্বাভাবিক কারণে ঘটেনি। মজুরদের ধর্মঘট বা ষ্ট্রাইকের ফলে কাপড়ের উৎপাদন গত বছরে অনেক কম হ'য়েছে। তার জন্য অবশ্য বর্তমান গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মিল মালিকদের দুর্নীতি ও অসততা এর জন্য দায়ী। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিও এর মধ্যে অনেক আছে: প্রত্যেক মিলকে তার উৎপন্ন কাপড়ের এক তৃতীয়াংশ কাপড় স্বাধীনভাবে খোলা বাজারে বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে, আর দুই তৃতীয়াংশ কাপড় সরকারী বরাদ্দ অনুসারে বণ্টন করার নির্দেশ আছে। কিন্তু স্বাধীনভাবে বিক্রয় করার এক তৃতীয়াংশ কাপড় প্রায়ই খোলা বাজারে না গিয়ে চোরা বাজারে এবং এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশী ঐ অনুমতির ফাঁকে চোরা বাজারে চলে যায়। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি হ'ল এখানে।

এত সময় যা বললাম তা ভারতের সব প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থা অন্য প্রদেশের চেয়ে গুরুতর। বাংলা দেশের বাজার থেকে মিলের কাপড় প্রায় লোপ পেয়েছে। সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী মাসে ১৭,৫০০ গাঁইট কাপড় পশ্চিম বাংলার জন্য বরাদ্দ করা ছিল। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের আসার ফলে কয়েক লক্ষ জন সংখ্যার বৃদ্ধি পেয়েছে; কুচবিহার পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আরও ৮৭ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর কাপড়ের জন্য মাসিক বরাদ্দ দাঁড়িয়েছিল ১৮,৬০০ গাঁইট। তার মধ্যে ১৪,৫০০ গাঁইট মিলের কাপড় এবং ৩,১০০ গাঁইট তাঁতের কাপড়। গত বছর কাপড়ের উৎপাদন কম হওয়াতে পশ্চিম বাংলার মিল বস্ত্রের বরাদ্দ কমিয়ে ১২,৪০০ করা হয় কিন্তু কার্যতঃ পশ্চিম বাংলা সরকার ৮ হইতে ১০ হাজার গাঁইট কাপড় পাচ্ছিল।

হঠাৎ এইভাবে কাপড়ের বরাদ্দ এতখানি কমান যুক্তিসংগত হ'য়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি বস্ত্র উৎপাদন এই পরিমাণে হ্রাস পেয়ে থাকে তা হ'লে উৎপন্ন বস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ স্বাধীনভাবে বিক্রয় করার অনুমতি অনেক পূর্বেই প্রত্যাহার করা উচিত ছিল। কাপড় ও লোহার বরাদ্দ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উপর চোখ রাখার জন্য একটি বিশেষ অর্দ্ধ-পুলিশ জাতীয় বিভাগ তৈরি করা হ'য়েছে। অতএব ইহা আশা করা যায় যে, কাপড়ের চোরা বাজার সম্বন্ধে সরকারের কিছুটা খবর অন্ততঃ থাকবে। অন্যান্য সব প্রদেশে চোরা বাজারের জন্য অনেক লোককে জেলে আবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আজ পর্যন্ত চোরা কারবারের জন্য কোন লোককে জেলে আবদ্ধ করা হয় নাই। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, বহু কাপড় বরাদ্দ অনুযায়ী বণ্টিত হয় না, যায় চোরা বাজারে; আর যে এক তৃতীয়াংশ

পেড অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় খোলা বাজারে যাওয়ার কথা প্রায় সবই যায় চোরা বাজারে। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদারই চোরা বা ভেবে মাল যোগান দেয়। অথচ পশ্চিম বাংলা সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করছেন না যতদিন পর্যন্ত সরকার চোরা বাজার বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করবেন এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করবেন ততদিন পর্যন্ত বস্ত্র সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। চোরা কারবারের উদ্যোক্তাদের প্রতি সরকারের এই কোমল মনোভাব জনসাধারণের মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদ্রেক করে।

বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে পশ্চিম বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি বস্ত্রসঙ্কট সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে মাইতি মহাশয়ের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হবে। কতকটা যেন অদৃষ্ট ও দৈবের কাছে অসহায় ভাবে আত্ম-সমর্পণ করার মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁর মন্ত্রী-গিরি চালাচ্ছেন। তাঁর দেখা উচিত মাথা পিছু কত গজ কাপড় পশ্চিম বাংলার জন্য বরাদ্দ করা হ'য়েছে; অন্য প্রদেশের মাথা পিছু বরাদ্দের চেয়ে যদি পশ্চিম বাংলার বরাদ্দ কিছু কম হয় তা হ'লে মাইতি মহাশয়ের ও পশ্চিম বাংলা সরকারের তা মেনে নেওয়া গুরুতর অপরাধ ব'লে আমরা মনে করি। দ্বিতীয়তঃ বরাদ্দ কাপড়ের চেয়ে ইদানিং যে কমতি করা হ'য়েছে, তা অন্য প্রদেশের তুলনায় সঙ্গত হয়েছে কিনা তাও পশ্চিম বাংলা সরকারের বিচার করা উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ যে কাপড় বাংলা দেশের জন্য বরাদ্দ আছে তা যাতে ঠিক ভাবে বন্টন করা হয় এবং তার কোন অংশ যাতে চোরা বাজারে না যায় তার ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব। এই তিনটার কোন একটা সম্বন্ধেই পরিষদের সভ্যদের বা দেশবাসীকে নিকুঞ্জবাবু বিন্দুমাত্র আশ্বাস দেন নাই। আমরা মনে করি মন্ত্রীপদের দায়িত্ব বোধের অভাবের পরিচয় ভিন্ন এতে আর কিছুই নেই। আমাদের যতটা মনে পড়ে অন্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বাংলার জন্য মাথা পিছু কাপড়ের বরাদ্দ কম। এটা বাড়ানর চেষ্টা পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর করা উচিত। পশ্চিম বাংলার কলে প্রতিমাসে যে কাপড় তৈরি হয়—তার এক তৃতীয়াংশ প্রায় ২ হাজার গাঁইট কাপড় খোলা বাজারের নামে চোরা বাজারে যায় কিনা এবং গেলে তা রোধ করা সম্ভবপর কি না—তা খেয়াল করাও পশ্চিম বাংলা সরকারের দায়িত্ব।

ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি :—বহুদিন পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবার ব্যবসায়ী যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। এই নূতন চুক্তিতে পাকিস্তানী মুদ্রার পাকিস্তান-নির্দিষ্ট মূল্য মেনে নেওয়া হয়েছে। এই একটা বিষয়ের প্রতি সাধারণের নজর বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়াতে এই বাণিজ্য চুক্তির ব্যবসায়ের দিকের প্রতি লোকের নজর উপযুক্তভাবে আকৃষ্ট হয়নি। একথা আমরাও মানছি যে প্রায় ১৮ মাস মুদ্রা বিনিময়ের ঝগড়া চালিয়ে তারপর পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া ভারতের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত শুধু জেদ বা সম্মান বোধের বশবর্তী হ'য়ে জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রথমে যখন মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হ'য়েছিল তখন সিংহল ও পাকিস্তানের সঙ্গে তেমন ভাবে পরামর্শ করা হয়নি। একথা আজ বলা চলে যে, সেই সময় ভারত সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার উপর অনেকটা বেশী পরিমাণে নির্ভর ক'রে পাকিস্তান ও সিংহলকে উপেক্ষা করেছিলেন, যদিও ঐ উভয় দেশের সঙ্গেই ব্যবসায়ী ও আর্থিক সম্বন্ধ ভারতের অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। যে রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপ দিয়ে পাকিস্তানকে কাবু করা সম্ভব ছিল তা গত বছর এপ্রিল মাসের বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা নষ্ট করা হ'য়েছে। এর পরও ভারত সরকারের আশা ছিল আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (International Monetary Fund) দিয়ে পাকিস্তানের মুদ্রা মূল্য আমাদের অনুকূলে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে। ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ এই আশা নিয়ে

৬।৭ মাস পূর্বে প্যারীতে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার অধিবেশনে গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর মনোকোণের প্রকাশ পেয়েছিল; কিন্তু তখনও তিনি আশা ছাড়েন নি। ভারত সরকারের ও তাঁর মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে এই আশা পোষণ করা বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

পর পর এ ক'টা ভুলের জের টানা হ'ল গত অক্টোবর মাসে। এপ্রিল মাসের বাণিজ্য চুক্তির কতম হওয়ার পর পাকিস্তানের তরফ হ'তে নূতন চুক্তির প্রস্তাব যখন এল তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই প্রত্যাখ্যান করার মূলেও ছিল বৃটেন ও আমেরিকার সদিচ্ছার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ঐ দুই দেশের বা প্রকৃত পক্ষে আমেরিকার খাস তালুক। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক হয়, তা বৃটেন বা আমেরিকার কখনও অভিপ্রেত নয়। এই সহজ কথাটা যদি ভারত ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই বুঝতেন তা হ'লে এই দুই দেশের সম্পর্ক এমন তিক্ত হ'ত না। তখন যদি নূতন বাণিজ্য চুক্তি করা হ'ত তা হ'লে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের কষ্টের কিছু লাঘব হ'ত এবং উভয় রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের অনেকটা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা কম হ'ত। একথা ঠিক যে আজকের এই চুক্তি ৫।৬ মাস পূর্বে করা উচিত ছিল এবং করলে উভয় রাষ্ট্রেরই মঙ্গল হ'ত কিন্তু তখন করা হয়নি ব'লে সেই ভুলকে বরাবর টেনে চলতে হবে, এটা বিচার-সহ কথা নয়। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকার ফলে কয়লার অভাবে পাকিস্তানের রেল ষ্টীমার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং অপরদিকে পাট ও তুলার অভাবে ভারতের দুটা প্রধান ইণ্ডাষ্ট্রী—পাটের কল ও কাপড়ের কল—বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'য়েছিল। দেশ-ব্যাপী যে বস্ত্রসঙ্কট দেখা দিয়েছে তারও মূলে হ'ল তুলার অভাব অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকায়।

এই নূতন চুক্তিকে আমরা সেজন্য সমর্থন ক'রছি। বাণিজ্য চুক্তিকে বাণিজ্যের দিক থেকেই দেখা উচিত; রাজনীতির দিক থেকে যথাসম্ভব একে বিচার না করা ভাল। গত বছর এপ্রিল মাসে বাণিজ্য চুক্তি করার সময় রাজনৈতিক বিচারের হয়ত অনেকটা কারণ ছিল; কিন্তু তখনই যখন রাজনৈতিক হিসাব রাখা হয়নি, আজ রাজনৈতিক হিসাব এনে বাণিজ্যকে বন্ধ করা গুরুতর অন্যায়। উভয় রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ থাকার ফলে মুষ্টিমেয় ধনপতি জাতীয় রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক কোটি টাকা একমাত্র পাট ব্যবসায়ে উপার্জন ক'রেছে। বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা আছে তাদেরই; জনসাধারণের দিক থেকে এই চুক্তির বিরোধিতা করার কোন কারণ নেই। আমরা মনে করি এই চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের দিক থেকে এই চুক্তিকে বিচার ক'রে আমরা কি পাই তা নিম্নে দেখাচ্ছি।

কলকাতার চটকলগুলো বহুদিন যাবৎ পুরোদমে কাজ করছিল না। তাদের শতকরা ১২৯ টি তাঁত পাকা-পাকি ভাবে বন্ধ আছে এবং সপ্তাহে মাত্র ৫২৯ ঘণ্টা ক'রে বাকী তাঁতে কাজ চলছিল অথচ আজ পাট-উৎপন্ন চট প্রভৃতির এমন চাহিদা যে বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের পাটকলগুলি অবিশ্রান্ত ২৪ ঘণ্টা কাজ ক'রে যাচ্ছিল। পাকিস্তান থেকে পাট না পাওয়ার জন্যই আমাদের পাট কল গুলোকে পঙ্গু ক'রে রাখা হ'য়েছে, শ্রমিকরা বেতন কম পাচ্ছে; বিদেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি কম হচ্ছে এবং তার ফলে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা ডলার আমরা কম উপার্জন করছি এবং ভারতের সর্বপ্রধান ইণ্ডাষ্ট্রী চিরদিনের জন্য নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম হ'য়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি অবস্থা হ'য়েছিল ভারতের অপর একটি প্রধান ইণ্ডাষ্ট্রী কাপড়ের ব্যাপারে। এই চুক্তির ফলে কাঁচা পাট ও তুলা আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাব, যা দিয়ে আমাদের কলগুলোকে চালু রাখা সম্ভব হ'বে। এমনি ক

একটি আমাদের রপ্তানির মাল ছিল চামড়া। কাঁচা চামড়া বেশীর ভাগই পাকিস্তান হ'তে আসত, তা আমরা এখানে ট্যান ক'রে রপ্তানি করতাম এবং চামড়া দিয়ে তৈরী মালও অনেক রপ্তানি হ'ত। তারপর খাদ্যশস্য এই চুক্তির একটি বিশেষ বিষয়। খাদ্যশস্যের জন্য আমরা বিভিন্ন দেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং যে-কোন মূল্যে তা কিনবার জন্য তৈয়ারী ছিলাম। পূর্ব-বাংলার চাউল, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুর গম হাতের কাছে থাকতে বুভুক্ষু নর-নারীকে খাদ্যে বঞ্চিত রাখা মানবতার দিক থেকে অমার্জনীয় অপরাধ। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে যে মূল্যে খাদ্যশস্য আমদানী করতাম তার থেকে সস্তায় পাকিস্তানে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে; উপরন্তু দূরদেশ থেকে আনার খরচ ও সময় দুই বাঁচবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা আর্থিক হিসাবে অখণ্ডিত ও একাত্মক। রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অর্থনীতিও বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে—এমন মনে করা অত্যন্ত ভুল। এখনও উভয় বাংলা পারস্পরিক আর্থিক স্বার্থে জড়িত। পূর্ববাংলা হ'তে মাছ, চাল, নারিকেল, সুপারি, ঘনে, আদা, প্রভৃতি সাধারণ গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য বহু দ্রব্য পশ্চিম বাংলায় আসত। উভয় বাংলার বাণিজ্য বন্ধ থাকার ফলে ঐ সব জিনিসের দাম পশ্চিম বাংলায় অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে এবং চাহিদার অভাবে পূর্ব বাংলায় দাম অসম্ভব ক'মে গিয়েছে। ফলে উভয় বঙ্গের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বেড়েছে। এখন আশা করা যায় এই নূতন বাণিজ্য চুক্তির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের মূল্যের সমতা সাধিত হবে। পশ্চিম বাংলার উৎপন্ন দ্রব্য, যেমন কাচ ও চীনা বাসন, সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি পূর্ব-বাংলায় বহু আমদানী হ'ত। ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ থাকাতে পশ্চিম বাংলার ঐ সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রীর যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছিল। মাদ্রাজের তাঁতের উৎপন্ন লুঙ্গি বহু পরিমাণে পূর্ব-বাংলায় রপ্তানি হ'ত। এই সব ছোটখাট জিনিসের লেন দেন এখন ছাড়পত্রের (O. G. L.) লিষ্ট অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

পশ্চিম বাংলার প্রয়োজনের দিক থেকে এই লিষ্টের মধ্যে আরও কিছু নাম সংযোজিত হওয়া উচিত। তার মধ্যে আমরা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করতে চাই—প্রসাধন দ্রব্য, গেঞ্জী, কাচের ও চীনা বাসন প্রভৃতি। আমরা আশা করি পশ্চিম বাংলা সরকার ও ব্যবসায়ী-মণ্ডলী চেষ্টা করলে খোলা ছাড়া পত্রের লিষ্টের মধ্যে এসব নাম সংযোজিত করিয়ে নিতে পারবেন।

এই চুক্তি অনুযায়ী লেন দেনের প্রধান বিষয়গুলি হ'ল ১৯৫২ সালের জুন মাসের ভিতরে ৩৪ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট, ১৬ লক্ষ টুকরা কাঁচা চামড়া, প্রায় ৮ লক্ষ টন চাউল ও গম এবং কাঁচা তুলা যথা প্রয়োজন—পাকিস্তান হ'তে ভারতে আসবে; আর এর পরিবর্তে ভারত পাকিস্তানকে দেবে ১১ লক্ষ টন কয়লা, ২৬ হাজার টন কাঁচা লোহা, ৪৩ হাজার টন ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, ১ লক্ষ টন সিমেন্ট, ২০ হাজার টন সরিষার তৈল, ১১ কোটী গজ বস্ত্র, ১৫ হাজার গাঁইট সুতা, ৬২ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি। ভারতবর্ষ যে সমস্ত মাল নেবে তার মূল্য পাকিস্তানের রপ্তানী মালের চেয়ে ৫০ কোটী টাকা বেশী। এর অর্থ এই নয় যে পাকিস্তান বে-কায়দায় পেয়ে ভারতকে বাধ্য করছে এত বেশী মাল কিনতে; এর অর্থ হ'ল, পাকিস্তানের কাঁচা মালের প্রয়োজন আমাদের অত্যন্ত বেশী। যে ৫০ কোটী টাকা বেশী পাকিস্তানকে দিতে হবে তার পরিবর্তে ঐ সব দ্রব্যের উৎপন্ন মাল বিদেশে বিক্রি ক'রে আমরা অনেক বেশী লাভবান হব।

বর্তমান কোরিয়া যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান মুদ্রার মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে;—কারণ আজ সব দেশই বিশেষ ক'রে আমেরিকা বহু কাঁচা মাল সংগ্রহ ক'রে মজুত করছে। তাই পাকিস্তানী মুদ্রার চাহিদা বেড়েছে। এটা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় হ'ক এবং আমাদের হিসাবের ভুল যতই এতে প্রমাণিত হ'ক—একে অস্বীকার করা যায় না। তাই আজকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বাজারে পাকিস্তানী মুদ্রার তাদের নির্ধারিত মূল্যই স্বীকার করতে হবে।

উপরে যা বলা হ'ল, তা থেকে বোধ হয় এটা পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিক থেকে বাণিজ্য চুক্তির প্রয়োজন ছিল। আমরা একথা মানছি যে, ৪।৬ মাস পূর্বে এই বাণিজ্য চুক্তি হ'লে ভারতবর্ষ অনেক সুবিধাজনক সর্ত পেত। এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল কাঁচা পাটের পর্যাপ্ত আমদানি। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে চুক্তি করলে পাট পাওয়া যেত মণ প্রতি ৩৫ টাকা দরে, আর এখন সেই পাট কিনতে হবে ৭০ টাকার উর্ধ্বে। শুনা যায় পাট কলের মালিকদের পক্ষ হ'তে তখন ভারত সরকারকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, পাকিস্তানের পাট ব্যতীতই কলকাতার কলগুলো কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। পাট কল সমিতির সভাপতি (একজন ইংরেজ) ভারত সরকারের পক্ষে পাটের নিয়ন্ত্রক (Jute Controller), কয়েকজন দেশী ও বিলেতি পাটকল মালিক ভারত সরকারকে এতদিন পাটের বিষয় যে পরামর্শ দিয়েছে তার ফলে আজ শতাধিক কোটী টাকা ভারতের লোকসান হয়েছে; কয়েকজন ধনপতি পাট ব্যবসায়ী কোটী কোটী টাকা লাভ করেছে আমরা মনে করি অবিলম্বে তাদের হাত থেকে ভারতের ব্যবসায়িক নীতি মুক্ত করা উচিত। একজন পাট ব্যবসায়ীকে পাটের নিয়ন্ত্রক রাখা অত্যন্ত গর্হিত হ'য়েছে। এ ব্যবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন আবশ্যক।

রেলের বাজেট :—রেলের আগামী বছরের বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা হ'য়েছে এবং একথা ধরে নেওয়া যায় যে তা পাশ হ'য়ে যাবে: এই বছরে রেলে মোট উপার্জন হবে প্রায় ২ শত ৮০ কোটী টাকা। রেলের কাজ চালানর জন্যে মোট খরচ হবে ১ শত ৮৭ কোটী, ক্ষয়-পূরণ ভাণ্ডারে (Depreciation Fund) রাখা হবে ৩০ কোটী। রাষ্ট্রের সাধারণ ধনভাণ্ডারে দেওয়া হবে প্রায় ৩২½ কোটী। ইহা ব্যতীত ছোট খাট কিছু কিছু খরচ আছে, তার দরুনও ৬।৭ কোটী টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া নূতন কাজের জন্য এবং যাত্রীদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য কয়েক কোটী টাকা খরচ হবে; এর পর কিঞ্চিদধিক ২ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকত যদি রেলের ভাড়া বাড়ান না যেত। তাই এই বাজেটে সর্বশ্রেণীর-ই রেলের ভাড়া বাড়ানর প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্ষয়-পূরণ ভাণ্ডারে বরাবর ১৫ হতে ১৭ কোটী ক'রে টাকা রাখা হত কিন্তু চলতি বছরে তা বাড়িয়ে ৩০ কোটী করা হ'য়েছে এবং আগামী বছরের জন্যও ৩০ কোটী টাকা ধরা হ'য়েছে। সরকার পক্ষের যুক্তি হ'ল এই যে, প্রতি বছর ঐ ভাণ্ডার থেকে ৩০।৩৫ কোটী টাকা খরচ করা হয়; যদি বছরে মাত্র ১৫।১৬ কোটী টাকা সেই ভাণ্ডারে জমা রাখা হয় তা' হলে আগামী ৪।৫ বছরের মধ্যেই ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। অবস্থা যদি এই হয়, তা হ'লে ঐ ভাণ্ডারে অন্তত ৩০ কোটী ক'রে টাকা দেওয়া নিতান্তই উচিত। ১৯৪৯-৫০ সালে ঐ ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হ'য়েছিল ১১½ কোটী টাকা; ৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটী টাকা; তার পর হঠাৎ তাকে বাড়িয়ে ৩০ কোটী করা হ'ল। অথচ এই টাকা নির্দিষ্ট করার পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বসান হ'য়েছিল এবং তাতে সুপারিস ছিল অন্যূন ১৫ কোটী টাকা ঐ ভাণ্ডারে রাখতে হবে। এই সংখ্যা নির্দিষ্ট করার পূর্বে কর্তৃপক্ষের হিসাব করা উচিত ছিল কি পরিমাণ টাকা বছর বছর ঐ ভাণ্ডার থেকে উঠান হয়। ভারতের সমগ্র রেল লাইনে (ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের রেল লাইন সমেত) বোধহয় মোট ৯০০ কোটী টাকার মত মূলধন ন্যস্ত আছে। বড় বড় কারখানায় যে হিসাবে ক্ষয় পূরণ তহবিলে টাকা রাখা হয়, সেই হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় রেললাইন সমূহের জন্য ৩০ কোটী টাকা ক্ষয় পূরণ ভাণ্ডারে রাখা মোটেই বেশী নয়।

সরকারের সাধারণ তহবিলে যে টাকা দেওয়া হয় তাও মূলধনের হিসাবে। রেল লাইন নির্মাণের সমস্ত খরচ ভারতের সাধারণ রাজস্ব তহবিলে দেখান হ'য়েছে এবং এর বেশীর ভাগ টাকাই কর্জ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। এই কর্জের জন্য সাধারণ রাজস্ব হ'তে সুদও দেওয়া হয়।

তাই ৮০০ কোটী টাকার উপর শতকরা ৪ টাকা হারে এই টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হ'য়েছে। ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য সমূহের রেল লাইনগুলি অল্প কিছুদিন হ'ল সরকারের আয়ত্তে এসেছে।

রেলের যা আয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্ক হ'ল নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া থেকে ও মালের ভাড়া থেকে। মালের ভাড়া থেকে পাওয়া যায় বছরে ১৪৩ কোটী টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের থেকে পাওয়া যায় ১০০ কোটী টাকা। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের থেকে পাওয়া যায় মাত্র ১৫ কোটী টাকা। অথচ সুখ সুবিধার দিক থেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য প্রায় কিছুই নেই, আর যা কিছু ব্যবস্থা আছে সবই উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য। এবার যে ভাড়া বাড়ানর প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রতি মাইলে ২৪ হ'তে ২৭ পাই; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ১৪ হতে ১৬ পাই; মধ্যম শ্রেণীর জন্য ৯ পাই থেকে ১০½ পাই এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ৫ পাই থেকে ৬ পাই ও ৩ পাই থেকে ৪ পাই বাড়ান হ'য়েছে।

রেলের কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে জীবন যাত্রার খরচ প্রায় তিন গুণ বেড়েছে কিন্তু রেলের ভাড়া সেই পরিমাণে বাড়েনি কাজেই সামান্য কিছু ভাড়া বাড়ান রেল বিভাগের পক্ষে অন্যায় হবে না। এটা হ'ল বিভাগীয় নৈয়ায়িকের যুক্তি কিন্তু মানুষের জীবন ন্যায় শাস্ত্রের হিসাবে চলে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী যারা তাদের জীবন যাত্রা আজ দুর্বহ হ'য়ে উঠেছে, আর বেশী বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপালে তারা সইতে পারবে কিনা তা বিচার করা সকলের আগে দরকার। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া প্রায় শতকরা ২৫ টাকা বাড়ান হ'য়েছে কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া সেই তুলনায় অনেক কম বাড়ান হ'য়েছে। এর পক্ষে যুক্তি দেখান হ'য়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া আজ যে স্তরে আছে তাতে আর ভাড়া বাড়ালে আয় বাড়বে না বরং যাত্রী সংখ্যা কমে আয় কমতে থাকবে। তাদের এ যুক্তি হয়ত কতকটা সত্যি কিন্তু তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, রেলে প্রথম শ্রেণী কোনদিনও খরচের অনুপাতে আয় দেয়নি। অথচ বহু গাড়ী তাদের জন্য আটকা থাকে; এই অবস্থায় প্রথম শ্রেণী রাখবার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রথম শ্রেণী উঠিয়ে দিলে যে পরিমাণ যায়গা খালাস হবে তাতে তৃতীয় শ্রেণীর ভীড় অন্ততঃ কতকটা পরিমাণ লাঘব হবে। প্রথম শ্রেণীতে লাভ না হলেও ঐ শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার প্রচুর ব্যবস্থা রেলে থাকে; অথচ যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের থেকে প্রচুর লাভ হয় তাদের সুখ সুবিধার প্রতি উপযুক্ত নজর দেওয়া হয় না, রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই হ'ল প্রধান অভিযোগ।

রেলের ভাড়া বাড়াবার পূর্বে রেল পরিচালনার খরচে মিতব্যয়িতা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় রেলেও ক্রমাগত খরচ বেড়েই চলেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় রেলের উপার্জন ছিল ১০৭ কোটী টাকা। রেল লাইনের খরচ ছিল ৬৯ কোটী টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে উপার্জন হয়েছে ২২৫ কোটী টাকা এবং খরচ হয়েছে ১ কোটী টাকা। এর অর্থ দাঁড়ায় এই দশ বছরে উপার্জন বেড়েছে শতকরা ১৩২ আর খরচ বেড়েছে শতকরা ১৮৭। ১৯৩৯-৪০ সালে উপার্জনের তুলনায় খরচ ছিল শতকরা ৩৪ টাকা; ১৯৪৯-সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮০। এ থেকে বুঝা যায় যে কি হারে খরচের পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

রেলের কর্ম কুশলতার একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তার কয়লার খনির পরিচালনায়। রেল কর্তৃপক্ষের হাতে ১১টা কয়লার খনি আছে, তার মধ্যে ৮টায় প্রতি বছর লোকসান হয়। বে-সরকারী কয়লার খনির ১টন (২৭ মন) কয়লা তুলতে গড়ে খরচ পড়ে ১০৲ টাকা হ'তে ১৪৲টাকা কিন্তু রেলের ঐ ৮টা কয়লার খনিতে ১টন কয়লা তুলতে খরচ পড়ে প্রায় ২৩৲টাকা। কয়লার যে নির্ধারিত আছে সে অনুসারে হিসাব করলে ঐ ৮টা খনিতে প্রতি বছর অন্যূন ১ কোটী টাকা লোকসান হয়। এটা যে কত বড় লজ্জার ব্যাপার তা হয়ত রেল কর্তৃপক্ষ

বুঝতে পারেন না, কারণ সংশোধনের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না।

রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে বলতে গেলে পশ্চিম বাংলার স্থানীয় ২।১টি ব্যাপার উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না। বঙ্গ বিভাগের ফলে উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলা প্রায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। আসামের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। আসাম ও উত্তর বঙ্গের ঐ সব জেলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কোন সরাসরি যোগাযোগ কার্যতঃ নেই; রেলের যোগাযোগ করতে হ'লে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কাটিহার দিয়ে নূতন রেল লাইন করা হ'য়েছে। অতি অল্প সময়ের ভিতর যা ক'য়েছে তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়নি। এর বহু ত্রুটি আজ ধরা প'ড়েছে; শিলি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের বহু অসুবিধা হচ্ছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতিও যথেষ্ট হচ্ছে। আবার কলিকাতার নিকটে বারাসাত, বসিরহাট রেললাইন অতি আদিম যুগের রেল লাইনে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। শোনা যাচ্ছে, রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত ক'রেছেন ঐ রেল লাইন তুলে দেবেন এবং ঐ অঞ্চলে কোন নূতন রেল লাইন না ক'রে মটর বাস দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হ'বে। ওটা একটি সীমান্ত অঞ্চল, পাকিস্তানের সংলগ্ন কলকাতার নিত্যকার প্রয়োজনীয় বহু মাছ তরকারি ঐ অঞ্চল হ'তে রোজ আসে। তদুপরি কয়েক লক্ষ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ওর আশে পাশে বসতি স্থাপন ক'রেছে, কাজেই এই অঞ্চলে রেল লাইন রাখা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। আশা করি রেল কর্তৃপক্ষ পশ্চিম বাংলার দিক থেকে রেলের এই দুইটি বিষয় জনসাধারণের সুবিধার দিক থেকে সত্বর বিবেচনা করবেন।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের যা করা উচিত ছিল তার অনেকটাই করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের রেল লাইনে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে হাজার খানেক উদ্বাস্তুকে নেওয়া হ'য়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অধিকাংশই কুলি শ্রেণীর বা প্রায় কুলি শ্রেণীর। দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর উপযুক্ত বহু শিক্ষিত যুবক উদ্বাস্তুদের মধ্যে আছে, তারা যে বিশেষ কোন সুবিধা পেয়েছে তা আমাদের মনে হয় না। চিত্তরঞ্জন কারখানায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে ব'লে আমরা শুনি নি। আমরা মনে করি এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কার্য সরকারের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আশা করি এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ সত্বর মনোযোগ দিবেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই পাকে। —বরাভ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুষ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

[illegible] উচ্চ

—ডা. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৮ম সংস্করণ

সরস্বতী লাইব্রেরী ৫ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

পরিচয়

ত্রয়োদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৫৭ | দ্বাদশ সংখ্যা

কুটির উৎপাদন কেন?

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

পূর্বানুবৃত্তি

আরেক একটি কথা বিচার করার আছে। কুটির-উৎপাদনের প্রতি গান্ধীর এই যে আগ্রহ, তা কি কেবলই ভারতের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে? না, মনের সত্যতার বৃহত্তর সমস্যার সমাধানের পক্ষেও এর কোন উপযোগিতা আছে? এই প্রবন্ধেই প্রথমে যন্ত্র-উৎপাদনের কতকগুলি দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি। কারখানা উৎপাদন ও বিরাট যন্ত্র মানুষের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করতে চায়, তার ব্যক্তিগত সৃজনী শক্তির কোন বিশেষ মূল্য এর মধ্যে নেই;—যন্ত্রের ও যন্ত্র-বিশারদের তাঁবেদারী করাই তার পক্ষে একমাত্র পন্থা উন্মুক্ত থাকে। সাম্যবাদের আদর্শ সামনে রেখেও সোভিয়েট রুশিয়াতে শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। ২৭-২৮ সালে কারখানায় শ্রমিকদের যে কর্তৃত্ব ছিল, কারখানা পরিচালনায় তাদের যে অধিকার ছিল, ৩৪-৩৫ সালে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে কারখানার অধিনায়কের (director এর) সর্ব-কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। কারখানার কারোর কাছে অধিনায়ক দায়ী নন; কিন্তু সবাই তাঁর কাছে দায়ী; তাঁর হুকুমই সেখানে আইন। গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় থেকে রুশিয়ার কারখানার অধিনায়কের সর্ব-কর্তৃত্ব আরও বাড়ছে। ধাপে ধাপে এই সর্ব-কর্তৃত্ব নেমে এসে এক দুর্বহ আমলাতন্ত্র কারখানার মধ্যে স্থাপিত হ'য়েছে। জটিল যন্ত্রের ও বিরাট কারখানার চাপে এ হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক।

গান্ধী একাধিকবার বলেছেন—তিনি যন্ত্রের উচ্ছেদ চান না, যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ চান। যন্ত্র আমাদের সেবক, সে যেন আমাদের প্রভু হ'য়ে না বসে। তিনি এ-ও বলেছেন মানুষের শ্রমকে লাঘব করার উপায় হিসাবে যন্ত্রকে তিনি বরণ করতে রাজী আছেন; কিন্তু মানুষের শ্রম যেন এমন ভাবে লাঘব করা না হয় যে বহু মানুষ বৃত্তিহীন বেকার হ'য়ে পড়ে। যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি, যন্ত্র তার শ্রমিকদের সৃজনী শক্তি নষ্ট করে। আর শ্রমিকদের স্বাধীন সত্তা নষ্ট করে, বহু শ্রমিকদের বেকার করে; বহু শ্রমিকদের তাদের শ্রম-লব্ধ সম্পদ হ'তে বঞ্চিত ক'রে মুষ্টিমেয়ের হাতে সমস্ত সম্পদ তুলে দেয়, উৎপাদন করে কেন্দ্রীভূত পাইকারী হুকুমে—কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ (distribution) করে কাপণ্যের সঙ্গে শীর্ণ ধারায়, যার ফলে বৃহত্তর ও দরিদ্র প্রদেশ সমূহ

উৎপন্ন দ্রব্য পাচ্ছে না; পল্লী অঞ্চল থেকে সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় ক'রে চড়া দরে ঐ কাঁচা মাল হ'তে উৎপন্ন দ্রব্য পল্লীর কাছে বিক্রয় করে, যার ফলে পল্লী ক্রমে শোষিত হ'চ্ছে,—পল্লী আজ রিক্ত, বৃত্তিহীন ও বিত্তহীন।

সমস্ত যান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ লোকায়ত্ত বা সমাজীভূত করলে এই সব দোষ ত্রুটির অনেকটা অপসৃত হ'তে পারে। রুশিয়ার এই ২৫ বছরের চেষ্টায় আশানুরূপ ফল হয়নি দেখে, অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে। রুশিয়ার পথপ্রদর্শকই এই বিষয়ে চরম কথা ব'লে যেমে নিয়ে তার বাস্তবতাকে সাম্যবাদী গঠন প্রয়াস বজ্জন করার যুক্তি ব'লে গ্রহণ করা আমরা পছন্দ করি না। তবে এও ঠিক, যে মতের কথাই ধরা যাক, থিওরী বা নীতি হিসাবে তা যতই নিখুঁত দেখাক না কেন, তাকে কাজে পরিণত করতে গেলে ঠিক থিওরীর বা নিছক নীতির প্রতিচ্ছবি পাবেনা বাস্তবের স্পর্শ অনেকখানি তার মধ্যে আসবে। তার জন্য সমস্ত থিওরীকে বজ্জন করা ভুল। একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার—মানুষ যুগে যুগে এক একটা রামরাজ্য বা স্বর্গ রাজ্য বা আদর্শ ব্যবস্থার কল্পনা নিয়ে মেতে ওঠে। ঐ কল্পিত আদর্শ ব্যবস্থা চিরদিনই মানুষের হাতের নাগালের বাইরে থেকে যায়। ঠিক যেমন দিকচক্রবাল চিরদিনই মানুষের অনধিগম্য থেকে যায়। ঐ আদর্শ ব্যবস্থায় যে সে পৌঁছাতে পারেনা—এখানেই হ'ল তার মনুষ্যত্বের প্রেরণা। মানুষ চির অ-তুষ্ট আর দেবতারা হ'ল চির তুষ্ট। তাই দেবতারা তাঁদের স্বর্গ আঁকড়ে প'ড়ে আছে; আর মানুষ পৃথিবীর বুকে নিত্য নিত্য স্বর্গ সৃষ্টি করছে—আর ভাঙ্গছে—আবার গড়ছে।

সামাবাদ দিয়ে যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার কল্পনা গান্ধীর মনেও এসেছিল। ৩৪ সালে তিনি বলেছেন "এ একটা নূতন পরীক্ষা; ইহা কতদূর কৃতকার্য হবে, আমি জানিনা। যদি এই পরীক্ষা জোর জবর-দস্তির ওপর নির্ভর না করত, তবে আমি একে সানন্দে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ এর পেছনে রয়েছে জোর;—তাই আমি জানিনা, ইহা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।" "It is a new experiment. How far it will ultimately succeed, I do not know. If it were not based on force, I would dote on it. But to-day since it is based on force, I do not know how far and where it will take us."

(Cent per cent Swadeshi P. 104)

গ্রাম উদ্যোগ পত্রিকায় (জুন ১৯৪৫) তিনি ঐ কথাই আবার লিখেছেন "আমি আশা করি রুশিয়া বিস্ময়জনক কিছু করবে। আমি একে একটা মস্ত সাফল্য মনে করব যদি রুশিয়ার চেষ্টার ফলে জাতীয় সম্পদ দরিদ্রের হাতে যায় এবং যদি সকলের শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সত্যিই এসব সম্ভব হয়, তবে আমাকে আমার বর্তমান অহিংসার ধারণা পরিবর্তন করতে হবে।

"I hope Russia will produce something wonderful···I shall consider it a great success if through it all wealth goes into the hands of the poor; and the mental and physical freedom of every person is at the sametime secured. And in that case, I will have to revise the present concept of Ahimsa")

মোটের উপর কতগুলি বৃহৎ ও মৌলিক ইণ্ডাষ্ট্রীতে যন্ত্র ও কলকারখানা রাখতে-ই হবে; আজকালকার বিশ্বের প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করবার জন্য অনেক ব্যবহার্য দ্রব্যের (consumer goods) উৎপাদনও যন্ত্রের সাহায্যে করতে হবে। এ সবই হবে লোকায়ত্ত সাধারণ সম্পত্তি ও সৃষ্টিমেয় সর-ভোগীর লাভের কোন পথ এতে থাকবে না। এর মধ্যে রুশিয়ার মত যন্ত্র বিশারদদের একাধিপত্যকে তেমন প্রশ্রয় না দিয়ে কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের অনেকখানি অধিকার রাখতে হবে। বিপ্লবের প্রথম যুগে ১০ সাল পর্যন্ত-ও রুশিয়ায় তা অনেকটা ছিল; কাজেই এটা একেবারে অসম্ভব, এমন মনে হবার কোন কারণ নেই। যে বাধা ও অসুবিধার জন্য রুশিয়া এই প্রথা বর্জন করেছে, তা অতিক্রম করার

পন্থা বের করতে হবে। কারখানাগুলি স্থানীয় প্রয়োজন ও উৎপাদন সুযোগ বিবেচনা ক'রে যথাসাধ্য দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে রাখতে হবে যাতে কাঁচা মাল আনা ও উৎপন্ন মাল বিতরণের দোমুখী যানবাহনের খরচ, শ্রম ও হাঙ্গামা যথাসাধ্য এড়ানো যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের দর যাতে দেশের সর্বত্তরের পক্ষে সমান হয়—সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য বর্তমান রুশিয়ার মত এমন বিরাট হবে না; এই পার্থক্য কমিয়ে যথাসাধ্য আয়ের সাম্য বজায় রাখতে হবে। গান্ধীর পরিকল্পনায় নিম্নতম আয় থেকে উচ্চতম আয় ১২ গুণের বেশী হতে পারবে না;—রুশিয়ার ৮০ গুণের তুলনায় এই ১২ গুণ খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু আরও কমান যায় কিনা—অর্থাৎ নিম্নতম আয় আরও বাড়ানো যায় কিনা তাও বিচার্য।

এই সব সতর্কী ব্যবস্থা করার পরও, যন্ত্রের পাশে পাশে কুটির উৎপাদন রাখতে হবে, গ্রামকে যথাসাধ্য স্বাবলম্বী রাখতে হবে। এবং কুটির উৎপাদনকে সহজ ও এর শ্রম লাঘব করার জন্য পরিবেশের কুটিরে চালানো যায়—বা সাধারণ গ্রামবাসীর সাধ্যায়ত্ত ছোট খাটো কল ও যন্ত্র প্রচলন করতে হবে। গান্ধী বলেছেন, "Simple tools and instruments and such machinery as save individual labour and lighten the burden of millions of cottages, I should welcome." তিনি এমনও বলেছেন—সম্ভব হ'লে গ্রামে গ্রামে তিনি বিদ্যুৎ-সরবরাহ করবেন,—যাতে বিদ্যুৎ দিয়ে গ্রাম আলোকিত হতে পারে এবং গ্রামের কুটির উৎপাদন সহজ হতে পারে।

গ্রাম কেন্দ্রগুলিকে সজীব ও প্রাণবান ক'রে তুলতে হবে,—উৎপাদন ও ইণ্ডাষ্ট্রীর সহিত গ্রামের যোগ রাখতে হবে। পূর্বে বলেছি গ্রামই হ'ল জাতির জনশক্তি ও প্রাণশক্তির গোলাঘর। এই গোলা-ঘর শূন্য হলে, জাতির অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়-ক্ষতি [wear and tear] পূরণ করার আর কোন উপায় থাকবে না। বর্তমান যান্ত্রিক কারখানা উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় জাতির এই গোলাঘর শূন্য হ'য়ে যাচ্ছিল। সমস্ত বিশ্বের মানব সভ্যতার পক্ষে এই এক সঙ্কট আসন্ন হয়ে আসছে; গান্ধীর রুশিয়ারী বাণীতে বিশ্বের চিন্তাশীলদের মন ঐদিকে ফিরছে। পূর্ব হ'তেই বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক ও শহরে অসুস্থতার দিকে মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল; গান্ধী কার্যকরীভাবে ও জোর ক'রে ঐ কথা বলায় অনেকের দৃষ্টি আজ বিশেষভাবে এইদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

যথেচ্ছ যান্ত্রিক উৎপাদন আজ জগতের পক্ষে এক বিপদ হয়ে উঠেছে। পরদেশ শোষণ ভিন্ন এই যথেচ্ছ যান্ত্রিক উৎপাদন চলতে পারে না। এই শোষণের ক্ষেত্র ক্রমে সঙ্কুচিত হচ্ছে, অথচ যান্ত্রিক উৎপাদনের শোষণে প্রতিযোগী ক্রমে-ই বেড়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধের ফলে জার্মেনী ও জাপান হয়ত কতক বছরের জন্য প্রতিযোগীর তালিকা হতে বাদ পড়েছে; কিন্তু ভারত ও চীন যান্ত্রিক উৎপাদনে শোষিতের পর্যায় থেকে শোষকের পর্যায়ে পা বাড়াচ্ছে। যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা-ও বেড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে কুটির উৎপাদনের বীর কর্মে বহু লোককে নিয়োজিত করা ভিন্ন উপায় নেই।

কুটির উৎপাদন প্রথা বজায় রাখার পক্ষে আর একটি যুক্তি গত যুদ্ধের সময় পাওয়া গিয়েছে। আজকালকার যান্ত্রিক যুদ্ধে কারখানা অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করা বিশেষ কঠিন নয়। সব দেশই ঐ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হ'তে এটা বুঝেছে যে কতিপয় শহরে বা ইণ্ডাষ্ট্রির অঞ্চলে জাতির সব উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত করলে শত্রুপক্ষ সহজেই তা নষ্ট করে দিতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ কারখানাকে বারে বারে এক অঞ্চল হ'তে অন্য অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার অনেক কাহিনী এই যুদ্ধে পাওয়া গিয়েছে। সেই হিসাবে ছোট ছোট কুটির ইণ্ডাষ্ট্রি শত্রুর গোলা-গুলির ও উড়োজাহাজের ধ্বংসকারী আক্রমণ হ'তে অনেকটা অব্যাহতি পায়। চীনকে বাধ্য হ'য়েই এই সময় সমবায় প্রথায় কুটির উৎপাদনের আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। গান্ধীজী বহু পূর্বেই (১৯২০) যেন বোমারু যুদ্ধের আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন—The mills may suffer destruction—

মিলগুলি ধ্বংস হ'তে পারে। গত মহাযুদ্ধের সুরুতে ইওরোপীয় দেশ সমূহের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এমনি যুদ্ধ যতদিন থাকবে, ততদিন কেবল মিল ও কল-কারখানার উপর নির্ভর করলে যুদ্ধের সময় ঠকতে হবে।

ভারত বা চীনের পক্ষে কুটির-উৎপাদন অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী দরকারী। এই দুই ঘনবস্তি দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর, দারিদ্র্য প্রায় সর্বব্যাপী, যান্ত্রিক উৎপাদন আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য,—অদূর ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত হবার সম্ভাবনাও কম; গ্রামে জনতা বহুলাংশে বেকার ও অর্ধবেকার। কৃষিজীবী লোকদের পোষণের পক্ষে বর্তমান কৃষি পর্যাপ্ত নয়। এই অবস্থায় অর্ধ-বুভুক্ষু, বেকার ও অর্ধ-বেকার, বৃত্তিহীন ও বিত্তহীন কয়েক কোটি জনতার একমাত্র সংস্থান হ'তে পারে কুটির উৎপাদনে। এমনি ব্যবস্থা না হ'লে সভ্যজগতের কৃষি-মূলক সমাজ স্বপর্যাপ্ত ও স্বাবলম্বী হ'তে পারে না। অবশ্য এমনি কুটির উৎপাদনের পরশ্রম শোষণ বন্ধ করা দরকার। সমবায় প্রথায় ও লোকায়ত্ত ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে কুটির উৎপাদনের সংস্থাগুলিকে চালাতে হবে।

আজ এক নূতন রকমের রাষ্ট্র দেখা দিয়েছে—যাকে বলা যায় সর্বাত্মক রাষ্ট্র (totalitarian state):—জাতির সর্বাঙ্গকে এই রাষ্ট্র আচ্ছন্ন করে রাখে। এই রাষ্ট্রের গ্রাস থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হ'লে উৎপাদনকে বিকেন্দ্র (difused) করা দরকার—সাধারণ মানুষের আর্থিক সত্তাকে রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে রাখা দরকার। থরোর মত হ'ল—সেই রাষ্ট্রই সব চেয়ে ভাল যে সব চেয়ে কম শাসন করে।* এই মত পুরাপুরি না মানলেও এই সর্বাত্মক রাষ্ট্রের গ্রাস থেকে আমরা সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে চাই। এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনদিন বিদ্রোহ করতে হ'লে, সাধারণ মানুষের স্বাধীন আর্থিক সত্তা বজায় রাখা দরকার; এর জন্যও গ্রাম গুলিকে কুটির উৎপাদনের ভিতর দিয়ে স্বাবলম্বী রাখা উচিত। বিশ্বের অনেক মনীষী আজ কুটির-উৎপাদনের এই প্রয়োজনীয়তা-ও স্বীকার করছেন।

সর্বশেষ কথা হ'ল—যান্ত্রিক উৎপাদনের পিছনে মানুষের মনে যে ভোগ ও বিলাসের অনুবৃত্তি tendency) রয়েছে, তাকে সংযত ক'রে একটা শান্ত, ধীর ও নির্লোভ জীবনের আদর্শও মানুষের সামনে রাখার প্রয়োজন আছে কিনা—তা-ও আজ বিচার করা দরকার। গত ২।৩ শতাব্দী ধ'রে মানবের সকল প্রয়াস যেন ধাবিত হচ্ছে এক-ই উদ্দেশ্যে—ভোগ ও বিলাসের নব নব সামগ্রী আহরণের চেষ্টায়। বিশ্বের ইতিহাসে এই জিনিস আজ নূতন নয়। এমনি এক একটা বুদ্ধিভ্রংশের পর-ই, মানব ইতিহাসে একটু মোড় ফিরবার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। যুগে যুগে যে ধর্ম প্রবর্তক ও সমাজ সংস্কারকগণ ত্যাগ ও নিস্পৃহ জীবনের বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাও ইতিহাসের দ্বৈববাদী ক্রমবিকাশের (dialectic evolution) প্রয়োজন সাধনের জন্যই। বুদ্ধ বা যিশু এমনি এক একটা যুগ সন্ধিক্ষণে এসে, উল্কার মতো ভোগের পথে ছুটছিল যে মানব, তাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে গেছেন। এই দুই মহাযুদ্ধের পর-ও কি মানুষকে হুশিয়ার ক'রে দিবার কোন প্রয়োজন আসে নি? এ কথাও অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই যে, যান্ত্রিক উৎপাদনের মারফৎ শোষণের প্রতিযোগিতাই হ'ল এই দুই মহাযুদ্ধের মূল কারণ। আজ একে সংযত ক'রে মানুষের বুদ্ধিকে অন্য পথে চালিত করা উচিত কি-না সে প্রশ্নের জবাব আমি দিতে চাই না কিন্তু কেবল মহাপুরুষের মনোভাব ব'লে, বিনা যুক্তিতে এই কুটির উৎপাদনের জীবন দর্শনকে উপেক্ষা করা-ও খুব সুবিবেচনার হবে না—কেবল এটুকু-ই বলতে চাই। বুদ্ধ বা যিশুর দৃষ্টান্ত দেওয়াতে, কেউ যেন মনে না করেন, তাদের পারলৌকিক তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছি; আমি তাঁদের ইহজগতের আচরণীয় কর্মনীতি ও জীবন-দর্শনের কথা মনে রেখে-ই ঐ তুলনা ক'রেছি।

আমাদের ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক গান্ধী ছিলেন ভারতের অবিসংবাদিত নেতা। একদিকে যেমন নেতা

* That government is the best that rules the least. —Thoreau

তাঁর খাম-খেয়াল মত কোন কর্মনীতি দেশের উপর আরোপ করতে পারেন না, তেমনি আবার নেতা কেবল-মাত্র ঘটনাচক্রের দাস নন। বাস্তবের ছাপ যেমন নেতার মনের উপর পড়ে, তেমনি নেতার মনের চাপ-ও বাস্তবের উপর পড়ে। ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার যে কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছিল, তা বাস্তব ও গান্ধীর মনোবৃত্তির পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আজ ফস ক'রে নেতৃত্বের আসন থেকে দেহাতীত গান্ধীকে যেমন টেনে ফেলতে পারিনা তেমনি ফস ক'রে এই কর্মপন্থাও বদলাতে পারিনা। অন্য পথে বিপ্লব হ'তে পারবে না, এমন দাবী আমি করছি না; কিন্তু ভারতের বিপ্লব-প্রয়াস এই ৩০ বৎসর যাবৎ কুটির-উৎপাদন ও অহিংস পথ-ই বেছে নিয়েছে। গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম-পন্থা বাদ দিয়ে ভারতের বিপ্লবের কথা কল্পনা করা আজ বাতুলতা। গান্ধী আজ মৃত; কিন্তু তবু-ও দেহাতীত গান্ধী-ই সমাজ বিপ্লব প্রয়াস চালিত করবেন। জীবিত রক্তমাংসের গান্ধীর স্থলে তেমনি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে মৃত গান্ধীর মর্মকথা। তাঁর নির্দিষ্ট পথ-ই ভারতে বিপ্লবের পথে থাকবে।

হয়ত কেউ বলবে—এ যেন অনিবার্য কল্পনা ক'রে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ। কিন্তু এ তা নয়। এই কর্ম পন্থা গত ২৫ বছরে তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। এই প্রমাণ আমরা পেয়েছি ঐ পথে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক বিপ্লব-ই সম্ভব। তাই শুধু খেয়ালের বশে বা অযৌক্তিক বিরাগের বশে, এই পন্থা ত্যাগ করতে যাওয়া হবে বিপ্লব-বিরোধিতা। অপর দিকে, কোন নীতিকে মনের যুক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দিয়ে গ্রহণ না ক'রে, কেবল লোক দেখানো রকমে গ্রহণ করলে, সাধারণত তাতে ব্যর্থতা-ই লাভ হয়। তাই বলছি অনুকূল মনোভাব নিয়ে, এই কর্মনীতি ও জীবন আদর্শকে বুঝতে হবে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তাকে গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক ও মানসিক মঙ্গল সাধনের পক্ষে, আমাদের আসন্ন সমস্যার পক্ষে এবং বৃহত্তর বিশ্বের গুরুতর সমস্যার পক্ষে কুটির উৎপাদন প্রথার উপযোগিতা যে আছে, তা আমরা দেখেছি। অন্য কোন পন্থার যে ঐ উপযোগিতা নেই, এমন দাবী ক'রে অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু আমাদের এই পন্থার যে সে উপযোগিতা আছে এটুকু আজ স্বীকার করতেই হবে।

শত্রু ও মিত্ররূপী ছত্রাক

অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

উদ্ভিদ জগতে যে সমস্ত উদ্ভিদ নিম্নস্তরের উদ্ভিদরূপে পরিগণিত হয়েছে তাদের সমাজকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নস্তরের উদ্ভিদ বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত উদ্ভিদকে যারা ফুল ফল কিছুই প্রসব করে না। শুধু ফুল ফল বলে নয়, এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিও পর্যন্ত থাকে না। ফুল ও ফলহীন এ-সমস্ত উদ্ভিদকে সাধারণতঃ বলা হয় অপুষ্পক ইংরাজীতে বলা হয় 'ক্রিপটোগামস্' (Cryptogams)। এই সমস্ত উদ্ভিদের গায়ে একপ্রকার গুঁড়ো পদার্থ জন্মে, তাদের বলা হয় 'স্পোর' (Spores), তা হতে নূতন গাছ জন্মায়।

বিরাট ফুল ফলহীন উদ্ভিদ সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হচ্ছে থ্যালোফাইটা (Thallophyta) বা 'সমাজদেহী'বর্গ, দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রাইওফাইটা (Bryophyta) বা 'মস'বর্গ, এবং তৃতীয় হচ্ছে টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) বা 'ফার্ণ'বর্গ। থ্যালোফাইটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ' ছত্রাক ও

(Fungi and Algae)।

কোলে সাবের গাদা, পচা খড়, বিচালী প্রভৃতির উপর ছাতা জন্মাতে দেখা যায়। তা ছাড়া ভিজে চামড়া, জুতা, পুরান অনেক দিনের চাটনী ও আচার, দোয়াতের কালী ও বাসী পাউরুটীর উপর ছাতা জন্মাতে সাধারণতঃ দেখা যায়। এগুলি কিন্তু উদ্ভিদ। এদের নাম ছত্রাক বা ফাঙ্গাস (Fungi)। আবার পুকুরের জলের উপর সবুজ রঙের সর পড়ে, ভিজে শানের উপর পিচ্ছিল সবুজ স্তরও জন্মে এও আমরা দেখে থাকি। এ গুলিও অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের নাম শৈবাল বা অল্গা (Algae)। ছাতা ও শৈবালের দেহের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট নাই—দেহজন্য উহাদের সমাঙ্গী-দেহী উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিভাগ থ্রাইওফাইটার অন্তর্গত উদ্ভিদ হচ্ছে 'মস'। বর্ষাকালে সাধারণতঃ দেওয়াল ও প্রাচীরের গায়ে, পুরাতন গাছের গায়ে সবুজ কার্পেটের মত একপ্রকার নরম উদ্ভিদ জন্মে। তাদের ক্ষুদ্র কাণ্ড ও পাতা আছে, কিন্তু তারা অপুষ্পক। তাদের নাম 'মস' (Moss) আর তৃতীয় বিভাগ টেরিডোফাইটার অন্তর্গত উদ্ভিদ হচ্ছে ফার্ণ। এই জাতীয় গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে, কিন্তু অপুষ্পক।

বর্তমান প্রবন্ধে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস আমাদের আলোচ্য বিষয়। যারা দূরবীণ অথবা ক্যামেরা ব্যবহার করেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যে অনেক সময় 'লেন্সের' উপর সাদা সরু সরু জালের মত একরকম জিনিষ জন্মায় —তখন তাঁরা বলে থাকেন যে 'লেন্সের' উপর ফাঙ্গাস জন্মেছে এগুলো সময় সময় এতো ঘন ভাবে জন্মায় যে দেখবার পথও অসুবিধা ঘটায়। তবে তাদের অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়। এই ফাঙ্গাস বা ছত্রাক সাধারণতঃ পচা জিনিসের উপর জন্মাতে ভালবাসে। এইজন্য পচা কাঠ, খড়, আর সারের উপর ছাতা জন্মাতে আমরা দেখি। এই সব ছাতার মধ্যে অনেক বিষাক্ত ও অনেক অবিষাক্ত আছে। অবিষাক্ত ছাতাগুলি অনেক দেশে আদরের সহিত আহারূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক ছাতা আমরা খালি চোখে দেখে থাকি, আবার অনেক ছাতা এত সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে যে, খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। সে ছাতাগুলি পরভোজী এবং গাছে জন্মায় ছত্রাকের দেহে সাধারণতঃ ক্লোরোফিল' থাকে না; ফলে তারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই তারা পরের নিকট হতে খাদ্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। এইজন্য ছত্রাক চিরকালই পরভোজী বলে আখ্যা পেয়ে আসছে। আবার কতকগুলি ছত্রাক আছে যেমন, লাইকেন (Lichens), তারা ঠিক পরভোজী নয়। এই জাতীয় ছত্রাক শৈবালের সহিত মিলিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, অর্থাৎ দুটি উদ্ভিদই পরস্পর পরস্পরকে বাঁচানোর জন্য তৎপর। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার নাম 'সিমবাওসিস্' Symbiosis)। এই ছত্রাক আবার বনজাত উচ্চস্তরের উদ্ভিদের শিকড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এই ভাবে ছত্রাক ও তার আশ্রয়দাতার একত্রে মিলিত ভাবে থাকার নামকে বলা হয় 'মাইকোর-হাইজা' (Mycorhyza)।

ছত্রাকের জীবন চরিত বর্ণনা করতে হলে প্রথমে তার দেহের বর্ণনা করা আমাদের প্রয়োজন। ছত্রাকের দেহ গঠিত হয়েছে বহু শাখা প্রশাখাময় সুতার জালের মত একটী আবরণী হতে। এই আবরণীকে বলা হয় মাইসিলিয়াম (Mycilium) এবং প্রতিটী সুতার মত আবরণীর শাখা প্রশাখাকে বলা হয় হাইফা (Hypha)। সাধারণতঃ হাইফা পচনশীল ও অপচনশীল দুই-ই হতে পারে। যখন অপচনশীল হয় তখন তার মধ্যে প্রটোপ্লাসম্ (Protoplasm) থাকে এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিক (Nucli) ও ভেকুল (Vacuoles) থাকে। এইরূপ মাইসিলিয়াম বা আবরণী সাধারণতঃ সিনোসাইট (Cœnocyte) নামে পরিচিত হয়। পচনশীল আবরণী বহু কোষে বিভক্ত এবং প্রতিটী কোষ এক কেন্দ্রিক, অথবা দ্বিকেন্দ্রিক অথবা বহুকেন্দ্রিক হয়। কোষ-প্রাচীর (Cell-wall) সাধারণতঃ সেলুলোজ দিয়ে তৈরী থাকে। কোষগুলির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ সঞ্চিত থাকে গ্লাইকোজেন ও তৈল-কণারূপে।

ছত্রাক বহু শ্রেণীর আছে। সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর ছত্রাককে পৃথকভাবে চারটী বিভাগের অন্তর্গত করা হয়েছে। যেমন, ফাইকোমাইসেটিস (Phycomycetes), এ্যাসকোমাইসেটিস (Ascomycetes) বাসিডিওমাইসেটিস (Basidiomycetes) এবং ফাঙ্গাই ইমপারফেক্টি (Fungi Imperfecti)। এই চারিটী স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্গত সকল ছত্রাকসমাজ। ফাইকোমাইসেটীস্ বিভাগের অন্তর্গত ছত্রাক যেমন; মিউকোর (Mucor), এই জাতীয় ছত্রাক সাধারণতঃ পচা চামড়া, বাসী পাউরুটী, দোয়াতের কালী ও পচা আচারের উপর জন্মায়। এ্যাসকোমাইসেটিস বিভাগের অন্তর্গত ছত্রাক হচ্ছে 'ইষ্ট' (Yeast), ইষ্ট সাধারণতঃ মদ, তাড়ি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। বেসিডিওমাইসেটিস্ বিভাগের অন্তর্গত ছত্রাক হচ্ছে এ্যাগারিকাস্ (Agaricus) বা ব্যাঙের ছাতা। এই জাতীয় ছত্রাক পচা গড়, বিচালী, সার এবং কাঠের উপর জন্মায়। এদের খালি চোখে দেখা যায়। কতকগুলি ছত্রাক আছে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণতঃ হয় পরভোজী। দেহের মধ্যে যেমন রোগ-বীজাণু প্রবেশ ক'রে এবং আমাদের দেহের পুষ্টিকর খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ ক'রে আমাদের সর্বনাশ সাধন করে, সেইরূপ পরভোজী ছত্রাকগুলিও গাছের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, গাছের আহার্য গ্রহণ ক'রে তাদের সর্বনাশ করে। আমাদের ক্ষেত্রে যেমন উপযুক্ত রোগে উপযুক্ত ঔষধ খেলে আমরা রোগের কবল হতে অব্যাহতি পাই, তেমনি ছত্রাকের কোন্ গাছে উপস্থিতি জানতে পারলে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে এইসব পরভোজী, অনিষ্টকারী ছত্রাকদের ধ্বংস সাধন করে উদ্ভিদদিগকে বাঁচান যায়।

এই সব অনিষ্টকারী ছত্রাক বহু ফলপ্রসূ উদ্ভিদের ধ্বংসসাধন করে; বহু উদ্ভিদ আছে যাদের শত্রু এই সব ছত্রাক। শত্রুরূপী ছত্রাক বহু প্রকার আছে এবং বিভিন্ন ছত্রাকের বিভিন্ন অনিষ্টলীলা হতভাগা উদ্ভিদের উপর ফলে। ছত্রাকের অনিষ্টকারীতার ইতিহাস বড় কম নয়। একবার সিংহল দ্বীপে কফি গাছে 'কফিরাষ্ট' নামে এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে বহু গাছের ক্ষতি হয়েছিল। আর একবার এই ছত্রাকের অকল্যাণে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একবার এই ছত্রাকের আক্রমণে আলুর ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল, যার ফলে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর একটী বিশেষ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, প্রায় ১০০ বছর আগে ইউরোপের উৎপন্ন সমস্ত আলু এবং রোপীত সমস্ত আলু গাছ 'ফাইটোপথরা ইনফেস্টানস' নামে এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ফলে ইউরোপের বহু স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিলো। বিশেষ করে আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়েছিল। বহুলোক খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছিল। কেননা তখনকার দিনে বহুলোককে আলুর উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে হ'ত।

তখনকার দিনে স্থানীয় অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী আলুর ফসল নষ্ট হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং নানা মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কেউ বলেছিলেন, কৃষকেরা ক্লোরীন তৈরী করে গাছে গাছে ছড়িয়ে দিক। কেউ মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমানে নব আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক আলোর জন্য এইসব উৎপাদন নষ্ট হতে বসেছে। আবার অনেকে বললেন, রাতে আলুর ক্ষেতে আলোর আগমনে এই সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটছে। এইসব ঘটনা এবং কাহিনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে আমরা বেশ বুঝতে পারি, সাগর পারের অধিবাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের চেয়ে কম ছিলেন না। তবে সকলে একই পর্যায়ভুক্ত নয়। অনেকে ভুল পথ ছেড়ে প্রকৃত পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন কাঁকা, অসঙ্গত, যুক্তিহীন কথা না বলে প্রকৃত গবেষণায় অনেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইরূপ একজন সত্যিকারের গবেষক ছিলেন—যাঁর নাম বার্কলি। তিনি নর্থাম্পটনের ধর্ম-যাজক ছিলেন। তিনি সব কিছু ত্যাগ এবং অস্বাভাবিকতার গণ্ডি ছেড়ে এসে প্রকৃত গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে-

ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণায় জেনেছিলেন যে, আলু এবং আলুগাছের নষ্ট হওয়ার মূলে আছে একপ্রকার ছত্রাক। তিনি পরে পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন, কি করে এই ছত্রাকেরা তাদের দেহের সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে সমস্ত আলু গাছকে বেষ্টন করে নষ্ট করে ফেলে। প্রথমে কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ বাকলের একথা বিশ্বাস করে নি; কিন্তু বহুকাল পরে তাদের এ অবিশ্বাস দূরীভূত হয়েছিল। এরপর উদ্ভিদনাশক ছত্রাকেরা তাদের দেহের সূক্ষ্ম অংশগুলো আলুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আলুর মধ্যস্থিত পুষ্টিকর খাদ্য শোষণ করে আলুকে অসার করে দেয়। এইভাবে আশ্রয়দাতা সর্বস্বান্ত হয়।

শুধু আলুর শত্রু এই ছত্রাক নয়—গমের উপর চরম শত্রুতা করতে এরা ছাড়ে না। গমের উপর যে সব ছত্রাকের আক্রমণ চলে তাদের বলা হয় 'হুইট্‌রাষ্ট'। ১৯০৪ এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ও কানাডায় দু' দু'বার এই ছত্রাক গমকে আক্রমণ ক'রে সমস্ত শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল। সিংহলে বহুবার কফির চাষ এরাই নষ্ট করেছিল। ফ্রান্সে এই ছত্রাকের হাত থেকে আঙুরক্ষেত্রকে রক্ষা করার জন্য ফরাসী সরকার বহু অর্থব্যয় করে থাকেন।

গম আক্রমণকারী ছত্রাকের নাম 'টিলেটিয়া কেরিজ'। এই জাতীয় আক্রমণকারীরা অদ্ভুত কৌশল ও চাতুরীর পরিচয় দেয়। গমকে তারা যখন আক্রমণ করে—বাইরে থেকে তখন কিছুই বোঝা যায় না যে, গাছগুলো ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত কিনা। কিন্তু বোঝা যায় তখন যখন একটী গমের বীজ টিপলেই দেখা যায় খানিকটা কালো গুঁড়ো বেরিয়ে আসে এবং গমের সারত্ব বলে যখন আর তাতে কিছুই থাকে না। কুসংস্কারের নাগপাশ হতে যখন পাশ্চাত্য জনসমাজ মুক্ত ছিলনা তখন জনসমাজ কর্তৃক ঘোষিত হল চাষের কুদৃষ্টি পড়েছে বলে গমের এই সর্বনাশ ঘটেছে। কিন্তু তাদের সে ভ্রান্তি কেটে গিয়েছিল, যখন ফরাসী পর্যবেক্ষক মঁসিয়ে টিলেট দেখিয়ে দিলেন যে, এই কালো চূর্ণ পদার্থ গমের উপর প'ড়ে তাদের এই ক্ষতি করে। আর যখনই এই কালো গুঁড়োর হাত থেকে গমকে রক্ষা করার পথ উদ্ভাবন হবে তখনই গমের সর্বনাশের পালা কেটে যাবে। টিলেটের নামানুসারে ঐ কালো চূর্ণবৎ ছত্রাকের নামকরণ হয়েছে "টিলেটিয়া কেরিজ"। উদ্ভিদের 'রাষ্ট' নামে একপ্রকার রোগ হয় এবং ছত্রাকের দ্বারা উদ্ভিদ সে রোগে আক্রান্ত হয়। ইংল্যাণ্ড—যাকে সভ্যতার উৎসভূমি বলা চলে—সেই দেশেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ এক সময় বলতো যে, লাল কুকুর ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করলে উদ্ভিদের ঐ রোগ হয় এবং তাই তারা লাল কুকুর মেরে ফেলতো। বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে ছত্রাক কর্তৃক আক্রান্ত উদ্ভিদদিগকে বাঁচানোর বহু প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছত্রাকের দ্বারা আমরা শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হইনা,—উপকারও পেয়ে থাকি। অনেক ছত্রাক আছে যারা আমাদের বহু রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান চিকিৎসা জগতে পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন নামে যে দুটী বিখ্যাত ঔষধ তৈরী হয়েছে, সে দুটী পেনিসিলিয়াম নোটেটাম ও ষ্ট্রেপটোমাইসাস্ পাহারোজেনাস্ নামে ছত্রাকের নিঃসৃত রস থেকে তৈরী হয়েছে। আরও অনেক প্রকার মানবকল্যাণকারী ছত্রাক আছে—তাদের উপকারীতাও স্বতন্ত্র। এস্পিউমা নামে একপ্রকার ছত্রাক আছে—মাছিরা এদের রীতিমত ভয় করে। ফলে মাছির হাত এড়ান যায় এই ছত্রাকের সাহায্য নিয়ে। ল্যামিয়া নামে আর একপ্রকার ছত্রাক আছে যা মশার শত্রু। বাঁধাকপিতে একপ্রকার পোকা হয়—যা বাঁধাকপিকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু 'এণ্টোমফথোরা' নামে একপ্রকার ছত্রাককে যদি বাঁধাকপিতে জন্মানো যায়, তাহলে সে ছত্রাক বাঁধাকপির উপর একটী স্তর তৈরী করে। ফলে সেই স্তর ভেদ ক'রে বাঁধাকপিকে নষ্টকরা বিশেষ কষ্টকর হয় পোকাদের। এক প্রকার শুঁয়োপোকা আছে—তারা শিম-উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতি করে, কিন্তু কর্ডাইসেপস্ জাতীয় ছত্রাকেরা তাদের কাছে বাধাসৃষ্টি ক'রে শিম উদ্ভিদকে বাঁচায়। তাড়ি ও মদে যে ইষ্ট পাওয়া যায়, সেই ইষ্ট নামক ছত্রাক হতে নানাপ্রকার ঔষধ তৈরী হয়। ভিটামিন "বি" ট্যাবলেট বা ঔষধের দোকানে পাওয়া যায় তার প্রধানতম উপকরণ এই ইষ্ট। ইষ্টচূর্ণ ও ইষ্টের বড়ি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেকারীতে যে পাউরুটী প্রস্তুত হয় তাও এই ইষ্ট দিয়ে তৈরী হয়। ইষ্টের দ্বারা পাউরুটীকে ফোলান হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকের বহুল ব্যবহার হয়েছে। ছত্রাক আজ মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে। বিষাক্ত, অনিষ্টকারী ছত্রাকদের অনিষ্টকর প্রবৃত্তিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। অদূরভবিষ্যতে মানবসমাজ এই নিম্ন স্তরের অকিঞ্চিৎকর, ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ সমাজের কাছ হতে যে আরও উপকৃত হবে এ আশা রাখে।

সিন্ধুর ডাক

কণপ্রভা ভাদুড়ী।

দশম পরিচ্ছেদ [পূর্বানুবৃত্তি]

দীর্ঘ দিন পরে, সূর্য আবার ফিরে এসেছে তার চির-প্রিয় আবাসভূমিতে। সেই চৌধুরী বাড়ী, সেই ভবানীর মন্দির, সেই কৃষ্ণসরু, সবই আছেন—শুধু নেই একজন, তিনি কমলা ; সূর্যর মায়ের চেয়েও বড় কাকীমা। কিন্তু তার বদলে আর একজনকে সে এ বাড়ীতে দেখতে পেল ; সে হচ্ছে তান্তী। আর একটী খবর সে শুনল, অরুণ দেশে ফিরে এসেছে ; সে এখন কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন নেতা। এখানে বিরাট সংঘ তৈরী করে বেশ ভালো ভাবে কাজ করছে। তবে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংঘ বৃটীশ সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হবার পর থেকেই, এবং উপযুক্ত নেতার অভাবে, ভেঙ্গে চুড়ে তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে। তাদের পার্টি অফিসের বড় ঘরটীতে এখন অবাঙ্গালী এক মহাজন লালা এসে কাপড়ের দোকান খুলে বসেছে। পাটের মণ যখন বারো টাকা থেকে আঠারো টাকায় ওঠে ; চাষীদের হাতে টাকা হয় কিছু ; তখন তারা লুব্ধ পতঙ্গের মত লালার দোকানের সামনে গিয়ে ভীড় করে দাঁড়ায় ; রঙীন একখানা ডুরে কাপড়ের জন্য, এক গজ সৌখীন ছিটের জন্য। দরিদ্র পাট-চাষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের অর্থ গিয়ে জমা হয় মহাজনের গদীতে ; তারপর সে চালান যায় সুদূর বোম্বাই প্রদেশের ব্যাঙ্ক তহবিলে। আর এদিকে নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-সম্প্রদায়, হেমন্ত আর শীতের ক'টী মাস একটু হেসে খেলে থেকে গ্রীষ্মের সুরুতেই এসে উপস্থিত হয় অভাব অনটনের সম্মুখে। তারপর বর্ষায় তাদের অবস্থা ; দারিদ্র্যের রুদ্র মূর্তি অবর্ণনীয়। যেবারে আউস ধানের ফসল ভালো হয় ; সেবারে দরিদ্ররা কোনও প্রকারে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখে ; আর যেবার আউষ ধান ভালো হয়না সেইবারই আসে মহামারী আর মৃত্যু। ম্যালেরিয়া আর আমশা, গ্রামকে গ্রাম উজার করে দেয়। চাষী ঘরের বউ ঝিয়েরা, আধেদাবাদী পাতলা ডুরে শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে ; কর্মহীন রান্নাঘরে নিঃস্ব উনুনের পাশে শুয়ে জ্বরে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপে। পুরুষেরা বিদ্রান্তের মত কচি পাট আর ধান ক্ষেতের ধারে ধারে হাতে লাঙ্গল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঠ তারা কিছুই মারে না, শুধু এই কচি চারা গাছগুলির ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালে ওদের অনাহার, মৃত্যুর বেদনা যেন অনেকটা লাঘব হয় বলে মনে হয়। একদিকে ঘরে ছেলে বউ না খেয়ে মরছে, বর্ষার জলে ঘরের চাল ফুটো হয়ে জল ঝরছে ; পাহাড়ী জলে কুঁড়ে আর সব্জীর ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ; বলদ বিক্রী করে চড়া দরে মহাজনী গুদাম থেকে ধান কিনছে ; ঢেঁকী ঘরে সাপখোপ বাসা বেঁধেছে, আর একদিকে আশা ; বিরাট আশা ; ধান ক্ষেতের শীর্ষে, আর পাট চারার সবুজ পাতায় কাঁপনে, সোনার আশা চাষীদের চোখের সামনে, সবুজ অক্ষরে লেখা যেন নতুন কথা। ওরা সযত্নে ধানক্ষেতের গোড়া থেকে আগাছা বাছে ; আর মনে মনে ভাবে ভাবনা কি ? এইত ধান ঘরে এলো বলে ; পাটও এল—এবার সকলেই পেট ভরে খেতে পাবে ; প্রাণে বাঁচবে। নতুন খড়ে ঘরে ছাউনী দোব ; আবার পাট বিক্রীর টাকাতে বলদ কিনবো ঢেঁকীশাল পরিষ্কার করবো ; সেখানে ধৌ কিয়েরা ধান ভানবে ; চিঁড়ে কুটবে ; ছেলেমেয়েরা খাবে হাসবে খেলবে"—মনে মনে প্রার্থনা করে, "হে মা কালী, বাবা বিশ্বনাথ ; হে খোদাতাল্লা, আমাদের ফসলের ক্ষেত পরমন্ত করঁ"—এই ত বাংলার চাষীদের

জীবন। এদের নিজেদের জমি প্রায় খুব কমই থাকে। সব জমিই অধিকাংশ চাষীরা জোতদারদের কাছে বন্ধকী থাকে—কেননা দেশে আকালের সময় চড়া সুদে জমি বন্ধক না দিয়ে ওদের কোনও উপায়ও থাকে না। এদের বেশীর ভাগই ভাগ-চাষী আর দিন মজুর। জমিতে অক্লান্ত খেটে দীর্ঘ দিন পর যখন ফসল ঘরে তোলার সময় হবে; তখনই জমীদার আর জোতদারের পাইকরা লাঠি নিয়ে এসে হাজির হবে আদির জন্য। মূর্খ চাষীরা ফসলের অর্ধেক ভাগ জমীর মালিককে দিয়ে আর অর্ধেক নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এইতেই তারা আনন্দে সকালে গীত গায়; রাত্রে সংকীর্তন করে গ্রাম তোলপাড় করে তোলে। ওরা ভালো মন্দ কিছুই বোঝেনা। ওদের সময় চিৎকার করে কাঁদে; আর সুখের সময় চিৎকার করে আনন্দ করে।

ওই মহাজনী কাপড়ের দোকানটির পানে চেয়ে সূর্যর মনে হোল তার গ্রামের সমস্ত চাষী সম্প্রদায়ের মৃত্যুবাণ লুকানো আছে ওই ছোট ঘরখানির মধ্যে। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই ঘরকে ও পাঠশালায় পরিণত করবে। বাংলার জনসাধারণের বিশেষ করে, পল্লী বাংলার মানুষের দারিদ্র্য আর অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ হোল, মুষ্টিমেয় ধনিকের জমিদারী শাসন; আর জোতদার মহাজনের রক্তচোষা নাগপাশ। এই নাগপাশ থেকে বাংলার চাষীকে মুক্তি দিতে না পারলে কোনও-দিনই বাংলার উন্নতি হবে না—বাংলার মধ্যবিত্ত চাষীর পেটের ভাত, পরণের কাপড়, শিক্ষার সংস্থান হবে না। কৃষকরাই হোল বাংলার প্রাণ। আর সেই কৃষকরাই জোত-জমা, হাল-বলদ খুইয়ে দিনে দিনে ভাগচাষী আর দিন মজুরে পরিণত হচ্ছে। সরকার কোন দিনই এদের দিকে নজর দেবেনা, কেননা তার রাজস্ব তো আর বন্ধ হচ্ছে না! সূর্যর মন শপথ করল; সরকারের দুর্নীতিকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। কৃষকদের বাঁচাতেই হবে। তারজন্য প্রয়োজন একটী সঙ্ঘ। ওই মহাজনকে তার পুরানো ঘর থেকে উঠিয়ে সেইখানেই ও প্রতিষ্ঠা করবে ওর নতুন সমিতি, আর প্রাথমিক পাঠশালা। গ্রামের ছেলে সূর্য গ্রামেই থাকবে। গ্রামই ওর প্রাণ।

কমলার মৃত্যুর পর থেকেই কৃষ্ণশরণ কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সূর্য উতলা হবে বলে বিনোদে ওকে এ খবর জানানো হয়নি। সূর্যকে কাছে বসিয়ে তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। একটা অব্যক্ত বেদনার পুঞ্জ চতুর্দিকে যেন একটা গভীর বেদনার স্তব্ধতা বিস্তার করে রেখেছে। তিনি খোলা জানালা দিয়ে বাঁশবনের পিছনে ভবানীর মন্দিরের স্বর্ণ চূড়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিলেন। সূর্যর মনে হোল, এ যেন ঠিক সেই বন্দী সম্রাট বৃদ্ধ শাজাহান। শাজাহানের প্রাণ ছিল "তাজমহল", আর কৃষ্ণশরণের প্রাণ হচ্ছে এই ভবানীর মন্দির। সেদিনের সম্রাটের মত, আজকের ক্ষুদ্র সম্রাট কৃষ্ণশরণও ভবানী মন্দিরের পানে চেয়ে, তিলে তিলে মৃত্যু পথে অগ্রসর হচ্ছেন। দুজনের বেদনার অভিব্যক্তি এক; দহন এক; শুধু যুগ ভিন্ন। আর মানুষ ভিন্ন।

সূর্য বললে, "কাকাবাবু, এবার থেকে ভবানীর মন্দি-রের সমস্ত ভার আপনি আমার হাতে দিন। আপনাকে এত পরিশ্রম করতে আমি কিছুতে দোব না"।

কৃষ্ণশরণ হাসলেন। কিছু বললেন না। এ যেন আর এক কৃষ্ণশরণ। সূর্যর সঙ্গে এঁর কোনও পরিচয় নেই। আজকের কৃষ্ণশরণের এই দুর্বলতা সূর্যর পরিচিত। কৃষ্ণশরণের তেজস্বিতার কথা স্মরণ করে ওর মনে অত্যন্ত পীড়া বোধ করতে লাগল। একটা বিরাট অশথ গাছকে পত্রহীন মৃতপ্রায় কল্পনা করতে কষ্ট হয়না কি? সূর্যর এই বেদনা ঠিক সেই রকম। সে বললে, "হাসলে চলবেনা কাকাবাবু, আমি এখন থেকে নিজেই আপনার দেখা শুনা সব করবো"—

কৃষ্ণশরণ এবার কথা কইলেন। পরম স্নেহে সূর্যর মাথায় একখানি হাত রেখে বললেন, "তারপর তুমি যখন কোলকাতায় চলে যাবে সূর্যশরণ; তখন আমার কার হাতে দিয়ে যাবে"?

সূর্য বললে, "এখন থেকে আমি বাড়ীতেই থাকবো কাকাবাবু। আপনাকে ফেলে আর কোলকাতা যাবো না। আপনার আদেশ আমি পালন করেছি। বি. এ. পরীক্ষায় আমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। ভেবেছিলুম এরপর সমুদ্র-যাত্রা করবো। কিন্তু দেশে এসে আমি সে সংকল্প ত্যাগ করেছি"—

কৃষ্ণশরণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ত্যাগ করেছো সূর্য? আমারও ত সেই ইচ্ছাই ছিল"—

সূর্য বললে, "কাকাবাবু, আমাদের দেশের অবস্থা, দিন দিন অত্যন্ত শোচনীয় হচ্ছে। এখনও যদি আমরা সাবধান না হই। তাহলে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, বাংলা দেশে কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেইজন্য আমি স্থির করেছি, দেশে থেকে এদের বাঁচাবার চেষ্টা করবো"।

"তোমার পরিকল্পনা কি রকম?" কৃষ্ণশরণের কণ্ঠে ঔদাসীন্য।

সূর্য বুঝতে পারল তার সঙ্কল্প তিনি সহজে চিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না। কৃষ্ণশরণ যে একজন প্রতাপশালী জমীদার সূর্য এ কথা ভুলে যায়নি। সূর্য জানে এই জমীদারী তাঁর প্রাণ; তাঁর অভিজাত্য তাঁর আত্মা। সূর্যর উপর তাঁর অনন্ত আশা; অখণ্ড নির্ভরতা। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত পার্থিব, বংশগত সম্পদ আর অভিজাত্য দিয়ে যাবেন সূর্যর হাতে। তাঁরই মত একনিষ্ঠ কর্মময়তায় রক্তের ঋণ অস্বীকার না করে; সূর্য তার সম্মান রক্ষা করবে এই তিনি চান; তা না সূর্য আজ বলছে কি! সে বলছে, তাঁদের পিতৃপিতামহ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা না করে, সূর্য করবে তার সংস্কার। কোন্ জমীদারের রক্ত এ প্রস্তাবে শান্ত থাকে? না থাক শান্ত; সূর্য তার সংকল্পে অবিচলিত থাকবে। ভালোবাসার জন্য সে তার যুক্তিকে হত্যা করতে পারে না।

সূর্য বললে, "আমি মনে করেছি, প্রথমে একটা সমিতি গঠন করবো আমাদের গ্রামে; তারপর যাতে করে আশে পাশের গ্রামে এই রকম এক একটী সমিতি গড়ে ওঠে, তার চেষ্টা করবো। সমিতি মানেই পাঁচজন লোক একসঙ্গে হওয়া। একসঙ্গে হলে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের সুখদুঃখের কথা কইবে। তারপর এমন দিন আসবে, নিজেদের এই দৈন্য অবস্থা ঘোচাবার জন্য ওরা উন্মুখ হয়ে উঠবে। সেই সময় প্রয়োজন হবে তাদের ভালো নেতার উপদেশ দেওয়ার জন্য, নির্দেশ দেওয়ার জন্য। এমনি ভাবে ওদের না জাগালে দেশ বাঁচবে না কাকাবাবু"।

কৃষ্ণশরণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, "ভবানীর যা ইচ্ছা তাই হবে। তবে তোমার কাকীমার একটা আশা পূরণের দায়িত্ব আমার উপর আছে সূর্য"?

"কি কাকাবাবু"? কাকীমার কথায় সূর্যর যুক্তিবাদী মন আর্দ্র হয়ে এল।

কৃষ্ণশরণ বললেন, "তোমার বিবাহ।"

একথা শোনার জন্য সূর্য মোটেই আশা করেনি। সে নীরবে নতনেত্রে বসে রইলো। কৃষ্ণশরণ বললেন, "আমাদের কাছে অনেক প্রস্তাব আছে; তবে তার মধ্যে তোমার কাকীমার অত্যন্ত পছন্দ সীতাপুরগড়ের মেজ-কুমারের মেয়েটীকে"।

আবার শিউলী? যাকে সে অতি নিষ্ঠুর ভাবে পরিত্যাগ করে চলে এসেছে? যাকে সে বহুকষ্টে মনের থেকে সরিয়ে রেখেছে?

তার মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণশরণ বললেন, "তুমি সেই মেয়েটিকে নিশ্চয়ই দেখেছো সূর্য, কেননা সেও তোমারই মত উনার কাছে থেকে পড়াশুনা করেছে"।

সূর্য কি বলবে? সে কি বলবে, শিউলীকে সে জানে না—তাকে সে বিয়ে করতে পারবে না; সে অন্যের বাগদত্তা?

কৃষ্ণশরণ বললেন, "তাদের ইচ্ছে এই বৈশাখেই শুভ কাজ শেষ করে ফেলার, কিন্তু আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি, এত তাড়াতাড়ি এতবড় একটা ব্যাপারে সমস্ত গোছগাছ করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ তোমার কাকীমা যদি থাকতেন, হয়ত এতেই তিনি রাজী

হতেন—কিন্তু আমার ইচ্ছে মানুষের প্রথমেই কাজ করা। অবশ্য এর মানে যদি মরে না যাই"।

সূর্য আর সহ্য করতে পারে না। দারুণ ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে সে ছুটে চলে এসেছে কিন্তু চলে এসেও কি সে শান্তি পেয়েছে একটুও? প্রথমেই গ্রাম-খানির অবনত অবস্থা দেখে ওর মন বিদ্রোহ হয়ে উঠেছে। তারপর এই নিয়ে কাকার সঙ্গে মতবিরোধ। তারপর আরও এক করুণতম দুঃখের মুখোমুখী হবার জন্য ওর উপর আদেশ এল। হায়, আজ যদি কমলা জীবিত থাকতেন, তাহলে সূর্য তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলে হয়ত কিছু সান্ত্বনা পেতো; কিন্তু আজ তিনি নেই। কৃষ্ণশরণের ক্লান্ত মুখের পানে চাইলেই সেই কথাটা ওর বেশী করে মনে পড়ে যায়। ও বুঝতে পারে না মানুষের সান্ত্বনা কোথায়? কিন্তু কৃষ্ণশরণের যদি মৃত্যু ঘটে? ঘটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়? নাঃ, সূর্য আর পারে না। সে অবোধ বালকের মত কৃষ্ণশরণের হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। ওর চোখের জলে কৃষ্ণশরণের পাতলা ধুতি ভিজে ওঠে। তিনি সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "পাগল ছেলে কোথাকার? মরবো বললেই মরে যাওয়া যায় রে? তোকে ফেলে আমি কোথায় যাবো? তোর বাবা যে তোকে আমার হাতেই দিয়ে গেছেন। শোন্ সূর্য, উঠে বোস্, সেদিনের গল্প তোকে বলি"—

সূর্য ওঠে না এইখানে সে যেন খুঁজে পেয়েছে পরম সান্ত্বনা। কৃষ্ণশরণ তাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলতে সুরু করেন তার পিতা মাতার জীবন কথা। অদ্ভুত, আশ্চর্য তার মা ছিলেন—বিলেত ফেরৎ মেয়ে। একথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? ও ধীরে ধীরে উঠে বসে; অস্ফুট স্বরে বলে, "আমার মা"।

কৃষ্ণশরণের স্তিমিত চোখের তারায় শান্ত হাসি। তিনি বলেন, "হ্যাঁ সূর্য, অত্যন্ত গুণবতী মেয়ে ছিলেন তোমার মা"?

তাণ্ডীর সঙ্গে দেখা হোল সূর্যর দুপুর বেলা, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে। লক্ষ্মী এখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। এখনও সে নিজের ঘরের দাওয়ায় পরে বসে তরকারীতে সুতা কাটছে। কানে একেবারেই শুনতে পায় না। সূর্যকে দেখে সে কেঁদে ফেললে: "দাদা, কাকীমা আর নেই; কে তোমাকে যত্ন করবে"?

তাণ্ডী কোথায় ছিল ছুটে এসে, লক্ষ্মীকে ধমকে দিয়ে বললে, "কি হচ্ছে লক্ষ্মীদি? তুমি কাঁদলে সূর্যদাও কাঁদবে, একথা তোমার একবারও মনে হচ্ছে না? নাও ওঠো, তুমি খাবার ব্যবস্থা কর। ও কি খেতে ভালোবাসে না বাসে আমি বাপু কিছুই জানিনা"—

সত্যিই ত লক্ষ্মীর একথা মোটেই মনে ছিল না। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, "যাও দাদা চট করে চান করে এসো, আমি খাবার জায়গা করি। আহা, দাদা আমার কত বড়ই না হয়েছে,—মুখখানা ঠিক মায়ের মত হয়েছে। আহা যদি বউমা একবার কাছে আসতো! লক্ষ্মী অশ্রু সামলাতে পারে না। সূর্যর মন হাহাকার করে ওঠে, এই প্রাচীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুর, সে কমলা ছাড়া ভাবতেও পারে না—যত সে চোখের জল গোপন করতে চায়, ততই লোকের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভগবান মানুষকে কেন এত দুঃখ দেন!

সূর্য খাচ্ছে, তার সামনে এসে দাঁড়াল তাণ্ডী। সে বললে, "সূর্যদা কিছুই যে খাচ্ছো না"?

তাণ্ডীকে দেখে সূর্য খুশী হোল। বললে, "খেতে ভালো লাগছে না তাণ্ডী, এতদিন দূরে ছিলাম নানা রকম কাজের মধ্যে; কাজেই কাকীমার অভাবটা এমন ভাবে বুঝতে পারিনি,—এখানে এসে অনুভব করছি, তিনি ছাড়া আমাদের সমস্তই শূন্য"।

তাণ্ডী ভর্ৎসনা করে বললে, "ছিঃ সূর্যদা, তুমি না বিদ্বান, তোমার কি এরকম বিলাপ করা সাজে? একথা ত আমাদের শাস্ত্রে বলে না যে, মানুষ মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শেষ হয়ে যায়? তবে তুমি এটা বিশ্বাস করছ কি করে"?

সূর্য নতমুখে কয়েক গ্রাস ভাত খেয়ে উঠে পড়ল।

যাবার সময় তাপ্তীকে বলে গেল, "আমার সঙ্গে একবার দেখা করো তাপ্তী"।

তাপ্তী ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা"।

বিকেল বেলা, সূর্য নিজের ঘরে বসে, একটা খসড়া তৈরী করছিল তার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির। এমন সময় চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল তাপ্তী। সূর্য খুশী হয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, "তুমি কি করে জানলে তাপ্তী, যে আমি এসময় চা খাই"?

সূর্য হেসেছে! দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে তাপ্তী বললে, "আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে কি, সহরের নিয়ম কানুন কিছুই জানি না"?

অপ্রস্তুত হয়ে সূর্য বলে, "না না আমি সেকথা বলিনি। তুমি কিছু মনে কোরনা তাপ্তী"—

তাপ্তী হাসিতে ফেটে পড়ে। বিষম খেতে খেতে বলে, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কবে আর হবে? বিয়ের পর শিউলীদিকে ভুগিয়ে মারবে দেখছি"? আবার সেই শিউলী? সূর্য নীরবে চা খেতে থাকে। তাপ্তী উঠে গিয়ে তার পাশে বসে। বলে, "কতদিন পরে আমাদের দেখা, কথা বলবে না সূর্যদা"?

তার হাতখানি নিয়ে নিজের কপালের উপর চেপে ধরে, সূর্য লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। "তাপ্তী,... তোর কথা আগে সব বল। আমার কথা দেখছি, সবই তুই জানিস। মাসীমা কেমন আছেন বল"? কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাপ্তী বললে, "মা আর বেঁচে নেই সূর্যদা"—

সূর্য লাফিয়ে উঠল, "এঁ্যা ভুল মাসীমা নেই? সত্যি? আমি যে ভাবছিলুম সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে যাবো? হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য, সকলেই একে একে আমায় ফেলে চলে যাচ্ছে"।

তাপ্তী তার পিঠে হাত দিয়ে বললে; "দুঃখ কোরনা, সূর্যদা; মা তোমায় খুব ভালোবাসতেন; তুমি কাঁদলে তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবেনা"—

সূর্য সোজা হয়ে বসে বলল, "ঠিক বলেছ তাপ্তী ঠিক বলেছ, কাকীমা, ভুলমা, পিসীমা, ওদের কারো মৃত্যু ঘটেনি। ওরা তিনজনেই আমাদের দুঃসময় মনে পরম সান্ত্বনা আর প্রভূত আশীর্বাদ হয়ে বেঁচে আছেন। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁরাই ত আমাদের মনে শক্তি সঞ্চার করছেন প্রতিনিয়ত"—

তাপ্তী মৃদু কণ্ঠে বললে, "সূর্যদা, তোমার এত দুঃখ কিসের? আমায় বলবেনা"?

সূর্য হাসল; অত্যন্ত করুণ তার রূপ। এত তরুণ বয়সে ওই হাসি ওর মুখে মোটেই মানাল না। সে বললে, "আমার দুঃখ, সে ত আমি নিজেই। এখন বলত তাপ্তী, তোমার ছেলে মেয়ে কটী? তোমার প্রভু কেমন আছেন"? তাপ্তী বিমর্ষ মুখে বললে, "ছেলে পিলে আমার হয়নি সূর্যদা। আর প্রভুর সঙ্গে বর্তমানে আমার কোনও সম্পর্ক নেই"—

সূর্য চমকে উঠল—"সেকি কথা তাপ্তী? সম্পর্ক ছিন্ন করার কি কারণ ঘটল"?

"কারণ অনেক"—তাপ্তী বললে, "প্রথমতঃ তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন না কেন জানিনা, আমায় অকারণে সন্দেহ কোরতেন—আমি কোনওদিনই তাঁর এই ভ্রান্ত অধিকারবাদকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। কাজেই একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি হুকুম করলেন, তাঁর বাড়ীতে আমার আর থাকার সুবিধা হবে না। আমিও বাধ্য হয়ে মার কাছে চলে এলুম। মা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। তার একমাস পর তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন। তখন জ্যাঠামশাই আমায় এই বাড়ীতে এনে রাখলেন"।

সূর্যর মন থেকে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে বললে, "তোমার স্বামী তোমায় কেন সন্দেহ কোরতেন তাপ্তী? এর মধ্যে কিছু কি সত্য আছে? উত্তর দাও; মাথা নীচু কোরনা। আমার দিকে তাকিয়ে সত্য কথা বল"? হায় লজ্জার দেবতা, তুমি কোথায়? তাপ্তী যে তোমার স্মরণ চায়। তাপ্তী সূর্যর কথা রক্ষা কোরলো। কিন্তু তার কালো চোখের গভীর দৃষ্টি সূর্যকে কি বলল?

তার চোখের নীরব ভাষা পড়ে সূর্যর মনের অবস্থা কি রকম হোল? ওইত সূর্যর কোমল বেদনাময় মুখ, ধীরে ধীরে ক্রোধে কঠিন হয়ে উঠছে; ইস্ এখনি হয়ত ফেটে পড়তে পারে সে দুঃসহ যন্ত্রণায়। নাঃ, সূর্যর রক্ত ধৈর্য ধরতে জানে। সে গম্ভীর স্বরে বললে, "আমি কি এই কথাই বিশ্বাস কোরবো তাণ্ডী; যে আমার জন্যই তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছ"?

তাণ্ডী মৃদুস্বরে বললে, "শুধু তোমার কথা ভাবতুম সূর্যদা। তাছাড়া আর কোনও অন্যায় করিনি। একজন মানুষের স্বাধীন কল্পনাতেও যারা অবিশ্রাম বাধা দেয়; তাদের সে অন্যায়কে অস্বীকার করে আমি কি পাপ করেছি সূর্যদা"? "হ্যাঁ তাণ্ডী, তুমি পাপ কোরেছ? স্বামী ত্যাগ করার মধ্যে কোনও বাহাদুরী নেই, এই সত্যটা না জানাটাই হোল তোমার সবচেয়ে বড় পাপ।"

তাণ্ডীও ঈষৎ রেগে উঠে বললে, "থামো সূর্যদা, থামো। সবটা না জেনেই আমায় দোষী করা তোমার উচিত হচ্ছেনা।

সূর্য তিক্ত কণ্ঠে বললে, "আমার আর কিছু জানার দরকার নেই। তবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি; তোমার স্বামীকে তুমি এ বিষয় কোন দিন কিছু বলেছিলে"?

"বলা প্রয়োজন মনে করিনি" তাণ্ডী বললে।

"অথচ বলাটাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।" সূর্য বললে—"কেননা, বললে পরে সমস্ত সত্য মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং তার ফলে, কোনও অশান্তিও ঘটতনা। একটা কথা শোনো; মানুষ যাকে ভালোবাসে; তার কথাই সে সব সময় ভাবে। ভালোবাসা একই বস্তু; তবে তার প্রকাশ রীতি বিভিন্ন ধরণের। ভালোবাসায় কোনও পাপ নেই; ভালোবাসায় সকলের সমান অধিকার আছে। ভালোবাসাকে সম্মান দিতে গিয়ে, তোমরা প্রতি মুহূর্তে তার অসম্মান করো। তুমি আমায় ভালোবাসো, এতে ত লুকানোর কিছু নেই; ভয়েরও কিছু নেই। তবে তুমি ভয় পেলে কেন? লুকালে কেন স্বামীর কাছে; এটা হোল তোমার চরম অজ্ঞতা। যে বিষয় কিছুই জানোনা, তার উপর কর্তৃত্ব করতে যাওয়াই মহাপাপ। ভালোবাসাই ত মানুষের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয় সব সময়। আমিও তোমায় ভালোবাসি তাণ্ডী; সে কথা ত সকলের কাছে এখনি প্রকাশ করতে পারি; তবে আমার ভালোবাসা এ সত্য স্বীকার করতে তোমার এত সঙ্কোচ কেন? তারজন্য স্বামী ত্যাগ করার প্রয়োজন হোল কেন? তুমি কি আমায় স্বামীরূপে চাও তাণ্ডী"? সূর্যর চোখে আবার সেই বিষাদময় হাসি। তাণ্ডী চিৎকার করে উঠল; "চুপ কর সূর্যদা, অপমানেরও একটা সীমা আছে। তোমার কাছে আমি নীতিকথা শুনতে আসিনি। আমি যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। আমার এ বাড়ীতে থাকা তোমার যদি পছন্দ না হয়, আমি কালই এখান থেকে স্বচ্ছন্দে অন্যত্র চলে যাবো"।

সে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। ব্যথাহত চিত্তে সূর্য ঘরের থেকে বেরিয়ে মাঠে গেল।

আবার সেই সন্ধ্যা। অন্ধকারের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চতুর্দিক গভীর স্তব্ধতায় ভরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সূর্যর মনেও নেবে আসছে সীমাহীন ক্লান্তি; অসহ্য বিষণ্ণতা। ওর শৈশবের সঙ্গী, পুরানো বৃদ্ধ হরিতকী গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ও ঘাসের উপর গিয়ে বসল। সেই পুরাতন শব্দে গাছ থেকে পাকা হরিতকী টুপ টাপ করে ঝরে ঝরে পড়ছে। তার সঙ্গে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। কিছুদূরে সূর্যদের মালীর ঘরের পিছনে আছে একটা অতি পুরাতন ভাঁট বন। প্রতি সন্ধ্যায় এই ভাঁটবনে গন্ধের উৎসব জাগে। এ গন্ধ সূর্যর অতি পরিচিত। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সেই চণ্ডীতলার বকুল গাছটা, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় তার ফুলে ভরা মাথাটা আশ্চর্য সুন্দর আর ওই ক্ষুদ্র ফুলগুলির কি মদির গন্ধ; এগন্ধও সূর্যর চেনা। আশ্চর্য ওই বাদাম গাছের কোটরে সেই মাণিক-জোড় লক্ষ্মীপেঁচা দুটী এখনও আছে। ওই তারা অবাক চোখে সূর্যর দিকে চেয়ে রয়েছে। সূর্যর মনে

পড়ে এই পেঁচাদুটীকে কমলা কতই না ভালোবাসতেন। ওদের বিষয় কতনা সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন, ছোটবেলায় সূর্যকে। প্রতি সন্ধ্যায় কাকীমার সঙ্গে সূর্যও মাণিক-জোড়কে ভক্তিভরে নমস্কার কোরতো। প্রায়ই সন্ধ্যা-বেলায় সূর্যকে কাছে বসিয়ে কমলা গুন গুন করে গাইতেন,

"এস মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে :
এস সোনার বরণ রাণী গো, শঙ্খ কমল করে।"

হায় কোথায় গেল সেই সব সোনার দিনগুলি? গাছের পাতায়, ঝরা ফলের ঘ্রাণে, বকুল আর ভাঁটের গন্ধে; চাঁদের জ্যোৎস্নায়, ঘাসের কোমল ঘাস, পেঁচার চোখে; সেই সব দিনগুলি এতদিন স্বপ্ন হয়ে ছিল। তারা ঘরের ছেলে সূর্যকে ভোলেনি। আজ সন্ধ্যায় তাকে আবার নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল ওর। সূর্য ওদের ভুলেছিল, কিন্তু ওরা সূর্যকে ভোলেনি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিনই রাত্রি বেলা।—

সূর্য নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করছিল। রাত্রি তখন গভীর। সমস্ত পল্লী ঘুমে মগ্ন। এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল তাপ্তী। সূর্য আশ্চর্য হোলনা, আশঙ্কিত হোল। বললে, "এত রাত্রে কি ব্যাপার তাপ্তী"?

তাপ্তী টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "একটা কথা-সূর্যদা"!

"বলে ফেল" সূর্য বললে।

"আমায় এবাড়ী থেকে চলে যেতে বোল না। দয়া করে আমায় এখানে থাকতে দাও"

সূর্য বললে, "আমি তোমায় এখানে নিয়ে আসিনি; কাজেই যেতে বলারও কোনও অধিকার আমার নেই তাপ্তী"—

"সকালে যে বললে"। তাপ্তী বললে।

"সকালে আমি তোমায় চলে যেতে একবারও বলিনি। সূর্য বললে, আমি শুধু তোমায় ভুল দেখিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হয়, তুমি সে ভুল শুধরাতেও পারো, ইচ্ছা না হয় নাও পারো"—

তাপ্তী ভয়স্বরে বললে, "ভুল শুধরানো মানে ত সেই ওই বাড়ীতে ফিরে যাওয়া? সে আমি পারবোনা সূর্যদা"—

"বেশ, না পারো, ও প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করে দাও" সূর্যর কণ্ঠে তিক্ততা।—

"সূর্যদা, শুধু একবার তুমি বল"—

কথার মাঝখানে, সূর্য লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে দুম্ দুম্ করে বেরিয়ে গেল। তার রাগ দেখে তাপ্তী হেসে উঠল খিল খিল করে। গভীর রাত্রে সেই তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনি সূর্যর তীক্ষ্ণ মনে আরও জ্বালা ধরিয়ে দিল। সে দ্রুত পদক্ষেপে কৃষ্ণশরণের ঘরে গিয়ে তাঁর শয্যার একাংশে শুয়ে পড়ল। উন্মাদিনী তাপ্তী সূর্যর পরিত্যক্ত শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটি বালিশ বুকে আঁকড়ে ধরে পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগল। "সূর্য আমার, আমার,—আর কারো নয়। শিউলীর কোনও সাধ্য নেই, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। সূর্যকে কেউই পাবেনা, আমিও না, শিউলীও না. এ হতে পারে; কিন্তু আমি না পেয়ে শিউলী তাকে পাবে, এ হতে পারে না; কিছুতেই হতে পারে না। এ কল্পনাও অসম্ভব। সূর্যর জন্য আমি ঘর সংসার, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বামী, ভাবী পুত্রকন্যা সমস্ত বিসর্জন দিয়েছি। সূর্য যদি আমার না হয়, তবে তাকেও সংসারের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা জলাঞ্জলি দিতে হবে। আমার মত সেও হবে ব্যর্থ। আমার মত তারও আত্মা থাকবে চির অতৃপ্ত। আজ আমি সূর্যকে অভিশাপ দিতে পেরেছি—প্রাণ ভরে; আজ আমার কি আনন্দ? হায় সূর্য, আমার এ আনন্দ তুমি একবারও দেখলে না? উন্মাদিনী বকতে বকতে শ্রান্ত হয়ে পড়ল। সূর্যর পরিপাটী করে পাতা শয্যা তার অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে উঠল। হায়, এ পৃথিবীতে কে সুখী? যে ভালোবাসে সেও অসুখী; যে ভালোবাসেনা সেও অসুখী। এ এক ট্র্যাজেডী।—

পরের দিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখল, সূর্যর শয্যায় পড়ে রয়েছে মৃতা তাপ্তী। সে বিষ খেয়েছে।

তার সুন্দর মুখখানি নীল হয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত প্রতিহিংসা যেন ওই নীলটুকুর মধ্যেই ফুটে রয়েছে অবিচলিত ভাবে। সূর্য কোনও কথা বলেনা। নিঃশব্দে যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। সে ঘরে তখন তুমুল চৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে।

ছেলেদের খেলার মাঠে সেইদিনই সূর্য তার বিশিষ্ট কয়েকটী বন্ধুকে নিয়ে একটী সভার আয়োজন করল। একটী ছুটী করে ধীরে ধীরে সেখানে বহু লোক জমায়েৎ হোল। সূর্য প্রথমেই বললে, আমাদের দেশে, মানে এই সব পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার বড় অভাব। এই অভাব, অচিরে ঘোচাতে না পারলে, এ জাতি আর বেশীদিন বাঁচবে না। প্রত্যেকটী গ্রামে বাধ্যতামূলক স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। এর জন্য ব্যাপক আন্দোলন চালাতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামের ছেলেদের অগ্রণী হতে হবে। তা না হলে মায়ের জাতের আর মুক্তি নেই। আমাদের দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বয়ং রাষ্ট্রই এ ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতো। কিন্তু আমরা আজ পরাধীন। তাই আমাদের দেশের মেয়েদের এই দুর্দশা। দেশের বর্তমান গবর্ণমেণ্ট সৈন্য রক্ষার ব্যাপারে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তার সিকি ভাগও শিক্ষা ব্যাপারে ব্যয় করে না। তাইতো আমাদের নিজেদের এ ভার দেশের দিকে তাকিয়ে গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। আমি প্রথমেই প্রস্তাব করছি—কাপড়ের মহাজন লালা সাহেবের ঘরটা আমরা ফিরে চাই; ওটাতেই আপাততঃ বিদ্যামন্দির স্থাপন করার চেষ্টা করবো। আসল কথা, গ্রামের লোকদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে" সকলে একবাক্যে সায় দিল, নিশ্চয়, এতো ভাল কথা

সভার এককোণে একটী জামগাছে হেলান দিয়ে বসেছিল, পরাণ সাহা। বেচারীর মনে বড় কষ্ট। তার বিষয় সম্পত্তি প্রচুর; লেখাপড়াও সে শিখেছে ম্যাট্রিক অবধি, তবু গ্রামে ওর তেমন সম্মান নেই একটা মুর্খ দরিদ্র কায়স্থ কিংবা বামুনের ছেলের পাশে বসে সে জামাই খেতে পারে না। তার হাতের ছোঁওয়া জল কেউ খাবে না। কারু বাড়ী কোনও উৎসব হলে, তাকে অঙ্গিনার পাতা পেতে খেতে দেওয়া হবে এবং খাওয়া শেষে নিজেকেই পাতা ফেলে যেতে হবে। এইজন্য ওর বাড়ীর মেয়েরা বড় একটা কোথাও যেতে চায় না। পরাণ সা জানে, সহরে এমন উৎকট জাতিভেদ প্রথা নেই। সেখানে কেউ কাউকে ছুঁলে স্নান করে না এবং অন্য জাতের ছোঁওয়া খাবার কিংবা জল খেলে জাত গেল বলে মনেও করে না। সেখানে সকলেই একিষ্ঠ স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করে। লাহিড়ী বাড়ীর ছোট কর্তার সঙ্গে পরাণের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। দুজনে ছিলেনও প্রায় সমবয়সী। (যদিও তাঁদের ছোঁওয়াছুঁয়ি কোনদিনই হয়নি) সে আজ প্রায় বছর দশেক আগের কথা। সেদিনের ঘটনা পরাণ সার মনে আজও গভীর বেদনার ক্ষতচিহ্নের মত উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে।

কংশনদীর যে শাখাটা তাদের গ্রামের প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে, তার নাম লাবণ্য নদী। দেশোয়ালী নাম হোল লাউয়া গাঙ। পরাণ সা একদিন বড় এক খালুই কই মাছ এনে লাহিড়ী বাড়ীর ভিতর অঙ্গনে প্রবেশ করে হাঁক দিল, "কই গো ছোড় কর্তা কই, আছেন"?

পূজার ঘর থেকে লাহিড়ী মশাই বেরিয়ে আসতেই, সে সহাস্যে বললে, "এই মাছ কয়ডা আপনার সেবায় লাইগ্যা আনছি, তাখছেন ত ভালা কিনা"?

ছোট কর্তাও রঙ্গভরে বললেন, "ভালো না অইলে কি তুমি আমারে দেবার আসবা"?

এমন সময় রান্নাঘর থেকে লাহিড়ী বাড়ীর একটী নতুন বধূ একবাটী দুধ হাতে নিয়ে উঠান পার হয়ে তাদের শোবার ঘরে প্রবেশ করল। এবং কচি ছেলের চিৎকারে বোঝা গেল যে, ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে—পরাণ সা তখন কাঁঠাল গাছের তলায় বসে ঝরা কাঁঠালপাতা সংগ্রহ করে নারকোলের পাতার কাঠি দিয়ে নানা রকম খেলার জিনিস তৈরী করছিল। একটী সুন্দর বাটী তৈরী করে সে হেসে বললে, "কর্তা, এই বাটীতে কইরা আপনার নাতীন দুধ ভাত খাইবে"—

এমন সময় কর্তার চিৎকারে তার হাত থেকে পাতা আর কাঠি ছিটকে পড়ে গেল। সে দেখল রান্নাঘরের দাওয়ায় বধূটী জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের বাটীতে তার খানিকটা দুধ রয়েছে। বোধহয় ছেলে খায়নি। কর্তা রুষ্টস্বরে বললেন, "কি করতেছ বউমা, ওই দুধ লইয়া কোন আক্কলে তুমি পাকের ঘরে ঢুকতেছো? তোমাদের জন্যই জাত জন্ম সবই খোয়াইতে হইবো"—

বধূ হয়ত নতুন সহর থেকে এসেছে, কাজেই দেশের গ্রাম্য রীতিনীতি কিছুই জানে না। কিন্তু পরাণ সা মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিল যে বধূর হাতে দুধ অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। কেননা যে উঠানে শুঁড়ীর ছেলে পরাণ সা বসেছিল, সেই উঠানের মধ্য মাড়িয়ে বধূ দুধ নিয়ে যাওয়া আসা করেছে; কাজেই পরাণ হাত দিয়ে তাকে না ছুঁলেও, মাটীতে মাটীতে ছোঁওয়া লেগেছে ত! উঃ, কী ভীষণ সূক্ষ্ম বিচার নীতি। মানুষের জাত এতই সস্তা যে তাকে রক্ষা করার জন্য সামান্য ব্যাপারেও মানুষকে অমানুষ হতে হয়। তার বেশী দুঃখ হয়েছিল নতুন বধূটীর অযথা তিরস্কৃত হওয়ার কথা ভেবে। আহা, পরাণের জন্যইত সে মনোকষ্ট পেলো! পরাণ আজও সে কথা ভোলে নি। তার মনে এর জন্য কোনও প্রতি-হিংসা নেই। সে প্রতি মুহূর্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে দেশের উচ্চবর্ণের লোকদের মনের পরিবর্তন সাধনের জন্য। ছেলে মেয়েরা মাঝে মাঝে পরাণকে বলে, "দাও বাবা আমরা সহরে চইলা যাইগ্যা। সেখানে যাইলে, আমরা লিখা পড়াডাও ভালা ভাবে শিখবার পারব; থাকতামও ভালা ভাবে"—

পরাণ সা'রও যে মাঝে মাঝে এ ইচ্ছা মনে না হয় এমন নয়; তবে, গ্রামে নিজের আর সব জাতভাইদের দিকে তাকিয়ে, তাদের এই অন্ধকারে একলা ফেলে ওর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না—কেন না ওর অগাধ অর্থ বল অনেক সময় গ্রামবাসীদের নানা বিপদে আপদে মুক্তহস্তে সাহায্য করে—রক্ষা করে। সেদিন সূর্যর সভায় জামগাছ হেলান দিয়ে বসেছিল, এই পরাণ সা। সে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে বললে, "চৌধুরী বাবু, আমার একটা নিবেদন আছিল"—

সূর্য তাকে সামনে ডেকে বললে, ভাই"—

পরাণ সা বললে, "লালার কাপড়ের ঘরডা আমার। ও আমারে এক বছরের গোটা খাইনা আগে দিয়া দিছে। সহজে উয়ারে ঘর ছাড়াবার পারতাম না। আপনাকে আমি ইস্কুল বসাইবার লাইগ্যা আর একখান ভালা ঘর দিবার পারি, দয়া কইরা সেখান লইবোন কি"?

সূর্য উৎসাহিত হয়ে বললে, "নিশ্চয় নিশ্চয়, কেন নোব না ভাই। তবে ঘরটা একটু গ্রামের মধ্যে হলেই ভালো হয়। কেননা দূর হলে মেয়েদের যাওয়ার অনেক অসুবিধা"—

কৃতার্থ হয়ে পরাণ সা বললে, "বেশী দূর নয় বাবু, ওই যে চণ্ডীতলায় একটু আগেই ভেলের খানি-ঘরের ডাইনে যে বড় টিনের ঘরডা; সেইডার কথা কইতে-ছিলাম"—

সূর্য বললে, "বেশ বেশ, সেত আমাদের গ্রামেই এবং কাছেও। আমি এতে খুব খুশী হলুম ভাই। তুমি নিজে যেমন দেশের অবস্থা বুঝতে পেরেছ, সেই রকম আর পাঁচজনেও যাতে বুঝতে পারে, তার জন্যও চেষ্টা কর"।

পরাণ দুঃখীত স্বরে বললে, "কি করব্যাম বাবু, গাঁয়ের পোলাপানরা ভালা কথা কেউ শুনবার চায় না। আপনে যদি কইয়া দেন, কি ভাবে শিখাইতে হইবো, তবে আমি সেই ভাবে শিখাইবার পারি"—

পরাণের কথা শুনে সূর্য খুশী হয়ে গেল। দেশে এসে আজই সে প্রথম মনে সুখ অনুভব করল। তার দেশের লোকের মনে ভালো হবার, জানবার, শিখবার ব্যাকুলতা জেগেছে, কেবল পথ পাচ্ছে না বলে এগোতে পারছে না। একজনের ইচ্ছাই ত পাঁচজনের ইচ্ছাতে এবং পাঁচজনের ইচ্ছা পঞ্চাশে, পঞ্চাশের ইচ্ছা পাঁচশো ইচ্ছায়

পরিণত হয়। জনসাধারণের মনের এই অগ্রগতি, একতা বোধ, এইত তাদের স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর দূরে নেই। পরাণ সর্দার এই ব্যাকুলতার মধ্যেই আজ প্রকাশ পেয়েছে, তার আসল পরিচয়। সূর্য বললে, "ভাই তোমার কথা শুনে আমি খুব খুশী হলুম। তোমার নাম কি? কোন গ্রামে থাকো"?

পরাণ লজ্জিত স্বরে বললে, "এ অধমের নাম পরাণ সাহা। থাকি বাঁশের খাল গাঁয়ে"—

সূর্য চমৎকৃত হয়ে বললে, "ও তুমিই পরাণ সা? তুমি ত ভাই খুব বড়লোক। তোমায় দেখার আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল পরাণ কাকা। আজ ভগবান আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে বল; সেইদিনই তোমায় কাজের কথা সব বুঝিয়ে দোব"—

পরাণ বললে, "আমারে আর লজ্জায় ফ্যালেন্ কান্ দাদাবাবু? আপনি যখনি কইবেন, আমি তখনি আপনার লগে দেখা কইরবাম—আমার আর একটা নিবেদন আছিল"—

সূর্য বললে, "বলে ফেল, কাকা! এখন থেকে তুমি ত আমাদের কর্মী; যা বলবে জোরের সঙ্গে বলবে, আমরা সকলেই সকলের কথা শুনবো, তোমার আমার আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। আমার একথা শুধু মুখের কথা নয়। যেমন করেই হোক কাজে লাগাতেই হবে। কোনও সঙ্কোচ কোর না কাকা"—

পরাণ বললে, "আপনার পাঠশালাতে, আমরার ঘরের মাইয়া গুলানরে ঢুকবার দিব্যান তো? আমার বড় ইচ্ছা তাগো লিখা পড়া শিখাইবার"—

সূর্য বললে, "নিশ্চয় নিশ্চয়, মেয়ে যত বেশী হয়, আমাদের ত ততই ভালো। তোমাদের ঘরের মেয়েদের জন্যই আমার এই পাঠশালা খোলা! আমি কাল সকালে তোমার বাড়ী যাবো কাকা! তুমি বাড়ী থেকো"।—

আঃ, এত সম্মান, এত আনন্দ, পরাণ জীবনে কখনও পায় নি। আজ সে বুঝতে পারল, দেশের মাটী তাকে এই সাফল্যটুকু দেবার জন্যই এত দুঃখ অপমান সহ্য করেও তাকে আঁকড়ে ধরে ছিল। সূর্যর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে সে ফিরে গেল।

সভা ভেঙ্গে গেল। সকলে যে যার ঘরে চলে গেল। বাকী রইল শুধু সূর্য। তার বাড়ী ফিরতে মোটেই ইচ্ছা করছেনা। বাড়ীর কথা মনে হলেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাপ্তীর মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য। বাড়ীর সেই বিশৃঙ্খল কোলাহল, কৃষ্ণশয়নের অটল স্তব্ধতা। ও বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়ে বসল। এ সেই নদী। ছোটবেলায় এ নদীতে আসার সময় তার কতনা আনন্দ ছিল? সূর্যর বড় ভালো লাগে এই নদীটীকে। ও কলকল করে কত কথাই যে বলছে, সূর্য বুঝতে না পারলেও মনে হয় এসব কথা সবই যেন নদী ওকে বলছে। সে পরম স্নেহে নীচু হয়ে নদীর জলে হাত পা ডুবিয়ে বসে রইল। একসময় কে একজন তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, আরে এ যে আমাদের সূর্য? কবে দেশে এলি"?

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে সূর্য মুখ তুলে দেখল, সে তার বালাবন্ধু অরুণ। বহুদিন পর তাদের দুই বন্ধুর দেখা। কাজেই দুজনের অবস্থাই সমান। অরুণ বললে, সে সুসংঘে গায়ের আর ছাত্রদের মধ্যে কাজ করছে। কেন না শাসকরা ওই দুটী সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত অবিচার আর অত্যাচার করছে। ওদের নেতার নাম প্রকাশ করতে বারণ আছে। তবে একজন এদেশেরই ছেলে। সূর্য বললে "তুমি কেন যাত্রার দলের সঙ্গে পালিয়ে গেলে অরুণদা? তখন আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল, আর কত যে কেঁদেছি, কি বলবো তোমায়"? সূর্যর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, অরুণ, "তোকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল সূর্য, সে কথা সত্যি। কিন্তু সেদিন গিয়েছিলুম বলেই আজ আমি জীবনে কত নতুন পথ দেখতে পেয়েছি। সার্থকতার অনুসন্ধান করতে পারছি। তা না হলে গ্রামে পড়ে থাকলে, আমিও পরিণত হতুম আর

একটী নিরক্ষর ডাকবাহক। মুষ্টিমেয় ধনিকের সৌখীনতার চাহিদা মেটাতে মেটাতেই আমার জীবন ক্ষয় হয়ে যেতো। আজ যেমন করে নিজেকে চিনেছি জাতিকে চিনেছি; দেশকে চিনেছি—বিদেশে না গেলে কি পারতুম তাই, এমন ভাবে নিজের জন্মভূমিকে জানতে"?

সূর্য বললে, "ঠিক বলেছ অরুনদা। আমারও ত অবস্থা সেই রকম। জন্মেছি ধনীর ঘরে, লালিত পালিত হয়েছি অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে, শিক্ষালাভ করেছি বিদেশী অনুশাসনের মধ্যে; মনে আশা ছিল বড় হয়ে বিলেত আমেরিকা যাবো, একটা কেউকেটা লোক হবো। কিন্তু এই বিদেশ বাসের ফলেই মনের সমস্ত চিন্তাধারা গেল বদলে। এবার দেশে এসে দেখলুম, এখানেই রয়েছে আমার বিরাট কাজ। এই কাজের মধ্যেই রয়েছে আমার জীবনের সর্ব সাফল্য। কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ। তেমন সঙ্গী কেউকে পাচ্ছিনা। তুমি আমায় অবসর সময় সাহায্য করবে অরুণদা"?

অরুণ বললে, "নিশ্চয় কোরবো সূর্য, এই ত আমার কাজ। আমরা দেশের ছেলে দেশের দুঃখ দুর্দশার দিকে যদি তাকিয়ে না দেখি, তবে বাইরের লোক ত তাকে অবজ্ঞা কোরবেই। আমার বড় দুঃখ হয় সূর্য; গ্রামের সমস্ত ছেলেরা লেখা পড়া শিখতে একবার বিদেশে গেলে দেশে আর ফিরে আসে না। এরই ফলে দেশে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ম্যালেরিয়া আর ডাকাতি; শাসকদের শোষণ, আর অশিক্ষা ও দারিদ্র্যপ্রসূত দুর্নীতি। সহরে থেকে তারাই আবার গ্রামের কথা বলতে গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ কুচকায়"।

সূর্য বললে, "অরুণদা তোমায় পেয়ে আমার যে কত আনন্দ হোল, কি বোলবো। চল আজ রাত্রে আমাদের বাড়ী থাকতে হবে তোমায়"।—

দীর্ঘদিন পর দুই বন্ধু আবার সেই শৈশবের অতি প্রিয় গাঁয়ের পথ ঘাট ঘুরে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরল। পথে আসতে আসতে অরুণ বললে, "যাত্রা দলের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে কি করে চোর হয়ে উঠল। প্রথমে পকেট কাটা, পরে একেবারে পাকা চোর। তার পর ধরা পড়ে জেল। জেলে সে একজন রাজবন্দীর চাকরের কাজ কোরতো। তাঁর কাছ থেকেই সে জানতে পেরেছিল যে জীবনে আরও একটা পথ আছে। সে হোল, মানুষের মত সৎ কাজ করে এগিয়ে যাওয়ার পথ। একজন বিড়িওয়ালার কাছে তার কিছু জমানো টাকা ছিল। সে রাজবন্দীর নির্দেশ অনুযায়ে জেল থেকে মুক্ত হয়ে, সেই টাকার স্থলে পড়ল; ম্যাট্রিকে সে স্কলারশিপ পেয়েছিল তাইতে আই. এ, পড়ার খরচ লাগেনি। কিন্তু বি. এ, পাশ করতে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে। কলকাতায় ছাত্রছাত্রী থেকে বোধহয় টিউটরের সংখ্যা বেশী। কাজেই টিউশানী জোগাড় করতে তার বড় কষ্ট হয়েছে। তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। দাদা একটী পয়সাও তাকে দেয়নি। পাশ করেই সে দেখা করেছিল সেই মুক্ত বন্দী বিপ্লবীর সঙ্গে। তাঁরই নির্দেশক্রমে, সে পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলে কাজ করছে।

সমস্ত শুনে দুঃখ করে সূর্য বললে, "এত দুঃখ কোরেছ অরুণদা, অথচ আমাকে একবারও জানাওনি, আমাকে এতই পর মনে কর তুমি"

অরুণ সজল কণ্ঠে বললে, "বিশ্বাস কর আমায় সূর্য, তোর কথা আমি একদিনও ভুলিনি। তবে দেশ থেকে অমন ভাবে পালিয়ে আসার জন্য আমার মনে বড় ক্ষোভ ছিল। ইচ্ছে ছিল যদি মানুষ হতে পারি তবেই তোর কাছে মুখ দেখাবো। আজ আমার সে ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেছেন"।

দুই বন্ধুকে একসঙ্গে দেখে কৃষ্ণশরণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে সকলে একসঙ্গে গল্প করলেন। আশ্চর্য, তিনি একবারও সূর্যকে তাহার বিষয় কিছু জিগ্যেসও করলেন না। ওর জীবনের এই পরিণাম তিনি যেন জানতে পেরেছিলেন। শুধু কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার বললেন, "শোন সূর্য, আমি যখন থাকবোনা; তখন মায়ের মন্দিরে, তুই নিজে হাতেই প্রদীপ দিস। আর তুই যদি কার্যোপলক্ষে কখনও বিদেশে থাকিস, তাহলে, আমার ভাবী বউমা, সিউলীর

হাতেই প্রদীপ জ্বালাবার ভার দিস। দেখিস প্রদীপ জ্বালাতে কোনও দিন ভুল না হয়। ভুলে যাসনি, ভবানীর বংশগত নির্দেশ মন্দিরের প্রদীপ না জ্বাললে, কিংবা নিভে গেলে, এই বিখ্যাত চৌধুরী বংশেরও কোনও না কোনও সুবের বাতী নিভে যাবে।"

এমন সময় বৃদ্ধা লক্ষ্মী হাতে বাতী নিয়ে এসে সে ঘরে প্রবেশ করল। কৃষ্ণশরণের চোখে আলো লাগতে; তিনি প্রশ্ন করলেন কে"?

বললে, 'আমি লক্ষ্মী ছোটবাবু, আজ কি আপনার শরীর ভালো নেই"?

কৃষ্ণশরণ বললেন, "কেন লক্ষ্মী, আজ ত আমার শরীর বেশ ভালোই লাগছে"—

লক্ষ্মী শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, "তবে মায়ের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালা হয়নি আজ কেন ছোটবাবু"?

"এ্যাঁ, ভবানীর মন্দিরে প্রদীপ জ্বলেনি আজ? হ্যাঁরে সূর্য, আমি আজ মন্দিরে যাইনি সন্ধ্যাবেলা? কৃষ্ণশরণ উঠে বসেছিলেন, এবার দাঁড়ালেন। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীর তখন রীতিমত কাঁপছে। সূর্য তাঁকে সবলে আকড়ে ধরে রইল। কৃষ্ণশরণ তখন প্রলাপ বকছেন, "মা এই ছিল তোর মনে? ভবানী ভবানী? ক্ষমা কর মা, অধম সন্তানের ভুল ক্ষমা কর। ওরে সূর্য আমার পূজার ভার দে; আমি এখনি মন্দিরে যাবো"।

সূর্য আর অরুণ জোর করে তাঁকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললে; "কাকাবাবু আপনি বসুন আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি"—

কৃষ্ণশরণ বিছানায় বসে কাঁপতে লাগলেন; "ওরে দেরী করিসনি, আর সময় নেই"—

সূর্য বললে, "লক্ষ্মীদিদি, তাড়াতাড়ি যাও, প্রদীপ নিয়ে এস। আর ভুবন কাকাকে একবার খবর পাঠাও আসবার জন্য। অরুণদা তুমি ভাই ছুটে যাও একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস"।

লক্ষ্মী ও অরুণ চলে গেল। সূর্য কৃষ্ণশরণকে তাঁর পূজার কাপড় পরিয়ে দিল; কপালে এঁকে দিল লাল সিঁদুরের ফোটা; হাতে সোনার প্রদীপ তুলে দিয়ে বললে, "চলুন কাকাবাবু আমার হাত ধরে"—

কৃষ্ণশরণ উঠে বললেন, "আমায় একবার আমার খাস্ কামরায় নিয়ে চল সূর্য"।

ততক্ষণে বাড়ীর দাস দাসী, যে যেখানে ছিল, সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সূর্যর ইঙ্গিতে সকলে বাতী হাতে করে তাদের সঙ্গে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। কৃষ্ণশরণের ঘরের দরজা খোলা হ'লে তিনি এগিয়ে গেলেন ভিতরে, যেখানে দেওয়ালের গায়ে মায়ের পট্টা ঝোলানো ছিল সেখানে গিয়ে দেওয়ালে, বার বার মাথা ঠুঁকে তিনি বালকের মত কাঁদতে লাগলেন, "ভবানী এই ছিল তোর মনে? শেষে আমাকে দিয়ে ভুল করালি? মা আমায় ক্ষমা করিস; অপরাধ ক্ষমা করিস মা" প্রণাম শেষ করে যেই দরজা দিয়ে বেরুতে যাবেন; সেই সময় হঠাৎ তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটীতে পড়ে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সেদিন ভবানীর মন্দিরে আর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলল না। ভবিষ্যতে আর জ্বলবে কি না, তাও বলতে পারেন একমাত্র সেই চৌধুরীদের বংশদেবতা, মা ভবানী। এক বিরাট মহীরুহ সহসা ভূপাতিত হোল। চৌধুরী বংশের আর এক সূর্য অস্ত গেল। নবীন সূর্য তাঁর মহান অস্তপথের দিকে চেয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠল। হায় সূর্য, তুমি আজ পিতৃহীন হলে। তোমার মাথার উপর থেকে ছায়া-ছত্র সরে গেল। কাঁদো সূর্য, কাঁদো; অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, কিন্তু কোনও দিন বিচলিত হওনি; অশ্রু ত্যাগ করোনি, আজ কাঁদো; প্রাণ ভরে কাঁদো। দেখ তাতে যদি সান্ত্বনা পাও কিছু?

কৃষ্ণশরণের আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই কাঁদল। কঠিন চোখে শুধু জল করল না একজনের। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণশরণের ইষ্ট দেবী মা ভবানী। পাথরের মন্দিরের মধ্যে তিনি কঠিন চোখে চেয়ে রইলেন শূন্য পানে। তবে কি তিনিই তাঁর ভক্ত সন্তানকে ডেকে ছিলেন কাছে? তার তাপিত প্রাণে সান্ত্বনা দেবার জন্য? তাহলে এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর কখনও ত এমন মারাত্মক ভুল হয়নি? সূর্য দৃঢ় কণ্ঠে বলে, না আমি ওই পাথরের মূর্তির পায়ে প্রণাম কোরবো না। ওর দয়া নেই, মায়া নেই—আছে শুধু আক্রোশ। প্রস্তর-কঠিন আক্রোশ: ও ত দেবী নয়, ও হচ্ছে পাষাণী। (ক্রমশঃ)

সাগর বলাকা

শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় ও চতুর্থ অংকের মধ্যে দুই বৎসর পার হয়ে গেছে।

[দোরিণের বাড়ির একটা বসবার ঘর কনষ্টানটিন ট্রায়েপলিভের পড়ার ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার পথ। পাশের আর একটা কাচের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। বসবার ঘরের সাধারণ আসবাব পত্র ছাড়াও ডান কোণে একটা পড়ার টেবিল, একটা বুক কেস বইয়ে ভর্তি, তাছাড়াও চেয়ার ও আশে পাশে ছড়িয়ে আছে। বিকেল হয়ে এসেছে, ঢাকনা দেওয়া একটা আলো জ্বালান হয়েছে। আধো অন্ধকারে সারা ঘর আবৃত। বাগানের গাছ-গুলোতে প্রতিহত হয়ে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস এসে মাঝে মাঝে চিমনিতে কাপটা মারছে।]

(মেডভেডিনকো ও মাসা এসে ঢুকলো)

মাসা—কনস্টানটিন পেত্রিলিচ! কনস্টানটিন পেত্রিলিচ! (চারিদিকে তাকিয়ে) তাই তো, এখানে তো কেউ নেই। বুড়োর জ্বালায় আর পারিনে সব সময়ই শুধু "কসটে কোথায়, কসটে কোথায়"!... ওকে ছাড়া এক মিনিটও যেন থাকতে পারে না···

মেডভেডিনকো—একা থাকতে উনি ভয় পান। (বাইরের দিকে লক্ষ্য করে) কী বিশ্রী দিন করেছে, দু'দিন হয়ে গেল অথচ একটু কমলো না।

মাসা—(আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে) লেকে কী ঢেউ উঠছে দেখেছো!

মেডভেডিনকো—ইস্ বাইরে কী অন্ধকার। বাগান থেকে নাটা মন্দটা খুলে ফেলা উচিত ছিল, কেমন যেন কংকালের মত দাঁড়িয়ে আছে আর পর্দাটা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে। কাল রাতে আমি যখন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমার মনে হলো কে যেন ওখানে বসে কাঁদছে।

মাসা—তাই না কী?

[একটু চুপচাপ]

মেডভে—চল মাসা বাড়ী যাই।

মাসা—(অসম্মতিতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে) না, আজ রাতে আমি এখানে থাকবো।

মেডভে—(অনুরোধের সুরে) চল মাসা যাই, আমাদের খুকীর নিশ্চয়ই এতক্ষণে খিদে পেয়েছে।

মাসা—কেন? ধাই তো রয়েছে।

[একটু চুপচাপ]

মেডভে—কী আশ্চর্য! আজ নিয়ে তিন রাত হতে চললো সে মাকে ছাড়া আছে।

মাসা—অসহ্য! সব সময়ই এক বক্‌বকানি নিয়েই আছ—"খুকী আর-বাড়ী, বাড়ী আর খুকী।"

মেডভে—না মাসা, চল যাই।

মাসা—যেতে হয় তুমি যাও।

মেডভে—তোমার বাবা কী আমার যাবার জন্য ঘোড়া দেবেন।

মাসা—চেয়েই দেখ না। দেবেন হয়ত।

মেডভে—দেখি চেষ্টা করে। তাহলে তুমি কাল ফিরে আসছো?

মাসা—(নম্র নিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ যাবো'খন। যত সব...

[ট্রায়েপলিভ ও পলিন এন্ড্রিয়েভনা এসে ঢুকলো। পলিন ট্রায়েপলিভের পড়ার টেবিলের পাশে এসে একটা পাণ্ডুলিপি দেখতে লাগলো।]

মেডভে—আমি তবে চললুম মাসা। (মাসার হাতে চুমু খেয়ে) মা, আমি তবে আসি।

পলিন—(বিরক্তির সুরে) এসো, ভগবান তোমার

[মেডভেডিনকো বেরিয়ে গেল]

পলিন—(পাতুলপির দিকে তাকিয়ে) কে ভাবতে পেরেছিলো যে তুমি শেষ পর্যন্ত একজন রিয়ালিস্টিক লেখক হয়ে দাঁড়াবে। আর শেষ পর্যন্ত পত্রিকাগুলো থেকে টাকাও পাঠাতে সুরু করেছে। (ট্রায়েপের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) তুমি এখন কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে .....কস্‌টে, আমার মাসেংকাকে একটু ভাল চোখে দেখতে সুরু কর

মাসা—মা, ওকে একলা থাকতে দাও।

পলিন—(ট্রায়েপকে) ওর মত মেয়ে হয় না। (একটু বাদে) কস্‌টে মেয়েরা কিছু চায় না, শুধু একটু প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, এ আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

[ট্রায়েপলিভ উঠে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে চুপচাপ বেরিয়ে গেল]

মাসা—হলো তো, ওকে তো রাগিয়েই দিলে। থাক্, তোমাকে আর উকালতি করতে হবে না।

পলিন—তোর জন্যই তো আমার সব ভাবনা।

মাসা—থাক্, তার কোন দরকার নেই।

পলিন—তোর ব্যথা যে আমি সইতে পারি নে। আমি সব দেখি, সব বুঝি।

মাসা—যত সব! এমনি ভালবাসা উপন্যাসেই মানায় —মাটির পৃথিবীতে এর কোন দাম নেই। এমনি ভাবে কতকাল আর অপেক্ষা করা চলে, এ যেন সমুদ্রের ধারে বসে সুদময়ের প্রতীক্ষা.....যে করেই হোক এর সমাপ্তি আমি ঘটাবই। ওরা বলছিল আমাকে নাকী কিছু দিনের মধ্যে দূরে বদলি করে দিচ্ছে। থাক্, সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই মন থেকে সমূলে এই আপাছা তুলে ফেলবো।...(একটু চুপচাপ) আসল কথা কী জান মা? ওকে না দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বদলির ব্যবস্থাটা করে দাও, আমি এক মাসের মধ্যেই সব ভুলে যাবো।

[বাঁ দিকের দরজা খুলে গেল, সোরিনের চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে মেডভেডিনকো ও ডরণ এসে ঢুকলো।]

মেডভেডিনকো—বাড়ীতে এখন ৮'জন আছি, আর মজদার যা দাম।

ডরণ—ইস্, তোমাকে তো অনেক কথা ভাবতে হয়।

মেডভে—এসব কথা আপনার পক্ষে হাসির হতে পারে, প্রচুর টাকা হাতে আছে যে।

ডরণ—টাকা? এই ত্রিশটি বছর রাত্রি দিন প্রাকৃটিস্ করে কত জমিয়েছিলাম জান? মাত্র দু'হাজার রুবল। আর এবার বাইরে গিয়ে তার সবই শেষ করে এসেছি। এখন আমার হাতে এক কপর্দকও নেই।

মাসা—(আমাকে) তুমি যাওনি?

মেডভে—কেন? ওরা ঘোড়া দিল না যে!

মাসা—(বিরক্তিভরা তিক্ত কণ্ঠে, চাপা গলায়) তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না।

[চেয়ারটা ঘরের বাঁ দিকের অর্ধেকটাতে এনে রাখলো; পলিন, এনড্রিয়েভনা, মাসা, ও ডরণ কাছাকাছিই বসলো। মেডভেডিনকো বিমর্ষভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো]

ডরণ—এযে দেখছি সব ওলট পালট করে ছাড়লে—বসবার ঘরকে করেছ পড়ার ঘর।

মাসা—কনস্টানটিনের পক্ষে এইটেই সুবিধে, যখন খুসী বাইরে বাগান থেকে ঘুরে আসতে পারে।

সোরিন—আমার বোন গেল কোথায় বলতে পার?

ডরণ—উনি ষ্টেশনে ট্রীগরিণকে আনতে গেছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন।

সোরিন—কস্‌টেকে উপন্যাস লেখার একটা বিষয়-বস্তু দেবো ভাবছি। বয়েস কালে লেখক হবার খুব সখ ছিল, কিন্তু হতে পারলাম কই? আকর্ষণীয় ভাবে কথা বলবো ভাবি কিন্তু সবার কাছেই প্রতিকটু হয়ে পড়ে.... বিয়ে করবো ভেবে কত কল্পনার জাল বুনেছি, সবই বৃথা। সব সময়ই সহরে থাকার প্রবল ইচ্ছা মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে কিন্তু জীবনের শেষ দিনকটাও এই গ্রামের বাড়িতেই কাটলো···এই হলো ব্যাপার।

ডরন—আইন পরিষদের সদস্য হতে চেয়েছিলেন, হয়েছিলেন তো।

সোরিন—ও আমি চাইনি, আপনি এসে গেছে।

[ট্রায়েপলিভ ঢুকে, সোরিনের পা'র কাছে এসে বসলো। দাক্ষণের মধ্যে মাসী একবারও তার থেকে চোখ ফেরায় নি।]

মেডভেডিনকো—আচ্ছা ডাক্তার বাইরের কোন সহর আপনার সব চাইতে ভাল লাগে।

ডরণ—গোয়েনা।

মেডভেডিনকো—গোয়েনা?

ডরণ—সেখানকার রাস্তায় ভিড়ের শেষ নেই। বকেলে হোটেল থেকে বেরুতেই দেখবে লোকজনের সে কী সমারোহ। রাস্তায় নামার কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে তুমি ভিড়ের একাংশ হয়ে গেছ। এইবার তুমি হয়ত নীনার সেই নাটকের মত ভাবতে সুরু করবে আত্মিক একতার কথা। ভাল কথা, নীনার খবর কী?

ট্রায়েপ—ভালই আছে হয়ত।

ডরন—শুনলাম সে নাকী এখন একলা আছে? জান নাকী?

ট্রায়েপ—সে অনেক কথা।

ডরন—কম কথায় বলে ফেল।

ট্রায়েপ—সে বাড়ী থেকে ট্রীগরিনের কাছে পালিয়ে যায়, সে কথা তো সবারই জানা।

ডরন—হ্যাঁ।

ট্রায়েপ—একটা ছেলেও হয়েছিল। ছেলেটি মারা যায়। কিছুদিন বাদে ট্রীগরিনের ভালবাসার ভেদ পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে তার পুরনো আকর্ষণেই ফিরে যায়। আমার মনে হয়, সে পুরনোকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয় নি, বেড প্রেমকেই জীবনের উপজীব্য করে নিয়েছিল। আমি যতদূর জানতে পেরেছি, নীনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ডরন—আর তার অভিনেত্রী জীবন?

ট্রায়েপ—তাতোধিক ব্যর্থ। সে প্রথমে মস্কোর পাশে ছোট একটা থিয়েটারে যোগ দেয়, তার কিছুদিন বাদে ওখান থেকে চলে যায়। তখন সব সময়ই সে যেখানে যেতো আমিও সাথে সাথে যেতাম। সব জায়গাতেই দেখেছি, সে সাধারণত বড় পার্ট নিয়েছে, কিন্তু কোন জায়গাতে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মাঝে মাঝে এক আধটা চীৎকারে বা মৃত্যুর দৃশ্যে ক্ষণিকের জন্য প্রতিভার পরিচয় মিলতো।

ডরণ—এতে মনে হয় তার মধ্যে কিছুটা প্রতিভা নিশ্চয়ই ছিল।

ট্রায়েপলিভ—বলা শক্ত। তবু মনে হয়, ছিলও ছিল। আমার সাথে ও কখনই দেখা করতে চাইতো না, ওর চাকর বাকরেরা আমাকে ওর ঘরে ঢুকতে দিত না। আমিও তার মনের অবস্থাটা বুঝে, দেখা করার জন্য কোন চেষ্টা করতাম না। [একটু চুপচাপ] তারপর, বাড়ী ফিরে এসে ওর চিঠি পাই। সে কারো উপর কোন দোষারোপ করতো না, তবু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারতাম, কী নিদারুণ মর্মবেদনার মধ্যে তার দিন কাটছে। প্রতিটি ছত্র থেকে একটা অবিশ্বাসের অভিশাপে ম্রিয়মাণ, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় ক্লান্ত একটা মুখ ভেসে উঠতো। চিঠির নীচে সে লিখতো—'সাগর-বলাকা'। সে এখন, এখানেই আছে।

ডরণ—এখানে মানে?

ট্রায়েপ—এখানকার সহরে একটা হোটেলে। পাঁচ দিন থেকে সেখানে একটা ঘর নিয়ে আছে। আমি আর বেশী ইলেসনা গিয়েছিলাম, সে কারো সাথেই দেখা করেনি। যেমন সেমনোভিচ বলেছিল, সে নাকী কাল তাকে এখান থেকে দু'মাইল দূরে একটা মাঠে দেখেছে।

মেডভেডিনকো—আমি তাকে সহরের দিকে হেটে যাবার পথে দেখেছি। ডেকে—আলাপ করতে চাইলাম, সে বললো—পরে দেখা করবে

ট্রায়েপ—সে আসতে পারে না। [একটু চুপচাপ] তার বাবা আর সৎ মা তার সাথে কোন পরিচয় রাখতে চান না, তারা সব দিকে কড়া পাহারা রেখেছে সে যেন

এদিকে আসতে না পারে। (ডাক্তার ও নিজে টেবিলের দিকে উঠে গেল) ডাক্তার, কাগজে কলমে দার্শনিক হওয়া কত সহজ আর বাস্তিগত জীবনে তা কত কঠিন।

সোরিন—সত্যি, চমৎকার মেয়ে ছিল আমাদের নীনা

[বাইরে সেমরিয়ডের হাসি শোনা গেল]

পলিন—তারা ষ্টেশন থেকে ফিরেছে বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাপ্লেপ—হাঁ, মার গলা শুনলুম।

[২' একাদিন ও ট্রীগরিণ তাদের পেছন পেছন সেমরিয়েভ এলো]

সেমরিয়েভ—সবাই যখন কালের প্রবাহের সাথে সাথে বুড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি তখন দিন দিন যৌবনে ফিরে যাচ্ছেন—পাতলা ব্লাউজ, সদাহাস্যময়ী,...উৎফুল্ল...

মী—আবার আমার দিকে চোখ পড়লো, অসহ্য, অসহ্য!

ট্রীগরিণ—(সোরিনকে) কেমন আছেন, পেটার নিকোলেভিচ্! (মাসাকে লক্ষ্য করে) আরে তুমি যে?

মাসা—আমাকে চিনতে পারছেন?

ট্রীগরিণ—বিয়ে করেছ না কী?

মাসা—অনেক দিন।

ট্রীগরিণ—তুমি সুখী তো? (ডরন ও মেডভেডি-কোর সাথে করমর্দন করলো, তারপর ইতস্ততঃ ভাবে ট্রাপ্লেপলিপের পাশে এসে দাঁড়ালো) এরিন নিকোলে-ভেনা বলছিলেন, যা হয়েছে তুমি নাকী তা সব ভুলে গেছ, এখন আর আমার উপর রাগ নেই।

[ট্রাপ্লেপলিভ করমর্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়াল]

মী—(ছেলেকে) বোরিস এলিক্সেয়েভিচ একটা পত্রিকা নিয়ে এসেছেন তাতে তোমার একটা নতুন গল্প বেরিয়েছে।

ট্রাপ্লেপ—(পত্রিকাটা নিয়ে, ট্রীগরিণকে) আপনাকে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

ট্রীগরিণ—তোমার প্রশংসাকারীদের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি...পেটার্সবার্গ আর মস্কোর পাঠকগোষ্ঠি তোমার সম্বন্ধে বেশ উৎসাহী, তারা আমাকে তোমার কথা অনেক করে জিজ্ঞেস করেছে। 'তুমি কী ভালবাস, তোমার বয়েস কত, তুমি দেখতে মরলা না ফর্সা' এমনি কত প্রশ্ন। কেন জানিনা সবারই ধারণা তোমার বয়েস অনেক বেশী। আর ছদ্মনামে লেখার পর থেকে তোমার আসল নাম কেউ জানে না। এ যেন একেবারে লৌহ যবনিকার অন্তরালের মানুষের মত।

ট্রাপ্লেপ—আপনি ক'দিন থাকবেন তো?

ট্রীগরিণ—না কালই মস্কো রওনা হয়ে যাবো। আমাকে যেতেই হবে; একটা উপন্যাস শেষ করার তাগিদ আছে- তাছাড়া পত্রিকায় লেখাও দিতে হবে।

[তারা যখন কথা বলছিলো, ততক্ষণে মী একাদিন ও পলিন একটা টেবিল এনে ঘরের মাঝখানে রাখলো, সেমরিয়েভ মোম জেলে আনলো ও চেয়ারগুলো টেনে দিল। তাক থেকে লুডো বের করে আনলো]

ট্রীগরিণ—এসে নামতে না নামতেই দিনটা খারাপ করে বসলো। কাল সকালে ভাল থাকলে লেকে মাছ ধরতে যাবো। আর তাছাড়া বাগানটাও একবার ঘুরে আসবো—সেই যেখানে তোমার নাটক অভিনীত হয়েছিল। আমার মাথায় একটা ভাব এসেছে, সব দেখে শুনে সেটাকে নতুন করে নেবো শুধু।

মাসা—(বাবাকে) বাবা, আমার স্বামীকে একটা ঘোড়া দিতে পারবে, তার বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন।

সেমরিয়েভ—(আশ্চর্য হয়ে) ঘোড়া...। নিজের কথাই তো শুধু ভাবছো। ঘোড়াগুলো এইমাত্র ষ্টেশন থেকে এলো, আমি কা দিনরাত ওগুলোকে আর বিশ্রাম দেবো না?

মাসা—এ ছাড়াও তো ঘোড়া আছে।...(তার বাবাকে চুপ করে যেতে দেখে) তোমাকে জিজ্ঞেস করার আগেই আমার বুঝা উচিত ছিল।

মেডভেডিনকো—পাক্ মাসা, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।

পলিন—এই দিনে হেটে যাবে (টেবিলের পাশে

বসে) তোমরা বসবে তো এসো।

মেডভেঙ—এখান থেকে চ'মাইল...(স্ত্রীর হাতে চুমু খেয়ে) আজকের মত তবে বিদায়...মা তবে চলি (পলিন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাত বাড়িয়ে দিল) আমার খুকীর জন্য আমি কাউকে জ্বালাতন করতে চাইনে।

[অপ্রস্তুত ভাবে বেরিয়ে গেল]

পলিন—আঃ তোমরা খেলবে না কী, এসো। এখনই বোধ খাবার ডাক আসবে।

(সেমরিয়েভ, মাসা ও ডরন এসে বসলো।)

মী—(ট্রীগরিণকে) শরৎ কালের লম্বা বিকেলটা ওরা এমনি করে লুডু খেলেই কাটিয়ে নেয়। জান এই লুডু-টাতে, ছোট ছিলাম যখন মার সাথে বসে কত খেলেছি। খেতে যাবার আগে এক গেম খেলবে না কী? (ট্রীগ-রিণকে নিয়ে খেলতে বসলো।)

ট্রায়েপ...(পত্রিকাটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে) আমার লেখার পাতাটা পর্যন্ত কাটে নি।

[সে পত্রিকাটা টেবিলের উপর রাখলো, বাঁ'দিকের দরজার দিকে বেরিয়ে গেল, মার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর মাথায় চুমু খেল।]

মী—কস্‌টে তুমি?

পলিন—ও সব সময়ই কেমন যেন মনমরা।

সেমরিয়েভ—পত্রিকার সমালোচনা ও সহ্য করতে পারে না।

ট্রীগরিণ—সে একটা নতুন দৃষ্টিভংগী নিয়ে লেখতে সুরু করেছে সত্যি; কিন্তু এখন পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ওর লেখায় একটা অসাধুতার ছাপ থেকে যায়। কোন একটা চরিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠে না। এমনি লেকের ধারে থাকলে, হয়ত সারা জীবন মাছ ধরেই কাটিয়ে দিতাম।

ডরণ—কনস্‌টানটিন গেভরলোভিচের প্রতি আমার আস্থা আছে। ওর যেন কী একটা বলার আছে। ওর গল্পগুলি সরস ও সুন্দর হয়ে উঠে, আমার বেশ ভালই লাগে। কিন্তু আসল কথা হলো, কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। পড়লে মনে ছাপ থেকে যায়, কিন্তু শুধুমাত্র এতে কতদূর চলা যায়। এরিন নিকোলেভেনা, তোমার ছেলের লেখার জন্য তোমার গর্বিত হওয়া উচিত।

মী—তার কোন লেখাই আজ পর্যন্ত আমি পড়িনি।

[ট্রায়েপলিভ্‌ শান্তভাবে ঢুকে, টেবিলে গিয়ে বসলো]

সেমরিয়েভ—(ট্রীগরিণকে) আপনার একটা জিনিষ এখানে আছে, বলুন তো কী?

ট্রীগরিণ—কী?

সেমরিয়েভ—কনস্‌টানটিন গেভরলোভিচ একবার একটা সাগর বলাকা মেরে ছিল, আপনি সেটা চেয়েছিলেন।

ট্রীগরিণ—তাইতো, মনে পড়ছে না।

ট্রায়েপ—(জানালাটা খুলে ফেলে) ইস কী অন্ধকার! কিছুতেই বুঝতে পারি না, সব সময়ই অস্বস্তি বোধ হয় কেন?

মী—কস্‌টে জানালা বন্ধ করে দাও—জল ঢুকবে। চল সবাই খেতে যাই। খেয়ে দেয়ে এসে আবার খেলা যাবে। (ছেলেকে) পাণ্ডুলিপি রেখে এখন চল কিছু খেয়ে নেবে।

ট্রায়েপ—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।

মী—তোমার যা খুসী।

[পলিন, ডরণ ও শোরিন চেয়ার ঠেলতে লাগলো, পেছন পেছন সবাই বেরিয়ে গেল। ট্রায়েপলিভ শুধু তার টেবিলে বসে রইলো।]

ট্রায়েপলিভ—(লিখতে বসলো, আগের লেখাটা জোরে জোরে পড়তে লাগলো) সাহিত্যে নতুন ধারা আনার কথা তো মুখে অনেক করে বলেছি; কিন্তু গতানু-গতিকতার উর্ধে উঠতে পারলাম কই? (পড়তে পড়তে) "...পাণ্ডুর মুখ চারদিকে গভীর কালো চুলে ঢাকা..."। পাণ্ডুর,...ঢাকা...(শব্দ ক'টা কেটে দিল।) নায়ক ট্রেনের শব্দে জেগে উঠলো, এখান থেকে আবার সুরু করবো। চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যার বর্ণনাটাও কেমন যেন একটু বড় হয়ে গেছে। ট্রীগরিণ কিন্তু নিজের মন মত একটা ধারা তৈরি করে নিয়েছে। (একটু চুপ চাপ) কতদিন থেকে

আমার মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছে একজন নতুন বা পুরনো ধারার কথা চিন্তা না করেও, অনুভূতির প্রেরণায় লিখে যেতে পারে। (কে যেন কাচের জানালায় এসে টোকা দিল) কে? (বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি ...(জানলা খুলে, বাগানের দিকে তাকিয়ে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে না। (উচ্চস্বরে)

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে, বাইরে তার পদশব্দ শোনা

আধমিনিটের মধ্যেই নীনাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো নীনা! নীনা!

(নীনা তার মাথা ট্রায়েপলিভের বুকের পর এলিয়ে দিল)

ট্রায়েপ—(আত্মভোলা ভাবে) নীনা! নীনা তুমি!... আজ সারাটা দিন কী যে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়েছি (তার পা থেকে কোট ও টুপি খুলে নিয়ে) প্রিয় আমার ...এতোদিনে তুমি এলে। কেঁদো না লক্ষীটি।

নীনা—আশপাশে কেউ আছে না কী?

ট্রায়েপ—না, কেউ নেই।

নীনা—দরজা বন্ধ করে দাও, কেউ এসে পড়তে পারে।

ট্রায়েপ—না, এখন কেউ আসবে না।

নীনা—এরিন নিকোলেভিনা এখানে আছেন। তুমি দরজা বন্ধ করে এসো...

ট্রায়েপ—(ডান দিকের দরজা বন্ধ করে, বাঁদিকে যেতে যেতে) এ দরজাটায় তো বন্ধ করার কিছু নেই, আচ্ছা চেয়ারটা ঠেলে দিলেই হবে। (একটা চেয়ার দরজার দিকে টেনে দিল) তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন? এখন কেউ আসবে না।

নীনা—(স্থির দৃষ্টিতে ট্রায়েপলিভের দিকে তাকিয়ে) তোমাকে ভাল করে দেখতে দাও। বেশ গরম লাগছে তো, এটাতো আগে বসবার ঘর ছিল। আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাই না?

ট্রায়েপ—হ্যাঁ, বেশ শুকিয়ে গেছ, আর চোখ দু'টোও বেশ অনেক বড় বড় ঠেকছে। তুমি আরও আগে কেন আমার সাথে দেখা করলে না, কেন আমাকে দেখা করতে দিলে না। তুমি এক হপ্তা হয়ে এলো এখানে আছ, প্রত্যেক দিন আমি তোমাকে দেখতে যেতাম, তোমার জানালার নিচে রক্তে ভিখেরির মত দাঁড়িয়ে থাকতাম।

নীনা—আমার ভয় হতো, তুমি বুঝি আমাকে ঘৃণা করবে। প্রতি রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখতাম, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না। এখানে আসার পর থেকে প্রত্যেক দিন লেকের ধারে ঘুরে বেড়াই, কতবার তোমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি কিন্তু ঢুকতে ভরসা পাই নি। এসো বসে নিই, (বসে) এসো, বসে বসে আমরা শুধু গল্পই করে যাই। ইস্ বাইরে বাতাসে কি শব্দ হচ্ছে। টুরগেনিভ এক জায়গায় বলেছেন "এমনি রাতে যার থাকবার মত একটা ঘর আছে, বসবার মত একটা আশ্রয় আছে, সেই পৃথিবীতে সব চাইতে সুখী"। না, না তা নয়, (মাথা দুলিয়ে) কী জানি বলছিলাম? হ্যাঁ টুরগেনিভ..."ভগবান এইসব ঘরছাড়াদের করুণা করুন।"... তুমি কিছু মনে করছো না তো? [দীর্ঘশ্বাস ফেললো]

ট্রায়েপ—নীনা...নীনা!

নীনা—তোমার পাশে বসে থাকতে কী যে ভাল লাগছে···দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম কেঁদেছি। কাল রাতে বাগানে সেই থিয়েটারের মঞ্চটা এখনও আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। দু'বছরের মধ্যে সেই প্রথম কাঁদলাম, আমার চোখের জলের সাথে মনের গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল, নিজেকে অনেক হালকা বোধ হতে লাগলো। দেখ, এখন আর কাঁদছিনে (হাত ধরে) সত্যি সত্যি তুমি আজকাল লিখছো...তুমি লেখক আর আমি অভিনেত্রী... আমাদের জীবনে কত পরিবর্তন এসে গেছে।...আমার জীবন হয়ত শিশুর মত আনন্দে নেচে গেয়ে কাটতো। তোমাকে ভালবাসতাম—খ্যাতির স্বপ্ন দেখতাম—আর আজ? জান কাল সকালে এলটেজে যাবার পথে, কৃষকদের সাথে তৃতীয় শ্রেণীতে আমাকে যেতে হয়েছে।

ট্রায়েপ—এলটেজে কেন গিয়েছিলে?

নীনা—সমস্ত শীত মরশুমের জন্য একটা চুক্তি পত্রে সই করলাম।

ট্রায়েপ—জান নীনা আমি তোমাকে ঘৃণা করতে

অনেক চেষ্টা করেছি, তোমার চিঠি তোমায় ফেরৎ পাবার সাথে সাথেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি, তবু সব সময়ই আমার মনে হয়েছে আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সাথে গাঁথা হয়ে গেছে। তোমাকে ভাল না বেসে থাকা আমার ক্ষমতার বাইরে। তোমাকে হারাবার পর থেকে আমার লেখা ছাপা হতে সুরু হলো। নিজের কাছেই জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো, আমার মনে হলো যৌবন যেন কোথায় উবে গেছে, পৃথিবীতে যেন একশ বছর থেকে বাস করে চলেছি, এই পৃথিবীর মাটি আমি চুম্বন করে ফিরেছি, যেখানে তোমার স্মৃতির পরশ মাখান আছে সেই পথের বুকেই তোমার হাসিমাখা মুখ জেগে উঠেছে, আমার জাগরণের সেই ধ্রুবতারাকে সব সময়ই নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি।

নীনা—(অভিভূত ভাবে) ও এ সব কথা কেন বলছ!

ট্রাপ—আমার একাকিত্ব আমাকে পাগল করে দেয়, বুকভরা ভালোবাসার সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তির মধ্যেও এখন আর আমাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে রাখে না। আমার সমস্ত লেখাই কেমন যেন প্রাণহীন, শুষ্ক হয়ে পড়েছে। নীনা, আমার একটা অনুরোধ রাখ, এখানে থাক, তা নইলে আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল, আমার জীবনকে এইভাবে মরুভূমি করে দিও না।

[নীনা তাড়াতাড়ি কোট ও টুপি পরে নিল]

ট্রাপ—নীনা, এখনই যাবে?...[একটু চুপচাপ]

নীনা—বাইরে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। (অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে) আমাকে একটু জল দাও...

ট্রাপ—(তার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে) তুমি এখন কোথায় যাবে?

নীনা—সহরে (চুপচাপ) এরিন এখানে আছে?

ট্রাপ—হ্যাঁ। (একটু পরে) কাকা ক'দিন আগে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

নীনা—তুমি এই কথা কেন বললে, আমি যে মাটির উপর দিয়ে চলেছি তাতে চুম্বন করে ফিরেছ? (টেবিল চেপে ধরে] ইস্, কী ক্লান্ত? একটু বিশ্রাম...। [মাথা তুলে] আমি সাগর বলাকা...তাই না? (ট্রীগরিণ ও মী একাদিনের গলার স্বর শুনে, দৌড়ে বাঁ দিকের দরজার দিকে গিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে তাকাল) সেও এখানে এসেছে ..(ট্রাপলিভের কাছে ফিরে গিয়ে)...কিন্তু... কেন...থাম, সে কখনও থিয়েটারে বিশ্বাস করেনি, বিদ্রূপের মধ্যে আমার স্বপ্নকে ডুবিয়ে দিয়েছে, তারপর আস্তে আস্তে আমিও মনের জোর হারিয়ে ফেললাম...এর পর ভালবাসা সম্বন্ধে ঈর্ষা, অবিশ্বাস আর সেই বাচ্চার জন্ম সব সময়ের ভীতি আমার সমস্ত উলট পালট করে দিল; কী করে কথা বলতে হয়, কী করে মঞ্চে দাঁড়াতে হয় সব কিছুতেই আমার সেই অজ্ঞতা আর মানসিক অশান্তি মিলে আমার প্রতিভাকে ধ্বংস করে দিল ...আগে তো আমি এমনি ছিলাম না, মনের আনন্দে থিয়েটারে নাবতাম, থিয়েটারে নামার কল্পনা আমাকে মাতাল করে দিত। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি, খ্যাতি বা যশ লেখক বা অভিনেত্রী জীবনের প্রাণ রসকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, আসল কথা হলো জীবনের তিক্ততার মধ্যে তুমি কতটা সহ্য করার ক্ষমতা দেখাতে পেরেছ। বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের উপরই সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে .....আচ্ছা, আমি এখন যাই। যদি কোনদিন বিখ্যাত অভিনেত্রী হতে পারি, দেখা করো [হাত ধরে] প্রতিজ্ঞা কর।...উঃ আমি আর দাঁড়াতে পারছি না,... শ্রান্ত, ক্লান্ত।

ট্রাপ—একটু দাঁড়াও, তোমার জন্ম খাবার নিয়ে আসি।

নীনা—না, না, সে হয় না.....আমি যাচ্ছি।..... ট্রীগরিণকে কিছু বলো না।...আমি তাকে ভালবাসি।... আগের চাইতে গভীর ভাবে এখনও ভালবাসি...কস্‌টে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে? কী সুন্দর, সুখের জীবন কাটিয়েছি—ফুলের মত নিষ্পাপ ভালবাসা দু'জনকে আবিষ্ট করে রেখেছিলো।...মনে পড়ে?...

[দ্রুত ট্রাপলিভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঁচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল] [একটু চুপচাপ]

[ট্রাবেপলিত শান্ত ভাবে তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো করে টেবিলের নিচে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডানদিকের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল...]

ভরণ—(দরজায় ধাক্কা দিয়ে) আশ্চর্য... ভিতর দিয়ে বন্ধ কেন? (চেয়ারটা সরিয়ে ঢুকলো) এই ভাবে বন্ধ করলো কে?

[মী একাদিন ও পলিনের পেছন পেছন জেকোভ এলো, তার হাতে কয়েকটা বোতল। শেষে এলো মাসা, সেমরিয়েভ ও ট্রীগরিণ]

পলিন—(জেকোভকে) চা নিয়ে এসো, আমরা খেলবো। (মোম জ্বালিয়ে খেলার টেবিলের দুপাশে বসলো সবাই]

সেমরিয়েভ—(ট্রীগরিণের দিকে, মৃত সাগর বলাকা এগিয়ে দিয়ে। সেই গল্পটার কথা বলছিলাম না, সেই সাগর বলাকা?

ট্রীগরিণ—(সাগর বলাকার দিকে তাকিয়ে) কী ব্যাপার? আমার কিছুই তো মনে পড়ছে না?

[ডানদিক থেকে একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দ এলো, সবাই ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠলো]

মী—(ভয় পেয়ে) কী হলো?

ভরণ—ভয় পাবার মত কিছু নয় নিশ্চয়ই। ওষুধের বাক্স থেকে কিছু ফেটে গেছে নিশ্চয়ই। (ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এলো) তাই। একটা বোতল ফেটে গেছে।

মী—(বসে) উঃ কী ভয়ই না পেয়েছিলাম...

ভরণ—(পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ট্রীগরিণকে) মাস দুয়েক আগে একটা লেখা বেরিয়েছিল, সে সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো (ট্রীগরিণের কাঁধে হাত দিয়ে, তাকে সামনের দিকে টেনে এনে নিচু কণ্ঠে) এরিন নিকোলেভেনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, ব্যাপার কী জানেন, কনস্টানটিন গেওরিলোভিচ নিজেকে নিজে গুলি করেছে...

[পর্দা পড়লো]

সমাপ্ত

অবসান

ডাঃ সত্যপদ রায় চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

অমরনাথের একখানি ঘরে বসে অনিল ও নরেন অমরনাথের অসুখ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করছিল। নরেন জিজ্ঞাসা ক'রলে "অনিলদা, অমরদা'র রোগটা দিন দিন খারাপের দিকে চলেছে না? রেবাদি' খুবই পরিশ্রম করছেন। ওর পরিশ্রম আমাদের মুগ্ধ করেছে।" রেবা গরম দুধের একটি ফ্লাস্ক নিয়ে যাচ্ছিল সেই দিক দিয়ে। অনিল ও নরেনকে গল্প করতে দেখে একটু দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। বললে "আচ্ছা, অনিলদা' রুগীর অবস্থা দেখে তোমার কি মনে হয়, সেরে উঠবেন শিগ্‌গির কি? আমার কিন্তু বড় ভয় হয়।" অনিল বলে, "ভয়ের কারণ যে একেবারে নেই তা নয়। ডাক্তার বলেন সেবা যত্ন পেলে ভাল হয়ে উঠবেন ইনি।" এমন সময়ে অমিয়া আর সবিতা ঢুকলো সেই ঘরে। নরেন, অমিয়া ও সবিতাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, "আপনারা? এখানে? সবি, তোমরা?" অনিলও অবাক হয়ে গেল খুবই। অমিয়া ভেতরে এসে কাউকেও কিছু না বলে সোজা রেবার কাছে গিয়ে বললে, 'তোমার নাম বুঝি রেবা? খুবই আশ্চর্য হ'চ্ছ বুঝি? তা হবারই কথা, আমি যে তোমার অচেনা। বল, তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি কি?" রেবার উত্তরের আগেই নরেন বললে, "হ্যাঁ, ইনিই রেবাদি।" অমিয়া এবার নরেনকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখানে কবে এলে? উনি কোথায়? নরেন উত্তর দিলে, "আমি তো সেই দিনই কাকাবাবুর সঙ্গে চলে এসেছি আর সেই থেকেই এখানে আমি থাকি।" সময়নাথ এখন বাইরে সে কথাও জানিয়ে দিলে সে। রেবা এতক্ষণ সকলের মুখের দিকে চেয়েছিল। কিছু ঠিক করতে না পেরে বললে, "আপনাদের পরিচয়? ঠিক ধরতে পারছি না, কিছু মনে করবেন না।" অমিয়া বলে, "আমি তোমাদের খুবই আপনার। আমি এখন আসছি পিসিমা অর্থাৎ তোমার মার কাছ থেকে। তুমি এখানে আছ শুনে এসেছি তোমার সঙ্গে পরিচয় করতে। সবি, এই তোমার রেবাদি।" রেবা খুবই অবাক হয়ে গেল। বললে, "আমার মা আপনার পিসিমা! আমার মা তো কোনদিন বলেন নি।"

অমিয়া বললে, "হ্যাঁ, অনেক দূর সম্পর্কের আমরা কিনা! পরে আরো অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম আমরা। তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে ছিলাম এতদিন। আমি আবার এলাম নতুন ক'রে ঝালাতে সেই পুরনো সম্বন্ধ।"

সময়নাথ ঘরে ঢুকেই অমিয়াকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর পিছন হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছিলো। রেবা দেখেই তাকে ভিতরে ডাকলে। বললে, "ভেতরে আসুন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।" সময়নাথ ভিতরে এসে সভয়ে বললে, "তুমি এখানে কি করে এলে?" অমিয়া তার অবস্থা দেখে হেসে ফেললে, "অবাক হচ্ছ আমাকে দেখে বুঝি? তুমি কোথায় যাবে আমাকে ফেলে? তাছাড়া দেখতে এসেছি তোমার বন্ধুকে, এতে দোষ কি কিছু হয়েছে আমার?"

সময় বললে, "না-না। তা-তা নয়। তবে তোমার হঠাৎ এই পরিবর্তন বেশ একটু আশ্চর্য মনে হচ্ছে আমার।"

রেবা দুই জনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "সময়দা ইনি আপনার—" অমিয়া খুব হেসে বললে, "রেবা, ইনি তোমার ভগ্নিপতি। দেখছো তো ঠাট্টা করছেন আমার

সঙ্গে, আমাকে নাকাল করতে চান তোমাদের সামনে।" রেবা যেন আকাশ থেকে পড়লো, বললে, "সমরদা আমার ভগ্নিপতি? সত্যি আজ আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে এ কথা জেনে।" একটু পরে বললে "খুব ভাল হল। চলুন সকলে এবার কণীর ঘরে পরিচয় হবে তাঁর সঙ্গে নতুন করে। খুবই খুশী হবেন তিনি।"

দুই

অমরনাথ আজকাল কাউকেও কাছে না পেলে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঘুম ভাঙ্গার পর কাউকেও দেখতে না পেয়ে আপন মনে ভাবতে লাগলো নানা কথা। মাথা তার আবার গরম হয়ে উঠলো। খুব জোরে হেসে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কড উঠলো, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে এলো। কে? কে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসছো? পারবে আমাকে নিতে? না, না, না, এখন যাব না। রেবা, রেবা।" রেবা ছুটে এলো তার কাছে, বললে "কি হয়েছে আপনার?" "রেবা কে যেন মাঝে মাঝে আমাকে নিতে আসে, সেজন্য আমার মাথা ঠিক থাকেনা। কেমন হয়ে যাই আমি।" অমরনাথ আনমনা হয়ে বললে। রেবা তাকে কত বুঝালে, তারপর অন্য কথা পেড়ে বললে অমিয়া, সবি ও সমরনাথের কথা, আর কিছুক্ষণ আগে সে জানতে পারলে যে, সমরনাথ তার ভগ্নিপতি, তাও জানালে তাকে। অমরনাথ শুনে খুবই আশ্চর্য হলো, তার আনন্দও হলো খুবই। তারপর অমরনাথ বললে তাদের পূর্বের কথা যখন তারা দুই বন্ধু একসঙ্গে পড়তো কলেজে। বন্ধুর বিয়ে হল। বিয়ের পর বন্ধুর স্ত্রী খুবই আদর যত্ন করতো, হঠাৎ বিনা কারণে বন্ধ হলো তার ওখানে যাওয়া। সেই দিন থেকে তাদের আবার ছাড়াছাড়ি হলো। অমিয়া, সবিতা, অনিল, নরেন ও সমরনাথ এলো অমরনাথের কাছে। অমিয়াকে দেখে অমরনাপ একটু অভিমান করেই বললে, "এতদিনে মনে পড়লো বুঝি আমাকে?" অমিয়া জবাব দিলে, "মনেতো অনেকদিনই পড়েছে—এতদিন আসতে পারিনি সেজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। অমর হেসে বললে, "ক্ষমা? কেন? কার কাছে?" তারপর সবিতাকে দেখে বললে, "তুই দেখছি বেশ বড় হয়ে গিয়েছিস। সে রকম নাচতে গাইতে পারিস এখনও কি তুই?" পরে রেবাকে বললে, সবিতা ছেলেবেলায় কেমন গান করতে পারতো নেচে নেচে।

এইভাবে তাদের হলো আবার মিলন।

আজ খুবই সুখী তাদের পেয়ে।

তিন

অমরনাথের অন্য একখানি ঘরে বসে নরেন একখানি বই পড়ছিলো। সবিতা এলো সেই ঘরে। তাকে দেখেই নরেন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো তার মুখের দিকে। তারপর বললে, "সবি তুমি এখানে? এখন? আমি যে একা বসে আছি? তোমার মা রাগ করবেন না?" "ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?" জিজ্ঞাসা করলে সবিতা। নরেন চুপ করে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পরে বললে, "কেমন যেন ঠেকছে?" "না, না, কোন ভয় নেই আপনার।" হেসে বললে সবিতা নরেনের সামনের চেয়ার খানিতে বসে।

সবিতা—"আশ্চর্য মনে হচ্ছে বুঝি?"

নরেন একটু অবাক হয়েই বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্য মনে হচ্ছে আমার।"

সবিতা একটু হেসে বললে, "কেন? মা বললেন, আপনার সঙ্গে এখন দেখা করতে।"

"যাই হোক, এখানে এসে উন্নতি হয়েছে তোমাদের, যাক ওসব কথা।" নরেনের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই অমিয়া এসে দাঁড়ালেন সেই ঘরে। নরেন তাকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে পড়লো চেয়ারখানি থেকে। তারপর বললে, "আমি এখুনি চলে যাচ্ছিলাম ভিতরে—সবির সঙ্গে দেখা হওয়াতে—, আমি যাচ্ছি আপনি বসুন।" নরেন ভিতরের দিকে গেল। অমিয়া তাকে ডেকে বললে, "ব্যস্ত কেন হবো, যেও'খন।" একটা কথা তোমাকে বলবো বলবো ভাবছিলাম দু' দিন ধরে। দেখ নরেন, আমার ইচ্ছা যতদিন আমরা এখানে আছি একটু

করে কি পড়াবে এই মেয়েটাকে? এখন দেখছি বড় ভুল করেছিলাম ওকে লেখা পড়া না শিখিয়ে।"

নরেন—"আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন সব হবে।" নরেন সবিতার মা'র এই পরিবর্তনে বেশ একটু অবাক হয়েছিল আর এতদিন পরে তাঁর যে ভুল ভেঙেছে সেটা মনে করে তার আনন্দ হল খুবই। তারপর মনে মনে ভাবে সেদিনকার কথা, যেদিন তাকে কত কথা শুনতে হয়েছিল এর জন্য। অমিয়া নরেনকে একটু ভাবতে দেখে বলেন, "দেখ নরেন, আজ আমার কথায় তোমরা খুবই আশ্চর্য হবে। কিন্তু আজ আমার চোখ খুলেছে এই রেবাকে দেখে। আমার ইচ্ছা আমি তৈরী করি সবিতাকে রেবার মত মেয়ে। তোমরা বসো। আমি যাই দেখি রেবা কি ক'রছে।" এই বলে চলে গেলেন তিনি অন্য ঘরে।

নরেন ও সবিতা, আজ তাদের মনে হল তারা মুক্ত।

সবিতা প্রাণের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে গান ধরলে আপন মনে—

মোর গানের বলাকা খানি
ছন্দের শত বাণী
পুলকের সুরে সুরে
হৃদয়ের কূলে কূলে
ভেসে যায় শুধু আনি
গানের বলাকা খানি।

নরেনও মুগ্ধ হয়ে শুনছিল তার গান।

—চার—

জ্যোৎস্না রাত্রি। চাঁদের আলোয় স্নান করছে ধরা সংসার মহা আনন্দের মাঝে। ঝিরঝিরে বাতাসে গাছগুলি নড়ছে শন্ শন্ আওয়াজ করে। অনেকদিন পর আজকের এই দিনে অমরনাথ ঘুমুলেন বেশ একটু আরামে। মনে হলো সব রোগ চলে গেলো আজ তার শরীর থেকে। রেবা নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসলো তার নিজের ঘরখানিতে। অনেকদিন এমনভাবে আসতে পারে নাই তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে। নিজের চেহারা আয়নাতে দেখতে দেখতে ভাবলে কি ভাবে সে এখানে এলো অমরনাথের সেবা করতে। কেন সে এত কষ্ট করছে তার জন্য? কেন? কিসের জন্য? মনটা তার সত্যই যেন কেমন হয়ে উঠলো। এসব মনে করে।

একমনে ভাবতে থাকে খোলা জানালার দিকে চেয়ে, কত রুগী আগে দেখেছি, কত সেবা করেছি, কত রকমের লোক দেখেছি কিন্তু এঁরমত এমন সুন্দর আপন ভোলা লোক আগে আমি দেখি নি। সেজন্যই আজ আমি বাঁধা পড়েছি। সেজন্য আমি এঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না। অমিয়া এলো সেই ঘরে, রেবাকে ভাবতে দেখে বললে সে, "কি ভাবছ তুমি রেবা? এতদিন পরে আজ তোমার একটু ফুরসৎ হয়েছে না?"

রেবা প্রথমটা কিছু বলতে পারলে না তারপর বললে, "দিদি বলতে পারো কেন আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে এর জন্য মাঝে মাঝে? আগে কত লোকের সেবা করেছি, এমনতো কখনও কোথাও হয় নাই।"

"এ তোমার দোষ নয় রেবা। তোমার মত মেয়ের এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তোমার ঐকান্তিক যত্ন ও সেবা অমরবাবুকে বাঁচিয়ে রেখেছে।" বললে অমিয়া।

"না, দিদি, না আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছি।" বললে রেবা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

অমিয়া—"তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের এরূপ কর্তব্য-জ্ঞান না থাকলে কি অমরবাবু ভাল থাকতেন এতদিন? রেবা কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বললে "দিদি, সত্যি আমি—" আর কিছু বলতে পারলে না, মাথা নীচু করে থাকলে। অমিয়া—"বল, রেবা বল, কোথায় তোমার গোপন ব্যথা?"

রেবা—"দিদি, আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছি এঁকে পেয়ে, আমার কোন খেয়াল নেই। কেবল ভূতের মত খেটেই চলেছি এঁকে ভাল করার জন্য। ওঁর ভাবগুলি দেখে আমি মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যাই। কখন কখন একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, কি যে বলেন কিছুই বুঝতে পারি না। চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতে

থাকে, আমারও প্রাণটা আকুল হয়ে উঠে আর থাকতে পারি না।" রেবার চোখ জলে ভরে এলো।

অমিয়া—"ছিঃ, তোমার চোখে জল কেন? ভাল হয়ে উঠবেন উনি।"

রেবা—"ভাল হবেন কি? আবার মাঠলে মুখ ঢাকলে রেবা।

দীননাথ এমন সময়ে খুব ব্যস্ত হয়ে এই ঘরে ঢুকেই বললে, "দিদিমণি তোমরা এখানে? বাবু কোথায়?" দুজনেই চমকে উঠলো, বললে একসঙ্গেই, "সেকি?"

দীননাথ—"কি জানি, বাবুকে খুঁজে পাচ্ছি না। পেছনের দরজা খোলা।" ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। রেবা ব্যস্ত হয়ে বলে, "সব দিক খুঁজেছিস্?"

দাদু—"চারদিক খুঁজেইতো এসেছি তোমার কাছে।" রেবা এবার হতাশ হয়ে পড়লে। বললে, "দিদি আমার এতদিনের পরিশ্রম বুঝি এবার পণ্ড হয়—শিগ্‌গির উপায় কর কিছু।" নিজেই ডাকলে অনিল ও আর সবাইকে খুব ব্যস্ত হয়ে। সকলে এলে বললে দীননাথের কথা। সকলে শুনে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সমর বললে, "এই তো কিছুক্ষণ আগে আমি দেখে এসেছিলাম সে খুব ঘুমুচ্ছে। কোথায় গেল?" সকলেই বেরিয়ে গেল তাকে খুঁজতে।

রেবা—দিদি, বোধহয় এবার সব আশা আমার নিরাশায় ডুবে গেল!" কাঁদতে লাগলো খুবই। অমিয়াও কাঁদছিলো, কিন্তু বোঝাতে লাগলো রেবাকে

সহরের কিছু দূরে একটা নির্জন রাস্তা নদীর ধারে। সেখানে মধ্যবিত্ত লোকেদের একটা ছোট পাড়া ছিল। সে পাড়ার হরিচক্রবর্তী, গরীব ব্রাহ্মণ, সামান্য একটু চাকুরী করে। পয়সার অভাবে তাদের ঘরে সদাই অশান্তি। অভাবের তাড়নায় আর স্ত্রীর ব্যবহারে বেরিয়ে পড়েছে ঐ রাস্তায় মনটাকে নদীর ধারে বসে একটু ঠাণ্ডা করবে বলে। হারান বাঁড়ুয্যে ঐ পাড়ারই লোক। পথে দেখা হল দুজনের। সুখ দুঃখের গল্প করতে করতে চলছে তারা নদীর ঘাটের দিকে।

সেই সময়ে একটা লোক উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আকাশ পানে চেয়ে চলেছিল ঐ পথ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন সে খুবই অসুস্থ। হাতপাগুলি তার কাঁপছিল থর থর করে। তারা দুইজনে লক্ষ্য করলে অনেকক্ষণ, তারপর হারান বাঁড়ুয্যে বললে, "বোধহয় পাগল টাগল হবে।" হরিচক্রবর্তী মাথা নেড়ে বলে, "না, হে, না আমারই মত গরীব বোধহয়, পয়সার অভাবে নানান কষ্টে যা খেয়ে এমন হয়েছে।"

হারান—'যা হয় হোক এখন চল আমরা চলি এগিয়ে।' সে সময়ে লোকটা চেঁচিয়ে বললে, "আর পারছিনা, কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ? গলা যে কাঠ হয়ে গেল তেষ্টায়—। আর চলতে পারছিনা। কেন আমাকে টেনে নিয়ে এলে? এবার আমাকে ছেড়ে দাও।" কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল সে, তারপর চেঁচিয়ে উঠলে, "রেবা, রেবা।" হরিচক্রবর্তী ব্যস্ত হয়ে পড়লো তাই দেখে, দৌড়ে গেল তার কাছে। হারানকে ডেকে বললে, "হারানদা পড়ে গেল যে। এস শীগ্‌গির এস একটু সাহায্য করতে। তোমার কাপড় ভিজিয়ে একটু জল নিয়ে এস তাই নদী থেকে।" হারান খুবই বিরক্ত হল হরি চক্রবর্তীর এই কাজে, বললে, "চক্কত্তি, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? পড়ে থাকনা ওখানে। মরে গেলে যে ফ্যাসাদ হবে, তখন পুলিসে টানাটানি করবে আমাদের।" হারান একটু ধমক দিয়েই বললে, "করে করবে, তাই বলে ছেড়ে যাব একে? যাও একটু জল আন। মানুষ হতে শেখো ভাই।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারান গেল জল আনতে। দুইজনে শুশ্রূষা করে তাকে একটু সুস্থ করলে। তারপর তার মাথাটি রাখলে হারানের কোলের উপর। কত কথা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ঘর, কি ভাবে এখানে এলো ইত্যাদি। কোন কথারই ভাল জবাব তিনি দিতে পারলেন না। হারান অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো হরি চক্রবর্তীর কারবার দেখে সে বললে, "আর থাকতে পারি না ভাই, চল্লাম আমি।" এই বলে সে চলে গেল হারানের অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও।

অনিল ও সমরনাথ খুব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল নদীর দিকে। হরি চক্রবর্তীর কোলের উপর মাথা রেখে, যে লোকটি শুয়ে ছিল তাকে দেখেই অনিল বললে, "অমরদা, আপনি এখানে এমন ভাবে পড়ে? আমরা কি খোঁজাটাই খুঁজেছি সেই সন্ধ্যা থেকে। কেন আপনি চলে এলেন এমন ভাবে না বলে!" অমরনাথ শুধু বললে, "আমি কেমন করে এসেছি জানি না। যখন জ্ঞান হলো তখন আমি দেখছি এঁর কোলে শুয়ে আছি।" অনিল ও সমর হরি চক্রবর্তীর পরিচয় নিলে, তারপর ক্ষতস্থানে বাঁধও দিলে যত্নের সঙ্গে। সমরনাথ বললে, "অমর, তুমি এখনও খুবই দুর্বল। আমাদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে কোন রকমে চল এই গলির বাইরে, তারপর গাড়ীতে গেলেই হবে।" তারা নিয়ে গেল অমরনাথকে তার বাড়ীর দিকে খুব ধীরে ধীরে।

এদিকে যে ঘরখানিতে অমরনাথ শুতেন সেই ঘরে রেবা, অমিয়া আর সবিতা বসে। অমরনাথের অকস্মাৎ চলে যাওয়ার ফলে সকলে কেমন হয়ে গিয়েছে, রেবার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সে ঘুরছে ফিরছে আর চোখের জল ফেলছে। একবার বললে, "দিদি, তাকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে না আর?" "কেন অত ভাবছ তুমি, সকলেইতো তাকে খুঁজতে গিয়েছে। এখুনি আসবেন," বললে অমিয়া। সবিতা এক একবার উঠে জানালার দিকে যাচ্ছিল দেখতে অমরনাথকে নিয়ে কেউ আসছে কিনা। কিছু পরে অমরনাথ অনিল ও সমরনাথের কাঁধের উপর ভর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো। রেবা তাড়াতাড়ি তাকে খুব যত্নের সঙ্গে শোয়ালে তার বিছানার উপরে। সকলেই তার সেবা করতে লাগলো; দীনু দূর থেকেই কেঁদে বললে দিদিমণি, বাবুকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।" পরে ঘরে ঢুকেই তার বাবুকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল তার। নরেনও এলো কিছুক্ষণ পরে। সকলে অমরনাথের কাছে বসলে। রেবা জিজ্ঞাসা করলে তাকে "কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?"

"আমার মনে নেই। কোথায় ছিলাম, কেন গিয়েছিলাম কিছুই মনে নেই। খুবই দুর্বল মনে হচ্ছে এখন। বুকের ভেতর কেমন করছে আমার," বললে অমরনাথ খুবই কষ্টের সঙ্গে। রেবা তাড়াতাড়ি ভেতরে গেল, একটু দুধ এনে বললে, "এইটুকু খেয়ে ফেলুন; না, না, সবটাই খেতে হবে আপনাকে।" জিদ ক'রে বলে রেবা। দুধটুকু খেয়ে অমরনাথ বললে, "তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করছো রেবা, জানি না স্বার্থক হবে কিনা।" একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, অমরনাথ চেয়ে থাকে রেবার মুখের দিকে।

রেবা—"অমন কথা বলবেন না। এখন চুপ করুন আপনি। এখনো কাঁপছেন যে!"

অমর—"রেবা, আমার মনে হচ্ছে যেন আমার জীবন প্রদীপ নিভে আসছে। রেবা তুমি..." আর বলতে পারলে না, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তার বালিশের উপরে। রেবারও চোখে জল এল কিছুই বলতে পারলে না সে। সকলেই চুপ করে আছে, হঠাৎ অমরনাথ যেন কিছু দেখে খুব ভয় পেয়েছে এমনি ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, "রেবা, রেবা, ঐ আবার আসছে। না, না, আমি যাব না, আর আমার সুখে বাধা দিও না। আর আমাকে কষ্ট দিও না।" রেবা অমরনাথের অকস্মাৎ এই পরিবর্তনে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে অমরনাথকে জড়িয়ে ধরে বললে, "কি হয়েছে আপনার? অমন করছেন কেন? কৈ? কেউতো আসেনি এখানে?"

অমর—"রেবা ঘরে রাখ, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের কাছ থেকে আমাকে। না, না, আর ভয় দেখিও না। আর হাহাকারের ভিতর টেনে নিয়ে যেও না। না, আর না।" অমরনাথ চেয়ে থাকলো শূন্যের দিকে একদৃষ্টে, তার চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার এ অবস্থা দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অনিল দৌড়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে। রেবা কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে কেঁদে ফেললে। পরে বললে, "সমরদা এবার কি হবে? আমার এতদিনের পরিশ্রম কি আজ বিফল হবে?" সমরনাথও কিছু

বলতে পারেছিল না, ইতস্ততঃ করে বললে, "কি জানি, ভগবান কি করবেন।"

দীননাথ প্রভৃতি সকলেই কেমন হয়ে গিয়েছে : কারও মুখে কথা নেই, ঘর নিস্তব্ধ। এমন সময় অনিলের সঙ্গে ডাক্তার এলেন। রেবা খুব ব্যস্ত হয়ে তাকে পরীক্ষা করতে বললে। অমরনাথ আবার চেঁচিয়ে উঠে বসল বিছানার উপর, তারপর একদৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে বললে, "কড! আগুন! পুড়ে গেল সব! আর পারি না। কেন আমি কি করেছি তোমার? না, না, ।" আবার বিছানায় পড়ে গেল। জ্ঞান হারালে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন সব ভাল করে। তারপর একটী ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় অনিলকে বলে গেলেন, "ইনি যেন একেবারে না উঠেন, কারণ এঁর হার্টটা একেবারে "ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে।" অনিল চলে গেল অষুধ আনতে ডাক্তারের সঙ্গে। ধীরে ধীরে অমরনাথের পূর্ব জ্ঞান ফিরে এলো। একটু ফলের রস খেতে দিলে রেবা। অমরনাথ সমরকে ডেকে বললে, "ভাই, অনেক চেষ্টা করলে তুমি। তোমার জন্য আজ আমার এত বড় সংসার। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। আমার মনে হচ্ছে আমার প্রাণটা যেন ছট ফট করছে পিঞ্জর ছিঁড়ে পালাবার জন্য। ইচ্ছা ছিল নরেনের সঙ্গে সবির বিয়ে আমি নিজে দেবো তা' আর হল না।" সমরের চোখে জল এলো। বললে, "এখন তুমি খুবই দুর্বল, আর কথা বলে নিজেকে দুর্বল করো না।" অমর সকলকে এক এক করে কাছে ডাকলে, তারপর সকলের কাছে বিদায় নিলে। ব্যথায় সকলেই কাঁদতে সুরু করে দিলে। দীনু তো অস্থির হয়ে পড়লে, ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে, "দাদা বাবু, কেন অমন বলছো তুমি? তুমি যে আমার সব। ছেলে-বেলা থেকে তোমার কাছে আছি। আর কাউকে জানি না আমি" আর বলতে পারলে না সে। অমরনাথও খুব কাঁদছিল তার কথা শুনে। সব নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে অমর ডাকলে, "রেবা, রেবা, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?" রেবা কেমন হয়ে গিয়েছে, কলের পুতুলের মত মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। অমরনাথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। পরে বললে, "আঃ, খুব ভাল লাগছে রেবা।" আর বলতে পারলে না সে কাঁদতে সুরু করে দিলে। রেবাও নিজেকে আর সামলাতে পারলে না : সেও কাঁদতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে অমরনাথ আবার রেবার হাতখানি নিজের হাতের উপর রেখে আস্তে আস্তে বললে, "বড় সাধ ছিল রেবা, আমরা দুইজনে গড়বো এক নতুন সংসার। জগতের সেবা করবো আমরা দুজনে। গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করবো এই ছিল আশা, কিন্তু তা হল না। রেবা, দুঃখ করো না। মনে কোরো স্বপ্নরাজ্যে হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা, স্বপ্নরাজ্যেই আমাদের পরিচয়, আবার স্বপ্নরাজ্যেই আমাদের বিদায়। দুঃখ করো না রেবা, বড় অসহায় আমি।" রেবা আর স্থির থাকতে পারলে না, চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলে। অমরনাথও চোখের জল ফেলতে লাগলো। অমরের শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু বেশী খারাপ হয়ে পড়লো। অনিল এলো অষুধ নিয়ে। সবাইকে এই অবস্থায় দেখে বললে, "বাঃ, এ তোমরা কি করছো? এতে কি উনি ভাল হবেন?"

অমর—"অনিল, তোমার ঋণ শোধ করতে পারলাম না, ক্ষমা করো ভাই।"

অনিল—"এখন ওসব কথা বলে নিজের শরীর আরও দুর্বল করবেন না অমরদা, এখন চুপ করুন।"

অমর—"আর ভাই, এবার আমার সময় হয়ে আসছে।" অনিলের হাত থেকে অষুধের শিশিটি নিয়ে রেবা খুব যত্নের সঙ্গে একটী কাঁচের গ্লাসে ঢেলে অমর-নাথকে খেতে দিলে।

অমর—"আর অষুধ কেন?" অমরনাথ অষুধ খেলে, রেবা অমরনাথের মাথার উপর হাত রেখে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো তার মুখের দিকে। অমরনাথ আর একবার রেবার হাতখানি টেনে নিয়ে তার বুকের উপরে রেখে বললে, "রেবা, আর পারছি না, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে, মনে হচ্ছে যেন আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে

আসছে। আর পারছি না।" উষার আলো জানালা দিয়ে ভেতরে এসে পড়লো। অমরনাথ হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে উঠবার চেষ্টা করলে, তারপর চেঁচিয়ে বললে, "খুলে দাও সব বন্ধন, খুলে দাও।" রেবা তাকে ধরে ফেললে, অমরনাথ নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না, সে বিছানার উপরেই পড়ে গেল, শেষ নিঃশ্বাস পড়লো। সবাই কেঁদে উঠলো, রেবা মূর্চ্ছিতা। অনিল একদৃষ্টে অমরনাথের মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আজ হল এক মহাপ্রাণের অবসান।" বাইরে সব নিস্তব্ধ। আকাশ লাল হয়ে উঠলো।

ভারতের দাস পর্ব

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

ভারতের দাস-পর্ব পড়িতে বেদনা যে পাই ভারী
এ যেন দীর্ঘ হত্যাখানার মাঝ দিয়া পায়চারী।
কে কেমনে কি কি ধ্বংস করিয়া লুণ্ঠিয়া হ'ল বীর
কি কাজ শুনিয়া ধূর্ত খপর দুষ্ট শতাব্দীর?
কি হবে গণিয়া লজ্জিত সব দস্যু দলের সারি?

২

ঘোড়া ও হাতীর নাচ দেখাইল, ঘুরাইল যারা গদা
নারী হরণের বীরত্ব লয়ে, ফলাও করিল কথা,
কি দিয়েছে তারা? দেশ ও জাতিকে করিয়াছে শুধু নীচু,
উই ইন্দুরের মেটে গর্বের শুনিবার নাই কিছু,
ও হুলো বাড়ীতে পেচক ডাকুক উঠুক গোয়াল-লতা।

৩

সে বিভীষিকার কুশ্রী মূর্তি রক্ত কেন অঙ্কনে?
ঝরে যা গিয়েছে কাল সাগরের তীক্ষ্ণ রসায়নে।
কি হইবে রেখে শতাব্দী চাপে পিষ্ট নষ্ট পাঁজি?
শুধু মরা ডাকাতী ছিপের অর্ধ দগ্ধ 'কাছি'?
মৃত কুমীরের জীর্ণ দন্ত গাঁথিরোনা আভরণে।

৪

কেটে কেনে দাও, ছেঁটে কেনে দাও, রাখ যা সাচ্চা খাঁটি
ফোসিল হাওর কচ্ছপ নয় মুক্তা যা পরিপাটী।
মহাসাগরের রত্নাকরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান
কাল তরঙ্গ শুধু বারবার বাড়ালো যাহার মান
যুগে যুগে যাহা দিবে আশা আলো দিবে আনন্দ
বাঁটি'।

৫

কৃতঘ্নতা ও নৃশংসতায় রঞ্জিত বিবরণ
কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ সন।
তাদের উপর নাহিক শ্রদ্ধা নাহি মমতার লেশ
শুধু সপ্ত শতাব্দি কর সাতটা ছত্রে শেষ।
তাই কহ যাতে মুমূর্ষাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ হয় মন।

৬

যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয় কতটুকু তার রহে
অনন্ত এই কাল সমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে।
চিহ্ন রাখেনা ভাসাইয়া দেয় আবর্জনার ভার।
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করি চলে তার কারবার
কাঙ্ক্ষিত তরী বন্দরে আনে, অমৃতের কথা কহে।

৭

তাই কহ যাহা দেশকে জাগায় করে দিব্যোন্মাদ
শিশু গরুড়ের কানে এনে দেয় গোলকের সংবাদ।
আনে তপস্বী ভগীরথ কানে গঙ্গার কলগান,
ধরে দধীচির মনশ্চক্ষে জগতের কল্যাণ,
বিদ্রোহ বুকে জাগায় আবার সূর্য চাকার সাধ।

রবীন্দ্রকাব্যে স্বদেশীকতা

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের বাণীদূত। প্রাচীন ও নবীন ভারতের যে ত্যাগসাধনা ও শক্তির অমৃতমন্ত্র তিনি মুক্তকণ্ঠে বিহঙ্গের মত আজীবন কাল ধরিয়া পৃথিবীর আকাশকে ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন, দেশে দেশে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতের শাশ্বত-বাণী। তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন অমৃতের আহ্বান, দিয়াছেন মুক্তির ইসারা। তিনি জন্মভূমিকে ভাল-বাসিতে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যে জাতীয় সঙ্গীতে প্রাণে বীররসের সঞ্চার হয়, সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে উপযুক্ত ও প্রীতিকর হয় এইরূপ সার্বজনীন বীরত্ব-ব্যঞ্জক গান ও কবিতা রচনা করিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, সত্যাগ্রহ, ন্যায় ও করুণায় বিশ্বাস, বিশ্ব নিয়ন্তার মঙ্গল বিধানে নির্ভর, এইসব উপাদানই তাঁহার কবিতা, গান ও প্রবন্ধে বিদ্যমান আছে; তাঁহার স্বদেশ প্রেমে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা, আত্মগৌরবের অতি-পূজা, কিংবা বিদেশের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার ভাব নাই। ভারত-বর্ষের বিশেষত্বে ও বিধি-নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যে তাঁহার আস্থা আছে; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ও শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেন না। তবে পাশ্চাত্য দেশকে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র নকল করিয়া চলিবে তাহা তিনি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের যাহা ভাল আমরা তাহা গ্রহণ করিব আর আমাদের যাহা ভাল তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া ভারত-বর্ষ এক মহীয়ান আদর্শ দেশে পরিণত হইবে এই তাঁহার কামনা ও সাধনা।

তিনি সর্বদাই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। আমা-দের প্রকৃতিতে সর্ববিধ সাফল্যের বীজ নিহিত আছে। আমাদের স্বদেশের চিন্তার কার্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে বরণীয় করিতে হইবে। স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের সুস্থতা ও শক্তি পরিবর্ধন ইহাই জাতীয়তার মূলনীতি। ভিতরে যাহারা প্রবৃত্তি, স্বার্থ, ভয় ও অজ্ঞানতার দাস হয় বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। তিনি বাংলার জনগণের স্বপ্ন ও সাধনাকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া গাহিলেন।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, আসুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।

তিনি যুবকদের উদ্বুদ্ধ করিলেন নবীন বর্ষের গান গাহিয়া। আমাদের ভিতর যত ক্ষুদ্রতা, দীনতা আছে সব বর্জন করিতে হইবে। মানুষের যখন অদম্য শক্তি থাকে, উৎসাহ থাকে, অফুরন্ত কল্পনা শক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা থাকে, মানুষ তখনই নিঃস্বার্থভাবে আদর্শের চরণে আত্মবলি দিতে সক্ষম হয়। রাজা টাটকা ফুলে দেবতার পূজা হয়। তাই হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য, ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা আদর্শের চরণে উৎসর্গ করিতে আহ্বান করিতেছেন। কবি তরুণদের নববর্ষের গানে উদ্বুদ্ধ করিলেন:—

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।

এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

স্বদেশী যুগের সাধক রবীন্দ্রনাথ, জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণের মর্মকথার মূর্ত-প্রতীক রবীন্দ্রনাথ, চির মুক্তির অনন্ত আলোকের অভিযাত্রী রবীন্দ্রনাথ সর্বজন মহা মিলনের বাণীবাহক রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিলেন :—

মুক্ত করো, মুক্ত করো নিন্দা প্রশংসার
দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে।
নিঃশব্দ গমনে
চলেছোব কর্মক্ষেত্র-মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তি বলে।

দেশের গৌরব, ও সম্মান রক্ষা করিতে যত বিপদই আসুক তাহা তিনি বরণ করিয়া লইবেন। বার বার বাতি জ্বালাইতে যাইয়া তাহা হয়তো নিভিয়া যাইতে পারে তবু সাহস হারাইলে চলিবে না। যাহা ন্যায় ও সত্য তাহার জয় নিশ্চিত।

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।

ভারতের সাধনাকে কবি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। যে জীবন ভারতের রাজসিংহাসনে ছিল, সেই মহাজীবনকে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন :—

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিয়ো।

জয়যাত্রার পথে এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকে দেশ, আসে বাধা, আসে বিপর্যয়, সুরু হয় বঙ্গ ভঙ্গ, স্বদেশী যুগের আন্দোলন। বিভ্রান্ত, বিমূঢ় জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, ভারত ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশে তিনি আকুল নিবেদন জানান :—

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয় মৃত্যুভয় আর।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে" চলার পথের এ আহ্বান আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে, তারপর "বিধির বাঁধন টুটবে তুমি এমনি শক্তিমান" এমন সুদৃঢ় আত্মসংবৃত অটল বিশ্বাস তাঁহার মত কে শিখাইয়াছে, "তোদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে" এই অনুভূতি আমরা কোথায় পাইয়াছি কে অভয় মন্ত্র দিয়াছে, পিছিয়ে পড়া জাতিকে "আগে চল্ আগে চল, ভাই।"

কবি অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করিয়া নেয় উভয়েই সমান দোষী। তিনি প্রার্থনা করেন, যেন তিনি কখনও ন্যায় কাজ করিতে কোনরূপ পশ্চাৎপদ না হন। "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা," সেখানে যেন তিনি নিষ্ঠুর হইতে পারেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার রসনায় সত্যবাক্য যেন খরখড়্গ সম ঝলকিয়া উঠে, কারণ :

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়ান তিনিই কবির শ্রদ্ধা পান। কবি অরবিন্দের মধ্যে দেখিয়াছিলেন নির্ভীক চিত্ত, অকুণ্ঠ আশা, অখণ্ড বিশ্বাস তাই তিনি তাঁহাকে নমস্কার জানাইতেছেন :—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার,
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার

বন্দী মুক্তি তুমি তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।

অরবিন্দের রাজদণ্ড হইয়াছে শুনিয়া কবি উদাত্ত কণ্ঠে বলিলেন, যে তাঁহার বেদনা হইতে দেশবাসী বল পাইবে। তাঁহার সত্যরক্ষা ও সত্য প্রচার মিথ্যা হইবে না। দেবতার দীপ হাতে লইয়া যিনি আসিলেন তাঁহাকে কোন রাজা শাস্তি দিতে পারে না।

শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে
যে পারেনা শাস্তি তরে হইতে বাহির
লজ্জিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন.....

যেখানে আর্তের ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছে, যেখানে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী সহায় মাগিতেছে, যেখানে সঙ্কীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হইতে লক্ষ মুখ দিয়া রক্ত শুষিয়া পান করিতেছে, স্বার্থোদ্ধত অবিচার বেদনাকে পরিহাস করিতেছে, সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস ছদ্মবেশ খুঁজিতেছে, যাহারা নতশির মূক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ম্লানমুখে যাহাদের শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, যাহাদের স্তব্ধ-ভারের চাপে চলার গতি মন্থর হইয়া আসে, প্রতিবাদ করিতে পারে না, যাহাদের অন্ন কাড়িয়া লইলে দীর্ঘশ্বাসে ভগবানকে একবার ডাকিয়া নীরবে মরে সেই সব ব্যথিত, লাঞ্ছিতদের, প্রতিকারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল :—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব ভ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

দুর্গম পথের অভিযাত্রী হইতে আমরা প্রেরণা পাইয়াছি তাঁহার কাছে ; সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে সেই প্রেরণাই আমাদের জাতীয় মনকে স্তিমিত করতে পারে নাই, বাধার প্রাচীর আমাদের মনে হয়তো আনিয়াছে শঙ্কা, কখনো আনিয়াছে ভীতি, কিন্তু কবির আহ্বান :—

মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে,

কবি নিজেকেও বলিতেছেন :—

কবি, তবে উঠে এসো,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা ; সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

দুর্বলের ক্রন্দন কবি-চিত্তকে এমনি করিয়া চঞ্চল করিয়াছে, অন্যায়ের বীভৎসতা তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে। তিনি এই সকল দমন করিবেন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন "সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে।" তিনি জাতিকে অত্যাচারীর রক্তনেত্র উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক পরাণে লক্ষপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন। সেই গান গাহিতে গাহিতে কত লোক হাসিমুখে প্রাণ দিয়াছেন। একবার যে সেই মন্ত্রের আহ্বান গীতি শুনিয়াছে—গৃহ নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই—সেই ছুটিয়াছে :—

ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। বহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে ক'রেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন,—

কারণ কবি বলিয়াছেন :

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।

সেই সুখের জন্যই কোশল নৃপতি আশ্রিতের জন্য মস্তক বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তরুসিং বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে পারিয়াছিলেন, বান্দা ও শিশুপুত্র অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিয়াছিলেন, ধুঁদিবীর নকলগড় রক্ষা করিতে যাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; আর দুর্গেশ দুমরাজ প্রভুর আদেশ ও বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাইতে না পারায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তাই কবি আরাধনা করিতেছেন মরণজয়ী বীর্যের :—

দাও আমাদের, অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

কবি সুপ্রভাতে শুনিলেন

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

চারিদিক অমানিশার মত অন্ধকার। ঘোরতর অন্যায় ও অত্যাচারে দেশ নিপীড়িত। শান্তি ও ন্যায় কোথায়?

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

যাঁহারা ভগবানের অনুমোদিত উচ্চ মানবতার আদর্শকে কলঙ্কিত করিতেছেন, ভগবান কি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন? বিধাতার ন্যায় বিচার কি তাহাকে শাস্তি দিবে না?

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো।

তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন বেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের সর্বপ্রকার বর্বরতার আঘাত প্রকাশ পায়। অত্যাচার নিষ্ঠুর অবিচার, হত্যা আর ধ্বংসের বন্যা বহিয়া যায়। ফ্যাসিস্ট ইতালীর আবেসিনিয়া গ্রাস, ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস, জাপানের চীন গ্রাস করিবার উদ্যম, হিটলারের পররাজ্য লোলুপতা সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধ রচনা করে। আধুনিক সভ্যজাতিদের এই ঘোর স্বার্থপরতা, পররাজ্য লোলুপতা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধ্বংসকারী মারণাস্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া কবির হৃদয় ঘৃণায় ভরিয়া উঠে। তিনি এই বীভৎসতাকে শত সহস্র ধিক্কারে বজ্রবাণী প্রার্থনা করিলেন :—

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎস পরে ধিক্কার আনিতে পারি যেন···।

মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় ব্যথিত কণ্ঠে কবি বলিলেন, জগৎব্যাপী যে হিংসার দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহাতে শান্তির শত বাণী দুষ্কৃত জাতিদের কাছে পরিহাস বলিয়া মনে হইবে। তাই গভীর বেদনায় বলিয়া গেলেন :—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

কবি আশা করেন যে নিদারুণ সংগ্রামে পাপের লেলিহান তাপে পৃথিবীকে আজ যে নরঘাতীরা কলুষিত করিয়াছে সেই ধ্বংসলীলার শেষে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির

ভীষণ যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে

ভবিষ্যদ্বাণী কবি আরো আশা করেন :—

এ কুৎসিত লীলা হবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টির ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি এক নববর্ষে আশা করিয়াছিলেন "জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে, যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক তাহার জয় হইবেই।"

জীবনের শেষ নববর্ষে তাঁহার জীবিতকালের সর্বশেষ পঁচিশে বৈশাখ তাঁহার পুনরুক্তি তিনি করিলেন—

"পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।...আশা করব মহা প্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের এক নির্মল আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

সেই মহামানব অনিন্দ্যসুন্দর যাহার শিল্প সৃষ্টি, অবিনশ্বর যাহার কীর্তি, যিনি ছিলেন জাতীয় সাধনার অন্যতম পথপ্রদর্শক, যিনি ছিলেন দেশ ও জাতির মুক্তির অগ্রদূত—তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি :—

হে নূতন, দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা
করি উদ্‌ঘাটন
সূর্য্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর
উন্মোচন।

অভিশপ্ত প্রহরী

—শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ঐশ্বর্য্যের দ্বাররক্ষী, হে ধনীক! হে ভ্রান্ত প্রহরী,
কুড়াইয়া আজীবন, জীবনের অসার জঞ্জাল,—
আত্মারে আবদ্ধ করি, দেহ কক্ষে বেড়িয়া কঙ্কাল,
চলেছো বন্ধুর পথে সঙ্গে লয়ে স্বপ্ন সহচরী!

রক্তিম নয়ন তব—না হেরিল জগতের রূপ,—
মুখ না কহিল কথা কারো সাথে আপনার ভাবি,
না দিল কাহারে ডাক, করে তবু মনুষ্যত্ব দাবী,—
নিজেরে নিশ্চিহ্ন করি পথভ্রমে রহিল নিশ্চুপ!

• • • •

মানুষের নামরূপে অপরূপ রঙ্গরসে মাতি,
মানুষেরে তিলে তিলে নিত্য শুধু করি অপমান—
মনুষ্য করিলে চূর্ণ, মানুষেরে হানি পদাঘাত!
নিজেরে বিচ্ছিন্ন করি, কাটিবে কি জীবনের রাতি?
দংশন করিছে স্নেহ, মিলিল না প্রেমের সন্ধান
কোন হাটে বিকাইবে অভিশপ্ত সে অভিশাপ্ত?

গণ-জাগরণ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে,
ব্যষ্টি-জীবন ছাড়ো—ছাড়ো দলগত প্রাণ,
ব্যক্তিস্বার্থচিন্ততারে।
জগতে যেথা যত হীনজন
করে কি রে জয় সংগঠন ?
আজ নয় কাল তারে নয় জয় হয় কয় ;
দেখাও অকূল ছন্দতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা
ক্ষমতার মদমত্ততা রে।

শত হোক্ পিচ্ছিল হও পথে আগুয়ান
তোমরাই তোমাদের লাগিয়া
হও করমেতে ধীর মুছি সবে আঁখি-নীর
শত শুভ কল্যাণ মাগিয়া।
দুস্তর দিনে বাধা অনিবার,
ক্ষতি নাই করো গতি দুর্বার,
দেশ-মাতৃকাপদে হৃদয়ের বলিদান
যুগে যুগে সেত' মহানতা রে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা
ক্ষমতার মদমত্ততা রে।

কভু ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষুদ-গুঁড়া সঙ্কটে
নিখিলের বণ্টন মানিও,
তোমাদের পরিচয় প্রতীচীরে কেহ নয়,
তোমরাই তোমাদের জানিও।
সৎ পথ, সদাচার জীবনের
হানি যেন দেখিনাক' তোমাদের,
সাম্য ও মৈত্রীর সন্ধান মিলিবেই
দূর কর যদি বিদ্বেষতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে।

ধৈর্যের বন্ধনে শুধু আজ বাঁধো বুক,
হোক্ মন পর্বত গম্ভীর,
নন্দন-নর্তনে ছন্দিত করো দেশ,
কোন্দল ছেড়ে হও ধীর-স্থির।
ধ্বংসের কোলাকুলি কেন হায় !
কাজ নাই বোমা সাহসিকতায়,
প্রেম কাছে আণ্বের অস্ত্র যে কিছু নয়,
ধরো গান একতান সোতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে।

অনাগত দিন বহু সম্মুখে তোমাদের,
মানিও না মনে পথক্লান্তি,
দুঃখের মেঘে ঢাকা ধূসর দিবসের
ছড়াবেই আলোক প্রশান্তি।
দূর হ'বে শত ভয়-শঙ্কা
বাজিবেই শুভ অভ্রঙ্কা,
মিছিলের বন্যায় উদাসীন হ'বে লীন,
ধনী আর গরীব কি কথা রে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে।

নন্দর বৈরাগ্য।

[গল্প]

দশানন

নন্দদুলাল রায়—বয়স এই সবে মাত্র পঁচিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাথার চুল গাড়োয়ানি ধাঁচে ছাঁটানো; হাতে ওভাল্ প্যাটার্নের একটি রিষ্ট্ ওয়াচ। পায়ে সস্তা জুতা। পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে গরদের ফুল হাতা সার্ট। বুক পকেট আছে কিন্তু জামার কলারে ফাউন্টেন পেন। সার্টের কলারের বোতামের পাশ ঘেঁষিয়া, ক্লীপের বাঁকা উজ্জ্বল অংশটা প্রতিনিয়তই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এক কথায় বলিলে আজকালকার একটি চমৎকার আপ্-টু-ডেট্ ছোকরা! নিজের আমোদে নিজেই মাতিয়া থাকে। নিজ বংশ গৌরবের মোহে তাহার বুকের ছাতিটা অকারণেই অপরের কাছে সহসা ফুলিয়া ওঠে। কণ্ঠের ভাষা উচ্ছ্বসিত! হাসিবার ভঙ্গিটিতে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমি লাগিয়াই আছে। অপরিচিতেরা সহসা তাহাকে দেখিলে একটু ঘাবড়ায় বৈকি! কিন্তু বিশেষ পরিচিতেরা অনুশোচনা করে! পিতা মাতার আস্কারাতেই যে নন্দ দিন দিন গোল্লায় যাইতেছে এই কথা তাহারা অপরের কাছে নিন্দা করিয়া বেড়ায়। নন্দ এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে গুস্তর মতো ঘৃণা করে!

এ হেন ব্যক্তি সেদিন সংসারের সমস্ত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আউটরাম ঘাটের অনতিদূরে একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া লইয়া রুমাল পাতিয়া বসিল। উদ্দেশ্য মানসিক দ্বন্দ্বের একটা হেস্তনেস্ত করা! অর্থাৎ পটলির সঙ্গে তাহার প্রেমটা শত চেষ্টা করিয়াও দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে না। পটলির জন্য নন্দ করে নাই কি? থাকে হোপে লইয়া যাইবার জন্য সে পটলিকে দশবার আশ্বাস দিয়াছে। ঘাড়ে করিয়া তবলা বহিয়া লইয়া, তিন চারিটা মিটিং-এ পটলির গানের সঙ্গে বাজনার কসরৎ দেখাইয়া সভায় সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। সেদিন পটলির বাবা ওয়ক্ষে কনট্রাক্টার বন্ধু বাবুকে সে তাহার দূর সম্পর্কীয় এক খুড়ার সাহায্যে চুণ সুরকীর ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়া দিয়াছে। নইলে বালীগঞ্জের সেই সাব-জজের বাড়ীটা কী এই বাজারে আজও সমাপ্ত হইতে পারিত? অথচ কি বেইমান এই পটলি মেয়েটা! কাজ আদায় করিবার বেলায় অতি ভাল মানুষ;—আর যেই কাজটি শেষ হইল,—সে যেন কথাই কহিতে চাহে না! আবার কোথা হইতে এই হরেন মাষ্টারটাকে জুটাইয়াছে দেখ দেখি! নন্দ কি গান জানেনা? সেদিনও দরবারী কানাড়ার একটা সুর ভাঁজিয়া বেলেঘাটার জোড়া মজ্জিস অক্লেশে মুখরিত করিয়া দিয়াছিল। তাটিয়ালি ধরিলে কাহার সাধ্য যে উদাস না হইয়া থাকে? এই যে তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে 'তেতালা' 'কাহারুবা', প্রভৃতি সুরগুলা তবলার মারফতে-পটলিকে শিখাইল, তাহার কি কোনও মর্যাদা পটলি তাহাকে দিয়াছে? আর এই বঙ্কুবাবুই বা কোন শ্রেণীর ভদ্রলোক? কনট্রাকটারী করিয়া, না হয় এই বাজারে কিছু পিটীয়া খান দুই বাড়ীই করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি নন্দর অবস্থার সঙ্গে তাঁহার তুলনা? যদিও নন্দর পিতা আজ অভাবে পড়িয়াই একটা যেমন তেমন মুদীখানা চালাইতেছেন! কিন্তু থাকিত যদি সেই দাদা মহাশয়ের পাটের ব্যবসা? আর সেই নদীর ধারের পাটের গোলায় বহর? তাহা দেখিলে বঙ্কুবাবুর সাধ্য ছিল কি—যে, আজ তাহারি নাকের ওপর দিয়া পটলিকে তিনি হরেন মাষ্টারের সঙ্গে অমনি একাকী বেড়াইতে পাঠান? এতো পরিশ্রমের কি না এই পুরস্কার! আচ্ছা দেখা যাইবে! এক পৌষেই শীত পালায় না। আবার

যখন সঙ্গীতের মরসুম পড়িবে তখন দেখা যাইবে কে গিয়া পটলির সঙ্গে সঙ্গত করে।

—"বাবু কিছু ভিক্ষে দাও না; ছেলেটাকে আজ দু'দিন কিছু খাওয়াতে পারিনি বাবু,—"—"দাওনা বাবু দুটি পয়সা"—

ভূত দেখিলে সহৃদয় লোকে যেমন করিয়া ভয় পায়,—তেমনি লাফাইয়া উঠিয়াই নন্দ পেছনে দেখিল, কে একটি বিগতযৌবনা মেয়ে মানুষ, একটি কাঁকলাস শিশু বুকি ক্রোড়ে জড়াইয়া নন্দর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল! কি অসভ্য দেখ দেখি! এমন নিরিবিলি গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষা চাহিবার আর মানুষ জুটিল না? তাও আসিয়াছে কিনা একটা কাঁকলাস কোলে লইয়া? রূপ যৌবন থাকিলে পয়সা কোন্ ছার?—গলার সোনার বোতাম-সেট-টাই কি নন্দ বিক্রি করিয়া মেয়ে মানুষটাকে দিতে পারিত না? কেমন একটা নেকড়া পড়িয়া আসিয়াছে! কথা বলিতেই লজ্জায় মাথা কাটা যায়। "সর-সর-সরে—যা এখান থেকে। গতর খাটিয়ে খেতে পারিস নে? ওই মরা ছেলেটাকে কোথা থেকে জুটিয়েছিস? তুই থাকিস কোথায়?" ভিখারিনী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল "আর কোথায় থাকবো বাবু? কোনদিন কারো দাওয়ায়,—কখনো ফুটপাতে। কিন্তু এ অবস্থা আমাদের ছিল না বাবু। অদিষ্টের বিপাকে আমাদের যথাসর্বস্ব গেছে। কপালে দুর্ভোগ ছিল, তাই স্বামী পুত্র যথাসর্বস্ব খুইয়ে এই কোলের ছেলেটাকে নিয়ে আমি আজও বেঁচে আছি। আর যে কথা কইতে পাচ্ছি না,—কিছু খেতে দাও না বাবু!"

—"দাঁড়াও যা বলছি আগে তার উত্তর দাও,—তোমার দেশ কোথায়?"

"পাকিস্তানে ছিল বাবু! কিন্তু এখন যে আর আমাদের কিছুই নেই। আর কথা কইতে পাচ্ছি না, ছেলেটা যেন কেমন কচ্ছে বাবু, একটু জল ঐ দোকান থেকে—যদি একটু সরবৎ—দাও বাবু—তবে ছেলেটাকে একটু খাইয়ে বাচাই—।"

"সরবৎ?—সরবৎ ডাবের জলে কিছু হবে মোর বাড়ী যেতে পারবে? দুধ আছে ছেলেটাকে খাওয়াতে পারবে! যাবে?"

—"কিন্তু সে কতদূর বাবু? আমি যে আর চলতে পাচ্ছি না! একটু জল যদি"—"আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও দেখছি কি করতে পারি।" তারপর একটু অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে পেছন ফিরিয়া নন্দ বলিল,—"দেখ,—তুমি একটু ওই গাছটার তলায় বোস। আমি তোমার জন্য কিছু খাবার—আর জল নিয়ে আসছি।"

ভিখারিনীর দারিদ্র্য এড়াইয়া, নন্দ একটু একটু করিয়া ট্রাণ্ড রোডের দিকে আগাইতে সুরু করিল। সম্মুখে অদূরে একটা পান-সরবতের দোকান দেখা গেল বটে, কিন্তু সম্মুখে গিয়া ঢুকিল সুবিধা হইবে না। পরোপকারের মোহ, বিশেষ করিয়া যুবতী ভাতৃীয় মেয়ে গুলার দুঃখের কথা শুনিলেই মনটা যেন তাহার অজ্ঞাত সারেই কেমন করিয়া উঠিত। এখন সুযোগ পাইয়া সেই উপকারের সুপ্ত মমতাটা, একেবারে মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একটা ডাবে আর একগ্লাস সরবতে কি আর মানুষের পেটের ক্ষুধার উপশম হয়? কিছু খাবারও তো চাই? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ও চার্চ লেনের মোড়ে আসিয়া কিছু খাবার, দুইটি ডাব এবং গোটা দুই বড় খুরি, দোকানীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া, আবার আউটরাম ঘাটের পথে চলিতে সুরু করিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে একবার সে ভাবিয়াছিল, একখানা যদি কাপড় পোষ্টের কিছু এ অঞ্চলে মিলিত তবে সে মেয়েটির জন্য কিনিয়া লইত! কিন্তু...! এমন সময়ে দেখিল অদূরে একটি ধোপা, গাধার পিঠে দুই গাঁটরি কাপড় বোঝাই দিয়া তাহারি দিকে আসিতেছে। রুমালে বাঁধা পুটলিটা তখনি সে বাম হস্তে লইয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহাকে থামিতে বলিল। ধোপা, ঘোর সন্ধ্যার অন্ধকারে এমন স্থানে, এ হেন বাবুর আহ্বানে না থামিয়া পারিল না। নন্দ বলিল—"একখানা শাড়ী কাপড় দিতে

পারো? যা দাম লাগে ধোপা প্রথমতঃ একটু ভাবাচাকায় পড়িল। তারপর বলিল—"এ যে বাবু রোজের ভদ্দি কাপড়! একুণি গিয়ে দোকানে দিতে হবে। এতো আমি দিতে পারবো না বাবু!"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া নন্দ বলিল—"রাজের কাপড়! রোজের কাপড়—তুই যত দর চাইবি ক্লিনিংএ দিবি তো? কারো একটা কোরা, ধোয়া কাপড় দিয়ে যা না! আজ বলছি—কাচা হয়নি,—কাল আবার বাজার থেকে গিয়ে কিনে নিবি। আমি তোকে সে জন্য বেশী টাকা দিচ্ছি। এতে তোর আপত্তি কি? দে পরকর কাপড়।"

ধোপা প্রথমতঃ একটু গাঁই গুঁই করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার লোভে রাজী না হইয়া পারিল না। নন্দর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। একেবারে লাল চওড়া পেড়ে শান্তিপুরী শাড়ী।

অন্ধকার তখন প্রায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এমনি সময়ে, বগলে শাড়ী কাপড় এবং ডান হাতে ডাব আর খাবারের পুটলি লইয়া, নন্দ আউটরাম ঘাটের সেই গাছতলায় উপনীত হইল। কিন্তু এ কি! সম্মুখে গিয়া নন্দ দেখিল, গোটা তিন চার ছোটলোক আর একটা পুলিশে মিলিয়া ভিখারিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! বেচারী পুত্র শোকে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে—। মরা ছেলেটাকে ডোমের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য পুলিশ ভিখারিনীকে অনুরোধ করিতেছে।

নন্দর আর সহ্য হইল না। বাহাদুরী লইবার মানসে ভিড় ঠেলিয়া সে একেবারে মেয়েটার কাছাকাছি গিয়া, গায়ের ওপরে শাড়ী কাপড় খানা ছুড়িয়া দিয়া, ধমকাইয়া উঠিল,—"যাঃ-যাঃ আর কাঁদতে হবে না! মরাটাকে নিয়ে আর কি করবি শুনি? ওটাকে ডোমের হাতে দিয়ে দে। ও-নিয়ে গাদায় ফেলে দেবে।" তারপর পোটলাটা নামাইয়া বলিল, "নে এইগুলো খেয়ে নিয়ে কাপড়টা পর। তারপর চল দেখি তোর কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না।" ভিখারিনী কিন্তু নন্দর এত পরিশ্রমের কোন মর্যাদাই রক্ষা করিল না। সদ্য পাওয়া ফরসা কাপড়খানি দিয়া প্রথমেই সে, ছেলেটিকে অতি সযত্নে জড়াইল। তারপর পুঁরি হইতে একটি রসগোল্লা, রস সমেত তাহার মৃত পুত্রের হাঁ করা মুখ গহ্বরে, ফোঁটা ফোঁটা ফেলিতে-ফেলিতে, এই বলিয়া-ভোলা গলায় কুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, যে, "বাবা! বেঁচে থাকতে তোকে একটু দুধ দিতে পারিনি;—আজ যাবার দিনে একটু মিষ্টি খেয়ে, ওই নরম কাপড়ের বিছানায় শুয়ে পরপারে যা! এইটুকুই অভাগিনীর সান্ত্বনা।" তারপর সে খাবার গুলির উপরে পড়িয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া পুত্র শোকে কাঁদিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া পুলিশ, ডোমের হাতে ভিখারিনীর মৃত পুত্রটিকে পার করিয়া দিয়া, আড়চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, নন্দর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

নন্দ বিমনা হইয়া এতক্ষণ কি যেন ভাবিতেছিল। এখন ভিখারিনীর সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"নাও এখন ওঠো"! ভিখারিনী নন্দর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলে,—নন্দ বলিল—"ন্যাকামিতে আর বাঁচিনে? মরা ছেলেটার গায়ে কাপড়টা না জড়ালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হোতো? এখন ওই ন্যাকড়া পরিয়ে তোকে আমি কোথায় নিয়ে যাই বল দিকি? হাজার হোক আমি একটা ভদ্রলোক তো বটে! অথচ ঐ কাপড়খানা পরলে তোকে তো কতকটা মানুষের মত দেখা যেতো? দাতব্য করে সেটাও তুই ছেলের গায়ে জড়িয়ে দিলি, ওটা তো ঐ ডোম ব্যাটাই ছেলের গা থেকে খসিয়ে নেবে। ভিক্ষুক আর ছোট লোক কি সাধে বলেছে? খাবার গুলো আনলুম, তা পর্য্যন্ত নষ্ট করে ফেললি! মর এখন গাছতলায়—আমি চললুম!" এই বলিয়া সে গাছতলার নীচ হইতে ট্রাণ্ড রোড সংলগ্ন উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হইয়া, এক রিক্সাওয়ালাকে ডাকিয়া বসিল।

দর-দস্তুর প্রায় ঠিক হইয়াছে, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই কনেষ্টেবল একজন সারজেণ্ট সঙ্গে করিয়া আসিয়া নন্দর রিক্সা ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

পুলিশ! সারজেন্ট্? এ কি অভাবনীয় ব্যাপার! নন্দর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল! অথচ কারণ অজ্ঞাত। একবার পুলিশ এবং একবার সারজেন্টের দিকে মুখ তুলিয়া, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নন্দ ব্যাপারটা বুঝিবার অকারণ চেষ্টা করিল। রিক্সাওয়ালা ততক্ষণে রিক্সার দণ্ড দুইটা বগলে তুলিয়া গন্তব্য পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সারজেন্ট্ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"এই টিকসে খাড়া রহো। থানামে যানে হোগা"। তারপর কনেষ্টবলের দিকে চাহিয়া সে বলিল—"তুম উধারসে জেনানা-কো রিক্সামে লে আও।—হাম হিঁয়া হায়!—যাও জল্‌দি করো—"

নন্দর পায়ের তলা হইতে ততক্ষণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে। "থানামে যানে হোগা?" ঠাকুর নীচে হইতে পায়ের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত একটা অস্বাভাবিক কাঁপুনী নন্দকে তখন যেন পাইয়া বসিয়াছে। বুকের ভেতরে অনেকক্ষণ থামিয়া থামিয়া ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ সুরু হইয়াছে। আজ প্রথম নন্দর মনে হইল, লেখাপড়া না শিখিয়া সে কি বোকামিই করিয়াছে! আজ যদি তাহার এই চেহারা এবং পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে,—ইংরেজী ভাষাটা তেমন আয়ত্তে থাকিত, তাহা হইলে সে এই মুহূর্ত্তেই সারজেন্ট্‌কে কথায় মোহিত করিয়া ফেলিতে পারিত না? সাধ্য কি যে সারজেন্ট্ আজ তাহাকে থানায় লইয়া যায়। অথচ সে সব কিছুই যে করিবার উপায় নাই। জোড়াতালি দিয়া যদি বা সে এক তরফা কিছু একটা বলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সারজেন্ট্ যখন নিজে কথা বলিবে—? অথবা তাহার কথার জবাব দিবে—তখন সে বুঝিবে কেমন করিয়া? উঃ কি মারাত্মক পরাজয়! অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে থানায় যাইতেই হইল!

থানায় উপস্থিত হইয়া, বহুবিধ অপরাধী পরিবেষ্টিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, জনৈক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পাশে অনন্ত বাবুকে দেখিয়া নন্দর মান সম্ভ্রমের শেষ সম্বলটুকুও আর অবশিষ্ট রহিল না। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও যে ছিল ভালো! অনন্ত বাবু তো শুধু বন্ধুবাবুরই অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, বন্ধুবাবুর বাড়ীর প্রত্যেকেই যে তাহার অতি পরিচিত আপনার চাইতেও বেশী। অনন্ত বাবু যে পুলিশের লোক, এ কথা নন্দ পটলির মুখে বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু সে জন্য তাহার এ কৌতূহল কোনদিনই মনে জাগে নাই, যে, তিনি কোন্ থানায়,—কোন্ পোষ্টে কাজ করেন! পুলিশের লোক তো পুলিশের লোক!—অমন কত লোকই তো পুলিশের কাজ করে! নন্দ যথাসাধ্য নিজেকে, অনন্তবাবুর চোখের আড়ালে রাখিতে চেষ্টা করিল। বক্ষা এই যে, এখন পর্য্যন্তও নন্দ, অনন্ত বাবুর চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে না! কিন্তু আর কতক্ষণ? এই অপরাধী গুলার জবানবন্দী ফুরাইয়া গেলেই তো এ গুলিকে অন্যত্র সরাইয়া লইবে!—তখন যদি তাহার ডাক পড়ে?

অকস্মাৎ হন্তদন্ত হইয়া সেই সারজেন্ট্ আসিয়া—সেই অনন্ত বাবু এবং তাহার সঙ্গের লিখন রত ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া, নন্দকে দেখাইয়া, কেসটা যাহা লিখিয়া লইতে বলিল,—তাহার অর্থ হইতেছে এই যে,—নন্দ একটী ভিখারী মেয়েকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশে তাহাকে কাপড় জামা ইত্যাদি দিয়া ভুলাইতেছিল,—এমন সময়ে হনুমান সিং কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, এবং ভিখারিনীর মৃত পুত্রটীকে ডোমের হাতে তুলিয়া দিয়া, নন্দর কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে,—লোকটি রিক্সা যোগে পালাইবার চেষ্টা করে। সেই সময়ে সারজেন্ট্ নন্দকে রিক্সা সমেত এ্যারেষ্ট্ করিয়া সেই মেয়েটিকেও অপর একখানা রিক্সা যোগে থানায় আনিয়া কেসটা লিখাইবার জন্য ডেটীটীউটদের কক্ষে রাখিয়াছে। মরা ছেলেটাকে ডোমের হাতে দিয়া পুলিশ, নন্দর দেওয়া খাবার এবং শাড়ী কাপড় খানা পর্য্যন্তও সনাক্ত করিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছে। সবই কক্ষান্তরে রাখা হইয়াছে। এখন কেসটা লেখা হইয়া গেলেই সারজেন্ট্, ভিখারী মেয়েটাকে ডেটীটীউটদের তালিকা ভুক্ত করিয়া দিতে পারে!

সারজেন্টের কথা শুনিয়া, লিখন রত পুলিশ অফিসারটি অনন্তবাবুকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। নন্দ মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শুধু পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকটি, এ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নন্দকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রেম করবার কি আর আপনার লোক জুটলো না মশাই? এই ভাবে বুঝি দেশ স্বাধীন করবেন? না খেতে পেয়ে, মেয়েছেলেটাতো মরতে বসেছে! তাকে কিছু খাবার বা পয়সা দেওয়ার পরিবর্ত্তে—আপনি তাকে শান্তিপুরী শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন কেন? কথার উত্তর দিন, চুপ করে থাকলে চলবে না?"

নন্দর ঠোঁট—বার দুই কথার উত্তর দিবার জন্য কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু সব কথা, কোনমতেই আর সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না। এমন সময় অনন্তবাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এবার কিন্তু অনন্তবাবুকে দেখিয়া নন্দর আর পূর্ব্বের মত সঙ্কোচে মাথা কাটা যাইতে লাগিল না,—বরং সে যেন এই অপ্রীতিকর যুক্তির গভীর সমুদ্রে এতক্ষণ প্রাণপণে হাবুডুবু খাইয়া অনন্তবাবুরূপী তৃণ খণ্ডটি অবলম্বন করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পুলিশ কর্ম্মচারী ভদ্রলোক, প্রচণ্ড ঠাট্টার সুরে নন্দর দিকে চাহিয়া, আবার সুরু করিলেন,—কি মশাই কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে? পোষাক পরিচ্ছদে তো বেশ বড় ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়?—এমন সব টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, লেক্ রোড থাকতে—এই না খেতে পাওয়া ভিখিরী মেয়েটার ওপর আপনি নজর করলেন কেন?"

এইবার নন্দ একেবারে মরিয়া হইয়া অনন্ত বাবুর দিকে চাহিয়া, ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবৃতি করিয়া,—তাহার যে কোন অপরাধ নাই, এবং নিছক পরোপকারের মানসেই সে ভিখারিনীর সঙ্গে ঐরূপ করিয়াছে; এই কথা বলিয়া—অনন্ত বাবুকে ঘটনাটি নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইল।

নন্দর কথা শুনিয়া অনন্ত বাবু হাসিলেন। কিন্তু নিজের কোনও পরিচয় দিলেন না, এবং পার্শ্বস্থ পুলিশ অফিসারকে, কেসটিকে নন্দর কথা অনুযায়ী লিখিয়া লইতে বলিয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

• • • •

থানা হইতে পথে বাহির হইয়া নন্দ আজ একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। প্রতিজ্ঞা করিল এই যে, জীবন থাকিতেও সে আর কোন লোকের উপকার করিবে না। কোনও মেয়ের প্রেমে পড়িবার জন্য সে পাগল হইবে না! সংসারের প্রত্যেকটি লোক আজ নন্দর চক্ষুর সম্মুখে শয়তান প্রতিপন্ন হইয়া গেল। পটলির জন্য যে প্রেমটুকু তাহার অন্তরে ইতিপূর্ব্বে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আজ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল!—সব জুয়াচোর! সব বদমায়েস!—হরেন মাষ্টারের সঙ্গে পটলি বায়োস্কোপ দেখুক, গানের সঙ্গত করুক, সে আর তাহাতে জীবনেও যোগ দিবে না!—বরং সে তাহার পৈত্রিক ব্যবসাটায় মনোযোগ দিলে তাহার পিতার কিছুটা পরিশ্রম সাশ্রয় হইবে। প্রেম পৃথিবীতে নাই! সর্ব্বত্রই শুধুমিথ্যা আছে। নন্দ বাটী অভিমুখে চলিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর দেখা গেল শ্যামবাজারের মোড়ে নন্দ তাহার পিতার মুদীখানায় ডাল মাপিতেছে।

লুৎফান্নেসা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী।

খোশ্‌বাগে তুমি আজো কি ঘুমায়ে মৃত্যু-আঁধারে-সমাধি-তলে ?
সেখানে কি তব জীবনের স্মৃতি প্রাণের প্রদীপে আর না জ্বলে ?
ভালবেসেছিলে এই পৃথিবীরে, দিয়েছিলে ঢেলে বুকের প্রীতি,
প্রতিদানে তা'র কিছু পাও নাই—সম্বল ছিল ব্যথার স্মৃতি !
তোমার হৃদয় কেহ বোঝে নাই, কেহ শোনে নাই প্রাণের বাণী,
সকলের তরে তবু মেলেছিলে হরষ-স্নিগ্ধ-জীবনখানি !
মানবী হয়েও ছিলে তুমি দেবী, ছিলে মহীয়সী গুণান্বিতা,
ক্রীতদাসী হতে রাণীর আসনে তাই হ'লে তুমি সমুন্নীতা !
রাজ্য লুব্ধ বন্দী শত্রু সেও তব কাছে পেয়েছে ক্ষমা,
শৃঙ্খল টুটি' দিয়েছ মুক্তি, তুমি স্নেহময়ী মাতৃসমা !
সকলেরে তুমি টেনেছ বক্ষে, ভুলে গে'ছ তুমি নিজের ক্ষতি,
বিশ্বজনীন উদারতা তব ছিল প্রসারিত সবার প্রতি !
তুমি সিরাজের শান্তি-প্রতিমা, চির-ধ্রুব-তারা জীবনাকাশে,
তা'র ব্যথাতুর বক্ষে ঢেলেছ প্রেমের ঝরণা কলোচ্ছ্বাসে !
সম্পদ-দিনে তুমি ছিলে পাশে, বিপদের দিনে যাওনি স'রে,
দুঃখে ও সুখে ছিলে সঙ্গিনী, বেঁধেছিলে তা'রে মমতা-ডোরে !
বিলাসের স্রোতে ভাসিল সিরাজ, সুরা ও নারীর কুহকে মজি',
জীবনে করিল পাপ-অভিশাপ, পবিত্র রাজ-ধর্ম ত্যজি' !
চক্ষে তাহার ছেয়েছিল শুধু স্বপ্ন জড়িত ঘুমের মায়া,
দেখে নাই চেয়ে সারা বাংলায় ঘনাইছে ধীরে কি কালো ছায়া।
একদিকে তা'র বিদেশী বণিক, আর দিকে গৃহ-শত্রু যত,
আঁটিল ফন্দী কুচক্রীদল করিতে রাজ্য কুক্ষিগত !
সে কাল-রাতের অন্তরে তুমি রেখেছিলে জ্বেলে একটি আলো।
তুমি চেয়েছিলে মুছে দিতে সেই দিগন্ত ভরা সকল কালো !
তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া নিঠুর নিয়তি সাধিল বাদ,
ঘোর দুর্দিন এল ক্রমে ক্রমে, অপূর্ণ রহি তোমার সাধ !
সেই রাক্ষসী পলাশীর মাঠ, রক্ত-তৃষায় লোলুপ-প্রায়,
তোমার ধ্যানের বাংলাদেশে শোষণ করিল জীবন-ধারা !
বিশ্বাসঘাতী মিরজাফরের মিটিল সে দিন মনের আশা,

অস্ত-অচলে ডুবিল সূর্য, নামিল রাত্রি সর্বনাশা !
সে দিন সিরাজ আশ্রয়-হীন, সকলের সাথে ছিন্ন-ডোর,
নাহি বান্ধব, নাহি পরিজন, বক্ষে হতাশা, নয়নে লোর !
জীবনের' পরে বিশ্বাস-হারা, সাহস-অগ্নি নিবাপিত,
দুরু দুরু করি কাঁপে হিয়া, মরণের ভয়ে সতত ভীত !
সে দিনও মুৎফা তুমি ছিলে পাশে, দুঃখ-দরদী বন্ধু হয়ে,
ছিলে সঙ্গিনী, দিলে সান্ত্বনা, সকল মর্ম-যাতনা স'য়ে !
অঞ্চলে তব মুছালে অশ্রু, কহিলে কত না আশার বাণী,
চির-মমতায় রাখিলে ঢাকিয়া বাড়ায়ে দুইটি কোমল-পাণি !
হায় অভাগিনী, তবু পারিলে না রাখিতে সিরাজে নিজের কাছে,
কামনা-কুটিল চক্রীর আঁখি ছিল তোমাদের পথের পাছে !
মরণের ভীম ক্ষুরধার অসি ছিল দোদুল্য সিরাজ' পরে,
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-রাজ প্রাণ দিল হায় ঘাতক-করে !
তুমি বাংলার মহীয়সী রাণী, হ'লে কাঙালিনী সর্বহারা,
শত দুঃখ ও লাঞ্ছনা লভি' তবু মৃত্যুতে হওনি লীনা !
সিরাজের যারা সাধিল বিনাশ আত্মীয়তার ছদ্মবেশে,
বন্যার স্রোতে তৃণের মত একে একে গেল তারাও ভেসে !
পরাধীনতার গভীর আঁধারে ডুবে গেল এই সোনার ভূমি,
সেই ব্যথা স'য়ে কাঁদিবার তরে জীবন ধরিয়া রহিলে তুমি !
খোশ্‌বাগে যেথা সিরাজ শায়িত, সে মহাসমাধি বেদীর তলে,
তোমার প্রাণের অর্ঘ্য সাজালে, ধৌত করিয়া নয়ন-জলে !
প্রতি সন্ধ্যায় জ্বেলেছ সেথায় স্নিগ্ধ দীপের আরতি-শিখা,
আঁধারের মাঝে আঁকিয়া দিয়াছ তব জীবনের অমর-লিখা !
সর্বধ্বংসী কালের বক্ষে তুমি শাশ্বতী একেলা জাগি',
কল্যাণীরূপে দেখায়েছ পথ বাংলার ভাবীযুগের লাগি' !

কোরিয়া

শ্রীনির্মলেন্দু মাল্লা।

কোরিয়াকে আমরা চিনেছি যুদ্ধ লাগার পর। আরো সূক্ষ্ম ভাবে বলতে গেলে গত ১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জুন সকাল বেলাকার সংবাদপত্রে, ঠিক তার চব্বিশ ঘন্টা আগে কোরিয়ার যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। এটা বাইরের খবর। মনে মনে যুদ্ধ অনেক আগে থেকেই চলছিল। সে-ই যুদ্ধ প্রস্তুতির পটভূমিকায় কোরিয়াকে না দেখলে আজকের পরিস্থিতি ঠিক বোঝা যাবে না এবং কোরিয়ার ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ জাগবে না। অতএব ইতিহাস থেকেই আরম্ভ করা যাক।

ইতিহাসের ছাত্ররা একটি কথা খুব ভাল করে মনে রাখে, সে কথাটি হচ্ছে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। একই ঘটনা ভিন্ন দেশে ও কালে ভিন্ন রূপসজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে। কোরিয়ার যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেন যে ভূমিকা নিয়েছিল, সেই বীরবিক্রমের ভূমিকায় এবার দেখা দিয়েছে আমেরিকা। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা ছিল প্রায় নিরপেক্ষ, অবশ্য যুদ্ধের রসদ সে-ই জুগিয়েছে এবং যদিও তার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের প্রয়োজন ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়া থেকে আমেরিকা তার এই বিশ্ব বিচ্ছিন্নতার ব্রত ভঙ্গ করে রণাঙ্গনে সক্রিয় অংশ নেয়। তখন থেকেই সে মুখে প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার রাজনীতির সুলভ আদর্শ ঘোষণা করেছে এবং সতর্ক দৃষ্টিতে কড়া নজর রেখেছে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে যাতে তার আপন অধিকার বিস্তারে ব্যাঘাত না জন্মে। এজন্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে তার উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র এবং আলাস্কাকে পঞ্চাশতম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে এশিয়ার দোরে গোড়ায় এগিয়ে এসেছে তার লক্ষ্য ছিল যাতে বিজয়ী রুশ খুব বেশী তাড়াতাড়ি দখল করতে না পারে। হিটলারের তাড়নায় রাশিয়ার সঙ্গে তার নামে মাত্রে একটা মিতালী হয়েছিল; আসলে ধনিকতন্ত্রের দেশ আমেরিকা কোনদিনও সাম্যবাদী রুশ সোভিয়েটকে ভালোর চক্ষে দেখতে পারেনি। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামতে না থামতেই আমেরিকা দ্রুত জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় আপন অধিকার কায়েম করে নিয়েছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তার আয়ত্বে ছিল। ওদিকে চিয়াংকাইশেকের অধিকারে ফরমোজা থাকায় সেখানেও একপ্রকার মার্কিণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। অপর পক্ষে রাশিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকেনি। তারও লক্ষ্য ছিল যাতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা এক-চেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করতে না পারে। তাই মিত্রশক্তির সঙ্গে পূর্ব চুক্তিমত য়ুরোপের হিটলারের পতনের পরই সে জাপান আক্রমণের জন্য পূর্ব রুশ সীমান্তে সৈন্য নিয়োগ করেছে। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই অন্তর্মোঙ্গলিয়া, বহির্মোঙ্গলিয়া, রুশ প্রভাবিত অঞ্চল বলে অনুমোদিত ছিল। মহাযুদ্ধের সুযোগে চীনেও ক্রমশঃ রুশীয় সাম্যবাদী নীতি (কিছু পরিবর্তিত আকারে) প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

এইবার কোরিয়ার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কোরিয়া ছিল জাপানের অধিকারে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে পটসডাম সম্মেলনে জাপানের আত্মসমর্পণের সর্ত ঠিক হয় এবং কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেয়া হবে এই মর্মে কায়রো সম্মেলনের ঘোষণাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এই সময় ত্রিশক্তি অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং বৃটেনের সামরিক প্রধান কর্তাদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে, কোরিয়ায় মার্কিণ এবং রুশ উভয় বাহিনীই

অভিযান [illegible] কিন্তু উভয়কেই আটত্রিশ অক্ষরেখা পর্যন্ত [illegible] হবে তার বেশী এগোলে চলবে [illegible] এই সেই মত কাজ হল। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করল [illegible] রাশিয়ার সৈন্যদল দক্ষিণাঞ্চলে মার্চ করতে করতে উত্তর কোরিয়া দখল করে নিল। এদিকে দক্ষিণ দিক থেকে আমেরিকার সৈন্যদল এগোতে এগোতে আটত্রিশ অক্ষরেখায় গিয়ে থামলো। এইভাবে রাশিয়া এবং [illegible] রণনীতির খেলায় কোরিয়া সম্পূর্ণ একটি কৃত্রিম ভাগে ভাগ হয়ে গেল। উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে নেই কোনো বিভেদ, কোনো বিদ্বেষ। কিন্তু তাদের যারা অধীশ্বর হয়ে বসল, সেই রুশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে চলেছে মতবাদের তীব্র বিরোধিতা, সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে আলোছায়ার সংগ্রাম এবং সেইখান থেকেই কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়েছে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো সম্মেলনে ঠিক হোল কোরিয়াকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কোরিয়ার নতুন গভর্ণমেণ্ট গঠন করবার জন্য ১৯৪৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার যুক্ত কমিশন তৈরী হল। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। মূল প্রশ্নের সমাধান কিছুতেই হল না। সে প্রশ্নটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার কোন্ আদর্শমতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সে কি মার্কিণ গণতন্ত্র না সোভিয়েট গণতন্ত্র? কোনো পক্ষই অপর পক্ষের কাছে নতি স্বীকার করল না। ফলে সমস্যা সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলল। ১৯৪৭ সালে এই সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিষদে উত্থাপন করা হল। পরিষদ ১৯৪৮ সালে কোরিয়ার নির্বাচন পরিদর্শন করবার জন্য একটি কমিশন পাঠালেন। রাশিয়া সে কমিশনকে আটত্রিশ অক্ষরেখা পেরোতে দিল না। উত্তর কোরিয়ায় রাশিয়া আপন আদর্শানুযায়ী পিপলস্ রিপাব্লিক গাঁড় করালো আর দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকা তার আদর্শমত পৃথক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলে, যার প্রেসিডেণ্ট হলেন কুখ্যাত সীগম্যান রী। দুই কোরিয়া মিলিত হবার সকল শুভ আশা এই থেকেই দুরাশায় পরিণত হলো। অবশ্য তার পরেও অখণ্ড কোরিয়া গঠনের একটা চেষ্টা চলছিল। তদুদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা অনেক আগে থেকেই করা হয়েছিল; কারণ উত্তর কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে আর দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিণ প্রভু মনোনীত সদস্যরাই জয় ফেপিধে জনসাধারণের কাছে থেকে ভোট আদায় করেছিল এবং সেইসব সদস্যেরই প্রেসিডেণ্ট হলেন সীগম্যান রী। এই কারণে দুই কোরিয়ার সীমান্তে কিছু দিন ধরে ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই ছিল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া এবং ১৯৪৯ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য অপসারণে আশা করা গিয়েছিল যে, কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের কোন শক্তি হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। আমেরিকা এই সব সীমান্ত সংঘর্ষকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ বলে প্রচার করতে লাগল এবং সীগম্যান রী খুব জোরের সঙ্গে বললেন যে, সশস্ত্র আক্রমণের মধ্য দিয়েই দুই কোরিয়াকে যুক্ত করা হবে। তার পরেই দেখা গেল দক্ষিণ কোরিয়-বাহিনীর একলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত; শুধু ওয়াশিংটন থেকে একটা আদেশ আসার অপেক্ষা মাত্র।

উত্তর কোরিয়া থেকেও অখণ্ড কোরিয়া গঠনের আয়োজন সুরু হয়ে গেল। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে এজন্যে ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট গঠন করা হয়। এই ফ্রণ্ট আবার একটা নির্বাচন কমিটী প্রস্তুত করে, যার মারফৎ প্রচার করা হল যে, দুই কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট বাতিল ক'রে দিয়ে সমগ্র কোরিয়া ব্যাপী এক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একাজ করবার অধিকার তাদের আছে। এই কমিটী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিটীকে অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় আক্রমণ সুরু করলো। অষ্ট্রেলিয়াকে বলেছে, 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিকিয়ে যাওয়া বৃটীশ ক্রীতদাস'। ভারতবর্ষকে বলেছে, 'যে দেশ নিজেদের মধ্যে ঐক্য আনতে পারেনি, সে আবার অন্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে জাতিপুঞ্জে প্রতিনিধি প্রেরণ করে কোন সাহসে?' বাই-

হোক, জাতিপুঞ্জ কমিশন যুদ্ধ আরম্ভ হবার দু'সপ্তাহ আগে আটত্রিশ অক্ষরেখার উত্তর কোরীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঐস্থানেই সীমান্ত অতিক্রম করবার কালে উত্তর কোরিয়ার সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ফলে গৃহযুদ্ধের আয়োজন ত্বরান্বিত হয়।

এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনোনীত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ ভালভাবে হোত যদি বাইরের কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করত। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, যুদ্ধ সুরু হওয়া মাত্রই নামে মাত্র অনুসন্ধান চালিয়ে মার্কিণ প্রভাবিত জাতিপুঞ্জ স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলল যে, উত্তর কোরিয়াই আক্রমণ করেছে আগে, অতএব বিপন্ন দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করো। রাশিয়া এই অন্যায় সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তো সাহায্য করবার জন্যে সৈন্যবল নিয়ে তৈরী হয়েই ছিল। এই হলো কোরিয়া যুদ্ধের অতি সংক্ষিপ্ত পট-ভূমিকা। এখন এর ভৌগোলিক বৃত্তান্তে আসা যাক।

দেশটির আয়তন হলো ৮৫২৪৬ বর্গ মাইল। পশ্চিম বাংলার প্রায় আড়াই গুণ এর পশ্চিমে রয়েছে পীত সমুদ্র, পুবে জাপান সাগর, উত্তরে মাঞ্চুরিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়া। উত্তর এবং মধ্যভাগ পর্বতসঙ্কুল। ঐ পর্বতেরই নানা শাখাপ্রশাখা পূর্ব তীর পর্যন্ত এসে সমুদ্রতলে নেমে গেছে। সেজন্যে পূর্ব উপকূলে খাড়াই পাহাড়, দেশের মাটীর সঙ্গে জলের সহজ যোগাযোগের একটা কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এদিকের উল্লেখযোগ্য বন্দর হলো ইন্‌চান। কাগজে দেখা যায় জাপান থেকে মার্কিণ সৈন্যবহর অনেক ক্ষেত্রে ইনচান বন্দর দিয়ে কোরিয়ায় প্রবেশ করে। এর কারণ হোল পূর্ব উপকূল থেকে জাপানের দূরত্ব মাত্র ১১০ মাইল। কোরিয়ার পশ্চিম এবং দক্ষিণ উপকূল অত্যন্ত ভগ্ন। সেজন্য প্রচুর দ্বীপ এবং খাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। এইদিকে গেনসান ও ফুসানের মত যে কয়েকটী খুব সুন্দর সুন্দর বন্দর রয়েছে তার কারণ হলো সমুদ্র দেশের অনেকখানি ভিতরে প্রবেশ করেছে।

উত্তর কোরিয়ায় শীত অত্যন্ত তীব্র। দক্ষিণ কোরিয়ার আবহাওয়া বিশেষ মৃদুভাবাপন্ন গ্রীষ্মকালে রীতিমত বৃষ্টি হয়। তার ফলে দক্ষিণ কোরিয়া হয়ে উঠেছে কৃষি প্রধান। কৃষি ও শিল্পের দিক থেকে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্থক্য হচ্ছে এইখানে; দক্ষিণ কোরিয়ার প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে চারজনই কৃষির ওপর নির্ভরশীল আর উত্তর কোরিয়ার কেবল মাত্র শীতকালীন গম, বার্লি এবং ওটের চাষ হয়—আসলে ও অকলটা শিল্প প্রধান। জল-বিদ্যুতের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি উত্তর কোরিয়াতেই পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বার্লি, গম আর ওট ছাড়া অন্যান্য ফসলও ফলে, যেমন, ধান, আলু, নানা রকমের ফল, তুলা ও তামাক। কৃষি ছাড়া মৎস্য-শিল্পেও দক্ষিণ কোরিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

খনিজের দিক থেকে এদেশটীর সম্পদ অত্যন্ত আশা-প্রদ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জাপানী অধিকারে থাকার জন্য খনিজ-সম্পদ আহরণ বিষয়ে কোরিয়া অত্যন্ত পেছনে পড়ে রয়েছে। খনির প্রসার ঠিক ততটুকুই হয়েছে যতটুকু জাপান তার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন মনে করেছে। কাঁচা মালের অভাবের দরুণ উত্তর কোরিয়ার শিল্পকেন্দ্রগুলিরও বিশেষ উন্নতিসাধন হয়নি। এদেশকে পদানত রাখবার জন্যে জাপান শিল্পোন্নতি তথা আর্থিক উন্নতিতে বাধা দিয়েছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে এখানে পাওয়া যায় স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা, তাম্র, রৌপ্য, টাংষ্টেন, গ্রানাইট, মলিবডেনাম, ইলমেনাইট এবং অভ্র। শিল্পের মধ্যে কার্পাস বয়ন, রেশম শুটী, সার প্রস্তুত কারখানা, কাগজ এবং সিমেন্ট-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

এদেশে প্রতি চার একর জমির তিন একরই হলো সরল বর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল। পাইন, ওক, এল্ম প্রভৃতি নানা জাতের বৃক্ষ এখানে জন্মায়। বন-সংরক্ষণের জন্য সরকারী দপ্তর খুবই সক্রিয়।

[illegible] যানবাহন ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। ভাল
জাপানীরা প্রথম এদেশে
করে। বর্তমানে প্রায় চার হাজার
রেলপথ রয়েছে সারা দেশ জুড়ে। পাকা
রাস্তার পরিমাণ ছয় শত মাইল। দক্ষিণ
কোরিয়া গভর্নমেণ্টের মালিক তাঁদের সরকারের
হাতে আছে বিকাশ মোটরে ঘুরতে দেখা যায় বটে।
কিন্তু আসলে কোরিয়ার জনজীবনযাত্রার এখনও সেই
বলদ-চালিত মন্থর যানেরই প্রাধান্য রয়েছে। উত্তর
কোরিয়ার মোটর এবং তদানুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামের যে
তীব্র দুর্ভিক্ষ রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় গাড়ী চুরির
সংখ্যা থেকে। যুদ্ধের আগে সীমান্ত থেকে চোরাই গাড়ী
চালান দেওয়া এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে রীতিমত
ব্যবসা বলে গণ্য হয়েছিল।

কোরিয়ার রাজধানী হচ্ছে সিয়োল। ইঞ্চন বন্দর
থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে। এটি দক্ষিণ কোরিয়াতেই
পড়েছে। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে গত দশ বছরের
মধ্যে রাজধানীর লোক সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ; কেবলমাত্র
জন্মহার বৃদ্ধিই এর কারণ নয়, উত্তর কোরিয়ার পিপলস্
রিপাবলিক কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেওয়ার
অধিকাংশ উচ্চ মধ্যবিত্ত জমিদারশ্রেণীর দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিড়
করেছে। শহরের বাড়িগুলির সর্বাঙ্গে জীর্ণদশা পরি-
স্ফুট। যুদ্ধের সময় মালমশলার ছিল নিদারুণ অভাব।
তাই অধিকাংশ বাড়ীই মেরামতের অভাবে এখন
নষ্ট হতে বসেছে। জাপানীরা এদেশে রাজত্ব করবার
সময় পাশ্চাত্যের কাঠামোর শহরের কিছু কিছু অংশ
গঠন করে গেছে। বড় বড় কংক্রীটের বাড়ী কিংবা
প্রশস্ত এ্যাভেন্যু, এদের অভাব নেই, যদিও সমগ্র
শহরের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রচুর।

শহরের আশপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি অত্যন্ত
উপভোগ্য। খাড়া গ্রানাইট পর্বত ঘিরে রয়েছে শহরটিকে।
শহরের মধ্যেও রয়াল গার্ডেন কিংবা প্যাগোডা পার্কের
মত সুন্দর সুন্দর উদ্যান রয়েছে। এখানের মন্দিরগুলি
সাক্ষ্য দিচ্ছে কিভাবে কোরিয়া-স্থাপত্য চৈনিক
শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সিয়োলের পুরুষ অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদে
পাশ্চাত্যের ছাপ লেগেছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিদেশী
হতে পারে নি। পাশ্চাত্যের প্যাণ্টলুন পরে গায়ে
প্রাচ্য দেশের একখানা আধো মহলা জামা ঝুলিয়ে
দেয়ার রেওয়াজ এখানো চলেছে। মেয়েদের পোষাকে
কিন্তু একটুও পাশ্চাত্যপ্রভাব লাগেনি, সেই চিরাচরিত
পা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া সাদা কিংবা রঙীন স্কার্ট।
মায়েরা আবার পিঠে শিশু সন্তানদের বেঁধে নিয়ে ঘুরে
বেড়ান।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা যখন উঠেছে তখন
একথাও বলে রাখা ভাল যে, সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়াই
আজ জনবাহুল্যের সমস্যায় আক্রান্ত। যুদ্ধের পূর্বে
দক্ষিণ কোরিয়ার লোক সংখ্যা ছিল বেড় কোটী। আর
এখন দু'কোটী ছাপিয়ে গেছে। কৃষি প্রধান দেশ বলে
লোকে নতুন কোনো উপার্জনের পথ পাচ্ছে না, জমির
ওপর চাপ পড়ছে বেশী।

কোরিয়ার জনগণ যে মোঙ্গলদের উত্তর পুরুষ সে
বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের সঙ্গে চীনা এবং জাপানী-
দের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত প্রভেদ রয়েছে প্রচুর।
আমাদের চোখে অবশ্য সব সমান লাগবে। সেই
কালো চুল, কালো আঁখি-তারা, অলিভের মত ব্রাউন
রঙের দেহবর্ণ, উঁচু গুতনী এবং চ্যাপ্টা নাক। তবে
ওরা চীনা এবং জাপানীদের চেয়ে লম্বায় একটু বেশী।

ভাষার দিক থেকে চীনা এবং জাপানীদের সঙ্গে
খুব সাদৃশ্য আছে। মোট পঁচিশটি বর্ণমালার মধ্যে
এগারটি স্বরবর্ণ এবং চৌদ্দটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এখানকার
সংবাদ পত্র গুলিতে কিছু কিছু চীনা হরফ দেশীয়
হরফের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এখন চীনা
হরফের প্রচলন উঠে যাচ্ছে এবং জাপান চলে যাওয়ার
পর কোরিয়া শিশুরা মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার
অধিকার পেয়েছে। এখানে বলা দরকার যে উচ্চবিত্তের

দল শিক্ষার আলোক পেলেও গণসাধারণ অজ্ঞতার অন্ধকারেই রয়ে গেছে। ক্রিশ্চিয়ান মিশন স্কুলগুলি ওপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

ধর্মের দিক থেকে এরা আগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। খৃষ্ট জন্মের ৩৮৪ বছর পূর্বে এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই ধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল দেশবাসীর মনে, এখন তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, যদিও এখনও বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এ ধর্মের আবেদন কোরিয় নারীদের মধ্যেই প্রবল; কিন্তু মানা সংস্কার এসে এই ধর্মের উচ্চ আদর্শকে আবিল করে তুলেছে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের জন্যে আসে। বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। জাপানীরা শিন্টো ধর্ম প্রচার করেছিল, যদিও তার প্রসার বেশী হয়নি। চৈনিক দার্শনিক এবং কৃষি কনফ্যুসিদের মতবাদ কোরিয়াবাসীদের হৃদয় জয় করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই কোরিয়ার ইতিহাস জাপানী আক্রমণ ও অধিকারের দ্বারা স্তব্ধ হয়ে আছে। জাপানীরা তাদের এই নিকটতম উপনিবেশের নাম দিয়েছিল চোসেন অর্থাৎ প্রভাত শান্তির দেশ। কোরিয়া যে জাপানকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছিল তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার হয়েছিল কোরিয়া। এখানে সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে এশিয়ার অন্য দেশগুলি জয় করবার নিষ্ঠুর স্বপ্ন সে দেখেছে। জাপানে ঘনবসতির দরুণ বহু জাপানী এদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার জন্যে চলে এসেছে। সবচেয়ে মূল্যবান কথা হচ্ছে জাপানীরা এদেশে প্রচুর খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে, যার দ্বারা তাদের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ হয়েছে।

কোরিয়ায় প্রথম জাপানী আক্রমণ ঘটে ১৪০০ সালে। ১৯১০ সালে সমগ্র কোরিয়া জাপান অধিকারে আসে। পঞ্চত্রিশ বছর ধরে রাজত্ব করবার পর ১৯৪৫ সালের পরাজয়ের ফলে জাপান কোরিয়ার ওপর অধিকার হারায় এবং সমস্ত জাপানী কোরিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ঐ যে একটানা পঞ্চত্রিশ বছর ধরে জাপান রাজত্ব করেছে তার মূল কথা হল শোষণ। কতকগুলো শিল্প আর জলবিদ্যুতের কেন্দ্র তারা গড়েছে বটে, কিন্তু সে কেবল নিজ স্বার্থের খাতিরে। কোরিয়ার শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ তারা আইন করে বন্ধ করেছিল। সরকারী কাজে কোরিয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়েছিল। শিল্প কাজে দক্ষ শ্রমিকের জন্য জাপানীদের আমদানী হয়েছিল। তাই যখন জাপানীরা চলে গেল, রেখে গেল বিকৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা, রেখে গেল মূর্খ জনসাধারণ, যারা এক কৃষি ছাড়া অন্য কোনো কাজেরই উপযুক্ত নয়।

সম্প্রতি মিঃ এড্রো স্ত শেটেলাাই দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে কৃষিজীবীদের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধ লাগার কয়েক মাস মাত্র আগে তিনি সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া বেড়িয়ে এসেছেন। সেই দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনা খুবই আধুনিক। তাঁর বিবৃতির কিছু অংশ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

একজন কোরিয়া কৃষক কিভাবে জীবন যাপন করে জানতে চাইছেন? তবে শুনুন, যা দেখেছি, বলি। কোরিয়ায় থাকবার সময় আমি সাণ্ডডঙএর টাংস্টেন খনি দেখতে গিয়েছিলাম—পৃথিবীর সেরা খনিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। জাপানীদের তৈরী মিলগুলো পুনর্গঠিত হলে এবং নতুন যন্ত্রপাতি বসালে, এই খনি থেকেই টাংস্টেন রপ্তানীর দ্বারা কোরিয়া প্রভূত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

যাই হোক,-জীপগাড়ীতে করে ঘুরতে ঘুরতে আমার কোরিয়ান ড্রাইভার আর দোভাষী সমেত একটা পর্বতের ধারে থেমে পড়লাম। আমাদের তখন লাঞ্চ খাবার সময় হয়েছিল। কিন্তু এমন খোলা জায়গায় আহারাদি করার বিপদ আছে। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো এমন ভাবে তোমায় ঘিরে ধরবে যে তুমি অস্বস্তি বোধ না করে পারবে না। আমি সেই জন্য ভাবছি এ অবস্থায় গাড়ীতে

হয়ে যাওয়াও ঠিক হবে কিনা, এমন সময় একজন গৌঢ় কৃষক তাঁর ঘরে বসে খাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি বললেন সেখানে আমরা ঠাণ্ডা খাবার গরম করে নিতে পারবো—তাছাড়া এই শীতশেষের কন্‌কনে হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার সুযোগও হবে।

যে ঘরে গেলাম তিনি একজন বেশ অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী। তিরিশ বিঘের ওপর ধানী জমি রয়েছে একলাঠা জমিও তিনি ফেলে রাখেন নি। তখন ধানচারা করে দেবার সময় পড়েছিল। আমরা দেখলাম সেই পুরাকালের হাল বলদের সাহায্যেই জমির মাটী আলগা করে নিয়ে কাদা মাটে ছুটো আঙুলের জোরে ধানচারা রোপণ করা হচ্ছে এসব জমি ছাড়া তাঁকনো জমিতে সয়াবীন, হেম্প (পাটের মত তন্তুসার উদ্ভিদ), গম, বার্লি এবং শাকসব্জীর চাষ তিনি করে থাকেন। দক্ষিণ কোরিয়ার তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষক এবং প্রত্যেকেই খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী। আমরা শহরের আওতায় মানুষ হয়েছি। এদের মত বেশন কথাটাকে একটা অপ্রচলিত পৌরানিক শব্দ কিংবা খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারকে একটা হাস্যকর মিথ্যাকথা বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

কৃষকটির স্ত্রী এবং অন্যান্য মেয়েরা দেখলাম শিল্প এবং তুলোর সুতো তৈরী বা কাপড় বোনার কাজ করছেন। সিল্কের সুতো বা কাপড় প্রস্তুতের কাজ কয়েক শতাব্দী ধরে কোরিয়ার চলে আসছে। জাপানীরা এই কারুকলাটি এদের কাছ থেকে শিখে গেছে। পৃথিবীর সিল্কের বাজার দখল করবে বলে জাপান এদের উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। এটা মূলতঃ এদের কুটির শিল্প; যদিও বর্তমানে সিল্কের কাপড় তৈরীর মিল দুচারটে চালু হয়েছে

এখানের প্রত্যেক গ্রামেই কর্মকার এবং কুম্ভকার রয়েছে। জামাজুতো কিংবা দেশলাই, তামাকের মত গ্রামে প্রস্তুত হয় না। এসব জিনিস কিনতে হলে ভদ্রলোকটী বিনিময় প্রথার সাহায্য নেন। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাষের কাজে এখন অসুবিধা বোধ করছেন নাকি? তখন তিনি বললেন, জমিতে সারের খুবই অভাব। আগে উত্তর কোরিয়ায় সার প্রস্তুত হতো, এখন আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে।

কৃষকটির স্ত্রীকে সাদা আলখাল্লার মত লম্বা পোষাকে ঘুরাঘুরি করতে দেখলাম। পরে জানলাম, ওটা নাকি শোকসূচক পরিচ্ছদ, আরো শুনলাম, নিকট আত্মীয় মারা গেলে তিন বছর ধরে ঐ পোষাক পরে থাকতে হয়। শোক প্রকাশের ব্যবস্থাটা যে খুবই দীর্ঘ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটু পরেই আমাদের গরম করা খাবার এসে গেল, সেই সঙ্গে ওদের দেশের খাবারও কিছু কিছু। যে মহিলাটি খাবারের ডিসগুলি আনছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকেই নীচু টেবিলের ওপর সেগুলি দ্রুত রেখে দিলেন—তারপর নিজেরেই হাওয়া। কৃষক রমণীরা অপরিচিত বিদেশীদের সামনে বেরোতে একেবারেই অনভ্যস্ত।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ওনজু শহরে একটা কোরিয় বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। উচ্চবিত্ত ঘরের বিয়ে। খেলাম আচার আড়ম্বরের নানান ছাঁচামা দেখলাম। বিবাহের মৌলিক ব্যাপারে এদের মধ্যে পাশ্চাত্যের ছাপ পড়েছে। যে ছেলেটির বিয়ে হচ্ছে সে তার ভাবী বধূর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে।

দেখলাম নববধূকে খুব জমকালো লাল সিল্কের ঘাঘরা পরানো হয়েছে। গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউজ; মুখে সাদা পাউডারের একপ্রস্থ ঘন ছোপ। মাথায় নানা রঙের ঝকমকে মুকুট। পিঠের দিকে হীরে সেট্ করা লম্বা ফিতে। তাকে একবারও হাসতে কিংবা মুখ তুলতে দেখলাম না। বরের জন্যেও ঐ রকম ফ্যান্সী পোষাকের চলন আছে। এক্ষেত্রে ছেলেটি অবশ্য কোট প্যান্ট পরেই বিয়ে করতে এসেছিল।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলে কনে অন্দরে চলে গেল। আমরা বরের সঙ্গে তাদের বাড়ীর দিকে ফিরে গেলাম।

বিয়ের প্রথা এখন দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। তবে সাধারণতঃ বরকে তিনদিন শ্বশুর বাড়ীতে কনের সঙ্গে থাকতে হয়।

এখানে বিয়ের একটা সামাজিক অর্থ আছে। কেবলমাত্র বিবাহিতরাই এখানে সাবালকের মর্যাদা পায়। কেউ যদি আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করে, তবে তার সঙ্গে সতর বছরের যুবকের কোনো তফাৎ রইল না। আবার যদি কেউ সতর বছরেও বিয়ে না করে কেউই তার কথায় কান দেবে না—যেমন আঠার বছর বয়সী ছেলেদের বেলা হয়। কনফুসিয়াসের মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় এবং ভূতপ্রেত পূজার প্রচলন থাকায় এদের ধারণা হয়ে গেছে যে, পুত্রকন্যার সংখ্যা যত বেশী হবে ততই ভালো; কারণ বংশধরদের দ্বারা তাদের আত্মার আরাধনা ততই ভাল ভাবে চলবে। এই রকম ধারণার ফলে দেশে জনবাহুল্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এরপর আমি দক্ষিণ পূর্ব কোরিয়ায় ভ্রমণ করবার সুযোগ পাই। তখন কাংজু শহর পরিদর্শন করবার সৌভাগ্য ঘটে। কাংজু ছিল প্রাচীন সিলা রাজ্যের রাজধানী। য়ুরোপে খৃষ্টীয় সভ্যতা যখন সবে সূচনা লাভ করেছে তখন এই রাজ্যটি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। শহরের আশপাশে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় সেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেই সব প্রাচীন সম্রাট এবং রাজকুমারদের বিরাট বিরাট মাটির কবর দেখে। এখন সেখানে পাইনের বন গজিয়ে উঠেছে।

মিঃ স্লেটে জ্যাটের বর্ণনা এইখানেই শেষ করা হল। তবে তাঁর কথার জের টেনে আমরা এইটুকু মন্তব্য করতে পারি যে, য়ুরোপে যেকালে অসভ্য-অর্ধসভ্যের দল বিরাজ করতো, কোরিয়ায় সেকালে থাকতো পণ্ডিত, শিল্পী ও কারিগরের দল। কোরিয়ার সভ্যতা খুবই প্রাচীন। তারাই প্রথম ছাপাখানার জন্যে ধাতুনির্মিত অক্ষর আবিষ্কার করেছে। প্রথম সহজবোধ্য লিপিমালা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাদেরি। তারা প্রথম সশস্ত্র জলবাহিনী গঠন করে পনেরোশ খৃষ্টাব্দের জাপানী আক্রমণ রোধ করেছে।

সেই সভ্যতা তথা সভ্য দেশ আজ দু'টুকরো হয়ে গেছে। আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ রূপান্তরিত হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধে। জগতের দুটি প্রধান বিপক্ষ-শক্তি কোরিয়াকে উপলক্ষ্য করে হিংস্র হানাহানির খেলায় মেতেছে। উভয় পক্ষ থেকেই আশ্বাস দেয়া হয়েছে, কোরিয়ার ভাঙা ঘর তারা জোড়া লাগাবেই। কিন্তু তার আগেই যে ভাঙা ঘর বোমার ঘায়ে ধূলো হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোরিয়াবাসীরা আজ বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তারা সর্বস্বান্ত হতে চলেছে। সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ কোরিয়ার কথা চিন্তা করে নিশীথ প্রহর জাগছে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের আবির্ভাব কি ঐ পথে? কে জানে!

দুই দিন

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

দেখা হ'ল মোর প্রিয়া সাথে ফাল্গুনের ফুল কুঞ্জবনে।
চলেছিল লঘুপায়ে শুভ্র মেঘসমা শান্ত তার আঁখিতারা দুটি
জ্বলে যেন শুচি শুকতারা!
ফুলন্ত চম্পকবন ছড়ায় সৌরভ, আকাশেতে
জাগে বাঁকা চাঁদ।
অধীর আগ্রহভরে প্রিয়ারে টানিনু বক্ষমাঝে;
চোখ তার ভরে এলো জলে-মুখে কথা নাহি।
নীরব অধরে শুধু এ মিনতি জাগে—"হে অশান্ত মোর,
কেন এই চঞ্চলতা? আমার প্রেমের ভীরুফুল,
তাহারে ফুটিতে দাও সহজে নীরবে।"
অধৈর্য যৌবন মোর বাধা নাহি মানে,
নিবিড় বাহুর ডোরে বাঁধিনু তাহারে
চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিনু তার রক্তবিম্বাধর।
নীরবে সহিল প্রিয়া সকল আদর।
শুধু যাওয়ার বেলায় চলে গেল ম্লান হাসি,
কালো চোখে জল ছলো ছলো।

সেদিন ফুরায়ে গেছে, সে ছবি মিলায়ে গেছে, হায়!
জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়েছি আসি, কুঞ্জবনে।
আজি সব ফুল ঝরে গেছে, রিক্ত এ প্রান্তর।
ওই দূর শুষ্ক নদীতীরে জ্বলে চিতা।
পশ্চিম দিগন্তপারে ক্লান্ত সূর্য অস্ত যায়।
উড়ে আসে ধূলি, চৈত্রের বিমর্ষ বাতাসে।
সে চম্পক বন—জীর্ণশাখা মেলি আছে দাঁড়াইয়া,
তলে তার পড়ে আছে জীর্ণ পত্রদল।

বিদেশী কবিতার ভাবানুসরণে।

কেন্দ্রীয় বাজেট :

ভারতের নূতন অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন্ দেশমুখ তাঁর প্রথম বাজেট ভারতীয় বিধান পরিষদে পেশ করেছেন। ভারতের আর্থিক অবস্থা যে খুব সচ্ছল নয় তা প্রতি বছরের বাজেটে প্রমাণিত হয়। এ বছরে আমাদের মোট রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা ৩৭০ কোটী টাকা এবং খরচ ৩৭৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। তাতে ৪৪ কোটী টাকা ঘাটতি হয়। মূলধন খাতে খরচের (capital expenditure) বরাদ্দ আছে ১৪০ কোটী টাকা; তন্মধ্যে ৬৩ কোটী টাকা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ দেওয়া হ'বে। মূলধন খাতে আমাদের মোট ঘাটতির পরিমাণ হ'বে প্রায়—৭৮ কোটী টাকা। '৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর আমাদের জমা ছিল ২৭০ কোটী টাকা। এ বছরের খরচের হিসাব ধ'রে তা ১২ কোটী টাকাতে দাঁড়াত। ভারতের মত এত বড় একটা বিরাট দেশের পক্ষে মাত্র কোটী টাকা তহবিলে থাকা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বিশেষ ক'রে আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এটা অধিকতর বিপজ্জনক। দেশমুখ বাজেটের একটা বিশেষত্ব হ'ল রাজস্ব তহবিল ও জমা তহবিল থেকে খরচ একযোগে দেখান হয়েছে; এবং রাজস্ব তহবিল ও জমা তহবিলকে সাকল্যে ধ'রে রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা বিচার করা হয়েছে। যদি গত তিন বছর ভারতের বাজেট এই সাকল্য হিসাব ধরে করা হত, তাহ'লে আমাদের জমা বা মূলধন খাতের টাকা এমনি দ্রুত কমে যাওয়া হয়ত কিছুটা বাধা পেত। এই গুরুতর অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যই রেলের ভাড়া বাড়ান হয়েছে এবং কিছু নূতন কর বসান হয়েছে। রেলের ভাড়া বাড়িয়ে ১৯ কোটী টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং উপরে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে ঐ ১৯ কোটী টাকাও ধরা হয়েছে অর্থাৎ রেলের ভাড়া বাড়িয়ে ১৯ কোটী টাকা না পেলে ভারতীয় রাজস্বের অবস্থা আরও খারাপ হ'ত। তাই নূতন কর বসিয়ে ৩১ কোটী টাকা রাজস্ব খাতে আয় বাড়াতে হয়েছে। ৪৪ কোটী টাকা ঘাটতি বাদ দিয়ে এ বছর রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত থাকবে ২৪ কোটী টাকা। কাজেই জমা তহবিলে ১২ + ৩১ − ৪৩ কোটী টাকা জমা থাকবে। দেশমুখ হিসাব দিয়েছেন, অন্ততঃ ৫০ কোটী টাকা জমা তহবিলে থাকা উচিত। আমাদের মনে হয় এই অঙ্ক খুব কম ক'রে তিনি ধরেছেন। যাই হোক, তাঁর হিসাবেও জমা তহবিল নিম্নতম অঙ্কের চেয়েও ৭ কোটী টাকা কম থাকবে।

রাজস্ব খাতে নূতন কর নিয়ে ৪০১ কোটী টাকা এই বছরে আদায় হওয়ার কথা। ৩৭৪৪ কোটী খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে ২৪ কোটী টাকা। তন্মধ্যে সামরিক বিভাগ নেবে ১৮০ কোটী। মোট খরচের প্রায় অর্দ্ধেক সামরিক খাতে ব্যয় হওয়া অনেকের নিকটে একটু অতিরিক্ত মনে হ'বে। সরকার হ'তে বলা হয়, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের এই ব্যয় অতিরিক্ত নয় এবং অন্য দেশের তুলনায় বরং কম। প্রায় কোন দেশেই রেলের বাজেট ও সাধারণ বাজেট আলাদা করে দেখান হয় না; একই রাজস্ব হিসাবে উভয়ের হিসাব ধরা হয়। সেই হিসাবে আমাদেরও মোট রাজস্ব ৬৮০

কোটী টাকা। তার উপর আরও ৪৪ কোটীর কিছু বেশী টাকা আয়কর থেকে বিভিন্ন প্রদেশকে দেওয়া হয়। এই সব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব দাঁড়ায় ৭২৫ কোটী টাকা এই ৭২৫ কোটী টাকা থেকে ১৮০ কোটী টাকা সামরিক ব্যয় খুব বেশী নয়। কিন্তু তবুও আমরা মনে করি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের সাথে ভারতের বর্তমান সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিচার করেও সামরিক খাতে ব্যয় কমান যেতে পারে। সৈন্য সংখ্যার হ্রাস করার পক্ষপাতী আমরা নই, কিন্তু মালপত্র ক্রয় সম্বন্ধে মিতব্যয়িতার সুযোগ আছে ব'লে আমরা মনে করি। মূলধন হিসাব থেকেও প্রায় ১৫ কোটী টাকা সামরিক খাতে ব্যয় করা হ'বে। অধিক খাদ্য ফলাও, নদী উপত্যকা উন্নয়ন (River Valley Schemes), যথা দামোদর উপত্যকা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি খাতে বিভিন্ন প্রদেশকে রাজস্ব-খাতে ৪০ কোটী টাকা দেওয়া হবে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বাবদ রাজস্ব ও জমা তহবিল থেকে মোট ৩৭ কোটী টাকা এ বছর ব্যয় করা হবে। রাজস্ব তহবিল হ'তে ৬৩ কোটী টাকা খরচ হবে এমন কতকগুলি হিসাব বা ভারত-সরকারের পক্ষে অনিবার্য, যেমন ঋণ বাবদ সুদ, পেনসন, বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট বরাদ্দ, প্রাক-ভারত-বিভাগ দেনা প্রভৃতি বাবদ। এ পর্যন্ত গত তিন বছরে মোট ১০৭ কোটী টাকা উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬ কোটী টাকা পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ইহা ব্যতীত প্রায় আর সবটাই পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ হয়েছে। তাদের সমস্যা কতকটা মিটেছে, অথচ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য আজ প্রায় কিছুই করা হয়নি। আশা করি এ বছরের বরাদ্দ টাকা থেকে বেশীর ভাগ টাকাই পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হবে।

নূতন যে সব কর বসানো হয়েছে তার মধ্যে কতগুলি উঁচু আয়ের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য। আয়করের উপর একটা অতিরিক্ত কর বসান হয়েছে (surcharge), সেখানে আমাদের মনে হয় বছরে অন্ততঃ ৬০০০ টাকার কম যাদের আয় তাদের এই অতিরিক্ত কর থেকে রেহাই দেওয়া উচিত। অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তাতে ৬০০০ টাকা আয়ের লোককে বছরে ৮ টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হবে। পেট্রল ও কেরোসিনের উপর যে অতিরিক্ত কর বসান হয়েছে, তাতে মোট ১৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়বে। কিন্তু এ ট্যাক্সটা প্রধানতঃ গরীবদের ওপর পড়বে। কেরোসিন প্রত্যক্ষভাবে গরীবদের ব্যবহার্য দ্রব্য। আর পেট্রলের দর বাড়ালে মোটর বাসের ভাড়া বাড়বার সম্ভাবনা আছে এবং তাও গরীবদের উপর পড়বে। অর্থনীতির নূতন কর ধার্যের প্রস্তাবের মধ্যে সব চাইতে আপত্তিজনক হ'ল বিড়ি ও তামাকের উপর কর। এই দুইটীই গরীবদের ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বিড়ি তৈরীর কারখানার উপর যে ভাবে কর বসানো হয়েছে তা নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর বিড়িকারীগরদের অত্যন্ত কষ্টের কারণ হবে। আশা করি এই ক'টা বিষয় পার্লামেন্টের শেষ বিবেচনার সময় পরিবর্তিত করা হবে।

বাজেট মোটামুটি জাতির আর্থিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। ঘাটতি বাজেট থেকে বোঝা যায় আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব সহজ নয়। জাতির আর্থিক অবস্থার ব্যবহারিক নিদর্শন স্বরূপ দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এক হ'ল, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার খরচের মান; দ্বিতীয় হ'ল, জাতির বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির অবস্থা। আমাদের জীবনযাত্রার খরচের মান ক্রমাগতই বেড়ছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন তা প্রায় চার গুণ বেড়েছে। আমদানি-রপ্তানির হিসাবের দিক থেকেও আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়, যদিও এ বছরে মোট আমদানি ৫৯৩ কোটী টাকা এবং মোট রপ্তানি ৫৪১ কোটী টাকা। অর্থাৎ ৪৮ কোটী টাকার মত বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের উদ্বৃত্ত আছে। তবুও একটু হিসাব করলে দেখা যাবে সত্যিকার অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। অত্যন্ত কড়াকড়ি ক'রে আমদানির পরিমাণ গত বছর থেকে এ বছর ১০৮ কোটী

টাকা কমান হয়েছে। তার ফলে সাধারণ লোকের ব্যবহার্য দ্রব্যের ঘাটতি পড়েছে এবং দর বেড়েছে। নূতন করের প্রস্তাবে সমস্ত আমদানির উপর একটা অতিরিক্ত কর ধরা হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আরও বেড়ে যাবে। বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে এবং এর একটি প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর নির্ভর করে। গত দুর্ভিক্ষ, বন্যা-বিভাগ, অন্যান্য প্রদেশের প্রতিযোগিতা এবং এই জীবনযাত্রার উচ্চমান বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছে। ভারতের এই বাজেট সম্পর্কে বাংলার দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বিবেচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা :

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী পাকিস্তানের বাজেট সেখানকার সংসদে পেশ করেছেন। এ বাজেটের বিশেষত্ব তুলিস্তানের ঘাটতির দিনে ওখানে হয়েছে উদ্বৃত্ত। বিলাতের বিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' কাগজ কিছুদিন পূর্বে লিখেছেন যে, পাকিস্তানের জন্মের সাথে ওর ভাগ্যলক্ষ্মীরূপে একটা পরী বরাবরই কাজ করেছে।—যখনই কোন দুঃসময়ের সূচনা দেখা গিয়েছে তখনই অবস্থার ও ঘটনাচক্রের এমন সমাবেশ অলক্ষ্যিতরূপে হয়েছে যাতে ঐ দুঃসময় পাকিস্তানের পক্ষে সুসময়ে পরিণত হয়েছে। দেড় বছর পূর্বে যখন মুদ্রার বিনিময় হারের বিতর্ক নিয়ে ভারতের সঙ্গে তার বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, তখন পাট ও তুলার বাজার তার পক্ষে অত্যন্ত মন্দা হয়ে পড়ল। কিন্তু সে সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আগ্রহে, হয়ত কোন বৈদেশিক শক্তির গোপন হস্তক্ষেপে এবং পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার 'বল্লভভাই'র সদিচ্ছার ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি হয়ে তার আর্থিক সংকট কাটিয়ে দিল। তারপর ৮।৯ মাস পূর্বে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে কাঁচা মালের চাহিদা বেড়ে গেল এবং আন্তর্জাতিক সংকট পাকিস্তানের সৌভাগ্যের হয়ে উঠল।

১৯৪০-৫১ সালে পাকিস্তানের বাজেটে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে তার উদ্বৃত্ত হল প্রায় ২৯ কোটী টাকা। তার মুদ্রার বিনিময় হার খোলা বাজারে কোন দিনই ভারতীয় মুদ্রা থেকে শত-করা ১০।১২ টাকার উপরে ওঠেনি। সময় সময় ভারতীয় মুদ্রার প্রায় সমান পর্যায়েও নেমেছে। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে তার মুদ্রার বিনিময় হার অপ্রত্যাশিত রকমে বেড়ে গিয়েছে এবং ভারতকে আজ পাকিস্তানের দাবী মেনে নিয়ে শতকরা ৪৪ টাকা বেশী হারে তার মুদ্রার বিনিময় মূল্য মানতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (I.M.F.) এতদিন চুপ ক'রে বসেছিল। আজ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থা অনুকূল দেখে তারাও পাকিস্তানের মুদ্রার পূর্ণ মূল্য স্বীকার করে নিয়েছে।

এবারকার পাকিস্তান বাজেটে রেল ও সাধারণ খাতে মিলে মোট রাজস্ব হবে ১৬০ কোটী টাকা। বিভিন্ন প্রদেশকে দেয় আয়কর এবং বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে আদায়ী-কৃত বিক্রয় কর সবই এই ১৬০ কোটী টাকার মধ্যে ধরা হয়েছে। ভারতীয় সাধারণ বাজেটের রাজস্বের মোট হিসাবে প্রদেশকে প্রদেয় আয়করের অংশ বাদ দিয়ে দেখান হয় এবং বিক্রয় কর মোটেই কেন্দ্রীয় রাজস্বে আসে না। এই ১৬০ কোটী টাকা হ'তে ৬০ কোটী টাকা খরচ করা হবে সামরিক খাতে। রেল, পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ বাবদ যাবে ৪৩।০ কোটী টাকা। অন্যান্য খাতের হিসাবে একুনে ৩৩ কোটী টাকা। এর ভেতর থেকে বিভিন্ন প্রদেশকে আয়কর ও বিক্রয় করের বাবদ অংশ কিছু টাকা দেওয়া হবে। তারপর যা বাকী থাকবে তার ভেতর কেন্দ্রীয় সরকারের খাস খরচের করাচী বাবদ একটা মোটা হিসাব যাবে। কর্মচারীদের মাহিনা, পেনসন, ঋণের সুদ এবং প্রাক্-ভারত-বিভাগ ঋণ—এই সব বাবদও যেন কিছু

টাকা গিয়ে জাতি সংগঠনমূলক কাজের জন্য কি পরিমাণ টাকা থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু গত বছর ও এ বছরে পাকিস্তানের প্রায় ৫০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। এই ৫০ কোটী টাকা থেকে জাতিসংগঠন কাজের জন্য ৩৪ কোটী টাকা দিয়ে তিনটী আলাদা তহবিল সৃষ্টি করা হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন—অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ১০ কোটী, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৬॥ কোটী এবং সামরিক পরিকল্পনায় ৭॥ কোটী টাকা। এই টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হলে জনসাধারণের কিছুটা উপকার সাধিত হ'তে পারে। তাছাড়া দেশের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ৫ কোটি টাকা মূলধন দিয়ে একটী কৃষি উন্নয়ন আর্থিক সংস্থা (Agricultural Finance Corporation) স্থাপন করা হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কাজেই পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষে অনুকরণযোগ্য।

পাকিস্তান ও ভারত আজও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রায় অচ্ছেদ্য। একের উন্নতি বা অবনতি অপরের উপরও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তাই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি ভারতের পক্ষেও আনন্দের। আমরা আশা করি পাকিস্তান দিন দিন তার আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করবে।

পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে পূর্ব বাংলার সভ্যগণ প্রায় সবাই অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেয় না। পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন খুব তীব্র ভাষায় এই অভিযোগ ওখানে প্রকাশ করেছেন। পূর্ব বাংলার অন্যতম মন্ত্রী হবিবুল্লা বাহার সাহেবও পূর্ব বাংলা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী পূর্ব বাংলার অধিবাসী। পূর্ব বাংলা সেই হিসাবে পাকিস্তান সরকারের যথাযোগ্য মনোযোগ পায় না ব'লে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনে বিক্ষোভ যেন ক্রমশঃই বাড়ছে। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ও শিক্ষার আগ্রহ অনেক বেশী ছিল। আজ পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো এখনও চালু আছে তাও সংকীর্ণ অবস্থায় চলছে। এখন আবার বাংলা ভাষার, আরবী লিপি প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে। এই সকল নানা কারণে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিগণ ওখানকার বিধান পরিষদে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার হ'তে চিটাগঙ্গ বন্দরের উন্নতি সাধনের এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাতেই যে পূর্ব বাংলার সমস্ত বিক্ষোভ দূর হবে এমন আশা করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সমীচীন হবে না।

মানভূম :

১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রহিত করার সময় ইংরেজ তার বদ অভিসন্ধি ত্যাগ করতে পারে নি। অর্থাৎ বাংলাকে মুসলমান-প্রধান প্রদেশ ক'রে তার রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করার যে অভিসন্ধি বঙ্গ-বিভাগের মধ্যে ছিল, বঙ্গ-বিভাগ রহিত করার সময়েও সে অভিসন্ধি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রইল। তাই অনেকগুলি বাংলা ভাষী অঞ্চল বাংলা হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে নবগঠিত বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল। সে বছর জাতীয় কংগ্রেসে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং সমর্থন করেন শ্রীপরমেশ্বর লাল নামক বিহারের একজন খ্যাতনামা নেতা। ইংরেজ সরকারের তরফ থেকেও বলা হয়েছিল—তাড়াতাড়ি ক'রে বঙ্গভঙ্গ করার সময় সীমানার সূক্ষ্ম বিচার করার সময় হয়নি; ধীরে সুস্থে এই ত্রুটি সংশোধন করা হবে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, শ্রীদীপ নারায়ণ সিংহ, মৌলবী ফকরুদ্দীন প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা বিহারী নেতা এক বিবৃতি প্রচার ক'রে বলেন যে, বঙ্গ-ভাষী ঐ সব অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়ে

দেওয়া উচিত। সমগ্র মানভূম, সিংভূমের ধলভূম পরগণা, সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়ার অনেকখানি অংশ সেই হিসাবে বাংলায় আসা উচিত।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনের ও মতের বহু পরিবর্তন হয়েছে। দু'বছর আগে মৃত্যুর কিছু পূর্বে ডাঃ সচ্চিদানন্দ এক পুস্তক লিখে তাঁর ১৯১২ সালের বিবৃতি ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার ক'রে দাবী করেছেন যে, ঐ সব অঞ্চল বিহারেরই অংশ। মানভূমের বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মীদল ৺নিবারণ দাসগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বরাবর ভাষার বিতর্ক এড়িয়ে একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী হিসাবে কংগ্রেসের কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বিহার সরকারের মতিগতি ও কর্মপদ্ধতিতে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মানভূমকে বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবী তাঁরা আজও করেন নি। কিন্তু তাঁরা দাবী করেছেন বিহারের অন্তর্গত থেকেও মানভূম তার ভাষার ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যাতে বজায়-রাখতে পারে। অতুলবাবুর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা বিহারে বেশী ছিলেন না। কিন্তু প্রধানত বিহার সরকারের বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার ফলে কংগ্রেসের সাথে অতুলবাবু ও তাঁর কর্মীদের বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। গত বছর তাঁরা লোক সেবক-সংঘ গঠন ক'রে বিহার সরকারেরই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন। বিভিন্ন নেতৃবর্গের মধ্যস্থতায় সত্যাগ্রহ তখনকার মত স্থগিত রইল, কিন্তু বিহার সরকার তাদের বাংলাভাষা উচ্ছেদ-নীতি বর্জন করল না।

এবারকার সেন্সাসকার্য পরিচালনায় বিহার সরকার অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মানভূমকে হিন্দী-ভাষী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে ব'লে বহু অভিযোগ আমরা পেয়েছি। অতুলবাবু এবং স্থানীয় বার-লাইব্রেরী এবং বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীগণ বহু ঘটনার উল্লেখ ক'রে পণ্ডিত জওহরলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। চিঠি, আবেদন, টেলিগ্রাম—এ যাবৎ অনেকগুলি পণ্ডিতজীর নিকট গিয়েছে। শুনা যায় জওহরলালজী তাঁদের ঐ সব আবেদনের কোন জবাব দেন নাই। পার্লামেন্টের সভ্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বিহার সরকারের এই কার্যকলাপের প্রতি পণ্ডিতজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা অবগত হ'লাম, জওহরলালজী অরুণবাবুর চিঠির উত্তরে তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি এ বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ অনুসন্ধান করবেন। অনুরূপ দুর্ভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য পাঞ্জাব ও পেপসুর সম্বন্ধে ভারত সরকার স্থির করেছেন যে, সেন্সাসের বেলায় ভাষাতত্ত্ব বিবেচনা করা হবে না। আমরা আশা করি বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি সম্বন্ধেও ভারত সরকার অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

পাট ইণ্ডাষ্ট্রী :

ভারতবর্ষের প্রধান রপ্তানি হ'ল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। বিশেষ ক'রে বাংলার ও কলকাতার আর্থিক ব্যবস্থা এই পাট ইণ্ডাষ্ট্রীর উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু প্রায় গত এক বৎসর যাবৎ পাট ইণ্ডাষ্ট্রী নিয়ে বহু গোলমাল চলছে। এর প্রধান কারণ, বস্ত্র বিভাগের ফলে কাঁচা পাটের ঘাটতি বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। তার উপর কোরিয়ার যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য পাটজাত চাহিদা ও মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। পাট কলের কর্মকর্তাগণ এই কয় মাসে অতিরিক্ত মুনাফা বা চোরা বাজারের মুনাফা হিসাবে কোটি কোটি মুদ্রা উপার্জন করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ লোপ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

এতদিন এখানে কাঁচা পাটের উচ্চতম মূল্য নির্ধারিত ছিল মণ প্রতি ৩৫৲ টাকা। এর অর্থ পাট চাষী কৃষক হয়ত ২০।২৫৲ টাকার বেশী প্রতি মণ পাটে পেত না। ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ জানতে চান, তুলা, ধান, গম প্রভৃতির জন্য যেমন নিম্নতম মূল্য নির্ধারিত করা আছে, পাটের জন্যও সে রকম কোন

নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত করা হ'বে কিনা, যাতে বাংলার পাট চাষীরা পাট ব্যবসায়ের এই লাভের কতকটা অংশ পেতে পারে। সরকার থেকে জবাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি কোন নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করার ইচ্ছা সরকারের নেই। পূর্ব বাংলায় যখন পাটের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় অন্যূন ৭০৲ টাকা তখন পশ্চিম বাংলার পক্ষে পাটের উচ্চতম মূল্য ৩৫৲ টাকা নির্দ্ধারণ ক'রে রাখা নিতান্ত বোকামী। ঐ মূল্য নির্দ্ধারণের ফলে পশ্চিম বাংলার অনেক পাট পূর্ব বাংলার গোপনে রপ্তানি হ'ত (smuggled)। কাজেই পশ্চিম বাংলার খাটতি পাটের ভাণ্ডার হ'তে গোপনে পাট পূর্ব বাংলায় চলে যেত।

পার্লামেণ্টে অরুণবাবুর আর এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার থেকে জানিয়েছে যে, ১০০ গজ চটের (hessian) আমেরিকা পৌঁছান পর্যন্ত মূল্য পড়ত পৌনে তেইশ ডলার বা ১১৬।১১৭৲ টাকা। আর আমেরিকার বাজারে ঐ ১০০ গজ চটের মূল্য সাড়ে চৌত্রিশ ডলার বা ১৭০৲ টাকার মত। তার অর্থ প্রতি ১০০ গজ পাটে এখানকার রপ্তানিকারী আমেরিকাতে ৫৫৲ টাকা লাভ করত। এটা নিতান্তই চোরা কারবারের লাভ। এ লাভের টাকা রপ্তানিকারীদের নামে আমেরিকাতেই জমা থাকত। এই সঞ্চিত ডলারের কোন সুবিধাই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত পেত না। সর্বোপরি এই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কোন প্রকার আয়কর (Income tax) ভারত সরকার পেত না। যে পরিমাণ চট ভারতবর্ষ হ'তে আমেরিকায় চালান যায় তাতে এই লাভের পরিমাণ প্রতি মাসে প্রায় ৩ কোটী টাকা। গত কয়মাস যাবৎ পাট ব্যবসায়ের মারফৎ এই প্রকার লুণ্ঠন চলছে। এইভাবে যে কত টাকা চোরা বাজারে অনকগুলি পাট ব্যবসায়ীর হাতে গিয়েছে তা হিসাব করা কঠিন। ভূতপূর্ব ব্যবসায়-মন্ত্রী গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে যেটুকু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাতেও তিনি বলেছিলেন, কেবল মাত্র মোট রপ্তানির শতকরা ১০ ভাগের উপর ১২ কোটী টাকার বেশী চোরাকারবারে মুনাফা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, বাকী শতকরা ৯০ ভাগ চটের রপ্তানি হয়েছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুসারে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণে এমন ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না যাতে আমেরিকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা চলত। সেই পাটও আমেরিকার বাজারে প্রচলিত দামেই বিক্রী হয়েছে। মুনাফা যেই পাক, ভারতবর্ষ সেই ডলারের কোন সুযোগ পায়নি, ভারত সরকারও কোন আয়কর পায়নি। কাজেই দেশ হিসাবে ও সরকারের দিক থেকে রপ্তানির সেই শতকরা ৯০ ভাগ পাটও আমাদের লোকসানই হয়েছে। শতকরা ১০ ভাগে যদি ১২ কোটী টাকা লোকসান হয়ে থাকে, তবে বাকী ৯০ ভাগে লোকসানের পরিমাণ গাণিতিক হিসাবে আরও ১০৮ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। তবে এটুকু স্বীকার করতে রাজী যে, গত বছরের প্রথম দিক দিয়ে ভারতীয় ও আমেরিকার মূল্যের পার্থক্য এতটা ছিল না কাজেই প্রথম দিক দিয়ে লাভ এই পরিমাণে হয়নি।

এই পাট ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাংলার জনসাধারণের দিক থেকে দুটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার পাট চাষীদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পাট ব্যবসায়ে টাকার এই ছিনিমিনি খেলার সময়েও তারা কাঁচা পাটের পর্যাপ্ত মূল্য পায়নি। দ্বিতীয় কথা হ'ল, পাটকলের অংশীদারগণের কথা; এরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ১০।২০ টাকা ক'রে দিয়ে পাট কোম্পানীগুলির অংশ (share) কিনেছিল। এই যে এত লাভের খেলা চলছে তাতেও অংশীদারদের ভাগে দেখান হবে নিতান্তই লোকসান। কারণ কাঁচা পাটের সর্বোচ্চ মূল্য ৩৫৲ টাকা দরে অনেকেই পাট কেনে নাই, বা কিনে থাকলেও বেশী মূল্য দেখিয়েছে। কাঁচা পাটের আমদানীর জন্য যে সংস্থা করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে মিল সমূহের কর্মকর্তাদের হাতে। মিল বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে অতিরিক্ত মূল্যে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা এরা করে নিয়েছিল, অথচ উৎপন্ন চট মিল সম্পূর্ণ করেছে আর একটী সরকার

সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দিষ্ট ৪৫৲ টাকা মূল্যে এই শেষোক্ত সংস্থাটির ভারও মিল কর্তৃকর্তাদের হাতে। যা কিছু মজা লুটবার তা করা হয়েছে মিল থেকে প্রতি ১০০ গজ চটে ৪৫৲ টাকা মূল্যে সমস্ত চট ঐ সংস্থার হাতে যাওয়ার পরে। এই ছিল সরকারের ব্যবস্থা এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাই মিল কর্তৃকর্তাদের পরামর্শ অনুসারে করা হয়েছিল। দেশের বুকের উপর বসে ১৫।২০টী অবাঙালী ও অবাঙালী ব্যবসায়ী ও ধনপতি পাট ব্যবসায়ে কোটী কোটী টাকা উপার্জন করল, অথচ এই ব্যবসায়ের দ্বারা যেসব—পাটচাষী ও পাটকল সমূহের অংশীদারগণ—তাদের ভাগ্যে কোন মুনাফাই জুটল না। পাট ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হ'তে হ'তে ১৯৪৯ সালে দেখান হয়েছে লোকসান, অর্থাৎ পাট কোম্পানীগুলির অংশীদারগণ লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ট স্বরূপ কিছুই পায়নি। হয়ত ১৯৫০ সালেও তাদের ভাগ্যে শূন্য রহবিলই দেখান হবে। আধুনিক অর্থনীতির এ একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা।

এখন পাট ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ লোপ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল ব'লে আমরা মনে করি। আমাদের মতে সমস্ত ব্যবসায় সরকারের নিজের হাতে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কাঁচা পাট ও পাট-উৎপন্ন চট উভয়েরই ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে দুটী সংস্থা ছিল তার প্রধান কর্মকর্তা ছিল দুজন ইউরোপীয়। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রপ্তানি ইণ্ডাষ্ট্রির ভাগ্য দুটী বিদেশীর হাতে এভাবে ছেড়ে দেওয়া সরকারের পক্ষে যে কতবড় ভুল হয়েছে তা স্পষ্ট ভাষায় সরকারের স্বীকার করা উচিত। অবশ্য ঐ দুজন বিদেশী ধনপতির সহকারী ও সহযোগী হিসাবে কয়েকজন দেশীয় ধনপতি ছিলেন; তাঁরা সবাই অবাঙালী। দেশ ও জাতির স্বার্থের দিক দিয়ে তাদের আচরণ ঐ দুটী বিদেশীর ধনপতির আচরণ থেকে বিন্দুমাত্রও ভাল নয়। কিছুদিন পূর্বে পার্লামেণ্টে অরুণবাবুর আর একটী প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-মন্ত্রী বলেছেন, পাট ব্যবসায়কে সরকারী ব্যবসায়ী সংস্থার হাতে আনবার সংকল্প সরকার এখনও ত্যাগ করেননি, এবং এ সম্বন্ধে এখনও তাঁরা বিচার বিবেচনা করছেন। আশাকরি খুব বেশী বিলম্ব না ক'রে তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এবং ঐ রকম কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লে তার কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভার এইসব অনার্য ব্যবসায়ীদের উপর ছেড়ে দেবেন না। বাংলার অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ উন্নতি পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। কাজেই বাংলার জনতার স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয় তেমন ভাবে যেন সেই সংস্থা গঠিত হয়।

সালতামামি ৫

১৩৫৭ সাল শেষ হয়ে আর একটি নূতন বৎসর সুরু হ'তে চলল। এক একটা বৎসর আসে—জাতির মনে আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে; কিন্তু বছর যখন শেষ হয়, তখন সে রেখে যায় নিরাশা ও ব্যর্থতার বোঝা। প্রায় ৩ বছর হ'তে চলল ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের অধিকারে পেয়ে দেশের শাসনকার্য বিদেশীর হাত থেকে নিজে গ্রহণ করেছে।—এ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাওয়ার আগে তার সব কিছু ব্যর্থতা ও দুঃখ-দৈন্যের জন্য দায়ী করত বিদেশী শাসনকর্তাদের। তাতে আর কিছু না হোক আত্মধিক্কারের কোন অবকাশ তার থাকত না এবং অদূর ভবিষ্যতে সব কিছুর সুব্যবস্থা হবে এমন আশা দিয়ে সে একটা সান্ত্বনাও পেত। কিন্তু আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়ার পর বিদেশী শাসকদের উপর দোষ চাপিয়ে সে সান্ত্বনা তো পায়-ই না, বরং আত্মগ্লানিতে তার মন ভ'রে ওঠে।

যে বছর শেষ হ'তে চলেছে তা কি রেখে গেল তার হিসাব নিতে গেলে দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হতে হয়। যে সব নেতাদের আহ্বানে জাতি একদিন দুঃখ বরণের রাস্তায় নেমেছিল, আজ তাঁদের প্রতি সেই আস্থা জাতি হারাতে বসেছে। যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব নিয়েছিল এবং ভরসা দিয়েছিল স্বাধীনতা লাভের পর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই জাতীয়

প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশবাসীর আস্থা রাখা কঠিন হ'য়ে উঠেছে। প্রায় চার বছর শাসনকার্যের ভিতর তারা কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করতে পারেনি বা কোন বিশেষ অর্থনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ নিয়ে চলবার প্রয়াসও করতে পারেনি। এই তিন বছরের শাসনে একদিকে ধনপতিদের লোভ ও মুনাফাস্পৃহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে; অপর দিকে শ্রমিকদের বহু দাবীও মেনে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাধারণ জনতা, যারা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে ব্যবহার করে এবং যারা সংখ্যায় শতকরা ৯০ জন, তাদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে প্রায় দুর্বহ। একদিকে কাশ্মীর নিয়ে এবং হয়ত মনের কোণে লুক্কায়িত কোন এক অক্ষম বাসনার বশে পাকিস্তানের সাথে একটা খিচিমিচির সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে, অপর-দিকে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি দ্বারা পূর্ব বাংলার কম বেশী এক কোটী হিন্দুর স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। একদিকে কন্‌ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য করা হয়েছে, অপর দিকে কন্‌ট্রোলের ভিতর এমনি ফাঁক ও ফাঁকির সুযোগ রয়েছে যার বলে চোরা কারবারের অবাধ প্রচলন সম্ভব হয়েছে এবং ধনপতিদের ধনভাণ্ডার চোরা মুনাফায় দিনের পর দিন স্ফীত হয়েছে। শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির পর যোগ হয়েছে নৈসর্গিক বিপর্যয়। ভূমিকম্প, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হিসাবের চাইতে অনেক কম হয়েছে। অপর দিকে শাসকবর্গ কাগজ-কলমের হিসাব দিয়ে ঠিক করেছিলেন যে, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের ভেতর আমরা খাদ্যশস্যে স্বপর্যাপ্ত হ'ব। এই হিসাবের বলে সময়মত বিদেশ হ'তে খাদ্য আমদানি করা হয়নি। আজ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা যাচ্ছে। এখন অতিরিক্ত মূল্যে খাদ্য আমদানির অর্থ যোগাবার জন্য দেশবাসীকে প্রায় উলঙ্গ রেখে অতিরিক্ত পরিমাণে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করতে হয়েছে। দেশে খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব এবং সর্বোপরি দেখা দিয়েছে নৈতিক চরিত্রের অভাব। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—ক্ষুধার্তের নিকট ভগবানকে আসতে হ'লে অন্নরূপে আসতে হ'বে। আজ ক্ষুধার্ত দেশবাসীকে নৈতিক চরিত্রের কথা কে বলতে যাবে?

নূতন আদমসুমারীতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৭৪ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে ৪৮ লক্ষের মত উদ্বাস্তু পাওয়া যায়, আর পূর্ব পাকিস্তান হ'তে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৭ লক্ষ। ভারতের পশ্চিম অঞ্চল হ'তে প্রায় ৫০ লক্ষ মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। তাদের বিষয় সম্পত্তি, ঘর দরজা আর্থিক মূল্য হিসাবে যাই হোক, ঐ ৪৮ লক্ষ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত হ'তে পেরেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান হ'তে আগত প্রায় ২৭ লক্ষ উদ্বাস্তুর পক্ষে তেমন সুযোগ জোটেনি। পূর্বপাঞ্জাব ও পেপ্‌সু হ'তে অন্যূন ৪০ লক্ষ মুসলমান চলে গিয়েছে এবং ঐ দুই রাজ্যে মোট উদ্বাস্তু বসেছে ২৮ লক্ষ। পশ্চিম বাংলা হ'তে হয়ত ৪।৭ লক্ষ মুসলমান পূর্ব বাংলায় গিয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা হ'ল ২১ লক্ষের কিছু উপরে। আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য নিয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা হ'বে ৪ লক্ষ। এই পূর্ব পাকিস্তান হ'তে আগত উদ্বাস্তুদের হিসাব লালতামামির একটা বড় অঙ্ক। এদের পুনর্বাসনে কোন প্রকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা এখনও সুদূর-পরাহত। পশ্চিম বাংলার মত ঘনবস্তি একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে ২১।২২ লক্ষ উদ্বাস্তুর অধিবাস সেই প্রদেশের পক্ষে ও উদ্বাস্তুদের পক্ষে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে বাধ্য। এদের পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা হ'তে যতই দেরী হ'বে, ততই প্রদেশের পক্ষে হানিকর। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হ'লে প্রদেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির পক্ষে এরা সহায়ক হ'বে এ-কথা পশ্চিম বাংলার মুখ্য-মন্ত্রী সেদিন স্বীকার করেছেন। আশা করি পশ্চিম বাংলা সরকার ও সরকারের সমর্থকগণ মুখ্য-মন্ত্রীর এই উক্তির যথাযোগ্য মর্যাদা দেবেন।

বছরের হিসাবে আমরা সুখের ও আনন্দের কিছুই

পাইনি। তবু, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা নূতন সমাজ গড়বার সংকল্প নিয়েই চলতে চাই। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর অনিবার্য ভুল-ত্রুটি ও সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে লোকের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা বাড়বেই। তার পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে; ভুল-ত্রুটিও নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ চলতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস হারান চলে না। সেই বিশ্বাসের বলেই জাতির ভবিষ্যতের প্রতি আমরা আজও আশান্বিত।

মন্দিরার নূতন বছর—

মন্দিরা তার ১৩ বৎসর এবার পূর্ণ করছে। মন্দিরার জন্ম হয়েছিল পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর;—সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দীন সেবকরূপে মন্দিরা তার দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। আজ [illegible] ভারতে নূতন সমাজ গঠনের মহান দায়িত্ব নিতেও মন্দিরা দ্বিধা করেনি এবং তারজন্যও যা কিছুর বাধা ও অসুবিধা মন্দিরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। তারপর যারা মন্দিরার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছি, আমাদের ত্রুটি ও যত্নের অভাব-ও মন্দিরাকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু-ও এই ১৩ বছর, মন্দিরা আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে দেশ ও জাতির সেবা ক'রে এসেছে। পরিচালকবর্গের তরফ থেকে, আমরা অতীতের ত্রুটি ও অক্ষমতা স্বীকার ক'রে, আগামী বছরে যথাসাধ্য তা দূর করবার সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আশা করি আগামী বছরে মন্দিরা আরও সুষ্ঠুভাবে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারবে। এই ভরসায় আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের অধিকতর সহায়তা আশা করছি।

আগামী সংখ্যা থেকে

তারাশঙ্করের

"সাহিত্য জীবন কথা"

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সূর্যি গেল পাটে
খুকু গেল জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল
তুলতে গিয়ে বিষ্টি এল ভিজল খুকুর চুল
চুল ভিজিয়ে খুকুমনির চক্ষু ছল ছল
তাই দেখে মা চা করতে চড়িয়ে দিল জল

চা

বিষণ্ণ বর্ষায় অপরিহার্য্য পানীয়

CTB 22 সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

Regd. No C 2504

অ্যাস্‌কো বার সোপ

বিশুদ্ধ সাবান

প্রস্তুতকারক

এসিয়াটিক সোপ কোম্পানী

৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা